Contents
তাফসীরে ইবনে কাছীর
প্রথম খণ্ড
আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ.)

Contents

তাফসীরে ইবনে কাছীর

প্রথম খণ্ড

(ফাযায়েলুল কুরআন, সূরা ফাতিহা ও আলিফ লাম পারা)

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক আখতার ফারূক

অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

Contents

তাফসীরে ইবনে কাছীর (প্রথম খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত
ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত
ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ৫৪
ইফা প্রকাশনা : ১৫৫২/৫
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0432-5

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৮৮

ষষ্ঠ সংস্করণ (উন্নয়ন)
মার্চ ২০১৪
চৈত্র ১৪২০
জমাদিউল আওয়াল ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামিক প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৬০০.০০ টাকা।

TAFSIRE IBNE KASIR (Commentary on the Holy Quran) (1st Volume): Written by Imam Abul Fidaa Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535 March 2013
E-mail : info @ islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

Contents

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ফাযায়েলুল কুরআন

অহী অবতরণ পরিক্রমা	২৭
কুরআনের গ্রন্থনা	৩৮
হযরত উসমান (রা) কর্তৃক কুরআন লিপিবদ্ধকরণ	৪৩
আরবী লিখন পঠন পদ্ধতি	৫৬
নবী করীম (সা)-এর লেখকবৃন্দ	৫৮
কুরআন মজীদ সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে	৫৮
সাত হরফের তাৎপর্য	৭২
কুরআন মজীদের সূরাসমূহের বিন্যাস	৭৭
কুরআন মজীদের নুকতা স্থাপন	৮২
নবী করীম (সা)-এর সমীপে জিবরাঈল (আ)-এর কুরআন তিলাওয়াত	৮৩
কারী সাহাবাবৃন্দ	৮৪
কুরআন তিলাওয়াতের সময়ে রহমতের ফেরেশতার অবতরণ	৯২
তিনি দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব ভিন্ন অন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই	৯৫
কুরআন মজীদ শ্রেষ্ঠতম বাণী	৯৬
আল্লাহ্র কিতাব আঁকড়াইয়া থাকিবার ওসিয়ত	৯৯
সুরের সহিত কুরআন তিলাওয়াত	৯৯
সুরের সহিত তিলাওয়াত প্রসঙ্গে	১০২
কুরআন পাঠকের সৌভাগ্য	১১১
কুরআন শিক্ষা লাভ ও শিক্ষা দান	১১৪
কুরআন মজীদের মুখস্থ তিলাওয়াত	১১৭
বারংবার তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন অবিস্মৃত রাখা	১২০
যানবাহনে কুরআন তিলাওয়াত	১২৪
বালক-বালিকাদের কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা	১২৫
কুরআন মজীদের বিস্মরণ	১২৭
কুরআনের সূরার নামকরণ	১৩০

মন্থর গতিতে কুরআন তিলাওয়াত ১৩১
কুরআনের অক্ষর টানিয়া পড়া ১৩৩
তিলাওয়াতে স্বর বিশেষের বারংবার নিঃস্বরণ ১৩৪
সুমধুর আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত ১৩৫
অপরের মুখে তিলাওয়াত শ্রবণ ১৩৬
তিলাওয়াতকারীকে থামিতে বলা ১৩৬
কতদিনে কুরআন খতম বিধেয় ১৩৭
তিলাওয়াতকালে ক্রন্দন ১৪৩
কুরআনের লোক দেখানো প্রীতির নিন্দা ১৪৪
কুরআনে তিলাওয়াতে মনোযোগের গুরুত্ব ১৪৬
কতিপয় জরুরী হাদীস ১৪৯
কুরআন মজীদ স্মরণ রাখিবার দোয়া ১৫৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
সূরা ফাতিহা

উপক্রমণিকা ১৬৩
প্রয়োজনীয় কথা ১৭৯
সূরা আল-ফাতিহা ১৮৩
সূরা ফাতিহার ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ১৮৭
উক্ত হাদীস সম্পর্কে জরুরী আলোচনা ১৯৩
আউযুবিল্লাহর ব্যাখ্যা ও বিধান ১৯৬
ইস্তিআযার অর্থ নিরূপণ ২০৪
'আর রাজীম' শব্দের বিশ্লেষণ ২০৭
বিসমিল্লাহর বিশ্লেষণ ২০৮
বিসমিল্লাহ্র ফযীলত ২১১
'ইসম'-এর তাৎপর্য ২১৫
'আল্লাহ্' শব্দের গঠন-প্রকৃতি ও তাৎপর্য ২১৭
আলহামদুর তাৎপর্য ২৩২
আর রহমানির রহীম ২৩৭
মালিকি ইয়াওমিদ্দীন ২৩৮
ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন ২৪২
ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম ২৪৭

সিরাতাল্লাযীনা আন আমতা আলায়হিম গায়রিল মাগদুবি আলায়হিম ওলাদ দাল্লীন	২৫২
দাল্লীন ও জাল্লীন সমস্যা	২৫৯
ফাতিহার বিষয়বস্তু	২৬০
আমীন প্রসঙ্গ	২৬২

তৃতীয় অধ্যায়
আলিফ-লাম পারা

সূরা বাকারার ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ	২৬৯
সূরা আলে ইমরানসহ সূরা বাকারার ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনা	২৭২
দীর্ঘ সাত সূরার ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ	২৭৫
সূরা বাকারা সম্পর্কিত জরুরী আলোচনা	২৭৭
সূরা বাকারার তাফসীর প্রথম আয়াত হুরুফে মুকাত্তা'আত	২৭৮
দ্বিতীয় আয়াত মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য	২৮৫
তৃতীয় আয়াত মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য	২৯১
চতুর্থ আয়াত মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য	২৯৭
পঞ্চম আয়াত মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য	৩০১
ষষ্ঠ আয়াত কাফিরদের পরিচয়	৩০২
সপ্তম আয়াত কাফিরদের পরিচয়	৩০৪
অষ্টম ও নবম আয়াত মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত	৩০৮
দশম আয়াত মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত	৩১১
একাদশ-দ্বাদশ আয়াত মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত	৩১৪
ত্রয়োদশ আয়াত মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত	৩১৭
চতুর্থদশ-পঞ্চদশ আয়াত মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত	৩১৮
ষষ্ঠদশ	৩২৩
সপ্তম-অষ্টাদশ আয়াত মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত	৩২৪
আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে পূর্বসূরিদের বক্তব্য	৩২৬
উনবিংশ-বিংশ আয়াত	৩২৮
প্রাসঙ্গিক হাদীসসমূহ	৩৩১
২১-২২ আয়াত তাওহীদের প্রমাণ	৩৩৬
২৩-২৪ আয়াত কুরআনের চ্যালেঞ্জ	৩৪২
বিশেষ জ্ঞাতব্য "	৩৫১
২৫ আয়াত "	৩৫২
২৬-২৭ আয়াত কুরআনে প্রদত্ত উপমা ও ইহার প্রতিক্রিয়া	৩৫৫

Contents

২৮ আয়াত পুনর্জীবনের প্রমাণ ৩৬৫
২৯ আয়াত মানুষের কল্যাণে আল্লাহ্‌র দৃষ্টি ৩৬৭
৩০ আয়াত মানুষের মর্যাদা ৩৭২
তাফসীরকারদের পর্যালোচনা ৩৭৫
৩১-৩৩ আয়াত ৩৮২
৩৪ আয়াত শয়তানের অহংকার ও পতন ৩৮৯
৩৫-৩৬ আয়াত আদম (আ)-এর পরীক্ষা ও পদস্খলন ৩৯৭
৩৭ আয়াত আদম (আ)-এর তাওবা ৪০৪
৩৮-৩৯ আয়াত ৪০৬
৪০-৪১ আয়াত বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ ৪০৮
৪২-৪৩ আয়াত " ৪১৩
৪৪ আয়াত " ৪১৫
৪৫-৪৬ আয়াত সবর ও সালাতের গুরুত্ব ৪১৯
৪৭ আয়াত বনী ইসরাঈলের নিআমত প্রাপ্তি ৪২৩
৪৮ আয়াত বনী ইসরাঈলের নিআমত প্রাপ্তি ৪২৫
৪৯-৫০ আয়াত বনী ইসরাঈলের নিআমত প্রাপ্তি ৪৩০
৫১-৫৩ আয়াত বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা ৪৩৫
৫৪ আয়াত " ৪৩৭
৫৫-৫৬ আয়াত " ৪৪০
৫৭ আয়াত " ৪৪৫
৫৮-৫৯ আয়াত " ৪৫৫
৬০ আয়াত " ৪৬২
৬১ আয়াত " ৪৬৪
৬২ আয়াত ঈমান ও আমলের গুরুত্ব ৪৬৯
৬৩-৬৪ আয়াত বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা ও শাস্তি ৪৭৪
৬৫-৬৬ আয়াত " ৪৭৬
৬৭ আয়াত " ৪৮৩
৬৮-৭১ আয়াত " ৪৯১
৭২-৭৩ আয়াত ৪৮৭
৭৪ আয়াত ৫০১
৭৫-৭৭ আয়াত ৫১০
৭৮-৭৯ আয়াত ৫১৬
৮০ আয়াত ৫২১

৮১-৮২ আয়াত	৫২৩
৮৩ আয়াত	৫২৫
৮৪-৮৬ আয়াত	৫২৯
৮৭ আয়াত	৫৩৩
রূহুল কুদুসের তাৎপর্য	৫৩৫
৮৮ আয়াত বনী ইসরাঈলের দুর্গতি ও শাস্তিভোগ	৫৩৯
৮৯ আয়াত	৫৪২
৯০ আয়াত	৫৪৪
৯১-৯২ আয়াত	৫৪৬
৯৩ আয়াত	৫৪৯
৯৪-৯৬ আয়াত	৫৫২
৯৭-৯৮ আয়াত জিবরাঈলের মর্যাদা	৫৬০
৯৯-১০৩ আয়াত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্যসহ আগমন	৫৭৪
হারূত মারূত সম্পর্কিত হাদীস ও তৎসম্পর্কিত আলোচনা	৫৮৮
সাহাবী ও তাবেঈগণ কর্তৃক বিবৃত বিবরণ	৫৯১
যাদুর প্রভাব	৬০১
১০৪-১০৫ আয়াত মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ	৬১৯
১০৬-১০৭ আয়াত রহিতকরণ প্রসঙ্গ	৬২৩
১০৮ আয়াত মুসলমানদের কর্তব্য	৬৩১
১০৯-১১০ আয়াত মুসলমানদের কর্তব্য	৬৩৫
১১১-১১৩ আয়াত ইয়াহূদী-খৃস্টানদের অযৌক্তিক দাবী	৬৩৯
১১৪ আয়াত মসজিদ ধ্বংস প্রচেষ্টার শোচনীয় পরিণাম	৬৪৫
১১৫ আয়াত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ	৬৫১
১১৬-১১৭ আয়াত আল্লাহ্ই পৃথিবী ও আসমানের স্রষ্টা	৬৫৯
১১৮ আয়াত	৬৬৪
১১৯ আয়াত	৬৬৭
১২০-১২১ আয়াত কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব	৬৭১
১২২-১২৩ আয়াত বনী ইসরাঈলের প্রতি সতর্কবাণী	৬৭৬
১২৪ আয়াত ইবরাহীম (আ)-এর মর্যাদা	৬৭৭
১২৫ আয়াত বায়তুল্লাহ্ শরীফের মর্যাদা	৬৮৯
১২৬-১২৮ আয়াত মক্কা শরীফের মর্যাদা	৭০০
কা'বা নির্মাণের ইতিহাস	৭০৬
কুরায়শ কর্তৃক কা'বা ঘর পুনর্নির্মিত হওয়ার ঘটনা	৭৩৩

১২৯ আয়াত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ ৭৪৬
১৩০-১৩২ আয়াত ইবরাহীম (আ)-এর মর্যাদা ৭৪৯
১৩৩-১৩৪ আয়াত প্রত্যেকের কর্মফল তাহারই জন্য ৭৫৫
১৩৫ আয়াত ইয়াহূদী-খৃস্টানদের বিভ্রান্তি ৭৫৭
১৩৬ আয়াত মুসলমানদের বিশ্বাসের স্বরূপ ৭৫৮
১৩৭-১৩৮ আয়াত ৭৬১
১৩৯-১৪১ আয়াত প্রত্যেকের কর্মফল তাহার নিজের জন্য ৭৬৩

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্প্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই।
পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।
এ তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশ প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এ তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।
আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয়

মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইব্ন কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন, 'এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।' আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম' বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক আখতার ফারূক। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয় এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইব্‌ন কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের তিনটি সংস্করণ ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর চতুর্থ সংস্করণ পাঠকদের সুবিধার্থে রয়্যাল সাইজে প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থের নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

Contents

যাঁর দু'আ ও অনুমোদন এই গ্রন্থের প্রাণপ্রবাহ
মরহুম শায়েখ হযরত হাফেজ্জী হুযূরের
মাগফিরাত কামনায় নিবেদিত

সবিনয় নিবেদন

অশেষ দাতা ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে আরম্ভ করিতেছি। অনন্ত প্রশংসা সেই চিরন্তন প্রভুর যাঁহার 'হও' বলায় আমরা অস্তিত্ববান হই আর 'নাই' বলার সাথ সাথে বিলীন হইয়া যাই। অশেষ প্রশংসা সেই রহমানুর রহীমের যিনি কলমের সাহায্যে আমাদিগকে শিখাইলেন আর অজানাকে জানাইয়া আঁধারপুরী হইতে আলোর জগতে পৌঁছাইয়া দিলেন। অজস্র দরূদ ও সালাম সেই মহান রাসূল (সা) ও তাঁহার আল-আসহাবের উপর যাঁহার অস্তিত্বের বদৌলতে আমাদের অস্তিত্বের উদ্ভব আর যাঁহার হিদায়াত ও শাফাআত আমাদের ইহ ও পরকালের নাজাতের একমাত্র পূর্বশর্ত। ওগো পরওয়ারদেগার! আমার কাজকে সহজ কর আর তাহা সুসম্পন্ন করার তাওফীক দান কর।

প্রারম্ভেই আমি অকপটে স্বীকার করিতেছি যে, তাফসীর ইব্ন কাছীর অনুবাদ করার যথাযথ যোগ্যতা আমার নাই। তথাপি আল্লাহ্র রহমত ও বুযুর্গানের দোআর উপর ভরসা করিয়া এরূপ দুঃসাহসিক কাজে এই জন্য হাত দিয়াছি যে, সুদীর্ঘ সাত শতাব্দী ধরিয়া বাংলা ভাষাভাষী ভ্রাতাভগ্নীগণ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নির্ভরযোগ্য তাফসীরের অশেষ জ্ঞান ও অফুরন্ত কল্যাণ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। বস্তুত, এতকালের সুযোগ্য মনীষীদের অবহেলা ও ঔদাসীন্যজনিত এই বঞ্চনার বেদনা লইয়া আমি ছাত্র জীবন হইতেই এই মহান দায়িত্বটি পালনের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছিলাম।

অবশেষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম সাহেব আমার এই সম্পর্কিত প্রকল্পটি সোৎসাহে গ্রহণ করিয়া আমারই স্কন্ধে ইহার সার্বিক দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। অগত্যা আমি ১৯৮১ সালে উহা শুরু করার পরই বিভিন্ন কাজে জড়াইয়া পড়িলাম। অতঃপর ১৯৮৬ সালে উহা হইতে নিজকে মুক্ত করিলাম এবং অনুবাদ কার্যে মনোযোগ দিলাম। তাহারই ফলশ্রুতিতে মার্চ ২০০৩ সালে আল্লাহ্র ফযলে তাফসীরে ইব্ন কাছীরের একাদশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়া সমাপ্ত হইল।

প্রথম খণ্ডে আমি সূরা ফাতিহাসহ আলিফ লাম পারার তাফসীর সন্নিবেশিত করিয়াছি। পরন্তু প্রচলিত রীতি অনুসরণ করিয়া আমি মুসান্নিফ (র)-এর সর্বশেষে সংযোজিত 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়টি অনূদিত গ্রন্থের শুরুতেই সংযোজন করিয়াছি। উহাও একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বিধায় আমি উহার স্বতন্ত্র পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রদান করিয়াছি। অনূদিত এই গ্রন্থটির নাম মূলত 'তরজমাতুত তাফসীরে ইব্ন কাছীর'। কিন্তু সংক্ষেপণ ও সঙ্গতির জন্য আমি শুধু 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর' নাম দিয়াছি।

বলাবাহুল্য, আমার শাস্ত্রজ্ঞান নগণ্য, ভাষাজ্ঞান সীমিত ও লেখনী বড়ই দুর্বল। এত অক্ষমতা লইয়া আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া যতটুকু করিলাম তাহা সহৃদয় উলামায়ে কিরাম ও সুধীমণ্ডলীর সার্বিক সহায়তার আশায়ই প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। তাঁহারা আমার অজ্ঞতার ক্ষেত্রে জ্ঞান দান করিবেন, ভাষার ত্রুটি সংশোধন করিবেন ও লেখনীর দুর্বলতা

ধরাইয়া দিবেন, ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা। উহার বিনিময়ে আমি চিরকাল তাঁহাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব।

প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া খুবই খুশি হইলাম। সম্পূর্ণ নির্ভুল ও নিখুঁত করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থাকিতে পারে। অনুবাদের ক্ষেত্রেও দুই একটি অসতর্কতাজনিত ভুল থাকিতে পারে। তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ জানাইলে আশা করি, ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে এইসব ত্রুটি সংশোধিত হইবে। এতবড় গ্রন্থের ত্রুটি বিচ্যুতিটুকু সহৃদয় পাঠকবৃন্দ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন বলিয়া আমার দৃঢ় আস্থা রহিয়াছে।

এই বিরাট অনুবাদকার্যে আমি গওহর ডাংগার এককালের কৃতি ছাত্র ও বর্তমানে শিক্ষকতারত মাওলানা মাজহারুল হকের পরোক্ষ সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। তেমনি ইহার প্রকাশনাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সহযোগিতার জন্য অনুবাদ বিভাগের মাওলানা ফরীদউদ্দীন মাসউদ ও জনাব আবুল বাশার আখন্দ এবং প্রকাশনা বিভাগের জনাব আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী ও হাফেজ মঈনুল ইসলামের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। তৃতীয় সংস্করণের প্রুফ সংশোধন করেছেন জনাব মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী। আল্লাহ্ পাক তাহাদের সকলের ইহ ও পরকালীন কল্যাণ দান করুন, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

পরিশেষে আমি এতটুকুই বলিতে চাই, এই গ্রন্থের যাহাকিছু কৃতিত্ব তাহার সবটুকু প্রশংসা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের প্রাপ্য আর যাহাকিছু অকৃতিত্ব তাহার সবটুকু নিন্দার একমাত্র প্রাপক আমিই। এই অধম বান্দার পারলৌকিক মুক্তির জন্য আল্লাহ্ গফুরুর রহীম এই নগন্য কাজটিকে বাহানা হিসাবে কবূল করুন, ইহাই আমার একমাত্র মুনাজাত। আমীন-ইয়া রাব্বাল আলামীন!

আহকার

আখতার ফারুক

গ্রন্থকার পরিচিতি

ইমাম হাফিজ আল্লামা ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন উমর ইব্ন কাছীর আল্ কারশী আল বসরী (র) ৭০০ হিজরী মোতাবেক ১৩০০ খ্রীস্টাব্দে সিরিয়ার বসরা শহরে এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পবিরারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শায়খ আবূ হাফস শিহাবুদ্দীন উমর (র) সেখানকার 'খতীবে আজম' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আবদুল ওহাব (র) সমসাময়িক কালের একজন খ্যাতনামা আলিম, হাদীসবেত্তা ও তাফসীরকার ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র যয়নুদ্দীন ও বদরুদ্দীন সেই যুগের প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ছিলেন। মোটকথা, তাঁহার গোটা পরিবারই ছিল সেকালের জ্ঞান জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ।

মাত্র তিন বৎসর বয়সে ৭০৩ হিজরীতে তিনি পিতৃহারা হন। তখন তাঁহার অগ্রজ শায়খ আবদুল ওহাব তাঁহার অভিভাবকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। ৭০৬ হিজরীতে তাঁহার আগ্রহের সহিত বিদ্যার্জনের জন্য তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাকেন্দ্র বাগদাদে উপনীত হন। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আবদুল ওহাবের কাছেই সম্পন্ন হয়। অতঃপর তিনি শায়খ. বুরহানুদ্দীন ইব্ন আবদুর রহমান ফাযারী ও শায়খ কামালুদ্দীন ইব্ন কাযী শাহবার কাছে ফিকাহ্শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ইত্যবসরে তিনি শায়খ আবূ ইসহাক সিরাজীর 'আত তাম্বীহ ফী ফুরুইস শাফেঈয়াহ' ও আল্লামা ইব্ন হাজিব মালেকীর 'মুখতাসার' নামক গ্রন্থদ্বয় আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করেন। ইহা হইতেই তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

খ্যাতনামা হাদীস শাস্ত্রবিদ 'মুসনিদুদ দুনিয়া রিহলাতুল আফাক' ইব্ন শাহনা হাজ্জারের কাছে তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁহার অন্যান্য উস্তাদবৃন্দ হইতেছেন ঃ বাহাউদ্দীন ইব্ন কাসিম ইব্ন মুজাফ্ফার ইব্ন আসাকির, শায়খুজ জাহির আফীফুদ্দীন ইসহাক ইব্ন ইয়াহিয়া আল আমিদী, ঈসা ইবনুল মুতইম, মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ, বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন সুয়ায়দী, ইবনুর রাযী, হাফিজ জামালুদ্দীন ইউসুফ আল মিয্যী শাফেঈ, শায়খুল ইসলাম তকীউদ্দীন আহমদ ইব্ন তায়মিয়া আলহার্‌রানী, আল্লামা হাফিজ কামালুদ্দীন যাহাবী ও আল্লামা ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুস্ সিরাজী। তন্মধ্যে তিনি সর্বাধিক শিক্ষালাভ করেন 'তাহযীবুল কামাল' প্রণেতা সিরীয়ার মুহাদ্দিছ আল্লামা হাফিজ জামালুদ্দীন ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমান মিয্যী আশ্ শাফেঈ (র) হইতে। পরবর্তীকালে তাঁহারই কন্যার সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর বেশ কিছুকাল তিনি শ্বশুরের সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার রচিত 'তাহযীবুল কামাল' ও অন্যান্য হাদীস সংকলন অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ফলে হাদীস শাস্ত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জিত হয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র)-এর সান্নিধ্যেও তিনি বেশ কিছুকাল অধ্যয়নরত ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি বিভিন্ন জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাহা ছাড়া মিসরের ইমাম আবুল ফাতাহ দাবুসী, ইমাম আলী ওয়ানী ও ইমাম ইউসুফ খুতনী তাঁহাকে মুহাদ্দিস হিসাবে স্বীকৃতি দানপূর্বক হাদীস শাস্ত্র অধ্যাপনার অনুমতি প্রদান করেন।

[আঠার]

মোটকথা, মুসলিম জাহানের তৎকালীন সেরা মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও ফকীহ্বৃন্দের নিকট হইতে বিপুল অনুসন্ধিৎসা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তিনি নিজকে সমগ্র মুসলিম জাহানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমামের গৌরবময় আসন অধিষ্ঠিত করেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ ছাড়াও তিনি আরবী ভাষা, সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাসে অশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। এক কথায় উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে সমানে পারদর্শীতার ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তিত্ব খুবই বিরল। হাদীস শাস্ত্রে তো তিনি 'হুফ্ফাজুল হাদীস'-এর মর্যাদায় ভূষিত হইয়াছিলেন। তেমনি আরবী ভাষার তিনি একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন।

ইমাম ইব্ন কাছীর সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহাদের কয়েকজনের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

আল্লামা হাফিজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ

"হাফিজ জামালুদ্দীন মিয্যীর সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করিয়া তিনি হাদীস শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অশেষ পারদর্শীতা অর্জন করেন।"

প্রখ্যাত ইতিহাসকার আল্লামা আবুল মাহাসীন জামালুদ্দীন ইউসুফ বলেন ঃ

"হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ্, আরবী ভাযা ও আরবী সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল।"

হাফিজ আবুল মাহাসিন হুসায়নী দামেশকী বলেন ঃ

"ফিকাহ্ শাস্ত্র, তাফসীর, সাহিত্য ও ব্যাকরণে তিনি বিপুল পারদর্শীতা লাভ করেন ও হাদীস শাস্ত্রের 'রিজাল' ও 'ইলাল' প্রসঙ্গে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সুতীক্ষ্ম ও সুগভীর।"

হাফিজ যয়নুদ্দীন ইরাকী বলেন ঃ

হাদীসের 'মতন' ও ইতিহাস শাস্ত্রে সবচাইতে প্রজ্ঞাবান হইলেন ইমাম ইব্ন কাছীর।"

শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রায্যাক হামযাহ্ বলেন ঃ

"ইমাম ইব্ন কাছীর সমগ্র জীবনব্যাপী জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। এই জ্ঞানার্জন ও গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি প্রচুর পরিশ্রম ব্যয় করেন।"

হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবী বলেন ঃ

"ইমাম ইব্ন কাছীর একাধারে খ্যাতনামা মুফতী, মুহাদ্দিস, ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ, তাফসীর ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। হাদীসের মতন সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ছিল অপরিমেয়।"

হাফিজ হুসায়নী বলেন ঃ

"তিনি হাদীসের অনন্য হাফিজ, প্রখ্যাত ইমাম, অসাধারণ বাগ্মী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।"

আল্লামা শায়েখ ইবনুল ইমাদ হাম্বলী বলেন ঃ

"ইমাম ইব্ন কাছীর হাদীসের শ্রেষ্ঠতম হাফিজ ছিলেন।"

হাফিজ ইব্ন হুজ্জী বলেন ঃ

"আমাদের জ্ঞাত মুহাদ্দিসকুলের মধ্যে তিনি হাদীসের মতনের স্মৃতিস্থকরণে, রিজাল শাস্ত্রজ্ঞানে ও হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণে সর্বাধিক বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ছিলেন।"

[উনিশ]

আল্লামা হাফিজ নাসীরুদ্দীন আদ্ দামেশকী বলেন ঃ

"আল্লামা হাফিজ ইব্ন কাছীর ছিলেন মুহাদ্দিসগণের ভরসাস্থল, ইতিহাসকারদের অবলম্বন ও তাফসীরকারদের গৌরবোন্নত পতাকা।"

হাফিজ ইব্ন হাজার আস্কালানী বলেন ঃ

"হাদীসের মতন ও রিজাল শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ও অধ্যয়নে তিনি অহর্নিশ মশগুল থাকিতেন। তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন অত্যন্ত রসিকতাপ্রিয়। জীবদ্দশায়ই তাঁহার গ্রন্থরাজি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।"

মোটকথা, ইমাম ইব্ন কাছীর গ্রন্থ রচনা, অধ্যাপনা ও ফতওয়া প্রদানের মহান দায়িত্বে তাঁহার সমগ্র জীবন নিয়োজিত করেন। তাঁহার মহামান্য উস্তাদ আল্লামা হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবীর ইন্তেকালের পর তিনি দামেশকের শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনদ্বয়ে একই সঙ্গে হাদীস অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও ইবাদতগুযার ছিলেন। ঘন্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তিনি সালাত, তিলাওয়াত ও যিকির-আযকারে মশগুল থাকিতেন। তাহা ছাড়া তিনি ছিলেন সদা প্রফুল্ল, সদালাপী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি। আলাপ আলোচনায় তিনি মূল্যবান রসালো উপমা ব্যবহার করিতেন। হাফিজ ইব্ন হাজার আস্কলানী তাঁহাকে 'উত্তম রসিক' বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

আল্লামা ইমাম ইব্ন তায়মিয়ার শাগরিদ দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যের কারণে ইমাম ইব্ন কাছীর মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহারই অনুসারী ছিলেন। এমনকি তালাকের মাসআলায়ও তিনি তাঁহার অনুসারী হন। ফলে তাঁহাকেও ভীষণ বিপদ ও কঠিন নির্যাতনের শিকার হইতে হয়।

অপরিসীম অধ্যয়নের কারণে শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। অতঃপর ৭৭৪ হিজরী মোতাবেক ১৩৭২ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে শা'বান রোজ বৃহস্পতিবার তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।)

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য দুই পুত্র যথাক্রমে যয়নুদ্দীন আবদুর রহমান আল কারশী ও বদরুদ্দীন আবুল বাকা মুহম্মদ আল-কারশী মুসলিম জাহানে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। আল্লামা ইমাম ইব্ন কাছীরের রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজির কতিপয়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। আত তাকমিলাতু ফী মা'রিফাতিস সিকাতি ওয়ায যুআফা ওয়াল মুজাহিল। ইহা রিজাল শাস্ত্রের (বর্ণনাকারী বিশ্লেষণ বিদ্যা) একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানি পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে আবদুর রহমান মিয্যীর 'তাহযীবুল কামাল' ও শামসুদ্দীন যাহাবীর 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থের সমন্বয় ঘটিয়াছে।

২। আল হাদ্‌য়ু ওয়াস সুনানু ফী আহাদীছিল মাসানীদে ওয়াস সুনান। গ্রন্থখানি 'জামিউল মাসানীদ' নামে খ্যাত। এই গ্রন্থে মুসনাদে আহমদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদে বায্যার, মুসনাদে আবূ ইয়ালা, মুসনাদে ইব্ন আবি শায়বা ও সিহাহ সিত্তার রিওয়ায়েতসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে।

৩। তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যা– এই গ্রন্থে শাফিঈ ফিকাহবিদগণের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪। মানাকীবুশ শাফিঈ– এই গ্রন্থে ইমাম শাফেঈ (র)-এর জীবনালেখ্য ও কর্মধারা বর্ণিত হইয়াছে।

৫। তাখরীজু আহাদীসে আদিল্লাতিত তাম্বীহ।

৬। তাখরীজু আহাদীসে মুখতাসার ইবনিল হাজিব।

৭। শারহু সহীহিল বুখারী– বুখারী শরীফের এই ভাষ্য তিনি অসমাপ্ত রাখিয়া যান। ইহাতে শুধু প্রথমাংশের ভাষ্য বিদ্যমান।

৮। আল-আহকামুল কবীর– অনুশাসন সম্পর্কিত হাদীসগুলির বিশদ আলোচনা সম্বলিত এই গ্রন্থটিও 'কিতাবুল হজ্জ' পর্যন্ত লিখার পর অসমাপ্ত থাকিয়া যায়।

৯। ইখতিসারু উলূমিল হাদীস– ইহা আল্লামা ইবনুস সালাহ রচিত 'উলূমুল হাদীস' নামক উসূলে হাদীস গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। ইহার সহিত গ্রন্থকার অনেক মূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজন করার ফলে দেশ-বিদেশে ইহার অশেষ জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়। ইহার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২।

১০। মুসনাদুশ শায়খাইন– ইহাতে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংকলিত হইয়াছে।

১১। আস্ সীরাতুন নববিয়াহ– ইহা রাসূল (সা)-এর একটি বৃহদায়তন জীবনালেখ্য।

১২। আল-ফসূল ফী ইখতিসারি সীরাতির রাসূল– ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য।

১৩। কিতাবুল মুকাদ্দিমাত।

১৪। মুখতাসার কিতাবুল মাদখাল লেইমাম বায়হাকী– ইহা ইমাম বায়হাকীর 'কিতাবুল মাদখাল'-এর সংক্ষিপ্তসার।

১৫। রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জ্বিহাদ– খ্রীস্টানদের আয়াস দুর্গ অবরোধের সময়ে জিহাদ সম্পর্কিত এই গ্রন্থটি তিনি লিপিবদ্ধ করেন।

১৬। রিসালা ফী ফাযায়েলিল কুরআন– ইহা তাফসীর ইব্ন কাছীরের পরিশিষ্ট হিসাবে লিখিত হইয়াছে।

১৭। মুসনাদে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল– ইহাতে বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের বিখ্যাত মুসনাদ সংকলনের হাদীসসমূহ বিন্যস্ত করা হইয়াছে। পরন্তু ইমাম তাবারানীর 'মু'জাম' ও আবূ ইয়ালার 'মুসনাদ'-এর হাদীসগুলিও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে।

১৮। আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া– এই ইতিহাস গ্রন্থটি ইমাম ইব্ন কাছীরের অত্যন্ত জনপ্রিয় এক অমর সৃষ্টি। ইহাতে সৃষ্টির শুরু হইতে ঘটিত ও ভবিষ্যতে ঘটিতব্য সকল ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে অতীতের নবী-রাসূল ও উম্মতসমূহের বর্ণনা এবং পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অবশেষে খুলাফায়ে রাশেদীন হইতে তাঁহার সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে কিয়ামতের আলামতসমূহ ও পরকালের ঘটনাবলী দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। বিশেষত ইহার সীরাতুন্নবী অধ্যায়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে।

১৯। তাফসীরুল কুরআনিল করীম। ইহাই 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর' নামে খ্যাত।

গ্রন্থ পরিচিতি

ইমাম ইব্ন কাছীরের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি হইল 'তাফসীরুল কুরআনিল করীম'। উহাই 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর' নামে জগজ্জোড়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহার প্রতি খণ্ডের পাতায় পাতায় লেখকের কঠোর পরিশ্রম, গভীর অনুসন্ধিৎসা, ব্যাপক অধ্যয়ন ও অগাধ পাণ্ডিত্যের ছাপ বিদ্যমান।

আল্লামা সুয়ূতী বলেন– 'এই ধরনের তাফসীর আজ পর্যন্ত অন্য কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। রিওয়ায়েত ভিত্তিক তাফসীরসমূহের মধ্যে ইহাই সর্বাধিক কল্যাণপ্রদ ও উপকারী।' মূলত তাফসীরে ইব্ন কাছীর ইমাম ইব্ন কাছীরের এক অমর ও অবিস্মরণীয় অবদান। প্রাথমিক যুগে রচিত তাফসীর গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কোন কোন তাফসীর গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারেই হয়ত কোন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রহিয়াছে। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর গ্রন্থাকারে আলোর মুখ দেখিয়া কালোত্তীর্ণ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে, তাফসীরে ইব্ন কাছীর তন্মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তার দাবীদার। মান্কূলাত তথা রিওয়ায়েতভিত্তিক তাফসীরসমূহের মধ্যে তাফসীরে ইব্ন কাছীরই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর। এই ধারায় পূর্বে রচিত তাফসীরে তাবারী ও তাফসীরে কুরতুবী ইত্যাদির বিশিষ্ট দিকগুলির ইহাতে সমাবেশ ঘটিয়াছে। পরন্তু সেই সব তাফসীরের দুর্বল দিকগুলি ইহাতে পরিশীলিত ও বিশুদ্ধ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অপূর্ব রচনাশৈলী, বর্ণনার লালিত্য ও অকাট্য দলীল প্রমাণ প্রয়োগে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ইহা পূর্ববর্তী তাফসীরের চাইতেও এক ধাপ আগাইয়া গিয়াছে। হাদীসের সনদ ও মতনের সার্বিক ও যথাযথ বিশ্লেষণ ইহাকে অত্যধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে। কুরআন পাকের জটিল ও দুর্বোধ্য অংশগুলির বিশদ ব্যাখ্যা ও বিভিন্নার্থক শব্দসমষ্টির আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ ইহাকে সুসমৃদ্ধ করিয়াছে। বিশেষত বিভিন্ন ভ্রান্ত ও আজগুবী মতামত দলীল প্রমাণের ক্ষুরধার তরবারি দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া যেভাবে ইহাতে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। মোটকথা, ইহা বিদআত ও বিভ্রান্তির বেড়াজালমুক্ত কুরআন সুন্নাহ্র এক অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হইয়া দেখা দিয়াছে।

ইমাম ইব্ন কাছীর তাঁহার পাণ্ডিত্য বিমণ্ডিত এই তাফসীরে কোথাও দুরূহতা বা জটিলতাকে প্রশ্রয় দেন নাই। বর্ণনার পারিপাট্য, ভাষার স্বচ্ছ-সাবলীলতা ও শাব্দিক প্রাঞ্জলতা তাঁহার তাফসীরকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও গতিময় করিয়াছে। যে কোন বিতর্কমূলক বিষয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি ও ঐতিহাসিক নির্লিপ্ততা বজায় রাখিয়া নিজ অভিমত পেশ করিয়াছেন। তিনি যাহা কিছুই বলিয়াছেন, কুরআন হাদীসের অকাট্য দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে বলিয়াছেন, কোথাও নিজের ভাবাবেগকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেন নাই। ঠিক এই কারণেই তিনি তাঁহার তাফসীরে ইব্ন জারীর তাবারীর তাফসীরের ইসরাঈলী আজগুবী কাহিনী ও জাল হাদীস ভিত্তিক অলীক উপাখ্যানসমূহ প্রত্যাখ্যান করিয়া বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে নির্ভরযোগ্য ঘটনার সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। তাই তাঁহার তাফসীরকে ন্যায়সঙ্গতভাবেই 'তাফসীরে সলফী' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

তাফসীর ইব্ন কাছীরের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লামা হাফিজ আবূ আলী মুহাম্মদ শওকানী বলেন ঃ

"আলোচ্য তাফসীরে তাফসীরকার হাদীসের রিওয়ায়েতসমূহ এরূপ পূর্ণাঙ্গভাবে আহরণ করিয়াছেন যে, কোথাও ত্রুটি-বিচ্যুতির বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। তেমনি তিনি ইহাতে বিভিন্ন মাযহাব ও মতবাদ, প্রাসঙ্গিক হাদীস, আছার ও কওল এরূপ সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন যে, কাহারও কোন সংশয়ের লেশমাত্র অবকাশ থাকে না।"

তাফসীরে ইব্ন কাছীরের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কুরআনের তাফসীর করিতে প্রথমে কুরআন ব্যবহার করা হইয়াছ। তারপর রাসূলের হাদীস, অতঃপর সাহাবার আছার ও পরিশেষে তাবেঈনের আকওয়াল ব্যবহৃত হইয়াছে। হাদীস ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বর্ণনার সূত্র, বর্ণনাকারীর চরিত্র ও হাদীসের স্তর ও শ্রেণীভেদের প্রতিটি দিক ইহাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত হইয়াছে। আছার ও আকওয়ালের প্রয়োগ ক্ষেত্রেও উহা সত্যাসত্যের কষ্টিপাথরে ভালভাবে যাঁচ-পরতাল করিয়া লওয়া হইয়াছে। মোটকথা, তাফসীরটিকে সত্যের মানদণ্ড হিসাবে দাঁড় করাইতে যত রকমের সতর্কতা ও সযত্ন প্রয়াস প্রয়োজন তাহা সবই করা হইয়াছে। ইহার ফলেই তাফসীর জগতের এই অনন্য নির্ভরযোগ্য অমর সৃষ্টির আত্মপ্রকাশ সম্ভব হইয়াছে।

তাফসীরে ইব্ন কাছীরকে 'উম্মুত তাফাসীর' বা 'তাফসীর জননী' বলা হয়। মূলত পরবর্তীকালের সকল নির্ভরযোগ্য তাফসীর এই তাফসীর হইতেই জন্ম নিয়াছে। এই তাফসীর মুসলিম মিল্লাতের যে অপরিমেয় কল্যাণ সাধন করিয়াছে, গ্রন্থ জগতে তাহার তুলনা সত্যিই বিরল। সত্যের শাণিত তরবারি দিয়া ইমাম ইব্ন কাছীর পূর্ববর্তী তাফসীরসমূহের ইসরাঈলী কাহিনী ও জাল হাদীসের জঞ্জালগুলি কচুকাটা করিয়া মুসলিম মিল্লাতকে মহান কুরআনের এক নির্ভেজাল ভাষ্য উপহার দিয়া গিয়াছেন।

উদাহরণস্বরূপ সূরা বাকারার গাভী সম্পর্কিত বিভিন্ন ইসরাঈলী উপাখ্যানের কথা বলা যাইতে পারে। তিনি একে একে সব উপাখ্যানই তুলিয়া ধরিয়াছেন। অতঃপর বর্ণনাকারীদের বর্ণনাসূত্রের অসারতা ও খোদ বর্ণনাকারীদের দুর্বলতা সুপ্রমাণিত করার পর তিনি সেইগুলিকে অলীক ও অনির্ভরযোগ্য ঘোষণা করিয়াছেন। তেমনি 'সূরা কাফ'-এর শুরুতে ব্যবহৃত প্রথম 'কাফ' অক্ষরটিকে পূর্বসূরী তাফসীরকারগণ যে সারাবিশ্ব বেষ্টনকারী 'কোকাফ' পাহাড় অর্থে চালাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি তদ্রূপ কোন পাহাড়ের অস্তিত্বকে অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

ইমাম ইব্ন কাছীর তাঁহার এই সুবিস্তারিত তাফসীরে শুধু হাদীস শাস্ত্রই ঘাটেন নাই, ফিকাহ শাস্ত্রেরও বিভিন্ন জরুরী মাসায়েলের বিশ্লেষণ পেশ করিয়াছেন। উহাতে তিনি নিরাসক্তভাবে বিভিন্ন মাযহাবের মতামত তুলিয়া ধরিয়াছেন। তবে স্বভাবতই নিজ মাযহাবের প্রতি তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য মাযহাবের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন অসহিষ্ণু মনোভাবের প্রকাশ ঘটে নাই। সত্যিকার সত্যানুসন্ধিৎসা লইয়াই তিনি অত্যন্ত বিনয় ও সংযমের সহিত মাসআলার যথার্থ সমাধান নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

তাফসীরের শুরুতে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা প্রদান করিয়াছেন। উহাতে তাফসীর করার বিভিন্ন শর্ত ও প্রয়োজনীয় দিকগুলি তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার এই ভূমিকাটি পরবর্তী তাফসীরকারদের দিক-নির্দেশনার কাজ দিয়াছে।

ইমাম ইব্ন কাছীরের এই জগজ্জোড়া আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাফসীর ও শুধু বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু ইহার বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত সংস্করণও বাহির হইয়াছে। আরবী ভাষায় ইহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করেন শায়খ মুহাম্মদ আলী আস্ সাবূনী। বৈরুতের 'দারুল কুরআনিল করীম' প্রকাশনা হইতে তিন খণ্ডে উহা অত্যন্ত সুন্দরভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। উর্দুতে উহার সংক্ষিপ্তসার অনূদিত হয় এবং উর্দু অনুবাদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মাওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী।

এখানে উল্লেখ্য, ইহার মূল সংস্করণটি চার খণ্ডে সমাপ্ত ও প্রতি খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছয় শতাধিক। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই মূল সংস্করণেরই প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

Contents

তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর

প্রথম খণ্ড

Contents

প্রথম অধ্যায়

ফাযায়েলুল কুরআন

ওহী অবতরণ পরিক্রমা

প্রথম হাদীস

'কিভাবে ওহী নাযিল হইল ও কোন্ আয়াত প্রথম নাযিল হইল' শীর্ষক অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (র) বুখারী শরীফে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। উহাতে তিনি বলেন ঃ

اَلْمُهَيْمِنُ। অর্থাৎ الامين। (সংরক্ষক)। আল-কুরআন যেহেতু অতীতের সকল আসমানী গ্রন্থের সংরক্ষক, তাই উহাকে 'আল মুহায়মিন' বলা হইয়াছে।'

হযরত আবূ সালমা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইয়াহিয়া, শায়বান ও আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

'আমাকে হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন- নবী করীম (সা)-এর মক্কী জীবনের দশ বছর ও মাদানী জীবনের দশ বছরে কুরআন অবতরণ সম্পন্ন হইয়াছে।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইমাম বুখারী (রা) যে 'আল মুহায়মিন' শব্দের ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন উহা দ্বারা তিনি সূরা মায়িদার তাওরাত ও ইঞ্জীল সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ـ

'আর আমি তোমার নিকট সত্যসহ আল-কিতাব নাযিল করিয়াছি যাহা পূর্ব প্রচলিত আসমানী গ্রন্থের সত্যায়ক ও উহার সংরক্ষক।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্ন তালহা, মুআবিয়া, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালেহ, আল মুছান্না ও ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন ঃ

مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ আয়াতাংশের المهيمن। অর্থ الامين। (সংরক্ষক)। অর্থাৎ আল-কুরআন উহার পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থের সংরক্ষক।'

অপর এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে ঃ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ অর্থ شهيدا عليه অর্থাৎ পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যতা সম্পর্কে ও উহার অনুসারীদের বিকৃতি সাধনের ব্যাপারে আল-কুরআন সাক্ষ্য প্রদানকারী।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইমাম আবূ ইসহাক সাবীঈ, সুফিয়ান ছাওরী ও একাধিক অন্যান্য ইমাম বর্ণনা করেন ঃ

مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ অর্থাৎ مُؤْتَمِنًا عَلَيْهِ (উহার আমানতদার)।' মুজাহিদ, আস-সুদ্দী, কাতাদাহ, ইব্‌ন জুরায়জ, হাসান বসরীসহ পূর্বসূরী বহু ইমাম অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করেন।

اَلْمُهَيْمِنُ -এর মর্মার্থ হইল الحفظ والارتقاب (সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ)। যখন কেহ কোন কিছু দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে, তখন বলা হয় قد هيمن عليه অর্থাৎ অমুক উহা দেখাশোনা করিয়াছে। তাই তাহাকে বলা হয়, مهيمن অর্থাৎ পর্যবেক্ষণকারী। আল্লাহ্ তা'আলার এক নাম المهيمن। অর্থাৎ তিনি সকল কিছুরই পরিদর্শক, পর্যবেক্ষক ও সংরক্ষক।

যে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'নবী করীম (সা) কুরআন নাযিলের দশ বছর মক্কায় ও দশ বছর মদীনায় ছিলেন, উহা ইমাম বুখারী (র) তাঁহার বুখারী শরীফে একাই উদ্ধৃত করেন। মুসলিম শরীফে উহা উদ্ধৃত হয় নাই। অবশ্য নাসায়ী শরীফে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) হইতে উহা পর্যায়ক্রমে আবূ সালমা, ইয়াহিয়া ইব্‌ন কাছীর ও শায়বান ইব্‌ন আব্দুর রহমানের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমাগত ইকরামা, দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ ইয়াযীদ ও আবূ উবায়দ আল-কাসিম বর্ণনা করেন ঃ

"কদরের রাত্রিতে পৃথিবীর আকাশে কুরআন একই সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে। তারপর বিশ বছর ধরিয়া উহা (পৃথিবীতে) অবতীর্ণ হইয়াছে।" অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়েন ঃ

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَءَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيْلاً "আর কুরআনকে আমি পৃথক পৃথক করিয়া নাযিল করিয়াছি যেন মানুষের কাছে তুমি উহা বিরতি সহকারে পাঠ কর এবং উহা আমি যথাযথভাবেই নাযিল করিয়াছি।" এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ।

'নবী করীম (সা)-এর মদীনার দশ বৎসর কুরআন নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু নবূওত লাভের পর তাঁহার মক্কায় দশ বৎসর অবস্থানের ব্যাপারটি প্রশ্ন সাপেক্ষ।

কারণ, মশহুর বর্ণনামতে উহা তের বৎসর। কারণ, তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সে নবূওত ও ওহী লাভ করেন এবং বিশুদ্ধ বর্ণনামতে তেষট্টি বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। সম্ভবত সংক্ষেপণের জন্য ইমাম বুখারী (র) দশোর্ধ বৎসর কয়টি উল্লেখ করেন নাই। কারণ, আরবরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দশকের পরবর্তী ভগ্ন সংখ্যা অনুল্লেখ বা উহ্য রাখে। ইহাও হইতে পারে যে, ওহী লইয়া জিবরাঈল (আ)-এর আগমনের পরবর্তী কালটুকুই হিসাব করা হইয়াছে ও উহার পূর্ববর্তী কালটুকু ধরা হয় নাই। কারণ, ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন– প্রারম্ভে মীকাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর নিকট আসেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর প্রতি কোন আয়াত বা অন্য কিছু 'ইলকা' করিতেন। নবূওত ও ওহী নাযিলের ইহাই প্রথম স্তর। অতঃপর তাঁহার নিকট জিবরাঈল (আ) আসেন।

ফাযায়েলুল কুরআনের অধ্যায়ে উক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত করার কারণ এই যে, কুরআনের অবতরণ শুরু হইয়াছে হারাম শরীফের মত সম্মানিত স্থানে ও রমযান শরীফের মত সম্মানিত

মাসে। তাই মহাসম্মানিত কুরআনের সহিত সম্মানিত স্থান-কালের যে সংযোগ ঘটিয়াছে, উক্ত হাদীস হইতে তাহা জানা গেল।

এই কারণেই রমযান মাসে বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াত করা অভিপ্রেত বা মুস্তাহাব। যেহেতু রমযান মাসেই উহার অবতরণ শুরু হইয়াছে। তাই জিবরাঈল (আ)-ও রমযান মাসে আসিয়া রাসূল (সা)-এর কুরআনের শুনানী নিতেন। তাঁহার ইন্তিকালের বৎসর জিবরাঈল (আ) দুইবার আসিয়া তাঁহার তিলাওয়াত শুনেন যাহাতে কুরআন তাঁহার স্মৃতিতে স্থায়ী হইয়া যায়।

উক্ত হাদীসে ইহাও জানা গেল যে, কুরআন মক্কা ও মদীনা উভয় স্থানে নাযিল হইয়াছে। উহার হিজরত পূর্ব আয়াতগুলি মক্কী ও হিজরত পরবর্তী আয়াতগুলি মাদানী–উহা মদীনা, মক্কা, আরাফাতসহ যে কোন শহরেই নাযিল হউক না কেন।

কুরআনের সূরাগুলিকে মক্কী ও মাদানী হিসাবে বিন্যাস করা হইয়াছে। মাদানী সূরাগুলির ব্যাপারে মদভেদ রহিয়াছে। একদল বলেন– প্রারম্ভে মুকাত্তাআত হরফ সংযুক্ত সূরাগুলি মক্কী। শুধু বাকারা ও আলে-ইমরান বাদ যাইবে। তেমনি যেই সকল সূরায় মু'মিনগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে তাহা মাদানী। পক্ষান্তরে যাহাতে মানব জাতিকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহা মক্কী ও মাদানী উভয়ই হইতে পারে। তবে মক্কী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তবে কোন কোন মাদানী সূরায়ও উহা বিদ্যমান। যেমন সূরা বাকারায় 'ইয়া আইউহান নাসু'বুদূ রব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম' ও 'ইয়া আইউহান্নাসু কুলু মিম্মা ফিল আরদে হালালান তাইয়িবা।' একদল অবশ্য এইরূপ সুনির্দিষ্টভাবে ভাগ করা দুরূহ ও অসম্ভব বলেন।

আবূ উবায়দ (র) বলেন ঃ আমাদিগকে আবূ মুআবিয়া, তাহাদিগকে একব্যক্তি আ'মাশ হইতে, তিনি ইবরাহীম হইতে ও তিনি আলকামা হইতে বর্ণনা করেন ঃ কুরআনে যাহাই 'ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানূ' দ্বারা শুরু হইয়াছে, উহা মাদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহা 'ইয়া আইউহান্নাসু' দ্বারা শুরু হইয়াছে উহা মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর আলকামা বলেন– আমাদিগকে আলী ইব্‌ন মুআব্বাদ আবুল মালীহ হইতে ও তিনি মায়মূন ইব্‌ন মিহরান হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'কুরআনে যাহা 'ইয়া আইউহান্নাস' ও 'ইয়া বনী আদামা' দ্বারা শুরু হইয়াছে তাহা মক্কী এবং যাহা 'ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানূ' দ্বারা শুরু হইয়াছে তাহা মাদানী।'

তাঁহাদের একদল বলেন ঃ কোন কোন সূরা দুইবার নাযিল হইয়াছে। একবার মক্কায় ও একবার মদীনায়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। অপর একদল মক্কী সূরার কিছু আয়াত মাদানী বলিয়া আলাদা করেন। যেমন সূরা হজ্জ ইত্যাদির কিছু আয়াত। মূলত বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা যাহা প্রমাণিত হয় শুধু তাহাই সত্য। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আবূ উবায়দ (র) বলেন ঃ আমাদিগকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালেহ মুআবিয়া ইব্‌ন সালেহ হইতে ও তিনি আলী ইব্‌ন আবূ তালহা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"সূরা বাকারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়িদা, আনফাল, তাওবা, হজ্জ, নূর, আহযাব, আল্লাযীনা কাফারূ, ফাতহ্, হাদীদ, মুজাদালা, হাশর, মুমতাহিনা, সাফ্‌ফ, তাগাবুন, ইয়া আইউহান্নাবীয়্যু ইযা তাল্লাকতুমুন্ নিসা, ইয়া আইউহান্নাবীয়্যু লিমা তুহার্রিমু, (প্রথম দশ আয়াত) ওয়াল ফাজর, ওয়াল্লাইলে ইযা ইয়াগশা, ইন্না আনযালনা, লাম্ ইয়া কুনিল্লাযীনা, ইযা যুলযিলাত ও ইযা জাআ নাসরুল্লাহ মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর সবই মক্কায়

অবতীর্ণ হইয়াছে।'[১] আবূ তালহার বর্ণনাটিই বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সহচরগণের অন্যতম। তাঁহাদের নিকট হইতেই তাফসীর বর্ণিত হইয়া থাকে।

অবশ্য মাদানী বলিয়া আরও যে সকল সূরা চিহ্নিত করা হইয়াছে তাহার ভিতর কোন কোন সূরার মাদানী হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন রহিয়াছে। যেমন সূরা হুজুরাত ও মুআব্বিযাত।

দ্বিতীয় হাদীস

ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ আমাদিগকে মূসা ইব্ন ইসমাঈল ও তাঁহাদিগকে মু'তামার তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি আবূ উসমান হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– আমি খবর পাইয়াছি যে, হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর সামনে হযরত জিবরাঈল (আ) আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে কথা বলেন। তখন নবী করীম (সা) হযরত উম্মে সালামা (রা)-কে প্রশ্ন করেন– বল তো, এই লোকটি কে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন– দাহিয়াতুল কালবী। তারপর যখন রাসূল (সা) মসজিদে গিয়া খুতবায় হযরত জিবরাঈলের আগমনের কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া হযরত উম্মে সালামা (রা) বলিলেন– আল্লাহ্র কসম! আমি তো দাহিয়া কালবী ছাড়া অন্য কেহ বলিয়া ভাবিতেই পারি নাই।

বর্ণনাকারী মু'তামার দ্বিধান্বিত হইয়া বলেন ঃ আমার পিতা বলিয়াছেন, আমি আবূ উসমানকে প্রশ্ন করিলাম– আপনি কাহার নিকট এই বর্ণনা শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন– 'উসামা ইব্ন যায়দের (রা) নিকট।' আব্বাস ইব্ন ওয়ালিদ আন নুরসী হইতে 'আলামাতে নবূওত' অধ্যায়ে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। মুসলিম শরীফে 'ফী ফাযায়েলে উম্মে সালামা' অধ্যায়ে আবদুল আলা ইব্ন হাম্মাদ ও মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লার মাধ্যমে মু'তামার ইব্ন সুলায়মানের সূত্রে উহা উদ্ধৃত হয়। এখানে উক্ত হাদীস উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য ইহাই প্রতিপন্ন করা যে, আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ) দূতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ফেরেশতা। পদমর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তির বিচারে অত্যন্ত উঁচু স্তরের ফেরেশতা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ - عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ 'বিশ্বস্ত আত্মার মাধ্যমেই উহা তোমার অন্তরে অবতীর্ণ হইয়াছে যেন তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ - ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ - مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ - وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ -

"অবশ্যই এই কথা এক সম্মানিত দূতের; আরশে অবস্থানকারীর সকাশে প্রাপ্ত মর্যাদার বলে বলীয়ান; তথাকার সর্বজনমান্য বিশ্বস্ত সত্তা। আর তোমাদের সহচরও উন্মাদ নহে।"

আল্লাহ্ তা'আলা এই সব আয়াতে তাঁহার বান্দা ও দূত জিবরাঈল (আ) ও মুহাম্মদ (সা)-এর প্রশংসা করিয়াছেন। ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই এই ব্যাপারে তাফসীরের যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচনা করিব।

---

১. ইবনুল আনবারী– কাতাদাহ সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়েতে তালিকায় কিছু ভিন্নতা রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী, সূরা নাহল, ফাত্হ, লায়ল ও কাদর মক্কী সূরা।

আলোচ্য হাদীসে হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর বিরাট ফযীলতের ব্যাপারটি প্রকাশ পাইয়াছে। ইমাম মুসলিম (র)-এর বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়, তিনি শ্রেষ্ঠতম ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছেন ও কথোপকথন শুনিয়াছেন। এই হাদীসে দাহিয়া কালবীরও মর্যাদা প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ, জিবরাঈল (আ) অধিকাংশ সময়ে দাহিয়া কালবীর রূপ ধারণ করিয়া রাসূল (সা)-এর কাছে আসিতেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দর চেহারার লোক ছিলেন। উসামা ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিছা কালবী তাঁহারই গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁহারা উভয়ই কালব ইব্ন ওবেরার বংশধর এবং কুযাআ গোত্রের লোক। একদল বলেন– তাহারা আদনান সম্প্রদায়ের লোক। অপর দল বলেন– তাহারা কাহ্তান গোত্র হইতে আসিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন– তাহারা স্বতন্ত্র এক গোত্র। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

তৃতীয় হাদীস

আমাকে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইউনুস, তাঁহাকে আল-লায়ছ, তাঁহাকে সাঈদ ইবনুল মাকবারী তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"নবী করীম (সা) বলেন– প্রত্যেক নবীকে তাঁহার উপর যেই পরিমাণ লোক ঈমান আনিয়াছে সেই পরিমাণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা দান করা হইয়াছে। সেমতে আমার উপর যে পরিমাণ ওহী আসিয়াছে তাহাতে আমি আশা করিতে পারি যে, কিয়ামতের দিন আমার অনুসারী সর্বাধিক হইবে।"

আব্দুল আযীয ইব্ন আব্দুল্লাহ্র 'আল ইতিলাম' গ্রন্থেও উক্ত হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে। মুসলিম ও নাসাঈ কুতায়বা হইতে এবং তাহারা সকলেই লায়ছ ইব্ন সা'দ হইতে, তিনি সাঈদ ইব্ন আবূ সাঈদ হইতে এবং তিনি তাঁহার পিতা কায়সানুল মাকবারী হইতে উহা বর্ণনা করেন।

এই হাদীসে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে। অন্যান্য নবীর কাছে যত ওহী বা কিতাব নাযিল হইয়াছে, কুরআন তাহা হইতে সর্বদিক দিয়া শ্রেষ্ঠ ও কুরআনের মু'জিযা সকল গ্রন্থের মু'জিযাকে ডিঙাইয়া গিয়াছে। উক্ত হাদীসের তাৎপর্য ইহাই। উহাতে বলা হইয়াছে– এমন কোন নবী নাই যাঁহাকে মু'জিযা দেওয়া হয় নাই। অতঃপর তাঁহার সেই মু'জিযা অনুপাতেই তাঁহার উপর মানুষ ঈমান আনিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়ার জন্য যে দলীল প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে তাহা যত বেশী শক্তিশালী, তত বেশী লোক তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছে। আম্বিয়ায়ে কিরামের ইন্তিকালের পর তাঁহাদের মু'জিযাও শেষ হইয়া গিয়াছে। শুধু অবশিষ্ট রহিয়াছে তাঁহাদের প্রাপ্ত বাণী ও অনুসারীবৃন্দ। উহাই যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহাদের মু'জিযার সাক্ষীরূপে বিরাজ করে। কিন্তু তাঁহাদের সেইসব আজ নিছক কাহিনী হিসাবে বিদ্যমান।

পক্ষান্তরে সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে যে বিরাট ও মহান কিতাব দান করিয়াছেন তাহা ক্রমাগত যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌঁছিতেছে। প্রত্যেক যুগে ও প্রতি মুহূর্তে উহা যেইভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিল সেইভাবে বিরাজ করিতেছে। এই কারণে রাসূল (সা) বলিয়া গিয়াছেন– আমি আশা করি, কিয়ামতে আমার অনুসারীর সংখ্যা সর্বাধিক হইবে। ঘটিয়াছেও তাহাই। তাঁহার রিসালাতের ব্যাপ্তি ও সার্বজনীনতার কারণে অন্যান্য নবীর

অনুসারী হইতে তাঁহার অনুসারীর সংখ্যা বেশী। বিশেষত কিয়ামত পর্যন্ত এই রিসালাতই অব্যাহত থাকিবে এবং তাঁহার মু'জিযাও ততদিন স্থায়ী থাকিবে। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ـ মুবারক সেই মহান সত্তা যিনি তাঁহার বান্দার উপর আল-ফুরকান নাযিল করিয়াছেন যেন সে নিখিল সৃষ্টির জন্য সতর্ককারী হয়।

তিনি আরও বলেন ঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ ـ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ـ

"বলিয়া দাও, যদি জ্বিন ও ইনসান সকলে মিলিয়া এই কুরআনের অনুরূপ কিছু উপস্থিত করিতে চায়, তাহা তাহারা আদৌ করিতে পারিবে না, যদিও তাহারা পরস্পরের সহায়তায় আগাইয়া আসে।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র কুরআনের স্থলে মাত্র দশটি সূরা সৃষ্টির জন্য তাহাদিগকে আহ্বান জানান। যেমন ঃ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ ط قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

"তবে তাহারা কি উহাকে মিথ্যা বলিয়াছে? বলিয়া দাও, উহার মত দশটি সূরা আনয়ন কর। আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া তোমাদের যাহারা উহা পারে তাহাদিগকেও ডাকিয়া লও– যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

অতঃপর তাহাদিগকে একটি মাত্র সূরার সমতুল্য সূরা সৃষ্টির সীমা নির্ধারণ করা হয়। তথাপি তাহারা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি বলেন ঃ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ ط قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

"অথবা তাহারা কি উহাকে মিথ্যা বলিতেছে? তুমি বল, তাহা হইলে উহার যে কোন সূরার মত একটি সূরা আন। আর আল্লাহ্ ছাড়া যাহারা তোমাদের ভিতরে উহা করিতে সাহায্য করিতে পারে তাহাদিগকে ডাকিয়া লও– যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

এই চ্যালেঞ্জগুলি মক্কী সূরার জন্য ছিল। অতঃপর মাদানী সূরার ব্যাপারে মদীনায় এই চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়। সূরা বাকারায় বলা হইয়াছে ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ـ

"আর যদি তোমরা আমার বান্দার উপর আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে সন্দিহান হও, তাহা হইলে উহার মত একটি সূরা আনয়ন কর। আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের যত সহায়ক রহিয়াছে তাহাদিগকে ডাকিয়া লও, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। অতঃপর তোমরা উহা করিতে পার নাই এবং কখনও পারিবে না। অনন্তর সেই আগুনকে ভয় কর যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর। উহা কাফিরগণের জন্য তৈরি করা হইয়াছে।"

আল্লাহ্ তা'আলা জানাইলেন যে, তাহারা অনুরূপ একটি সূরা সৃষ্টি করার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। আর ভবিষ্যতেও তাহারা কখনও তাহা পারিবে না। অথচ তাহারা তখনকার সেরা ভাষাবিদ, ভাষালংকারিক, কবি ও সাহিত্যিক ছিল। কিন্তু আল্লাহ্র তরফ হইতে তাহাদের সামনে এমন গ্রন্থ উপস্থিত হইল যাহারা সমকক্ষতা কি ভাষা, কি বিষয়বস্তু, কি ভাষালংকার, কি বাক্য-বিন্যাস, কি ছন্দ-স্পন্দন, কি ভাব-গভীরতা, কি উপমা-উৎপ্রেক্ষা, কি ব্যঞ্জনার ব্যাপ্তি ও সুদূর প্রসারতা, এক কথায় কোন ক্ষেত্রেই কোন মানুষের পক্ষে অতীতেও সম্ভব হয় নাই, ভবিষ্যতেও সম্ভব হইবে না। তেমনি উহার বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ, অজ্ঞাত-অতীত ও অজানা ভবিষ্যতের ইতিবৃত্ত এবং প্রজ্ঞাময় ইনসাফের বিধি-বিধান সর্বকালের জন্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে।

যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً "আর তোমরা প্রভুর বাণী সততা ও ইনসাফে পূর্ণতায় পৌঁছিয়া শেষ হইল।"

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন ঃ আমাদিগকে ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম, তাহাদিগকে তাঁহার পিতা, তাঁহাদিগকে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব হইতে এবং তিনি হারিছ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-আওয়ার (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি একদিন সন্ধ্যাবেলা আমিরুল মু'মিনীনের (আলী কঃ) নিকট একটি ব্যাপারে জানার জন্য প্রশ্ন করিলাম। তিনি আমাকে ইশার পরে আসিতে বলিলেন। অতঃপর আমি যখন সেখানে গেলাম, তখন তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ

"আমি রাসূল (সা)-কে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি– আমার কাছে জিবরাঈল (আ) আসিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার পরে আপনার উম্মতগণ বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম– হে জিবরাঈল! উহা হইতে বাঁচার উপায় কি? তিনি বলিলেন– আল্লাহ্র কিতাবে উহার উপায় নিহিত রহিয়াছে। উহা দাম্ভিকগণকে চূর্ণ করিবে। যে ব্যক্তি উহা মজবুতভাবে আঁকড়াইয়া থাকিল, সে মুক্তি পাইল। আর যে উহা বর্জন করিল, সে ধ্বংস হইল। তিনি দুইবার ইহা বলিলেন। অতঃপর বলেন ঃ উহা চূড়ান্ত বাণী এবং উহার বিলুপ্তি নাই। ভাষার বিভিন্নতা উহাকে বিকৃত ও বিভিন্ন করিতে পারিবে না এবং উহার বিস্ময়কারীতারও ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। উহা তোমাদের অতীতের সংবাদবাহক, বর্তমানের চূড়ান্ত বিধায়ক ও পরবর্তীদের জন্য ভবিষ্যদ্বক্তা।" ইমাম আহমদের বর্ণনাও এইরূপ।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন ঃ আমাদিগকে আব্দ্ ইব্ন হুমায়দ, তাহাদিগকে হুসায়ন ইব্ন আলী আল জা'ফী, তাহাদিগকে হামযাহ আয্ যায়্যাত, আবুল মুখতার আত্ তায়ী হইতে, তিনি হারিছুল আওয়ারের ভাতিজা হইতে এবং তিনি হারিছুল আওয়ার (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

একদিন মসজিদে গিয়া দেখি লোকজন হাদীস নিয়া তর্ক-বিতর্ক করিতেছে। তখন আমি আলী (রা)-এর কাছে গিয়া বলিলাম– হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি দেখেন না যে, লোকেরা হাদীস নিয়া তর্ক-বিতর্ক করিতেছে? তিনি প্রশ্ন করিলেন– তাহারা কি সত্যই উহা করিয়াছে? আমি বলিলাম– হ্যাঁ! তিনি বলিলেন ঃ নিশ্চয় আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, শীঘ্রই ফিতনা দেখা দিবে। আমি প্রশ্ন করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! উহা হইতে বাঁচার উপায় কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কিতাব। উহাতে তোমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের সব খবরাখবর বিদ্যমান। উহা তোমাদের চূড়ান্ত বিধান। উহা কোন তামাশার বস্তু নহে। যে দাম্ভিক উহা বর্জন করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে চূর্ণ করিবেন। উহার বাহিরে যে ব্যক্তি হিদায়েত খুঁজিবে, আল্লাহ্ তাহাকে বিভ্রান্ত করিবেন। উহা আল্লাহ্র মজবুত রশি। উহা বিজ্ঞতম উপদেশগ্রন্থ। উহাই সিরাতুল মুস্তাকীম। উহা মানুষের খেয়াল-খুশীর নিয়ন্ত্রক। ভাষার বিভিন্নতাও উহাতে বিভিন্নতা সৃষ্টি করিতে পারে না। আলিমগণের কোনদিনই উহার চাহিদা মিটিবে না। হাজার চ্যালেঞ্জ দিয়াও উহা সৃষ্টি করা যাইবে না। আর উহার বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যেও কোন ঘাটতি দেখা দিবে না। সেই বৈশিষ্ট্যের দুর্বার আকর্ষণ জ্বিনকে পর্যন্ত আকৃষ্ট করিয়াছে। ফলে তাহারা বলিতে বাধ্য হইল ঃ

اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য এক কুরআন শ্রবণ করিয়াছি। উহা সঠিক পথের নির্দেশ দেয়। তাই আমরা ঈমান আনিয়াছি।' তাই যে উহার আলোকে কথা বলে; সত্য বলে আর যে উহা আমল করে সে পুণ্য লাভ করে। উহার ভিত্তিতে যে রায় দেয় সে ইনসাফ করে; আর যে উহার দিকে ডাকে সে সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকেই ডাকে। হে আওয়ার! উহা মজবুত করিয়া ধারণ কর।'

অতঃপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন– হাদীসটি 'গরিব'। শুধু হামযাহ আয্ যিয়াত ছাড়া আর কেহ এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। আর তাহার সূত্র অপরিজ্ঞাত। তাহা ছাড়া হারিছের হাদীসে ত্রুটি থাকে।

আমি বলি– হামযা ইব্ন হাবীব আয যিয়াত এই হাদীস একা বর্ণনা করেন নাই। উহা মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকও মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল করযী হইতে এবং তিনি হারিছ আল আওয়ার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং হামযার এই বর্ণনায় নিঃসঙ্গতার প্রশ্ন আর থাকিল না। যদি তাহাকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল বলা হয়, তাহা হইলেও তাহাকে কিরাআতের ইমাম বলিয়া মান্য করা হয়। তবে হাদীসটি হারিছুল আওয়ারের সূত্রে বর্ণিত একটি মশহুর হাদীস। অবশ্য তাঁহার ব্যাপারে সমালোচনা রহিয়াছে। সমালোচকদের একদল তাঁহার মতামত ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তথাপি তিনি জ্ঞাতসারে হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নিয়াছেন এমনটি হইতে পারে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইহাও সম্ভব যে, হাদীসটি মুলত হযরত আলী (রা)-এর উক্তি। অবশ্য কেহ কেহ ইহাকে মারফূ' মনে করিয়াছেন। তবে হাদীসের বক্তব্যকে 'হাসান সহীহ' বলা যায়। কারণ, উহার সমর্থনে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত হাদীস রহিয়াছে। জ্ঞান জগতের ইমাম আবূ উবায়দ আল কাসিম ইব্ন সাল্লাম (র) তাঁহার 'ফাযায়েলুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন ঃ আমাদিগকে আবুল য়্যাকজান, তাহাদিগকে আম্মার ইব্ন মুহাম্মদ আছ ছাওরী কিংবা অন্য কেহ ইসহাক আল হিজরী হইতে, তিনি আবুল আহওয়াস

হইতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে এবং তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন– 'নিশ্চয় এই কুরআন আল্লাহ্‌র উপহার। তাই তাহার উপহার হইতে যত পার আহরণ কর। নিশ্চয় এই কুরআন আল্লাহ্‌র রজ্জু। উহা সুস্পষ্ট আলো ও কল্যাণপ্রদ দাওয়াই। যে উহা শক্ত হাতে ধারণ করিল, সে সুরক্ষিত হইল। যে উহা অনুসরণ করিল, সে মুক্তি পাইল। উহাতে কোন জটিলতা নাই যে, সরল করিতে হইবে। তেমনি উহাতে কোন কূটিলতা নাই যাহার জন্য অনুতপ্ত হইবে। উহার অনুপমত্বে কোন ত্রুটি নাই। যতই উহার বিরোধিতা হউক, উহা সৃষ্টি করা যাইবে না। তাই উহা তিলাওয়াত কর। আল্লাহ্ তা'আলা উহার প্রতি হরফে দশ দশ নেকী দিবেন। আমি নিশ্চয় ইহা বলি না যে, আলিফ লাম মীম মিলিয়া এক হরফের পুণ্য হইবে; বরং আলিফে দশ, লামে দশ ও মীমে দশ নেকী পাইবে।'

এই সূত্রে অবশ্য হাদীসটি 'গরিব'। তবে আবূ ইসহাক আল হিজরী হইতে উহা মুহাম্মদ ইব্‌ন ফুযায়েল বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার আসল নাম ইবরাহীম ইব্‌ন মুসলিম। তিনি একজন তাবেঈ। কিন্তু তাঁহার ব্যাপারে অনেক কথা আছে। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন– তিনি মজবুত বর্ণনাকারী নহেন। আবুল ফাতাহ ইযদী বলেন– তাহার মারফূ' বর্ণনায় সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আমি বলি ঃ হয়ত হাদীসটি মূলত হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিজস্ব উক্তি। সুতরাং উহাকে মারফূ' করায় সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা হইলেও অন্য সূত্রে ইহার সমর্থন মিলে।

আবূ উবায়দ (র) আরও বলেন ঃ আমাদিগকে হাজ্জাজ– ইসরাঈল হইতে, তিনি আবূ ইসহাক হইতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ হইতে এবং তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

"কোন বান্দাকেই কুরআন সম্পর্কিত ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করা হইবে না। যদি সে কুরআনকে ভালবাসিয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই সে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলকেও ভালবাসে।"

চতুর্থ হাদীস

ইমাম বুখারী (র) বলেন– আমাকে আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ, তাঁহাকে ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম, তাঁহাকে তাঁহার পিতা, সালেহ ইব্‌ন কায়সান হইতে এবং তিনি ইব্‌ন শিহাব হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্‌ন শিহাব বলেন– আমাকে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) এই খবর পৌঁছাইয়াছেন যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-এর উপর তাঁহার ইন্তিকাল পর্যন্ত ক্রমাগত ওহী পাঠাইতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালে অধিকাংশ ওহী অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করেন।'

ইমাম মুসলিম (র)-ও উক্ত হাদীস আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি একজন সমালোচকও। তাহা ছাড়া হাসান আল হালওয়ানী, আব্দ ইব্‌ন হামীদ ও ইমাম নাসায়ী, ইসহাক ইব্‌ন মানসূর আল-কাউসাজ হইতে উহা বর্ণনা করেন। তাহাদের চতুর্থ বর্ণনাকারী উহা ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ আয্ যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন।

হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-এর উপর এক এক বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রমাগত ওহী নাযিল করিতে থাকেন। উহাতে কোন বিরতি ছিল না। শুধু জিবরাঈল ফেরেশতা 'ইকরা বিসমি রাব্বিকা' ওহী লইয়া আসার পর প্রায় দুই বছর কিংবা

কিছু বেশী সময় বিরতি ঘটে। অতঃপর আবার ওহী চালু হয় ও উহা ক্রমাগত চলিতে থাকে। উক্ত বিরতির পর প্রথম নাযিল হইল 'ইয়া আইউহাল মুদ্দাছ্ছির, কুম ফাআনযির।"

পঞ্চম হাদীস

আমাকে আবূ নাঈম ও তাঁহাকে সুফিয়ান, আসওয়াদ ইব্ন কয়স হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি জুন্দুবকে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূল (সা) একরাত্রি কি দুইরাত্রি অসুস্থতার কারণে রাত জাগা ইবাদত করিতে পারেন নাই। তখন এক মহিলা আসিয়া তাঁহাকে বলিল– আমার মনে হয় তোমার ভূতটি তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরা নাযিল করেন ঃ

وَالضُّحٰى - وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى 'উজ্জ্বল দিবস ও অন্ধকার রাত্রির শপথ! তোমার প্রভু তোমাকে ত্যাগ করেন নাই এবং তোমরা উপর নারাযও হন নাই।'

ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি ইহা ছাড়াও অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ (র) অন্য সূত্রে সুফিয়ান ছাওরী ও শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ হইতে এবং তাহারা উভয়ই আসওয়াদ ইব্ন কয়স আল আব্দী হইতে ও তিনি জুনদুব ইব্ন আব্দুল্লাহ্ আল বাযালী (র) হইতে উহা বর্ণনা করেন। সূরা আয্যুহার তাফসীর প্রসঙ্গে এই হাদীসটি পর্যালোচিত হইয়াছে।

ফাযায়েলুল কুরআনের সঙ্গে এই হাদীস ও পূর্ববর্তী হাদীসের সঙ্গতি এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে শ্রেষ্ঠতম অবদানে ধন্য করিয়াছেন এবং অত্যধিক ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার উপর ক্রমাগত ওহী অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তাঁহার ইন্তিকাল পর্যন্ত তাহা অব্যাহত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর কুরআন ক্রমাগত পৃথক পৃথক করিয়া নাযিল করার ভিতর অবদানের পূর্ণত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ পায়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ কুরআন আরবের কুরায়েশের ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে। আরবী কুরআন বিশুদ্ধতম আরবীতে নাযিল হইয়াছে। আমাকে আবুল ইয়ামান, তাঁহাকে শুআয়ব, যুহরী হইতে এবং তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণণা করেন ঃ

'হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) যায়দ ইব্ন ছাবিত, সাঈদ ইবনুল আস, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র ও আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ ইব্ন হিশামকে নির্দেশ দিলেন– কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ কর এবং যেখানে তোমাদের ভিতর ভাষার ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা দিবে, সেখানে তোমরা কুরায়েশের ভাষায় উহার সমাধান খুঁজিও। কারণ, কুরআন তাহাদের ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর তাহারা তাহাই করিল।'

এই হাদীসটি মূলত অপর এক হাদীসের অংশমাত্র। শীঘ্রই সেই হাদীস নিয়া পর্যালোচনা করিব। ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। তাহা এই যে, কুরআন কুরায়শদের ব্যবহৃত ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে এবং কুরায়শগণ আরব জাতির প্রাণসত্তা। তাই আবূ বকর ইব্ন দাউদ (র) বলেন ঃ আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন খাল্লাদ ও তাহাকে ইয়াযীদ ইব্ন শায়বান ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র ইব্ন জাবির ইব্ন মায়সারাহ্ বলেন ঃ

"আমি উমর ফারূক (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমাদের কুরআনের বর্তমান গ্রন্থনার পিছনে রহিয়াছে দুইজন কুরায়শ ও দুইজন বনূ ছকীফের তরুণের ভাষা নির্দেশনা।" এই সনদটি

বিশুদ্ধ। আবূ বকর ইব্‌ন দাউদ আরও বলেন ঃ আমাকে ইসমাঈল ইব্‌ন আসাদ, তাহাকে হাজ্জাজ, তাহাকে আওফ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ফুযালা (র) বর্ণনা করেন– হযরত উমর ফারূক (রা) যখন ইচ্ছা করিলেন কুরআনের লিপিবদ্ধকরণ, তখন তাঁহার একদল সহচরকে বসাইয়া দিলেন এবং বলিলেন– তোমরা যখন ভাষার ব্যাপারে মতানৈক্যে জড়াইবে, তখন মুযর গোত্রের ভাষা অনুসরণ করিবে। কারণ, কুরআন মুযর গোত্রের এক ব্যক্তির ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ ـ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ "কুরআন সরল আরবী ভাষায় বক্রতামুক্ত (অবতীর্ণ হইয়াছে) যেন তাহারা সতর্ক হয়।" আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ـ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ـ بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِيْنٍ ـ

"আর নিশ্চয় উহা (কুরআন) অবশ্যই নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের তরফ হইতে অবতীর্ণ। তিনি বিশ্বস্ত আত্মার মাধ্যমে উহা তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করিয়াছেন। যেন তুমি সতর্ককারীগণের অন্যতম হও। সুস্পষ্ট আরবীতে (উহা অবতীর্ণ হইয়াছে)।"

তিনি আরও বলেন ঃ

وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ "আর ইহা (কুরআন) সুস্পষ্ট আরবী ভাষা।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ءَاَعْجَمِىٌّ وَّعَرَبِىٌّ "যদি আমি আজমী ভাষায় উহা (কুরআন) রচনা করিতাম, অবশ্যই তাহারা বলিত, কেন উহা আজমী ও আরবী ভাষায় রচিত হইল না?"

মোটকথা, ইত্যাকার আরও বহু আয়াত প্রমাণ করে যে, কুরআন বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

অতঃপর ইমাম বুখারী (র) ইয়ালী ইব্‌ন উমাইয়া (রা)-এর হাদীসটি উদ্ধৃত করেন। তিনি বলিতেন– হায়, আবার যদি রাসূল (সা)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়া দেখিতে পাইতাম! অতঃপর তিনি সেই হাদীসটি বর্ণনা করেন যাহাতে এক মুহরিম উমরাহ্‌র সময় ইহরামের অবস্থায় সুগন্ধী লাগানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তাহার গায়ে জুব্বা ছিল। বর্ণনাকারী বলেন– রাসূল (সা) তাহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইলেন। ইত্যবসরে ওহী আসিল। তখন উমর (রা) ইয়ালী (রা)-কে কাছে আসার জন্য ইশারা করিলেন। ইয়ালী (রা) আসিয়া মাথা ঢুকাইয়া ওহী নাযিলের অবস্থা দেখার প্রয়াস পাইলেন। তিনি দেখিলেন– রাসূল (সা)-এর চেহারা মুবারক লাল হইয়া গিয়াছে এবং কিছুক্ষণ তিনি ধ্যানমগ্ন রহিলেন। অতঃপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। তখন তিনি বলিলেন– উমরাহ্‌র সময় ইহরামের অবস্থায় সুগন্ধী লাগানো সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোথায়? সে উপস্থিত হইলে রাসূল (সা) তাহাকে সুগন্ধী লাগানো জুব্বা খুলিয়া ফেলিতে ও দেহে লাগানো সুগন্ধী ধুইয়া ফেলিতে বলিলেন।

উক্ত হাদীসটি একদল বর্ণনাকারী বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। কিতাবুল হজ্জে উহা পর্যালোচনাযোগ্য। বর্তমান অধ্যায়ের সহিত উহার সঙ্গতি সুস্পষ্ট নহে, বরং হজ্জের অধ্যায়ের সহিতই উহার সঙ্গতি সুস্পষ্ট। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

কুরআনের গ্রন্থনা

ইমাম বুখারী (র) বলেন– আমাদিগকে মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল, তাহাদিগকে ইবরাহীম ইব্‌ন সাদ, তাহাদিগকে ইব্‌ন শিহাব, উবায়দ ইব্‌ন সিবাক হইতে এই হাদীস শুনান ঃ

"যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলেন– ইয়ামামার যুদ্ধের সময়ে আবূ বকর (রা) আমাকে কাছে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন উমর ফারূক (রা) তাঁহার কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। আবূ বকর (রা) বলিলেন– 'উমর ইবনুল খাত্তাব আমার কাছে আসিয়া জানাইল যে, রণাঙ্গণ খুবই উত্তপ্ত। কুরআনের হাফিজগণের এখন কঠিন সময়। আমার ভয় হয়, রাষ্ট্রের হাফিজগণ এরূপ শহীদ হইতে থাকিলে আমরা কুরআনের অনেকাংশ হারাইয়া ফেলিব। তাই আমি মনে করি, এখন কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলিত করার নির্দেশ দেওয়া যায়।' আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম– রাসূল (সা) যাহা করেন নাই, আমরা তাহা কিরূপে করিতে পারি? উমর বলিলেন– আল্লাহ্‌র শপথ! ইহা উত্তম কাজ। অতঃপর যতদিন এই ব্যাপারে আমার মন পরিষ্কার হয় নাই, ততদিন উমর আর আমার কাছে আসেন নাই। অবশেষে আমিও উমরের মতকে উত্তম ভাবিলাম। তখন আবূ বকর (রা) বলিলেন– 'তুমি বিচক্ষণ যুবক ও সর্বাধিক অপবাদমুক্ত নির্দোষ ব্যক্তি। তুমি রাসূল (সা)-এর ওহী লেখক ছিলে। সুতরাং তুমিই কুরআন সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থরূপ দান কর।' আল্লাহ্‌র কসম! আমাকে যদি বলা হইত যে, একটি পাহাড় বহন করিয়া আরেকটি পাহাড়ের কাছে লইয়া যাও, তাহা হইলে তাহাও আমার কাছে এত ভারী মনে হইতে না, যাহা এই নির্দেশে মনে হইল।" আমি তাঁহাকেও প্রশ্ন করিলাম– 'রাসূল (সা) যাহা করেন নাই তাহা আপনারা কি করিয়া করিতেছেন?' তিনিও জবাব দিলেন– আল্লাহ্‌র কসম! ইহা উত্তম কাজ।' তারপর যতদিন আমার বুঝ আসেনি, ততদিন আবূ বকর (রা) আমার কাছে আসিতে লাগিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকর ও উমরকে যেই বুঝ দান করিয়াছেন, আমাকেও তাহা দান করিলেন। অতঃপর আমি কুরআন সংগ্রহ ও গ্রন্থনা শুরু করিলাম। উহা গাছের বাকল, পাথরের টুকরা ও মানুষের অন্তরে গ্রথিত ছিল। আবূ খুযায়মা আনসারী (রা)-এর কাছে সূরা তাওবার শেষাংশ পাইলাম (লাকাদ জাআকুম রসূলুম মিন আনফুসিকুম হইতে সূরা বারাআত সমাপ্ত)। এই সহীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁহার কাছেই ছিল। তারপর উহা হযরত উমর (রা)-এর কাছে রক্ষিত থাকে।"

ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি তাঁহার সংকলনে ভিন্ন প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ ভিন্ন সূত্রে যুহরী হইতে উহা বর্ণনা করেন। এই কাজটি নিঃসন্দেহে অতি উত্তম, মহৎ ও বিরাট কাজ। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ইহা সম্পন্ন করিয়া আল্লাহ্‌র দীনকে মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাঁহাকে তাঁহার রাসূলের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। অন্য কেহ এই মর্যাদার যোগ্য হয় নাই। তিনিই যাকাত বিরোধীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তেমনি তিনিই জিহাদ পরিচালনা করেন মুরতাদদের বিরুদ্ধে এবং রোমক ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। তিনি অভিযান পরিচালনা করেন, দূত প্রেরণ করেন, সৈন্য প্রেরণ করেন, বিশৃঙ্খল অবস্থাকে সুশৃঙ্খল করেন ও বিক্ষিপ্ত কুরআনকে গ্রথিত করেন। ফলে সমগ্র কুরআনের অসংখ্য কারী ও হাফিজ সৃষ্টি হয়। অবশ্যই ইহা আল্লাহ্ পাকের নিম্ন বাণীর হুবহু বাস্তবায়ন মাত্র। তিনি বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ "নিশ্চয় আমি যিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করিয়াছি এবং অবশ্যই আমি উহার সার্বক্ষণিক সংরক্ষক।"

কুরআন মজীদের উক্ত আয়াতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপরোক্ত কার্য এবং উহার ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী সুফলের প্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে। তিনি যাবতীয় কল্যাণের দ্বার উন্মোচন ও সর্ববিধ অকল্যাণের দ্বার রুদ্ধ করেন।

উপরোল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতেছেন কুরআন মজীদের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মহা ব্যবস্থাপক। তাঁহার ব্যবস্থাপনার ফলে কালামে পাক সর্বপ্রকারের বিকৃতির হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হউন এবং এজন্যে তাঁহাকে পুরস্কৃত করুন।

ওয়াকী', ইব্ন যায়দ, কুবায়সা প্রমুখ ইমামগণ হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দ খায়ের, ইসমাঈল ইব্ন আবদুর রহমান আস সুদ্দীয়্যুল কবীর ও সুফিয়ান ছাওরী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত আলী (রা) বলেন—কুরআন মজীদ সংরক্ষণ কার্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতেছেন মানুষের মধ্যে অধিকতম নেকী ও সওয়াবের প্রাপক। কারণ, তিনিই কুরআন মজীদকে সর্বপ্রথম সংগৃহীত ও একত্রিত করিবার ব্যবস্থা করেন।' উক্ত হাদীসের উপরোক্ত সনদ সহীহ।

আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ তাঁহার রচিত 'আল-মুসাহেফ' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হিশামের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম, আবাদাহ ও হারূন ইব্ন ইসহাকের মাধ্যমে আমার নিকট এই বর্ণনাটি পৌঁছিয়াছে ঃ

'নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ই কুরআন মজীদকে সংগৃহীত ও একত্রিত করিবার ব্যবস্থা করেন। তৎকর্তৃক সংগৃহীত কুরআন মজীদের সংকলনটি ছিল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ। ইয়ামামাহ অঞ্চলে অবস্থিত 'মৃত্যু উদ্যান' (حديقة الموت।) নামক স্থানে মুসায়লামাতুল কায্যাব ও তদীয় বনূ হানীফা গোত্রীয় লোকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধে বিপুলসংখ্যক হাফিজুল কুরআন শহীদ হওয়ায় হযরত উমর (রা) কুরআন মজীদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সচেতন হন।'

ঘটনাটি নিম্নরূপ

নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর ভণ্ড নবী, সেরা মিথ্যুক মুসায়লামা প্রায় এক লক্ষ ইসলাম ত্যাগী লোককে নিজের দলে ভিড়াইয়া ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিল। তাহাকে দমন করিবার জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর নেতৃত্বে প্রায় তের হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী পাঠাইলেন। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিপুল সংখ্যক লোক ইসলামী অনুপ্রেরণা হইতে বঞ্চিত অজ্ঞ ও অপরিশুদ্ধ ছিল। তাহাদের ঈমানের দুর্বলতার কারণে মুসলিম বাহিনী রণক্ষেত্রে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইসলামী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত উচ্চ শ্রেণীর সাহাবীগণ সেনাপতি হযরত খালিদ (রা)-কে উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন— 'হে খালিদ! আমাদিগকে মুক্ত করুন।' অর্থাৎ ওই সকল দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি হইতে আমাদিগকে পৃথক করিয়া ফেলুন। অতঃপর তাঁহারা দুর্বল ঈমানের লোকগুলি হইতে পৃথক হইয়া গেলেন। সংখ্যায় তাঁহারা মাত্র প্রায় তিন হাজার ছিলেন। তাঁহারা প্রকৃত ঈমানী শক্তি লইয়া মুসায়লামার বাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন। তুমুল যুদ্ধের পর আল্লাহ্‌র ফযলে মুসলমানগণ জয়ী হইলেন। যুদ্ধের সময়ে

সাহাবীগণ "হে সূরা বাকারার ধারকগণ' এই সম্বোধনে পরস্পরকে সম্বোধিত করিতেছিলেন। কাফিরগণ পরাজিত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। সাহাবীগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অনেককে হত্যা এবং অনেককে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। সেরা মিথ্যুক মুসায়লামা নিহত হইল। তাহার দলবল ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল এবং ইসলামে ফিরিয়া আসিল।

যুদ্ধ জয়ে মুসলমানদিগকে বিরাট মূল্য দিতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধে প্রায় পাঁচশত হাফিজ সাহাবী শাহাদতবরণ করিলেন। এতদ্দর্শনে হযরত উমর (রা) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে কুরআন মজীদ সংগ্রহ ও সংকলন করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। হযরত উমর (রা)-এর আশংকা ছিল, ভবিষ্যৎ যুদ্ধসমূহে আরও হাফিজ সাহাবী শহীদ হইতে পারেন। এমতাবস্থায় কুরআন মজীদ সংগ্রহ ও একত্রিত না করিলে উহার কিয়দংশ বিনষ্ট ও হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে। লিপিবদ্ধ আকারে উহা সংরক্ষিত হইলে উহার প্রথম প্রচারক দলের তিরোধানেও উহা বিনষ্ট হইবে না। বিষয়টি যাহাতে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা দৃঢ় ও মজবুত হয়, তজ্জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এতদ্বিষয়ে হযরত উমর (রা)-এর সহিত যথেষ্ট আলোচনা-পর্যালোচনা করিলেন। অতঃপর তিনি হযরত উমর (রা)-এর সহিত ঐকমত্যে পৌঁছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর ফারুক (রা)-এর সহিত এতদ্বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করিলেন। অতঃপর তিনিও তাঁহাদের সহিত একমত হইলেন। উক্ত ঘটনা হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-এর উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিতবহও বটে।

হযরত হাসান বসরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ফুযালা, ইয়াযীদ ইব্‌ন মুবারক, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খাল্লাদ ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ

"একদা হযরত উমর (রা) কুরআন মজীদের একটি আয়াত সম্বন্ধে কিছু মানুষের কাছে প্রশ্ন করিলেন। তাহারা বলিল, 'আয়াতটি অমুক সাহাবীর স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিল। তিনি তো ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন।' হযরত উমর (রা) বলিলেন– 'ইন্না লিল্লাহি.... রাজিউন।' অতঃপর তিনি সমগ্র কুরআন মজীদ সংগ্রহ ও একত্রিত করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে উহা সংগৃহীত ও একত্রিকৃত হইল। এইরূপে হযরত উমর (রা)-ই সমগ্র কুরআন মজীদ সর্বপ্রথম সংগৃহীত ও একত্রিত করিবার ব্যবস্থা করেন।"

উপরোক্ত বর্ণনার সনদ বিচ্ছিন্ন। কারণ, সনদের প্রথম রাবী হযরত হাসান বসরী হযরত উমর (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই। বর্ণনায় হযরত উমর (রা)-কে যে কুরআন মজীদের সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যবস্থাপক হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য এই যে, তিনি উহার সংগ্রহ ও সংকলনের পরামর্শদাতা এবং প্রস্তাবক ছিলেন।

অনুরূপ অর্থ ইয়াহিয়া ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন হাতিম হইতে ধারাবাহিকভাবে আলকামা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর, আমর ইব্‌ন তালহা লায়ছী, ইব্‌ন ওহাব, আবূ তাহের ও ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'কুরআন মজীদ একত্রিকরণের সময়ে হযরত উমর (রা) দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যতিরেকে কোন আয়াত বা কোন অংশই কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন না। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতি উক্তরূপ নির্দেশ ছিল।' অনুরূপ অর্থে উরওয়াহ হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র হিশাম, ইব্‌ন আবূ যানাদ, ইব্‌ন ওহাব, আবূ তাহের ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন।

'ইয়ামামার যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক হাফিজ সাহাবী শহীদ হইলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আশংকা করিলেন যে, এইভাবে হাফিজ সাহাবী শহীদ হইলে কুরআন মজীদ বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব তিনি হযরত উমর (রা) ও হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা)-কে বলিলেন- দুইজন সাক্ষীসহ কুরআন মজীদের কোনো অংশ কেহ তোমাদের নিকট উপস্থাপন করিলে তোমরা উহা গ্রহণ করত লিখিয়া লইবে।' উক্ত বর্ণনার সনদ বিচ্ছিন্ন হইলেও উহা গ্রহণযোগ্য।

হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ 'আমি সূরা তওবা'র শেষাংশ ঃ لَقَدْ جَاۤئَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ الى اخر السورة 'আবূ খুযায়মা আনসারী (রা)-এর নিকট পাইয়াছি। বর্ণনান্তরে তাঁহাকে খুযায়মা ইব্ন ছাবিত বলা হইয়াছে। আল্লাহ্র রাসূল উক্ত সাহাবীর একক সাক্ষ্যকে দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমান মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত আয়াতদ্বয় আমি অন্য কাহারও নিকট লিখিত আকারে পাই নাই।'

'একদা নবী করীম (সা) জনৈক বেদুইনের নিকট হইতে একটি অশ্ব ক্রয় করেন। সে অশ্ব বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করিয়া বসে। হযরত খুযায়মা (রা) নবী করীম (সা)-এর অনুকূলে বেদুইনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেন। নবী করীম (সা) তাঁহার সাক্ষ্যকে দুইজন সাক্ষীর সমতুল্য ধরিয়া উহা গ্রহণ করেন এবং ক্রীত অশ্বটি বেদুইনের নিকট হইতে স্বীয় অধিকারে আনয়ন করেন।' 'সুনান' সংকলনসমূহের সংকলকগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক উপরোক্ত সাহাবীর একক সাক্ষ্যকে দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের মর্যাদা প্রদত্ত হইবার উপরোল্লেখিত ঘটনা রিওয়ায়েত করিয়াছেন। উহা একটি বিখ্যাত রিওয়ায়েত।

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী' ও আবূ জা'ফর (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল আলীয়া বলেন ঃ উক্ত আয়াতদ্বয় হযরত খুযায়মা ইব্ন ছাবিত (রা)-এর সহিত হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) ও স্বীয় পাণ্ডুলিপি হইতে লোকদিগকে শুনাইয়াছিলেন।'

ইয়াহিয়া ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হাতিম হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আলকামা, আমর ইব্ন তালহা লায়ছী ও ইব্ন ওহাব বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইয়াহিয়া বলেন ঃ হযরত উসমান (রা)-ও উক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাপারে (হযরত খুযায়মা (রা)-এর পক্ষে) সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

উপরে বর্ণিত রিওয়ায়েতে হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা)-এর বক্তব্য নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

فتتبعت القران اجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال -

কোনও কোনও রিওয়ায়েতে তাঁহার উক্তি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

فتتبعت القران اجمعه من الاكتاف والاقتاب وصدور الرجال -

কোনও কোনও রিওয়ায়েতে তাঁহার উক্তি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

فتتبعت القران اجمعه من العسب والرقاع والاضلاع -

রিওয়ায়েতে উল্লেখিত عسب শব্দটি হইতেছে عسيب শব্দের বহুবচন। আবূ নাসর ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ জাওহারী বলেন- عسب শব্দটির সহিত سعف শব্দটির কিছুটা অর্থগত মিল রহিয়াছে। عسيب হইল খর্জুর বৃক্ষের শাখার গোড়ার অংশ যাহাতে পত্র থাকে না।

পক্ষান্তরে سعفة হইল سعف শব্দের একবচন– খর্জুর বৃক্ষের শাখার অগ্রভাগ যাহাতে পত্র থাকে। اللخاف। শব্দটি اللخفة। শব্দের বহুবচন। اللخفة। অর্থ চেপ্‌টা পাতলা পাথর।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখে কুরআন মজীদের আয়াত শুনিয়া উহা উপরোক্ত বস্তুসমূহের উপর লিখিয়া রাখিতেন।

অনেক সাহাবী লেখাপড়া জানিতেন না। তাঁহারা এবং অক্ষর-জ্ঞান সম্পন্ন কেহ কেহ স্বীয় স্মৃতিতে কুরআন মজীদ ধরিয়া রাখিতেন। হযরত যায়দ (রা) স্বীয় দায়িত্ব পালনে পশুর প্রশস্ত অস্থি, প্রশস্ত পাতলা প্রস্তর ফলক, প্রশস্ত খর্জুর শাখা এবং মানুষের স্মৃতি হইতে সমগ্র কুরআন মজীদ সংগ্রহ করেন। আরব জাতি ছিল আমানত রক্ষা ও উহা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার কর্তব্যে নিষ্ঠাবান। বলাবাহুল্য, কুরআন মজীদ ছিল নবী করীম (সা) কর্তৃক তাঁহাদের নিকট রক্ষিত সর্বশ্রেষ্ঠ আমানত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ অর্থাৎ 'হে রাসূল। তোমার প্রভু হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা পৌঁছাও।'

আল্লাহ্‌র রাসূলও উহা লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া স্বীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন। তেমনি সাহাবায়ে কিরামও পরবর্তী লোকদের নিকট উহা পৌঁছাইয়া দিয়া তাঁহাদের নিকট রক্ষিত আমানত সম্পর্কিত কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন।

বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রশ্নোত্তর এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আরাফাতের ময়দানে সাহাবীদের বৃহত্তম সমাবেশে মানব ইতিহাসের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান শেষে নবী করীম (সা) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলিলেন– তোমরা আমার সম্বন্ধে নিশ্চয় জিজ্ঞাসিত হইবে। তোমরা তখন কি উত্তর দিবে? তাঁহারা আরয করিলেন– আমরা সাক্ষ্য প্রদান করিব, আপনি নিশ্চয় পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং মঙ্গলকর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। নবী করীম (সা) আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন– "প্রভু হে! সাক্ষী থাকিও! প্রভু হে! সাক্ষী থাকিও!! প্রভু হে! সাক্ষী থাকিও!!!" ইমাম মুসলিম হযরত জাবির (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

নবী করীম (সা) স্বীয় উম্মতকে আদেশ দিয়াছেন– উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট কুরআন-সুন্নাহ তথা দীন ইসলামকে পৌঁছাইয়া দেয়। তিনি আরও বলিয়াছেন– তোমরা আমার পক্ষ হইতে একটি আয়াত হইলেও পৌঁছাইয়া দাও। অর্থাৎ তোমাদের কাহারও নিকট যদি একটি আয়াত ব্যতীত কিছুই না থাকে, তথাপি সে যেন উহা মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরোক্ত আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। তাঁহারা কুরআন মজীদকে কুরআন মজীদ হিসাবে এবং পবিত্র সুন্নাহকে পবিত্র সুন্নাহ হিসাবে মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা একটিকে অন্যটির সহিত মিলাইয়া ফেলেন নাই। কুরআন মজীদ এবং পবিত্র সুন্নাহ যাহাতে পরস্পর মিলিয়া না যায়, তজ্জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ আমার নিকট হইতে কুরআন মজীদ ভিন্ন অন্য কিছু লিখিয়া লইয়া থাকিলে সে যেন উহা মুছিয়া ফেলে। উল্লেখ্য যে,

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরোক্ত আদেশের তাৎপর্য কোনক্রমে ইহা হইতে পারে না যে, তিনি পবিত্র সুন্নাহকে হিফাজত করা হইতে বিরত থাকিতে সাহাবীদিগকে আদেশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কুরআন মজীদকে পবিত্র সুন্নাহ হইতে পৃথক রাখিবার উদ্দেশ্যই নবী করীম (সা) উপরোক্ত আদেশ দিয়াছিলেন। নবী করীম (সা)-এর আদেশের ফলে কুরআন মজীদের কোন অংশ উহার সংকলন হইতে যেমন বাদ পড়ে নাই, তেমনি পবিত্র সুন্নাহর কোন অংশ উহার সংকলনে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই। এই জন্য সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র প্রাপ্য।

নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্যই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর (রা) কুরআন মজীদ সংগ্রহ ও সংকলন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের উপরোক্ত সংকলন তাঁহার নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁহার ইন্তেকালের পর উহা হযরত উমর (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। হযরত হাফসা (রা) হযরত উমর (রা)-এর নিকট রক্ষিত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী হিসাবে উহা হিফাজত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে উহা হযরত উসমান (রা) গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে আমরা ইনশা আল্লাহ্ শীঘ্রই আলোচনা করিতেছি।

হযরত উসমান (রা) কর্তৃক কুরআন লিপিবদ্ধকরণ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন শিহাব, ইবরাহীম, মূসা ইব্ন ইসমাঈল ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

একদা হযরত হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) হযরত উসমান (রা)-এর নিকট আগমন করিলেন। ইতিপূর্বে তিনি আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের যুদ্ধে ইরাকী মুসলিম বাহিনীর সহিত সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে নানারূপ মত দেখিয়া তিনি মর্মাহত ও ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি হযরত উসমান (রা)-কে বলিলেন– হে আমীরুল মূমিনীন! ইয়াহুদী ও নাসারা জাতি স্ব-স্ব কিতাব লইয়া যেরূপে মতভেদে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই উম্মত কুরআন মজীদ লইয়া তদ্রূপ মতভেদে লিপ্ত হইবার পূর্বে উহার প্রতি মনোযোগী হউন। এতদশ্রবণে হযরত উসমান (রা) হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, 'আপনার নিকট রক্ষিত কুরআন মজীদের সংকলন গ্রন্থখানা আমার নিকট পাঠাইয়া দিন। আমি উহার অনুলিপি রাখিয়া উহা আপনার নিকট প্রত্যর্পণ করিব।' হযরত হাফসা (রা) উহা হযরত উসমান (রা)-এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা), হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়র (রা), সাঈদ ইব্ন আস (রা) এবং আব্দুর রহমান ইব্ন হারিছ ইব্ন হিশাম (রা)-কে উহার কতগুলি অনুলিপি প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিলেন। তাঁহারা উহার কতগুলি অনুলিপি প্রস্তুত করিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শেষোক্ত কুরায়শী সাহাবীত্রয়ের প্রতি হযরত উসমান (রা)-এর নির্দেশ ছিল, কুরআন মজীদের কোন শব্দের উচ্চারণের বিষয়ে হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত ও তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তাঁহারা যেন উহা কুরায়েশ গোত্রের উচ্চারণ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা তাঁহার উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি প্রস্তুত হইবার পর হযরত উসমান (রা) হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট হইতে আনীত মূল সংকলনখানা তাঁহার নিকট প্রত্যর্পণ করত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি

গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় একখানা করিয়া অনুলিপি প্রেরণ করিলেন এবং কুরআন মজীদের এতদ্‌ভিন্ন প্রতিটি সংকলন পোড়াইয়া ফেলিতে নির্দেশ দিলেন।[১]

হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে খারিজা ইব্ন যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) ও ইব্ন শিহাব যুহরী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ

'হযরত উসমান (রা)-এর নির্দেশে আমরা যখন কুরআন মজীদের অনুলিপি প্রস্তুত করিতেছিলাম, তখন আমি (মূল সংকলনে) সূরা আহ্‌যাবের একটি আয়াত পাইতেছিলাম না। অথচ উক্ত আয়াত আমি নবী করীম (সা)-কে তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। অনুসন্ধান করিয়া আমরা উহা হযরত খুযায়মা ইব্ন ছাবিত আনসারী (রা)-এর নিকট রক্ষিত পাইলাম এবং অনুলিপিতে উহা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। উক্ত আয়াতটি এই ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ـ

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-এর নেতৃত্বে সাহাবীগণ কর্তৃক প্রস্তুত কুরআন মজীদের সংকলনের অনুলিপি প্রস্তুত করত উহা বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করা এবং সন্দেহযুক্ত অন্যান্য সংকলন বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে হযরত উসমান (রা)-এর একটি বৃহত্তম কীর্তি।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর (রা) কুরআন মজীদের বিক্ষিপ্ত অংশসমূহ একত্রিত করিয়াছেন। হযরত উসমান (রা) উহা সমগ্র মুসলিম জাহানে প্রচার করত কুরআন মজীদকে বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সকল সাহাবী তাঁহার উক্ত কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন দান করিয়াছেন। কুরআন মজীদের অনুলিপি প্রস্তুতকরণ কার্যে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ না পাওয়ায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) মনঃক্ষুণ্ন হইয়াছিলেন এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে সাহাবীগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কুরআন মজীদের সংকলন ভিন্ন সকল সংকলন পোড়াইয়া ফেলিবার জন্য হযরত উসমান (রা) যখন নির্দেশ দিয়াছিলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) তখন স্বীয় সহচরবৃন্দের নিকট রক্ষিত সংকলনকে সর্বসম্মতরূপে প্রস্তুত সংকলনের সহিত সংযোজিত করিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহাদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন বলিয়া একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত রহিয়াছে। তবে পরবর্তীকালে তিনি স্বীয় অভিমত ত্যাগ করত সাহাবীগণের সর্বসম্মত রায়ের সহিত একমত হইয়াছিলেন। এতদসম্পর্কে হযরত উসমান (রা)-এর কার্যক্রমকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন– 'হযরত উসমান যাহা করিয়াছেন, তাহা তিনি না করিলে আমিই উহা করিতাম।' এতদ্বারা প্রমাণিত হইল, কুরআন মজীদ সংগ্রহ, সংকলন ও একত্র করা খলীফা-চতুষ্টয়ের দৃষ্টিতে একটি দীনী মহৎ কাজ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাঁহাদের সম্বন্ধে স্বয়ং নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তীকালের খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত (রীতি-নীতি)-কে তোমরা আঁকড়াইয়া ধরিবে।'

---

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে পবিত্রাত্মা সাহাবায়ে কিরাম (রা) কঠোর সতর্কতা অবলম্বন পূর্বক সর্বসম্মতভাবে কুরআন মজীদের যে সংকলন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, উহা ছিল ভ্রান্তি ও ত্রুটির সামান্যতম সম্ভাবনা হইতেও মুক্ত এবং পবিত্র। বলা নিষ্প্রয়োজন, হযরত উসমান (রা) কর্তৃক ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরিত অনুলিপি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে প্রস্তুত সংকলনের হুবহু অনুলিপি। পক্ষান্তরে এতদভিন্ন অন্যান্য সংকলনের ত্রুটিমুক্ত হওয়া সন্দেহাতীত ছিল না। উহাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা মোটেই বিচিত্র ছিল না। এমতাবস্থায় সেইগুলি বিনষ্ট করিয়া দেওয়া ছাড়া কুরআন মজীদকে বিকৃতির হাত হইতে পবিত্র রাখিবার অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা ছিল না। হযরত উসমান (রা)-এর উপরোক্ত সাহসিকতাপূর্ণ ব্যবস্থার ফলেই কুরআন মজীদ আজ একমাত্র আসমানী গ্রন্থ যাহাতে কোনরূপ বিকৃতি নাই।

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) ছিলেন কুরআন মজীদের সঠিক সংকলনের অনুলিপি বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করিবার অনুপ্রেরণা দাতা। উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের যুদ্ধে তিনি ইরাক ও সিরিয়ার অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, লোকেরা কুরআন মজীদের বিভিন্ন বর্ণের উচ্চারণের বিষয়ে বিভিন্ন মতের অনুসারী হইয়া গিয়াছে। এতদ্দর্শনে তিনি হযরত উসমান (রা)-কে বলিয়াছিলেন- 'ইয়াহুদী ও নাসারা জাতি তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের বিষয়ে যেরূপ মতভেদে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই উম্মত কুরআন মজীদ লইয়া সেইরূপ মতভেদে লিপ্ত হইবার পূর্বেই উহাকে রক্ষা করুন।'

ইয়াহুদী ও নাসারা জাতি তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের বিষয়ে এইরূপে মতভেদে লিপ্ত হইয়াছিল যে, ইয়াহুদী জাতির হাতে তাওরাত কিতাবের একটি সংকলন রহিয়াছে এবং 'সামেরী' সম্প্রদায়ের হাতেও উহার একটি সংকলন রহিয়াছে। আর উভয় সম্প্রদায়ের তাওরাতের মধ্যে প্রচুর অমিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই অমিল শুধু শব্দের অমিল নহে; বরং অর্থের অমিলও বটে। সামেরীদের তাওরাতে হামযা (الهمزة), হা (الهاء) এবং ইয়া (الياء) এই বর্ণ তিনটি দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ইয়াহুদীদের তাওরাতে উহা সমুপস্থিত। আবার, নাসারা জাতির হাতেও তাওরাত কিতাবের একটি সংকলন রহিয়াছে। ইয়াহুদী ও 'সামেরী' সম্প্রদায়ের তাওরাত এবং নাসারা জাতির তাওরাতের মধ্যেও মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আবার, নাসারা জাতির হাতে যে ইন্‌জীল (انجيل) কিতাব রহিয়াছে, উহার সংখ্যা একটি নহে; বরং উহার সংখ্যা চারটি ঃ (১) মার্ক লিখিত ইন্‌জীল; (২) লুক লিখিত ইন্‌জীল; (৩) মথি লিখিত ইন্‌জীল (৪) যোহন লিখিত ইন্‌জীল। এইগুলির পরস্পরের মধ্যে প্রচুর অমিল পরিলক্ষিত হয়। এই সকল ইন্‌জীলের প্রত্যেকটিই কলেবরে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কোনোটি মধ্যম আকারের অক্ষরে চৌদ্দ পাতার কাছাকাছি; কোনোটি উহার দেড়গুণ এবং কোনোটি বা দ্বিগুণ হইবে। উহাতে হযরত ঈসা (আ)-এর জীবন বৃত্তান্ত, তাঁহার আচরণাবলী, তাঁহার আদেশ-নিষেধ এবং তাঁহার রচনাবলী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উহাতে স্বল্প-সংখ্যক এইরূপ বাক্যও রহিয়াছে যাহার সম্বন্ধে নাসারা জাতির দাবী এই যে, সেইগুলি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী। উক্ত ত্রুটিরাজির মধ্যে বড় ত্রুটি হইতেছে উহারা পরস্পর বিরোধী। তাওরাতের অবস্থাও তথৈবচ। পরিবর্তন-পরিবর্ধন হইতেছে উহার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) কর্তৃক আনীত শরীআত দ্বারা তাওরাত-ইন্‌জীলের শরীআতসহ সকল শরীআতই রহিত হইয়া গিয়াছে।

মোটকথা, হযরত হুযায়ফা (রা)-এর কথা শুনিয়া হযরত উসমান (রা) উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা)-কে বলিয়া পাঠাইলেন- 'তিনি যেন তাঁহার নিকট রক্ষিত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর (রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মজীদখানা তাঁহাকে প্রদান করেন। তিনি উহার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া মূল সংকলনখানা তাঁহার নিকট প্রত্যর্পণ করিবেন এবং প্রস্তুত অনুলিপিসমূহ মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করিবেন, যাহাতে লোকেরা কুরআন মজীদের (ভ্রান্ত) সংকলনসমূহ ত্যাগ করত উক্ত বিশুদ্ধ সংকলন গ্রহণ করিতে পারে।' হযরত হাফসা (রা) উহা হযরত উসমান (রা)-এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হযরত উসমান (রা) নিম্নোক্ত সাহাবীগণকে উহার অনুলিপি প্রস্তুত করিতে

নির্দেশ দিলেন ঃ (১) হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত আনসারী (রা)। ইনি নবী করীম (সা)-এর অন্যতম ওহী লেখক ছিলেন। (২) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম আল-কুরায়শী আল-ইযদী (রা)। ইনি একজন গভীর জ্ঞানসম্পন্ন মহৎ চরিত্রের সাহাবী ছিলেন। (৩) হযরত সাঈদ ইব্‌ন আস ইব্‌ন উমাইয়া আল-কুরায়শী আল-উমুবী। ইনি একজন মহৎ হৃদয় ও দানশীল সাহাবী ছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে তাঁহার বাচনভঙ্গি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাচনভঙ্গির সহিত অধিকতর সামঞ্জস্যশীল ছিল। (৪) হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযুম আল-কুরায়শী আল মাখযূমী (রা)।

উপরোক্ত সাহাবী চতুষ্টয় তাঁহাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করিবার কালে কোন শব্দের উচ্চারণের বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে উহার নিষ্পত্তির জন্য তাঁহারা হযরত উসমান (রা)-এর শরণাপন্ন হইতেন। একদা التابوت। শব্দটির সঠিক বানান লইয়া তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলিলেন– শব্দটির সঠিক বানান হইবে التابوه। তিনি উহার শেষ বর্ণকে التاء। না বলিয়া الهاء। বলিতেছিলেন। পক্ষান্তরে শেষোক্ত কুরায়শী সাহাবীত্রয় বলিলেন– শব্দটির সঠিক বানান হইবে التابوت। তাঁহারা উহার শেষ বর্ণকে الهاء। না বলিয়া التاء। বলিতেছিলেন। এই বিষয়ে লেখক চতুষ্টয় হযরত উসমান (রা)-এর রায় চাহিলেন। তিনি বলিলেন– 'উহা কুরায়শ গোত্রের বানান অনুযায়ী লিখ। কারণ, কুরআন মজীদ কুরায়শ গোত্রের ভাষায় নাযিল হইয়াছে।'

হযরত উসমান (রা)-ই কুরআন মজীদের সূরাসমূহকে বর্তমান আকারে বিন্যস্ত করেন। তিনি 'দীর্ঘ সপ্তক' (السبع الطوال) অর্থাৎ সূরায়ে বাকারা হইতে সূরায়ে আনফাল পর্যন্ত সাতটি সূরাকে কুরআন মজীদের প্রথমভাগে এবং যে সকল সূরার আয়াতের সংখ্যা একশত বা উহার কাছাকাছি, উহাদিগকে 'দীর্ঘ সপ্তম'-এর অব্যবহিত পর স্থাপন করেন।[১]

ইমাম ইব্‌ন জারীর, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ একাধিক ইমামের মাধ্যমে আওফ আরাবী হইতে, তিনি ইয়াযীদ ফারসী হইতে এবং তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে নিম্নোক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেন ঃ

আমি হযরত উসমান (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ 'সূরা আনফাল হইতেছে 'মাছানী' (المثانى) শ্রেণীভুক্ত[২] সূরা। পক্ষান্তরে সূরা তওবা হইতেছে 'আলমিঈন (المئين) একশত বা উহার নিকটবর্তী সংখ্যক আয়াতবিশিষ্ট সূরা। উহা একটি নহে; বরং দুইটি সূরা। আপনারা কিরূপে উহাদিগকে পরস্পর পাশাপাশি রাখিয়া এবং উহাদের মধ্যে বিসমিল্লাহ্ না লিখিয়া দুইটিকে এক করিয়া দিয়া দীর্ঘ সপ্তক (السبع الطوال) শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন?'

১. সহীহ হাদীস সংকলনসমূহে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরাসমূহের বিন্যাসের বর্তমান রূপ হযরত উসমান (রা)-এর নিজস্ব উদ্ভাবন নহে; বরং হযরত জিবরাঈল (আ) সেইগুলিকে ঐরূপেই বিন্যস্ত করিয়া সর্বশেষ বারে নবী করীম (সা)-কে তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছিলেন।

২. আরবী المثانى। শব্দটি المثنى। শব্দের বহুবচন। المثنى। শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কখনও কুরআন মজীদের যে কোন আয়াতকে, আবার কখনও উহার শুধু ক্ষুদ্র আয়াতকে المثنى। বলা হয়। এতদভিন্ন উহার আরও অর্থ রহিয়াছে। যথাস্থানে উহা বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে সেই সকল সূরাকে المثنى। নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে, যাহার আয়াতের সংখ্যা একশতের নীচে। এতদসম্পর্কীয় আরও আলোচনা وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ الخ এই আয়াতে দেখুন।

হযরত উসমান (রা) বলিলেন– রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি একটি সূরার অংশ বিশেষ অবতীর্ণ হইবার পর সূরার সমগ্রটুকু অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই আর এক সূরার অংশবিশেষ অবতীর্ণ হইত। তাঁহার প্রতি কোন সূরার অংশবিশেষ অবতীর্ণ হইলে তিনি ওহী লেখক সাহাবীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিতেন– 'এই সকল আয়াতকে অমুক সূরার অমুক স্থানে স্থাপন কর।' সূরা আনফাল হইতেছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনার জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরা। পক্ষান্তরে সূরা তওবা হইতেছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনার জীবনের শেষ দিকে অবতীর্ণ সূরা। কিন্তু উভয় সূরায় বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে মিল রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস ছিল, উহা দুইটি নহে; বরং একটি সূরা। আমরা প্রকৃত অবস্থা জানিবার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তিকাল করেন। আমার ধারণা অনুযায়ী আমি উহাদিগকে পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছি এবং উভয়ের মধ্যে বিসমিল্লাহ্ লিখি নাই। এইরূপে উহা এক সূরা হইবার ফলে দীর্ঘ সপ্তক (السبع الطوال) শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, সূরাসমূহের আয়াতের বিন্যাস নবী করীম (সা) কর্তৃক (আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত) সম্পন্ন হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, সূরাসমূহের বিন্যাস হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল।[১] সূরাসমূহের আয়াত নবী করীম (সা) কর্তৃক বিন্যস্ত হইয়াছে

১. 'আল মানার' তাফসীর গ্রন্থের লেখক বলেন– ইমাম ইব্‌ন কাছীরের উপরোক্ত উক্তি সকল সূরার বেলায় সঠিক নহে; বরং তাঁহার উক্তি সম্পূর্ণ বাতিল। উক্ত রিওয়ায়েতের ভিত্তিতে কেহ কেহ শুধু আলোচ্য সূরা দুইটির বেলায় তাঁহার মন্তব্যকে সঠিক বলিয়া মনে করেন; কিন্তু তাহাদের এইরূপ মন্তব্যও বাতিল। তাফসীরুল মানার গ্রন্থে 'তাফসীরে রূহুল বয়ান'-এর লেখক আল্লামা আলূসী হইতে তাহাদের মন্তব্য উদ্ধৃত করিবার পর আমি নিম্নোক্ত মন্তব্য পেশ করিতেছি ঃ

'সুনান নামক তিনখানা হাদীস সংকলনের সংকলকত্রয় ইমাম আহমদ, ইব্‌ন হিব্বান এবং আল-হাকিম কর্তৃক হযরত উসমান (রা)-এর উত্তর এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি একটি সূরার অংশবিশেষ অবতীর্ণ হইবার পর উক্ত সূরার সমগ্রটুকু অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই অন্য এক সূরার অংশবিশেষ অবতীর্ণ হইত। তাঁহার প্রতি কোন সূরার অংশবিশেষ অবতীর্ণ হইবার পর তিনি ওহী লেখক কোন সাহাবীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিতেন– 'যে সূরায় অমুক অমুক বিষয় বিবৃত রহিয়াছে, এই সকল আয়াত সেই সূরায় সংযুক্ত কর।' সূরা আনফাল হইতেছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাদানী যিন্দেগীর প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরা। পক্ষান্তরে, সূরা তাওবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাদানী জীবনের শেষদিকে অবতীর্ণ সূরা। কিন্তু, উভয় সূরায় বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে মিল রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস ছিল, উহারা দুইটি নহে; বরং একটি সূরা। আমরা প্রকৃত অবস্থা জানিবার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তিকাল করেন। আমার ধারণা অনুযায়ী আমি উহাদিগকে পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছি এবং উভয়ের মধ্যে বিস্‌মিল্লাহ্ লিখি নাই। এইরূপে উহারা এক সূরা হইবার ফলে দীর্ঘ সপ্তক (السبع الطوال) শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।'

উপরোক্ত রিওয়ায়েতের ভিত্তিতে ইমাম বায়হাকী বলিয়াছেন যে, সূরা আনফাল ও সূরা তাওবা ভিন্ন সকল সূরার বিন্যাস নবী করীম (সা) কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। আল্লামা সুয়ূতীও তদনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত অভিমতের বিরুদ্ধে যুক্তি দেওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআন মজীদের সকল সূরা বিন্যস্ত করিয়া মাত্র দুইটি সূরা অবিন্যস্ত রাখিয়া গিয়াছেন, এইরূপ ঘটনা যুক্তিযুক্ত নহে। এতদ্ব্যতীত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) প্রতি বৎসর রমযান মাসে হযরত জীবরাঈল (আ)-কে একবার করিয়া কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন। কিন্তু, যে বৎসর তিনি ইন্তেকাল করেন, সেই বৎসর উহা দুইবার তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতেছে, তিলাওয়াতকালে তিনি উহাদিগকে কোথায় স্থাপন করিতেন? প্রকৃত কথা এই যে, অন্যান্য সূরার ন্যায় আলোচ্য সূরাদ্বয়ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক বিন্যস্ত হইয়াছে। হযরত উসমান (রা) উহা হয়ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আলোচ্য সূরাদ্বয় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক বিন্যস্ত না হইলে হযরত উসমান (রা)-এর উদ্যোগে কুরআন মজীদের অনুলিপি প্রস্তুত

বলিয়াই কোন সূরার আয়াতসমূহের অবস্থান পরিবর্তন করিয়া তিলাওয়াত করা অবৈধ। পক্ষান্তরে, পরবর্তী সূরা পূর্বে তিলাওয়াত করিয়া পূর্ববর্তী সূরা পরে তিলাওয়াত করা অবৈধ নহে। তবে হযরত উসমান (রা) যেরূপে উহাদিগকে বিন্যস্ত করিয়াছেন, তাঁহার অনুসরণে উহাদিগকে সেইরূপে স্থাপন করিয়া তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। আর কোন সূরার তিলাওয়াত শেষ করিবার পর উহার অব্যবহিত পরবর্তী সূরাকে বাদ দিয়া অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করায় কোন দোষ নাই। তবে, এইরূপ না করিয়া উহার অব্যবহিত পরবর্তী সূরা তিলাওয়াত করাই উত্তম। নবী করীম (সা) কখনও জুমুআর নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা জুমুআ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মুনাফিকূন আবার কখনও প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়া তিলাওয়াত করিতেন। পক্ষান্তরে তিনি ঈদের নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা কাফ এবং দ্বিতীয় রাকআতে (উহার অব্যবহিত পরবর্তী সূরা আয্যারিয়াত-এর পরিবর্তে) সূরা কামার তিলাওয়াত করিতেন। হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হইতে ইমাম মুসলিম উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) জুমুআর দিনে ফজরের নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আলিফ লাম মীম আস-সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা দাহর তিলাওয়াত করিতেন।

কোন সূরা তিলাওয়াত করিয়া উহার পূর্ববর্তী অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করায়ও কোন দোষ নাই। হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) প্রথমে সূরা বাকারা, তৎপর সূরায়ে নিসা এবং তৎপর সূরায়ে আলে ইমরান তিলাওয়াত করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উমর (রা) ফজরের নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা নাহল এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করিয়াছেন।

কুরআন মজীদের অনুলিপি প্রস্তুত হইয়া যাইবার পর হযরত উসমান (রা) মূল সংকলনখানা হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট ফিরাইয়া দিলেন। উহা তাঁহারই নিকট সংরক্ষিত

(চলমান) হইবার কালে অন্যান্য সাহাবী এতদ্বিষয়ে তাঁহার বিরোধিতা করিতেন। যেমন বিরোধিতা করিয়াছিলেন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কুরআন মজীদের অনুলিপিসমূহের প্রস্তুত হওয়ার এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় উহার ছড়াইয়া পড়ার বেশ কয়েক বৎসর পর। (অবশ্য হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ধারণায় আলোচ্য সূরাদ্বয়ের বিন্যাস প্রভৃতি ব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক গৃহীত পন্থায় না হওয়ার কারণে তিনি হযরত উসমান (রা)-এর নিকট প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন।)

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন ঃ উক্ত হাদীসটি حسن (হাসান) এবং উহার সনদের কোন রাবীই মিথ্যাবাদী নহে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ ফারেসী ও আওফ ইব্ন আবূ জামীলা ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে উহা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। সনদের অন্যতম রাবী ইয়াযীদ আল ফারেসী একজন অখ্যাত রাবী। সে ইয়াযীদ ইব্ন হুরমুয, না অন্য কেহ এ বিষয়ে হাদীস শাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এতদসম্বন্ধীয় সঠিক তথ্য এই যে, সে ইয়াযীদ ইব্ন হুরমুয ভিন্ন অন্য কেহ ছিল। সে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছে এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ ও হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ হইতে কুরআন মাজীদের অনুলিপি সম্বন্ধে তথ্য বর্ণনা করিয়াছে। সে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের সচিব ছিল। একদা ইয়াহিয়া ইব্ন মাঈনের নিকট তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি তাহার পরিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবূ হাতিম তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন– তাঁহার নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করা যাইতে পারে।' 'তাহযীবুত্তাহযীব' নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত ইমাম তিরমিযীর মন্তব্য সমাপ্ত হইল। এই ধরনের অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি যে হাদীসের একক রাবী, উহা কুরআন মজীদের ন্যায় বিপুল জনগোষ্ঠী কর্তৃক বর্ণিত ও প্রচারিত গ্রন্থের বিন্যাসের ক্ষেত্রে গৃহীত হইতে পারে না।"

রহিল। একদা মারওয়ান ইব্ন হাকাম তাঁহার নিকট উহা চাহিয়া সংবাদ পাঠাইলে তিনি উহা তাহাকে দিতে অসম্মতি জানাইলেন। এইরূপে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত উহা তাঁহার নিকট রক্ষিত রহিল। তাঁহার মৃত্যুর পর উহা তদীয় ভ্রাতা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট রক্ষিত রহিল। আমীর মারওয়ান উহা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া এই ভয়ে পোড়াইয়া ফেলিলেন যে, উহাতে হযরত উসমান (রা) কর্তৃক প্রস্তুত অনুলিপির সহিত সামঞ্জস্যবিহীন কোন কিছু লিপিবদ্ধ থাকিতে পারে।[১]

হযরত উসমান (রা) একটি অনুলিপি মক্কা শরীফে, একটি অনুলিপি বসরা নগরীতে, একটি অনুলিপি কূফা নগরীতে, একটি অনুলিপি সিরিয়া প্রদেশে, একটি অনুলিপি ইয়ামান প্রদেশে ও একটি অনুলিপি বাহরাইনে প্রেরণ করিলেন এবং একটি অনুলিপি মদীনা শরীফে রাখিয়া দিলেন। আবূ হাতিম সাজিস্তানী হইতে আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ উপরোক্ত রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী অবশ্য বলিয়াছেন, হযরত উসমান (রা) মাত্র চারিখানা অনুলিপি বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই অভিমত সমর্থিত নহে। জনসাধারণের নিকট কুরআন মজীদের অন্যান্য যে (অসম্পূর্ণ বা সম্পূর্ণ) সংকলন রক্ষিত ছিল, হযরত উসমান (রা) তাহা পোড়াইয়া ফেলিতে নির্দেশ দিলেন– যাহাতে কুরআন মজীদের কিরাআত ও উহার শব্দের উচ্চারণে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ দেখা না দেয়। তাঁহার সময়ের সকল সাহাবী এই কার্যে তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। যাহারা একত্রিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল, কেবলমাত্র তাহারাই এই কার্যের বিরোধিতা করিয়াছিল। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন। বিরোধীগণ হযরত উসমান (রা)-এর যে সকল কার্যের বিরূপ সমলোচনা করিয়াছিল, ইহা ছিল সেগুলির অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের সমালোচনা ছিল অযৌক্তিক, অমূলক ও ভিত্তিহীন। শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ ও তাবেঈগণ সকলেই উক্ত কার্যে তাঁহার প্রতি সমর্থন প্রদান করিয়াছিলেন।

সুয়ায়দ ইব্ন গাফলাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে জনৈক ব্যক্তি, আলকামা ইব্ন মারসাদ, শু'বা, ইমাম আবূ দাউদ তায়ালেসী, ইব্ন মাহদী ও গুনদুর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত উসমান (রা) যখন কুরআন মজীদের মূল সংকলন ও উহার অনুলিপি ছাড়া সকল পাণ্ডুলিপি পোড়াইয়া ফেলিলেন, তখন হযরত আলী (রা) মন্তব্য করিলেন, 'উসমান (রা) উহা না করিলে আমিই উহা করিতাম।'

হযরত মুসআব ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, শু'বা, আবদুর রহমান, আহমাদ ইব্ন সিনান ও আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত মুসআব বলেন ঃ

১. এখানে ইহা বলাই সঙ্গত ছিল যে, আমীর মারওয়ান উহা এই আশংকায় পোড়াইয়া ফেলিলেন যে, কেহ দাবী করিতে পারে যে, উহাতে হযরত উসমান (রা) কর্তৃক প্রস্তুত অনুলিপির সহিত সামঞ্জস্যবিহীন কোন কিছু লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মূল সংকলনখানা ছিল বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত। সুসংবদ্ধ একটি গ্রন্থের আকারে উহা আবদ্ধ ছিল না। এইহেতু বলা যায়, আমীর মারওয়ানের উপরোক্ত আশংকা ভিত্তিহীন ছিল না। পক্ষান্তরে হযরত উসমানের নেতৃত্বে সাহাবীগণ কর্তৃক প্রস্তুত অনুলিপিসমূহ ছিল সুসংবদ্ধ, সুবিন্যস্ত ও একটি মাত্র গ্রন্থের আকারে আবদ্ধ। উহা দীর্ঘদিনেও নষ্ট হইবার আশংকা ছিল না। কথিত আছে, উক্ত অনুলিপিসমূহের মধ্যে হইতে একটি অনুলিপি রুশ বাদশাহদের নিকট রক্ষিত ছিল। তাহাদের উত্তরসূরীগণ উহার একটি আলোকচিত্র রাখিয়া দিয়া মূল সংকলনখানা বুখারা নগরীর অধিপতিকে উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করেন। উহাও কথিত আছে, মূল সংকলনখানা বুখারার আমীরের হস্তগত হয় নাই।

হযরত উসমান (রা) যখন কুরআন মজীদের অনির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি পোড়াইয়া ফেলেন, তখন আমি বিপুল সংখ্যক লোককে উপস্থিত দেখিয়াছি। 'উক্ত কার্য তাহাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিল' অথবা 'তাহাদের কেহই উক্ত কার্যের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

গুনায়েম ইব্‌ন কায়স মাযানী হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত ইব্‌ন আম্মারাহ আল-হানাফী, ইয়াহিয়া ইব্‌ন কাছীর ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম সওয়াফ ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, গুনায়েম বলেন ঃ

'আমি কুরআন মজীদকে উভয়বিধ উচ্চারণেই (على الحرفين جميعا) তিলাওয়াত করিয়াছি। হযরত উসমান (রা) যদি কুরআন মজীদের অনুলিপি প্রস্তুত না করিতেন, তবে এক দুঃখজনক অবস্থা দেখা দিত। আল্লাহ্‌র কসম! এইরূপ চিন্তাও আমাকে দুঃখ দেয়। প্রত্যেক মুসলমানরেই সন্তান থাকে। প্রতিদিন সকাল বেলায় তাহার সন্তান কুরআন মজীদকে নিজের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের সহিত স্বীয় সঙ্গী হিসাবে দেখিতে পায়। রাবী বলেন, আমরা (গুনায়েমকে) বলিলাম, ওহে আবুল আম্বার! ইহা কেন বলিতেছেন? তিনি বলিলেন– হযরত উসমান (রা) যদি কুরআন মজীদ লিখিয়া উহা হিফাজত করিবার ব্যবস্থা না করিতেন, তবে লোকে কবিতা পাঠ করিত।

আবূ মাজলায হইতে ধারাবাহিকভাবে ইমরান ইব্‌ন হাদীর, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্, ইয়া'কূব ইব্‌ন সুফিয়ান ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

আবূ মাজলায বলেন– 'হযরত উসমান (রা) যদি কুরআন মজীদ লিখিবার ব্যবস্থা না করিতেন, তবে লোকদিগকে কবিতা পাঠ করিতে দেখা যাইত।' ইব্‌ন মাহদী হইতে ধারাবাহিকভাবে আহমাদ ইব্‌ন সিনান ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ইব্‌ন মাহদী বলেন– 'হযরত উসমান (রা) এইরূপ দুইটি মহৎ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, এমনকি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর ফারূক (রা)-ও যাহার অধিকারী ছিলেন না। এক. তিনি অন্যায়ভাবে নিহত হইয়াছেন; কিন্তু শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে যান নাই। দুই. তিনি বিশ্ববাসীর জন্যে নির্ভুল কুরআন মজীদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।'

পক্ষান্তরে খুমায়র ইব্‌ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক ও ইসরাঈল বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত উসমান (রা) যখন কুরআন মজীদের মূল সংকলন ও উহার অনুলিপি ভিন্ন অন্য সমুদয় পাণ্ডুলিপি পোড়াইয়া ফেলিবার নির্দেশ দিলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) উহা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি (জনসাধারণকে) উপদেশ দিলেন, তোমাদের কেহ কুরআন মজীদের কোন সংকলন গোপন রাখিয়া দিতে পারিলে সে যেন উহা রাখিয়া দেয়। কেহ এইরূপে যাহা রাখিয়া দিতে পারিবে, কিয়ামতের দিনে তাহা লইয়া সে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে আমি সত্তরটি সূরা[১] শিখিয়াছি। যায়দ ইব্‌ন ছাবিত তখন বালক ছিল। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে যাহা শিখিয়াছি, তাহা আমি ত্যাগ করিব?'

১. মূল বর্ণনায় এই স্থলে 'সত্তর বার' উল্লেখিত থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আবূ ওয়ায়েল হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ, ইব্‌ন শিহাব, সা'ঈদ ইব্‌ন সুলায়মান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন নাযর ও আবূ বকর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

আবূ ওয়ায়েল বলেন– 'একদা হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) মিম্বারে দাঁড়াইয়া আমাদের সম্মুখে বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন, যদি কেহ চুরি করিয়া কিছু করে, তবে কিয়ামতের দিনে সে চুরির বস্তু লইয়া আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তোমরা তোমাদের নিকট রক্ষিত কুরআন মজীদের সংকলনকে গোপনে হিফাজত করিয়া রাখিয়া দাও। তোমরা আমাকে কিরূপে যায়দ ইব্‌ন ছাবিতের কিরাআত অনুযায়ী কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে বলো? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখে সত্তরের কিছু অধিক সূরা শিখিয়াছি। সেই সময়ে যায়দ ইব্‌ন ছাবিত ছিল বালক মাত্র। সে বালকদের সহিত আসিত। তাহার মস্তকের অগ্রভাগে দুই গুচ্ছ কেশ ছিল। কুরআন মজীদের প্রতিটি আয়াতের শানে নুযূল সম্বন্ধে আমিই অধিকতর ওয়াকেফহাল। আল্লাহ্‌র কিতাব সম্বন্ধে আমার চাইতে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী অন্য কেহ নাই। তবে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নহি। আমি যদি জানিতে পারি যেখানে যানবাহন হিসাবে ব্যবহার্য উট পৌঁছিতে পারে, সেইরূপ কোন স্থানে আল্লাহ্‌র কিতাব সম্বন্ধে আমার চাইতে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী কোন ব্যক্তি রহিয়াছে, তবে আমি তাঁহার নিকট গমন করিব।' অতঃপর আবূ ওয়ায়েল বলেন– হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) মিম্বার হইতে নামিবার পর আমি জনতার মধ্যে বসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) যাহা বলিলেন, কেহই উহার বিরোধিতা করিল না।' উপরোক্ত রিওয়ায়েত বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফেও বর্ণিত রহিয়াছে। উহাতে হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর উক্তি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর সাহাবীগণ জানেন, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে অধিকতর জ্ঞানের অন্যতম অধিকারী।'

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আবূ ওয়ায়েলের মন্তব্য 'কেহই হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর বক্তব্যের বিরোধিতা করিল না'– ইহার তাৎপর্য এই যে, 'হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) কুরআন মজীদ সম্পর্কিত স্বীয় জ্ঞান ও ফযীলত সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, কেহই উহার বিরোধিতা করিল না।' আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। পক্ষান্তরে অনেকেই কুরআন মজীদের সংকলন লুকাইয়া রাখিবার জন্য তাঁহার পরামর্শের বিরোধিতা করিয়াছিল। আলকামা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম ও আ'মাশ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলকামা বলেন ঃ একদা আমি সিরিয়ায় আগমন করিলে তথায় হযরত আবূ দারদা (রা)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার নিকট বলিলেন– 'আমরা আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ)-কে একজন ভীরু ব্যক্তি মনে করিতাম। তাঁহার কি হইল যে, তিনি আমীরের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন?'

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ স্বীয় পুস্তকের একটি পরিচ্ছেদকে "অবশেষে হযরত উসমান (রা) কর্তৃক কুরআন মজীদ সংকলনের প্রতি হযরত ইব্‌ন মাসউদের সমর্থন জ্ঞাপন" এই শিরোনাম দিয়াছেন। উহাতে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন– ফালফালাহ জা'ফী হইতে ধারাবাহিকভাবে উসমান ইব্‌ন হাস্‌সান আল-আমেরী, ওয়ালীদ ইব্‌ন কায়স, যুহায়ের, আবূ উসামাহ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন উসমান আমার (আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদের) নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'একদা কুরআন মজীদের অনুলিপিসমূহের (প্রস্তুতকরণের) বিষয় লইয়া ভীত হইয়া আমরা কিছু সংখ্যক লোক হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিকট গমন করিলাম। আমাদের

মধ্য হইতে জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, আমরা আপনার নিকট সৌজন্য সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে আগমন করি নাই; বরং (কুরআন মজীদ সম্পর্কিত) এই সংবাদে ভীত হইয়াই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। ইহাতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিলেন– নিশ্চয় সাত প্রকার বিষয়ে সাতটি উচ্চারণে তোমাদের নবীর প্রতি কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হইয়াছে। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ একটি মাত্র বিষয়ে ও একটি মাত্র উচ্চারণে অবতীর্ণ হইত।' আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলি, হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর উপরোক্ত মন্তব্য দ্বারা আবূ বকর ইব্‌ন দাউদের অনুমতি হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর স্বীয় পূর্ব অভিমত প্রত্যাহার করা এবং হযরত উসমান (রা)-এর কার্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা প্রমাণিত হয় না। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত মুসআব ইব্‌ন সা'দ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, আবূ রজা, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদের পিতৃব্য ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করেন ঃ

একদা হযরত উসমান (রা) মিম্বারে দাঁড়াইয়া জনতার উদ্দেশ্যে বলিলেন– হে লোক সকল! তোমাদের নবী তের বৎসর পূর্বে তোমাদের প্রতি দায়িত্ব সঁপিয়া দিয়া তোমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আজ তোমরা কুরআন মজীদ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছ। তোমরা (কুরআন মজীদের জন্যে বিভিন্ন কিরাআত উদ্ভাবন করিয়া) বলিয়া থাক, ইহা উবাই (ইব্‌ন কা'ব)-এর কিরাআত; ইহা আব্দুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ)-এর কিরাআত ইত্যাদি। তোমাদের একজন অন্যজনকে বলিয়া থাকে, 'আল্লাহ্‌র কসম! তোমার কিরাআত (জনগণের নিকট) টিকিবে না।' আমি তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ্‌র কসম দিয়া বলিতেছি, যাহার নিকট কুরআন মজীদের যাহা কিছু আছে, সে যেন উহা লইয়া উপস্থিত হয়। তাঁহার কথায় লোকেরা (কুরআন মজীদের আয়াত সম্বলিত) পত্র ও পশুচর্ম লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে ডাকিয়া ডাকিয়া আল্লাহ্‌র কসম দিয়া বলিতে লাগিলেন, তুমি কি ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে শুনিয়াছ? প্রত্যেকে বলিল– হ্যাঁ।

অতঃপর হযরত উসমান (রা) লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন– লিখনকার্যে জনগণের মধ্যে দক্ষতম ব্যক্তি কে? লোকেরা বলিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লেখক যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)। তিনি বলিলেন– বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণে লোকদের মধ্যে কে অধিকতম দক্ষ? লোকেরা বলিল, সাঈদ ইব্‌নুল আস। তিনি বলিলেন– সাঈদ ইবনুল আস কুরআন মজীদের উচ্চারণ বলিয়া দিবে এবং যায়দ ইব্‌ন ছাবিত উহা লিপিবদ্ধ করিবে। হযরত উসমান (রা)-এর নির্দেশ অনুসারে হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) কুরআন মজীদের কয়েকখানা অনুলিপি প্রস্তুত করিলেন। হযরত উসমান (রা) উহা লোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। রাবী বলেন– আমি কোন কোন সাহাবীকে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'কুরআন মাজীদের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া হযরত উসমান (রা) একটি মহৎ কাজ করিয়াছে।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ্।

কাছীর ইব্‌ন আফলাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন, আবূ বকর ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন হাস্‌সান, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন যায়দ ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত উসমান (রা) যখন কুরআন মজীদের অনুলিপি প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি এতদুদ্দেশ্যে কুরায়েশ ও আনসারের মধ্য হইতে বারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে একত্রিত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) এবং হযরত যায়দ ইব্‌ন

ছাবিত (রা)-ও ছিলেন; তাঁহারা হযরত উমর (রা)-এর বাড়িতে রক্ষিত কুরআন মজীদের মূল সংকলনখানা (الربعة) আনাইলেন। হযরত উসমান (রা) তাঁহাদের কার্য দেখাশুনা করিতেন। কোন বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তাঁহারা উহার লিখন স্থগিত রাখিতেন। রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন বলেন, আমি আমার ঊর্ধ্বতন রাবী কাছীর ইব্‌ন আফলাহর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম– তাঁহারা এইরূপ বিষয়ের লিখন কেন স্থগিত রাখিতেন, তাহা বলিতে পারেন কি?' কাছীর ইব্‌ন আফলাহ ছিলেন একজন সুলেখক ব্যক্তি। তিনি নেতিবাচক উত্তর দিলেন। রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন বলেন– আমি ধারণা করিলাম, 'তাঁহারা বিতর্কিত বিষয়ের লিখনকার্য এই উদ্দেশ্যে স্থগিত রাখিতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সম্মুখে সর্বশেষে আবৃত্ত কুরআন মজীদের তিলাওয়াত সম্বন্ধে যাঁহারা সর্বাধিক ওয়াকেফহাল, তাঁহাদের নিকট হইতে সঠিক তথ্য, আয়াত বা উচ্চারণ জানিয়া লইয়া উহা লিপিবদ্ধ করিবেন।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি, উপরোক্ত রিওয়ায়েতে মূল আরবীতে যে الربعة শব্দ উল্লেখিত হইয়াছে, উহার অর্থ সংকলিত বিষয়সমূহ। উক্ত বিক্ষিপ্ত সংকলনখানা হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। একত্রিত গ্রন্থাকারে উহার অনুলিপি প্রস্তুত করিবার পর হযরত উসমান (রা) উহা হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। জনগণের নিকট প্রাপ্ত অনির্ভরযোগ্য সংকলনসমূহ পোড়াইয়া ফেলিলেও তিনি উহা পোড়ান নাই। কারণ, উহাকেই অবিকলভাবে পুনঃলিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তবে উহা ছিল অবিন্যস্ত। তিনি সুবিন্যস্ত আকারে উহার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।[১] মূল সংকলনখানা পোড়াইয়া না ফেলিবার কারণ এই যে, উহা হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট প্রত্যর্পণ করিবার ওয়াদা করিয়াই হযরত উসমান (রা) উহা তাঁহার নিকট হইতে আনিয়াছিলেন। হযরত হাফসা (রা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত উহা তাঁহারই নিকট রক্ষিত ছিল। তাঁহার ইন্তিকালের পর মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম উহা লইয়া গিয়া পোড়াইয়া ফেলেন। জনসাধারণের নিকট প্রাপ্ত অনির্ভরযোগ্য সংকলনসমূহ পোড়াইয়া ফেলিবার পক্ষে হযরত উসমান (রা) যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রে মারওয়ানই সেই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সালেম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ হইতে ধারাবাহিকভাবে যুহ্‌রী, শুআয়ব, আবুল ইয়ামান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আওফ ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করেন ঃ

'মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম হযরত হাফসা (রা)-এর জীবদ্দশায় তাঁহার নিকট রক্ষিত কুরআন মজীদের সংকলনখানা চাহিয়া পাঠাইয়া ব্যর্থ হন। হযরত হাফসা (রা)-এর ইন্তিকালের পর তিনি উহা অলঙ্ঘনীয় আদেশক্রমে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট হইতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি উহা ছিঁড়িয়া বিনষ্ট করিয়া দেন। স্বীয় কার্যের পক্ষে মারওয়ান যুক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া বলেন, আমি উহা এই জন্য করিয়াছি যে, উহার অনুলিপি প্রস্তুত করত সংরক্ষণ

১. প্রকৃত তথ্য এই যে, হযরত উসমান (রা) মূল সংকলনের কতগুলি সুসংবদ্ধ জিলদযোগ্য মজবুত অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহার আয়াতসমূহ ও সূরা সমূহের বিন্যাস প্রক্রিয়া হযরত উসমান (রা)-এর পরিকল্পনা নহে; বরং হযরত জীবরাঈল (আ) যে তারতীব ও বিন্যাসে উহা সর্বশেষে আবৃত্ত করিয়া হযরত নবী করীম (সা)-কে শুনাইয়াছিলেন, হযরত উসমান (রা) উহাকে সেই তারতীব অনুযায়ীই পুনঃসংকলিত করেন। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় উহা অচিরেই জ্ঞাত হওয়া যাইবে। 'সূরা আনফাল ও সূরা তাওবা উহার ব্যতিক্রম ছিল'– এই মর্মে ইতিপূর্বে যে রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, উহা দুর্বল, অতএব গ্রহণযোগ্য নহে।

করা হইয়াছে। উহা বিনষ্ট হইলেও কুরআন মজীদ বিনষ্ট হইবার কোন আশংকা নেই। পক্ষান্তরে উহা রাখিয়া দিলে ভবিষ্যতে কোন সন্দেহপরায়ণ ব্যক্তি বলিতে পারে যে, উহাতে লিপিবদ্ধ অংশ-বিশেষ উহার অনুলিপিতে বাদ পড়িয়া গিয়োছে।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, খারিজার পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে খারিজা ও যুহরী কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত বিশেষত গ্রহণযোগ্য নহে। উক্ত রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'হযরত উসমান (রা)-এর স্মরণে আসিল যে, সূরা আহযাবের مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ الخ এই আয়াতটি সংকলনে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। অতঃপর অনুলিপি প্রস্তুত করিবার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ উহা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিলেন।' প্রকৃতপক্ষে হযরত উসমান (রা)-এর আমলে নহে; বরং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আমলে উপরোক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল।

হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দ ইব্‌ন সাব্বাক ও যুহরী কর্তৃক বর্ণিত অপর একটি রিওয়ায়েতে উহা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে। প্রথমোক্ত রিওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার প্রমাণ এই যে, উহাতে বর্ণিত হইয়াছে, 'আমরা (অনুলিপি প্রস্তুতকারকগণ) উহা উক্ত সূরায় লিপিবদ্ধ করিলাম।' অথচ উহা হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সৃষ্ট অনুলিপির হাশিয়া বা টীকায় নহে; বরং গ্রন্থের অভ্যন্তর ভাগে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

কুরআন মজীদের সংকলন ছিল একটি মহা মর্যাদাপূর্ণ কীর্তি। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর (রা) উক্ত মহৎ কীর্তির প্রথম পর্যায় সম্পন্ন করেন। হযরত উসমান (রা) উহার দ্বিতীয় পর্যায় সম্পন্ন করেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) এবং হযরত ফারূকে আজম (রা) কুরআন মজীদের বিশুদ্ধ সংকলন প্রস্তুত করেন। পক্ষান্তরে হযরত উসমান (রা) উহার মজবুত ও স্থায়ী অনুলিপি প্রস্তুত করত অন্যান্য অনির্ভরযোগ্য সংকলনসমূহ বিনষ্ট করিয়া দিয়া একমাত্র বিশুদ্ধ সংকলনসমূহ বিশ্বে প্রচার করেন। এইভাবে তিনি অশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন মজীদের প্রচলনের পথ রুদ্ধ করত বিশুদ্ধ উচ্চারণের কুরআন মজীদ প্রচারপূর্বক কুরআন মজীদকে হিফাজত করিবার ব্যবস্থা করেন। হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-কে রমযান মাসের শেষ দিকে তাঁহার জীবনের সর্বশেষ বারে কুরআন মজীদকে যেরূপে আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন, উহা সেইরূপেই বিশ্বময় প্রচারিত হইয়াছে। হযরত জীবরাঈল (আ) সর্বশেষ রমযানে নবী করীম (সা)-কে উহা দুইবার শুনাইয়াছিলেন। অন্যান্যবার তিনি উহা একবার শুনাইতেন। তাই নবী করীম (সা) উহার কারণ সম্পর্কে হযরত ফাতিমা (রা)-কে বলিয়াছিলেন– 'আমার মনে হয়, আমার মৃত্যু নিকটবর্তী।' বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে উপরোক্ত রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে।

বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রা) সংকল্প করিলেন যে, কুরআন মজীদ যে তারতীব ও পরম্পরায় নাযিল হইয়াছে, উহাকে সেই তারতীব ও পরম্পরায় সংকলিত করিবেন। এই প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন হইতে ধারাবাহিকভাবে আশআছ, ইব্‌ন ফুযায়েল, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল আহমাসী ও (আবূ বকর) ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রা) শপথ করিলেন যে, তিনি যতদিন কুরআন মজীদকে একখানা সংকলিত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না করিবেন, ততদিন জুমুআর নামায আদায় করিবার সময় ভিন্ন অন্য কোন সময়ে গায়ে চাদর ব্যবহার করিবেন না।

শপথ অনুযায়ী তিনি একসময় কুরআন মজীদের সংকলন প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কিছুদিন পর তাঁহার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন- 'ওহে আবুল হাসান! আপনি কি আমার নেতৃত্বকে অপছন্দ করেন?' তিনি আসিয়া বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি আপনার নেতৃত্বকে অপছন্দ করি না; কিন্তু, আমি শপথ করিয়াছিলাম, কুরআন মজীদের সংকলন প্রস্তুত না করিয়া জুমুআর নামায আদায় করিবার সময় ভিন্ন অন্য কোন সময়ে গায়ে চাদর ব্যবহার করিব না।' অতঃপর তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়আত করত প্রত্যাবর্তন করিলেন।"

আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েতের সনদ বিচ্ছিন্ন। উক্ত রিওয়ায়েত সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন- উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী আশআছ ভিন্ন অন্য কেহ উল্লেখ করে নাই যে, হযরত আলী (রা) কুরআন মজীদের সংকলন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উক্ত 'আশআছ' একজন মিথ্যাবাদী ব্যক্তি। অন্যান্য রাবী বর্ণনা করিয়াছেন- 'হযরত আলী (রা) বলিলেন- حتى اجمع القران ....

অর্থাৎ 'যতদিন আমি কুরআন মজীদ কণ্ঠস্থ করিবার কার্য সম্পন্ন করিতে না পারিব, ততদিন...। যেমন, جمع فلان القران -'অমুক ব্যক্তি কুরআন মজীদ কণ্ঠস্থ করিয়াছে।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদের উপরোক্ত মন্তব্যই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। কারণ, হযরত আলী (রা) কর্তৃক লিখিত কুরআন মজীদের কোন সংকলন বা অন্য কোন গ্রন্থ[১] পাওয়া যায় না। তবে হযরত উসমান (রা) কর্তৃক প্রস্তুত কুরআন মজীদের সংকলনের অবিকল অনুকরণে লিখিত এইরূপ কতকগুলি অনুলিপি পাওয়া যায়, যেগুলি সম্বন্ধে কথিত হইয়া থাকে যে, উহা হযরত আলী (রা) লিখিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ ধারণা সঠিক নহে। কারণ, উহার কোন কোনটিতে লিখিত রহিয়াছে ঃ كتبه على ابن ابو طالب

(ইহা হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব লিখিয়াছেন।)[২] উক্ত বাক্যটি আরবী ব্যাকরণগত দিক দিয়া ভুল। হযরত আলী (রা) দ্বারা এইরূপ ভ্রান্তি সংঘটিত হইতে পারে না। তিনি ছিলেন আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদগাতা। আসওয়াদ ইব্ন আমর দুয়েলী তাঁহার নিকট হইতে ব্যাকরণ সম্পর্কিত যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্দারা উহা প্রমাণিত হয়। তিনি আরবী শব্দ الكلمة -কে اسم - فعل ও حرف এই তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হযরত আলী (রা) কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং আবুল আসওয়াদ কর্তৃক সম্প্রসারিত হইয়াছে। গবেষকগণ পরবর্তীকালে উহার সুবিস্তৃত রূপ দান করিয়াছেন। এইরূপে আরবী ব্যাকরণ একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

---

১. তবে শিয়া সম্প্রদায়ের 'রাওয়াফেয' নামক একটি সম্প্রদায় কতগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার নামে প্রচার করিয়াছে। কোন কোন চরমপন্থী রাফেযী বলিয়া থাকে যে, 'হযরত আলী (রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মজীদে কিছু অতিরিক্ত আয়াত এবং সারা বিশ্বে প্রচলিত কুরআন মজীদের বিরোধী কিছু আয়াত সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ইমাম মাহদী আসিয়া তাঁহার (হযরত আলীর) সংকলনখানা প্রকাশ করিয়া দিবেন।' তাহাদের এই সকল কথা হযরত আলী (রা)-এর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ ভিন্ন কিছু নহে। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কালামের মধ্যে কোনরূপ বিকৃতি ঘটাইবার-মত পাপাচার হইতে পবিত্র ছিলেন। যাহারা নবী করীম (সা)-এর আহলে বায়তের প্রতি এইরূপ জঘন্য মিথ্যা দোষারোপ করে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হউক।

২. উক্ত ভ্রান্ত বাক্যটি দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, উহার লেখক কোন অনারব ব্যক্তি। সম্ভবত কোন পারসিক অমুসলিম কর্তৃক উক্ত বাক্যটি লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী একটি টীকায় উহা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

হযরত উসমান (রা) কর্তৃক প্রস্তুত কুরআন মজীদের অনুলিপিসমূহের মধ্যে অধিকতর বিখ্যাত হইতেছে দামেস্কের জামে মসজিদের প্রাচীর পরিবেষ্টিত কক্ষের পূর্বাংশে সংরক্ষিত অনুলিপিখানা। উক্ত কক্ষটিতে আল্লাহ্ তা'আলার বিভিন্ন নাম অংকিত রহিয়াছে। উক্ত অনুলিপিখানা পূর্বে 'তবরিয়্যাহ' (طبرية) শহরে সংরক্ষিত ছিল। পাঁচশত আঠার হিজরী সনে উহা দামেস্কে স্থানান্তরিত হয়। আমি উহা দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। উহার কলেবর বিপুল। উহার হস্তাক্ষর, সুস্পষ্ট, সুপাঠ্য ও সুন্দর দীর্ঘস্থায়ী রঙের কালিতে উহা লিখিত। উহার পাতা সম্ভবত উটের চামড়ার। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। উহা মহিমান্বিত মহা সম্মানিত প্রিয় কিতাব। আল্লাহ্ তা'আলা উহার সম্মান, তা'জীম ও ইয্যত বাড়াইয়া দিন।

হযরত উসমান (রা) কর্তৃক প্রস্তুত কুরআন মজীদের অনুলিপিসমূহের কোনটিই হযরত উসমান (রা)-এর নিজ হস্তে লিখিত নহে। সেইগুলি হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত প্রমুখ লেখকবৃন্দ কর্তৃক তাঁহার খিলাফতের কালে লিখিত। যেহেতু হযরত উসমান (রা)-এর উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাই সেগুলিকে 'উসমানী মাসাহিফ' বলা হয়। অবশ্য হযরত উসমান (রা)-এর সম্মুখে সেইগুলি পড়িয়া সাহাবীগণকে শুনানো হইয়াছিল। এইরূপে সাহাবীদের সর্বসম্মত রায়ে নির্ভুল ঘোষিত হইবার পর উহা মুসলিম রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত হয়।

বনূ উসাইদ গোত্রের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আবূ সাঈদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নাযারাহ, সুলাইমান তায়মী, কুরায়েশ ইব্ন আনাস, আলী ইব্ন হারব তাঈ ও আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'মিসরীয় বিদ্রোহীগণ হযরত উসমান (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করিয়া সর্বপ্রথম তাঁহার পবিত্র হস্তে তরবারীর আঘাত হানিল। উহা فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ - وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ –এই আয়াতের উপর পতিত হইল। তিনি স্বীয় হস্ত টানিয়া লইয়া বলিলেন– 'আল্লাহ্র কসম! এই হাত সর্বপ্রথমে কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করিয়াছে।'

ইব্ন ওয়াহাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ তাহের ও আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ আরও বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইব্ন ওয়াহাব বলেন– একদা আমি ইমাম মালিকের নিকট হযরত উসমান (রা)-এর কুরআন মজীদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, উহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। হযরত উসমান (রা)-এর কুরআন মজীদ বলিতে প্রশ্নকারী ইব্ন ওয়াহাব বলেন, হযরত উসমান (রা) কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত কুরআন মজীদ[১] অথবা মদীনা শরীফে রক্ষিত কুরআন মজীদের অনুলিপিখানা বুঝাইয়াছে। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

আরবী লিখন-পঠন পদ্ধতি

জাহেলী যুগে আরবদেশে লেখাপড়ার প্রচলন একেবারেই কম ছিল। হিশাম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সায়েব কালবী প্রমুখ ইতিহাসকারদের বর্ণনায় জানা যায়, জাহেলী যুগে উকায়দার দাওমাহ নামক জনৈক ব্যক্তির ভ্রাতা বিশর ইব্ন আবদুল মালিক আম্বার শহর হইতে আরবী ভাষার লিখন পঠন শিখিয়া মক্কায় ফিরিয়া আসে। অতঃপর সে আবূ সুফিয়ান সখর ইব্ন হারব

১. অর্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য হযরত উসমান (রা) কুরআন মজীদের যে সংকলনখানা নিজে লিখিয়াছিলেন।

ইব্‌ন উমাইয়ার ভগ্নী 'সহবা বিনতে হারব ইব্‌ন উমাইয়া'কে বিবাহ করে। এই সূত্রে সে স্বীয় শ্বশুর হার্‌ব ইব্‌ন উমাইয়া এবং শ্যালক সুফিয়ানকে লিখন পঠন শিক্ষা দেয়। অতঃপর উমর ইব্‌ন খাত্তাব হার্‌ব ইব্‌ন উমাইয়ার নিকট হইতে এবং মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান স্বীয় পিতৃব্য সুফিয়ান ইব্‌ন হারবের নিকট হইতে উহার শিক্ষা লাভ করেন। কেহ কেহ বলেন, 'বাক্কা' নামক জনপদের অধিবাসী 'তায়' গোত্রীয় একদল লোক আম্বার শহর হইতে সর্বপ্রথম আরবী ভাষার লিখন-পঠন শিখিয়া আসে। তাহারা উহাকে অধিকতর উন্নতরূপ দান করিয়া আরব উপদ্বীপে প্রচার করে। এইরূপে আরবী লিখন-পঠন সমগ্র আরবদেশে ছড়াইয়া পড়ে।'

শা'বী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, সুফিয়ান, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ, যুহরী ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, শা'বী বলেন ঃ

'একদা আমরা মুহাজির সাহাবীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম– আপনারা কোথা হইতে আরবী ভাষার লিখন-পঠন শিখিলেন? তাহারা বলিলেন– আম্বার নামক দেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে।'

পুরাকালে আরবী লিখন পদ্ধতি প্রধানত কূফাকেন্দ্রিক ছিল। উযীর আবূ আলী ইব্‌ন মাকাল্লাহ্ উহাকে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দেন। তিনি আরবী ভাষা লিখনের একটি উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। অতঃপর আলী ইব্‌ন হিলাল বাগদাদী ওরফে ইব্‌ন বাওয়াব উহার উন্নতি বিধানে আগাইয়া আসেন। জনগণ এই বিষয়ে তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলে। তাহার প্রবর্তিত পদ্ধতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট।

উপরের আলোচনা দ্বারা আমি বুঝাইতে চাহিতেছি যে, ইসলামের প্রথম যুগে কুরআন মজীদ সংকলিত হইবার কালে যেহেতু আরবী ভাষার লিখন পদ্ধতি উন্নত ও সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে নাই, তাই উহার সংকলিত হইবার কালে উহার আয়াতসমূহের বিষয়ে নহে; বরং উহার শব্দসমূহের লিখন পদ্ধতির বিষয়ে লেখকদের মধ্যে স্বভাবতই মতভেদ দেখা দিয়াছিল। এই বিষয়ে লেখকগণ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইমাম আবূ উবায়দ কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (র) স্বীয় পুস্তক 'ফাযায়েলুল কুরআন'-এ এই বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদও স্বীয় গ্রন্থে উহাকে গুরুত্ব দিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে স্ব-স্ব পুস্তকে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কুরআন মজীদের লিখন সম্পর্কিত তাঁহাদের প্রবন্ধ দুইটি অতীব চমৎকার।

কুরআন মজীদের লিখনশিল্প এস্থলে আমার আলোচ্য বিষয় নহে বিধায় তাঁহাদের প্রবন্ধদ্বয়ের বিস্তারিত আলোচনা হইতে বিরত রহিতেছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম মালিক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হযরত উসমান (রা) কর্তৃক প্রস্তুত কুরআন মজীদ সংকলনের লিখন-রীতি ভিন্ন অন্য কোন লিখন-রীতিতে কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করা বৈধ নহে। অন্যেরা উহাকে অবৈধ বলেন না। তবে তাহারা অক্ষরের রূপ ও নোকতা পরিবর্তনের বিষয়ে একমত নহেন। কেহ কেহ উক্ত পরিবর্তনকে বৈধ এবং কেহ কেহ উহাকে অবৈধ বলেন। অবশ্য আমাদের যুগে কুরআন মজীদের একটি মাত্র সূরাকে, কয়েকটি আয়াতকে, কুরআন মজীদের এক-দশমাংশকে অথবা উহার যেকোন অংশকে পৃথক করিয়া লিখিবার রীতি বহুল প্রচলিত রহিয়াছে। তবে পূর্বযুগের নেককারবৃন্দের (سلف صالحين) অনুসরণই শ্রেয়তর।

নবী করীম (সা)-এর লেখকবৃন্দ

ইমাম বুখারী (র) স্বীয় হাদীস সংকলনে 'নবী করীম (সা)-এর লেখকবৃন্দ'[১] এই শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ সৃষ্টি করত উহাতে বলিয়াছেন ঃ হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন সাব্বাক, যুহরী, প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে আমি ইমাম বুখারী বর্ণনা করিতেছি ঃ

'হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলেন– হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আমাকে বলিলেন যে, 'তুমি তো নবী করীম (সা)-এর নির্দেশে ওহী লিখিতে।' অতঃপর ইমাম বুখারী আলোচ্য হাদীসের অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নির্দেশে হযরত যায়দ কর্তৃক কুরআন মজীদ সংকলিত হইবার ঘটনার বর্ণনায় ইতিপূর্বে উহা বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী, হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) কর্তৃক বর্ণিত لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ غَيْرَ اُوْلِى الضَّرَرِ الخ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইবার ঘটনা সম্পর্কিত হাদীসও বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য পরিচ্ছেদে তিনি হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) ভিন্ন নবী করীম (সা)-এর অন্য কোন লেখকের আলোচনা করেন নাই। ইহা আশ্চর্যজনক বটে। হযরত যায়দ ভিন্ন অন্য লেখক সম্পর্কিত আলোচনা রহিয়াছে, এইরূপ কোন হাদীস সম্ভবত ইমাম বুখারীর নীতিমালায় টিকে নাই। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। নবী করীম (সা)-এর পবিত্র জীবনীতে তাঁহার লেখকগণ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে এইরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়া থাকে।

কুরআন মজীদ সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে

'কুরআন মজীদ সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে' এই শিরোনামায় ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিহাব, উকায়ল, লায়ছ ও সাঈদ ইব্‌ন আফীর আমার (ইমাম বুখারীর) নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রথমে একটি হরফে কুরআন মজীদ শিখাইয়াছিলেন, আমি তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া একটির পর একটি হরফের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে অনুরোধ জানাইতে থাকিলাম। আমার পর্যায়ক্রমিক অনুরোধে তিনি উহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে

১. প্রকৃতপক্ষে ইমাম বুখারী 'লেখকবৃন্দ' এর পরিবর্তে লেখক শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। লেখক শব্দটি দ্বারা তিনি হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-কে বুঝাইয়াছেন। হাফিজ ইব্‌ন হাজার আসকলানী 'ফাতহুল বারী'তে বলিয়াছেন– 'ইমাম ইব্‌ন কাছীর মন্তব্য করিয়াছেন, ইমাম বুখারী 'নবী করীম (সা)-এর লেখকবৃন্দ' এই শিরোনামেও হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) ভিন্ন অন্য কোন লেখকের আলোচনা করেন নাই। অতঃপর ইব্‌ন হাজার বলেন– 'বুখারী শরীফের কোন সংস্করণেই 'লেখকবৃন্দ' শব্দটি দেখিতে পাই নাই, বরং প্রত্যেক সংস্করণই 'লেখক' শব্দটি দেখিতে পাইয়াছি। পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসের সহিত উহা সঙ্গতিপূর্ণ।' অর্থাৎ ইমাম বুখারী আলোচ্য পরিচ্ছেদে শুধু হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-এর আলোচনা করিতে চাহিয়াছেন। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনিই নবী করীম (সা)-এর লেখক হিসাবে কাজ করিয়াছেন। হাফিজ ইব্‌ন হাজার নবী করীম (সা)-এর হিজরতের পূর্বের ও পরের জীবনের লেখকগণের কতিপয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন– নবী করীম (সা)-এর লেখকগণের মধ্যে ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীন, যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম, সাঈদ ইব্‌ন আস ইব্‌ন উমাইয়ার পুত্রদ্বয় খালিদ ও আবান; হানযালা ইব্‌ন রবী আল আসাদী, মুআইকিব ইব্‌ন আবূ ফাতিমা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আরকাম যুহরী, শুরাহবীল ইব্‌ন হাসানাহ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা।

সাতটি হরফে আমাকে কুরআন মজীদ শিখাইলেন।' ইমাম বুখারী(র) উপরোক্ত হাদীসকে প্রায় অনুরূপ অর্থে 'সৃষ্টির প্রারম্ভ' নামক পরিচ্ছেদেও বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিমও উহা ইব্ন শিহাব যুহরী হইতে ইউনুস ও মুআম্মার প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে প্রায় অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীরও উহা উপরোক্ত রাবী (ইব্ন শিহাব) যুহরী হইতে ঊর্ধ্বতন উপরোক্ত সনদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীস বর্ণনা করিবার পর সনদের অন্যতম রাবী যুহরী (র) বলেন ঃ

'আমি জানিতে পারিয়াছি যে, হাদীসে উল্লেখিত সাতটি 'হরফ' (একই অর্থযুক্ত সাত প্রকারের উচ্চারণ রীতি)-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, একই আয়াতকে বিভিন্ন হরফে তিলাওয়াত করিলে উহার অর্থের মধ্যে কোন তারতম্য ঘটে না। হরফ-এর পরিবর্তনে অর্থের বিকৃতি ঘটিয়া হালাল বিষয় হারামে অথবা হারাম বিষয় হালালে পরিণত হয় না।'

ইমাম আবূ উবায়দ কাসিম ইব্ন সাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে 'সাতটি হরফ'-এর উপরোক্ত ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আনাস ইব্ন মালিক, হামীদ আত্তাবীল, ইয়াযীদ, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ ও ইমাম আবূ উবায়দ কাসিম ইব্ন সাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন– আমি ইসলাম গ্রহণ করিবার পর একটি বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয় আমার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই। উক্ত বিষয়টি এই যে, একদা আমি কুরআন মজীদের একটি আয়াতকে একরূপে তিলাওয়াত করিলাম এবং অন্য এক ব্যক্তি উহাকে অন্যরূপে তিলাওয়াত করিল। আমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি অমুক আয়াতটি আমাকে এইরূপে শিখান নাই কি? তিনি বলিলেন– 'হ্যাঁ! আমি তোমাকে উহা এইরূপেই শিখাইয়াছি।' অতঃপর তিনি বলিলেন– 'একদা হযরত জিবরাঈল (আ) ও হযরত মীকাঈল (আ) আমার নিকট আসিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) আমার ডান পার্শ্বে এবং হযরত মীকাঈল (আ) আমার বাম পার্শ্বে বসিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন, কুরআন মজীদকে একটি 'হরফ'-এ তিলাওয়াত করুন। ইহাতে হযরত মীকাঈল (আ) বলিলেন, তাঁহার (হযরত জিবরাঈল (আ)-এর) নিকট 'হরফ' এর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে অনুরোধ জানান। এইরূপে তিনি 'সাতটি হরফ' পর্যন্ত পৌঁছিলেন। প্রত্যেকটি 'হরফ'ই যথেষ্ট ও সঠিক।' ইমাম নাসাঈ উপরোক্ত হাদীস হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আনাস (রা), হামীদ আত্তাবীল ইয়াযীদ ইব্ন হারূন ও ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ কাত্তান প্রমুখ রাবীর সনদে প্রায় অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে ইব্ন আবূ আদী, মাহমুদ ইব্ন মাইমূন যা'ফরানী এবং ইয়াহিয়া ইব্ন আইউব উহা উপরোক্ত রাবী হামীদ আত্তাবীল হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা), হযরত আনাস (রা), হামীদ, হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ, আবুল ওয়ালীদ, মুহাম্মদ ইব্ন মারযূক ও ইমাম ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কুরআন মজীদ সাতটি 'হরফ'-এ নাযিল হইয়াছে।' উক্ত রিওয়ায়েতে দেখা যাইতেছে, হযরত উবাই ইব্ন কা'ব ও হযরত আনাস ইব্ন মালিকের মধ্যে হযরত উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) রাবী হিসাবে

অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন। হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ঈসা, ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন ঃ

'একদা আমি মসজিদে অবস্থান করিতেছিলাম। এই সময়ে একটি লোক মসজিদে প্রবেশ করিল। লোকটি কুরআন মজীদের একটি অংশ বিশেষ উচ্চারণে তিলাওয়াত করিল যাহা আমার নিকট সঠিক বিবেচিত হইল না। অতঃপর আরেকটি লোক মসজিদে প্রবেশ করিল। লোকটি কুরআন মজীদের সেই অংশ অন্যরূপ উচ্চারণে তিলাওয়াত করিল। আমরা সকলে নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই লোকটি কুরআন মজীদের একটি অংশ বিশেষ উচ্চারণে তিলাওয়াত করিয়াছে যাহা আমার নিকট সঠিক বিবেচিত হয় নাই। পক্ষান্তরে ওই লোকটি কুরআন মজীদের সেই অংশটি অন্যরূপ উচ্চারণে তিলাওয়াত করিয়াছে। নবী করীম (সা) বলিলেন– তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ উচ্চারণে উহা তিলাওয়াত করো। তাহারা নিজ নিজ উচ্চারণে উহা তিলাওয়াত করিল। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'তোমাদের সকলের তিলাওয়াতই সঠিক হইয়াছে।' উক্ত মন্তব্য আমার নিকট ভারী বোধ হইল। আমি অমুসলিম থাকাকালেও এইরূপ (সন্দিগ্ধ) ছিলাম না। তিনি আমার অব্যবস্থিতচিত্ততা উপলব্ধি করিয়া আমার বক্ষে মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। আমি ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়া গেলাম। আমি যেন ভয়ে আল্লাহ্র (আকাশের) দিকে তাকাইতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন– "হে উবাই! আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন– তুমি 'একটি হরফ'-এ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করো। আমি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আবেদন জানাইলাম–প্রভু হে! আমার উম্মতের জন্য সহজ করুন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন– তুমি 'দুইটি হরফ'-এ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করো। আমি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আবেদন জানাইলাম– প্রভু হে! আমার উম্মতকে সুযোগ প্রদান করুন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন– তুমি 'সাতটি হরফ'-এ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করো। আর প্রতিবারের আবেদনের পরিবর্তে তোমার একটি করিয়া প্রার্থনা গৃহীত হইবে। আমি আরয করিলাম– প্রভু হে! আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়া দিন! প্রভু হে! আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়া দিন!! তৃতীয় প্রার্থনাটি আমি সেই দিনের জন্য রাখিয়া দিলাম, যেদিন সকল মানুষ, এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ)-ও আমার নিকট সাহায্য প্রার্থী হইবেন।"

ইমাম মুসলিম (র) উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী ইসমাঈল ইব্ন খালিদের উর্ধ্বতন উপরোক্ত সনদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উবাই ইব্ন কা'ব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, ঈসা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ঈসা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ, মুহাম্মদ ইব্ন ফুযায়েল, আবূ কুরায়ব ও ইমাম ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে 'একটি হরফে' কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে আদেশ করিলেন। আমি আরয করিলাম– প্রভু হে! আমার উম্মতের জন্য আসান করুন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন– তুমি উহা 'দুইটি হরফে' তিলাওয়াত করো। আমি আরয করিলাম– প্রভু হে! আমার উম্মতের জন্য সহজ করুন। উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা

আমাকে জান্নাতের সাতটি দরওয়াজার সংখ্যার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া 'সাতটি হরফে' উহা তিলাওয়াত করিতে আদেশ করিলেন। প্রত্যেকটি হরফই ফলদায়ক ও যথেষ্ট।'

হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর, হিশাম ইব্‌ন সা'দ, ইব্‌ন ওয়াহাব, ইউনুস ও ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন– একদা আমি একটি লোককে 'সূরা নাহল'-এর একটি অংশ বিশেষ উচ্চারণে তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম। উহা আমার উচ্চারণ হইতে পৃথক ছিল। আরেকটি লোককে ভিন্ন উচ্চারণে উহা তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম। আমি উভয়কে লইয়া নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার খেদমতে আরয করিলাম– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই লোক দুইটিকে 'সূরা নাহল'-এর একটি অংশ দুইটি পৃথক উচ্চারণে তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম। 'কে তোমাদিগকে ইহা শিখাইয়াছেন'– আমি তাহাদিগকে ইহা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, নবী করীম (সা) ইহা আমাদিগকে শিখাইয়াছেন। আমি তাহাদিগকে বলিলাম– আমি নিশ্চয় তোমাদিগকে নবী করীম (সা)-এর নিকট লইয়া যাইব। কারণ, নবী করীম (সা) আমাকে যে কিরাআত শিখাইয়াছেন, তোমাদের কিরাআত উহা হইতে পৃথক। নবী করীম (সা) তাহাদের একজনকে বলিলেন– তুমি পড়ো তো। লোকটি পড়িল। নবী করীম (সা) বলিলেন– তোমার পড়া শুদ্ধ ও সঠিক হইয়াছে। অতঃপর অন্য লোকটিকে বলিলেন– তুমি পড়ো তো! লোকটি পড়িল। তিনি বলিলেন– তোমার পড়া শুদ্ধ ও সঠিক হইয়াছে। হযরত উবাই (রা) বলেন, ইহাতে আমার মনে শয়তান ওয়াসওয়াসা (সন্দেহ) আনিয়া দিল। আমার চেহারা লাল হইয়া গেল। নবী করীম (সা) আমার চেহারায় উহা দর্শন করিয়া আমার বক্ষে মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। অতঃপর বলিলেন– 'আয় আল্লাহ্! তুমি তাহার নিকট হইতে শয়তানকে দূর করিয়া দাও। হে উবাই! একদা আমার নিকট আমার প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ হইতে জনৈক আগন্তুক আগমন করিয়া বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা একটি মাত্র হরফে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে আপনাকে আদেশ করিতেছেন। আমি আল্লাহ্ পাকের কাছে আরয করিলাম– প্রভু হে! আমার উম্মতকে আসান দান করুন। আগন্তুক দ্বিতীয়বার আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা দুইটি হরফে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে আপনাকে আদেশ করিতেছেন। আমি প্রার্থনা করিলাম–প্রভু হে! আমার উম্মতকে সুবিধা দান করুন। আগন্তুক তৃতীয়বার আমার নিকট আগমন করিয়া তিনটি হরফে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার আদেশ প্রদানের কথা বলিলেন। আমি পূর্বের ন্যায় আবেদন জানাইলাম। আগন্তুক চতুর্থবার আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা সাতটি হরফে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে আপনাকে আদেশ করিতেছেন। আর প্রতিবারের আবেদনের পরিবর্তে আপনার একটি করিয়া প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে। আমি বলিলাম– হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে ক্ষমা করো। হে আমার প্রভু! আমার উম্মতকে ক্ষমা করো। তৃতীয়বারের প্রার্থনাটি আমি কিয়ামতের দিনে আমার উম্মতের শাফাআতের উদ্দেশ্যে রাখিয়া দিয়াছি।' উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি ঃ হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর হৃদয়ে উদ্রিক্ত যে সন্দেহের উল্লেখ উপরে বর্ণিত হাদীসে রহিয়াছে, উহা দূর করিবার জন্যই নবী করীম (সা) (আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী) তাহাকে কুরআন মজীদের অংশবিশেষ তিলাওয়াত করিয়া

শুনাইয়াছিলেন। নবী করীম (সা)-এর উক্ত তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল– নবী করীম (সা)-এর সত্যবাদিতা হযরত উবাই (রা) অন্তরে বসাইয়া দেওয়া এবং উহা দ্বারা তাঁহার সন্দিহান মনের সন্দেহ রোগ বিদূরিত করা। এইরূপ সন্দেহ রোগের চিকিৎসার জন্য নবী করীম (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বায়্যিনাহ নাযিল করিয়াছেন। উহাতে নিম্নোক্ত আয়াত অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে ঃ

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ـ

'এইরূপ রাসূল যিনি পবিত্র সূরাসমূহ তিলাওয়াত করিয়া শুনান যাহাতে দৃঢ় যুক্তিভিত্তিক নীতিমালা ও আদেশ-নিষেধ রহিয়াছে।'

নবী করীম (সা) এইরূপে হযরত উমর (রা)-কে 'সূরা ফাতহ' তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছিলেন। হুদায়বিয়াহ হইতে নবী করীম (সা)-এর প্রত্যাবর্তনের পথে উপরোক্ত সূরা নাযিল হইয়াছিল। ইতিপূর্বে (হুদায়বিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হইবার কালে) হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা) ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রতি একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর অব্যবস্থচিত্ততা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই নবী করীম (সা) তাঁহাকে উক্ত সূরা তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছিলেন। উক্ত সূরায় সুসংবাদ পূর্ণ নিম্নোক্ত আয়াত অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে ঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ـ

'আল্লাহ্ নিশ্চয় তাঁহার রাসূলের স্বপ্নকে সন্দেহাতীত রূপে বাস্তবায়িত করিয়া দেখাইবেন। তোমরা ইনশা আল্লাহ্ ভীতি মুক্ত হইয়া মসজিদে হারামে নিশ্চিতরূপে প্রবেশ করিবে।)

হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ লায়লা, মুজাহিদ, হাকাম, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর, মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ইমাম ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'একদা নবী করীম (সা) বনূ গিফার গোত্রের জলাশয়ের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়ে হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আদেশ করিতেছেন যে, আপনি স্বীয় উম্মতকে একটি হরফে কুরআন মজীদ শিখাইবেন। নবী করীম (সা) বলিলেন– আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমার উম্মত উহা করিতে সমর্থ হইবে না। হযরত জিবরাঈল (আ) দ্বিতীয়বার তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আদেশ করিতেছেন যে, আপনি স্বীয় উম্মতকে দুইটি হরফে কুরআন মজীদ শিখাইবেন। নবী করীম (সা) বলিলেন– আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি। আমার উম্মত উহা করিতে সমর্থ হইবে না। হযরত জিবরাঈল (আ) তৃতীয়বার তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আদেশ করিতেছেন যে, আপনি স্বীয় উম্মতকে তিনটি হরফে কুরআন মজীদ শিখাইবেন। নবী করীম (সা) বলিলেন– আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নাজাত প্রার্থনা করিতেছি। আমার উম্মত উহা করিতে সমর্থ হইবে না। হযরত জিবরাঈল (আ) চতুর্থবার তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আদেশ করিতেছেন যে, আপনি স্বীয় উম্মতকে সাতটি হরফে কুরআন মজীদ শিখাইবেন। তাহারা সাতটি হরফের যে কোন হরফে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিলেই তাহাদের তিলাওয়াত সহীহ হইবে।'

ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম নাসায়ীও উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী শু'বা হইতে উর্ধ্বতন উপরোক্ত সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ কর্তৃক হযরত উবাই ইব্ন কা'ব হইতে বর্ণিত একটি রিওয়ায়েতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ

'নবী করীম (সা) বলেন যে, একদা আমাকে কুরআন মজীদ শিক্ষা দেওয়া হইল। অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করা হইল, এক হরফে অথবা দুই হরফে? আমার সহিত অবস্থানকারী ফেরেশতা আমাকে শিখাইয়া দিলেন– আপনি বলুন, দুই হরফে। অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করা হইল, দুই হরফে অথবা তিন হরফে? আমার সহচর ফেরেশতা আমাকে শিখাইয়া দিলেন– আপনি বলুন, তিন হরফে। এইরূপে তিনি (প্রশ্নকর্তা ফেরেশতা) সাত হরফ পর্যন্ত পৌঁছিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন– "উহার প্রত্যেকটি হরফই আরোগ্যদাতা ও যথেষ্ট। যেমন যদি আপনি বলেন ঃ سَمِيْعًا عَلِيْمًا عَزِيْزًا حَكِيْمًا (তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়) অর্থাৎ যদি আপনার তিলাওয়াতে অর্থগত ভ্রান্তি না আসে, অন্য কথায় যদি না আযাব সম্পর্কিত আয়াতকে রহমত সম্পর্কিত আয়াতের সহিত অথবা রহমত সম্পর্কিত আয়াতকে আযাব সম্পর্কিত আয়াতের সহিত মিলাইয়া তাল গোল পাকাইয়া দেন (তাহা হইলে সকল হরফই ঠিক)।' ছাবিত ইব্ন কাসিম (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর উপরোক্তরূপ বাণী এবং হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর অনুরূপ উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবু যর, আসিম, যায়দাহ, হুসায়ন ইব্ন আলী জা'ফী ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'আহজারুল মারআ' নামক স্থানে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সহিত নবী করীম (সা)-এর সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হইল। নবী করীম (সা) তাঁহাকে বলিলেন– আমি নিরক্ষর উম্মতের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। তাহাদের মধ্যে গোলাম, কিশোর ও অতিশয় বৃদ্ধ নর-নারী রহিয়াছে। ইহাতে হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন– 'তাহাদিগকে সাতটি 'হরফ'-এ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে আদেশ দিন।' ইমাম তিরমিযী (র) উহা হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যর, আসিম ইব্ন আবূ নাজম প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইমাম আহমদ উহা প্রায় উপরোক্ত অর্থ হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যর, আসিম, হাম্মাদ ও খালিদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় ইহাও বলা হইয়াছে, 'নিশ্চয়ই কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ হইয়াছে।' হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী ইব্ন খারাশ, ইবরাহীম ইব্ন মুহাজির, সুফিয়ান, ওয়াকী', আবদুর রহমান ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা কয়িাছেন ঃ

'একদা আহজারুল মারআ নামক স্থানে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সহিত নবী করীম (সা)-এর সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-কে বলেন– আপনার উম্মত কুরআন মজীদকে 'সাতটি হরফে' তিলাওয়াত করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি যে 'হরফে' উহা তিলাওয়াত করিতে পারে, সে যেন উহা সেই 'হরফেই' তিলাওয়াত করে। উহা যেন সে পরিত্যাগ না করে।' উপরোক্ত সনদের আবদুর রহমান নামক রাবীর বর্ণনায় উহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন– আপনার উম্মতের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি রহিয়াছে। কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন 'হরফে' (কুরআন মজীদ) তিলাওয়াত

করিলে সে যেন উহাতে বীতস্পৃহ হইয়া উহা পরিত্যাগ না করে।' উক্ত সনদ সহীহ। তবে সিহাহ সিত্তাহ সংকলকগণ উপরোক্ত সনদে উহা বর্ণনা করেন নাই।

হযরত সুলায়মান ইব্‌ন সুরদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, শরীক, ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা, সুদ্দী ও ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলেন- একদা আমার নিকট দুইজন ফেরেশতা আগমন করিলেন। তাঁহাদের একজন আমাকে বলিলেন, আপনি পড়ুন। অন্যজন প্রশ্ন করিলেন- কয়টি হরফে? প্রথমজন বলিলেন- একটি হরফে। দ্বিতীয়জন বলিলেন- তাঁহার জন্য বৃদ্ধি করুন। এইরূপে তিনি সাতটি হরফ পর্যন্ত পৌঁছিলেন।

সুলায়মান ইব্‌ন সুরদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, আওয়াম ইব্‌ন হাওশাব, ইসহাক আযরাক, আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম ও ইমাম নাসায়ী তাঁহার 'আল-ইয়াওম-ওয়াল্লাইল' নামক পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

সুলায়মান ইব্‌ন সুরদ বলেন- 'একদা হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব দুইজন লোককে লইয়া নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের একজনের কিরাআত অন্যজনের কিরআত হইতে পৃথক ছিল।' অতঃপর রাবী ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসের ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। আহ্‌মদ ইব্‌ন মুনী' অনুরূপভাবে উহা সুলায়মান ইব্‌ন সুরদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, আওয়াম ও ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূনের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ইব্‌ন সুরদ, জনৈক আবদী (ইব্‌ন জারীর তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছেন), আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, ইয়াহিয়া ইব্‌ন আদম, আবূ কুরায়েব ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন- একদা আমি মসজিদে গিয়া একটি লোককে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম। আমি তাহাকে প্রশ্ন করিলাম- তোমাকে কে ঐরূপ তিলাওয়াত শিখাইয়াছেন? লোকটি বলিল- নবী করীম (সা)। আমি তাহাকে নবী করীম (সা)-এর নিকট লইয়া গিয়া আরয করিলাম- হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই লোকটিকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে বলুন। লোকটি (নবী করীম (সা)-এর নির্দেশে) কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিল। নবী করীম (সা) বলিলেন- 'তুমি শুদ্ধ পড়া পড়িয়াছ।' আমি আরয করিলাম- হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আপনি যে উহা আমাকে এইরূপে পড়াইয়াছেন। নবী করীম (সা) বলিলেন- 'তুমিও শুদ্ধ পড়িয়াছ, শুদ্ধ পড়িয়াছ এবং শুদ্ধ পড়িয়াছ।' অতঃপর তিনি আমার বুকে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন- 'আয় আল্লাহ্! তুমি উবাইর অন্তর হইতে সন্দেহ দূর করিয়া দাও।' আমি ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়া গেলাম। ভয়ে আমার পেট ফুলিয়া উঠিল। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন- 'একদা দুইজন ফেরেশতা আমার নিকট আসিলেন। তাঁহাদের একজন আমাকে বলিলেন, আপনি 'এক হরফে' কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করুন। অন্যজন বলিলেন- তাঁহার জন্যে 'হরফ' সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। আমি বলিলাম- আমার জন্যে 'হরফের' সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। প্রথমজন বলিলেন- উহা 'দুই হরফে' তিলাওয়াত করুন। এইরূপে তিনি 'সাত হরফ' পর্যন্ত পৌঁছিলেন এবং (আমাকে) বলিলেন- উহা 'সাত হরফে' তিলাওয়াত করুন।

নবী করীম (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব, সুলায়মান ইব্‌ন সুরদ, সাতীর আবদী, আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, হাজ্জাজ ও আবূ উবায়দ উহা প্রায় অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ইব্‌ন সুরদ, ইয়াহিয়া

ইব্‌ন ইয়া'মার কাতাদাহ, হুমাম, ওয়ালীদ তায়ালেসী ও ইমাম আবূ দাউদ (র)-ও উক্ত হাদীস অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, উক্ত হাদীস প্রায় ক্ষেত্রেই হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব হইতে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনা দ্বারা মনে হয়, সুলায়মান ইব্‌ন সরূদ খুযাঈ উহার সাক্ষী। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত আবূ বুকরাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তদীয় পুত্র আবদুর রহমান, আলী ইব্‌ন যায়দ, হাম্মাদ ইব্‌ন সালমাহ, আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলেন যে, একদা হযরত জিবরাঈল (আ) ও হযরত মীকাঈল (আ) আমার নিকট আসিলেন। হযরত জিবরাইল বলিলেন– আপনি একটি মাত্র হরফে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবেন। ইহাতে হযরত মীকাঈল (আমাকে) বলিলেন– তাঁহাকে (হরফের সংখ্যা) বৃদ্ধি করিতে বলুন। হযরত জিবরাঈল বলিলেন– 'আপনি কুরআন মজীদকে 'সাতটি হরফে' তিলাওয়াত করিতে পারিবেন। উহার প্রত্যেকটি আরোগ্যদাতা ও যথেষ্ট। এই অনুমতি ততক্ষণ রহিয়াছে যতক্ষণ না আপনি রহমতের আয়াতকে আযাবের আয়াতের সহিত মিলাইয়া তালগোল পাকাইয়া না দেন।'

ইমাম ইব্‌ন জারীরও উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী হাম্মাদ ইব্‌ন সালমাহ হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং হাম্মাদ ইব্‌ন সালমাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়দ ইব্‌ন খাব্বাব ও আবূ কুরায়েব এই অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি উহার শেষাংশে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত বর্ণনাটি সংযোজন করিয়াছেন ঃ 'হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন– যেমন আপনি বলিয়া থাকেন– هلم (তুমি আসো) কিংবা تعال (তুমি আসো)।'

হযরত সামুরাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, কাতাদাহ, হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা, বাহায, আফ্‌ফান ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– কুরআন মজীদ 'সাতটি হরফে' নাযিল হইয়াছে। উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। তবে সিহাহ সিত্তার সংকলক মুহাদ্দিসগণ উহা উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন নাই।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, আবূ হাযিম, আনাস ইব্‌ন ইয়ায ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়ছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কুরআন মজীদ সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে, কুরআন মজীদ সম্পর্কে সন্দেহ করা কুফর। নবী করীম (সা) ইহা তিনবার উচ্চারণ করিলেন। উহার যতটুকু তোমরা জানিতে পারো, ততটুকুর উপর আমল কর। আর উহার যতটুকু তোমরা জানিতে না পার, ততটুকু আলিমের নিকট লইয়া যাও (এবং তাহার নিকট হইতে উহা জানিয়া লও)।' ইমাম নাসায়ী উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবূ যুমরাহ আনাস ইব্‌ন ইয়ায হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আনাস ইব্‌ন ইয়ায হইতে কুতাইবার অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উম্মে আইউব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইয়াযীদ, তৎপুত্র উবায়দুল্লাহ্‌, সুফিয়ান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– কুরআন মজীদ 'সাতটি হরফে' নাযিল হইয়াছে। উহার যে কোন হরফে তুমি উহা পড়িলেই চলিবে। উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। তবে সিহাহ সিত্তার কোন সংকলক উহা উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন নাই।

হযরত আবূ জুহাম আনসারী হইতে ধারাবাহিকভাবে খাযরামীর মুক্তদাস মুসলিম ইব্ন সাঈদ (এখানে অন্যেরা 'বিশর ইব্ন সাঈদ' নাম উল্লেখ করিয়াছেন), ইয়াযীদ ইব্ন খাসীফাহ, ইসমাঈল ইব্ন জা'ফর ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'একদা দুইটি লোকের মধ্যে কুরআন মজীদের একটি আয়াতের বিষয় লইয়া মতভেদ দেখা দিল। তাহাদের প্রত্যেকেরই দাবী ছিল– নবী করীম (সা) তাহাকে উহা এইরূপ শিখাইয়াছেন। তাহারা উভয়ে নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিল। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'এই কুরআন মজীদ নিশ্চয় সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে। তোমরা উহা লইয়া ঝগড়া করিও না। কারণ, উহা লইয়া ঝগড়া করা কুফর।'

আবূ উবায়দ উহা উপরোক্তরূপে রাবীর নামে সন্দেহের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ অবশ্য উহা রাবীর নামে কোনরূপ সন্দেহ ব্যতিরেকে বর্ণনা করিয়াছেন। তৎকর্তৃক উল্লেখিত রাবীর নামই সহীহ। ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি এই ঃ হযরত আবূ যুহাম (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বাসার ইব্ন সাঈদ (আবূ উবায়দ এই স্থলে সন্দেহবশত 'মুসলিম ইব্ন সাঈদ' নামটি উল্লেখ করিয়াছেন), ইয়াযীদ ইব্ন খাসীফাহ, সুলাইমান ইব্ন বিলাল, আবূ সালমাহ খুযাঈ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'একদা দুইটি লোক কুরআন মজীদের একটি আয়াত লইয়া মতানৈক্যে পতিত হইল। তাহাদের একজন বলিল– আমি এই আয়াত এইরূপে নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে শিখিয়াছি। অন্যজন বলিল– আমি উহা এইরূপে নবী করীম (সা) নিকট হইতে শিখিয়াছি। অতঃপর তাহারা তৎসম্বন্ধে নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন– কুরআন মজীদ 'সাতটি হরফে' নাযিল হইয়াছে। অতএব তোমরা কুরআন মজীদ লইয়া ঝগড়া করিও না। কুরআন মজীদ লইয়া ঝগড়া করা কুফর। উক্ত হাদীসের সনদও সহীহ। তবে সিহাহ সিত্তার সংকলকগণ উহা উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন নাই।

হযরত আমর ইব্ন 'আসের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আবূ কায়স (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বাসার ইব্ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইয়াযীদ ইব্ন হাদী, লায়েছ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালেহ ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'একদা জনৈক ব্যক্তি কুরআন মজীদের একটি আয়াত তিলাওয়াত করিলে হযরত আমর ইব্ন আস (রা) বলিলেন, উহা এইরূপ হইবে। তিনি যে কিরাআতকে শুদ্ধ বলিলেন, তাহা উক্ত ব্যক্তির কিরাআত হইতে পৃথক ছিল। লোকটি বলিল, নবী করীম (সা) উহা আমাকে এইরূপেই শিখাইয়াছেন। ইহাতে তাহারা উভয়ে নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের মতভেদের বিষয়টি উল্লেখ করিলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন– এই কুরআন মজীদ নিশ্চয় সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে। উহার যে কোন হরফেই তোমরা উহাকে পড়, তোমাদের পড়া শুদ্ধ হইবে। তোমরা কুরআন মজীদ লইয়া ঝগড়া করিও না। কারণ, কুরআন মজীদ লইয়া ঝগড়া করা কুফর।'

আবূ কায়স হইতে ধারাবাহিকভাবে বাসার ইব্ন সাঈদ, ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উসামাহ ইব্ন হাদী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ, আবূ সালমা খুযাঈ এবং ইমাম আহমদও উহা প্রায় অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত সনদও সহীহ।

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান, সালমা, ইব্‌ন আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান, ওকায়েল ইব্‌ন খালিদ, হায়াত ইব্‌ন শুরায়হ, ইব্‌ন ওহাব, ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব মাত্র একটি বিষয়ে (من باب واحد) ও মাত্র একটি হরফে (من حرف واحد) নাযিল হইত; কিন্তু কুরআন মজীদ সাতটি বিষয়ে সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে। উক্ত সাতটি বিষয় (باب) হইতেছে ঃ (১) সতর্ক বাণী; (২) আদেশসূচক বাণী; (৩) হালাল; (৪) হারাম; (৫) নির্দিষ্টার্থক বাণী; (৬) অনির্দিষ্টার্থক বাণী ও (৭) দৃষ্টান্তসূচক বাণী। তোমরা উহাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বানাইবে। তোমাদের প্রতি যে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, উহা পালন করিবে। তোমাদিগকে যাহা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা হইতে বিরত থাকিবে। উহাতে বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করিবে। উহার নির্দিষ্টার্থক বাণী মানিয়া চলিবে এবং উহার অনির্দিষ্টার্থক বাণীর প্রতি ঈমান আনিবে। আর বলিবে– 'আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিলাম। উহার সমুদয় আয়াতই আমাদের প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ হইতে আসিয়াছে।' অতঃপর ইমাম ইব্‌ন জারীর উপরোক্ত হাদীস কাসেম ইব্‌ন আবদুর রহমান হইতে ধারাবাহিকভাবে যুমরাহ ইব্‌ন হাবীব, মুহারেবী ও আবূ কুরায়বের সূত্রে হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী না হইয়া হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

মুহাদ্দিস আবূ উবায়দ বলেন– বিপুল সংখ্যক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কুরআন মজীদ 'সাতটি হরফে' নাযিল হইয়ছে। কিন্তু নিম্নোক্ত হাদীসে সাতটি হরফের পরিবর্তে ভিন্ন সংখ্যক 'হরফ'ও উল্লেখিত হইয়াছে। হযরত সামুরাহ ইব্‌ন জুনদুব হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, কাতাদাহ,হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা ও আফ্‌ফান আমার (আবূ উবায়দের) নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– কুরআন মজীদ সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে। আবূ উবায়দ বলেন– সাতটি হরফই সঠিক বলিয়া আমি মনে করি। কারণ, উহাই বিপুল সংখ্যক রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে। এ কথার তাৎপর্য ইহা নহে যে, কুরআন মজীদের নির্দিষ্ট একটি শব্দকে সাত প্রকারের উচ্চারণে তিলাওয়াত করা যায়। প্রকৃতপক্ষে কুরআন মজীদে সর্বসাকুল্যে মোট সাতটি গোত্রের ভাষা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। উহার কোন শব্দের উচ্চারণ হয়তো একটি গোত্রের উচ্চারণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আবার অন্য কোন শব্দের উচ্চারণ হয়তো অন্য এক গোত্রের উচ্চারণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আবার অন্য কোন শব্দের উচ্চারণ হয়তো অন্য এক গোত্রের উচ্চারণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এইরূপে মোট সাতটি গোত্রের উচ্চারণ হইতে উহার শব্দ সম্ভারের উচ্চারণ গৃহীত হইয়াছে। উক্ত সৌভাগ্যে যে সকল গোত্র সৌভাগ্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের সকলের সৌভাগ্য আবার সমান নহে; বরং এই সৌভাগ্যে এক গোত্র আরেক গোত্রকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ এক গোত্র হইতে অন্য গোত্র অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক উচ্চারণ গৃহীত হইয়াছে। শীঘ্রই বর্ণিতব্য বিপুল সংখ্যক হাদীসে উহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।'

মুহাদ্দিস আবূ উবায়দ আরও বলেন– হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালেহ ও কালবী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কুরআন মজীদ সাতটি ভাষা-রীতিতে নাযিল হইয়াছে। উহার পাঁচটি হইতেছে– হাওয়াযেন (هوازن) গোত্রের অন্তর্গত আল-আজার

(العجر) শাখা গোত্রের ভাষারীতি।' আবূ উবায়দ বলেন– আল আজার শাখা গোত্রের চারিটি উপগোত্র বা উপশাখা রহিয়াছে। উহা হইতেছে ঃ (১) বনু আসআদ ইব্‌ন বকর (بنوا سعد ابن بكر) (২) খায়ছাম ইব্‌ন বকর (خيثم ابن بكر) (৩) নসর ইব্‌ন মুআবিয়াহ (نصر ابن معاويه) (৪) ছাকীফ (ثقيف) (৫) তামীম গোত্রের অধস্তন পুরুষ বনু দারম (بنو دارم)।'

আবূ আমা ইব্‌ন আ'লা মন্তব্য করিয়াছেন– 'আরবদের মধ্যে বিশুদ্ধতম ভাষায় কথা বলে হাওয়াযেন গোত্রের ঊর্ধ্বতন অংশ।' উক্ত অংশই আল-আজার নামে অভিহিত হইয়াছে। হযরত উমর (রা)-এর উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন– 'কুরআন মজীদের সংকলনে কুরায়শ এবং ছাকীফ গোত্রের লোক ভিন্ন অন্য কেহ যেন উচ্চারণ বলিয়া না দেয়।' ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন– 'ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাষারীতি হইতেছে (৬) কুরায়েশের ভাষারীতি এবং (৭) খুযাআহ গোত্রের ভাষারীতি। উক্ত রিওয়ায়েত হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে কাতাদাহ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সহিত কাতাদাহর সাক্ষাৎ লাভ ঘটে নাই।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসীন ইব্‌ন আবদুর রহমান, হাশীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাবী উবায়দুল্লাহ্ বলেন– হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট কুরআন মজীদের কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উহার অর্থ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক স্বীয় সমর্থনে আরব কবিদের কবিতা উদ্ধৃত করিতেন। সাঈদ অথবা মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বিশ্‌র, হাশীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) কুরআন মজীদের وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ আয়াতের অন্তর্গত وسق শব্দের অর্থ করিয়াছেন جمع (সে একত্রিত করিয়াছে)। প্রমাণস্বরূপ তিনি নিম্নোক্ত কবিতা চরণটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

قد اتسقن لو يجدن سائقا

অর্থাৎ চালক পাইলে তাহারা একত্রিত হইত। উল্লেখ্য, وسق ও اتسق। এই উভয় শব্দ একই ধাতু و - س - ق হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে হেসীন, হাশীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) فاذا هم بالساهرة আয়াতের অন্তর্ভুক্ত الساهرة। শব্দের অর্থ করিয়াছেন– الارض। স্থলভাগ। প্রমাণস্বরূপ তিনি কবি উমাইয়া ইব্‌ন আবূ সলতের নিম্নোক্ত কবিতা চরণটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

وعندهم لحم بحر ولحم ساهرة

'তাহাদের নিকট সমুদ্রের গোশত এবং স্থলভাগের গোশত উভয়ই রহিয়াছে।[১]

---

১. এখানে উল্লেখিত কবিতা চরণটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। لسان العرب। নামক অভিধানে এইস্থলে নিম্নোক্ত কবিতাচরণ দুইটি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) কর্তৃক উদ্ধৃত বলিয়া দাবী করা হইয়াছে ঃ

وفيها لحم ساهرة وبحر - وما فاهو به ابدا مقيم

'তথায় স্থলভাগ ও জলভাগ উভয় স্থানের গোশত রহিয়াছে। আর তাহারা যাহা বলে, তাহা অটুট থাকে।'

ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাজির হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– আমি কুরআন মজীদের فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এই অংশের অর্থ জানিতাম না। একদা দুইজন বেদুঈন একটি কূপকে কেন্দ্র করিয়া ঝগড়া করিতেছিল। তাহাদের একজন আকেরজনকে বলিল– انا فطرتها - انا ابتدأتها আমিই উহাকে সর্বপ্রথম নির্মাণ করিয়াছি; আমিই উহার গোড়া পত্তন করিয়াছি। (তাহার শব্দ প্রয়োগে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) উপরোক্ত শব্দের অর্থ জানিতে পারিলেন।) উক্ত রিওয়ায়েতের সনদও সহীহ।

উপরে বর্ণিত রিওয়ায়েতসমূহের কোন কোন রিওয়ায়েত বর্ণনা করিবার পর ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র) বলেন– 'ইহা প্রমাণিত সত্য যে, কুরআন মজীদ আরবের সকল গোত্রের ভাষায় নাযিল হয় নাই; বরং উহা সংখ্যা সাতের অধিক। এমনকি উহার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। পক্ষান্তরে কুরআন মজীদ মাত্র সাতটি ভাষারীতিতে নাযিল হইয়াছে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, যাহারা সংশ্লিষ্ট হাদীস نزل القران على سبعة احرف -এর এইরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করেন যে, কুরআন মজীদে সাত শ্রেণীর বিষয় যথা আদেশ, নিষেধ, উৎসাহিতকরণ, নিরুৎসাহকরণ, কাহিনী, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি বা অনুরূপ সাতটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের ব্যাখ্যা যে সঠিক নহে এবং পূর্বোল্লেখিত ব্যাখ্যাই (সাতটি ভাষারীতি বা শব্দের সাতটি উচ্চারণরীতি) যে সঠিক, তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, পূর্বযুগীয় কোন ইমাম অথবা কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কি উক্ত হাদীসের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন? যাহারা বলেন, কুরআন মজীদ সাত শ্রেণীর বিষয় যথা আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা এইরূপ দাবী করেন নাই যে, উহা نزل القران على سبعة احرف হাদীসাংশের ব্যাখ্যা। তাহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঠিক ও শুদ্ধই বটে। প্রকৃতপক্ষে নবী করীম (সা) এবং একদল সাহাবী হইতেই বর্ণিত হইয়াছে ঃ نزل القران على سبعة ابواب الجنة

'কুরআন মজীদ নিশ্চয় জান্নাতের সাতটি দরজায় নাযিল হইয়াছে।' ব্যাখ্যাকারদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা উক্ত হাদীসেরই ব্যাখ্যা। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উক্ত হাদীস– نزل القران على سبعة ابواب الجنة ইতিপূর্বে হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) ও হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন– "জান্নাতের সাতটি দরজার তাৎপর্য হইতেছে কুরআন মজীদে বর্ণিত সাত শ্রেণীর বিষয় ঃ আদেশ, নিষেধ, উৎসাহিতকরণ, নিরুৎসাহকরণ, কাহিনী,দৃষ্টান্ত ইত্যাদি। উহা এই কারণে 'জান্নাতের সাতটি দরজা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে যে, বান্দা সেইগুলি যথাযথভাবে পালন করিলে তাহার জন্যে জান্নাতের সাতটি দ্বারই উন্মুক্ত তথা ওয়াজিব ও প্রাপ্য হইয়া যায়।" অতঃপর ইমাম ইব্‌ন জারীর দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহার সারমর্ম এই যে, কুরআন মজীদ সাতটি কিরাআতে তিলাওয়াত করাকে শরীআত এই উম্মতের জন্যে জায়েয রাখিয়াছে।

"ইব্‌ন জারীর আরও বলেন– 'কুরআন মজীদ আরবী ভাষার সাতটি উচ্চারণ রীতিতে নাযিল হইলেও এবং সাতটি উচ্চারণ রীতিতে উহা তিলাওয়াত করা জায়েয হইলেও আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা) যখন দেখিলেন যে, লোকেরা উহা বিভিন্নরূপে তিলাওয়াত করিতেছে এবং এই বিষয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়াছে, তখন তাঁহার মনে আশঙ্কা জাগিল

যে, ভবিষ্যতে মানুষ স্বকপোলকল্পিত উচ্চারণের শব্দ কুরআন মজীদে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিবে এবং উহার ফলে প্রকৃত ও বৈধ উচ্চারণসমূহ উদ্ধার করা কঠিন বা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কুরআন মজীদকে হিফাজত করিবার জন্যে তিনি উহার মাত্র একটি উচ্চারণরীতি বহাল রাখিলেন। অবশিষ্ট ছয়টি কিরাআত বা উচ্চারণরীতি পরিত্যক্ত হইল। সেই একটি মাত্র উচ্চারণ রীতিতে সারা বিশ্বে কুরআন মজীদ সংরক্ষিত ও পঠিত হইয়া আসিতেছে। সমগ্র সাহাবীকুল তথা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ হযরত উসমান (রা)-এর উক্ত কার্যকে রুশদ ও হিদায়েত বিবেচনা করত উহার প্রতি স্বতোৎসারিত আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সাতটি কিরাআতের মধ্য হইতে ছয়টিকে পরিত্যাগ করত মাত্র একটি কিরাআতে সারা বিশ্বে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার মধ্যে তাহারা এই উম্মতের জন্যে খায়ের ও বরকত নিহিত মনে করিয়াছেন। আজ আর সে পরিত্যক্ত ছয়টি উচ্চারণরীতি বা কিরাআত উদ্ধার করা সম্ভবপর নহে। কেহ চাহিলেও উক্ত ছয়টি কিরাআতের কোনটিতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে সমর্থ হইবে না।

এক্ষণে প্রশ্ন দেখা দেয়, স্বয়ং নবী করীম (সা) যে সকল কিরাআত বা উচ্চারণ রীতিতে সাহাবীগণকে কুরআন মজীদ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করা হযরত উসমান (রা) তথা সাহাবীকুলের জন্যে কিরূপে জায়েয হইল? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, শরীআত সাতটি কিরাআতের প্রত্যেকটিতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা ফরয বা ওয়াজিব করে নাই। শরীআত শুধু সাতটি কিরাআতের যে কোন কিরাআতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছে। বস্তুত সাতটি কিরাআত বহাল রাখা ফরয বা ওয়াজিব নহে; বরং কুরআন মজীদের তিলাওয়াতে সাতটি কিরাআত ভিন্ন অন্য কোন কিরাআত আমদানী করা অবৈধ। হযরত উসমান (রা) এবং সাহাবীগণ তাহা করেন নাই। বরং ফরয বা ওয়াজিব নহে এমন অনুমোদিত ছয়টি কিরাআতকে বাদ দিয়াছেন মাত্র। কেন তাঁহারা সেইগুলি বাদ দিলেন? তাঁহারা দেখিলেন, একটি বিশষ কিরাআত বা উচ্চারণে কুরআন মজীদ সংকলিত হইয়া যাইবার পর তদনুযায়ী উহা তিলাওয়াত করা কোন গোত্রের লোকের পক্ষেই, এমনকি বিশ্বের কোন লোকের পক্ষেই অসম্ভব বা কষ্টকর হইবে না। অধিকন্তু, কুরআন মজীদের কিরাআত লইয়া পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইবার এবং অশুদ্ধ ও অননুমোদিত উচ্চারণ রীতি উহাতে প্রবেশ করাইয়া দিবার পথ ইহা দ্বারা চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। বস্তুত তাহাই হইয়াছে। কুরআন মজীদ এবং একমাত্র কুরআন মজীদই মানব জাতির নিকট বিদ্যমান নির্ভুল ও প্রক্ষেপমুক্ত আসমানী গ্রন্থ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কিতাব সংরক্ষণ করিবার বিনিময়ে পবিত্র হৃদয় সাহাবীগণকে আখিরাতে মহা পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন।

অতঃপর একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন। কুরআন মজীদ মাত্র একটি কিরাআত আমাদের মধ্যে বর্তমান থাকিলেও উহার শব্দের মূলরূপ অপরিবর্তিত রাখিয়া কোন কোন শব্দের কোন কোন অক্ষরে (رفع) কর্তৃকারকে বিভক্তি (نصب) কর্মকারকের বিভক্তি এবং (جر) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি স্থাপন, (تسكين) হসন্তকরণ, (تحريك) স্বরান্তকরণ, শব্দের অন্তর্গত বর্ণের অবস্থান পরিবর্তন ইত্যাদি ব্যাপারে মতভেদ করা হাদীসে উল্লেখিত নিষেধকে অমান্য করা নহে। সংশ্লিষ্ট হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'অনুমোদিত সাতটি কিরাআতের বিষয় লইয়া ঝগড়া করা কুফর।' বস্তুত উপরোল্লেখিত শ্রেণীর মতভেদ করা সাতটি অনুমোদিত কিরাআতের বিষয় লইয়া মতভেদ করা নহে। উম্মতের কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই উপরোক্ত রূপ মতভেদকে 'কুফর' নামে আখ্যায়িত করেন নাই।

আলোচ্য পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসে আছে যে, হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামাহ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল কারী, উরওয়াহ ইব্‌ন যুবায়ের, ইব্‌ন শিহাব, ওকায়ল, লায়ছ, সাঈদ ইব্‌ন উফায়র ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উমর (রা) বলেন– একদা আমি নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় হিশাম ইব্‌ন হাকীমকে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম। আমি তাহার কিরাআতের প্রতি মনোযোগী হইয়া জানিতে পারিলাম, সে কতগুলি বর্ণ বৃদ্ধি করিয়া উহা তিলাওয়াত করিতেছে। নবী করীম (সা) আমাকে উহা সেইরূপে তিলাওয়াত করা শিখান নাই। আমার অবস্থা এই হইল যে, তাহার নামাযের মধ্যেই তাহাকে পাকড়াও করি আর কী। তাহার নামায শেষ করা পর্যন্ত আমি ধৈর্যধারণ করিয়া রহিলাম। নামায শেষ হইবার পর আমি তাহার চাদর টানিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম– আমি তোমাকে যে সূরাটি তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম, তাহা তোমাকে কে শিক্ষা দিয়াছে? সে বলিল– আমাকে উহা নবী করীম (সা) শিক্ষা দিয়াছেন। আমি বলিলাম– তুমি মিথ্যা বলিতেছ! কারণ, তুমি উহা যেরূপে তিলাওয়াত করিয়াছ, নবী করীম (সা) আমাকে উহা অন্যরূপে শিক্ষা দিয়াছেন। আমি তাহাকে নবী করীম (সা)-এর নিকট টানিয়া লইয়া গেলাম। নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলাম– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এই লোকটিকে কতগুলি অতিরিক্ত বর্ণসহ সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। আপনি উক্ত অতিরিক্ত বর্ণসমূহ সহ আমাকে উহা শিক্ষা দেন নাই। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'হে হিশাম! তুমি পড়িয়া শুনাও তো।' আমি উহা ইতিপূর্বে যেইরূপ তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছিলাম, সে উহা সেইরূপে তিলাওয়াত করিয়া নবী করীম (সা)-কে শুনাইল। নবী করীম (সা) বলিলেন– উহা এইরূপেই নাযিল হইয়াছে। অতঃপর আমাকে বলিলেন– 'হে উমর! তুমি পড়িয়া শুনাও তো।' নবী করীম (সা) উহা আমাকে যেইরূপে শিখাইয়াছেন, আমি তাহাকে উহা সেইরূপে তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলাম। তিনি বলিলেন– 'উহা ঐরূপেই নাযিল হইয়াছে। কুরআন মজীদ নিশ্চয় 'সাতটি হরফে' নাযিল হইয়াছে। উহার যে হরফে তোমরা (কুরআন মজীদ) তিলাওয়াত করিতে পারো, সেই হরফে তিলাওয়াত করিও।' ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম বুখারীও উক্ত হাদীস ইব্‌ন শিহাব যুহরীর মাধ্যমে একাধিক সনদ শাখায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ উহা আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্দুল কারী হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়াহ, যুহরী ও মালিক ইব্‌ন মাহদীর সনদেও প্রায় অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ তালহা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ তালহা, ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌, হারব্‌ ইব্‌ন সাবিত, আবদুস সামাদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর সম্মুখে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিলে হযরত উমর (রা) তাহার কিরাআতকে ভ্রান্ত ও অশুদ্ধ আখ্যায়িত করিলেন। লোকটি বলিল– 'আমি নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে এইরূপেই তিলাওয়াত করিয়াছি। তিনি তো আমার কিরাআতকে অশুদ্ধ বলেন নাই।' অতঃপর তাহারা উভয়ে নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইল। লোকটি নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে সেইরূপে তিলাওয়াত করিল। নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন– 'তুমি সঠিক ও শুদ্ধরূপেই পড়িয়াছ।' ইহাতে হযরত উমর (রা) আবেগাপ্লুত হইয়া পড়িলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'হে উমর! কুরআন মজীদের সকল কিরাআতই সহীহ ও শুদ্ধ, যতক্ষণ না তুমি (উহার) আযাবকে মাগফিরাতে এবং মাগফিরাতকে আযাবে রূপান্তরিত

করিয়া দাও।' উক্ত হাদীসের সনদ গ্রহণযোগ্য। উহার অন্যতম রাবী হারব ইব্‌ন সাবিত 'আবূ সাবিত' নামেও পরিচিত। কোন সমালোচক তাহাকে বিরূপভাবে সমালোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

সাত হরফের তাৎপর্য

কুরআন মজীদ যে সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে, উহার তাৎপর্য সম্বন্ধে বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন ফারাহ আনসারী কুরতুবী মালেকী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন ঃ 'সাতটি হরফ-এর তাৎপর্য কি? এ সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। আলিমগণ উহার পঁয়ত্রিশটি তাৎপর্য বয়ান করিয়াছেন। এইস্থলে আমি উহার মধ্য হইতে মাত্র পাঁচটি তাৎপর্য বর্ণনা করিতেছি। আবূ হাতিম মুহাম্মদ ইব্‌ন হাব্বান উহার সবগুলি বর্ণনা করিয়াছেন।' অতঃপর ইমাম কুরতুবী উহার পাঁচটি তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে আমি (ইব্‌ন কাছীর) সংক্ষেপে উহা বর্ণনা করিতেছি ঃ

প্রথম তাৎপর্য ঃ অধিকাংশ বিজ্ঞ ব্যক্তি এই প্রথম তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনাহ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওহাব, আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর এবং ইমাম তাহাবী তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। উহা এই যে, কুরআন মজীদের একই স্থানে বিভিন্নরূপে পৃথক পৃথক শব্দে পরস্পর ঘনিষ্ট সাতটি অর্থ নিহিত থাকে। পরস্পর ঘনিষ্ট একাধিক অর্থের একাধিক পৃথক পৃথক শব্দের দৃষ্টান্ত হইতেছে ঃ اقبل - تعال - هلم ইহাদের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ প্রায় এক। অর্থাৎ 'আসো' (আদেশসূচক)। ইমাম তাহাবী বলেন– হযরত আবূ বুকরাহ (রা) নামক জনৈক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে উপরোক্ত তাৎপর্য স্পষ্টতরভাবে বিবৃত হইয়াছে ঃ

সাহাবী আবূ বুকরাহ (রা) বলেন– একদা হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আপনি একটি মাত্র হরফে পড়ুন। ইহাতে হযরত মীকাঈল (আ) বলিলেন, আপনি অধিকতর সংখ্যক হরফের জন্য অনুমতি চান। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন, আপনি দুইটি হরফে পড়ুন। ইহাতে হযরত মীকাঈল (আ) বলিলেন–আপনি অধিকতর সংখ্যক হরফের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করুন। এইরূপ হযরত জিবরাঈল (আ) সাতটি হরফ পর্যন্ত পৌঁছিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন– পড়ুন। উহাদের প্রত্যেকটিই যথেষ্ট ও আরোগ্যদাতা। তবে রহমতের আয়াতকে আযাবের আয়াতের সঙ্গে এবং আযাবের আয়াতকে রহমতের আয়াতের সঙ্গে মিলাইয়া তালগোল পাকাইবেন না। যেমন ঃ اقبل - تعال - هلم অর্থ আসো। আবার ذهب - اسرع - عجل অর্থ সত্বর যাও।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, আবূ নাজীহ ও ওয়ারকা (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَ الْمُنَافِقَات لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُنْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ এই আয়াতের انظرونا শব্দের স্থলে ارقبونا এবং اخرونا - امهلونا পড়িতেন। (প্রত্যেকটির অর্থ 'আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন'।) তিনি অনুরূপভাবে كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيْهِ এই আয়াতের مشوا শব্দের স্থলে مروا এবং سعوا পড়িতেন।[১]

---

১. কোন কোন আহলে ইলম মনে করেন যে, হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) ব্যাখ্যা হিসাবে এই সকল শব্দ উচ্চারণ করিতেন। কিন্তু কোন রাবী ভুলে উহাকে কুরআন মজীদের অংশ মনে করিয়াছেন।

ইমাম তাহাবী প্রমুখ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন- 'অনেক লোক কুরায়শের ভাষায় তথা নবী করীম (সা)-এর ভাষায় কুরআন মজীদ শুধু পড়িতে সমর্থ ছিল। কারণ তাহারা ছিল নিরক্ষর। তাহারা উহা লিখিয়া রাখিতে পারিত না। ফলে তাহাদের পক্ষে উহা ধরিয়া রাখা কষ্টকর ছিল। তাই সাতটি ভাষা-রীতিতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। ইমাম তাহাবী, কাযী বাকিল্লানী এবং শায়েখ আবূ উমর ইব্ন আব্দুল বার বলেন- প্রথম দিকে সাতটি ভাষা-রীতিতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু, পরবর্তীকালে অসুবিধা দূর হইয়া যাইবার পর উক্ত অনুমতি রহিত হইয়া গিয়াছে। লিখন-পঠনের মাধ্যমে কুরআন মজীদের সংরক্ষণ কার্য সহজ হইয়া যাইবার ফলেই উপরোল্লেখিত অসুবিধা অপসারিত হইয়া গিয়াছে।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি- কেহ কেহ বলেন, হযরত উসমান (রা)-ই সাতটি ভাষা রীতির ছয়টিকে পরিত্যাগ করত মাত্র একটি ভাষা রীতিতে কুরআন মজীদ সংকলন করেন। তিনি যখন দেখিলেন, কুরআন মজীদের শব্দের উচ্চারণ রীতিতে লোকদের মধ্যে দারুণ মতভেদ দেখা দিয়াছে, তখন তাঁহার মনে এই আশংকা জন্মিল যে, ভবিষ্যতে এই মতভেদ চরম মতভেদে এবং পরিশেষে পরস্পরকে কাফির আখ্যাদানে পরিণত হইতে পারে। তাই তিনি অন্য সকল উচ্চারণ রীতি পরিত্যাগ করতে হযরত জিবরাঈল (আ) কর্তৃক নবী করীম (সা)-এর নিকট সর্বশেষ রমযানে পেশকৃত উচ্চারণ রীতিতে কুরআন মজীদ সংকলন করিলেন। সংঘর্ষ এড়াইবার উদ্দেশ্যে তিনি লোকদিগকে আদেশ দিলেন- তাহারা যেন অন্যান্য অনুমোদিত উচ্চারণ রীতিতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত না করে। অবশ্য দুর্বৃত্তগণ তথাপি উহা ছাড়ে নাই। তাহারা উহাকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম উম্মাহকে বহুধা বিভক্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। অনুরূপভাবে হযরত উমর (রা) এক সঙ্গে উচ্চারিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করিতে লোকদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, এক সঙ্গে উচ্চারিত তিন তালাকে তিন তালাক সংঘটিত হওয়ার ফলে দাম্পত্য তথা পারিবারিক জীবনে যে শোচনীয় অশান্তি ও অব্যবস্থা নামিয়া আসে, তাঁহার আদেশে উহা তিরোহিত হইয়া যাইবে। কিন্তু, ফল হইয়াছিল বিপরীত। তাঁহার আদেশের পর সমাজে তালাকের সংখ্যা বাড়িয়া গেল। হযরত উমর (রা) বলিলেন- পূর্ব প্রচলিত ব্যবস্থাই যদি লোকদের মধ্যে প্রচলিত রাখিতাম! অতঃপর তিনি তাহাই করিলেন। অনুরূপভাবে তিনি হজ্জের মাসগুলিতে তামাত্তু (تمتع) [১] করিতে লোকদিগকে নিষেধ করিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, এইরূপ নির্দেশের ফলে হজ্জের মাসগুলির বাহিরেও আল্লাহ্র ঘরের যিয়ারত চালু থাকিবে। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) অবশ্য হজ্জের মাসগুলিতেও তামাত্তু জায়েয মনে করিতেন। তবে আমীরুল মুমিনীনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি স্বীয় ফতোয়া প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় তাৎপর্য ঃ একদল আহলে ইলম বলেন- কুরআন মজীদ সাত হরফে নাযিল হইবার তাৎপর্য ইহা নহে যে, কুরআন মজীদের প্রতিটি শব্দ সাত রকম উচ্চারিত হইতে পারে; বরং উহার তাৎপর্য এই যে, কুরআন মজীদের একটি শব্দ এক উচ্চারণ রীতিতে এবং অন্যটি অন্য উচ্চারণ রীতিতে উচ্চারিত হইবে। এইরূপে উহাতে আরবী ভাষাভাষীদের বিভিন্নরূপ উচ্চারণ রীতির মধ্য হইতে সর্বমোট সাতটি উচ্চারণ রীতি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইমাম খাত্তাবী বলেন- 'কুরআন মজীদের কোন কোন শব্দ অবশ্য সাত প্রকারের উচ্চারণ রীতিতেই উচ্চারিত

১. তামাত্তু উমরাহ্র ন্যায় বায়তুল্লাহ্ শরীফের এক শ্রেণীর যিয়ারত।

হইয়া থাকে। যেমন ঃ وعبد الطاغوت -এর অন্তর্গত عبد শব্দটি। এইরূপে يرتع ويلعب -এর অন্তর্গত يرتع শব্দটি। ইমাম কুরতুবী বলেন– আবূ উবায়দ সংশ্লিষ্ট হাদীসের উপরোক্ত তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আতিয়া উহাকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম আবূ উবায়দ মন্তব্য করিয়াছেন– আরবের বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন উচ্চারণের মধ্য হইতে যে সকল উচ্চারণ রীতি কুরআন মজীদে গৃহীত হইয়াছে, উহাদের একটি আবার অন্যটি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে। এই কারণে বলা যায়, কুরআন মজীদে গৃহীত সকল উচ্চারণ রীতিই সমান সৌভাগ্যের অধিকারী নহে। একটি অপরটি হইতে অধিকতর সৌভাগ্যের অধিকারী। কাযী বাকিল্লানী বলেন– 'কুরআন মজীদ কুরায়শের ভাষায় নাযিল হইয়াছে' হযরত উসমান (রা)-এর এই কথার তাৎপর্য এই যে, উহার অধিকাংশই কুরায়শের ভাষায় নাযিল হইয়াছে। অর্থাৎ কুরআন মজীদে কুরায়শের ভাষা ও উচ্চারণ রীতির প্রাধান্য রহিয়াছে। সমগ্র কুরআন মজীদ কুরায়শের ভাষা ও উচ্চারণ রীতিতে নাযিল হইয়াছে, এইরূপ কথার কোন প্রমাণ নাই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– قرانا عربيا অর্থাৎ আমি উহাকে আরবী গ্রন্থরূপে নাযিল করিয়াছি। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন নাই قرانا قريشيا আমি উহাকে কুরায়েশী গ্রন্থরূপে নাযিল করিয়াছি। বলাবাহুল্য عرب বলিতে আরবী ভাষাভাষী সকল গোত্রকে অথবা আরবী ভাষাভাষী গোত্রসমূহের সমগ্র এলাকাকেই বুঝায়। শায়েখ আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বারও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন– উহার কারণ, কুরায়েশ গোত্রের ভাষা ভিন্ন অন্য গোত্রের ভাষাও কুরআন মজীদের বিশুদ্ধ কিরাআতে বর্ণনা রহিয়াছে। যেমন ঃ হামযা همزه বর্ণসহ শব্দ উচ্চারণ করা। উল্লেখ্য যে, কুরায়শ গোত্র হামযা বর্ণসহ শব্দ উচ্চারণ করে না। ইমাম ইব্‌ন আতিয়্যা বলিয়াছেন– 'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন যে, 'আমি فاطر السموات والارض। এই আয়াতাংশের অর্থ জানিতাম না। একদা জনৈক বেদুঈনকে বলিতে শুনিলাম انا فطرتها। (আমিই উহাকে সর্বপ্রথম খনন করিয়াছি)। সে উহা একটি কূপ সম্পর্কে বলিতেছিল।'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বেদুঈন লোকটির নিকট হইতে শিখিলেন, - فطر - يفطر - فطرا। অর্থ কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বপ্রাপ্ত করা। ইমাম ইব্‌ন আতিয়্যা ইহা দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, কুরআন মজীদে ব্যবহৃত فاطر (নব উদ্ভাবক) শব্দটি কুরায়শের ভাষা ভিন্ন অন্য গোত্রের ভাষা। কারণ কুরায়শ গোত্রে জন্মগ্রহণকারী হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উহার অর্থ অবিদিত ছিল।

তৃতীয় তাৎপর্য ঃ কেহ কেহ বলেন– সংশ্লিষ্ট হাদীসের তাৎপর্য এই যে, আরবী ভাষাভাষী বিপুল সংখ্যক গোত্রের ভাষারীতির মধ্য হইতে মাত্র সাতটি গোত্রের ভাষারীতি কুরআন মজীদে গৃহীত হইয়াছে; আর মুযার مضر গোত্রের ভাষারীতির মধ্যে এই সাতটি ভাষারীতির সমাবেশ ঘটিয়াছে। অতএব, কুরআন মজীদের সাতটি ভাষারীতি মুযার গোত্রের ভাষারীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মুযার গোত্রের বিভিন্ন শাখার ভাষারীতির বাহিরের কোন ভাষারীতি ইহাতে গৃহীত হয় নাই।

আলোচ্য হাদীসের উপরোক্ত তাৎপর্যের ভিত্তিতে 'কুরআন মজীদ কুরায়শের ভাষায় নাযিল হইয়াছে'– হযরত উসমান (রা)-এর এই কথার তাৎপর্য এই হইবে যে, কুরআন মজীদে সন্নিবেশিত সাতটি গোত্রীয় ভাষারীতি কুরায়শের ভাষারীতির বিরোধী নহে। উহা একদিকে বিক্ষিপ্তভাবে সাতটি গোত্রীয় ভাষারীতির সমষ্টি এবং অপরদিকে কুরায়শ গোত্রের নিজস্ব

সামগ্রিক ভাষারীতিও বটে। কুরায়েশ গোত্রটি কাহার বংশধর? কুরায়শ গোত্র হইতেছে নাযর ইব্ন হারিছের বংশধরগণ। বংশ পরিচয় বিশারদগণের মধ্যে কুরায়শের পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। তবে উহার উপরোক্ত পরিচয়ই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য। সুনানে ইব্ন মাজাহ প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীসে ঐরূপই বর্ণিত রহিয়াছে।

চতুর্থ তাৎপর্য ঃ ইমাম বাকিল্লানী বলেন– কেহ কেহ বলিয়াছেন, আলোচ্য হাদীসের তাৎপর্য এই যে, কুরআন মজীদের বিভিন্নরূপে উচ্চারণের শব্দ সম্ভারের সাতটি অবস্থা রহিয়াছে। ইহাদের সবগুলিই শরীআত কর্তৃক অনুমোদিত অবস্থা। প্রথম অবস্থা এই যে, উহার উচ্চারণের রূপ একাধিক হইলেও উহাতে শব্দের মূল হরকতে, শব্দের সামগ্রিক বাহ্য আকৃতিতে অথবা উহার অর্থে কোনরূপ পরিবর্তন বা বিভিন্নতা আসে না। যেমন ঃ ويضيق صدرى -এর অন্তর্গত يضيق শব্দটির অবস্থা।[১]

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, উহার উচ্চারণের রূপ একাধিক হইলেও উহাতে শব্দের বাহ্য আকৃতিতে কোনরূপ পরিবর্তন বা বিভিন্নতা আসে না। তবে উচ্চারণের বিভিন্নতার দরুণ উহাতে অর্থের বিভিন্নতা দেখা দেয়। যেমন ঃ فَقَالُوْا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا বাক্যাংশের অন্তর্গত باعد শব্দটির অবস্থা।[২]

তৃতীয় অবস্থা এই যে, শব্দের উচ্চারণে বিভিন্নতা আসিবার দরুণ উহার বাহ্য আকৃতি ও অর্থ উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্নতা দেখা দেয়। তবে এইরূপ বিভিন্নতা শব্দের অন্তর্গত কোন বর্ণের বিভিন্নতার কারণে দেখা দেয়। যেমন ঃ كَيْفَ نُنْشِزُهَا বাক্যাংশের অন্তর্গত ننشز শব্দটির অবস্থা।[৩]

চতুর্থ অবস্থা এই যে, একই স্থানে একাধিক শব্দ পঠিত হয়। কেহবা একটি বিশেষ শব্দ, আবার কেহবা অন্য একটি শব্দ পাঠ করেন। উহাতে শব্দ বিভিন্ন হইলেও অর্থে বিভিন্নতা দেখা দেয় না। যেমন ঃ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ বাক্যাংশের অন্তর্গত العهن শব্দের অবস্থা।[৪]

পঞ্চম অবস্থা এই যে, একই স্থানে কেহ বা একটি বিশেষ শব্দ, আবার কেহবা অন্য একটি শব্দ পাঠ করেন। আর শব্দের এইরূপ বিভিন্নতার কারণে অর্থেও বিভিন্নতা দেখা দেয়। যেমন ঃ وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ এর অন্তর্গত طلح শব্দটির অবস্থা।[৫]

ষষ্ঠ অবস্থা এই যে, বাক্যের অন্তর্গত শব্দের স্থান পরিবর্তনের কারণে উহার বাহ্য আকৃতি ও অর্থ উভয় ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দেয়। যেমন ঃ

---

১. অধিকাংশ কারী উহার ق বর্ণটিতে رفع বা কর্তৃকারকের বিভক্তি দিয়া পড়েন। তবে ইয়াকূব উহাকে উহার পূর্ববর্তী يكذبون শব্দের সহিত সংযোজিত পদ হিসাবে ধরিয়া উহার ق বর্ণটিতে نصب বা কর্মকারকের বিভক্তি দিয়া পড়েন।

২. অধিকাংশ কারী উহাকে باعد (অনুজ্ঞাসূচক ক্রিয়া)রূপে পড়েন। তবে ইয়াকূব উহাকে مباعدة - باعد হতে গঠিত সাধারণ অতীতকালের সংবাদসূচক ক্রিয়ারূপে পড়েন। আবার ইব্ন কাছীর, আবূ আমর ও হিশাম উহাকে تبعيد - بعد হইতে গঠিত সাধারণ অতীতকালের সংবাদসূচক ক্রিয়া রূপে পড়েন।

৩. একদল কারী ز বর্ণকে উহার শেষ বর্ণ এবং আরেক দল কারী ر বর্ণকে উহার শেষ বর্ণ হিসাবে পড়েন। অর্থাৎ কেহ কেহ শব্দটিকে ننشز রূপে এবং কেহ কেহ উহাকে ننشر রূপে পড়েন।

৪. এইস্থলে সাধারণভাবে العهن শব্দটিই পঠিত হয়। কথিত আছে যে, এখানে الصوف শব্দও পঠিত হইয়াছে; কিন্তু উহা প্রমাণিত নহে। العهن শব্দের ব্যাখ্যা হিসাবে কেহ হয়ত الصوف শব্দটি উচ্চারণ করিয়াছে। অপরাপর ক্ষেত্রেও উক্ত কথা প্রযোজ্য।

৫. এস্থলে কেহ طلع -ও পড়েন। তবে উহা প্রমাণিত নহে।

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ আয়াতাংশের অবস্থা।[১]

সপ্তম অবস্থা এই যে, বাক্যে কোন শব্দ বৃদ্ধি করিবার ফলে উহার বাহ্য আকৃতি ও অর্থ উভয়ে অথবা শুধু বাহ্য আকৃতিতে পার্থক্য দেখা দেয়। যেমন ঃ لَهُ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً এর স্থলে له تسع وتسعون نعجة انثى পাঠ করিবার অবস্থা[২] অথবা وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنَ এর স্থলে واما الغلام فكان كافرا وكان ابواه مؤمنين পাঠ করিবার অবস্থা। কিংবা– وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ এর স্থলে ومن يكرههن فان الله من بعدا كراههن لهن غفور رحيم পাঠ করিবার অবস্থা।

পঞ্চম তাৎপর্য ঃ কেহ কেহ বলেন– কুরআন মজীদ সাত হরফে নাযিল হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য এই যে, কুরআন মজীদে বর্ণিত বিষয়াবলী সাত শ্রেণীতে বিভক্ত। উক্ত সাত শ্রেণীর বিষয়াবলী হইতেছে ঃ (১) আদেশ (২) নিষেধ (৩) পুরস্কারের ওয়াদা (৪) শাস্তির ব্যাপারে সতর্কীকরণ (৫) কাহিনীসমূহ (৬) যুক্তি প্রদর্শন ও (৭) দৃষ্টান্তসমূহ।

ইমাম ইব্‌ন আতিয়্যা মন্তব্য করিয়াছেন– আলোচ্য হাদীসের উক্ত তাৎপর্য বর্ণনা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, এই সকল বিষয়ের কোনটি 'হরফ' নামে অভিহিত হয় না। এতদ্ব্যতীত, আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কুরআন মজীদকে 'সাতটি হরফে' পড়িতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এমতাবস্থায় 'হরফ' শব্দটির তাৎপর্য উপরোক্তরূপ হইলে মানিয়া লইতে হয় যে, কুরআন মজীদে বর্ণিত হালালকে হারাম, হারামকে হালাল অথবা অর্থগত অন্যরূপ কোন পরিবর্তন করিবার অনুমতি শরীআতে রহিয়াছে। অথচ ইহা উম্মতে মুহাম্মদিয়ার সর্ববাদীসম্মত রায়ের পরিপন্থী।' ইমাম বাকিল্লানী এতদসম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করতে মন্তব্য করিয়াছেন– উপরোক্ত বিষয়সমূহ এইরূপ নহে যাহার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করিয়া কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা শরীআতে বৈধ। প্রকৃতপক্ষে ইহা আদৌ সম্ভবপর নহে।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ মুদাবূনী, ইব্‌ন আবূ সাফারাহ প্রমুখ বিপুল সংখ্যক বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন– প্রচলিত সাতটি কিরাআত মূলত হাদীসে অনুমোদিত সাতটি কিরাআত নহে। প্রচলিত সাতটি কিরাআত প্রকৃতপক্ষে হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মজীদে গৃহীত কিরাআতের বিভিন্নরূপ। উহা একটি কিরআতেরই একাধিক সংস্করণ ভিন্ন কিছু নহে। উহাদের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা একবোরেই সামান্য। ইব্‌ন নুহাস প্রমুখ ব্যক্তিও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রচলিত সাতটি কিরাআতের অনুসারী সাতজন কারীর প্রত্যেকেই অপর কারীদের কিরাআতকে অনুমোদন করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের একেকজন যেহেতু নির্দিষ্ট একেকটি কিরাআতকে অধিকতর শুদ্ধ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন, তাই উহাদের একেকটি কিরাআত তাহাদের একেকজনের নামের সহিত সম্পর্কিত হইয়া রহিয়াছে। মুসলিম উম্মাহ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত সাতটি কিরাআতকেই সঠিক ও শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উহাদের সঠিকতা ও শুদ্ধতার সমর্থনে বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে। এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা অনুযায়ী তাঁহার কালাম সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

---

১. এইস্থলে কেহ কেহ وجاءت سكرة الحق بالموت পড়েন। এইরূপ তিলাওয়াত বিরল। উহা প্রমাণিত নহে।

২. نعجة শব্দের পর انثى। শব্দ বৃদ্ধি করিয়া পড়া বিরল। পরবর্তী উদাহরণ দুইটির ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য।

কুরআন মজীদের সূরাসমূহের বিন্যাস

উক্ত শিরোনামে ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ ইউসুফ ইব্ন মাহিক হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ, হিশাম ইব্ন ইউসুফ ও ইবরাহীম ইব্ন মূসা আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইউসুফ ইব্ন মাহিক বলেন– একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম! এই সময়ে তাঁহার নিকট জনৈক ইরাকী আগমন করত প্রশ্ন করিল– কোন্ রং-এর কাফন উত্তম? তিনি উত্তর করিলেন– কোনো রং-এর কাফনই অনুত্তম নহে। ইরাকী লোকটি বলিল– আপনার কুরআন মজীদখানা আমাকে দেখান। তিনি বলিলেন– 'উহাতে তোমার কি কাজ? লোকটি বলিল, আমি উহার অনুরূপ করিয়া কুরআন মজীদকে বিন্যস্ত করিব। কারণ, কুরআন মজীদ অবিন্যস্ত অবস্থায় পঠিত হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন– কুরআন মজীদের যে কোন সূরাই পূর্বে পড় না কেন, তাহাতে কিছু যায় আসে না। নবূওতের প্রথম দিকে বেহেশত ও দোযখের আলোচনা সম্বলিত ক্ষুদ্রাবয়ব সূরা নাযিল হয়। অতঃপর লোকে যখন ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হইতে থাকে, তখন হালাল-হারাম সম্বলিত সূরা নাযিল হয়। প্রথম দিকেই যদি নাযিল হইত 'তোমার শরাব পান করিও না' তবে লোকে বলিত– 'আমরা কখনও শরাব ত্যাগ করিব না।' অনুরূপভাবে প্রথম দিকে যদি নাযিল হইত, 'তোমরা যিনা করিও না' তবে লোকে বলিত– 'আমরা কখনো যিনা ত্যাগ করিব না।' আমি যখন খেলাধূলায় লিপ্ত ছোট্ট বালিকা মাত্র, তখন পবিত্র মক্কায় রাসূল করীম (সা)-এর উপর بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ - وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ (বরং কিয়ামতই হইতেছে তাহাদের প্রতিশ্রুত দিবস; আর কিয়ামত হইতেছে অতিশয় লাঞ্ছনার ও অতিশয় তিক্ত) এই আয়াত নাযিল হয়। নবী করীম (সা)-এর প্রতি যখন সূরা বাকারা ও সূরা নিসা নাযিল হয়, তখন আমি তাঁহার সহধর্মিণী ছিলাম।' রাবী বলেন– অঃপর হযরত আয়েশা (রা) স্বীয় কুরআন মজীদখানা খুলিয়া ইরাকী লোকটিকে বিভিন্ন সূরার কতগুলি আয়াত শুনাইলেন।

এইস্থলে কুরআন মজীদের বিন্যাসের অর্থ হইতেছে উহার সূরাসমূহের বিন্যাস। ইরাকী লোকটির কাফন সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে হযরত আয়েশা (রা) যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ইহা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে এবং ইহার পশ্চাতে পরিশ্রম ও দৌড়াদৌড়ি করা নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় শ্রম নিয়োগ করা ছাড়া কোন লাভ নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, লোকেরা তৎকালে ইরাকবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত যে, তাহারা অপরকে নাকাল করিবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিয়া থাকে। একদা জনৈক ইরাকী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট কাপড়ে মশার রক্ত লাগিলে উহা নাপাক হইয়া যায় কিনা– এইরূপ প্রশ্ন করিল। তিনি বলিলেন– 'ইরাকীদের আচরণ দেখো। ইহারা মশার রক্ত কাপড়ে লাগিলে কাপড় নাপাক হইয়া যায় কিনা, তাহা জানিতে চাহে। অথচ ইহারাই আল্লাহ্র রাসূলের স্নেহের কন্যার গর্ভজাত সন্তান, তাঁহার আদরের দুলাল হযরত হুসায়ন (রা)-কে হত্যা করিয়াছে! উপরোক্ত কারণেই হযরত আয়েশা (রা) ইরাকী প্রশ্নকারী লোকটির সহিত কথোপকথনে বেশী অগ্রসর হইতে চাহেন নাই। এতদ্ব্যতীত পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি চাহিয়াছিলেন, লোকটি যেন বিষয়টিকে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ মনে করিয়া না বসে। তাই তিনি তাহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে গিয়া সংক্ষিপ্ত পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের দীর্ঘ উত্তরও হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট ছিল। হযরত সামুরাহ (রা) ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইমাম আহমদ এবং 'সুনান' এর সংকলকগণ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী

করীম (সা) বলিয়াছেন- 'তোমরা সাদা রং এর কাপড় পরিধান কর এবং উহাতে মুর্দা দাফন কর। কারণ, সাদা রং-এর কাপড় সুন্দর ও আনন্দদায়ক।' ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীস উভয় সনদেই সহীহ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন- 'নবী করীম (সা)-কে একহারা সূতায় প্রস্তুত সাদা রং-এর তিনখানা কাপড়ে দাফন করা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে জামা বা পাগড়ী ছিল না।' উক্ত হাদীস জানাযা অধ্যায়ের অন্তর্গত 'কাফন' পরিচ্ছেদে লিখিত রহিয়াছে। যাহা হউক, উপরোল্লেখিত কারণে হযরত আয়েশা (রা) ইরাকী প্রশ্নকর্তাকে উপরোক্ত হাদীস শুনাইতে যান নাই।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্তির পর ইরাকী লোকটি দীর্ঘ এক প্রশ্নের অবতারণা করিল। সে হযরত আয়েশা (রা)-কে জানাইল যে, সে যে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে, উহার সূরাসমূহ অবিন্যস্ত। হযরত উসমান (রা) কর্তৃক কুরআন মজীদ সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত ও বিভিন্ন মুসলিম এলাকায় উহা প্রেরিত হইবার এবং হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে কুরআন মজীদ জ্বালাইয়া দিবার অভিযোগ উত্থাপিত হইবার পূর্বে হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট ইরাকীর প্রশ্ন করিবার উপরোক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। উপরোক্ত কারণেই হযরত আয়েশা (রা) প্রশ্নকর্তাকে বলিয়া দিলেন- 'তুমি যে কোন সূরাকেই পূর্বে পাঠ কর না কেন, তাহাতে কিছু যায় আসে না।' হযরত আয়েশা (রা) তাহাকে আরও বলিয়াছিলেন যে, নবূওতের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরায় বেহেশত ও দোযখের বর্ণনা ছিল। উক্ত সূরা কোন্ সূরা ছিল? উহা যদি সূরা আলাক না হইয়া থাকে, তবে এইরূপ হইতে পারে যে, 'সূরা' শব্দ বলিতে হযরত আয়েশা (রা) নির্দিষ্ট সূরা বিশেষকে না বুঝাইয়া ক্ষুদ্রাবয়ব সূরা শ্রেণীকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। এই শ্রেণীর সূরাসমূহে জান্নাতের পুরস্কারের ওয়াদা ও জাহান্নামের শাস্তির ব্যাপারে সতর্কবাণী বিবৃত হইয়াছে।[১] হযরত আয়েশা (রা) তাহাকে আরও বলিয়াছিলেন- সূরা বাকারা ও সূরা নিসা নাযিল হইয়াছিল নবূওতের শেষ দিকে, যখন লোকে ঈমানে উদ্বুদ্ধ হইয়া ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হইতেছিল এবং এই সময়ে তিনি নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী ছিলেন। এই সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা ধীরে ধীরে হালাল-হারাম ইত্যাদি আদেশ-নিষেধ নাযিল করিয়াছিলেন। ইহা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ হিকমাত। যাহা হউক, হযরত আয়েশা (রা)-এর শেষোক্ত দুইটি কথার তাৎপর্য এই যে, ক্ষুদ্রাবয়ব সূরা শ্রেণী অথবা সূরা বিশেষ নবূওতের প্রথম দিকে নাযিল হইলেও কুরআন মজীদে উহার অবস্থান প্রথম দিকে না হইয়া শেষ দিকে রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, সূরা বাকারা ও সূরা নিসা নবূওতের শেষ দিকে নাযিল হইলেও কুরআন মজীদে উহাদের অবস্থান প্রথম দিকে রহিয়াছে।

এই গেল কুরআন মজীদের সূরাসমূহের বিন্যাস সম্পর্কিত হযরত আয়েশা (রা)-এর উক্তি। তাঁহার উক্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন মজীদের সূরাসমূহের যে কোনটিকে যে কোনটির পূর্বে বা পরে তিলাওয়াত করা বৈধ। কুরআন মজীদের সূরাসমূহের ক্ষেত্রে উপরোক্ত

---

১. 'সূরা' শব্দ দ্বারা হযরত আয়েশা (রা) যে সমগ্র ক্ষুদ্রাবয়ব সূরা শ্রেণী না বুঝাইয়া একটি মাত্র সূরা 'সূরা মুদ্দাসসির'কেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন- ইহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ, উক্ত সূরা সম্পূর্ণরূপে অবিচ্ছিন্নভাবে নবূওতের প্রথম দিকে নাযিল হইয়াছিল। উহাতে তাবলীগে দীনের আদেশ এবং জান্নাত ও জাহান্নামের উল্লেখ রহিয়াছে। উহার পূর্বে 'সূরা আলাক'-এর মাত্র পাঁচটি আয়াত নাযিল হইয়াছিল। উহাতে তাবলীগে দীনের আদেশ ছিল না।

অনুমোদন প্রযোজ্য হইলেও উহার সূরাসমূহের বিভিন্ন আয়াতের ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য নহে। কারণ, আয়াতসমূহের বিন্যাস আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে স্বয়ং নবী করীম (সা) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। কোনো সূরার যে কোনো আয়াতকে যে কোনো আয়াতের পূর্বে বা পরে তিলাওয়াত করিবার অনুমতি শরীআতে নাই বলিয়াই হযরত আয়েশা (রা) প্রশ্নকর্তাকে সেইরূপ অনুমতি দেন নাই। বরং তিনি স্বীয় কুরআন মজীদখানা বাহির করিয়া তাহার সূরাসমূহের কতগুলি আয়াত শুনাইয়া দিলেন। 'তুমি যে কোনো সূরাকেই পূর্বে পড়িতে পার'– প্রশ্নকর্তার প্রতি হযরত আয়েশা (রা)-এর এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'নামাযে যে কোনো সূরা পূর্বে বা পরে পড়া বৈধ।' সহীহ হাদীস গ্রন্থে হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও উহা প্রমাণিত হয়। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন– নবী করীম (সা) তাহাজ্জুদ নামাযে প্রথম সূরা বাকারা, তৎপর সূরা নিসা এবং তৎপর সূরা আলে ইমরান তিলাওয়াত করিয়াছেন।

ইমাম কুরতুবী 'প্রতিবাদ পুস্তক' নামক স্বীয় গ্রন্থে আবূ বকর ইব্ন আম্বারীর এইরূপ উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ 'কুরআন মজীদে সূরাসমূহ যেইরূপে বিন্যস্ত রহিয়াছে, কেহ যদি উহা লঙ্ঘন করিয়া পূর্বে অবস্থিত সূরা পরে অথবা পরে অবস্থিত সূরা পূর্বে তিলাওয়াত করে, তবে উহা দ্বারা তাহার কোন সূরার আয়াতসমূহের বিন্যাসকে লঙ্ঘন করিয়া তিলাওয়াত করিবার অথবা কোন শব্দের বিভিন্ন বর্ণের অবস্থানকে পরিবর্তন করিয়া তিলাওয়াত করিবার অপরাধের ন্যায় অপরাধই হইবে। আবূ বকর ইব্ন আম্বারী স্বীয় অভিমতের পক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, 'হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মজীদ যেইরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে, উহাই অনুসরণীয়। উহার যে কোনরূপ লঙ্ঘনই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।' অবশ্য, সূরা তাওবার প্রথমে বিস্মিল্লাহ্ না লিখিবার এবং সূরা আনফালকে দীর্ঘাবয়ব সাতটি সূরার অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যাপারে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হযরত উসমান (রা)-এর নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং তিনি উহার যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, সূরাসমূহের তারতীব বা বিন্যাস নবী করীম (সা) কর্তৃক নহে, বরং হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছিল। তিরমিযী শরীফসহ একাধিক হাদীস গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। উহার সনদ মজবুত ও শক্তিশালী।[১]

ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করিয়াছি যে, হযরত আলী (রা) কুরআন মজীদকে উহার অবতীর্ণ হইবার ক্রম অনুসারে সাজাইয়া সংকলিত করিতে চাহিয়াছিলেন।[২] কাযী বাকিল্লানী বর্ণনা করিয়াছেন– 'হযরত আলী (রা)-এর কুরআন মজীদের প্রথম সূরা ছিল اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ।[৩] হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কুরআন মজীদের প্রথম সূরা ছিল مَالِكِ يَوْمِ

১. ইতিপূর্বে লিখিত টীকায় এ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইমাম ইব্ন কাছীরের উক্ত ধারণা ঠিক নহে; বরং সূরাসমূহের বিন্যাসও স্বয়ং নবী করীম (সা) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল।

২. হযরত আলী (রা) সম্পর্কিত উক্ত তথ্য সত্য নহে। যদি উহা সত্য বলিয়া ধরা হয়, তবে উহার তাৎপর্য এই যে, তিনি আয়াতসমূহকে উহাদের অবতীর্ণ হইবার ক্রম অনুসারে সাজাইতে চাহেন নাই। এইরূপে উহাদিগকে সাজাইলে এক সূরার আয়াত অন্য সূরার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িত। বরং তিনি শুধু সূরাসমূহকে অখণ্ডিত ও পরিপূর্ণ রাখিয়া উহাদিগকে উহাদের অবতীর্ণ হইবার ক্রম অনুসারে সাজাইতে চাহিয়াছিলেন।

১. রাবী সূরা আলাকের একটি আয়াত দ্বারা খোদ সূরাটিকেই বুঝাইয়াছেন। অনুরূপভাবে তিনি হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও হযরত উবাই (রা)-এর কুরআন মজীদের প্রথম সূরার উল্লেখ করিতে গিয়া প্রতি ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহার মাত্র একটি আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন। তাই উহা দ্বারা উহার মাত্র একটি আয়াতকে না বুঝিয়া সমগ্র সূরাটিকেই বুঝিতে হইবে।

الدِّيْن। উহার পর যথাক্রমে বাকারা ও নিসা ছিল। উহাদের বিন্যাস ছিল (প্রচলিত কুরআন মজীদের সূরাসমূহের বিন্যাস হইতে) পৃথক ও স্বতন্ত্র। তেমনি হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর কুরআন মজীদের প্রথম সূরা ছিল اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ : উহার পর যথাক্রমে নিসা, আলে ইমরান, আনআম ও মায়িদা ইত্যাদি। উহাদের বিন্যাস ছিল লক্ষণীয়ভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র।[১]

অতঃপর কাযী বাকিল্লানী মন্তব্য করিয়াছেন- 'সম্ভবত সাহাবায়ে কিরামই স্বীয় ইজতিহাদ অনুযায়ী কুরআন মজীদের সূরাসমূহকে বর্তমান আকারে বিন্যস্ত করিয়াছেন।' তাফসীরকার মক্কীও স্বীয় তাফসীর গ্রন্থের সূরা তাওবার তাফসীরে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন- 'সূরাসমূহের আয়াতের বিন্যাস এবং প্রতিটি সূরার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্ শরীফ স্থাপনের কার্যটি নবী করীম (সা) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে।' একদল আহলে ইলমের ন্যায় ইব্‌ন ওহাব বলেন- আমি সুলায়মান ইব্‌ন বিলালের নিকট শুনিয়াছি- 'একদা রবীআর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, সূরা বাকারা সূরা আলে ইমরানের পূর্বে আশিটির বেশী সূরা নাযিল হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সূরাদ্বয়কে কেন উহাদের পূর্বে কুরআন মজীদের প্রথম দিকে স্থাপন করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন- 'কুরআন মজীদকে যাঁহারা সংকলিত করিয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞান মতে উহার সূরাসমূহ বিন্যস্ত হইয়াছে। উক্ত সূরাদ্বয়ের অবস্থানও তাঁহাদের জ্ঞান মতে নির্ধারিত হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞান অনুযায়ী একমত হইয়াই উহা করিয়াছেন। অতএব এই বিন্যাস প্রক্রিয়ার মূলে তাঁহাদের (সাহাবীগণের) ঐকমত্যই সক্রিয় ছিল। আর তাঁহাদের ইজমা বা সর্ববাদীসম্মত রায়ের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রশ্ন তোলা যায় না।' ইব্‌ন ওহাব আবার বলেন- আমি ইমাম মালিককে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'সাহাবীগণ নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে কুরআন মজীদকে যেইরূপে শুনিয়াছেন, সেইরূপেই উহা বিন্যস্ত হইয়াছে।' আবুল হাসান ইব্‌ন বাত্তাল বলেন- "আমরা কুরআন মজীদের সূরাসমূহকে শুধু লিখিত অবস্থায় বিশেষ একটি রূপে বিন্যস্ত আকারে পাই। কিন্তু, উক্ত বিশেষরূপে বিন্যস্ত আকারেই উহা নামাযে কিংবা নামাযের বাহিরে তিলাওয়াতে বা শিক্ষাদানে পড়িতে হইবে এবং উক্ত বিন্যাসে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো যাইবে না, কেহ এইরূপ কথা বলিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। কাহাকেও বলিতে শোনা যায় নাই যে, বাকারার পূর্বে কাহাফ অথবা কাহাফের পূর্বে 'হজ্জ' শিক্ষা করা অবৈধ বা নিষিদ্ধ। হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেন- 'তুমি যে কোন সূরাকেই পূর্বে পড়িতে পারো। উহাতে কোন ক্ষতি নাই।' নবী করীম (সা) নামাযে প্রথম রাকআতে কোন একটি সূরা তিলাওয়াত করিয়া দ্বিতীয় রাকআতে উহার অব্যবহিত পরবর্তী সূরার পরিবর্তে অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করিতেন। আবুল হাসান বাত্তাল অতঃপর বলেন- 'হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কুরআন মজীদ উল্টাভাবে পড়া ঘোরতর অপরাধ। যে ব্যক্তি উহা তদ্রূপ পড়ে, তাহার অন্তঃকরণই উল্টা। উহার তাৎপর্য এই যে, কোন সূরার শেষদিক হইতে তিলাওয়াত আরম্ভ করিয়া উহার প্রথমদিকে তিলাওয়াত শেষ করা জঘন্য গুনাহ ও অপরাধ। ইহা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

১. সাহাবায়ে কিরামের নিজস্ব কুরআন মজীদসমূহে সূরাসমূহের বিন্যাসের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধিতা সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, এতদসম্বন্ধীয় কোন কোন রিওয়ায়েতের পশ্চাতে মিথ্যাবাদী রাবীগণের ষড়যন্ত্র কাজ করিয়াছে। দ্বিতীয় কথা এই যে, সম্ভবত কোন কোন সাহাবী পশুচর্ম, অস্থি ইত্যাদিতে লিখিত আয়াতসমূহকে একত্রিত করিবার কালে কোন সূরার অংশবিশেষ একত্রিত করিবার পরই অন্য কোন সূরার সমগ্রটুকু একত্রিত করিয়াছেন। সে সূরার একত্রীকরণ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যথাস্থানে না রাখিবার এবং একত্রীকৃত অন্য সূরাটি তদস্থলে রাখিবার কারণে তাঁহাদের ব্যক্তিগত কুরআন মজীদসমূহের সূরাসমূহের বিন্যাসের পরস্পর বিরোধিতা পরিলক্ষিত হইয়াছে।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান, ইব্ন ইয়াযীদ, আবূ ইসহাক, শু'বা, আদম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

বনী ইসরাঈল, কাহাফ, মরিয়াম, ত্বা-হা ও আম্বিয়া এই সকল সূরা সম্বন্ধে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন– 'এইগুলি (নবূওতের) প্রথমদিকে অবতীর্ণ সূরা; ইহা আমার পুরাতন সম্পদ।' উক্ত হাদীস শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) উহা বর্ণনা করেন নাই। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর ব্যক্তিগত কুরআন মজীদে উপরোক্ত সূরাসমূহের বিন্যাস যে হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মজীদের সেই সকল সূরার বিন্যাসের সহিত সামঞ্জস্যশীল ছিল তাহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই ইমাম বুখারী (র) উপরোক্ত হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, শু'বা, আবুল ওয়ালীদ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন– 'নবী করীম (সা)-এর মদীনা শরীফে আগমন করিবার পূর্বেই আমি সূরা আ'লা শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম।' ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহা হিজরত সম্পর্কিত একটি হাদীসের অংশবিশেষ মাত্র। সূরা আ'লা (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) যে একটি মক্কী সূরা, ইহা প্রমাণ করিবার জন্যেই ইমাম বুখারী উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

শাকীক হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ, আবূ হামযা, আবদান ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ শাকীক বলেন– একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, নবী করীম (সা) অর্থগত দিক দিয়া ঘনিষ্ঠরূপে পরস্পর সম্পৃক্ত যে সকল সূরার (المفصل) দুইটি করিয়া প্রতি রাকআতে তিলাওয়াত করিতেন, সেইগুলি আমি নিশ্চয় চিনি। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত হযরত আলকামা অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত আলকামা বাহিরে আসিলে আমি তাঁহাকে উক্ত সূরাসমূহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলিলেন– 'উহা হইতেছে ক্ষুদ্রাবয়ব বিশিষ্ট সূরাসমূহের (المفصل) মধ্য হইতে প্রথম বিশটি সূরা। তবে এই বিশটি সূরা হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বিন্যস্ত তাঁহার ব্যক্তিগত কুরআন মজীদের সূরাসমূহের মধ্য হইতে ক্ষুদ্র আয়াত বিশিষ্ট সূরা সমষ্টির প্রথম বিশটি সূরা। উক্ত বিশটি সূরার শেষভাগে হইতেছে সূরা দুখান ও সূরা নাবা।'

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক গৃহীত কুরআন মজীদের যে ক্রমবিন্যাসের কথা ইতিপূর্বে একাধিকবার আলোচিত হইয়াছে, উহা একদিকে যেমন হযরত উসমান কর্তৃক গৃহীত বিন্যাসক্রমের বিরোধী, অন্যদিকে তেমনি সাধারণভাবে সাহাবীগণ কর্তৃক অসমর্থিত ও প্রত্যাখ্যাত। হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মজীদে ক্ষুদ্রাবয়ব বিশিষ্ট সূরা শ্রেণী (المفصل) হইতেছে– সূরা হুজুরাত হইতে কুরআন মজীদের শেষ অংশের সূরা সকল। সূরা দুখান কোনক্রমেই উহাদের অন্তর্ভুক্ত নহে। (অথচ, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর বিন্যাসক্রম অনুসারে উক্ত সূরা মুফাস্সাল শ্রেণীভুক্ত)। ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় ঃ

হযরত আওস ইব্ন হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উসমান ইব্ন আবদুল্লাহ্, ইব্ন আওস ছাকাফী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান তায়েফী, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী ও

ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আওস ইব্‌ন হুযায়ফা (রা) বলেন– 'আমি একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট আগত প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ছিলাম।' অতঃপর হযরত আওস (রা) একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহার একাংশ হইতেছে এই ঃ 'প্রতিদিন ইশার নামায আদায় করিবার পর নবী করীম (সা) আমাদের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেন। একদা তিনি ইশার নামাযের পর দীর্ঘক্ষণ বিলম্ব করিয়া আমাদের নিকট আসিলেন। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের নিকট আসিতে আজ আপনার বিলম্ব হইল কেন? তিনি বলিলেন– 'আজ কুরআন মজীদের একটি অংশ আমার সম্মুখে আসিয়াছিল। আমি ভাবিলাম, উহা তিলাওয়াত না করিয়া বাহিরে আসিব না।' সকাল বেলায় আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম– তোমরা কুরআন মজীদ কোন্ নিয়মে অংশ অংশ করিয়া তিলাওয়াত কর? তাহারা বলিল– 'আমরা কুরআন মজীদের তিন সূরা, পাঁচ সূরা, সাত সূরা, নয় সূরা, এগার সূরা এবং তের সূরাকে একটি অংশ বানাইয়া (নামাযে) তিলাওয়াত করি। আর মুফাসসাল (المفصل।) অংশটি হইতেছে– সূরা কাফ হইতে কুরআন মজীদের শেষ পর্যন্ত।' ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্‌ও উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়ালা তায়েফী হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অনুরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসের সনদ গ্রহণযোগ্য।

কুরআন মজীদে নুকতা স্থাপন

কথিত আছে, খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান কুরআন মজীদে নুকতা লাগাইবার জন্যে সর্বপ্রথম নির্দেশ প্রদান করেন। তাহার নির্দেশে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ কুরআন মজীদের অক্ষরসমূহ নুকতা দ্বারা চিহ্নিত করিবার কার্যে প্রবৃত্ত হন। হাজ্জাজ তখন ওয়াসিত নামক অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি হযরত হাসান বসরী ও হযরত ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়ামারকে উক্ত কার্যে নিয়োজিত করেন। তাঁহারা উহা সম্পন্ন করেন। ইহাও কথিত আছে– আবুল আসওয়াদ দুয়েলী সর্বপ্রথম কুরআন মজীদের অক্ষরসমূহ নুকতা দ্বারা চিহ্নিত করেন। কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন– মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীনের একখানা কুরআন মজীদ ছিল। ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়ামা'র উহার অক্ষরসমূহকে নুকতা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া তাহাকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

কুরআন মজীদের পার্শ্বদেশে দশমাংশসূচক চিহ্ন সর্বপ্রথম কে লাগাইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধেও ইতিহাসকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন– উহাও হাজ্জাজ কর্তৃক সংযোজিত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন– খলীফা মামূন সর্বপ্রথম উক্ত কার্য সম্পাদন করেন। আবূ আমর দানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) কুরআন মজীদে দশমাংশসূচক চিহ্ন লাগানোকে অপছন্দ করিতেন। তিনি উহা ঘষিয়া উঠাইয়া দিতেন। মুজাহিদও উহা অপছন্দ করিতেন। ইমাম মালিক বলেন– 'কুরআন মজীদে কালি দ্বারা দশমাংশসূচক চিহ্ন লাগানোতে কোন দোষ নাই; তবে ভিন্ন রং দ্বারা উহা করা সঙ্গত নহে। মূল কুরআন মজীদে সূরাসমূহের প্রথম দিকে উহাদের আয়াতের সংখ্যা লিখিয়া রাখাকে আমি পছন্দ করি না; তবে ছোট ছোট বালক-বালিকা কুরআন মজীদের যে (খণ্ডিত বা সম্পূর্ণ) সংস্করণ দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া

থাকে, তাহাতে উহা ঐরূপে লিখিয়া রাখার দোষ নাই।[১] কাতাদাহ বলেন– 'লোকগণ প্রথমে কুরআন মজীদের অক্ষরসমূহের নুকতা লাগাইয়াছে; অতঃপর উহাতে পঞ্চমাংশের চিহ্ন ও পরে দশমাংশের চিহ্ন লাগাইয়াছে।' ইয়াহিয়া ইব্ন কাছীর বলেন– মানুষ কুরআন মজীদের অক্ষরসমূহে প্রথমে নুকতা লাগাইয়াছে। উহা অক্ষরের নূর। অতঃপর তাহারা আয়াতের শেষে নুকতা লাগাইবার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিয়াছে। অতঃপর তাহারা কুরআন মজীদ ও উহার সূরাসমূহের প্রারম্ভে প্রারম্ভিক দোয়া এবং উহার সূরাসমূহের শেষে সমাপ্তিকালীন দোয়া সংযোজিত করিয়া দিয়াছে। ইবরাহীম নাখঈ একদা একটি সূরার প্রারম্ভে প্রারম্ভিক দোয়া লিখিত দেখিয়া উহা মুছিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বলিলেন– হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন– কুরআন মজীদ বহির্ভূত কোন কথা তোমরা কুরআন মজীদের সহিত মিলাইয়া দিও না। আবূ আমর দানী বলেন– পরবর্তীকালে মুসলমানগণ কুরআন মজীদের সকল সংস্করণে বিভিন্ন প্রকারের চিহ্ন লাগাইবার বিষয়ে একমত হইয়াছেন। তাহারা উহাকে জায়েয ও বৈধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

নবী করীম (সা)-এর সমীপে জিবরাঈল (আ)-এর কুরআন তিলাওয়াত

উক্ত শিরোনামে ইমাম বুখারী (র) বলেন– হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-কে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন। ইমাম বুখারী আরও বলেন– হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত ফাতিমা (রা) ও মাসরূক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন– নবী করীম (সা) আমাকে গোপনে বলিয়াছেন– 'হযরত জিবরাঈল (আ) প্রতি বৎসর আমাকে কুরআন মজীদ শুনাইতেন। এই বৎসর তিনি আমাকে উহা দুইবার শুনাইয়াছেন। ইহাতে আমার মনে হয়, আমার ইন্তেকাল নিকটবর্তী হইয়াছে।' ইমাম বুখারী উপরোক্ত হাদীসটি এইস্থলে এইরূপ বিচ্ছিন্ন সনদে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি অন্যত্র একাধিক স্থানে উহা অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ যুহরী, ইবরাহীম ইব্ন সা'দ, ইয়াহিয়া ইব্ন কুযাআহ ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) নেক কাজে লোকদের মধ্যে অধিকতর অগ্রগামী ছিলেন। আবার রমযান মাসে তিনি উহাতে অন্যান্য সময়ের তুলনায় অধিকতর অগ্রগামী ছিলেন। কারণ, রমযান মাসের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রতি রাত্রিতে হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। নবী করীম (সা) তাঁহাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার সহিত হযরত জিবরাঈল (আ) সাক্ষাৎ করিবার পর নেক কাজে তিনি প্রবহমান বাতাসের চাইতে অধিকতর দ্রুতগামী হইতেন।' উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয় কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। বুখারী শরীফের প্রথম দিকে এতদসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। হযরত জিবরাঈল (আ)

১. এইরূপেই (ইমাম) মালিক বলেন– তিলাওয়াতের জন্য রক্ষিত কুরআন মজীদের অক্ষরসমূহ ও উহার লিখন পদ্ধতি উসমানী কুরআন মজীদের অক্ষরসমূহ ও উহাদের লিখন পদ্ধতির অনুরূপ হইতে হইবে। অবশ্য বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত কুরআন মজীদে তাহাদের সুবিধার জন্যে উহার ব্যতিক্রম ঘটানোতে দোষ নাই। কুরআন মজীদে উহার সূরাসমূহের আয়াতের সংখ্যা লিখিয়া রাখা সম্বন্ধে ইমাম মালিকের অভিমত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তাবেঈন ও তাঁহাদের পরবর্তী যুগের লোকদের মধ্যে উহা প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ লিখিত বিষয় কুরআন মজীদের সহিত মিলিয়া যাওয়ার আশংকা থাকে না বিধায় উহাতে কোন দোষ নাই।

কর্তৃক নবী করীম (সা)-এর নিকট কুরআন মজীদ আবৃত্ত হইবার হিকমত ও উদ্দেশ্য উহাতে বিবৃত হইয়াছে। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালেহ, আবূ হাসীন, আবূ বকর, খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'প্রতি বৎসর একবার কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া নবী করীম (সা)-কে শুনানো হইত। তবে যে বৎসর তিনি ইন্তিকাল করেন, সেই বৎসর দুইবার তাঁহাকে উহা শুনানো হইয়াছিল। নবী করীম (সা) প্রতি বৎসর দশ দিন ই'তেকাফে বসিতেন। কিন্তু যে বৎসর তিনি ইন্তেকাল করেন, সেই বৎসর বিশ দিন ই'তেকাফে বসিয়াছিলেন।' ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহও উহা উপরোক্ত রাবী আবূ বকর হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ একাধিক অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। সনদের অন্যতম রাবী আবূ বকর হইতেছেন আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশ এবং উহার অন্যতম রাবী আবূ হাসীনের নাম হইতেছে– উসমান ইব্‌ন আসিম। হযরত জিবরাঈল (আ) এবং নবী করীম (সা) পরস্পর পরস্পরকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন। কুরআন মজীদের কোন কোন আয়াত রহিত (মানসূখ) হইয়া যাইবার পর উহা যেইরূপে বলবৎ ছিল, সেইরূপেই যেন উহা নির্ভুল ও নিশ্চিতভাবে মাহফূজ ও সংরক্ষিত থাকে, সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা উহা তিলাওয়াত করিয়া পরস্পরকে শুনাইতেন। এই কারণেই সর্বশেষ বৎসরে তাঁহারা উহা দুইবার তিলাওয়াত করিয়া পরস্পরকে শুনাইয়াছিলেন। হযরত উসমান (রা) কুরআন মজীদের সর্বশেষ আবৃত্তি অনুযায়ী উহাকে সংকলিত করিয়াছিলেন। তিনি রমযান মাসেই উহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কারণ, উক্ত মাসেই নবী করীম (সা)-এর প্রতি সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হইয়াছিল। আর এই কারণেই রমযান মাসে অধিক পরিমাণে কুরআন মজীদ তিলাওয়াতে কঠোর পরিশ্রম করিতেন। ইতিপূর্বে আমি এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি।

কারী সাহাবাবৃন্দ

মাসরূক হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম, আমর, শু'বা, হাফস ইব্‌ন উমর ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর কথা আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন– আমি তাঁহাকে (হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে) সর্বদা ভালবাসিয়া যাইব। কারণ, নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ 'তোমরা চারিটি লোকের নিকট হইতে কুরআন মজীদ গ্রহণ কর (১) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (২) সালিম (৩) মু'আয ইব্‌ন জাবাল এবং (৪) উবাই ইব্‌ন কা'ব।' উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী(র) সাহাবায়ে কিরামের সদগুণাবলী (مناقب) সম্পর্কিত পরিচ্ছেদের একাধিক স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসায়ী উহা উপরোক্ত রাবী মাসরূক হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ওয়ায়েল হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ প্রমুখ রাবীর অধঃস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসে প্রশংসিত সাহাবী চতুষ্টয়ের মধ্য হইতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং আবূ হুযায়ফা-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম হযরত সালিম (রা) ছিলেন প্রথম যুগের মুহাজির সাহাবা। হযরত সালিম (রা) ছিলেন নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে একজন। মদীনায় নবী করীম (সা)-এর আগমনের পূর্বে তিনি নামাযে ইমামতি করিতেন। উক্ত সাহাবী চতুষ্টয়ের মধ্য হইতে হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) এবং হযরত

উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) ছিলেন আনসার সাহাবা। তাঁহাদের স্থান ছিল নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে।

শাকীক ইব্‌ন সালমাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ, হাফস, উমর ইব্‌ন হাফস ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ শাকীক বলেন– একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) আমাদের সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করিতে গিয়া বলিলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিশ্চয় স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে কুরআন মজীদের সত্তরোর্ধ্ব সূরার শিক্ষা লাভ করিয়াছি।[১] আল্লাহ্‌র কসম! নবী করীম (সা)-এর সাহাবীগণ জানেন যে, 'তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্‌র কিতাব সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী, আমি তাহাদের অন্যতম। কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নহি।' রাবী শাকীক বলেন– বক্তৃতা শেষ হইবার পর আমি লোকদের মজলিসে বসিয়া পড়িলাম। তাহারা কি বলে, তাহা শ্রবণ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কাহাকেও হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর উপরোক্ত কথার বিরোধিতা করিতে শুনিলাম না।

আলকামাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম, আ'মাশ, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলকামা বলেন– একদা আমরা হিমস্ নগরে অবস্থান করিতেছিলাম। সেখানে একদিন হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করিলেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল– ইহা কি এইরূপেই নাযিল হইয়াছে? হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিলেন– আমি নবী করীম (সা)-কে (উহা) পড়িয়া শুনাইয়াছি।[২] লোকটি বলিল– 'আপনি সঠিক পড়াই পড়িয়াছেন।' লোকটির মুখে হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) মদের গন্ধ পাইলেন। তিনি বলিলেন– 'তুমি একদিকে মদ্য পান করো আর অন্যদিকে আল্লাহ্‌র কিতাবকে অবিশ্বাস করিতে সাহস করিতেছ?' অতঃপর তিনি (মদ্য পানের শাস্তিস্বরূপ) লোকটিকে দোররা মারিলেন।

মাসরূক হইতে ধারাবাহিকভাবে মুসলিম, আ'মাশ, হাফস, উমর ইব্‌ন হাফস ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিলেন– যে সত্তা ভিন্ন কোন মা'বূদ নাই, সেই সত্তার কসম! কুরআন মজীদের প্রতিটি সূরার অবতীর্ণ হইবার স্থান সম্বন্ধে আমি অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। কুরআন মজীদের প্রতিটি আয়াতের শানেনুযূল সম্বন্ধে আমি অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। আমি যদি জানিতে পারিতাম, কুরআন মজীদ সম্বন্ধে আমার চাইতে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী কোন ব্যক্তি রহিয়াছে, তবে তাহার নিকট উষ্ট্রযান পৌঁছিলে আমি উহাতে আরোহণ করিয়া তাহার নিকট পৌঁছিতাম।'

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) নিজের সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সত্য ও বাস্তব। নিজের সম্বন্ধে প্রয়োজনবোধে এইরূপ প্রশংসামূলক তথ্য প্রকাশ করা কাহারও পক্ষে অন্যায় বা অসমীচীন নহে। এইরূপে হযরত ইউসুফ (আ) নিজের সম্বন্ধে মিশরের অধিপতির নিকট প্রশংসামূলক তথ্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ - اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ -

---

১. হাফিজ ইব্‌ন হাজার আসকালানী তাঁহার 'ফাতহুল বারী' নামক ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ বদর হইতে আসিম কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতে অতিরিক্ত এই কথাটিও রহিয়াছে ঃ 'অবশিষ্ট সূরাসমূহ আমি সাহাবাদের নিকট হইতে শিখিয়াছি।'

২. ইমাম মুসলিম (র) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতে উহা এইরূপে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ 'স্বয়ং নবী করীম (সা) আমাকে উহা শিখাইয়াছেন।' উহাতে আরও উল্লেখিত হইয়াছে ঃ 'আমি লোকটির সহিত কথা বলিবার সময়ে তাহার মুখে মদের গন্ধ পাইলম........।'

(আমাকে যমীনে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন; আমি নিশ্চয় রক্ষণাবেক্ষণের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ও এতদসম্বন্ধীয় জ্ঞানের অধিকারী।)

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর প্রশংসায় নবী করীম (সা)-এর এই বাণীই যথেষ্ট যে, নবী করীম (সা) বলেন– 'তোমরা চার ব্যক্তির নিকট হইতে কুরআন মজীদ শিক্ষা করিও।' অতঃপর নবী করীম (সা) সর্বপ্রথম হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম, আ'মাশ, সুফিয়ান, মুসআব ইব্‌ন মাকদাম ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলেন– 'কুরআন মজীদ যেইরূপে নাযিল হইয়াছে, যে ব্যক্তি উহাকে ঠিক সেইরূপে অবিকৃত অবস্থায় পড়িতে চাহে, সে যেন উহা ইব্‌ন উম্মে আব্‌দ (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ)-এর কিরাআত অনুযায়ী পড়ে।' ইমাম আহমদও উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আ'মাশ হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ মুআবিয়া প্রমুখ রাবী এই ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত দীর্ঘ এবং উহাতে একটি ঘটনা উল্লেখিত রহিয়াছে। ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসায়ীও উহা উপরোক্ত রাবী আবূ মুআবিয়া হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম দারে কুতনী উহাকে সহীহ হাদীস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। আমি (ইব্‌ন কাছীর) উহাকে 'মুসনাদে উমর' নামক হাদীস সংকলনে উল্লেখ করিয়াছি। 'মুসুনাদে আহমদ' সংকলনে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কুরআন মজীদ যেইরূপে নাযিল হইয়াছে, যে ব্যক্তি উহাকে ঠিক সেইরূপে অবিকৃত অবস্থায় পড়িতে চাহে, সে যেন উহা ইব্‌ন উম্মে আব্‌দ-এর কিরাআত অনুযায়ী পড়ে।'

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাম, হাফস্, ইব্‌ন উমর ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কাতাদা বলেন– একদা আমি হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী করীম (সা)-এর যুগে কে কে কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত একত্রিত (মুখস্থ) করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন– 'চার ব্যক্তি। তাঁহারা সকলেই আনসার সাহাবী ঃ (১) উবাই ইব্‌ন কা'ব (২) মু'আয ইব্‌ন জাবাল (৩) যায়দ ইব্‌ন ছাবিত এবং (৪) আবূ যায়দ।' ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত রাবী হুমাম হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী বলেন– হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছুমামাহ, হুসাইন ইব্‌ন ওয়াকিদ এবং ফযলও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছুমামাহ ও ছাবিত, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুছান্না, মুআল্লা ইব্‌ন আসাদ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আনাস (রা) বলেন– 'নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় চারজন সাহাবী ভিন্ন অন্য কোন সাহাবী কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত সংগ্রহ করেন নাই। তাঁহারা হইতেছেন ঃ (১) আবূ দারদা (২) মু'আয ইব্‌ন জাবাল (৩) যায়দ ইব্‌ন ছাবিত এবং (৪) আবূ যায়দ। আমরা তাঁহার উত্তরাধিকারী।'

উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় উপরোক্ত চারজন সাহাবী ভিন্ন অন্য কোন সাহাবী কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত সংগ্রহ করেন নাই। প্রকৃত তথ্য এই যে, একাধিক মুহাজির সাহাবীও নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত সংগ্রহ ও একত্র করেন নাই। এই কারণেই উক্ত হাদীসে শুধু

আনসার সাহাবীদের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। তাঁহারা হইতেছেন ঃ (বুখারী ও মুসলিম উভয় কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত অনুযায়ী) (১) হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব- (শুধু বুখারী কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত অনুয়ায়ী এইস্থলে অবশ্য হযরত আবূ দারদা) (২) হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) (৩) হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) এবং (৪) হযরত আবূ যায়দ (রা)। উক্ত সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবূ যায়দ (রা) ভিন্ন অন্য সকলে মশহুর ও সুপরিচিত। উক্ত হাদীস ভিন্ন অন্য কোন হাদীসে তাঁহার নাম উল্লেখিত হয় নাই। তাঁহার নাম কি? সে সম্বন্ধে ইতিহাসকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন- তাঁহার নাম কয়েস ইব্‌ন সাকান ইব্‌ন কয়েস ইব্‌ন জাউরা ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন জুনদুব ইব্‌ন আমের ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাজ্জার।' ঐতিহাসিক ইব্‌ন নুমায়ের বলেন- তাঁহার নাম হইতেছে সা'দ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন কয়েস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন উমাইয়া। তিনি 'আওস' গোত্রের লোক ছিলেন।' কেহ কেহ বলেন- 'তাঁহারা স্বতন্ত্র নামের স্বতন্ত্র দুই ব্যক্তি। উভয়ই নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত একত্রিত করেন।'

ইমাম আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বার উহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহা সঠিক বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে, ঐতিহাসিক ওয়াকিদী তাঁহার যে নাম-পরিচয় উল্লেখ করিয়াছেন, উহাই সঠিক। ওয়াকিদী কর্তৃক উল্লেখিত পরিচয়ে দেখা যায়- তিনি 'খাযরাজ' গোত্রের লোক ছিলেন। উহাই নির্ভুল। কারণ হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেন- 'আমরা তাঁহার উত্তরাধিকারী।' আর হযরত আনাস (রা) যে খাযরাজ গোত্রের লোক, তাহা নিশ্চিত। এমনকি কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আনাস (রা) বলেন- 'তিনি আমার জনৈক পিতৃব্য ছিলেন।' হযরত আনাস (রা) হইতে কাতাদাহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেন- 'একদা আওস ও খাযরাজ এই দুই গোত্রের লোকেরা পরস্পর পরস্পরের কাছে গৌরব প্রকাশ করিবার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইল। আওস গোত্রের লোকেরা বলিল- আমাদের গোত্রে এমন শহীদ রহিয়াছেন, যাহাকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়াছিলেন। তিনি হইতেছেন- হানযালা ইব্‌ন আবূ আমের। আমাদের গোত্রে এমন লোকও রহিয়াছেন, যাহাকে মৌমাছির ঝাঁক শত্রু হইতে রক্ষা করিয়াছিল (حمته الدبر)। তিনি হইতেছেন আসিম ইব্‌ন ছাবিত। আমাদের গোত্রে এমন লোকও রহিয়াছেন, যাহার মৃত্যুতে আল্লাহ্ তা'আলার আরশ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তিনি হইতেছেন- সা'দ ইব্‌ন মু'আয। আমাদের গোত্রে এমন লোকও রহিয়াছেন, যাহার একার সাক্ষ্যকে দুইজনের সাক্ষ্যের সমান মূল্য দেওয়া হইয়াছিল। তিনি হইতেছেন খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত।' এবার খাযরাজ গোত্রের লোকেরা বলিল- 'আমাদের গোত্রে এমন চারজন লোক রিহিয়াছেন, যাহারা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত সংগ্রহ ও একত্র করিয়াছিলেন। তাঁহারা হইতেছেন (১) উবাই ইব্‌ন কা'ব (২) মু'আয ইব্‌ন জাবাল (৩) যায়দ ইব্‌ন ছাবিত এবং (৪) আবূ যায়দ।' উক্ত রিওয়ায়েত সহ সকল রিওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবূ যায়দের গোত্র পরিচয় সম্বন্ধে ওয়াকিদী যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য। একাধিক ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত আবূ যায়দ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। যুহরী হইতে মূসা ইব্‌ন উকবা বর্ণনা করিয়াছেন যে, যুহরী বলেন- আবূ যায়দ কায়স ইব্‌ন সাকান 'জিসরে আবূ উবায়দ'-এর যুদ্ধে পনের হিজরীর শেষ দিকে শহীদ হন।

মুহাজির সাহাবীদের মধ্যেও যে এমন সব ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহারা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত সংগ্রহ ও একত্র করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ এই

যে, নবী করীম (সা) মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকা অবস্থায় নামাযে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে মুহাজির ও আনসার সকল সাহাবীগণের ইমাম বানাইবার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন– 'সাহাবীদের জামাআতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবের কিরাআতে অধিকতর অগ্রগামী, সে-ই তাহাদের ইমাম হইবে।' উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কুরআন মজীদের কিরাআতে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অধিকতর অগ্রগামী ছিলেন। শায়খ আবুল হাসান আলী ইব্ন ইসমাঈল আশআরী এতদসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন উপরোক্ত আলোচনা উহা হইতে গৃহীত হইয়াছে। শায়খের বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় অখণ্ডণীয় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। হাফিজ ইব্ন সামআনী এ সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 'মুসনাদে শায়খাইন' নামক হাদীস সংকলনে এই বিষয়ে আমি সুবিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

মুহাজির সাহাবীদের মধ্যে যাহারা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত করিয়াছিলেন, হযরত উসমান (রা) এবং হযরত হযরত আলী (রা)-ও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উসমান (রা) এক রাকাআতে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়াছিলেন। আমি অচিরেই উহা আলোচনা করিব। কথিত আছে, কুরআন মজীদ যে তারতীবে নাযিল হইয়াছিল, হযরত আলী (রা) উহা সেই তারতীবে সংকলন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় যে সকল মুহাজির সাহাবা কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ সংকলন করিয়াছিলেন, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন– 'কুরআন মজীদের প্রতিটি আয়াতের অবতরণস্থল ও অবতরণের উপলক্ষ সম্বন্ধে আমি অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। যদি আমি জানিতে পারিতাম যে, আল্লাহ্র কিতাব সম্বন্ধে আমার চাইতে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী কেহ রহিয়াছেন, তবে তাহার নিকট উষ্ট্রযানে যাওয়া সম্ভবপর হইলে আমি তাঁহার নিকট গমন করিতাম।'

নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় যে সকল মুহাজির সাহাবা কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত করিয়াছিলেন, হযরত আবূ হুযায়ফা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত সালিম (রা) তাঁহার স্থান ছিল অতি ঊর্ধ্বে। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। যে সকল মুহাজির সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত করিয়াছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-ও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন নবী করীম (সা)-এর চাচাতো ভাই। তাঁহার পিতা হযরত আব্বাস (রা) নবী করীম (সা)-এর পিতৃব্য ছিলেন। তাঁহার পিতামহ এবং নবী করীম (সা)-এর পিতামহ একই ব্যক্তি– আবদুল মুত্তালিব। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্র এবং কুরআন মজীদের ব্যাখ্যাতা। ইতিপূর্বে মুজাহিদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন– 'আমি দুইবার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছি। প্রতিটি আয়াত তিলাওয়াত করিবার পর আমি থামিয়া গিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিতাম।' যে সকল মুহাজির সাহাবা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহিয়া ইব্ন হাকীম ইব্ন সাফওয়ান, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মালীকাহ ও ইব্ন জুরায়জ এই ঊর্ধ্বতন অভিন্ন সনদাংশে এবং পৃথক পৃথক অধস্তন সনদাংশে ইমাম নাসায়ী এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন

আমর (রা) বলেন ঃ আমি কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত করিয়া উহা প্রতি রাত্রিতে তিলাওয়াত করিতাম। একদা এই সংবাদ নবী করীম (সা)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি আমাকে বলিলেন– 'উহা এক মাসে একবার তিলাওয়াত কর।' অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) আলোচ্য হাদীসের অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করিয়াছেন।[১]

১. হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীস সম্বন্ধে এখানে কিছু জরুরী বক্তব্য বিবৃত হইতেছে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, চারিজন সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত করিয়াছিলেন। উক্ত হাদীসে উল্লেখিত চারজন সাহাবী ভিন্ন অন্য কোন সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত করেন নাই, এইরূপ বর্ণনা সঠিক নহে। উহা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত বর্ণনা। কোন রাবী হয়ত ভুলক্রমে ঐরূপে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত হাদীসে উল্লেখিত চারজন সাহাবী ভিন্ন একাধিক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত করিয়াছিলেন।

তবে যেহেতু উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ, তাই উহার বক্তব্য বিষয়কে সঠিক বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্যে ব্যাখ্যাকারগণ উহার একেকরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিজ ইব্‌ন হাজার আসকালানী 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে ব্যাখ্যাকারদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ "কাযী আবূ বকর বাকিল্লানী প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের নানারূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

প্রথম ব্যাখ্যা এই যে, হাদীসে শুধু চারিজন সাহাবীর নাম উল্লেখিত হইয়াছে। উহাতে এইরূপ কোন কথা উল্লেখিত হয় নাই যে, উক্ত চারজন ভিন্ন অন্য কোন সাহাবা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ সংগ্রহ করেন নাই। হাদীসে চারিজনের উল্লেখ কোনরূপ (حصر) সীমাবদ্ধকরণ নহে; বরং উহা সংশ্লিষ্ট সাহাবীদের মধ্য হইতে কয়েকজনের নাম উল্লেখমাত্র।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, উক্ত চারিজন সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদকে উহার সাতটি কিরাআতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অন্যান্য সাহাবী যাঁহারা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারা উহা উহার সাতটি কিরাআতে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

তৃতীয় ব্যাখ্যা এই যে, কুরআন মজীদের রহিত (منسوخ) ও অরহিত (غير منسوخ) এই উভয় শ্রেণীর আয়াতসমূহকে মাত্র উক্ত চারিজন সাহাবীই নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অন্যান্য যাঁহারা উহা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহার উভয় শ্রেণীর আয়াত নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

চতুর্থ ব্যাখ্যা এই যে, উক্ত হাদীসে উল্লেখিত একত্রিতকরণ (الجمع) শব্দের তাৎপর্য হইতেছে অন্যের মাধ্যমে নহে; বরং স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে সরাসরি শিক্ষা করত সংগ্রহ করা। উক্ত সাহাবী চতুষ্টয় স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অন্যান্য যে সকল সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহা সম্পূর্ণত স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

পঞ্চম ব্যাখ্যা এই যে, উক্ত চারিজন সাহাবী কুরআন মজীদ শিক্ষা প্রদানের কার্যে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অন্যান্য সাহাবী উক্ত কার্যে তাঁহাদের ন্যায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে পারেন নাই। এইহেতু উক্ত সাহাবী চতুষ্টয় নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদ সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্রে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন– যে খ্যাতি অন্য কোন সাহাবী লাভ করেন নাই। অথবা অন্যান্য সাহাবী উক্ত সাহাবী চতুষ্টয়ের ন্যায় নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের শিক্ষা প্রদান কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেও তাঁহারা লোক প্রদর্শন বা রিয়াকারীর ভয়ে লোক সমক্ষে উহা প্রকাশ পাইতে দেন নাই। পক্ষান্তরে উক্ত চারিজন সাহাবী রিয়াকারীর রোগ হইতে নিজদিগকে মুক্ত মনে করিয়া এবং উহার আক্রমণ হইতে নিজেদের আত্মাকে নিরাপদ মনে করিয়া লোক সমক্ষে নিজেদের কার্যকে প্রকাশ পাইতে বাধা দেন নাই। ফলে একদিকে যেমন অন্যান্য সাহাবীর নাম এই বিষয়ে অপ্রকাশিত রহিয়া গিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি উক্ত

হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন যুবায়র, হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত, সুফিয়ান, ইয়াহিয়া, সাদাকা ইব্ন ফযল ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) বলিয়াছেন– আলী (রা) হইতেছেন বিচারকার্যে আমাদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি ও উবাই (রা) হইতেছেন কিরাআতে আমাদের মধ্যে যোগ্যতম

(চলমান) সাহাবা চতুষ্টয়ের নাম এই বিষয়ে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে। হযরত আনাস (রা) তাঁহার জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী মাত্র উক্ত চারিজন সাহাবীর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য একাধিক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ ব্যাখ্যা এই যে, আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত একত্রিতকরণ (الجمع) শব্দের তাৎপর্য হইতেছে– লিখিত আকারে একত্রিত ও সংগৃহীত করা। উক্ত চারিজন সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ লিখিত আকারে একত্রিত ও সংগৃহীত করিয়াছিলেন। অন্যান্য যে সকল সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত ও সংগৃহীত করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহা মুখস্থ আকারে একত্রিত ও সংগৃহীত করিয়াছিলেন।

সপ্তম ব্যাখ্যা এই যে, আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত সাহাবা চতুষ্টয় ভিন্ন অন্য কোন সাহাবী প্রকাশ করেন নাই যে, তিনি নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদ পরিপূর্ণরূপে সংগ্রহ করিয়াছেন। কেবলমাত্র উক্ত সাহাবী চতুষ্টয়ই উহা প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা উপরোক্তরূপ কথা প্রকাশ করেন নাই, তাঁহারা কুরআন মজীদের সর্বশেষ আয়াত নাযিল হইবার পূর্বে এইরূপ দাবী করা সমীচীন ও সঠিক নহে। পক্ষান্তরে, উক্ত চারিজন সাহাবী মনে করিয়াছেন যে, 'কুরআন মজীদের অবতীর্ণ আয়াতসমূহ তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা কুরআন মজীদ সংগ্রহ করিয়াছেন এইরূপ দাবী করা অসঙ্গত ও অসমীচীন নহে। এই কারণে হযরত আনাস (রা) মাত্র চারিজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করিতে পারিয়াছেন।

অষ্টম ব্যাখ্যা এই যে, আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত একত্রিতকরণ (الجمع) শব্দের তাৎপর্য হইতেছে– কুরআন মজীদ শ্রবণ করা, অন্তরে উহার প্রতি অনুগত হওয়া এবং উহা কার্যে পরিণত করা। আলোচ্য হাদীসে মাত্র উল্লেখিত সাহাবী চতুষ্টয়ই নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদকে উপরোক্ত অর্থে একত্রিত করিয়াছিলেন বলিয়াই হযরত আনাস (রা) মাত্র তাঁহাদের চারিজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ 'যুহদ' পরিচ্ছেদে আবূ যাহেদ নামক রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা একটি লোক হযরত আবূ দারদা (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল– আমার পুত্র কুরআন মজীদ জমা করিয়াছে। ইহাতে হযরত আবূ দারদা (রা) বলিলেন– 'আয় আল্লাহ্! তোমার নিকট মাগফিরাত প্রার্থনা করি। যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের উপর আমল করিয়াছে, একমাত্র তাহার সম্বন্ধেই বলা চলে যে, সে কুরআন মজীদ জমা করিয়াছে।'

উপরে আলোচ্য হাদীসের যে সকল ব্যাখ্যা উল্লেখিত হইল, উহার অধিকাংশই কষ্ট-কল্পিত ব্যাখ্যা। বিশেষত সর্বশেষ ব্যাখ্যাটি (অষ্টম ব্যাখ্যাটি) হইতেছে একেবারেই অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও বাতিল ব্যাখ্যা। উহা জ্বলন্ত সত্যের স্পষ্ট অস্বীকৃতি ভিন্ন কিছু নহে। এক কথায় সর্বশেষ ব্যাখ্যাটি সত্যের অপলাপ মাত্র।

আলোচ্য হাদীসের অন্য একটি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। উহা এই যে, হযরত আনাস (রা) যেহেতু খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন, তাই তিনি স্বীয় গোত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী আওস গোত্রের মুকাবিলায় খাযরাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া খাযরাজ গোত্রীর উক্ত চারিজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ জমা করিবার কৃতিত্ব আওস ও খাযরাজ এই দুই গোত্রের মধ্যে শুধু খাযরাজ গোত্রের রহিয়াছে; আওস গোত্র উক্ত কৃতিত্বের অধিকারী হইতে পারে নাই। উভয় গোত্রের বাহিরের কোন সাহাবী উক্ত কৃতিত্বের অধিকারী হইতে পারেন নাই– এইরূপ কথা বুঝানো হযরত আনাস (রা)-এর উদ্দেশ্য নহে।

আলোচ্য হাদীসের আরেকটি ব্যাখ্যাও কাহারও মনে উদিত হওয়া অসম্ভব নহে। উহা এই যে, হযরত আনাস (রা) যেহেতু খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন, তাই উক্ত গোত্রের লোক ভিন্ন অন্য কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেন নাই– তিনি আনসারীই হউন আর মুহাজিরই হউন। তবে এইরূপ ব্যাখ্যার সম্ভাবনা ও যৌক্তিকতা যে একেবারেই কম তাহা না বলিলেও চলে।

ব্যক্তি। আর আমরা নিশ্চয় উবাই কর্তৃক পঠিত কিছু কিরাআত পরিত্যাগ করিব। এদিকে উবাই কিন্তু বলিয়া থাকেন– 'আমি উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে গ্রহণ করিয়াছি; সুতরাং কোনক্রমেই উহা পরিত্যাগ করিব না।' অথচ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا -

---

(চলমান) বিপুলসংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদ হিফজ করিতেন। অত্র গ্রন্থের المبعث নামক পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হইয়াছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) স্বীয় গৃহের আঙ্গিনায় একটি ব্যক্তিগত ইবাদতখানা বানাইয়াছিলেন। তিনি সেখানে বসিয়া কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেন। (অর্থাৎ কুরআন মজীদের যতটুকু নাযিল হইয়াছিল, তিনি উহার ততটুকুই তিলাওয়াত করিতেন।) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক সম্পর্কিত উক্ত তথ্য সন্দেহাতীতরূপে সত্য। কারণ, স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে কুরআন মজীদের শিক্ষা লাভ করিবার জন্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ইচ্ছুক ও আগ্রহান্বিত। উভয়ের মক্কায় অবস্থানকালে নবী করীম (সা)-এর জন্যে তিনি নিজের মন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে পার্থিব চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে শুধু আল্লাহ্ ও রাসূলের চিন্তা স্থায়ীভাবে বিরাজমান ছিল। উভয়ে উভয়ের সহিত প্রায়ই মিলিত হইতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন যে, নবী করীম (সা) সকালে-বৈকালে তাঁহাদের বাড়ীতে আগমন করিতেন। হিজরত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে উহা বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) (মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায়) বলিয়াছিলেন, সাহাবীদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের কিরাআতে অধিকতর অগ্রগামী, সেই ব্যক্তি নামাযে তাহাদের ইমাম হইবে। অন্যত্র উল্লেখিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) উহা দ্বারা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। ইমাম মুসলিম উক্ত হাদীসটি সহীহ্ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। অন্যত্র আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে নামাযে সাহাবীদের ইমাম হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি সকল সাহাবীর মধ্যে কুরআন মজীদের কিরাআতে অধিকতর অগ্রগামী ছিলেন। পক্ষান্তরে, হযরত আলী (রা) সম্বন্ধে অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরে কুরআন মজীদকে উহার অবতরণের ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন।

ইমাম নাসাঈ সহীহ সনদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন– আমি কুরআন মজীদ জমা করিয়া প্রতি রাত্রিতে উহা তিলাওয়াত করিতাম। একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছিলে তিনি আমাকে বলিলেন– 'তুমি উহা একমাসে একবার তিলাওয়াত কর।' হাদীসের অবশিষ্টাংশ এইস্থলে অনুল্লেখিত রহিয়াছে। সহীহুল বুখারীতে আবূ হুযায়ফা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত সালিম (রা)-এর নাম উল্লেখিত রহিয়াছে। তাঁহারা সকলেই মুহাজির ছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে হইতে যাঁহারা কারী ছিলেন, ইমাম আবূ উবায়দ তাহাদের নামের একটি তালিকা পেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মুহাজির ছিলেন, তাঁহাদের নাম এই ঃ চার খলীফা, হযরত তালহা, হযরত সা'দ, হযরত হুযায়ফা, হযরত সালিম, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সায়েব, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)– ইহারা সকলে মুহাজির পুরুষ। মহিলা মুহাজির কারীগণ হইতেছেন ঃ হযরত আয়েশা, হযরত হাফসা এবং হযরত উম্মে সালামা (রা)। অবশ্য ইহাদের কেহ কেহ নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর কুরআন মজীদের কিরাআতের শিক্ষা পূর্ণ করিয়াছিলেন। অতএব, হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটি তাঁহাদের বিষয়ের সহিত সংঘর্ষশীল নহে। ইমাম ইব্ন আবূ দাউদ তাঁহার 'কিতাবুশ শারীআহ' নামক পুস্তকে মুহাজির কারী সাহাবীদের মধ্যে হযরত তামীম ইব্ন আওস দারী এবং হযরত উকবা ইব্ন আমেরের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। আনসার কারী সাহাবীদের মধ্যে তিনি হযরত উবাদা ইব্ন সামিত, হযরত মাআজ (যিনি আবূ হালীমা নামেও পরিচিত ছিলেন), হযরত মাজমা' ইব্ন হারিছা, হযরত ফুযালাহ ইব্ন উবায়েদ, মাসলামা ইব্ন মাখলাদ প্রমুখ সাহাবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের কেহ কেহ নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ জমা করিয়াছিলেন। আবূ আমর দানী কারী সাহাবী হিসাবে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর নামও উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী যুগের কোন কোন ঐতিহাসিক কারী সাহাবী হিসাবে হযরত আমর ইব্ন আস (রা), হযরত সা'দ ইব্ন ওক্কাস এবং হযরত উম্মে ওরাকার নামও উল্লেখ করিয়াছেন।

'যদি আমি কোন আয়াত রহিত বা বিস্মৃত করিয়া দেই, তবে আমি উহা অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর অথবা উহার সমকক্ষ আয়াত তদস্থলে স্থাপন করি।'

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিজ্ঞ ব্যক্তিও কখনো কখনো এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন- যাহাকে তিনি সঠিক ও নির্ভুল মনে করিলেও উহা প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্ত ও অবাস্তব হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে ইমাম মালিকের কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন- 'এই কবরের অধিবাসী (নবী করীম সা) ভিন্ন কাহারো প্রতিটি কথাই গ্রহণযোগ্য নহে; বরং এই কবরের অধিবাসী ভিন্ন অন্য যে কোন ব্যক্তির কোনও কথা গ্রহণযোগ্য এবং কোনও কথা প্রত্যাখ্যানযোগ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ একমাত্র নবী করীম (সা)-এর প্রতিটি কথাই গ্রহণযোগ্য; অন্য কাহারো প্রতিটি কথা সেইরূপ নহে।

অতঃপর ইমাম বুখারী (র) সূরা ফাতিহাসহ বিভিন্ন সূরার ফযীলত বর্ণনা করিয়াছেন। আমি প্রতিটি সূরার তাফসীরের সহিত উহার ফযীলত বর্ণনা করিয়াছি। অতএব এখানে উহার বর্ণনা প্রদান হইতে বিরত রহিলাম।

কুরআন তিলাওয়াতের সময় রহমতের ফেরেশতার অবতরণ

হযরত উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম, যায়দ ইব্‌ন হা'দ, লায়ছ ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

একদা রাত্রিকালে উসায়দ ইব্‌ন হুযায়ের সূরা বাকারা তিলাওয়াত করিতেছিলেন। তাঁহার ঘোড়াটি তখন নিকটেই বাঁধা ছিল। সহসা উহা চতুর্দিকে লাফ দিতে লাগিল। তিনি চুপ করিলেন। ঘোড়াটিও থামিয়া গেল। তিনি আবার তিলাওয়াত করিতে লাগিলেন। ঘোড়াটিও আবার লাফাইতে লাগিল। তিনি চুপ করিলেন। ঘোড়াটিও থামিল। তিনি পুনরায় তিলাওয়াত করিতে লাগিলেন। ঘোড়াটিও পুনরায় লাফাইতে লাগিল। এবার তিনি (তিলাওয়াত ত্যাগ করিয়া ঘোড়াটির কাছে) ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পুত্র ইয়াহিয়া ঘোড়াটির কাছে ছিল। তাঁহার মনে আশংকা হইয়াছিল, ঘোড়াটি তাঁহার পুত্রকে পদদলিত করিতে পারে। তিনি তাহাকে টানিয়া লইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।................ এক সময়ে উহা অদৃশ্য হইয়া গেল।[১] সকাল বেলায় তিনি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে ঘটনাটি বর্ণনা করিলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন- 'ওহে ইব্‌ন হুযায়র! তুমি তিলাওয়াত করিতে থাকিলে না কেন? ওহে ইব্‌ন হুযায়র! তুমি তিলাওয়াত করিতে থাকিলে না কেন?' হযরত উসয়দ ইব্‌ন হুযায়র বলিলেন- আমি আশংকা করিলাম যে, ঘোড়াটি (আমার পুত্র) ইয়াহিয়াকে পদদলিত করিবে। সে ঘোড়াটির কাছেই ছিল। আমি মস্তক উত্তোলিত করিয়া তাহার (স্বীয় পুত্রের) নিকট গেলাম। তথায় আমি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলাম, উর্ধ্বে চাঁদোয়ার মত

১.হাফিজ ইব্‌ন হাজার আসকালানী উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইমাম বুখারী (র) উপরোক্ত বর্ণনায় কিছু বক্তব্য উহ্য রহিয়াছে। আবূ উবায়দ কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতে এইরূপ উল্লেখিত রহিয়াছে ঃ "... ... ...। তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তথায় চাঁদোয়ার ন্যায় একটি বস্তু রহিয়াছে। উহাতে লণ্ঠনের ন্যায় কতগুলি বস্তু (ঝুলন্ত) রহিয়াছে। উহা উর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে একসময়ে অদৃশ্য হইয়া গেল।" বুখারী শরীফের কোন কোন রিওয়ায়েতে এইরূপ হযফ বা উহ্যকরণ পরিদৃষ্ট হয়। উহার কারণ এই যে, কোন অংশ (লোকের নিকট) বিদিত থাকিবার কারণে কোন কোন রাবী উহা উহ্য রাখেন; ইমাম বুখারী (র) স্বীয় বর্ণনায় তদনুযায়ী উহা উহ্য রাখিয়াছেন।

একটি বস্তু রহিয়াছে। উহাতে লণ্ঠনের ন্যায় কতগুলি বস্তু (ঝুলন্ত) রহিয়াছে। আমি বাহিরে আসিবার পর উহা আর দেখিতে পাইলাম না। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'উহা কি তাহা কি তুমি জান?' হযরত উসায়দ (রা) বলিলেন– '(ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) তাহা আমি জানি না।' নবী করীম (সা) বলিলেন– 'উহারা ছিলেন ফেরেশতা। উহারা তোমার কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্যে নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। তুমি সকাল বেলা পর্যন্ত তিলাওয়াত অব্যাহত রাখিলে লোকে সকাল বেলায় তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইত। তাঁহারা তখন লোকদের নিকট হইতে পর্দার অন্তরালে থাকিতেন না।' উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী যায়দ ইব্ন হাদী বলেন– হযরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাব্বাব (রা) আমার নিকট উপরোক্ত রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রূপেই বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসের উপরোক্ত দুইটি সনদের প্রথম সনদে দুইটি স্থানে বিচ্ছিন্নতা রহিয়াছে ঃ প্রথমত, মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম তাবেঈ এবং হযরত উসায়েদ ইব্ন হুযায়ের– এই দুইয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ লাভ ঘটে নাই। মুহাম্মদের পরিচয় হইতেছে মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হারিছ তায়মী মাদানী তাবেঈ। তিনি হিজরী বিশ সনে অল্প বয়সেই মারা যান। হযরত উমর (রা) তাঁহার জানাযার নামাযে ইমামতী করেন। দ্বিতীয়ত, লায়ছ যেহেতু ইমাম বুখারীর উস্তাদ নহেন, তাই উক্ত হাদীস তিনি লায়ছের নিকট হইতে সরাসরি শুনেন নাই।

ইমাম বুখারীও বলেন নাই– 'লায়ছ আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।' বরং তিনি বলিয়াছেন– 'লায়ছ বলিয়াছেন।' অতএব সনদের এই স্থলেও বিচ্ছিন্নতা রহিয়াছে। ইমাম বুখারী বিচ্ছিন্ন সনদে হাদীস বর্ণনা করিবার কালে এইরূপ বাকধারা খুব কমই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। হাফিজ আবুল কাসিম ইব্ন আসাকির স্বীয় 'আতরাফ' পুস্তকে অবশ্য উক্ত হাদীস লায়ছ নামক রাবীর পর্যায়ে অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন– 'লায়ছ হইতে ইয়াহিয়া ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন বুকায়র উহা উপরোক্ত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।' আমি (ইব্ন কাছীর) উহা অন্য কোথাও উহার সনদের অন্যতম রাবী লায়েছের পর্যায়ে অবিচ্ছিন্নরূপে দেখিতে পাই নাই।

ইমাম আবূ উবায়দ 'ফাযায়েলুল কুরআন' পুস্তকে বলিয়াছেন ঃ হযরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হারিছ তায়মী, ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উসামাহ ইব্ন হাদী, লায়ছ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিক ও ইয়াহিয়া ইব্ন বুকায়র আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ (অতঃপর রাবী উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন)। ইমাম আবূ উবায়দ অতঃপর বলিয়াছেন– হযরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ সাঈদ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাব্বাবও আমার নিকট উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।' হযরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ সাঈদ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাব্বাব, ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (ইব্ন হাদী), সাঈদ ইব্ন আবূ হিলাল, খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ লায়ছ, দাউদ ইব্ন মানসূর, শুআয়ব ইব্ন লায়ছ এবং আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল হাকাম ও ইমাম নাসাঈ উহা 'ফাযায়েলুল কুরআন' পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। লায়ছ হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং লায়ছ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহিয়া ইব্ন বুকায়রের অধস্তন সনদাংশেও ইমাম নাসাঈ উহা উক্ত পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, ইমাম নাসাঈ উক্ত পুস্তকে উহা দুইটি সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাব্বাব, ইয়াযীদ ইব্‌ন হাদী, ইবরাহীম, ইয়া'কুব ইব্‌ন ইবরাহীম, আহ্‌মদ ইব্‌ন সাঈদ রিবাতী ও ইমাম নাসাঈ উহা 'সাহাবীগণের ব্যক্তিগত গুণাবলী' নামক পুস্তকেও বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন– 'একদা উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) স্বীয় অশ্বশালায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেছিলেন।... ... .।' উহাতে একথা উল্লেখিত নাই যে, হযরত আবূ সাঈদ (রা) হযরত উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বাহ্যত উহাই মনে হয়। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন কা'ব, ইব্‌ন মালিক, ইব্‌ন শিহাব, লায়ছ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালেহ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উসায়দ বলেন যে, 'একদা তিনি স্বীয় গৃহের উন্মুক্ত স্থানে বসিয়া কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল মধুর।' অতঃপর রাবী পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

হযরত উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা, ছাবিত বান্নাঈ, হাম্মাদ ইব্‌ন সালমাহ কুবায়সা ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উসায়দ (রা) বলেন– একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলাম – হে আল্লাহ্‌র রাসূল! গত রাত্রিতে আমি একটি সূরা তিলাওয়াত করিতেছিলাম। উহা শেষ করিবার পর আমি আমার পশ্চাতে ধপাস করিয়া কোন কিছুর পড়িয়া যাইবার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি ভাবিলাম, আমার ঘোড়াটি হাঁটিতেছে। নবী করীম (সা) বলিলেন– ওহে আবূ উসায়দ! তুমি বলিতে থাকো। তিনি ইহা দুইবার বলিলেন। হযরত উসায়দ বলিলেন[১] ঃ আমি তাকাইয়া দেখি, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে লণ্ঠনের মত কতগুলি বস্তু রহিয়াছে। নবী করীম (সা) বলিলেন– ওহে আবূ উসায়দ।! তুমি বলিতে থাক। হযরত উসায়দ বলিলেন– আল্লাহ্‌র কসম! আমি আর বলিতে পারিলাম না। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'উহারা ছিলেন ফেরেশতা। উহারা কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শ্রবণের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তুমি তোমার তিলাওয়াত কার্য চালাইয়া গেলে আশ্চর্যকর বিষয়সমূহ দেখিতে পাইতে।'

আবূ ইসহাক হইতে ধারাবাহিকভাবে শু'বা ও ইমাম আবূ দাউদ তায়ালেসী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ ইসহাক হযরত বারা (রা)-কে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছেন ঃ একদা রাত্রিকালে এক লোক সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করিতেছিল। সহসা সে স্বীয় বাহন অথবা অশ্বকে লাফাইতে দেখিল। সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, (ঊর্ধ্বে) একখণ্ড মেঘের মতো কি যেন রহিয়াছে। লোকটি উক্ত ঘটনা নবী করীম (সা)-এর নিকট বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন– 'উহা ছিল সাকীনাহ (প্রশান্তি)। উহা কুরআন মজীদের উদ্দেশে অথবা কুরআন মজীদের উপর নাযিল হইয়াছিল।' ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (র)-ও উহা উপরোক্ত রাবী শু'বার মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত লোকটি ছিলেন, হযরত উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা)। এই বিষয়টি সনদ শাস্ত্রের সহিত সম্পর্কিত। ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীসসমূহের মধ্যে উপরোক্ত হাদীস হইতেছে অতি বিরল বর্ণনাভঙ্গিতে বর্ণিত। তিনি উহা

১. মূল রিওয়ায়েতে এইরূপই উল্লেখিত রহিয়াছে। এইস্থলে এইরূপ হওয়া সঙ্গত ছিল ঃ 'হযরত উসায়দ (রা) বলেন, আমি বলিলাম।' হযরত উসায়দের ঘটনা সম্পর্কিত পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রিওয়ায়েতে অনুরূপ অসঙ্গতিও বিদ্যমান রহিয়াছে। স্বচ্ছ দৃষ্টির সম্মুখে উহা গোপন থাকিবার কথা নহে।

ব্যতিক্রমধর্মী বর্ণনাভঙ্গিতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর লক্ষণীয় যে, উক্ত হাদীসের বক্তব্য বিষয় বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদের ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক প্রদত্ত 'কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের সময়ে রহমতের ফেরেশতার অবতরণ' এই শিরোনামে বিধৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হযরত উসায়দের উপরোক্ত ঘটনার অনুরূপ একটি ঘটনা হযরত ছাবিত ইব্ন কয়স ইব্ন শাম্মাসের বেলায়ও ঘটিয়াছিল। জারীর ইব্ন ইয়াযীদ হইতে ধারাবাহিকভাবে জারীর ইব্ন হাযিম (জারীর ইব্ন ইয়াযীদের ভ্রাতুষ্পুত্র) ইবাদ ইব্ন উব্বাদ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ জারীর ইব্ন ইয়াযীদ বলেন– মদীনার বৃদ্ধেরা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করা হইল– হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি শুনেন নাই যে, গত রাত্রিতে সারাক্ষণ ছাবিত ইব্ন কয়স ইব্ন শাম্মাসের গৃহ আলোকমালায় সুসজ্জিত ছিল? নবী করীম (সা) বলিলেন– 'তবে সে হয়ত সূরা বাকারা তিলাওয়াত করিয়াছিল।' অতঃপর ছাবিতের নিকট এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন– 'আমি সূরা বাকারা তিলাওয়াত করিয়াছিলাম।'

'কোন জামাআত আল্লাহ্র কোন ঘরে একত্রিত হইয়া যদি তাঁহার কিতাব তিলাওয়াত করে এবং একজন আরেকজনকে উহা শিক্ষা দেয়, তবে তাহাদের উপর নিশ্চিতভাবে প্রশান্তি নাযিল হয়, তাহাদিগকে রহমত বেষ্টন করিয়া লয়, ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখে এবং যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রহিয়াছেন, তিনি তাহাদের নিকট সেই জামাআতের লোকদের বিষয় আলোচনা করেন।' ইমাম মুসলিম (র) উহা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ط اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا 'আর তুমি ফজরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করো; ফজরের তিলাওয়াত নিশ্চয় পর্যবেক্ষিত হইয়া থাকে।'

কোন কোন তাফসীরকার উক্ত আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন– 'ফেরেশতাগণ ফজরের তিলাওয়াত প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।' বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– তোমাদের নিকট ফেরেশতাগণ রাত্রিতে ও দিনে পালাক্রমে আগমন করেন। তাঁহারা উভয় দলই ফজরের নামাযে এবং আসরের নামাযে (তোমাদের নিকট) একত্রিত হন। কোন দল যখন তোমাদের নিকট থাকিবার পর তাঁহার (আল্লাহ্ তা'আলার) নিকট প্রত্যাবর্তন করে; তখন তিনি তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন– অবশ্য তিনি তোমাদের অবস্থা সম্বন্ধে সর্বোত্তম অবগত রহিয়াছেন– তোমরা আমার বান্দাদিগকে কোন অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছ? তাঁহারা বলেন– 'আমরা তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে নামায আদায়রত অবস্থায় পাইয়াছি; আবার তাহাদের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার কালে তাহাদিগকে নামায আদায়রত অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছি।'

তিনি দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব ভিন্ন অন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই

আবদুল আযীয ইব্ন রফী' হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবদুল আযীয ইব্ন রফী' বলেন– একদা শাদ্দাদ ইব্ন মা'কাল এবং আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গমন করিলাম। শাদ্দাদ ইব্ন মা'কাল তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন– নবী করীম (সা) কি কোন সম্পত্তি রাখিয়া যান

নাই।' আবদুল আযীয ইব্ন রফী' বলেন– আমরা মুহাম্মদ ইব্ন হানফিয়ার নিকট গমন করত তাঁহার নিকট সেই একই প্রশ্ন করিলে তিনিও বলিলেন– 'নবী করীম (সা) দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব ভিন্ন অন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই।'

উক্ত রিওয়ায়েতটি শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই। উহার তাৎপর্য এই যে, নবী করীম (সা) এইরূপ কোন ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই যাহা উত্তরাধিকারের নিয়মে বণ্টিত হইতে পারে। এইরূপে জুওইরিয়ার ভ্রাতা আমর ইব্ন হারিছও বলেন– নবী করীম (সা) দীনার, দিরহাম, দাস-দাসী বা অন্য কোন ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই। হযরত আবূ দারদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রহিয়াছে ঃ 'নবীগণ দীনার-দিরহামকে উত্তরাধিকারের সম্পত্তি হিসাবে রাখিয়া যান নাই; তাঁহারা শুধু দীনী ইলমকে উত্তরাধিকারের সম্পদ হিসাবে রাখিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি উহা গ্রহণ করে, সে বিরাট সৌভাগ্যই গ্রহণ করে।' এই কারণেই হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন– 'নবী করীম (সা) দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব রাখিয়া গিয়াছেন।' দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব হইতেছে কুরআন মজীদ। সুন্নাহ হইতেছে, কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা। উহা কুরআন মজীদের অধীন ও অনুসারী। মুখ্য কাম্য বস্তু হইতেছে কুরআন মজীদ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا (স্বীয় বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে আমি মনোনীত করিয়া লইয়াছি, অতঃপর তাহাদিগকে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানাইয়াছি।)

দুনিয়ার ধন-সম্পত্তি জমা করিবার এবং উহা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তব্য সম্পদ হিসাবে রাখিয়া যাইবার জন্যে আম্বিয়ায়ে কিরাম সৃষ্ট হন নাই। তাঁহারা সৃষ্ট হইয়াছেন আখিরাতের জন্যে। তাঁহাদের ব্রত হইতেছে মানুষকে আখিরাতের দিকে আহ্বান করা এবং তৎপ্রতি তাহাদের মনে আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা। এই কারণেই নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'আমরা নবীগণ যে পার্থিব সম্পত্তি রাখিয়া যাই, তাহা সাদকা হিসাবে বণ্টিত হইয়া থাকে।' নবী করীম (সা)-এর উক্ত মহৎ গুণকে উপরোক্ত পন্থায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সর্বপ্রথম প্রকাশ করিয়াছেন। একদা তাঁহার নিকট নবী করীম (সা)-এর মীরাছ (উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তব্য সম্পত্তি) সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত বাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় একাধিক সাহাবী উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আব্বাস, হযরত তালহা, হযরত যুবায়র, হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখ সাহাবীর নাম তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

কুরআন মজীদ শ্রেষ্ঠতম বাণী

হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা), হুমাম, হাদিয়াহ ইব্ন খালিদ, আবূ খালিদ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– যে নেককার ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে, তাহার অবস্থা লেবুর অবস্থার সমতুল্য। উহার স্বাদ ও ঘ্রাণ উভয়ই ভাল। যে নেককার ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে না, তাহার অবস্থা খেজুরের অবস্থার সমতুল্য। উহার স্বাদ ভাল; কিন্তু উহাতে কোন সুঘ্রাণ

নাই। যে বদকার ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে, তাহার অবস্থা পুষ্প স্তবকের অবস্থার সমতুল্য। উহার ঘ্রাণ আনন্দদায়ক, কিন্তু উহার স্বাদ তিক্ত। আর যে বদকার ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে না, তাহার অবস্থা হানযাল (মাকাল) ফলের অবস্থার সমতুল্য। উহার স্বাদও তিক্ত এবং উহাতে কোন সুঘ্রাণও নাই।' ইমাম বুখারী (র) উপরোক্ত হাদীস সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলকের সঙ্গে কাতাদাহর মাধ্যমে একাধিক স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য পরিচ্ছেদের সহিত উপরোক্ত হাদীসের সম্পর্ক এই যে, উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তির আত্মার মধ্যে সুঘ্রাণ থাকা বা না থাকা কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে, তাহার আত্মা সুঘ্রাণযুক্ত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে না তাহার আত্মা সুঘ্রাণ হইতে বঞ্চিত। উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদ হইতেছে নেককার বা বদকার যে কোনরূপ মানুষের কথা হইতে শ্রেষ্ঠতম।

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার, সুফিয়ান, ইয়াহিয়া, মুসাদ্দাদ ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলেন– 'পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের লোকদের হায়াতের তুলনায় তোমাদের হায়াত হইতেছে আসরের ওয়াক্ত হইতে মাগরিবের ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ের সমতুল্য। আর তোমাদের, ইয়াহুদীদের এবং নাসারাদের অবস্থা হইতেছে এইরূপ যে, একটি লোক কতকগুলি শ্রমিককে কর্মে নিযুক্ত করিল। লোকটি বলিল– মাত্র এক কীরাত (দিরহামের দ্বাদশাংশ)-এর বিনিময়ে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সময় আমার কাজ করিয়া দিতে কে রাজী আছ? তাহার কথায় ইয়াহুদীগণ কাজ করিল। অতঃপর লোকটি বলিল– মাত্র এক কীরাতের বিনিময়ে বেলা দ্বিপ্রহর হইতে আসর পর্যন্ত সময়ে কে আমার কাজ করিয়া দিতে রাজী আছ? তাহার কথায় নাসারাগণ কাজ করিল। এক্ষণে তোমরা দুই কীরাতের বিনিময়ে আসর হইতে মাগরিব পর্যন্ত সময়ে কাজ করিতেছ। ইহাতে ইয়াহুদী ও নাসারারা বলিল– আমরা বেশী পরিশ্রম করিয়া কম পারিশ্রমিক পাইয়াছি। নিয়োগকর্তা বলিল– আমি কি তোমাদিগকে তোমাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক হইতে সামান্যও কম দিয়াছি? তাহারা বলিল– 'না।' নিয়োগকর্তা বলিল– 'উহাদিগকে প্রদত্ত অতিরিক্ত পারিশ্রমিক হইতেছে আমার দান। উহা যাহাকে ইচ্ছা করি, দান করি।' উপরোক্ত সনদে উহা শুধু ইমাম বুখারীই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন নাই। বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদের শিরোনামের সহিত উপরোক্ত হাদীসের সম্বন্ধ এই যে, উহাতে বর্ণিত হইয়াছে, যদিও পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের লোকদের আয়ু অপেক্ষা উম্মতে মুহাম্মদীর লোকদের আয়ু স্বল্পতর, তথাপি এই উম্মতকে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ তোমরা হইতেছ মানবজাতির কল্যাণের জন্য মনোনীত সর্বোত্তম উম্মত।

বাহায ইব্ন হাকীমের পিতামহ হইতে ধারাবাহিকভাবে হাকীম এবং বাহায ইব্ন হাকীম কর্তৃক 'মুসনাদ' ও 'সুনান' সংকলনে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'তোমরা সত্তরটি উম্মতের মধ্যে সর্বশেষ উম্মত। আল্লাহ্র নিকট তোমরা সর্বোত্তম উম্মত।' কোন্ কারণে উম্মাতে মুহাম্মদী (সা) উক্ত ফযীলত ও মর্যাদার অধিকারী হইয়াছে? তাহারা কুরআন মজীদের বরকতের উসীলায় উক্ত ফযীলত ও মর্যাদার অধিকারী হইতে পারিয়াছে। কুরআন মজীদ

হইতেছে যাবতীয় আসমানী কিতাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কিতাব। উহা অন্যান্য আসমানী কিতাবের মুহাফিজ ও অন্যান্য সকল আসমানী কিতাবের রহিতকারক। কুরআন মজীদের এই ফযীলতের কারণ কি? কুরআন মজীদের এই ফযীলতের কারণ এই যে, পূর্ববর্তী সকল কিতাবই একবারে নাযিল হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, কুরআন মজীদ একবারে নাযিল হয় নাই; বরং উহা নাযিল হইয়াছে প্রয়োজন অনুসারে অংশ অংশ করিয়া। কারণ, কুরআন মজীদ এবং উহার ধারকগণ উভয়ই অত্যন্ত মর্যাদাশালী। অতএব, উহার একটি অংশের অবতারণ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের পূর্ণ কিতাবের অবতারণের সমতুল্য।[১]

পূর্ববর্তী প্রধান দুইটি উম্মত হইতেছে ইয়াহুদী ও নাসারা। ইয়াহুদী জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর নবূওতের কাল হইতে হযরত ঈসা (আ)-এর নবূওতের কাল পর্যন্ত সময়ে কার্যে নিয়োজিত করেন। নাসারা জাতিকে তিনি হযরত ঈসা (আ)-এর নবূওতের কাল হইতে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর নবূওতের কাল পর্যন্ত সময়ে কার্যে নিয়োজিত করেন। অতঃপর মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর উম্মতকে তাঁহার নবূওতের কাল হইতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ে কার্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। তাহাদের কার্যকালকে দিনের শেষ অংশের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মতকে যে পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছেন, এই উম্মতকে উহার দ্বিগুণ পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে পূর্ববর্তী উম্মতগণ বলিয়াছে– হে আমাদের প্রভু! আমরা বেশী কাজ করিয়া কম পারিশ্রমিক পাইলাম কেন? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন– আমি কি তোমাদিগকে তোমাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক হইতে কোন অংশ কম প্রদান করিয়াছি? তাহারা বলিল– না। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন– অতিরিক্ত পারিশ্রমিকটুকু হইতেছে আমার কৃপার দান। আমি যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে উহা দান করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত প্রণিধানযোগ্য ঃ

يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْلَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ لِئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ـ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ـ

'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমানে অটল থাক। তোমরা এইরূপ করিলে তিনি তোমাদিগকে স্বীয় রহমত হইতে দ্বিগুণ রহমত প্রদান করিবেন এবং তোমাদের জন্য নূর সৃষ্টি করিবেন। তোমরা উহার সাহায্যে চলিতে পারিবে। আর তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাময়। ফলত আহলে কিতাব জাতি জানিতে পারিবে যে, আল্লাহ্‌র কোন দানে তাহাদের কোন হাত নাই। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই উহা দান করিতে পারেন। আর আল্লাহ্ মহাদানের অধিকারী।'

---

১. অন্যান্য আসমানী কিতাবের উপর কুরআন মজীদের শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষে বর্ণিত উপরোক্ত কারণ গ্রহণযোগ্য নহে। কুরআন মজীদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত কারণ উহার নিজের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। কুরআন মজীদের ভাষা, উহার বর্ণনাশৈলী, উহার সর্ব কালোপযোগী জীবন ব্যবস্থা ইত্যাদি নিজস্ব গুণই উহাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ববর্তী কিতাবের ধারক বলিয়া পরিচয় দানকারী জাতি স্বীকার করে না যে, তাওরাত কিতাব হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি একবারে নাযিল হইয়াছিল। ইহা সত্য যে, কতকগুলি ওসিয়াত বা উপদেশ তাঁহার প্রতি একবারে নাযিল হইয়াছিল। কিন্তু তাবলীগ উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত হযরত মূসা (রা)-এর ভাষণ অংশ অংশ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

আল্লাহ্র কিতাব আঁকড়াইয়া থাকিবার ওসিয়াত

তালহা ইব্ন মুসাররফ হইতে ধারাবাহিকভাবে মালিক ইব্ন মিগওয়াল, মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তালহা বলেন– একদা আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম– নবী করীম (সা) কি কোন ওসিয়াত করিয়াছেন? তিনি বলিলেন– না। আমি বলিলাম– তবে ওসিয়াত করা মানুষের প্রতি ফরয হইল কিরূপে? ওসিয়াত করিতে মানুষকে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে; অথচ নবী করীম (সা) ওসিয়াত করিলেন না! তিনি বলিলেন– 'নবী করীম (সা) আল্লাহ্র কিতাবকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে (মানুষকে) ওসিয়াত করিয়াছেন।' ইমাম আবূ দাউদ ভিন্ন ইমাম বুখারী ও সিহাহ্ সিত্তার অন্যান্য সকল সংকলক উপরোক্ত হাদীস অন্যতম রাবী মালিক ইব্ন মিগওয়াল হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস ইতিপূর্বে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত 'দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব ভিন্ন অন্য কিছুই নবী করীম (সা) রাখিয়া যান নাই' এই হাদীসের তুল্যার্থক। উক্ত হাদীসে 'অথচ ওসিয়াত করিতে মানুষকে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে' এই মর্মে রাবী তালহার যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা দ্বারা রাবী কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَ نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِيْنَ-

(তোমাদের কেহ মৃত্যুকালে সম্পত্তির মালিক থাকিলে পিতা-মাতা এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের জন্যে ওসিয়াত করাকে তাহার প্রতি ফরয করা হইল।)

নবী করীম (সা) যে পার্থিব সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, উহা উত্তরাধিকারের নিয়মে বণ্টনীয় ছিল না। উহা ছিল সাদকায়ে জারিয়াহ্ বা বহমান দান। অতএব, তিনি স্বীয় পার্থিব সম্পত্তির ব্যাপারে কোন ওসিয়াত করিয়া যান নাই। তাঁহার ইন্তিকালের পর কে খলীফা হইবেন, তিনি সে বিষয়েও নামোল্লেখ করিয়া কোন ওসিয়াত করিয়া যান নাই। কারণ, বিষয়টি তাঁহার ইশারা ইঙ্গিতে ইতিপূর্বেই স্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইতিপূর্বে তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছিলেন। একবার তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নাম উল্লেখ করত ওসিয়াত করিতে মনস্থ করিয়া উহা ত্যাগ করেন। তিনি শুধু বলিয়াছিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা এবং মু'মিনগণ আবূ বকর ভিন্ন অন্য কাহাকেও খলীফা হিসাবে দেখিতে নারায ও অনিচ্ছুক। ঘটনাও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। মোটকথা, নবী করীম (সা) শুধু আল্লাহ্র কিতাব অনুসরণ করিয়া চলিতে ওসিয়াত করিয়া গিয়াছেন।

সুরের সহিত কুরআন তিলাওয়াত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ (তাহাদের জন্যে কি ইহাই যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করিয়াছি– যাহা তাহাদের সম্মুখে পঠিত হইয়া থাকে।)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালামাহ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন শিহাব, উকায়েল, লায়ছ, ইয়াহিয়া ইব্ন বুকায়র ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কোন নবী সুরের সহিত আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করিলে আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ সন্তুষ্টি সহকারে উহা শুনিয়া থাকেন, অন্য কিছুই তিনি সেইরূপ সন্তুষ্টি সহকারে শুনেন না।' উক্ত হাদীসের জনৈক রাবী বলিয়াছেন যে, উক্ত হাদীসের يتغنى শব্দের তাৎপর্য হইতেছ 'কুরআন মজীদ উচ্চৈঃস্বরে সুরেলা কণ্ঠে তিলাওয়াত করা।' ইমাম বুখারী উহা উপরোক্ত রাবী ইব্ন শিহাব যুহরী হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং যুহরী হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ ও আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাদীনীর অধস্তন সনদাংশেও বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান বলেন– উক্ত হাদীসে যে يتغنى بالقران (সে সুরের সহিত কুরআন তিলাওয়াত করে) শব্দগুচ্ছটি উল্লেখিত হইয়াছে, এইস্থলে উহার অর্থ হইবে 'সে কুরআন মজীদে তৃপ্ত থাকে।'

ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈ উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, কোন নবী শব্দ করিয়া সুরেলা কণ্ঠে যদি আল্লাহ্র কালাম তিলাওয়াত করেন, আল্লাহ্ তা'আলা সেই তিলাওয়াত করাকে যেরূপ সন্তুষ্টি সহকারে শ্রবণ করেন, অন্য কিছুই সেইরূপ সন্তুষ্টি সহকারে শ্রবণ করেন না। কারণ আম্বিয়ায়ে কিরামের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা ও ভীতি এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী পরিপূর্ণ অবস্থায় বর্তমান থাকিবার ফলে তাহাদের তিলাওয়াতের সুরে এক মহিমাময় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য বিদ্যমান থাকে। তিলাওয়াতের চরম উদ্দেশ্যও তাহাই। হযরত আয়েশা (রা) বলেন– মহান আল্লাহ্ সকল শব্দ ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা নেককার ও বদকার সকলের কণ্ঠস্বর শুনিলেও নেককার বান্দাদের কিরাআতের সুর ও শব্দকে তিনি মহা মর্যাদা দিয়া থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ وَّ مَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْانٍ وَّلاَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ـ

(তুমি যে কাজেই লিপ্ত থাকো না কেন এবং কুরআন মজীদের যে অংশই তিলাওয়াত করো না কেন, তোমাদের উক্ত কার্যে লিপ্ত থাকিবার কালে আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি।) বলাবাহুল্য, সাধারণ নেককারদের তিলাওয়াত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যত প্রিয়, আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিস সালামের তিলাওয়াত তদপেক্ষা অনেক অনেক বেশী প্রিয়। আলোচ্য হাদীসে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, আলোচ্য হাদীসে যে اذن (তিনি সন্তুষ্টি সহকারে শ্রবণ করেন)-শব্দটি উল্লেখিত হইয়াছে, এখানে উহার অর্থ হইবে 'তিনি নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।' তবে ইতিপূর্বে اذن (তিনি সন্তুষ্টি সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকেন) শব্দের যে অর্থ বর্ণনা করা হইয়াছে, উহাই এখানে উহার অধিকতর সঙ্গত অর্থ। হাদীসটির অন্যান্য শব্দের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উহার অর্থ করিলে প্রথমোক্ত অর্থই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে। উহার একটি শব্দগুচ্ছ হইতেছে– يتغنى بالقران অর্থাৎ 'যিনি সুরের সহিত শব্দ করিয়া (আল্লাহ্র কিতাব) তিলাওয়াত করেন।' ইহাতে সহজেই বুঝা যায়, হাদীসটির প্রথমোক্ত তাৎপর্যই অধিকতর সঙ্গত। কুরআন

মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতেও اذن শব্দটি 'মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ও পালন করা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

اذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ - وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ - وَ اذَا الاَرْضُ مُدَّتْ - وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ - وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ -

(যখন আকাশ ফাটিয়া যাইবে; আর উহা স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর আদেশ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিবে ও উহা পালন করিবে এবং স্বীয় প্রভুর আদেশ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ও উহা পালন করা উহার জন্যে নির্ধারিত রহিয়াছে। আর যখন পৃথিবীকে প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে এবং উহা স্বীয় গর্ভে অবস্থিত বস্তুসমূহকে বাহিরে নিক্ষেপ করত উজাড় হইয়া পড়িবে। আর উহা স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর আদেশ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিবে ও উহা পালন করিবে এবং স্বীয় প্রভুর আদেশ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ও উহা পালন করা উহার জন্যে নির্ধারিত রহিয়াছে।)

হযরত ফুযালা (রা) হইতে সহীহ সনদে ইমাম ইব্ন মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসেও لاذن শব্দটি 'মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নবী করীম (সা) বলেন ঃ

الله اشد اذنا الى الرجل الحسن الصوت بالقران من صاحب القينة الى قينته

অর্থাৎ মালিক তাহার দাসীর কণ্ঠস্বরকে যতটুকু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকে, সুরেলা কণ্ঠে কুরআন মজীদ তিলাওয়াতকারী ব্যক্তির কণ্ঠস্বর আল্লাহ্ তা'আলা ততোধিক মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকেন।

সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ يتغنى শব্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, উহার অর্থ হইবে 'সে তৃপ্ত থাকে বা সে নিজেকে পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে মুক্ত মনে করে।' আবূ উবায়দ, কাসিম ইব্ন সাল্লাম প্রমুখ ব্যাখ্যাকারও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উক্ত ব্যাখ্যা সঠিক নহে। এখানে উহা উক্ত শব্দের কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যাই বটে। আলোচ্য হাদীসের জনৈক রাবী বলিয়াছেন, উহার অর্থ হইবে 'সে শব্দ করিয়া সুরেলা কণ্ঠে তিলাওয়াত করে।' হারমালা বলেন– একদা আমি সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাকে বলিতে শুনিলাম যে, উহার অর্থ হইবে 'সে নিজেকে পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে মুক্ত মনে করে।' ইমাম শাফেঈর নিকট আমি উহা ব্যক্ত করিলে তিনি বলিলেন– না, উহার অর্থ ঐরূপ নহে। ঐরূপ অর্থ বুঝাইবার প্রয়োজন থাকিলে আলোচ্য হাদীসে يتغنى শব্দের পরিবর্তে يتغانى শব্দ উল্লেখিত হইত। প্রকৃতপক্ষে উহার অর্থ হইবে– 'সে সুরেলা কণ্ঠে তিলাওয়াত করে।' মুযানী এবং রবী'ও ইমাম শাফেঈ হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। হারমালা বলেন– আমি ইব্ন ওহাবকে বলিতে শুনিয়াছি– উহার অর্থ হইবে, 'সে সুরের সহিত তিলাওয়াত করে।'

উপরে আলোচ্য হাদীসের যে সঠিক তাৎপর্য বর্ণিত হইল, তদনুযায়ী اَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الخ আয়াতকে বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদের প্রথমদিকে উল্লেখ করা ইমাম বুখারীর পক্ষে প্রাসঙ্গিক হয় নাই।[১] কারণ, উদ্ধৃত আয়াতটিতে কুরআন মজীদ সুরের সহিত

১. এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম বুখারী (র) 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়ে 'সুরের সহিত কুরআন মজীদের তিলাওয়াত' এই শিরোনামে লিখিত পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে উপরোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন কাছীর স্বীয় পুস্তকে তদনুরূপই উহা বর্তমান পরিচ্ছেদের প্রথমদিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তিলাওয়াত করিবার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয় নাই। কাফিরগণ বলিত, মুহাম্মদের সত্যবাদিতার সমর্থনে কেন তাহার প্রতি নিদর্শনসমূহ নাযিল হয় না? তাহাদের এই কথার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا الايٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ـ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّ ذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ـ

'তুমি বল, নিদর্শনাবলী তো আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। আমি তো শুধু এক সুস্পষ্ট সাবধানকারী। তাহাদের জন্যে কি ইহাই যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করিয়াছি– যে কিতাব তাহাদের নিকট পঠিত হয়। যে জাতি সত্যকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত থাকে, তাহাদের জন্যে উহাতে নিশ্চয়ই রহমত ও উপদেশ রহিয়াছে।' আলোচ্য আয়াতটিতে প্রমাণিত হইতেছে যে, কুরআন মজীদই প্রয়োজনীয় নিদর্শন হিসাবে যথেষ্ট। অর্থাৎ নবী করীম (সা) ছিলেন উম্মী (নিরক্ষর)। কুরআন মজীদের ন্যায় অনন্যসাধারণ মহাগ্রন্থ রচনা করা তাঁহার পক্ষে কোনক্রমে সম্ভবপর ছিল না। এমতাবস্থায় উক্ত গ্রন্থ তাঁহার প্রাপ্ত হওয়া তাঁহার সত্যবাদিতার এক মহা নিদর্শন বটে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتَابٍ وَّ لاَتَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ـ

'ইতিপূর্বে তুমি না কোন কিতাব পড়িতে আর না স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহা লিখিতে। উহা হইলে অবশ্য বাতিলপন্থীগণ সংশয় প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইত।'

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, আলোচ্য হাদীসে সুরের সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার কথাই বলা হইয়া থাকুক, অথবা কুরআন মজীদের প্রাপ্তিতে পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে নিজেকে মুক্ত মনে করিবার কথাই বলা হইয়া থাকুক, কোন অবস্থাতেই আলোচ্য আয়াত ইমাম বুখারীর এইস্থলে উদ্ধৃত করা সঠিক ও যুক্তিযুক্ত হয় নাই।

সুরের সহিত তিলাওয়াত প্রসঙ্গ

হযরত উকবা ইব্‌ন আমির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্‌ন রুবাহ লখমী, কুব্বাছ ইব্‌ন রযীন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালেহ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উকবা ইব্‌ন আমির (রা) বলেন– একদা নবী করীম (সা) আমাদের নিকট আগমন করিলেন। আমরা তখন মসজিদে বসিয়া পরস্পরকে কুরআন মজীদ শিক্ষা দিতেছিলাম। তিনি বলিলেন– 'তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবের ইলম হাসিল কর এবং উহাকে আঁকড়াইয়া ধর।' রাবী বলেন– আমার মনে পড়ে, নবী করীম (সা) আরও বলিলেন– وتغنوه (আর তোমরা উহা সুরের সহিত তিলাওয়াত কর)। অথবা উহা দ্বারা পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে নিজেকে মুক্ত মনে কর।' অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন– 'যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার কসম! জলাশয়ে বাঁধা পশুকে ছাড়িয়া দিলে উহার পক্ষে ভাগিয়া যাওয়ার যতটুকু আশংকা থাকে, কুরআন মজীদের পক্ষে স্মৃতি হইতে চলিয়া যাইবার তদপেক্ষা অধিকতর আশংকা থাকে।'

হযরত উকবা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী, মূসা ইব্‌ন আলী, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালেহ্ ও ইমাম আবূ উবায়দ পূর্বোল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে পূর্বোল্লেখিত হাদীসে যেরূপ রাবীর সন্দেহ উল্লেখিত হইয়াছে, ইহাতে সেইরূপ কোন সন্দেহের উল্লেখ নাই। ইমাম নাসাঈও 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায়ে উহা উপরোক্ত রাবী মূসা ইব্‌ন আলী হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহা উপরোক্ত রাবী কুব্বাছ ইব্‌ন রযীন হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং কুব্বাছ ইব্‌ন রযীন হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক প্রমুখ রাবীর অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত বর্ণনায় এইরূপ উল্লেখিত হইয়াছে ঃ 'একদা নবী করীম (সা) আমাদের নিকট আগমন করিলেন। আমরা তখন কুরআন মজীদ পড়িতেছিলাম। তিনি আমাদিগকে সালাম দিলেন...................।' এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত রত ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করা অবৈধ বা অসঙ্গত নহে।

হযরত মুহাজির ইব্‌ন হাবীব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ মরিয়াম, আবুল ইয়ামান ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'হে কুরআন মজীদের ধারকগণ! তোমরা কুরআন মজীদকে বালিশ বানাইও না; উহা যেভাবে তিলাওয়াত করা দরকার, সকাল-সন্ধ্যায় সেইভাবে তিলাওয়াত করিও; আর তোমরা উহা সুরের সহিত তিলাওয়াত কর অথবা তোমরা উহা দ্বারা নিজকে পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে মুক্ত মনে করিও। আর উহাতে যাহা রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে ভালরূপে জ্ঞান লাভ করিও; ইহাতে আশা করা যায়, তোমরা কামিয়াব হইতে পারিবে।' উক্ত হাদীসের সনদ বিচ্ছিন্ন। অতঃপর ইমাম আবূ উবায়দ বলিয়াছেন, تقنوه ও تغنوه উভয়ের অর্থ হইতেছে– তোমরা উহা দ্বারা নিজদিগকে পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে মুক্ত মনে করিও এবং উহাকেই নিজেদের পার্থিব সম্পদ মনে করিও।'

হযরত ফুযালা ইব্‌ন উবায়দ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাঈল ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ মুহাজির, ইমাম আওযাঈ, আলী ইব্‌ন হামযাহ, হিশাম ইব্‌ন আম্মার ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'দাসীর মালিক উহার কণ্ঠস্বর যতটুকু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তদপেক্ষা অধিকতর মনযোগ সহকারে সুরেলা কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারী বান্দার তিলাওয়াত শ্রবণ করিয়া থাকেন।' ইমাম আবূ উবায়দ বলেন– উক্ত হাদীসের সনদে কোন কোন মুহাদ্দিস, হযরত ফুযালাহ (রা) এবং ইসমাঈল ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌র মধ্যে হযরত ফুযালার মুক্ত গোলাম মায়সারার নাম অন্যতম রাবী হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ উহা ইমাম আওযাঈ হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে (মায়সারার নামসহ) এবং ইমাম আওযাঈ হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়ালীদ, রাশেদ ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন আবূ রাশেদের অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে যে اذن শব্দটি উল্লেখিত রহিয়াছে, ইমাম আবূ উবায়দ তৎসম্বন্ধে বলেন– উহার অর্থ হইতেছে 'মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা।'

সায়েব হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ মুলায়কা, সালমা ইব্‌ন ফযল, মুহাম্মদ ইব্‌ন হামীদ ও ইমাম আবুল কাসিম বাগবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, সায়েব বলেন– একদা হযরত সা'দ (রা) আমাকে বলিলেন, তুমি কি কুরআন মজীদের কিরাআত শিখিয়াছ? আমি বলিলাম– 'হ্যাঁ।' তিনি বলিলেন– উহা সুরের

সহিত তিলাওয়াত করিও। কারণ, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ 'তোমরা সুরের সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিও; আর তোমরা (উহা পড়িবার কালে) ক্রন্দন করিও। যদি ক্রন্দন করিতে না পারো, তবে চেহারায় ক্রন্দনের ভাব আনিতে চেষ্টা করিও।'

হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ নাহীক, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মুলায়কা, লায়ছ প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'নিশ্চয় এই কুরআন মজীদ চিন্তা-ভাবনার বিষয় লইয়া নাযিল হইয়াছে। তোমরা যখন উহা তিলাওয়াত কর, তখন ক্রন্দন করিও। ক্রন্দন করিতে না পারিলে মুখে ক্রন্দনের ভাব আনিতে চেষ্টা করিও। আর তোমরা উহা সুরের সহিত তিলাওয়াত করিও, অথবা উহা দ্বারা নিজদিগকে পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে মুক্ত মনে করিও। যে ব্যক্তি উহা সুরের সহিত তিলাওয়াত না করে অথবা উহা দ্বারা নিজেকে পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে মুক্ত মনে না করে, সে ব্যক্তি আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নহে।' উক্ত হাদীসের সনদ সম্বন্ধে বলিবার মত অনেক কথা রহিয়াছে। এইস্থল উহা বলিবার স্থান নহে। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ যায়দ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ মুলায়কা, আবদুল জব্বার ইব্ন বিরদ, আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ ও ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ উবায়দ বলেন– একদা হযরত আবূ লুবাবা আমাদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমরা তাঁহার পশ্চাতে চলিলাম। এক সময়ে তিনি স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমরাও উহাতে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, তাঁহার গৃহ পুরাতন ও ভাঙ্গাচোরা; তাঁহার বৈষয়িক অবস্থায় দারিদ্র্যের ছাপ বিদ্যমান। আমরা তাঁহার নিকট আমাদের বংশ পরিচয় প্রদান করিলে তিনি বলিলেন– মোটা আয়ের ব্যবসায়ী সকল। অতঃপর তিনি বলিলেন– নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ ليس منا من لم يتغن بالقران 'যে ব্যক্তি সুরের সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে না সে ব্যক্তি আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নহে।' রাবী আবদুল জব্বার বলেন–আমি আমার উস্তাদ ইব্ন আবূ মুলায়কার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ মুহাম্মদ! তিলাওয়াতকারীর কণ্ঠস্বর মিষ্টি ও সুমধুর না হইলে সে কি করিবে? তিনি বলিলেন– যথাসম্ভব মধুর সুরে তিলাওয়াত করিবে।' উক্ত সনদে উহা শুধু ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ মুলায়কা ও তাঁহার শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বযুগীয় আলিমগণ التغنى بالقران শব্দ দ্বারা 'কুরআন মজীদ সুরের সহিত তিলাওয়াত করা' বুঝিতেন। হাদীসের ইমামগণ উহার ঐরূপ অর্থই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও উহাই প্রমাণিত হয় ।

হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আওসাজাহ, তালহা, আ'মাশ, জারীর, উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'স্বীয় কণ্ঠস্বর দ্বারা তোমরা কুরআন মজীদ সৌন্দর্যমণ্ডিত কর।' উক্ত হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য। ইমাম নাসায়ী এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ উহা উপরোক্ত রাবী তাল্হা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং তালহা হইতে ধারাবাহিকভাবে শু'বা প্রমুখ রাবীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ এবং ইব্ন হাব্বান, আবদুর রহমান ইব্ন আওসাজাকে বিশ্বস্ত রাবী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ আল কাত্তান হইতে ইয্দী বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইয়াহিয়া বলেন– 'আমি

মদীনাবাসীগণের নিকট আবদুর রহমান ইব্ন আওসাজাহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছি। তাহারা তাহাকে বিশ্বস্ত লোক বলেন নাই।' শু'বা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ, আবূ উবায়দ ও কাসিম ইব্ন সালাম বর্ণনা করিয়াছেন যে, শু'বা বলেন- স্বীয় কণ্ঠস্বর দ্বারা কুরআন মজীদকে তোমরা সৌন্দর্যমণ্ডিত কর'- এই হাদীস বর্ণনা করিতে আইউব আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। আবূ উবায়দ বলেন- আমার ধারণা এই যে, উক্ত হাদীসের অপব্যাখ্যা করিয়া লোকে শরীআত বিরোধী সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে পারে, এই আশংকায়ই আইউব উহা বর্ণনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি- উক্ত রাবী শু'বা তথাপি আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করিয়া উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ, ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ভয়ে যদি হাদীস বর্ণনা করা পরিত্যক্ত হয়, তবে নবী করীম (সা)-এর 'সুন্নাহ'-এর বিপুল অংশের বর্ণনা পরিত্যক্ত হইয়া পড়িবে। ফলে মানুষ সুন্নাহ্র বিপুল অংশের জ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে। শুধু সুন্নাহ নহে; বরং কুরআন মজীদের অনেক আয়াত বিকৃতরূপে ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। তাই বলিয়া কি লোকদের নিকট হইতে উহা গোপন করিতে হইবে? আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁহার উপর নির্ভর করি। 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।'

হাদীসে যে সুরের সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার আদেশ রহিয়াছে উহার তাৎপর্য এই যে, কুরআন মজীদ বিনয় মিশ্রিত, আন্তরিকতাপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী সুরের সহিত তিলাওয়াত করা কর্তব্য। হযরত আবূ মূসা হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র মূসা, আহমদ ইব্ন ইবরাহীম ও হাফিজ তাকী ইব্ন মুখাল্লাদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন যে, একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন- 'ওহে আবূ মূসা! গত রাত্রিতে আমি তোমরা কিরাআত যেরূপ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা যদি তুমি দেখিতে পাইতে! আমি আরয করিলাম- 'আল্লাহ্র কসম! আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, আপনি আমার কিরাআত শুনিতেছেন, তবে আপনার জন্যে উহা অত্যন্ত সুন্দর, মধুর ও হৃদয়স্পর্শী করিতাম।' ইমাম মুসলিম উহা তালহা নামক রাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে এই অতিরিক্ত কথাটি রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিলেন- 'তুমি নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে হযরত দাউদ (আ)-এর বংশধরদের একটি বাঁশী লাভ করিয়াছ।' ইমাম বুখারী উহা যে পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা সেই স্থানে শীঘ্রই উল্লেখিত হইবে। উক্ত হাদীসে উল্লেখিত হযরত আবূ মূসা (রা)-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদের তিলাওয়াত কালে তিলাওয়াতের সুর মধুর ও হৃদয়স্পর্শী করিতে অত্যধিক চেষ্টা করা নিষিদ্ধ নহে। উক্ত হাদীস দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, ইয়ামানবাসী হযরত আবূ মূসা (রা)-এর কণ্ঠস্বর ইয়ামানবাসীদের কণ্ঠস্বরের ন্যায় মধুর ছিল। উহাতে আল্লাহ্র ভয় ফুটিয়া উঠিত। আরও প্রমাণিত হয় যে, এই সব গুণ শরীআতের নিকট অভিপ্রেত গুণই বটে।

হযরত আবূ সালামা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন শিহাব, ইউনুস, লায়ছ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালেহ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উমর (রা) হযরত আবূ মূসা (রা)-কে দেখিলে বলিতেন- হে আবূ মূসা! আমাদের প্রভুকে আপনি আমাদের হৃদয়ে স্মরণ করাইয়া দিন।' হযরত উমর (রা)-এর কথায় হযরত আবূ মূসা (রা) তাঁহার নিকট বসিয়া কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেন।

আবূ উসমান নাহদী হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান তামীমী ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ উসমান বলেন- হযরত আবূ মূসা (রা) নামাযে আমাদের ইমামতী

করিতেন। আল্লাহ্র কসম! আমি কখনও তাঁহার কণ্ঠস্বর হইতে মধুরতর কোন রাগ মানুষের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত কিংবা সেতারা-সারিন্দা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র হইতে সৃষ্ট কোথাও শ্রবণ করি নাই। হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন ছাবিত, জুমহী, হানযালা ইব্ন আবূ সুফিয়ান, ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম, আব্বাস ইব্ন উসমান দামেশকী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ্ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা রাত্রিতে ইশার পর নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিতে আমার বিলম্ব হইল। নবী করীম (সা)-এর নিকট আমার আসিবার পর তিনি বলিলেন– তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি বলিলাম, আপনার জনৈক সাহাবীর কিরাআত শুনিতেছিলাম। তাহার কিরাআত ও কণ্ঠস্বরের ন্যায় কিরাআত ও কণ্ঠস্বর আমি আর কাহারও নিকট শুনি নাই। এতদশ্রবণে নবী করীম (সা) আমার নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন। আমি তাঁহার কথা শুনিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত চলিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন– এই ব্যক্তি হইতেছে 'আবূ হুযায়ফার মুক্ত গোলাম সালিম (রা)। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এইরূপ ব্যক্তিকে সৃষ্টি করিয়াছেন।' উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ্।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত জুবায়র ইব্ন মুতইম (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছেঃ হযরত জুবায়র (রা) বলেন– 'আমি নবী করীম (সা)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা তূর তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। তাঁহার কণ্ঠস্বর অপেক্ষা অধিকতর মধুর কণ্ঠস্বর অথবা তাঁহার কিরাআত অপেক্ষা অধিকতর মধুর কিরাআত আমি কাহারও নিকট শুনি নাই।' কোন কোন রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ 'আমি যখন নবী করীম (সা)-কে এই আয়াত তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম– اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْئٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ (তাহারা কি বিনা স্রষ্টায় সৃষ্ট হইয়াছে? অথবা তাহারা নিজেরাই কি স্রষ্টা?) তখন আমার মনে হইল, আমার হৃদযন্ত্র ফাটিয়া গিয়াছে।[১] এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত জুবায়র (রা) এই সময়ে মুশরিক ছিলেন। বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে মদীনায় প্রেরিত মক্কার কাফিরদের প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনি মদীনায় আগমন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর হযরত জুবায়র (রা) মুসলমান হইয়া যান। আহা! সেই মানব সন্তানটি কত বড় মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাহার কুরআন তিলাওয়াত ভ্রান্ত বিশ্বাসে অটল একজন মুশরিকের হৃদয়কে কাড়িয়া লইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে উত্তম কিরাআত হইতেছে হৃদয় উৎসারিত বিনয়, ভীতি ও ভালবাসার সংযোগে সৃষ্ট কিরাআত। হযরত তাউস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে লায়ছ, ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত তাউস (রা) বলেন– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় করে, তাহার তিলাওয়াতের সুর সর্বাপেক্ষা উত্তম।' হযরত তাউস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র ইব্ন তাউস, ইব্ন জুরায়জ, সুফিয়ান কুবায়সা ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত তাউস (রা) বলেন– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভয় করে, তাহার কিরাআতের সুর সর্বাপেক্ষা উত্তম।' হযরত তাউস (রা) হইতে

১. বুখারী শরীফে সূরা তূরের তাফসীরে বর্ণিত হইয়াছে ঃ হযরত জুবায়র (রা) বলেন, 'আমার প্রাণ উড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল।' উক্ত রিওয়ায়েতে হযরত জুবায়র (রা) সূরা তূরের তিনটি আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে উল্লেখিত আয়াতটি উক্ত তিনটি আয়াতের প্রথম আয়াত।

ধারাবাহিকভাবে ইব্ন তাউস ও হাসান ইব্ন মুসলিম, ইব্ন জুরায়জ, সুফিয়ান, কুবায়সা, ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) বলিলেন– 'যাহার কিরাআত শুনিলে তোমার মনে হইবে যে, সে আল্লাহ্কে ভয় করে, তাহার কিরাআতের সুর মধুরতম।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) নহে। তবে অন্যরূপ সনদে উহা অবিচ্ছিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুবায়র, মাজমা', ইবরাহীম ইব্ন ইসমাঈল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর মাদানী, বিশর ইব্ন মাআজ, জারীর ও ইমাম ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'যাহার কুরআন তিলাওয়াত শুনিলে আমাদের মনে হইবে যে, সে আল্লাহ্কে ভয় করে, তাহার কুরআন তিলাওয়াতের সুরই হইতেছে উত্তম।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ মুত্তাসিল হইলেও দুইজন রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর এবং তাহার উস্তাদ ইবরাহীম ইব্ন ইসমাঈল দুর্বল রাবী। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর হইতেছেন আলী ইব্ন মাদীনীর পিতা।

তিলাওয়াতের সুর সম্বন্ধীয় সারকথা এই যে, সুর কুরআন মজীদ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে, উহার অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করিতে, উহার প্রতি বিনয়াবনত হইতে এবং উহা মানিয়া চলিতে শ্রোতাকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে, সেই সুরই হইতেছে শরীআতের দৃষ্টিতে উত্তম ও মধুরতম সুর। শরীআত সেই সুরেই কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে মানুষকে আদেশ দিয়াছে। সেই সুরই হইতেছে মানুষের নিকট শরীআতের কাম্য ও অভিপ্রেত সুর।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আধুনিক যুগে উদ্ভাবিত বিভিন্ন গ্রাম ও বিভিন্ন তাল-লয়ের সুর ও রাগ-রাগিণী যাহা মানুষের চিন্তা ও অনুভূতিকে উচ্ছৃংখল ও নীতিহীন করিয়া দেয় এবং মানুষের মন-মগজের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত উহাকে আল্লাহ্, রাসূল, কুরআন ও আখিরাতের ভালবাসা হইতে শূন্য ও বঞ্চিত করে, তাহা কখনও কুরআন তিলাওয়াতের জন্যে অভিপ্রেত সুর ও রাগ-রাগিণী হইতে পারে না। মহান আল্লাহ্র বাণী কুরআন মজীদকে উক্ত সুর ও রাগ-রাগিনীর কলুষ হইতে মুক্ত ও পবিত্র রাখা আল্লাহ্-ভীরু মানুষের জন্য জরুরী ও অপরিহার্য। এই বিষয়ে পবিত্র সুন্নাহ্য় পথ নির্দেশনা রহিয়াছে। উহাতে এইরূপ সুর ও রাগ-রাগিনী হইতে কুরআন মজীদকে পবিত্র রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। হযরত হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মুহাম্মদ নামক জনৈক (অজ্ঞাত পরিচয়) বৃদ্ধ ব্যক্তি, হিসীন ইব্ন মালিক ফাযারী, বাকিয়াহ ইব্ন ওয়ালীদ, নাঈম ইব্ন হাম্মাদ, ইমাম আবূ উবায়দ, কাসিম ইব্ন সাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'তোমরা আরবদের সুর ও লাহানে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিও; ফাসিক সম্প্রদায় এবং ইয়াহূদী ও নাসারা জাতির সুর ও লাহানে উহা তিলাওয়াত করিও না। আমার পর অচিরেই একদল লোক আবির্ভূত হইবে। তাহারা কুরআন মজীদের শব্দে অতিরিক্ত বর্ণ আমদানী করত উহা কণ্ঠের মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উচ্চারণ করিয়া উচ্ছৃংখল ও নীতিহীন সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবে। কুরআন মজীদ তাহাদের কণ্ঠের নিম্নে গমন করিবে না (উহা তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না)। তাহাদের হৃদয় এবং তাহাদের আড়ম্বর ও জৌলুসে চমৎকৃত হৃদয় উভয়ই গোমরাহ ও বিভ্রান্ত।' আলীম হইতে ধারাবাহিকভাবে যাযান, আবূ উমর, আবুল ইয়াকযান, উসমান ইব্ন উমায়র, শারীক, ইয়াযীদ, ইমাম আবূ উবায়দ, কাসিম ইব্ন সাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'আলীম বলেন– একদা আমরা একটি উপত্যকায় অবস্থান করিতেছিলাম। আমাদের সঙ্গে নবী করীম (সা)-এর জনৈক সাহাবীও ছিলেন। রাবী ইয়াযীদ বলেন– আমার বিশ্বাস, আমার

উস্তাদ উক্ত সাহাবীর নাম বলিয়াছেন– হযরত আবেস গিফারী। উক্ত সাহাবী দেখিলেন, মহামারী লাগিবার কারণে লোকজন উহার ভয়ে এলাকা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– ইহারা কাহারা? একজন বলিল– ইহারা মহামারী হইতে ভাগিয়া যাইতেছে। তিনি বলিলেন– ওহে মহামারী! আমাকে পাকড়াও কর। লোকটি বলিল– আপনি মৃত্যু কামনা করিতেছেন? অথচ আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি– 'তোমাদের কেহ যেন মৃত্যু কামনা না করে।' তিনি বলিলেন– কতগুলি স্বভাব ও খাসলাত আমার যুগে মানুষের মধ্যে দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। উক্ত স্বভাব ও খাসলাতসমূহ নবী করীম (সা)-এর উম্মতকে পাইয়া বসিতে পারে, তাঁহাকে এইরূপ আশংকা প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। উক্ত স্বভাব ও খাসলাতগুলি হইতেছে ঃ 'অপকৌশলে অপরকে অধিকার বঞ্চিত করিয়া সম্পাদিত ক্রয় বিক্রয় ,.............. ১; রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং কুরআন মজীদকে গীতিকাব্যে পরিণত করা। তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে এইরূপ এক ব্যক্তিকে ইমাম বানাইবে যে ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে না হইবে বিজ্ঞতম, আর না হইবে উত্তম। তাহারা তাহাকে আগে বাড়াইয়া দিবে শুধু এই জন্যে যে, সে কুরআন মজীদ অপসুর ও বিকৃত লাহানে গাহিয়া তাহাদিগকে শুনাইবে। সে উহাই তাহাদের জন্যে করিবে।' অতঃপর রাবী আরও দুইটি খাসলাত উল্লেখ করিয়াছেন। (আলোচ্য রিওয়ায়েতে উহা উহ্য রহিয়াছে।)

হযরত আবেস গিফারী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যাযান, উসমান ইব্ন উমায়র, লায়ছ ইব্ন আবূ সালীম, ইয়া'কূব ইব্ন ইবরাহীম এবং ইমাম আবূ উবায়দ নবী করীম (সা) হইতে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ, ইবরাহীম, ইয়া'কূব ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা হযরত আনাস (রা) জনৈক ব্যক্তিকে নব-উদ্ভাবিত আধুনিক রাগ-রাগিণীতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে শুনিয়া উহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করত উহা হইতে বিরত থাকিতে বলিলেন।' সতর্কীকরণ সম্পর্কিত হাদীসের শ্রেণীভুক্ত উপরোক্ত সনদসমূহ সহীহ ও নির্ভরযোগ্য।[২] উক্ত রিওয়ায়েতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আধুনিক উচ্ছৃংখলতাপূর্ণ সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা কবীরা গুনাহ। ইমামগণ উহা সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা

১. মূল গ্রন্থে স্থান শূন্য রহিয়াছে।

২. উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহের বক্তব্য বিষয় সহীহ ও গ্রহণীয় হইলেও উহাদের একটির সনদও সহীহ নহে। ইমাম ইব্ন কাছীর অবশ্য উহাদের একটি অপরটির সহায়ক ও শক্তি বৃদ্ধিকারক হইবার কারণে উহাদিগকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। একই বক্তব্য বিষয় একাধিক দুর্বল সনদে বর্ণিত হইলে মুহাদ্দিসগণ এইরূপ দুর্বল সনদসমূহকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকেন। কুরআন মজীদের তিলাওয়াতে সুর সংযোজন সম্পর্কিত মৌলিক কথা এই যে, যে সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিলে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শ্রোতার হৃদয়ে আল্লাহ্র ভালবাসা ও ভয় হইতে উদ্ভূত বিনয় এবং প্রেরণা জাগরিত হয়, সেই সুরই কুরআন তিলাওয়াতের শারীআতসম্মত সুর। পক্ষান্তরে যে সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিলে শ্রোতার মন ও মগজ কুরআন মজীদের বক্তব্য বিষয়ের প্রতি নিবিষ্ট হইবার পরিবর্তে সুরের মূর্চ্ছনায় আবিষ্ট হইয়া উহা উপভোগ করিতেই নিরত হইয়া যায়, সেই সুর কুরআন তিলাওয়াতের শারীআত বিরোধী সুর। দেখা যাইতেছে, প্রতিটি সুর যেরূপ শারীআতসম্মত নহে, প্রতিটি সুর তেমনি শারীআত বিরোধীও নহে। বলাবাহুল্য, শরীআতসম্মত সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা হইলে উহা চিন্তাশীল হৃদয়বান মানুষের মন-মগজে আধ্যাত্মিক মহা আলোড়ন সৃষ্টি না করিয়া পারে না।

এই পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে বর্ণিত হাদীসে যে التغنى بالقران। বাক্যাংশের উল্লেখ রহিয়াছে, উহার অর্থ হইতেছে কুরআন মজীদকে সুরের সহিত তিলাওয়াত করা। কিন্তু কোন কোন আলিম বলেন– উহার অর্থ

করিয়াছেন। আবার উপরোক্ত সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে গিয়া কেহ কেহ যদি কুরআন মজীদের শব্দে কোন বর্ণের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটায়, তবে তাহার এই দ্বিমুখী বিকৃতি যে পূর্বোক্ত কবীরা গুনাহ অপেক্ষা জঘন্যতম কবীরা গুনাহের কার্য হইবে সে সম্বন্ধে বিজ্ঞ ইমামদের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ নাই। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

(চলমান) হইতেছে কুরআন মজীদ লাভ করিবার পর পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে নিজেকে মুক্ত মনে করা। তাহাদের এইরূপ অর্থ বর্ণনা করিবার কারণ এই যে, বর্তমান যুগে পার্থিব ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন আধ্যাত্মিকতা বঞ্চিত জড়বাদী সমাজের অন্যতম প্রধান প্রিয় বিষয় হইতেছে গান বাজনা। উহা তাহাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। আর এই কারণেই একদল চরমপন্থী ফকীহ সকল প্রকারের গান-বাজনাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাহারা জানেন যে, প্রতিটি সুরই মানুষের অনুভূতি ও চিন্তা শক্তিকে কলুষিত করে না। তথাপি কলুষময় সুরের কুপ্রভাব হইতে মানুষের আত্মা পবিত্র রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহারা ঐরূপ ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন। তাহারা জানেন যে, হযরত দাউদ (আ)-এর নিকট গীতিগ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছিল। তিনি উহা গাহিয়া শুনাইবেন এই জন্যেই উহা তাঁহার নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল। হযরত দাউদ (আ) সুমধুর সুরে আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা বর্ণনা করিতেন। পক্ষীকুল উহা শুনিবার জন্যে তাঁহার নিকট জড়ো হইত। উহারা তাঁহার সুর অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত এবং উহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গাহিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ 'আর আমি তাহার জন্যে পক্ষীর দলকে একত্রিত করিয়াছিলাম। সবই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।' যুগ যুগ ধরিয়া দেখা গিয়াছে যে, তোতা বুলবুল প্রভৃতি পাখী মানুষের সুরেলা কণ্ঠের সুমিষ্ট গান শুনিবার জন্যে থামিয়া দাঁড়ায়। এমনকি প্রাণী বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন কোন কীট যেমন মৌমাছি, মধুর সুর শুনিয়া নাচিতে থাকে। কেহ কেহ গান শুনিবার কালে সাপকে নাচিতে দেখিয়াছেন। হযরত দাউদ (আ) বিভিন্নরূপ বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া উহার সুললিত সুরের সহিত তাল মিলাইয়া যবুর কিতাব তিলাওয়াত করিতেন। হযরত দাউদ (আ)-এর গীতিগ্রন্থ ব্যতীত বনী ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ বলিয়া কথিত কিতাবসমূহের মধ্য হইতে কোন কিতাবেই আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য, পবিত্রতা ও প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায় না। উল্লেখযোগ্য যে, বনী ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ অন্যান্য আসমানী কিতাব বিকৃত হইয়া গেলেও উক্ত গীতসমূহ অবিকৃত রহিয়াছে। উক্ত গীতাবলীর শেষাংশে উহা সুরের সহিত গাহিবার নির্দেশ রহিয়াছে। আমরা অনেক খৃস্টান সাহিত্যিককে সুমধুর সুরের সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াতকারী ব্যক্তির তিলাওয়াত শুনিতে আগ্রহী দেখিয়াছি। তাহারা মানুষের হৃদয়ে এইরূপ তিলাওয়াতের সুদূরপ্রসারী সুপ্রভাব ও সুপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবার অনন্য সাধারণ ক্ষমতার কথা স্বীকার করিয়াছেন। সহীহ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মক্কার মুশরিকগণ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে মসজিদুল হারামে সালাত আদায় করিতে দিত না। ইহাতে তিনি নিজ গৃহেই সালাত আদায় করিতেন। তাহারা দেখিল, সালাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কুরআন তিলাওয়াত শুনিবার জন্যে সর্বশ্রেণীর মানুষ বিশেষত নারী ও শিশুগণ তাঁহার নিকট জড়ো হয় এবং তাঁহার কিরাআত তাহাদের অন্তরে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই কারণে তাহাদের সিদ্ধান্ত হইল, তাহারা তাঁহাকে সালাতে শব্দ করিয়া কুরআন তিলাওয়াত করিতে বাধা দিবে।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, আরবের লোকদিগকে ইসলামের পতাকাতলে টানিয়া আনিবার পশ্চাতে নবী করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর কুরআন তিলাওয়াতের বিস্ময়কর আকর্ষণীয় শক্তি বিশেষরূপে সক্রিয় ছিল। তাঁহারা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন যে, মানুষের হিদায়াতের পক্ষে সক্রিয় নবী রাসূলগণের মু'জিযা বা অলৌকিক কার্যসমূহের মধ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর কুরআন তিলাওয়াতের প্রবল আকর্ষণীয় শক্তি অদ্বিতীয় ও বৃহত্তম শক্তি হিসাবে কাজ করিয়াছিল।

সুরের সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার বিষয়টি এই পুস্তকে বর্ণিতব্য বিষয়সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতদসম্পর্কিত পরিপূরক আলোচনা সম্বন্ধে পাঠকদিগকে অবহিত করিবার উদ্দেশ্যে বর্তমান পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে উল্লেখিত হাদীস সম্বন্ধে হাফিজ ইবন হাজার আসকালানী কর্তৃক স্বীয় 'ফাতহুল বারী' নামক টীকাগ্রন্থে লিখিত টীকা এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। হাফিজ ইবন হাজার التغنى।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবূ মুলায়কাহ, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আখনাস, রওহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুআম্মার ও হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

(চলমান) القران নামক কবিতায় নিম্নোক্ত কয়টি চরণে শব্দের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যার সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। তিনি ব্যাখ্যাকারদের সকল ব্যাখ্যাকেই সঠিক রাখিয়া কবিতাচরণ কয়টি দ্বারা হাদীসটির ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। কবিতাচরণ কয়টি এই ঃ

تغن بالقران حسن به - الصوت حزينا جاهزا رفم - واستغن عن كتب الالى طالبا غنى يدو النفس ثم الزم -

অর্থাৎ সুমধুর সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করো; বিনম্র, চিন্তাশীল ও অহংকার বর্জিত হইয়া উহা সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি কর; আর পার্থিব সম্পদ লাভ করিবার সহায়ক কিতাবসমূহ হইতে অমুখাপেক্ষী হইয়া যাও। উহাতে বাহিরের এবং অন্তরের সকল অভাব হইতেই মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। উহাতে সেই মুক্তি অন্বেষণ কর ও উহা আঁকড়াইয়া থাকো।

অতঃপর হাফিজ ইব্‌ন হাজার বলেন– শীঘ্রই স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে সুমধুর সুরের সহিত সম্পর্কিত বিষয়সমূহ লইয়া আলোচনা করা হইবে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, মানুষের হৃদয় সুরবিহীন আবৃত্তির প্রতি যতটুকু পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, সুরযুক্ত আবৃত্তির প্রতি তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, সুরের মধ্যে হৃদয় বিগলিত করিয়া দিবার এবং চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়া দিবার মত দুর্নিবার সূক্ষ্ম শক্তি রহিয়াছে।

সকল মাযহাবের ফকীহ ও আলিমগণ এই বিষয়ে একমত যে, সুললিত ও সুমিষ্ট কণ্ঠে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা জায়েয ও শরীআতসম্মত। বরং কর্কশ ও রুক্ষ সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা অপেক্ষা সুললিত ও সুমিষ্ট কণ্ঠে উহা তিলাওয়াত করা শ্রেয়তর। তবে সুর ও রাগ-রাগিণীর সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা জায়েয ও শরীআতসম্মত কিনা এই বিষয়ে ফকীহ্‌গণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

আবদুল ওহাব মালিকী বলেন, ইমাম মালিক বলিয়াছেন যে, সুর ও রাগ-রাগিণীর সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা হারাম। আবূ তাইয়েব তাবারী, ফিকাহবিদ মাওয়ার্দী এবং ইব্‌ন হামদান ও একদল ফকীহ হইতে অনুরূপ ফতওয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মালিকী মাযহাবের ইব্‌ন বাত্তাল, কাযী ইয়ায ও ইমাম কুরতুবী; শাফেঈ মাযহাবের মাওয়ার্দী, বান্দানীজী ও ইমাম গাযযালী; হাম্বলী মাযহাবের আবূ ইয়ালা ও ইব্‌ন উকায়েল এবং হানাফী মাযহাবের 'যাখীরাহ' গ্রন্থের রচয়িতা উহা মাকরূহ ও অপছন্দনীয় বলিয়াছেন।

পক্ষান্তরে ইব্‌ন বাত্তাল একদল সাহাবী ও তাবেঈ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা উহা জায়েয ও শরীআত সম্মত বলিয়াছেন। ইমাম শাফেঈ হইতেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম তাহাবীও হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ হইতে অনুরূপ ফতওয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শাফেঈ মাযহাবের ফকীহ ফাওরানী 'ইবানাহ' নামক পুস্তকে বলেন– উহা জায়েয ও শরীআতসম্মত; বরং উহা মুস্তাহাব বটে।

উপরে যে অভিমতের কথা বর্ণিত হইল, উহা ততক্ষণ প্রযোজ্য হইবে, যতক্ষণ না তিলাওয়াতের সুর ও রাগ-রাগিণী কোন শব্দ বা অক্ষরের উচ্চারণকে বিকৃত করিয়া দেয়। অন্যথায় উহা সর্ববাদীসম্মতরূপে নাজায়েয ও হারাম। আল্লামা নববী স্বীয় 'তিবইয়ান' পুস্তকে ফকীহগণের উপরোক্ত সর্বসম্মত রায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

"শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণে কোনরূপ বিকৃতি না ঘটাইয়া সুমধুর ও সুললিত কণ্ঠে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা যে মুস্তাহাব এই বিষয়ে ফকীহগণ একমত। আবার তদ্রূপ তিলাওয়াতে শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণে কোনরূপ বিকৃতি আসিলে উহা যে হারাম হইবে এই বিষয়েও ফকীহগণ একমত। পক্ষান্তরে সুর ও রাগ-রাগিণীর সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করাকে ইমাম শাফেঈ একস্থানে জায়েয ও অন্যস্থানে মাকরূহ বলিয়াছেন। ইমাম শাফেঈর মতের এই বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তাঁহার অনুসারীগণ বলিয়াছেন যে, একইরূপ তিলাওয়াতকে ইমাম শাফেঈ কখনও জায়েয আবার কখনও মাকরূহ বলিয়াছেন, ইহা ঠিক নহে; বরং তিনি দুইরূপ তিলাওয়াতের একটিকে জায়েয এবয়ং অন্যটিকে মাকরূহ বলিয়াছেন। সুর ও রাগ-রাগিণীর তাল ও লয়ের কারণে যদি শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণ বিকৃত হইয়া না পড়ে, তবে ইমাম শাফেঈর মতে উহা জায়েয। পক্ষান্তরে, সুর ও রাগ-রাগিণীর তাল ও লয়ে পড়িয়া যদি শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণ বিকৃত হইয়া পড়ে, তবে ইমাম শাফেঈর মতে উহা নাজায়েয ও হারাম।

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ সুরের সহিত তিলাওয়াত করে না' (لم يتغنى بالقران) সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নহে। অতঃপর হাফিজ আবূ বকর মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'আমাদের অভিমতের পক্ষে প্রমাণ হইতেছে ইতিপূর্বে আমি যে হাদীস বর্ণনা করিয়াছি তাহা। আর এই হাদীসের ব্যাপারে বলা যায় যে, উহার অন্যতম রাবী ইব্ন আবূ মুলায়কার সত্যবাদিতা সম্বন্ধে সনদ বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

উক্ত হাদীস আবূ লুবাবাহ হইতে ইব্ন আবূ মুলায়কা ও তাঁহার নিকট হইতে আবদুল জব্বার ইব্ন বিরদ্ বর্ণনা করিয়াছেন। উহা সা'দ হইতে ইব্ন আবূ নুসায়েক, তাহার নিকট হইতে ইব্ন আবূ মুলায়কা, তাহার নিকট হইতে আমর ইব্ন দীনার ও লায়ছ বর্ণনা করিয়াছেন। উহা হযরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ মুলায়কা ও আসাল ইব্ন সুফিয়ান বর্ণনা করিয়াছেন। উহা হযরত ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে যথাক্রমে ইব্ন আবূ মুলায়কা ও হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর মুক্ত গোলাম নাফে' বর্ণনা করিয়াছেন। (দেখা যাইতেছে, উহার প্রতিটি সনদেই বিতর্কিত রাবী ইব্ন আবূ মুলায়কা উপস্থিত রহিয়াছে।)

কুরআন পাঠকের সৌভাগ্য

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্, যুহরী, শুআয়ব, আবুল ইয়ামান ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ফিকাহবিদ মাওয়ার্দী ইমাম শাফেঈ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমাম শাফেঈ বলেন– সুর ও রাগ-রাগিণীর সহিত কুরআন তিলাওয়াত করিতে গিয়া কেহ যদি শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণ বিকৃত করিয়া দেয়, তবে উহা নাজায়েয ও হারাম হইবে। হাম্বলী মাযহাবের ইব্ন হামদানও স্বীয় 'রিআয়াহ' পুস্তকে (ইমাম শাফেঈ হইতে) অনুরূপ অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন। শাফেঈ মাযহাবের ইমাম গায্যালী ও বান্দানীজী এবং হানাফী মাযহাবের 'যাখীরাহ' গ্রন্থের প্রণেতা বলেন– যে সুর ও রাগ-রাগিণীর কারণে কুরআন মজীদের শব্দের উচ্চারণ বিকৃত হইয়া যায় না, সেই সুর ও রাগ-রাগিণীর সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে যে সুর ও রাগ-রাগিণীর কবলে পড়িয়া উহার শব্দের উচ্চারণ বিকৃত হইয়া যায়, সেই সুর ও রাগ-রাগিণীর সহিত উহা তিলাওয়াত করা নাজায়েয ও হারাম।

রাফেঈ একটি অদ্ভুত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আমালী সারাখসী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুর ও রাগ-রাগিণীর সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা সর্বাবস্থায় জায়েয ও শারীআতসম্মত। ইব্ন হামদান ও হাম্বলী মাযহাবের একদল আলিম হইতে অনুরূপ অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন। উহা একটি স্বল্প সমর্থিত অভিমত। উহা গ্রহণযোগ্য নহে।

সারকথা এই যে, দলীল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মধুর কণ্ঠস্বরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা শরীআতের নিকট কাম্য ও অভিপ্রেত। কাহারও কণ্ঠস্বর মধুর না হইলে যথাসম্ভব মধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত করিবার জন্যে তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবে। ইতিপূর্বে বর্ণিত এতদসম্পর্কিত একটি হাদীসের অন্যতম রাবী ইব্ন মুলায়কা অনুরূপ কথাই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদও সহীহ সনদে ইব্ন মুলায়কার মাধ্যমে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। কণ্ঠস্বরকে শ্রুতিমধুর করিতে হইলে সুরবিধিও মানিয়া চলিতে হয়। কারণ, সুরবিধির অনুসরণ কর্কশ কণ্ঠস্বরকে সুমধুর করিয়া দিতে না পারিলেও উহা কণ্ঠস্বরের মধ্যে কিছুটা মাধুর্য আনিয়া দিতে পারে। আর এইরূপে একটি কর্কশ কণ্ঠস্বরের কর্কশতা উহা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হয়। অবশ্য শব্দ ও অক্ষরের সঠিক ও শুদ্ধ উচ্চারণ হইতেছে অপরিহার্য বিষয়। সুর বা স্বরকে মধুর করিতে গিয়া যদি কেহ শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণ বিকৃত করিয়া দেয়, তবে তাহার সেই সুর ও স্বর হারাম ও শরীআত বিরোধী হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যাহারা সুরবিধি পালনে তৎপর থাকে, তাহারা শব্দ তথা অক্ষরের উচ্চারণ-বিধি লঙ্ঘনেও তৎপর থাকে। সম্ভবত উক্ত কারণেই একদল ফকীহ সুর ও রাগ-রাগিনীর সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা অপছন্দ করিয়াছেন। অবশ্য শব্দের উচ্চারণ শুদ্ধ ও সঠিক রাখিয়া সুরের সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা যে শ্রেয়তর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'দুই ব্যক্তির প্রতি ছাড়া কাহারও প্রতি ঈর্ষা করা যায় না ঃ (১) যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাব দান করিয়াছেন এবং সে উহা রাত্র-দিন নামাযে তিলাওয়াত করে এবং (২) যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পত্তি দান করিয়াছেন এবং সে উহা দিবা-রাত্র সাদকা করে।'

উপরোক্ত সনদে উহা শুধু ইমাম বুখারীই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন নাই। তবে যুহরী হইতে সুফিয়ানের মাধ্যমে উহা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ই বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যাকওয়ান,সুলায়মান, শু'বা, রওহ, আলী ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'দুই ব্যক্তির প্রতি ছাড়া কাহারও প্রতি ঈর্ষা করা যায় না। (১) আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে কুরআন মজীদের জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং সে উহা রাত্র-দিন নামাযে তিলাওয়াত করে আর তাহার কোন প্রতিবেশী উহা শুনিতে পাইয়া বলে, আহা! অমুক লোকটিকে যে জ্ঞান দান করা হইয়াছে, আমাকে যদি উহার সমতুল্য জ্ঞান দান করা হইত, তবে আমিও তাহার ন্যায় আমল করিতে পারিতাম; তবে তাহার এই ঈর্ষা অসঙ্গত হইবে না। (২) আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ধন-সম্পত্তি দান করিয়াছেন এবং সে উহা হক ও ন্যায় পথে ব্যয় করায় যদি কোন ব্যক্তি বলে, আহা! অমুক লোকটিকে যে ধন-সম্পত্তি দান করা হইয়াছে, আমাকেও যদি উহার সমতুল্য ধন-সম্পত্তি দান করা হইত, তবে আমি তাহার ন্যায় আমল করিতাম; তবে তাহার এই ঈর্ষা অসঙ্গত হইবে না।'

উপরোক্ত দুইটি হাদীসের তাৎপর্য এই যে, কুরআন মজীদের জ্ঞান সম্পদে সম্পদশালী হওয়া ও উহা দিবা-রাত্র নামাযে তিলাওয়াত করা হইতেছে এক মহাসৌভাগ্য তথা আধ্যাত্মিক প্রশান্তি। অনুরূপভাবে ধন-সম্পত্তির মালিক হওয়া এবং উহা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করাও এক বিরাট আধ্যাত্মিক সৌভাগ্য তথা পরিতৃপ্তি বটে। প্রথম সম্পদটি দ্বারা উহার মালিক নিজে উপকৃত হয় এবং দ্বিতীয় সম্পদটি দ্বারা সে অপরকেও উপকৃত করে। যাহা হউক, উপরোক্ত দুইটি সৌভাগ্য এতই মহান ও গুরুত্বপূর্ণ যে, কাহারও মধ্যে উহার কোনটি দেখিতে পাইয়া নিজের জন্য তাহা কামনা করা অন্যের পক্ষে অন্যায় বা অসঙ্গত তো নয়ই; বরং এইরূপ সৌভাগ্য কামনা করা কাম্যই বটে। নিম্নোক্ত আয়াতে উপরোক্ত সৌভাগ্য দুইটির গুরুত্ব বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ -

"যাহারা আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আর আমি তাহাদিগকে যে সম্পদ দান করিয়াছি,তাহা হইতে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে সৎ পথে ব্যয় করে, তাহারা অবিনশ্বর তিজারতের আশা করিতে পারে।"

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য হাদীসদ্বয়ে যে ঈর্ষাকে বৈধ ও সঙ্গত বলা হইয়াছে, উহার অর্থ অপরের সম্পদের বিলুপ্তি ও ধ্বংস কামনা নহে; বরং উহার অর্থ হইতেছে নিজের জন্যে অপরের সম্পদের তুল্য সম্পদ কামনা করা। অপরের কোন প্রশংসনীয় গুণ বা সৌভাগ্যের প্রতি এইরূপ ঈর্ষা বা কামনা নিন্দনীয় নহে। তবে উপরোক্ত দুইটি গুণ ও সৌভাগ্য যেহেতু

অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ, তাই হাদীসে বিশেষত উহার প্রতি ঈর্ষা করিবার অনুমতি ও বৈধতা বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোক্ত হাদীস অন্যরূপ সনদেও বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদের পুত্র আবদুল্লাহ্ বলেন– আমি আমার পিতার কিতাবে তাঁহার নিজ হস্তে লিখিত এই কথাগুলি পাইয়াছি ঃ 'আমার নিকট আবূ তাওবা রবী' ইব্ন নাফে' লিখিয়াছেন– হযরত ইয়াযীদ ইবৃন আখনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাছীর ইব্ন মুররা, সালীম ইব্ন মূসা, যায়দ ইব্ন ওয়াকিদ ও হায়ছাম ইব্ন হামীদ আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– দুইটি বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইতে পারে না। এক. একটি লোককে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদের জ্ঞান দান করিয়াছেন। সে উহা রাত্র-দিন নামাযে তিলাওয়াত করে এবং উহার উপর আমল করে। উহা দেখিয়া অন্য একটি লোক বলে, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা যে নিয়ামত দান করিয়াছেন, আহা! আমাকে যদি তিনি উহার সমতুল্য নিআমাত দান করিতেন তাহা হইলে আমি তাহার ন্যায় রাত্র-দিন উহা নামাযে তিলাওয়াত করিতাম। দুই, একটি লোককে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দান করিয়াছেন। সে উহা আল্লাহ্র পথে খরচ এবং সাদকা করে। উহা দেখিয়া অন্য একটি লোক বলে, আহা! আল্লাহ্ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে যে নিআমাত দান করিয়াছেন, আমাকেও যদি তিনি উহার সমতুল্য নিয়ামত দান করিতেন, তাহা হইলে আমি উহা সাদকা করিয়া দিতাম।'

ইমাম আহমদও প্রায় অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ হযরত আবূ কাবশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ আবুল বুহতারী আততাঈ, ইউনুস ইব্ন হাব্বাব, ইবাদাহ ইব্ন মুসলিম ও আব্দুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া তিনটি বিষয় তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি এবং অন্য একটি বিষয়ে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতেছি। তোমরা উহা স্মরণ রাখিও। প্রথম তিনটি হইতেছে এই ঃ (১) কোন বান্দার মাল সাদকার কারণে কমিয়া যায় না, (২) কোন ব্যক্তি অত্যাচারিত হইয়া সবর করিলে আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয় উহার পরিবর্তে তাহার সম্মান বাড়াইয়া দেন এবং (৩) কোন ব্যক্তি অপরের নিকট হাত পাতিবার পথ গ্রহণ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয় তাহার জন্যে অভাবের দরজা খুলিয়া দেন।

চতুর্থ বিষয়টি হইতেছে এই যে, দুনিয়াতে চারি শ্রেণীর লোক রহিয়াছে ঃ প্রথম শ্রেণীর লোক হইতেছে সেই বান্দা যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা মাল ও ইলম দান করিয়াছেন এবং সে স্বীয় প্রভুর দানের ব্যাপারে তাঁহাকে ভয় করিয়া চলে। অধিকন্তু রক্ত সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলে এবং উক্ত দানে তাহার প্রভুর কি হক ও প্রাপ্য রহিয়াছে তাহা জানে। এই ব্যক্তি সর্বোত্তম স্থানে অবস্থান করে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হইতেছে সেই বান্দা যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইলম দান করিয়াছেন, কিন্তু মাল দান করেন নাই। তাই সে বলে. আহা! আমি যদি মালের মালিক হইতাম, তবে অমুক ব্যক্তির ন্যায় কাজ করিতাম! উক্ত দুই শ্রেণীর লোক সমান পুরস্কার লাভ করিবে।

তৃতীয় শ্রেণীর লোক হইতেছে সেই বান্দা যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা মাল দান করিয়াছেন; কিন্তু ইলমের অভাবে মাল যত্রতত্র ব্যয় করে। উহার ব্যাপারে সে স্বীয় প্রভুকে ভয় করিয়া চলে না, উহা দ্বারা সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলে না এবং উহার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার যে হক ও প্রাপ্য রহিয়াছে, তাহাও চিনে না। এই শ্রেণীর লোক নিকৃষ্টতম স্থানে অবস্থান করে।

চতুর্থ শ্রেণীর লোক হইতেছে সেই বান্দা যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা না মাল দান করিয়াছেন আর না ইলম দান করিয়াছেন। তাই সে বলে, আহা! আমি যদি মালের মালিক হইতাম, তবে অমুক ব্যক্তির ন্যায় কাজ করিতাম। উহা হইতেছে তাহার অন্তরের কামনা মাত্র। মালের ক্ষেত্রে ইহারা দুইজন সমান গুনাহ স্কন্ধে বহন করিবে।

হযরত আবূ কাবশা আনসারী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম ইব্ন আবুল জা'দ, আ'মাশ, ওয়াকী' ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'এই উম্মাতের লোক চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম প্রকারের লোক হইতেছে সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা মাল ও ইলম উভয়ই দান করিয়াছেন। আর সে ব্যক্তি স্বীয় ইলমের সাহায্যে মালের ব্যাপারে করণীয় কাজ সম্পাদন করিয়া থাকে অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রাপ্য আদায়ের ক্ষেত্রে খরচ করে। দ্বিতীয় প্রকারের লোক হইতেছে সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইলম দান করিয়াছেন; কিন্তু মাল দান করেন নাই। তাই সে বলে, আহা! যদি আমি এই লোকটির ন্যায় মালের মালিক হইতাম, তবে উহার ব্যাপারে তাহার ন্যায় কাজ করিতাম। তাহারা দুইজনে সমান পুরস্কার লাভ করিবে। তৃতীয় প্রকারের লোক হইতেছে সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা মাল দিয়াছেন; কিন্তু ইলম দেন নাই। সে উহা যথেচ্ছভাবে ব্যয় করে এবং সে আল্লাহ্র প্রাপ্য ক্ষেত্র ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে ব্যয় করে। চতুর্থ প্রকারের লোক হইতেছে সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা না মাল দিয়াছেন, আর না ইলম দিয়াছেন। সে বলে, আহা! আমি যদি এই লোকটির ন্যায় মালের মালিক হইতাম, তবে উহার ব্যাপারে তাহার ন্যায় কাজ করিতাম। ইহারা দুইজনে সমান গুনাহ স্কন্ধে বহন করিবে।' উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ্। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র প্রাপ্য।

কুরআনের শিক্ষা লাভ ও শিক্ষা দান

হযরত উসমান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ আবদুর রহমান, সা'দ ইব্ন উবায়দা, আলকামা ইব্ন মারসাদ, শু'বা, হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'সেই ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে উত্তম যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদান করে।' উক্ত হাদীসের মর্ম অনুযায়ী উত্তম মর্যাদা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে রাবী আবূ আবদুর রহমান হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকাল হইতে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের কাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া মানুষকে কুরআন মজীদ তা'লীম দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন– 'এই হাদীসই আমাকে এই স্থানে উপবিষ্ট করিয়াছে।' ইমাম মুসলিম ভিন্ন সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলক উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী শু'বা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। রাবী আবূ আবদুর রহমানের অন্য নাম হইতেছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাবীব সালমী।

হযরত উসমান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ আবদুর রহমান সালমী, আলকামা ইব্ন মারসাদ, সুফিয়ান, আবূ নাঈম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'তোমাদের মধ্যে উত্তম হইতেছে সেই ব্যক্তি যে কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদান করে।' ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্ন মাজাহও উপরোক্ত রাবী হযরত সুফিয়ান ছাওরী হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। লক্ষ্যণীয় যে, পূর্ববর্তী হাদীসের সনদে

আলকামা ও আবূ আবদুর রহমান এই দুই রাবীর মধ্যবর্তী রাবী হিসাবে সা'দ ইব্ন উবায়দার নাম উল্লেখিত হইয়া থাকিলেও শেষোক্ত হাদীসের সনদে সা'দ ইব্ন উবায়দার নাম উল্লেখিত হয় নাই। আরও লক্ষ্যণীয় যে, প্রথমোক্ত সনদের যে পর্যায়ে শু'বার নাম উল্লেখিত রহিয়াছে, শেষোক্ত সনদের সেই পর্যায়ে হযরত সুফিয়ান ছাওরীর নাম উল্লেখিত রহিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, হযরত সুফিয়ান ছাওরী কর্তৃক উল্লেখিত সনদে সা'দ ইব্ন উবায়দার নাম উল্লেখিত হয় নাই। আর হযরত সুফিয়ান ছাওরী আলোচ্য সনদ যেরূপে উল্লেখ করিয়াছেন উহাই যে সঠিক, তাহার পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ রহিয়াছে। অবশ্য বিনদার ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ উপরোক্ত হাদীস হযরত সুফিয়ান ছাওরীর মাধ্যমে বর্ণনা করিতে গিয়া সনদের পূর্বোল্লেখিত পর্যায়ে সা'দ ইব্ন উবায়দার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। উহা তাঁহার একটি ভুল। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'সুফিয়ানের একদল শিষ্য তাঁহার নিকট হইতে উপরোক্ত হাদীসের সনদে সা'দ ইব্ন উবায়দার নাম উল্লেখ না করিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সুফিয়ান হইতে আমি যে সনদ উল্লেখ করিয়াছি, উহাই অধিকতর সহীহ।'

বিন্দার ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদের উপরোক্ত মন্তব্যও ভ্রান্ত। উক্ত সনদে সা'দ ইব্ন উবায়দার নাম অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে পূর্বে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই সঠিক। এই স্থলে সনদশাস্ত্র সম্পর্কিত দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করা যাইত। এখানে আলোচনা করিবার মতো সুদীর্ঘ বিষয়ও ছিল। তবে পাঠকের বিরক্তি এড়াইবার উদ্দেশ্যে উহা পরিত্যক্ত হইল। অবশ্য সংক্ষেপে যতটুকু বিবৃত হইল, উহা পরিত্যক্ত অংশের প্রতি ইঙ্গিত প্রদানে যথেষ্ট। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

উপরে বর্ণিত হাদীসে যে দুইটি গুণ উল্লেখিত হইয়াছে, উহা আল্লাহ্ তা'আলার রাসূলগণের অনুসারী মু'মিনদের গুণ। রাসূলগণ একদিকে নিজেরা পূর্ণ মানব ছিলেন এবং অন্যদিকে মানবজাতিকে পূর্ণ মানবতা শিক্ষা দিতে সচেষ্ট ছিলেন। আলোচ্য হাদীসে সর্বোত্তম মু'মিনের দুইটি সর্বোত্তম গুণ যথা কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ এবং উহার শিক্ষা প্রদানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম উত্তম গুণটি দ্বারা মু'মিন নিজে উপকৃত হয় এবং দ্বিতীয় উত্তম গুণটি দ্বারা অপরে উপকৃত হয়। ইহাই মু'মিনের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য। সে নিজেও কুরআন মজীদের হিদায়েত গ্রহণ করিয়া মানবতা লাভ করে এবং অপরকে উহার হিদায়েত দ্বারা মানবতা লাভ করিতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। পক্ষান্তরে কাফিরের স্বভাব ও আদর্শ ইহার ঠিক বিপরীত। তাহারা একদিকে নিজেরা কুরআন মজীদের হিদায়েত গ্রহণপূর্বক মানবতা লাভ করিতে অসম্মতি জানায় এবং অন্যদিকে অপরকে উহার হিদায়েত হইতে দূরে রাখিতে সচেষ্ট থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ 'যাহারা নিজেরা সত্যকে গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইয়াছে এবং অপরকেও আল্লাহ্র পথ হইতে দূরে রাখিয়াছে, আমি তাহাদিগকে শাস্তির উপর শাস্তি প্রদান করিতে থাকিব।'

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ 'তাহারা অপরকেও উহা গ্রহণ করিতে দেয় না আর নিজেরাও উহা গ্রহণ করিতে বিরত থাকে।'

পক্ষান্তরে মু'মিনদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ। 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানায় এবং নেক কাজ করে আর বলে, নিশ্চয় আমি সত্যের কাছে আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত, কথায় তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে হইতে পারে?' আলোচ্য হাদীসটি কুরআন মজীদের উক্ত আয়াতের প্রতিধ্বনি বটে। উহার অন্যতম রাবী হযরত আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাবীব সালমী কূফী ইসলামের একজন ইমাম ও শায়েখ ছিলেন। তিনি উক্ত আয়াত ও হাদীসে বর্ণনা মাকাম ও মর্যাদা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ ও উহার শিক্ষা প্রদানে আত্মনিবেদিত হন। তিনি হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের যুগ হইতে হাজ্জাজের শাসনকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সত্তর বৎসর ধরিয়া মানুষকে কুরআন মজীদের তা'লীম ও শিক্ষা প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাঁহার ঈপ্সিত মাকাম ও মর্যাদা প্রদান করুন। আমীন!

হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ ইব্ন আবূ হাযিম, আমর ইব্ন আওন ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট জনৈকা মহিলা আসিয়া বলিল– আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য নিজেকে সমর্পণ করিলাম। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'নারীতে আমার কোন প্রয়োজন নাই।' ইহাতে জনৈক সাহাবী বলিলেন– 'হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহাকে আমার সহিত বিবাহ দিন।' নবী করীম (সা) বলিলেন– 'তাহাকে একখানা কাপড় দাও।' সাহাবী বলিলেন– 'কাপড় দিবার সামর্থ্য আমার নাই।' নবী করীম (সা) বলিলেন– 'তাহাকে একটি লোহার আংটি দিতে পারিলেও দাও।' সে উহাতেও অসমর্থ জানাইল। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'তুমি কুরআন মজীদের কতটুকু জানো?' সাহাবী বলিলেন– 'আমি উহার অমুক অমুক অংশ জানি।' নবী করীম (সা) বলিলেন– 'তোমার নিকট কুরআন মজীদের যে অংশটুকু রহিয়াছে, উহা শিক্ষাদানের বিনিময়ে তাহাকে তোমার সহিত বিবাহ দিলাম।' উপরোক্ত হাদীস একাধিক সহীহ সনদে বর্ণিত হইয়াছে। এইস্থলে ইমাম বুখারী (র) উহা বর্ণনা করিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, 'উল্লেখিত সাহাবী কুরআন মজীদের যতটুকু আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা সেই মহিলাকে শিক্ষা দিতে নবী করীম (সা) তাহাকে আদেশ দিয়াছিলেন। আর কুরআন মজীদের এই তা'লীমকেই তিনি উক্ত মহিলার দেন-মহর হিসাবে ধার্য করিয়াছিলেন।'

অবশ্য কুরআন মজীদের তা'লীম দেওয়া বিবাহের দেন-মহর হইতে পারে কিনা; কুরআন মজীদের তা'লীমের পরিবর্তে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কিনা; এই ব্যবস্থা শুধু উপরোক্ত সাহাবীর জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল কিনা; তাহা লইয়া ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। 'তোমার নিকট কুরআন মজীদের যে বিশেষ অংশটুকু রহিয়াছে, উহার পরিবর্তে আমি তাহাকে তোমার সহিত বিবাহ দিলাম'– নবী করীম (সা)-এর এই উক্তির তাৎপর্য কি এই হইবে যে, 'তোমার নিকট কুরআন মজীদের যে অংশ রহিয়াছে, তজ্জন্য তোমাকে মর্যাদা দিতেছি এবং বিনা মহরেই মহিলাটিকে তোমার সহিত বিবাহ দিতেছি?' অথবা উহার তাৎপর্য কি এই হইবে যে, 'তোমার নিকট কুরআন মজীদের যে অংশ রহিয়াছে, উহার তা'লীমের বিনিময়ে তাহাকে তোমার সহিত বিবাহ দিলাম?' এই ব্যাপারেই ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে। ইমাম আহমদ বলেন– নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত বাণীর তাৎপর্য এই যে,

উক্ত সাহাবীর স্মৃতিতে রক্ষিত কুরআন মজীদের অংশ বিশেষকে মর্যাদা দিয়া নবী করীম (সা) উক্ত মহিলাটিকে তাহার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তবে নবী করীম (সা)-এর বাণীর শেষোক্ত তাৎপর্য বর্ণনা করাই অধিকতর সঙ্গত। কারণ, মুসলিম শরীফে বর্ণিত রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন– 'তুমি তাহাকে কুরআন মজীদ শিক্ষা দাও।' উক্ত বিষয়টিকে (কুরআন মজীদের তা'লীমকে) প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যেই ইমাম বুখারী এইস্থলে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। মতভেদের অন্যান্য বিষয় বিবাহ ও ইজারা সম্পর্কিত অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

কুরআন মজীদের মুখস্থ তিলাওয়াত

এইস্থলেও ইমাম বুখারী হযরত সাহল (রা) কর্তৃক বর্ণিত উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) সাহাবীকে বলিলেন– তোমার নিকট কুরআন মজীদের কতটুকু অংশ রক্ষিত আছে? সাহাবী বলিলেন– আমার নিকট অমুক অমুক সূরা রক্ষিত রহিয়াছে। এই বলিয়া তিনি কয়েকটি সূরার নাম উল্লেখ করিলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন– তুমি কি সেইগুলিকে মুখস্থ তিলাওয়াত করিতে পারো? সাহাবী বলিলেন– হ্যাঁ; আমি সেইগুলি মুখস্থ তিলাওয়াত করিতে পারি। নবী করীম (সা) বলিলেন– যাও, তোমার নিকট কুরআন মজীদের যে অংশটুকু রক্ষিত রহিয়াছে, তাহার পরিবর্তে তোমাকে তাহার (মহিলাটির) মালিক বানাইয়া দিলাম (অর্থাৎ তাহাকে তোমার সহিত বিবাহ দিলাম)।

ইমাম বুখারী (র) 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায়ে 'কুরআন মজীদের মুখস্থ তিলাওয়াত' এই শিরোনামায় একটি পরিচ্ছেদ রচনা করিয়াছেন। তিনি উহা দ্বারা এই ইঙ্গিত প্রদান করিতে চাহিয়াছেন যে, কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করা অপেক্ষা উহা মুখস্থ তিলাওয়াত করা শ্রেয়তর। তবে বিপুলসংখ্যক ফকীহ বলেন– কুরআন মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করা অপেক্ষা উহা দেখিয়া তিলাওয়াত করা শ্রেয়তর। কারন, উহা দ্বারা একদিকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার সওয়াব এবং অন্যদিকে কুরআন মজীদ দেখিবার সওয়াব পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, কুরআন মজীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও সওয়াবের কাজ। পূর্বসুরী একাধিক বিজ্ঞ ব্যক্তি উহা বলিয়াছেন। তাহারা কোন ব্যক্তির সারাদিনেও কুরআন মজীদ না দেখাকে মাকরূহ ও অপছন্দনীয় কাজ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কুরআন মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করা অপেক্ষা উহা দেখিয়া তিলাওয়াত করা যে শ্রেয়তর, উক্ত অভিমতের পোষকগণ নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা তাহা প্রমাণ করেন ঃ

জনৈক সাহাবী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান, সালীম ইব্ন মুসলিম, মুআবিয়া ইব্ন ইয়াহিয়া, বাকিয়াহ ইব্ন ওয়ালীদ, নাঈম ইব্ন হাম্মাদ ও ইমাম আবূ উবায়দ স্বীয় 'ফাযায়েলুল কুরআন' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'ফরয নামায যেরূপ নফল নামায অপেক্ষা শ্রেয়, কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করা উহা মুখস্থ তিলাওয়াত করা অপেক্ষা সেইরূপ শ্রেয়।' উক্ত হাদীসের সনদ দুর্বল। কারণ, উহার অন্যতম রাবী মুআবিয়া ইব্ন ইয়াহিয়া মুআবিয়া, সদফীই হউক আর মুআবিয়াহ আতরাবলিসীই হউক, একজন দুর্বল রাবী।

'যর' হইতে ধারাবাহিকভাবে আসিম ও হযরত সুফিয়ান ছওরী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন– 'তোমরা সর্বদা কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করিও।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউসুফ ইব্ন মাহিক, আলী ইব্ন যায়দ ও হাম্মাদ ইব্ন সালমা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উমর (রা) বাহির হইতে আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিবার পর কুরআন মজীদ খুলিয়া লইয়া তিলাওয়াত করিতেন।

আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত ও হাম্মাদ ইব্ন সালমা আরও বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট তাঁহার সহচরগণ একত্রিত হইলে তিনি কুরআন মজীদ খুলিয়া তাহাদিগকে উহার তিলাওয়াত অথবা তাফসীর শুনাইতেন। উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাওয়ের ইব্ন আবূ ফাখতা, হাজ্জাজ ইব্ন আরতাত ও হাম্মাদ ইব্ন সালমা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন– তোমাদের কেহ যখন বাজার হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, তখন সে যেন (সর্বপ্রথম) কুরআন মজীদ খুলিয়া উহা তিলাওয়াত করে।

খায়ছাম হইতে আ'মাশ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ খায়ছাম বলেন– একদা আমি হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট গমন করিলাম। তিনি তখন কুরআন মজীদ খুলিয়া উহা তিলাওয়াত করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন– এই হইতেছে আমার আজিকার রাত্রিতে তিলাওয়াত করিবার অংশ।

সাহাবায়ে কিরামের উপরোক্ত কার্যাবলী ও বাক্যাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করা শ্রেয়তর।[১] উহার একটি ফায়দা এই যে, এইরূপ তিলাওয়াত করিলে লিখিত কুরআন মজীদ বেকার, পরিত্যক্ত ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে না। উহার আরও উপকার এই যে, কুরআন মজীদের হাফিজ উহা মুখস্থ তিলাওয়াত করিতে গিয়া উহার কোন শব্দ বা আয়াত ভ্রান্তরূপে তিলাওয়াত করিতে পারে অথবা এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত তিলাওয়াত করিতে পারে। এমতাবস্থায় উহা দেখিয়া তিলাওয়াত করা মুখস্থ তিলাওয়াত করা অপেক্ষা অধিকতর নিরাপদ ও ভ্রান্তির আশংকা হইতে অধিকতর মুক্ত।

কুরআন মজীদের তিলাওয়াত তা'লীম দিবারকালে অবশ্য মুআল্লিমের মৌখিক তিলাওয়াতের সাহায্য লওয়া মুতাআল্লিম বা শিক্ষানবীসের কর্তব্য। কারণ, মুআল্লিমের মুখ হইতে নিঃসৃত উচ্চারণের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া শুধু লিখিত কুরআন মজীদ দেখিয়া উহার তিলাওয়াত শিখিতে গিয়া শিক্ষানবীস অনেক ক্ষেত্রেই ভুল উচ্চারণ শিখিয়া ফেলে। কারণ, লিখিত কুরআন মজীদে শুধু বর্ণ ও শব্দ লিখিত থাকে; উহার উচ্চারণ লিখিত থাকে না; থাকা সম্ভবপরও নহে। উহার উচ্চারণ উস্তাদের মুখ হইতেই শিখিতে হয়। অবশ্য উস্তাদ পাওয়া না গেলে অক্ষমতা বা ওজরের কারণে (ভাষা জ্ঞান ও উহার উচ্চারণ জ্ঞানের সাহায্যে) উহার তিলাওয়াত শিক্ষানবীসের নিজেকেই শিখিয়া লইতে হয়। এইরূপ অবস্থায় কোনরূপ ভুল হইয়া গেলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উহা ক্ষমার যোগ্য হইবে। কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করিলেও ভুল হইতে পারে। অনিচ্ছাকৃত ভুল আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ক্ষমার্হ।

ইমাম আওযাঈ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন শুআয়ব, হিশাম ইব্ন ইসমাঈল দামেশকী ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইমাম আওযাঈ বলেন– একদা সফরে একটি লোক আমাদের সঙ্গী হইয়াছিল। লোকটি একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছিল। আমার মনে

১. উহা দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের নিকট বিপুলসংখ্যক কুরআন মজীদ লিখিত আকারে রক্ষিত ছিল। উক্ত তথ্যটি অনেক লোকের নিকট অবিদিত থাকিলেও উহা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত।

পড়ে, সে উহা নবী করীম (সা)-এর হাদীস হিসাবেই বর্ণনা করিয়াছিল। লোকটি যাহা বর্ণনা করিয়াছিল, তাহা এই ঃ 'আল্লাহ্‌র কোন বান্দা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবারকালে কোন ভুল করিলে উহা যেরূপে নাযিল হইয়াছে, ফেরেশতা তাহার তিলাওয়াতকে সেইরূপেই (তাহার আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করেন।'

বুকায়ের ইব্‌ন আখনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে শায়বানী, হাফস ইব্‌ন আবূ গিয়াস ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কথিত আছে, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবারকালে কোন অনারব লোক বা অন্য কেহ অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করিলে উহা যেরূপে নাযিল হইয়াছে, ফেরেশতা তাহার তিলাওয়াতকে সেইরূপেই (তাহার আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করেন।

কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করা কিংবা মুখস্থ তিলাওয়াত করার কোন্‌টি শ্রেয়তর, সে সম্বন্ধে একদল বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন ঃ শ্রেয়তর হইবার ভিত্তি হইতেছে আল্লাহ্‌র ভয়, ভালবাসা ও আন্তরিক বিনয়। কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করা এবং মুখস্থ তিলাওয়াত করা– ইহাদের মধ্যে যে তিলাওয়াতে আল্লাহ্‌র ভয় ও ভালবাসা এবং আন্তরিক বিনয় অধিকতর পরিমাণে অর্জিত হইবে, সেই তিলাওয়াতই শ্রেয়তর হইবে। উভয়বিধ তিলাওয়াতে সমপরিমাণের আল্লাহ্ ভীতি, আল্লাহ্ প্রেম ও আন্তরিক বিনয় অর্জিত হইলে কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করাই শ্রেয়তর হইবে। কারণ, উহাতে ভুলের আশাংকা কম থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, কুরআন মজীদের উভয়বিধ তিলাওয়াত সকল তিলাওয়াতকারীর উপরই সমান প্রভাব বিস্তার করে না। ব্যক্তির বিভিন্নতায় উহাদের প্রভাব বিস্তারেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শায়খ আবূ যাকারিয়া নববী 'তিবয়ান' গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন– 'পূর্বসূরী আহলে ইলমের এতদসম্পর্কীয় কথা ও কার্য এবং তাহাদের মতভেদ উপরোক্ত ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকেই এ সম্পর্কে তাহাদের পারস্পরিক মতভেদের স্বরূপ ও রহস্য উদঘাটন করিতে হইবে।

বর্তমান পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে আমরা দেখিয়াছি যে, ইমাম বুখারী হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহা দ্বারা তিনি যদি প্রমাণ করিতে চাহিয়া থাকেন যে, কুরআন মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করা উহা দেখিয়া তিলাওয়াত করা অপেক্ষা শ্রেয়তর, তবে তিনি ভুল করিয়াছেন।[১] কারণ, হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ঘটনাটি নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির ঘটনা। এইরূপ হওয়া বিচিত্র নহে যে, সংশ্লিষ্ট সাহাবী লেখাপড়া জানিতেন না এবং নবী করীম (সা)-এর নিকট উহা বিদিত ছিল। তাই উক্ত সাহাবী কুরআন মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করিতে পারেন কিনা নবী করীম (সা) তাহা তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অতএব, উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করিতে সমর্থ ও অসমর্থ– উভয় শ্রেণীর লোকের জন্যেই উহা মুখস্থ তিলাওয়াত করা শ্রেয়তর। এইরূপ ঘটনা দ্বারা উহা প্রমাণিত হইলে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার ঘটনা বর্ণনা করাই ইমাম বুখারীর জন্যে অধিকর সমীচীন ছিল।

১. ইমাম বুখারী সম্বন্ধে ইমাম ইব্‌ন কাছীরের উপরোক্ত ধারণা প্রকাশ করা এবং উহার উত্তর দিতে চেষ্টা করা ভুল। কারণ, ইমাম বুখারী সেইরূপ দাবী করেন নাই। আলোচ্য হাদীস দ্বারা কুরআন মজীদ মুখস্থ করতে উহা হিফাজত করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়। কুরআন মজীদ দেখিয়া পড়া অপেক্ষা উহা মুখস্ত পড়া অধিকতর শ্রেয় অথবা অশ্রেয়, উহা দ্বারা উহার কোনটিই প্রমাণিত হয় না। ইমাম বুখারীও আলোচ্য হাদীস দ্বারা উহার কোনটি প্রমাণ করিতে চাহেন নাই। কুরআন মজীদ মুখস্থ করিবার মাধ্যমে উহা হিফাজত করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিবার জন্যেই তিনি উহা এই স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন।

কারণ, নবী করীম (সা) নিজে একজন উম্মী বা নিরক্ষর মানব ছিলেন। তাই তিনি কুরআন মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করিতেন। বস্তুত আলোচ্য হাদীস দ্বারা শুধু ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট সাহাবী স্বীয় স্ত্রীকে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শিক্ষা দিতে পারিবেন কিনা, তাহা জানিবার জন্যেই নবী করীম (সা) তাহার নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, তিনি কুরআন মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করিতে পারেন কিনা। ইহাতে মুখস্থ তিলাওয়াতের শ্রেষ্ঠত্ব বা অশ্রেষ্ঠত্ব– কোনটিই প্রমাণিত হয় না। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী।

বারংবার তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন অবিস্মৃত রাখা

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে', মালিক, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কুরআন মজীদের ধারক রশি দ্বারা বাঁধা উটের মালিকের মতো। উটের মালিক উহাকে বাঁধিয়া রাখিলে উহা তাহার নাগালে থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে সে ছাড়িয়া দিলে উহা তাহার নিকট হইতে ভাগিয়া যায়।' ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসায়ীও উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী মালিক হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, আইউব, মা'মার, আবদুর রায্যাক ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কুরআন মজীদের ধারক হইতেছে উটের মালিকের ন্যায়। উটের মালিক উহা বাঁধিয়া রাখিলে উহা তাহার নাগাল ও অধিকারে থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে সে উহা ছাড়িয়া দিলে উহা তাহার নাগাল ও অধিকারের বাহিরে চলিয়া যায়। ঠিস সেইরূপ কুরআন মজীদের ধারক রাত্রিদিন তিলাওয়াত করিয়া উহা ধরিয়া রাখিলে উহা তাহার নিকট থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে সে উহা ঐ রূপে ধরিয়া না রাখিলে উহা তাহার নিকট হইতে চলিয়া যায়।' মুহাদ্দিস ইব্‌ন জাওযী 'জামেউল মাসানীদ' নামক হাদীস সংকলনে মন্তব্য করিয়াছেন যে, উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিমও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু শুধু ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত রাবী আবদুর রায্যাক হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়েল, মানসুর, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আরআরা ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– কোন ব্যক্তির পক্ষে ইহা বলা বড়ই বেমানান যে, 'আমি কুরআন মজীদের অমুক অমুক আয়াত ভুলিয়া গিয়াছি'; বরং সে তো উহা স্বেচ্ছায় নিজকে ভুলাইয়া দিয়াছে। (অতএব উহা বলাই তাহার পক্ষে সমীচীন যে, আমি উহাকে ভুলাইয়া দিয়াছি।) আর তোমরা কুরআন মজীদ বারংবার তিলাওয়াত করিয়া উহা স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিও। কারণ, গৃহপালিত পশুর পক্ষে ভাগিয়া যাইবার যতটুকু আশংকা থাকে, উহার পক্ষে মানুষের স্মৃতি হইতে ভাগিয়া যাইবার তদপেক্ষা অধিকতর আশংকা থাকে।'

বিশর ইব্‌ন মুহাম্মদ সাখতিয়ানী উপরোক্ত হাদীসটি পূর্বোক্ত রাবী শু'বা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং শু'বা হইতে ইব্‌ন মুবারকের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহা শু'বা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনাদাংশে এবং, শু'বা

হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ দাউদ তায়ালেসী ও মাহমুদ ইব্‌ন গায়লানের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী উহা শু'বা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তিনি উহা উপরোক্ত রাবী মানসুর হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং 'মানসুর হইতে উসমান ইব্‌ন জারীরের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত রাবী মানসুর হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং মানসুর হইতে ধারাবাহিকভাবে জারীর, উসমান, যুহায়র ইব্‌ন হারব এবং ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীমের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উপরোক্ত তথ্যে দেখা যাইতেছে যে, উল্লেখিত ইমামগণ সকলেই উপরোক্ত রাবী মানসূরের মাধ্যমে উপরোক্ত হাদীসটি স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী (حديث مرفوع) হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

অবশ্য ইমাম নাসাঈ উহা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়েল, মানসূর, হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ ও কুতায়বার সনদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিজস্ব উক্তি (حديث موقوف) হিসাবেও বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহা হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করা সমর্থিত নহে।

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাকীক, আবদাহ ও ইব্‌ন জুরায়জ প্রমুখ রাবী হইতেও উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা হইয়াছে। ইমাম মুসলিম উহা ইব্‌ন জুরায়জ হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ উহা 'আল ইয়াওমু ওয়াল্লাইলাহ্' পুস্তকে উপরোক্ত রাবী ইবাদাহ ইব্‌ন আবূ লুবাবাহ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন জাহাদাহ প্রমুখ রাবীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরদাহ, ইয়াযীদ, আবূ উসামা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা ও ইমাম নাসাঈ (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিলেন– 'কুরআন মজীদ পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত করিয়া উহা বিস্মৃতি হইতে রক্ষা কর। কারণ, যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাঁহার কসম! দড়ি দিয়া বাঁধা উটকে ছাড়িয়া দিলে উহার পক্ষে ভাগিয়া যাইবার যতটুকু আশংকা থাকে, মানুষের স্মৃতি হইতে কুরআন মজীদের চলিয়া যাইবার তদপেক্ষা অধিকতর আশংকা থাকে।'

ইমাম মুসলিম (র) উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবূ উসামা হাম্মাদ ইব্‌ন উসামা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ উসামাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরদ আশআরীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত উকবা ইব্‌ন আমের (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী মূসা ইব্‌ন আলী, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক, আলী ইব্‌ন ইসহাক ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে শিখ, উহা পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত করিয়া বিস্মৃতি হইতে রক্ষা কর এবং উহা সুরের সহিত তিলাওয়াত কর। যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার কসম! জলাশয়ে দড়ি দিয়া বাঁধা গৃহপালিত পশুর ভাগিয়া যাইবার যতটুকু

আশংকা থাকে, স্মৃতি হইতে কুরআন মজীদের চলিয়া যাইবার তদপেক্ষা অধিকতর আশংকা থাকে।'

উপরোক্ত হাদীসসমূহের মূল বক্তব্য হইতেছে– কুরআন মজীদ পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত করিবার প্রতি উৎসাহ প্রদান। কারণ, কুরআন মজীদ ভুলিয়া যাওয়া কবীরা গুনাহ। আর পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত করিবার মাধ্যমেই উহা বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করা সম্ভবপর। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে উক্ত কবীরা গুনাহ হইতে রক্ষা করুন।

হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি, ঈসা ইব্‌ন ফায়েদ, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ, খালিদ, খালফ ইব্‌ন ওয়ালীদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– মাত্র দশজন লোকের উপর নেতৃত্বকারী ব্যক্তিকেও কিয়ামতের দিন হাতকড়া পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হইবে। অধীন ব্যক্তিদের প্রতি আচরিত তাহার ন্যায়বিচার ছাড়া কোন কিছুই তাহাকে উক্ত অবস্থা হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না। অতঃপর নবী করীম (সা) কুরআন মজীদ শিখিবার পর যে ব্যক্তি উহা ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাকে তাহার শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছেন (যাহা এখানে বর্ণিত হয় নাই।) উক্ত হাদীসটি যেরূপ উপরোক্ত রাবী ইয়াযীদ ইব্‌ন যিয়াদ হইতে খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ রিওয়ায়েত করিয়াছেন, তদ্রূপ উহা ইয়াযীদ হইতে জারীর ইব্‌ন আবদুল হামীদ এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ফুযায়লও রিওয়ায়েত করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ উহা কুরআন মজীদের তিলাওয়াত ভুলাইয়া দেওয়ার ঘটনার সহিত 'হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ (রা)' হইতে ধারাবাহিকভাবে ঈসা ইব্‌ন ফায়েদ, ইয়াযীদ, ইব্‌ন আবূ যিয়াদ, ইব্‌ন ইদরীস ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লার সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত সনদে হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ (রা) এবং ঈসা ইব্‌ন ফায়েদ এই রাবীদ্বয়ের মধ্যে অজ্ঞাতনামা কোন রাবীর থাকিবার কথা উল্লেখিত হয় নাই। তেমনি উহা ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ হইতে আবূ বকর ইব্‌ন আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীস আবার যায়দ হইতে সাঈদও বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণনায় সনদের ব্যাপারে সন্দেহের উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত হাদীস আবার যায়দ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন ফায়েদ হইতে ধারাবাহিকভাবে তাঁহার শিষ্যগণ ও ওয়াকী' কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে রাবী সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয় নাই।

উক্ত সনদে উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবেই বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ উহা 'মুসনাদে উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রা)' নামক হাদীস সংকলনেও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ হযরত উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ঈসা ইব্‌ন ফায়েদ, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ, আবদুল আযীয ইব্‌ন মুসলিম ও আবদুস সামাদ আমার নিকট বর্ণণা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কোন ব্যক্তি মাত্র দশ জন লোকের উপর নেতৃত্ব করিয়া থাকিলেও (কিয়ামতের দিন) তাহাকে হাতকড়া পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হইবে। নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিদের প্রতি কৃত তাহার ন্যায়বিচার ছাড়া কোন কিছুই তাহাকে উক্ত বন্দীদশা হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না। আর যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শিখিবার পর উহা ভুলিয়া গিয়াছে, কিয়ামতের দিন সে কর্তিত হস্ত হইয়া আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হইবে।' উক্ত হাদীসটি ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ হইতে আবূ উআইনাহও বর্ণনা করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, উহার সনদের বিষয়ে রাবীদের মধ্যে মিল নাই। তবে সতর্কীকরণ (ترهيب) সম্পর্কীয় হাদীসের ক্ষেত্রে সনদ সম্বন্ধীয় এইরূপ অমিল আপত্তিকর নহে। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ

জ্ঞানী। এইরূপ অমিল সনদের হাদীস যখন অন্য হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়, তখন এইরূপ ক্ষেত্রে উহা বিশেষত গৃহীত হইয়াই থাকে। উক্ত হাদীস নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে ঃ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'আমার সম্মুখে আমার উম্মতের নেক আমলসমূহ উপস্থাপন করা হইয়াছে। এমনকি কোন ব্যক্তি মসজিদ হইতে যে খড়-কুটাটি অথবা পশুর লাদটি বাহির করিয়া ফেলে, উহার নেকীটিও। আর আমার সম্মুখে আমার উম্মতের বদ আমলসমূহ উপস্থাপন করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি কুরআন মজীদের কোন আয়াত বা সূরার তিলাওয়াত শিখিবার পর উহা ভুলিয়া গেলে তাহার আমলনামায় যে বদী লেখা হয়, তদপেক্ষা বৃহত্তম কোন বদী আমি উহার মধ্যে দেখি নাই।

হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'আমার উম্মতের লোকদিগকে কিয়ামতের দিনে যে সকল গুনাহের শাস্তি পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে, তাহাদের মধ্যে একটি বড় গুনাহ হইতেছে কোন ব্যক্তির কুরআন মজীদের কোন সূরার তিলাওয়াত শিখিবার পর উহা বিস্মৃত হইবার গুনাহ।' ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবূ ইয়া'লা এবং ইমাম বায্যারও উপরোক্ত হাদীস হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুত্তালিব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানতাব, ইব্ন জুরায়জ ও ইব্ন আবূ দাউদের অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস সম্বন্ধে ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন ঃ উক্ত হাদীস হযরত আনাস (রা) হইতে শুধু উপরোক্ত মাধ্যমেই বর্ণিত হইয়াছে; অন্য কোন মাধ্যমে উহা তাঁহার নিকট হইতে বর্ণিত হয় নাই। আমি উহা ইমাম বুখারীর নিকট উল্লেখ করিলে তিনিও উহা সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।' ওয়ালেবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারেমী বলিয়াছেন– '(উপরোক্ত রাবী) মুত্তালিব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানতার হযরত আনাস (রা) হইতে হাদীস শ্রবণ করেন নাই।' আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যুহরী, ইব্ন জুরায়জ, ইব্ন আবূ দাউদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ আদমীও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন কোন তাফসীরকার উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত বিষয়কে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের তাফসীর প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا ـ وَنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيمَةِ اَعْمٰى ـ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ـ قَالَ كَذَالِكَ اَتَتْكَ اٰيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمُ تُنْسٰى ـ

'যে ব্যক্তি আমার উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, তাহার জন্য জীবিকা হইবে সংকুচিত। অতঃপর আমি কিয়ামতের দিনে তাহাকে অন্ধ করিয়া অন্যদের সঙ্গে উঠাইব। সে বলিবে, হে প্রভু! কেন আমাকে অন্ধ করিয়া উঠাইলে? আমি তো দুনিয়াতে চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ্ বলিবেন, তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ (নিদর্শনাবলী) আসিয়াছিল; কিন্তু তুমি উহা ভুলিয়া রহিয়াছিলে। সেইরূপে আজ তোমাকে ভুলিয়া থাকা হইবে।'

উপরোল্লেখিত হাদীসের বক্তব্য বিষয় উপরোক্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার সমগ্রটুকু না হইলেও উহার অংশবিশেষ বটে। কারণ, কুরআন মজীদের তিলাওয়াত হইতে বিরত থাকা, উহা বিস্মৃত হওয়া এবং উহার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া কুরআন মজীদের প্রতি এক প্রকারের অবহেলা প্রদর্শন করা এবং উহা এক প্রকারের ভুলিয়া থাকা বৈ কিছু নহে। আল্লাহ্র নিকট এইরূপ কার্য হইতে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- تعاهدوا القران অর্থাৎ তোমরা কুরআন মজীদ পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত করিয়া উহাকে বিস্মৃতি হইতে রক্ষা কর। তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اَسْتَذْكِرُوا الْقُرْاٰنَ - فَانَّهُ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعْمِ অর্থাৎ তোমরা বারবার তিলাওয়াত করিয়া কুরআন মজীদকে অবিস্মৃত রাখো। গৃহপালিত পশুর পক্ষে পালাইয়া যাইবার যতটুকু আশংকা থাকে, মানুষের স্মৃতি হইতে কুরআন মজীদের দূরে সরিয়া যাইবার ততোধিক আশংকা থাকে। التفصى শব্দের অর্থ হইতেছে মুক্ত হওয়া, খালাস পাওয়া, দূরীভূত হওয়া। تفصى فلان من البلية অমুক ব্যক্তি বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়াছে। تفصى النوى من التمرة খেজুর হইতে উহার দানা পৃথক হইয়া গিয়াছে। উক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, গৃহপালিত পশুকে ছাড়িয়া দিলে উহার পালাইয়া যাইবার যত আশংকা থাকে, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত না করিয়া স্মৃতিতে রাখিয়া দিলে স্মৃতি হইতে উহার পালাইয়া যাইবার ততোধিক আশংকা রহিয়াছে।

ইবরাহীম হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন ঃ ইবরাহীম বলেন যে, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন- 'আমি যদি কোন ব্যক্তিকে দেখি যে, সে কুরআন মজীদ শিখিবার পর উহা ভুলিয়া গিয়াছে এবং সে মোটা-সোটা রহিয়াছে, তবে তাহাকে মারিয়া ফেলিব।' যিহাক ইব্ন মুযাহিম হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল আযীয ইব্ন আবূ দাউদ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক বর্ণনা করিয়াছেন যে, যিহাক ইব্ন মুযাহিম বলেন- 'কোন ব্যক্তি কুরআন মজীদ শিখিবার পর ভুলিয়া গেলে বুঝিতে হইবে যে, সে পূর্বে কোন গুনাহ্ করিয়াছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَاَاَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ অর্থাৎ 'তোমাদের প্রতি যে মুসীবত আসে উহা তোমাদের হাতেরই উপার্জন বৈ নহে।' নিঃসন্দেহে কুরআন মজীদ ভুলিয়া যাওয়া একটি মহা মুসীবত। এই কারণেই ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই প্রমুখ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন- 'তিন দিনের কম সময়ের মধ্যে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করা যেরূপ মাকরূহ, চল্লিশ দিনের মধ্যে কুরআন মজীদ আদৌ তিলাওয়াত না করা সেইরূপ মাকরূহ।' শীঘ্রই এতদসম্পর্কিত আলোচনা আসিতেছে।

যানবাহনে কুরআন তিলাওয়াত

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আইয়াস, শু'বা, হাজ্জাজ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল বলেন- মক্কা বিজয়ের দিনে আমি নবী করীম (সা)-কে স্বীয় উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরূঢ় অবস্থায় সূরা ফাতহ তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। ইমাম ইব্ন মাজাহ ছাড়া সিহাহ সিত্তার সকল সংকলকই

উপরোক্ত হাদীস পূর্বোক্ত রাবী শু'বা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আবূ আইয়াসের অন্য নাম হইতেছে মুআবিয়াহ ইব্‌ন কুররাহ। উক্ত হাদীস দ্বারাও গৃহে অবস্থান কিংবা বিদেশ ভ্রমণ, যে কোন অবস্থায় কুরআন মজীদ পুনঃ পুনঃ তিলাওয়াত করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়। অধিকাংশ ফকীহ বলেন– যানবাহনে আরূঢ় অবস্থায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করায় কোন দোষ নাই। তবে চলন্ত অবস্থায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা কোন কোন ফকীহ্‌র নিকট মাকরূহ।

হযরত আবূ দারদা (রা) সম্পর্কে ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি রাস্তায় চলন্ত অবস্থায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেন। হযরত উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীয (র) সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি ঐরূপ তিলাওয়াতের অনুমতি দিয়াছেন। পক্ষান্তরে মালিক (র) সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি তদ্রূপ তিলাওয়াতকে মাকরূহ মনে করিতেন। ইব্‌ন ওহাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ রবী' ও ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন ওহাব বলেন ঃ একদা আমি ইমাম মালিকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম– 'একটি লোক শেষ রাত্রিতে নামায আদায় করিতেছিল। নামাযে সে যে সূরা তিলাওয়াত করেছিল, উহা শেষ হইবার পূর্বেই সে মসজিদে রওয়ানা হইল। পথিমধ্যে সে অসমাপ্ত সূরাটির অবশিষ্টাংশ তিলাওয়াত করিতে পারিবে কি ? ইমাম মালিক বলিলেন– রাস্তায় চলমান অবস্থায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা যায় বলিয়া আমার জানা নাই।

শা'বী বলেন– তিনটি স্থানে কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরূহ। (১) গোসলখানায় (২) পায়খানা (৩) চক্র দ্বারা নির্মিত ঘূর্ণায়মান ঘর। পূর্বসূরি বিপুলসংখ্যক ফকীহ বলেন– গোসলখানায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা মাকরূহ নহে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ, ইবরাহীম নাখঈ (র) প্রমুখ ফকীহ্‌গণ অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) সম্বন্ধে ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি উহা মাকরূহ মনে করিতেন। আবূ ওয়ায়েল শাকীক ইব্‌ন সালমাহ, হাসান বসরী মাকহুল এবং কুবায়সাহ ইব্‌ন জুআয়েব সম্বন্ধে ইব্‌ন মুনযির বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা উহাকে মাকরূহ (অপছন্দনীয়) বলিয়াছেন। ইবরাহীম নাখঈ হইতেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি গোসলখানায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করাকে মাকরূহ মনে করিতেন।

পায়খানায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা কেন মাকরূহ তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। উহার কারণ স্পষ্ট। কুরআন মজীদের ইয্‌যাত ও সম্মান রক্ষা করিবার নিমিত্ত কেহ যদি পায়খানায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করাকে হারাম বলেন, তবে উহাও একটি উল্লেখযোগ্য অভিমত হিসাবে পরিগণিত হইবে। চক্র দ্বারা নির্মিত ঘূর্ণায়মান চড়কে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা এই কারণে মাকরূহ যে, উহাতে কুরআন তিলাওয়াতকারীর অন্য কোন ব্যক্তির নীচে নামিতে হয় ও অন্য ব্যক্তি তিলাওয়াতকারীর উপরে উঠিতে পারে। আর সত্য সর্বদা উপরে থাকে ও উহার উপর কিছু থাকিতে পারে না, থাকা শোভা পায় না। আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

বালক-বালিকাদের কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আবূ বিশর, আবূ উআয়নাহ, মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– 'নবী করীম (সা) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন আমার বয়স দশ বৎসর। এই বয়সেই আমি কুরআন মজীদের 'মুহকাম' (المحكم) অংশের তিলাওয়াত শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম।' উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন– কুরআন মজীদের যে অংশকে তোমরা 'মুফাস্‌সাল' (المفصل) নামে আখ্যায়িত করিয়া থাকো, উহার এক নাম 'মুহকাম' (المحكم) বটে।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আবূ বিশর, হাশীম, ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায়ই আমি কুরআন মজীদের 'মুহকাম' অংশটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম।' রাবী সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম– কোন অংশটির নাম 'মুহকাম'? তিনি বলিলেন– 'মুফাস্‌সাল নামক অংশটির আরেক নাম হইতেছে 'মুহকাম।' উক্ত রিওয়ায়েতটি শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই। উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বালক-বালিকাদের পক্ষে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শিক্ষা করা জায়েয। কারণ স্বয়ং হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কথায় জানা যাইতেছে যে, নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের সময়ে তাঁহার বয়স দশ বৎসর ছিল এবং এই বয়সেই তিনি কুরআন মজীদের মুফাস্‌সাল অংশটুকু আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, সূরা হুজুরাত হইতে শেষ পর্যন্ত অংশ 'মুফাস্‌সাল' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইমাম বুখারী অন্যত্র হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– 'নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের সময়ে আমি খতনাকৃত বালক ছিলাম। সেই সময়ে বালকদের বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বে তাহাদের খতনা সম্পাদিত হইত না।' উপরোক্ত রিওয়ায়েতগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যের একটি পথ এই হইতে পারে যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) মাত্র দশ বৎসর বয়সেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহার মধ্যে সামঞ্জস্যের আরেকটি পথ এই হইতে পারে যে, তিনি মাত্র দশ বৎসর বয়সে নহে; বরং দশ বৎসরের অধিক বয়সেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু দশ বৎসরের অতিরিক্ত বৎসরের সংখ্যা তিনি উল্লেখ করেন নাই। আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

সে যাহা হউক, উক্ত রিওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বালক-বালিকাগণকে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শিক্ষা দেওয়া জায়েয। ইহা সহজবোধ্য কথা। এমনকি উহা কখনও কখনও মুস্তাহাব অথবা ওয়াজিবও হয়। কারণ, প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্বে বালক-বালিকাগণ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শিক্ষা করিলে নামাযের জন্যে প্রয়োজনীয় কুরআন মজীদের অংশ প্রাপ্তবয়স্ক হইবার কালে তাহাদের জানা থাকে। অধিক বয়সে কুরআন মজীদ হিফজ করা অপেক্ষা অল্প বয়সে হিফজ করা শ্রেয়তর। উহাতে কুরআন মজীদ সহজেই হিফজ হইয়া যায় এবং স্মৃতিতে অধিকতর দৃঢ়ভাবে গাঁথা থাকে। বাস্তব ঘটনাই ইহার প্রমাণ বহন করে।

পূর্বসূরী কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, বালক-বালিকাগণকে তাহাদের প্রথম বয়সে কিছু দিন খেলাধূলার জন্যে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তারপর তাহাদের মধ্যে কুরআন মজীদ পড়িবার মত দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা সৃষ্টি হইলে তাহাদিগকে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শিক্ষা দেওয়া উচিত। এইরূপ করিলে তাহারা কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শিক্ষা করা আরম্ভ করিবার পর উহাতে বিরক্ত ও অনিচ্ছুক হইয়া খেলাধূলায় ফিরিয়া আসিবে না। কেহ কেহ বলেন– শিশুর মধ্যে যতদিন কথা বুঝিবার মত বুদ্ধি না আসে, ততদিন তাহাকে কুরআন

মজীদের তিলাওয়াত শিক্ষা না দেওয়াই ভাল। কিছুটা বুদ্ধি আসিবার পর তাহার বুদ্ধি অনুযায়ী অল্প অল্প করিয়া তাহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। হযরত উমর (রা) শিশুকে পাঁচ আয়াত করিয়া শিক্ষা দেওয়া পছন্দ করিতেন। আমরা তাঁহার নিকট হইতে উহা সহীহ সনদে (অন্যত্র) বর্ণনা করিয়াছি।

কুরআন মজীদের বিস্মরণ

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন উরওয়া, যায়দ, রবী' ইব্ন ইয়াহিয়া ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) একটি লোককে মসজিদে বসিয়া কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে শুনিয়া বলিলেন– 'আল্লাহ্ তাহাকে রহম করুন। সে আমাকে অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করাইয়া দিয়াছে।' উক্ত হাদীস শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই। হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম, ঈসা ইব্ন ইউনুস, মুহাম্মদ ইব্ন ইবায়দ ইব্ন মায়মুন ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ পূর্ববর্তী হাদীসে বর্ণিত বাণীর সহিত নবী করীম (সা) ইহাও বলিলেন– 'আমি উহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।' উক্ত রিওয়ায়েতও শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। উহা হিশাম হইতে আলী ইব্ন মুসহার এবং আবাদাহও বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী উহা হিশাম হইতে উপরোক্ত দুই রাবী আলী ইব্ন মুসহার এবং আবাদার মাধ্যমে অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা হিশাম হইতে শুধু আবাদার মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়াহ, হিশাম ইব্ন উরওয়াহ, আবূ উসামা, আহমদ ইব্ন আবূ রজা ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন ঃ

একদা নবী করীম (সা) একটি লোককে রাত্রিতে একটি সূরা তিলাওয়াত করিতে শুনিয়া বলিলেন– 'আল্লাহ্ তাহাকে দয়া করুন! সে আমাকে অমুক আয়াত স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। আমি উহা অমুক সূরা হইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।' ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত রাবী আবূ উসামাহ হাম্মাদ ইব্ন উসামাহ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অনুরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।[১]

১. উপরোক্ত হাদীস এবং তদনুরূপ অন্যান্য হাদীস দ্বারা ফকীহগণ প্রমাণ করেন যে, নবী করীম (সা)-ও ভুলিয়া যাইতেন এবং তিনিও বিস্মৃতির কবলে পতিত হইতেন। তবে ফকীহগণ সর্বসম্মতভাবে বলেন যে, নবী করীম (সা)-কে যে বিষয় লোকদের নিকট প্রচার ও তাবলীগ করিতে হইত, তাহা তিনি ভুলিয়া যাইতেন না এবং তাহা ভুলিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। দেখা যাইতেছে যে, কোন বিষয়কে গোপন করা নবী করীম (সা)-এর পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল, তেমনি যে বিষয়ের প্রচার ও তাবলীগ তখনও সম্পন্ন হয় নাই, সেই বিষয় ভুলিয়া যাওয়াও তাঁহার পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব ছিল। যে ধরনের বিস্মৃতি নবী করীম (সা)-এর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, উহা সম্ভবপর না থাকাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত ছিল। কারণ, এইরূপ বিস্মৃতি সম্ভবপর হইলে রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ঐরূপ বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের তাৎপর্য বর্ণনাযোগ্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى - إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (অচিরেই আমি তোমাকে তিলাওয়াত শিখাইব। ফলত আল্লাহ্ যাহা চাহেন, তাহা ছাড়া কিছুই তুমি ভুলিয়া যাইবে না।)

উপরোক্ত আয়াতের একটি তাৎপর্য এই যে, আয়াতের প্রথম দিকে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-কে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শিক্ষা দিবেন। উহার ফলে তিনি আর উহা ভুলিবেন না।

হযরত আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়েল, মানসূর, সুফিয়ান, আবূ নাঈম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কোন ব্যক্তির ইহা বলা বড়ই বেমানান যে, 'আমি কুরআন মজীদের অমুক অমুক আয়াত বা সূরা ভুলিয়া গিয়াছি। বরং সে তো উহা (অবহেলাভরে) বিস্মৃত হইয়াছে।' ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈও উহা উপরোক্ত রাবী মানসূর হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে এতদসম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচনা

(চলমান) যদিও অন্যেরা উহা ভুলিয়া যাইতে পারে; তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে উহার বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করিবেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যদি নবী করীম (সা)-এর স্মৃতি হইতে কুরআন মজীদ ভিন্ন অন্য কিছু ভুলাইয়া দিতে চাহেন, তবে উহা তিনি ভুলিয়া যাইতে পারেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যে এইরূপ বিস্মৃতি চাহিবেনই, উহা দ্বারা তেমন কথা বুঝা যায় না। তিনি এইরূপ বিস্মৃতি চাহিতেও পারেন, না চাহিতেও পারেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিয়াছিলেন ঃ

وَلاَ اَخَافُ مَاتُشْرِكُوْنَ بِهٖ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبِّىْ شَيْئًا ـ

(আর তোমরা যাহাদিগকে তাঁহার শরীক ঠাওরাও, আমি তাহাদিগকে ডরাই না। কিন্তু আমার প্রতিপালক যদি কোন কিছু আমার ব্যাপারে চাহেন (তবে উহা স্বতন্ত্র কথা)।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে 'কিন্তু' শব্দের পর উল্লেখিত বাক্য দ্বারা যে ব্যতিক্রমের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহা পূর্ববাক্যে বর্ণিত নেতিবাচক বিষয়ের সম-শ্রেণীভুক্ত নহে। এই ধরনের ব্যতিক্রম প্রকাশ আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে استثناء منقطع –ইসতেছনায়ে মুনকাতি) নামে পরিচিত। পূর্ব বিষয় হইতে ভিন্ন শ্রেণীর বিষয়কে ব্যতিক্রমমূলক বিষয় হিসাবে الا শব্দ সহযোগে পরবর্তী বাক্যে প্রকাশ করা হয়। এইরূপ ব্যতিক্রম প্রকাশের একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। উহা এই যে, যেহেতু (الا –কিন্তু)' শব্দের পর উল্লেখিত বস্তু বা বিষয়টি উহার পূর্বে উল্লেখিত বস্তু বা বিষয়ের সমশ্রেণীভুক্ত বস্তু বা বিষয় হইতে পারে না, তাই ব্যতিক্রম প্রকাশ ব্যতিরেকেই উভয় শ্রেণীর বস্তু বা বিষয়ের প্রতি প্রযোজ্য বক্তব্যও পৃথক এবং স্বতন্ত্র থাকে। তথাপি পূর্ব বাক্য দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যেই বাক্যে এইরূপ ব্যতিক্রম প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। পূর্বোক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা বুঝিবার জন্যেও আরবী বাগধারা সম্পর্কিত উপরোক্ত সূক্ষ্ম কথাটি মনে রাখিতে হইবে।

প্রসিদ্ধ আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ ফররা বলেন– উপরোক্ত আয়াতদ্বয় ও অনুরূপ আয়াতে 'কিন্তু' সহযোগে 'সৃষ্ট' বাক্যদ্বারা প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ ব্যতিক্রমই প্রকাশ করা হয় নাই; বরং উহা শুধু বরকত হিসাবে উল্লেখিত হইয়াছে। ফররার মতে বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে কুরআন মজীদের কোন আয়াত আদৌ ভুলাইয়া দেন নাই।

একদল ফকীহ ও মুহাক্কিক বলেন– 'তুমি ভুলিয়া যাইবে না' এই কথার তাৎপর্য এই যে, 'তুমি উহার আমল ভুলিয়া যাইবে না।' আর আলোচ্য হাদীসে যে বিস্মৃতির কথা উল্লেখিত হইয়াছে, উহা ছিল ইতিপূর্বে প্রচারিত বিষয়ের বিস্মৃতি।

এই টীকাকার বলিতেছে, আলোচ্য হাদীসে যে বিস্মৃতির কথা উল্লেখিত হইয়াছে, উহা ছিল সাময়িক বিস্মৃতি। উক্ত সাময়িক বিস্মৃতির পর নবী করীম (সা) বিস্মৃত আয়াতগুলিসহ সম্পূর্ণ সূরা তিলাওয়াত করিতে পারিতেন।

অথবা বলা যায়, আলোচ্য হাদীসসমূহ গ্রহণযোগ্য নহে; বরং উহা প্রত্যাখ্যাতও বটে। ইমাম বুখারীর নিকট যদিও উহার সনদ সহীহ, তথাপি বলা যায়, ইমাম বুখারী (র) সহ সকল হাদীস শাস্ত্রবিদই রাবীদের সম্বন্ধে তাহাদের নিকট পরিজ্ঞাত বাহ্য তথ্যাদির ভিত্তিতে রাবীদিগকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী, স্মৃতিধর বা বিস্মৃতিপরায়ণ মনে করেন। স্বীকার করি, তাহাদের এইরূপ মনে করা সাধারণত সঠিক ও নির্ভুল ধরিয়া লওয়া যায়। তবে যে ক্ষেত্রে রাবীদের বর্ণনা কুরআন মজীদের বর্ণনার বিরোধী হয়, সে ক্ষেত্রে রাবীদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নহে, গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীসগুলি শুধু ইমাম বুখারীই বর্ণনা করিয়াছেন। আরও উল্লেখ্য যে, হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হয়, কুরআন মজীদ ভুলিয়া যাওয়া কবীরা গুনাহ্।

করা হইয়াছে। উক্ত হাদীস এবং উহার পরবর্তী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদকে স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিবার জন্যে কেহ যথোপযুক্ত চেষ্টা ও সাধনা করিবার পরও যদি সে উহা ভুলিয়া যায়, তবে তজ্জন্য সে দায়ী বা গুনাহ্গার হইবে না।

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত ভুলিয়া যাইবার কথা প্রকাশ করিবার সঠিক ভাষা ও আদব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কেহ কুরআন মজীদের কোন আয়াত বা সূরার তিলাওয়াত ভুলিয়া গেলে সে যেন না বলে– 'আমি অমুক আয়াত বা সূরা ভুলিয়া গিয়াছি।' বরং সে যেন বলে– 'আমাকে ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।' কারণ, النسيان (ভুলিয়া যাওয়া) প্রকৃতপক্ষে বান্দার ক্রিয়া নহে। তবে ভুলিয়া যাইবার কারণ বান্দাই ঘটাইয়া থাকে। ভুলিয়া যাইবার কারণ হইতেছে– অবহেলা, যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া ও পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত না করা।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। উহা এই যে, কুরআন মজীদের তিলাওয়াত ভুলিয়া যাইবার কথা প্রকাশ করিবার জন্যে 'আল্লাহ্ আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছেন' বলা সমীচীন নহে; বরং 'আমাকে ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে' বলা সমীচীন।

অবশ্য বান্দাকেও কখন কখন ভুলিয়া যাওয়া ক্রিয়ার কর্তা বানানো হইয়া থাকে। তবে উহা আলংকারিক প্রয়োগ বৈ কিছু নহে। প্রকৃতপক্ষে 'ভুলিয়া যাওয়া' ক্রিয়ার কর্তা বান্দা নহে। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে ভুলিয়া যাওয়া ক্রিয়ার কর্তা বানাইয়াছেন ঃ

وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ (আর তুমি যখন ভুলিয়া যাও, তখন স্বীয় প্রভুকে স্মরণ কর।)

ভুলিয়া যাওয়ার কারণ হইতেছে– অবহেলা, ঔদাসীন্য ইত্যাদি। উহা একটি গুনাহ্ বটে। আর উক্ত কারণের সংঘটক বা কর্তা হইতেছে বান্দা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা 'ভুলিয়া যাওয়া' ক্রিয়ার কর্তা বাহ্যত বান্দাকে বানাইলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে বান্দার অবহেলা ইত্যাদি অপরাধকে উহার কর্তা বলিয়া বুঝাইয়াছেন।[১] আয়াতের তাৎপর্য এই যে, স্বীয় অবহেলারূপ অপরাধের কারণে তুমি যখন ভুলিয়া যাও, তখন স্বীয় প্রভুকে স্মরণ কর। প্রভুর স্মরণে অপরাধ মাফ হইয়া যাইবে। কারণ নেক কাজে গুনাহ্ মাফ হইয়া যায়। অপরাধ মাফ হইয়া যাইবার পর বিস্মৃত বিষয় পুনরায় স্মরণে আসিবে। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

---

১. ইমাম ইব্‌ন কাছীর (র) আলোচ্য হাদীসের যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, এবং প্রসঙ্গত বান্দাকে ভুলিয়া যাওয়া ক্রিয়ার কর্তা বানাইবার বৈধতা-অবৈধতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাকে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া সুকঠিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ স্বীয় অবহেলা ও গাফলতির দরুণ কুরআন মজীদের তিলাওয়াত ভুলিয়া যায়। এইরূপ ভুলিয়া যাওয়ার জন্যে আল্লাহ্ বা অন্য কেহ দায়ী নহে; উহার জন্যে বরং সে নিজেই দায়ী ও গুনাহ্গার। এইরূপ ব্যক্তি আর যাহাই হউক, অবুঝ শিশুর ন্যায় নিরপরাধ নহে। তাই আমি যদি বলি, 'আমি ভুলিয়া গিয়াছি' ও ভুলিয়া যাইবার জন্যে আমি দায়ী বা গুনাহ্গার নহি' তবে সে আরেকটি অপরাধে অপরাধী হইবে। অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে যদি সে অপরাধী মনে লজ্জিত হইয়া বলে, 'আমিই ভুলিয়া গিয়াছি' তবে উহা অন্যায় হইবে না,– হইতে পারে না। কিন্তু অপরাধী মনে নিজের অপরাধকে লজ্জা ও বিনয়ের সহিত প্রকাশ করিবার অধিকতর সঙ্গত ও উপযোগী ভাষা হইতেছে এই ঃ 'আমি অবহেলাভরে আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছি।' তাই আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– কাহারও পক্ষে 'আমি ভুলিয়া গিয়াছি' বলা বড়ই বেমানান; বরং (আমি ভুলাইয়া দিয়াছি বলাই মানানসই)। কারণ, সে নিজেই তো নিজকে ভুলাইয়া দিয়াছে। ইহাই উক্ত হাদীসের সঠিক ও প্রকৃত তাৎপর্য।

অতপর বলা যায়, বান্দা কখনও النسيان (ভুলিয়া যাওয়া) ক্রিয়ার প্রকৃত কর্তাও হইতে পারে। কারণ, সে নিজের অবহেলায় অথবা অনিচ্ছায় যে কোন কারণেই ভুলিয়া যাইতে পারে, ভুলিয়া যায়ও। কুরআন মজীদে একাধিক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে النسيان ক্রিয়ার কর্তা বানাইয়াছেন।

কুরআনের সূরার নামকরণ

হযরত আবূ মাসউদ উতবা ইব্ন আমর আনসারী বদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলকামা, আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ, ইবরাহীম, আ'মাশ, হাফস ইব্ন গিয়াছ, উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াছ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'যে ব্যক্তি রাত্রিতে সূরা বাকারার শেষ দুইটি আয়াত তিলাওয়াত করে, তাহার জন্যে উহা যথেষ্ট।'

সিহাহ সিত্তার সকল সংকলকই উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) উহা আবার উপরোক্ত রাবী আলকামা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুসাওয়ার আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল কারী, উরওয়া ও যুহরী প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, উমর (রা) বলেন– 'একদা আমি হিশাম ইব্ন হাকীম ইব্ন হিযামকে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম। অতঃপর তিনি তাঁহার বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসটির অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে উহা বর্ণিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও উহা বর্ণিত হইবে।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবহিকভাবে উরওয়াহ ও হিশাম ইব্ন উরওয়াহ প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) একটি লোককে রাত্রিতে মসজিদে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে শুনিয়া বলিলেন– 'আল্লাহ্ তাহাকে অনুগ্রহ করুন। সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। আমি সেইগুলি অমুক সূরা হইতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম।'

এইরূপে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি (হজ্জের সময়ে) উপত্যকা ভূমিতে দাঁড়াইয়া কংকর নিক্ষেপ করিবার কালে বলিতেন, এই স্থানে সূরা বাকারা নাযিল হইয়াছিল।

(চলমান) আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিতে গিয়া বলেন ঃ

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَئْنَا (প্রভু হে। যদি ভুলিয়া যাই অথবা ভুল করি, তবে তুমি আমাদিগকে পাকড়াও করিও না।)

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার শিষ্যের সফরের ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا (তাহারা দুইজনে দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছিবার পর নিজেদের মৎস্যকে ভুলিয়া গেল।)

তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ (আর যখন তুমি ভুলিয়া যাও, তখন স্বীয় প্রতিপালক প্রভুকে স্মরণ কর।)

এইস্থলে উহা অনুধাবনযোগ্য যে, মানুষ নিজেই ভুলিয়া যায়। ভুলের কারণ যাহাই হউক না কেন, উহা মানুষের হৃদয় হইতে আল্লাহ্ যে কুরআন মজীদ ভুলাইয়া দেয়। ইমাম ইব্ন কাছীর (র) শেষোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আয়াতটির অর্থ এই দাঁড়ায় ঃ আর তোমার অবহেলা যখন তোমাকে ভুলাইয়া দেয়, তখন তুমি স্বীয় প্রতিপালক প্রভুকে স্মরণ কর। এইরূপ অর্থ যে আয়াতের একটি কষ্টসাধ্য অর্থ, তাহা সহজেই বোধগম্য। উপরোল্লেখিত অপর দুইটি আয়াতের অর্থ বর্ণনা সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলা চলে।

পূর্বসূরী কোন কোন ফকীহ্ অবশ্য বলিয়াছেন যে, কোন সূরাকে নির্দিষ্ট কোন নামে অভিহিত করা মাকরূহ। বরং কোন সূরাকে বুঝাইতে হইলে বলিতে হইবে– 'যে সূরায় অমুক অমুক আয়াত রহিয়াছে, সেই সূরা। তাহাদের অভিমতের সমর্থনে তাহারা ইতিপূর্বে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

'হযরত উসমান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইয়াযীদ ফারসী প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উসমান (রা) বলেন– কুরআন মজীদের কোন আয়াত নাযিল হইলে নবী করীম (সা) বলিতেন– 'যে সূরায় অমুক অমুক আয়াত রহিয়াছে, ইহা সেই সূরার অন্তর্ভুক্ত কর।'

ইহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই যে, উপরোক্ত পথই অধিকতর শ্রেয়। তবে পূর্ববর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরাসমূহকে বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত করা বৈধ ও অনুমোদিত। আর এই ব্যবস্থাই বর্তমান যামানায় সাধারণ ও ব্যাপক ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। কুরআন মজীদের সূরাসমূহ বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত হইয়া থাকে।

মন্থরগতিতে কুরআন তিলাওয়াত

আল্লহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلاً (আর তুমি কুরআন মজীদ মন্থরগতিতে তিলাওয়াত কর।)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ (আর আমি এইরূপে কুরআন নাযিল করিয়াছি যেন তুমি উহা থামিয়া ধীরে-সুস্থে তিলাওয়াত করিয়া লোকদিগকে শুনাইতে পার।)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ فرقناه অর্থাৎ 'আমি উহার বিষয়বস্তুসমূহ বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি।' তাই কুরআন মজীদ ছন্দোবদ্ধ বাক্যের ন্যায় আবৃত্তি করা দূষণীয় নহে।

আবূ ওয়ায়েল হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াসিল, মাহদী ইব্ন মায়মূন, আবূ নু'মান ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ ওয়ায়েল বলেন– একদা আমরা সকাল বেলায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট গমন করিলাম। জনৈক ব্যক্তি বলিল, গত রাত্রিতে আমি মুফাস্সাল সূরা তিলাওয়াত করিয়াছি। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন– তোমার তিলাওয়াত আমি শুনিয়াছি। তুমি কুরআন মজীদকে ছন্দোবদ্ধ বাক্যের ন্যায় আবৃত্তি করিবে। পরস্পর পাশাপাশি সন্নিহিত যে সকল সূরা নবী করীম (সা) তিলাওয়াত করিতেন, উহা আমি নিশ্চয় স্মরণে রাখিয়াছি। সেইগুলি হইতেছে আঠারটি মুফাস্সাল সূরা এবং 'হা মীম' শ্রেণীর দুইটি সূরা।[১] ইমাম মুসলিম উপরোক্ত হাদীস 'হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়েল, শাকীক ইব্ন সালামা, ওয়াসিল ইব্ন হাব্বান, আহদাব, মাহদী ইব্ন মায়মূন ও শায়বান ইব্ন ফাররূখের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

১. উক্ত সূরা দুইটি হইতেছে সূরা 'দুখান' (الدخان) ও সূরা 'জাছিয়াহ' (الجاثية)। কথিত আছে, উক্ত সূরাদ্বয় হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কুরআন মজীদে মুফাস্সাল অংশের সহিত মিলানো ছিল।

মুসলিম ইব্ন মিখরাক হইতে ধারাবাহিকভাবে যিয়াদ ইব্ন নাঈম, হারিছ ইব্ন ইয়াযীদ, ইব্ন লাহীআ, কুতায়বা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন– একদা হযরত আয়েশা (রা)-কে জানানো হইল যে, কতেক লোক সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ এক রাত্রিতে একবার বা দুইবার তিলাওয়াত করে। ইহাতে তিনি বলিলেন– 'তাহারা পড়িলেও পড়ে নাই (অর্থাৎ তিলাওয়াত করে নাই)। আমি সারারাত নবী করীম (সা)-এর সহিত নামায আদায় করিতাম। তিনি (কখনও কখনও) সূরা বাকারা, সূরা আলে-ইমরান এবং সূরা নিসা তিলাওয়াত করিতেন। সতর্কীকরণমূলক যে কোন আয়াত তিলাওয়াত করিয়া তিনি অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিতেন এবং তাঁহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন। পক্ষান্তরে সুসংবাদমূলক যে কোন আয়াত তিলাওয়াত করিয়া তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিতেন এবং তাঁহার নৈকট্য কামনা করিতেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মূসা ইব্ন আবূ আয়েশা, জারীর, কুতায়বা ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ لَاتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে গিয়া হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন– 'হযরত জিবরাঈল (আ) যখন ওহী লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিতেন, নবী করীম (সা) তখন স্বীয় জিহবা ও ওষ্ঠদ্বয় নাড়াইয়া উহা তিলাওয়াত করিতেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন।' অতঃপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উল্লেখিত হইয়াছে। শীঘ্রই উহা বর্ণিত হইবে। উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত হাদীস এবং উহার পূর্বে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদ আস্তে-আস্তে তিলাওয়াত করা শরীআতের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। উহা অত্যন্ত দ্রুত তিলাওয়াত করা শরীআতের নিকট কাম্য ও অভিপ্রেত নহে। বরং শরীআত উহা ধীরগতিতে তিলাওয়াত করিতে এবং উহা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিতে ও উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كِتَابٌ اَنْزَلْنَهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اُوْلُوا الْاَلْبَابِ (উহা হইতেছে এইরূপ বরকতময় কিতাব যাহা আমি এই উদ্দেশ্যে নাযিল করিয়াছি যে, তাহারা উহার আয়াত লইয়া গভীরভাবে চিন্তা করিবে, আর প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তিগণ উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবে।)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যর, আসিম, সুফিয়ান, আবদুর রহমান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– কুরআন তিলাওয়াতকারী ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন বলা হইবে, 'তুমি তিলাওয়াত করিতে থাক আর উপরে উঠিতে থাক। তুমি দুনিয়াতে যেরূপ ধীরগতিতে তিলাওয়াত করিতে, সেইরূপ ধীরগতিতে তিলাওয়াত করিও। তুমি যেই স্তরে পৌঁছিয়া সর্বশেষ আয়াত তিলাওয়াত করিবে, তাহাই হইবে তোমার বাসস্থান।'

ইবরাহীম হইতে ধারাবাহিকভাবে মুগীরা, জারীর ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাবী ইবরাহীম বলেন– একদা আলকামা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে

কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। তিনি উহা দ্রুতগতিতে তিলাওয়াত করিয়াছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বলিলেন– 'আমার মা-বাপ তোমার জন্যে কুরবান হউন! তুমি কুরআন মজীদ মন্থর গতিতে পড়িবে। কারণ, কুরআন মজীদ সৌন্দর্যময়, শ্রুতি মাধুর্যময় ও আকর্ষণীয় করিয়া নাযিল করা হইয়াছে।' রাবী বলেন– 'আলকামা ছিলেন আকর্ষণীয় সুমধুর সূরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াতকারী।'

আবূ হামযা হইতে ধারাবাহিকভাবে আইউব, ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হামযা বলেন ঃ একদা আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলিলাম– 'আমি কুরআন মজীদ দ্রুতগতিতে তিলাওয়াত করিয়া থাকি। আমি তিন দিনে সমগ্র কুরআন মজীদ একবার তিলাওয়াত করিয়া থাকি।' ইহাতে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন– 'তুমি যেরূপে তিলাওয়াত করিয়া থাক বলিয়া দাবী করিতেছ, সেইরূপে তিলাওয়াত করা অপেক্ষা ধীরগতিতে এক রাত্রিতে মাত্র সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা এবং উহার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করা আমার নিকট নিশ্চয় অধিকতর প্রিয় ও পছন্দনীয়।'

ইমাম আবূ উবায়দ আবার উহা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হামযা, হাম্মাদ ইব্ন সালামা, শু'বা ও হাজ্জাজের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য উক্ত রিওয়ায়েতে 'তুমি যেরূপে তিলাওয়াত করিয়া থাক বলিয়া দাবী করিতেছ, সেইরূপে তিলাওয়াত করা অপেক্ষা' এই কথাটির স্থলে 'কুরআন মজীদ দ্রুত পড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা' এই কথাটি উল্লেখিত হইয়াছে।

কুরআনের অক্ষর টানিয়া পড়া

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে জারীর ইব্ন হাযিম ইযদী, মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদাহ বলেন ঃ 'একদা আমি হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট নবী করীম (সা)-এর কিরাআত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন– নবী করীম (সা) 'মদ' (المد) -এর সহিত তিলাওয়াত করিতেন।' 'সুনান'-এর সংকলকগণও উপরোক্ত রাবী জারীর ইব্ন হাযিম হইতে অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাম, আমর ইব্ন আসিম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল– নবী করীম (সা)-এর কিরাআত কিরূপ ছিল? তিনি বলিলেন– 'উহা ছিল মদ (المد) -এর সহিত সম্পন্ন কিরাআত।' অতঃপর হযরত আনাস (রা) (بسم الله الرحمن الرحيم) তিলাওয়াত করিলেন। উহাতে তিনি (الله) শব্দের 'লাম' (الرحمن) শব্দের 'মীম' এবং (الرحيم) শব্দের 'হা' টানিয়া পড়িলেন।'

উক্ত রিওয়ায়েত হযরত আনাস (রা) হইতে উপরোক্ত মাধ্যমে শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত মাধ্যমে বর্ণনা করেন নাই। ইমাম আবূ উবায়দ প্রায় অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উম্মে সালামা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়া'লা ইব্ন মুমলিক, ইব্ন আবূ মুলায়কা, লায়ছ, ইব্ন সা'দ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক,

আহমদ ইব্ন উসমান ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উম্মে সালামা (রা) নবী করীম (সা)-এর কিরআতের পরিচয় এইরূপে দিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) প্রতিটি অক্ষর পৃথকভাবে সুস্পষ্ট ও সুবোধ্য করিয়া সুন্দররূপে উচ্চারণ করিতেন। অর্থাৎ তিনি একটি অক্ষরের উচ্চারণকে আরেকটি অক্ষরের উচ্চারণের মধ্যে এরূপ প্রবিষ্ট করিয়া দিতেন না, যাহার কারণে অক্ষরের উচ্চারণ অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। ইমাম আহমদ উহা উপরোক্ত রাবী লায়ছ ইব্ন সা'দ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনাদাংশে এবং লায়ছ ইব্ন সা'দ হইতে ইয়াহিয়া ইব্ন ইসহাকের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ উহা উপরোক্ত রাবী লায়ছ ইব্ন সা'দ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং লায়ছ ইব্ন সা'দ হইতে ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ রামলীর অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ উহা উপরোক্ত রাবী লায়ছ ইব্ন সা'দ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং লায়ছ ইব্ন সা'দ হইতে কুতায়বার অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহাকে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

হযরত উম্মে সালামা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ মুলায়কা, ইব্ন জুরায়জ, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ উমুবী ও হযরত ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন ঃ 'নবী করীম (সা) স্বীয় কিরাআতে ওয়াক্ফ করিতেন। তিনি بِسْمِ اللّٰهِ। الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। পড়িয়া থামিতেন। অতঃপর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ। পড়িয়া থামিতেন। অতঃপর اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। পড়িয়া থামিতেন। অতঃপর مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ। পড়িয়া থামিতেন।' ইমাম আবূ দাউদ উহা উপরোক্ত রাবী ইব্ন জুরায়জ হইতে অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস সম্বন্ধে ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন– 'উহা অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই এবং উহার সনদও বিচ্ছিন্ন।' অর্থাৎ সনদের মূল বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মুলায়কা হযরত উম্মে সালামা (রা) হইতে কোন হাদীস শ্রবণ করিবার সুযোগ পান নাই। উক্ত রাবী উহা প্রকৃতপক্ষে ইয়া'লা ইব্ন মুম্লিকের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে উহা ঐরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

তিলাওয়াতে স্বর বিশেষের বারংবার নিঃস্বরণ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইয়াস, শু'বা, আদম ইব্ন আবূ ইয়াস ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল বলেন– 'আমি নবী করীম (সা)-কে স্বীয় চলন্ত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরূঢ় অবস্থায় সূরা ফাত্হ অথবা উহা অংশ বিশেষ মধুর ও বিনীত সুরে তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। তিলাওয়াতের মধ্যে তিনি কুরআন মজীদের শব্দের বহির্ভূত অতিরিক্ত স্বর একাধিকবার সংযোজন করিতেছিলেন।' উক্ত হাদীস 'বাহনারূঢ় অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত' শীর্ষক পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ই বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত সেই হাদীসে ইহাও উল্লেখিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) কর্তৃক সেইরূপে কুরআন মজীদ পঠিত হইবার ঘটনা মক্কা বিজয়ের দিন ঘটিয়াছিল। আলোচ্য

হাদীসে নবী করীম (সা)-এর তারজী'র (الترجيع) কথা বর্ণিত হইয়াছে। উহার অর্থ হইতেছে কোন স্বরকে স্বরনালীতে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উচ্চারণ করা।'

বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) পড়িতেছিলেন, 'আ-আ-আ।' উক্ত স্বরটি নবী করীম (সা)-এর কুরআন তিলাওয়াত করিবার কালে উটের গতির কারণে তাঁহার পবিত্র কণ্ঠে উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যানবাহনে আরূঢ় অবস্থায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে গেলে যদি যানবাহনের গতির কারণে তিলাওয়াতকারীর কণ্ঠে ঐরূপ ধ্বনি বা স্বর উৎপন্ন হয়, তথাপি যানবাহনে আরূঢ অবস্থায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা জায়েয ও শরীআতসম্মত। এইরূপ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতকারীর কণ্ঠে যেহেতু তাহার অনিচ্ছায় এইরূপ ধ্বনি বা স্বর উৎপন্ন হয়, তাই উহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমার্হ। উপরোক্ত ক্ষমার্হ বিষয়টি নিম্নোক্ত ক্ষমনীয় বিষয়টির সমান। যেমন কোন ব্যক্তির বাহনে আরূঢ় থাকা অবস্থায় উহা যেদিকেই চলমান থাকুক না কেন, সেই দিকেই মুখ করিয়া নামায আদায় করা তাহার জন্যে জায়েয ও অনুমোদিত। এইরূপ ব্যক্তি নামায বিলম্বিত করিলে পরবর্তী সময়ে উহা কিবলামুখী হইয়া আদায় করার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পশুপৃষ্ঠে যে কোন দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িলে তা আদায় হইবে। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

সুমধুর আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত

হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরদা, ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বুরদা, ইয়াহিয়া হাম্মানী, মুহাম্মদ ইব্ন খাল্ফ, আবূ বকর ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন ঃ

একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন– 'ওহে আবূ মূসা! তুমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে দাউদ (আ)-এর বংশধরদের একটি বাঁশী লাভ করিয়াছ।' (উহা দ্বারা নবী করীম (সা) হযরত আবূ মূসা (রা)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন।) উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আবূ ইয়াহিয়া হাম্মানীর আরেক নাম আবদুল হামীদ ইব্ন আবদুর রহমান। ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবূ ইয়াহিয়া হাম্মানী হইতে 'উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ ইয়াহিয়া হাম্মানীর আরেক নাম আবদুল হামীদ ইব্ন আবদুর রহমান। ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবূ ইয়াহিয়া হাম্মানী হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ ইয়াহিয়া হাম্মানী হইতে মূসা ইব্ন আবদুর রহমান কিন্দীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে সহীহ্ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত রাবী আবূ বুরদা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ বুরদা হইতে তাল্হা ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন তাল্হা প্রমুখ রাবীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েতে একটি ঘটনা উল্লেখিত রহিয়াছে। ইতিপূর্বে 'সূরের সহিত কুরআন তিলাওয়াত' পরিচ্ছেদে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার সহিত সম্পর্কিত বিষয় বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। এখানে উহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

অপরের মুখে তিলাওয়াত শ্রবণ

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দা, ইবরাহীম, আ'মাশ, হাফস ইব্‌ন গিয়াছ, উমর ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন গিয়াছ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ

একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন– 'আমাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাও।' আমি আরয করিলাম– যাহা আপনার উপর নাযিল হইয়াছে, তাহা আপনাকে তিলাওয়াত করিয়া শুনাইব? নবী করীম (সা) বলিলেন– 'অপরের মুখে উহা শুনিতে আমার নিকট ভাল লাগে।'

ইমাম ইব্‌ন মাজাহ ভিন্ন সিহাহ সিত্তার সকল সংকলকই উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আ'মাশ হইতে উক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস হযরত আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ) (রা) হইতে বহুসংখ্যক মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। উহার আলোচনা দীর্ঘ।

ইতিপূর্বে ইমাম মুসলিম কর্তৃক হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরদা, তাল্‌হা ইব্‌ন ইয়াহিয়া, ইব্‌ন তাল্‌হা প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, একদা নবী করীম (সা) হযরত আবূ মূসা (রা)-কে বলিলেন– 'ওহে আবূ মূসা! গত রাত্রিতে আমি যে মনোযোগ সহকারে তোমার কিরাআত শুনিয়াছি, তাহা যদি তুমি দেখিতে! হযরত আবূ মূসা (রা) বলিলেন– 'আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমি জানিতে পারিতাম যে, আপনি আমার কিরাআত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেছেন, তবে আমি উহা আপনার জন্যে যথাসম্ভব অধিক মধুর ও আকর্ষণীয় বানাইতাম।' আবূ সালামা হইতে যুহরী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উমর (রা) হযরত আবূ মূসা (রা)-কে দেখিলে বলিতেন– 'হে আবূ মূসা! আমাদিগকে আমাদের প্রতিপালক প্রভুকে স্মরণ করাইয়া দিন।' ইহাতে হযরত আবূ মূসা (রা) তাঁহাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন। আবূ উসমান নাহ্‌দী বলেন– হযরত আবূ মূসা (রা) নামাযে আমাদের ইমামতী করিতেন। যদি আমি বলি যে, আমি কোনদিন তাহার কণ্ঠস্বর অপেক্ষা অধিকতর মধুর কোন সেতার বা সারিন্দা অথবা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্রের সুর শ্রবণ করি নাই (তাহা সত্যের অপলাপ হইবে না।)

তিলাওয়াতকারীকে থামিতে বলা

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দা, ইবরাহীম, আ'মাশ, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ রা) বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন– 'আমাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাও।' আমি আরয করিলাম– আপনার উপর যাহা নাযিল হইয়াছে তাহা আপনাকে তিলাওয়াত করিয়া শুনাইব? নবী করীম (সা) বলিলেন– হ্যাঁ। তখন আমি তাঁহাকে সূরা নিসা শুনাইতে লাগিলাম। আমি নিম্নোক্ত আয়াতের তিলাওয়াত শেষ করিলে নবী করীম (সা) বলিলেন– থামো–

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا (আর যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য হইতে একজন করিয়া সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকে

তাহাদের বিষয়ে সাক্ষী হিসাবে পেশ করিব, তখন কি ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হইবে?) আমি নবী করীম (সা)-এর দিকে তাকাইয়া দেখি, তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে দরদর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে।'

ইমাম ইব্ন মাজাহ ভিন্ন সিহাহ সিত্তার সকল সংকলকই উক্ত হাদীস উক্ত রাবী আ'মাশ হইতে পূর্বোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'যতক্ষণ তোমাদের মন কুরআন মজীদের তিলাওয়াত সাগ্রহে গ্রহণ করে, তোমরা উহা ততক্ষণ তিলাওয়াত করো। তোমাদের মন উহার তিলাওয়াত গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া গেলে উহার তিলাওয়াত স্থগিত রাখ।'

কতদিনে কুরআন খতম বিধেয়

ইমাম বুখারী (র) 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায়ে উপরোক্ত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করিয়াছেন। তিনি উক্ত শিরোনামের সহিত নিম্নোক্ত শিরোনাম যুক্ত করিয়াছেন ঃ

فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ (অতঃপর উহা হইতে যতটুকু পার তিলাওয়াত কর।)

আয়াতের তাৎপর্য ঃ সুফিয়ান হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুফিয়ান বলেন ঃ

'একদা ইব্ন শুবরুমা আমাকে বলিলেন– নামাযে কুরআন মজীদের কতটুকু তিলাওয়াত করা একটি লোকের জন্যে যথেষ্ট তদ্বিষয়ে আমি চিন্তা করিয়াছি। তিন আয়াত হইতে কম আয়াত বিশিষ্ট কোন সূরা আমি পাই নাই। আমি (সুফিয়ান) বলিলাম– নামাযে তিন আয়াতের কম তিলাওয়াত করা কাহারও জন্যে ঠিক নহে।'

হযরত আবূ মাসউদ বদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলকামা (ইব্ন কয়স), আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ, ইবরাহীম, মানসূর, সুফিয়ান, আলী ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'যে ব্যক্তি রাত্রিতে সূরা বাকারার শেষ দুইটি আয়াত তিলাওয়াত করিবে, তাহার জন্যে উহা যথেষ্ট হইবে।' রাবী আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ বলেন– একদা হযরত আবূ মাসউদ (রা) বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করিতেছিলেন। সে সময়ে তিনি সরাসরি আমার নিকটও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। সনদের অন্যতম রাবী আলী হইতেছেন আলী ইব্ন মাদীনী। তাঁহার উস্তাদ হইতেছেন সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা। সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনার আরেক নাম আবদুল্লাহ্! তিনি কূফা নগরীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন। তাঁহার উপরোল্লেখিত অভিমত সুচিন্তিত অভিমত বটে।

'সুনান' সংকলনে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'ফাতিহা শরীফ এবং অন্য তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করা ব্যতীত নামায হয় না। কিন্তু হযরত আবূ মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসই অধিকতর সহীহ ও বিখ্যাত। তবে বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদের শিরোনামের সহিত উহার সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বরং উহার সহিত সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনার অভিমতের সম্পর্ক সুস্পষ্ট ও সুপরিজ্ঞেয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আঁমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, মুগীরাহ, আবূ উয়াইনা, মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন ঃ

'আমার পিতা আমাকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটি মহিলার সহিত বিবাহ করাইয়া দিলেন। তিনি স্বীয় পুত্রবধুর খোঁজ-খবর লইতেন। তিনি তাহার নিকট আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। আমার স্ত্রী আমার সম্বন্ধে বলিত- লোকটি বড়ই ভালো; তবে কথা এই যে, সে তাহার নিকট আমার আগমনের পর হইতে এই পর্যন্ত কোন দিন না আমার শয্যাসঙ্গী হইয়াছে আর না আমার সহিত নির্জনে একটু সময় কাটাইল। আমার পিতা দীর্ঘদিন ধরিয়া পুত্রবধূর নিকট হইতে আমার বিরুদ্ধে উপরোক্তরূপ অনুযোগ শুনিবার পর একদা তৎসম্বন্ধে নবী করীম (সা)-কে অবহিত করিলেন।! নবী করীম (সা) বলিলেন- 'তাহাকে লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।' আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে নীত হইলাম। তিনি আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন- 'তুমি কিভাবে রোযা রাখিয়া থাকো?' আমি আরয করিলাম- আমি প্রতিদিন রোযা রাখি। নবী করীম (সা) বলিলেন- 'তুমি কুরআন মজীদ কিভাবে খতম করিয়া থাকো?' আমি আরয করিলাম- আমি প্রতি রাত্রিতে একবার সমগ্র কুরআন মজীদ খতম করিয়া থাকি। নবী করীম (সা) বলিলেন- 'প্রতিমাসে তিন দিন করিয়া রোযা রাখিও এবং প্রতিমাসে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিও।' আমি বলিলাম- আমি উহা অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যায় রোযা রাখিতে পারি এবং অধিকতর পরিমাণে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে পারি। নবী করীম (সা) বলিলেন- 'তুমি প্রতি মাসে দিনে তিনটি করিয়া রোযা রাখিও।' আমি আরয করিলাম- আমি উহা অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে ইবাদত করিতে পারি। নবী করীম (সা) বলিলেন- প্রতি তিন দিনের তৃতীয় দিনে রোযা রাখিও। আমি আরয করিলাম- আমি উহা অপেক্ষা অধিকতর ইবাদত করিতে পারি। নবী করীম (সা) বলিলেন- 'রোযা রাখিও; তবে রোযা রাখিবার সর্বোত্তম পন্থা হইতেছে হযরত দাউদ (আ)-এর অনুসৃত রোযা রাখিবার পন্থা। উহা হইল একদিন পর একদিন রোযা রাখা। তাহা ছাড়া প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিও।'

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন- 'আহা! যদি আমি নবী করীম (সা) কর্তৃক সর্বপ্রথম প্রদত্ত অনুমতিকে বরণ করিয়া লইতাম, তবে কতো ভালো হইত! কারণ, আমি এখন বৃদ্ধ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।' বৃদ্ধ অবস্থায় তিনি স্বীয় পরিবারের জনৈক সদস্যকে দিনের বেলায় কুরআন মজীদের এক সপ্তমাংশ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন। প্রথম জীবনে রাত্রিতে কুরআন মজীদ যতটুকু তিনি তিলাওয়াত করিতেন, বৃদ্ধাবস্থায় দিনের বেলায় ততটুকু তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন, যাহাতে রাত্রিতে তিনি কম ক্লান্ত হন। আর যখন তিনি বেশী দুর্বল হইয়া পড়িতেন, তখন তিনি শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে হিসাব রাখিয়া কয়েক দিন রোযা রাখা বন্ধ করিতেন। অতঃপর শক্তি সঞ্চয় হইলে নির্ধারিত সংখ্যক দিনগুলিতে রোযা রাখিতেন, যাহাতে নবী করীম (সা) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ লঙ্ঘিত না হয়।

কেহ কেহ বলেন- প্রতি তিন দিনে একবার করিয়া সমগ্র কুরআন মজীদের তিলাওয়াত সম্পন্ন করা সমীচীন। কেহ কেহ বলেন- প্রতি পাঁচ দিনে একবার করিয়া কুরআন মজীদের তিলাওয়াত সম্পন্ন করা সমীচীন। তবে অধিকাংশ ফিকাহবিদ বলেন- প্রতি সাত দিনে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করা সমীচীন।

ইমাম বুখারী উপরোক্ত হাদীস 'সিয়াম অধ্যায়ে'ও বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী উহা উপরোক্ত রাবী মুগীরা (রা) হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং মুগীরা হইতে ধারাবাহিকভাবে শু'বা, গুনদুর ও বিনদারের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তিনি উহা উপরোক্ত রাবী মুজাহিদ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং মুজাহিদ হইতে হিসীন প্রমুখ রাবীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ সালামা হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান, ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাবী মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান বলেন– আমার মনে পড়ে আবূ সালামা আমার নিকট হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে নিম্নরূপ বর্ণনা প্রদান করেন ঃ

'হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন যে, একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন– তুমি প্রতি মাসে একবার করিয়া সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করিও। আমি আরয করিলাম– আমি উহার অধিক তিলাওয়াতের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তির অধিকারী। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'তবে তুমি প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিও। তদপেক্ষা অতিরিক্ত তিলাওয়াত করিও না।'

উক্ত হাদীস দ্বারা বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে কুরআন মজীদ খতম করা নিষিদ্ধ। ইমাম আবূ উবায়দ কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও উহাই প্রমাণিত হয়।

হযরত কয়স ইব্ন সা'সাআ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াসে, হাব্বান ইব্ন ওয়াসে, ইব্ন লাহীআ, হাজ্জাজ, উমর ইব্ন তারিক, ইয়াহিয়া ইব্ন বুকায়র ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

একদা হযরত কয়স (রা) নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কতদিনে সমগ্র কুরআন মজীদ একবার খতম করিব? নবী করীম (সা) বলিলেন– 'প্রতি পনের দিনে একবার।' হযরত কয়স (রা) আরয করিলেন– আমি উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করিতে সমর্থ। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'তবে প্রতি সপ্তাহে একবার।'

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন যাকওয়ান, শু'বা, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) রমযান মাস ভিন্ন অন্য সময়ে প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিতেন।

আবূ মাহলাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ কুলাবাহ, আইয়ুব, শু'বা, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) প্রতি আট দিনে একবার করিয়া এবং হযরত তামীম দারী (রা) প্রতি সাত দিনে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিতেন।'

ইবরাহীম হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ, হাশীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত আসওয়াদ প্রতি ছয় দিনে একবার করিয়া এবং হযরত আলকামা প্রতি পাঁচ দিনে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিতেন।'

উল্লেখিত রিওয়ায়েত দ্বারা যাহা প্রমাণিত হয়, তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উল্লেখিত রিওয়ায়েতে বর্ণিত সময় অপেক্ষা স্বল্পতর সময়েও সমগ্র কুরআন মজীদ খতম করা যায়। হযরত সা'দ ইব্ন মুনযির আনসারী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াসে', হাব্বান ইব্ন ওয়াসে', ইব্ন লাহীআ, হাসান ও ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদ সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

একদা হযরত সা'দ ইব্ন মুনযির আনসারী (রা) নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি তিন দিনে একবার করিয়া সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করিব? নবী করীম (সা) বলিলেন– 'হ্যাঁ।' রাবী বলেন যে, হযরত সা'দ (রা) আমৃত্যু উপরোক্ত নিয়মে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়াছেন। উক্ত হাদীসের সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী। উহার অন্যতম রাবী হাসান ইব্ন মূসা আশিয়াব একজন বিশ্বস্ত রাবী। তাঁহার মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত। সিহাহ সিত্তার সংকলকগণ তাঁহার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।' অপর এক রাবী ইব্ন লাহীআর মধ্যে অবশ্য দুইটি ত্রুটি ছিল ঃ (১) তাদলীস (التدليس) অর্থাৎ হাদীস বর্ণনায় বর্ণনকারীর স্বীয় উস্তাদের নাম উহ্য রাখা ও তদস্থলে উস্তাদের পূর্ববর্তী রাবীর নাম উল্লেখ করা এবং বর্ণনাকারী সরাসরি তাহার নিকট সংশ্লিষ্ট হাদীসটি শুনিয়াছেন বলিয়া ধারণা দেওয়া। (২) স্মৃতি শক্তির দুর্বলতা। তবে উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনায় তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি হাব্বান ইব্ন ওয়াসে'র নিকট উহা শ্রবণ করিয়াছেন। ইব্ন লাহীআ মিশরের তৎকালীন একজন শীর্ষস্থানীয় আলিম ছিলেন। তাঁহার উস্তাদ হাব্বান এবং হাব্বানের পিতা ওয়াসে' ইব্ন হাব্বান উভয়েই নেককার মুসলমান ছিলেন। হযরত সা'দ ইব্ন মুনযির (রা) হইতে সিহাহ সিত্তার কোন সংকলক হাদীস বর্ণনা না করিলেও আলোচ্য হাদীসের সনদ সিহাহ সিত্তার অনেক সংকলকের নিজস্ব শর্তাবলীর নিরীখে টিকে। আলোচ্য হাদীসের সনদ তাহাদের নিকট প্রত্যাখ্যেয় নহে। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত সা'দ ইব্ন মুনযির আনসারী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াসে', হাব্বান ইব্ন ওয়াসে', লাহীআ ইব্ন বুকায়র ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত সা'দ (রা) নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি প্রতি তিন দিনে একবার করিয়া সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করিব? নবী করীম (সা) বলিলেন– 'হ্যাঁ, যদি তোমার শক্তিতে কুলায়।' রাবী বলেন– হযরত সা'দ (রা) আমরণ উপরোক্ত নিয়মে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন খুমায়ের, কাতাদাহ, হুমাম, ইয়াযীদ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'তিন দিনের কম সময়ের মধ্যে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করিলে তুমি কুরআন মজীদের মর্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে না।' ইমাম আহমদ এবং অন্য চারিজন 'সুনান' সংকলকও উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী কাতাদাহ হইতে উক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহাকে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আম্মারাহ বিনতে আবদুর রহমান, তাইয়েব ইব্ন সুলায়মান, ইউসুফ ইব্ন উরফ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) তিন দিন অপেক্ষা অল্প সময়ে কুরআন মজীদ খতম করিতেন না।' উক্ত হাদীস অন্য কোন মাধ্যমে বর্ণিত হয় নাই। উহার সনদ দুর্বল। কারণ ইমাম দারা কুতনী উহার অন্যতম রাবী তাইয়েব ইব্ন সুলায়মানকে দুর্বল রাবী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া সে মুহাদ্দিসগণের নিকট তেমন পরিচিতও নহে। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

পূর্বসূরী বহু ফকীহ্ তিন দিনের কম সময়ে কুরআন মজীদ খতম করা মাকরূহ বলিয়াছেন। ইমাম আবূ উবায়দ, ইসহাক ইব্ন রাহবিয়াহ প্রমুখ পরবর্তী যুগের ফকীহগণও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে হাফস, হিশাম ইব্ন হাস্‌সান, ইয়াযীদ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবুল আলীয়া বলেন– 'হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) তিন দিন অপেক্ষা কম সময়ে কুরআন মজীদ খতম করা অপছন্দ করিতেন।' উক্ত রিওয়ায়েত সহীহ।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উবায়দা, আলী ইব্ন বুযায়মাহ, সুফিয়ান, ইয়াযীদ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন– 'তিন দিনের কম সময়ে সমগ্র কুরআন মজীদ খতম করা গুনাহ্র কাজ।' হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উবায়দা, আলী ইব্ন বুযায়মাহ, শু'বা, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ উপরোক্তরূপ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্ন যাকওয়ান, শু'বা, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) রমযান মাসে প্রতি তিন দিনে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিতেন।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী বিপুল সংখ্যক ফকীহ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন মজীদ খতম করা অপছন্দ করিতেন।' পক্ষান্তরে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পূর্ববর্তী বিপুল সংখ্যক ফকীহ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি তিন দিন অপেক্ষা কম সময়ে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সায়েব ইব্ন ইয়াযীদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন খাসীফ, জুরায়জ, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'সায়েব ইব্ন ইয়াযীদ বলেন– একদা জনৈক ব্যক্তি আবদুর রহমান ইব্ন উসমান তায়মীর নিকট হযরত তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্র নামায সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি লোকটিকে বলিলেন– তুমি চাহিলে আমি তোমাকে হযরত উসমান (রা)-এর নামায সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করিতে পারি। লোকটি বলিল– তাহাই করুন। তিনি (আবদুর রহমান) বলিলেন– 'একদা আমি সিদ্ধান্ত করিলাম, আজ সারা রাত জাগিয়া থাকিব। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাত্রিতে নামাযে দাঁড়াইলাম। আমার পার্শ্বেই একটি লোক স্বীয় মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া নামায আদায় করিতেছিল। লোকটির কারণে আমার নামাযের স্থান সংকুচিত হইয়া গিয়াছিল।

লক্ষ্য করিয়া দেখি– তিনি হযরত উসমান (রা)। আমি পিছনে সরিয়া গেলাম। তিনি নামায আদায় করিতে লাগিলেন। তিনি যতটুকু সময় ধরিয়া কিরাআত পড়িতেন, ততটুকু সময় ধরিয়া সিজদা করিতেন। এক সময়ে আমি বলিলাম– পূর্বদিকে ফজরের পূর্ববর্তী চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি মাত্র এক রাকআত বেজোড় নামায আদায় করিলেন। তিনি উহা ব্যতীত অন্য কোন নামায আদায় করিলেন না।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

ইব্‌ন সীরীন হইতে ধারাবাহিকভাবে মানসূর, হাশীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন সীরীন বলেন ঃ বিদ্রোহীগণ হযরত উসমান (রা)-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহার স্ত্রী নায়েলা বিনতে কুরাফসাহ কালবিয়া তাহাদিকে বলিয়াছিলেন– 'তোমরা তাঁহাকে হত্যাই কর অথবা উহা হইতে বিরত থাক; (জানিয়া রাখ) তিনি সারারাত জাগিয়া নামায আদায় করেন এবং এক রাকআত নামাযে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করেন।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ গ্রহণযোগ্য।

ইব্‌ন সীরীন হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন সুলায়মান, আবূ মুআবিয়া, আসিম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন সীরীন বলেন ঃ 'হযরত তামীম দারী (রা) এক রাকআত নামাযে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেন।'

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ শু'বা, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন– 'আমি বায়তুল্লাহ্ শরীফে দাঁড়াইয়া এক রাকআত নামাযে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়াছি।'

আলকামা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম, মানসূর, জারীর ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন– 'আলকামা এক রাত্রিতে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়াছেন। তিনি সাতবার বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করিয়াছেন। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমে আসিয়া নামায আদায় করিয়াছেন। উক্ত নামাযে কুরআন মজীদের শত আয়াত বিশিষ্ট দীর্ঘ সূরা সমষ্টি তিলাওয়াত করিয়াছেন। আবার সাতবার বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করিয়াছেন। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমে আসিয়া নামায আদায় করিয়াছেন। উক্ত নামাযে কুরআন মজীদের নাতিদীর্ঘ সূরা সমষ্টি তিলাওয়াত করিয়াছেন। পুনরায় সাতবার বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করিয়াছেন। অতঃপর মাকামে ইব্রাহীমে আসিয়া তথায় নামায আদায় করিয়াছেন। উক্ত নামাযে কুরআন মজীদের অবশিষ্টাংশ তিলাওয়াত করিয়াছেন।' উপরোক্ত সমুদয় রিওয়ায়েতের সনদই সহীহ।

ইব্‌ন আবূ দাউদ মুজাহিদ সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি (মুজাহিদ) মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে কুরআন মজীদ খতম করিতেন। মানসূর হইতে ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলী ইযদী রমযান মাসের প্রতি রাত্রিতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে কুরআন মজীদ খতম করিতেন। ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, মানসূর ইব্‌ন সা'দ বলেন– 'আমার পিতা স্বীয় পৃষ্ঠ ও হাঁটুকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিতেন। যতক্ষণ সমগ্র কুরআন মজীদের তিলাওয়াত খতম না করিতেন, ততক্ষণ বাঁধন খুলিতেন না।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি– 'মানসূর ইব্‌ন যাযান সম্বন্ধেও বর্ণিত রহিয়াছে, তিনি জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে একবার এবং মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে একবার কুরআন মজীদ খতম করিতেন। তবে তাহারা ইশার নামায বিলম্বে আদায় করিতেন। ইমাম

শাফেঈ সম্বন্ধে বর্ণিত রহিয়াছে, তিনি রমযান মাসে প্রতি দিবা-রাত্রিতে দুইবার করিয়া এবং রমযান মাস ভিন্ন অন্য সময়ে প্রতি দিবা-রাত্রিতে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিতেন।'

এতদসম্পর্কিত সর্বাধিক বিস্ময়কর ঘটনা হইতেছে শায়খ আবূ আবদুর রহমান সালমী সূফী কর্তৃক বর্ণিত ঘটনা। তিনি বলেন– আমি শায়খ আবূ উসমান মাগরেবীর নিকট শুনিয়াছি যে, ইব্ন কাতিব দিনে চারিবার এবং রাত্রিতে চারিবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিতেন।'[১]

ইহা অতিশয় বিস্ময়কর ঘটনা বটে। উক্ত ঘটনা এবং উহার অনুরূপ অন্যান্য ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা এই যে, এই সকল ব্যক্তির নিকট পূর্ব বর্ণিত হাদীস পৌঁছে নাই বলিয়া তাঁহারা এত দ্রুতগতিতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেন ও তদবস্থায়ই উহা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে এবং উহার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিতেন। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

শায়খ আবূ যাকারিয়া নববী স্বীয় 'বয়ান' গ্রন্থে উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন ঃ একটি লোকের পক্ষে প্রতিদিন কুরআন মজীদের কতটুকু অংশ তিলাওয়াত করা সমীচীন এই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধান দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনার অধিকারী করিয়াছেন, তাহার জন্যে ইহাই সমীচীন যে, তিনি গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞান দ্বারা কুরআন মজীদের যতটুকু অংশের মর্ম ও তাৎপর্য সম্যকরূপে গ্রহণ করিতে পারেন, ততটুকু অংশই তিলাওয়াত করিবেন। যাহারা দীনী ইলম প্রচার অথবা অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ দীনী কার্যে রত রহিয়াছেন, তাহারা উক্ত কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করিয়া যতটুকু অংশ তিলাওয়াত করা সম্ভবপর, ততটুকু অংশ তিলাওয়াত করিবেন। আর অন্যান্য মানুষ যতক্ষণ তিলাওয়াতে অনীহা ও অনিচ্ছা না আসে, ততক্ষণ তিলাওয়াত করিবে।

তিলাওয়াতকালে ক্রন্দন

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম ইব্ন উবায়দা, আ'মাশ প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন যে, একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন– 'আমাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাও।' আমি আরয করিলাম– আপনার প্রতি কুরআন নাযিল হইয়াছে আর আমি আপনাকে উহা তিলাওয়াত করিয়া শুনাইব? নবী করীম (সা) বলিলেন– 'অপরের মুখে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করা আমার নিকট ভাল লাগে।'

---

১. উক্ত খতমকরণের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে যে, তাঁহারা পূর্ববর্তী রাত্রিতে ও দিনে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে করিতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে উহার শেষাংশের তিলাওয়াত সম্পন্ন করিতেন। এইরূপে পূর্বে আরম্ভ করা তিলাওয়াত চলিতে চলিতে উক্ত সময়ে কুরআন মজীদের সর্বশেষ অংশের তিলাওয়াত সম্পন্ন হইত বলিয়া রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, তাঁহারা উক্ত সময়ে কুরআন মজীদ খতম করিতেন। একথা সুবিদিত যে, কুরআন মজীদের মর্ম উপলব্ধি করা ব্যতিরেকেই উহা দ্রুতগতিতে পড়িয়া গেলেও উক্ত সময়ের মধ্যে উহার এক চতুর্থাংশ অপেক্ষা অধিকতর অংশ তিলাওয়াত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। অবশ্য রূহানী তিলাওয়াত অনেক দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইতে পারে। তাসাউফপন্থীগণ অনেক বিস্ময়কর কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। আল্লামা শা'রানী কোন কোন উচ্চমার্গের সূফীসাধক সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহাদের কেহ কেহ লক্ষ লক্ষ বার এবং কেহ কেহ কোটি কোটি বার কুরআন মজীদ খতম করিয়াছেন। তাঁহাদের তিলাওযাত যবানী তিলাওয়াত নহে; বরং রূহানী তিলাওয়াত ছিল।

ইহাতে আমি নবী করীম (সা)-কে সূরা নিসা তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতে লাগিলাম। আমি নিম্নোক্ত আয়াতে পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, থামো ঃ

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا۔ (আর সেই সময়ে কিরূপ অবস্থা ঘটিবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য হইতে একজন করিয়া সাক্ষী উপস্থাপন করিব এবং তোমাকে তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদানকারী হিসাবে পেশ করিব।) এই সময়ে নবী করীম (সা)-এর চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িতেছিল।' উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ই বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে উহা উল্লেখিত হইয়াছে। উহা ইন্শা আল্লাহ্ আবার উল্লেখিত হইবে।

কুরআনের লোক দেখানো প্রীতির নিন্দা

হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুআয়দ ইব্ন আফলা, খায়সামা, আ'মাশ, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত আলী (রা) বলেন– আমি নবী করীম (সা)-কে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, 'শেষ যামানায় এইরূপ একদল লোকের আবির্ভাব ঘটিবে যাহারা বয়সে অর্বাচীন এবং বুদ্ধিতে নির্বোধ হইবে। তাহাদের মুখের কথা হইবে বড়ই উত্তম। যেরূপে তীর শিকার ভেদ করিয়া উহার বাহিরে চলিয়া যায়, তাহারা সেইরূপে ইসলাম ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে। তাহাদের ঈমান তাহাদের কণ্ঠদেশ অতিক্রম করিবে না (তাহাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করিবে না)। তোমরা তাহাদিগকে যেখানেই পাইবে, সেখানেই হত্যা করিবে। কারণ, তাহাদিগকে যে ব্যক্তি হত্যা করিবে, কিয়ামতের দিনে সে পুরস্কার পাইবে।'

ইমাম বুখারী উপরোক্ত হাদীস অন্যত্র দুইবার বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম নাসায়ী উহা উপরোক্ত রাবী আ'মাশ হইতে উক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আ'মাশের পর বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হারিছ তায়মী, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ, মালিক, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন– আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ 'তোমাদের মধ্যে এইরূপ একদল লোকের আবির্ভাব ঘটিবে যাহাদের নামাযের তুলনায় নিজেদের নামাযকে এবং যাহাদের রোযার তুলনায় নিজেদের রোযাকে তোমরা তুচ্ছ মনে করিবে। তাহারা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবে; কিন্তু উহা তাহাদের কণ্ঠদেশ অতিক্রম করিবে না। যেরূপে তীর শিকার ভেদ করিয়া উহার বাহিরে চলিয়া যায়; তাহারা সেইরূপে দীন হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবে। শিকারী তীরের ফলকের প্রতি তাকাইয়া দেখে উহাতে কিছুই (রক্তের কোন চিহ্নই) নাই; সে তীর দণ্ডের দিকে তাকাইয়া দেখে– উহাতে কিছুই নাই। সে তীরের সংলগ্ন পালকের প্রতি তাকাইয়া দেখে উহাতেও কিছুই নাই। অবশেষে তীর ফলকের নল সদৃশ অংশে কোন কিছু লাগিয়াছে কিনা তাহা লইয়া সে চিন্তা-ভাবনা করে।

ইমাম বুখারী উপরোক্ত হাদীস অন্যত্রও বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসায়ীও উহা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালামা ইব্ন

আবদুর রহমান ও মুহরী প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন মাজীহ উহা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আলকামা প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), কাতাদাহ, শু'বা, ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ, মুসাদ্দাদ ইব্‌ন মুসারহাদ ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে এবং উহা আমল করে, তাহার অবস্থা লেবুর সহিত তুলনীয়। উহার স্বাদও সুখকর এবং ঘ্রাণও সুমধুর। আর যে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে না; তবে উহা আমল করে, তাহার অবস্থা খেজুরের সহিত তুলনীয়। উহার স্বাদ মধুর; কিন্তু উহাতে কোন সুঘ্রাণ নাই। যে মুনাফিক ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে, তাহার অবস্থা পুষ্পস্তবকের সহিত তুলনীয়। উহার ঘ্রাণ আনন্দকর; কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে না, তাহার অবস্থা হানযাল (মাকাল) ফলের সহিত তুলনীয়। উহার স্বাদও তিক্ত এবং ঘ্রাণও বিশ্রী।' ইমাম বুখারী উহা অন্যত্রও বর্ণনা করিয়াছেন। সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলকও উহা উপরোক্ত রাবী কাতাদাহ হইতে উক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

কুরআন মজীদের তিলাওয়াত হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের অন্যতম প্রধান পথ ও মাধ্যম। হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'আর জানিয়া রাখ, কুরআন দ্বারা তুমি আল্লাহ্ তা'আলার যতটুকু নৈকট্য লাভ করিতে পারিবে, ততটুকু নৈকট্য অন্য কিছুতেই লাভ করিতে পারিবে না।' কুরআন তিলাওয়াত এত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও উহা মানুষকে দেখাইবার জন্যে করা উপরোক্ত হাদীসসমূহে নিষিদ্ধ হইয়াছে। উপরোক্ত হাদীসসমূহে লোক দেখানো তিলাওয়াতের বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করা হইয়াছে।

হযরত আলী (রা) এবং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে যে গোমরাহ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, উহা হইতেছে খারিজী সম্প্রদায়। ঈমান উক্ত সম্প্রদায়ের লোকদের কণ্ঠদেশ অতিক্রম করিয়া তাহাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে না। অর্থাৎ তাহাদের ঈমান আন্তরিক ঈমান নহে; তাহাদের ঈমান নিছক মৌখিক ঈমান। তাহাদের সম্বন্ধে অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ ... ... তাহাদের কিরাআতের তুলনায় তোমাদের কিরাআত, তাহাদের নামাযের তুলনায় তোমাদের নামায এবং তাহাদের রোযার তুলনায় তোমাদের রোযা তোমাদের নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে।' খারিজীগণ কুরআন মজীদের তিলাওয়াতকারী এবং বাহ্যত কুরআন মজীদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইলেও তাহাদের তিলাওয়াত ও শ্রদ্ধা প্রকৃতপক্ষে লোক দেখানো তিলাওয়াত ও শ্রদ্ধা। তাই হাদীসে তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্যে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ অবশ্য উক্ত লোক দেখানো তিলাওয়াত ও শ্রদ্ধা হইতে মুক্ত। কিন্তু তাহাদের তিলাওয়াত এবং শ্রদ্ধা যেহেতু ভ্রান্ত আকীদা ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তাহারাও তাহাদের অন্যান্য স্বমতাবলম্বীদের ন্যায় ভ্রান্ত ও নিন্দনীয়। অন্তরের আকীদা ও তাকওয়ার উপরই যে নেক আমল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, নিম্নোক্ত আয়াতে তাহা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ـ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

(যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র তাকওয়া ও সন্তোষের উপর স্বীয় মসজিদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেই ব্যক্তি ভালো, না যে ব্যক্তি ধ্বংসোন্মুখ খাদের কিনারায় স্বীয় গৃহ নির্মাণ করিয়াছে, অতঃপর উহা তাহাকে লইয়া জাহান্নামের আগুনে ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, সেই ব্যক্তি ভালো? আর আল্লাহ্ জালিম কওমকে হিদায়েত করেন না।)

খারিজী সম্প্রদায় কাফির অথবা ফাসিক কিনা এবং তাহাদের দ্বারা বর্ণিত রিওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য কিনা এই বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। আল্লাহ্ চাহেন তো যথাস্থানে উহা বিশদভাবে আলোচিত হইবে।

মুনাফিকের কুরআন তিলাওয়াতকে উপরোক্ত হাদীসে পুষ্পস্তবকের সুঘ্রাণের সহিত কেন তুলনা করা হইয়াছে, তাহা সহজে অনুমেয়। মূলত মুনাফিক মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে। তাহার এই অবস্থা পুষ্পস্তবকের তিক্ত স্বাদের সহিত তুলনীয়। মুনাফিকের রিয়াকারী বা লোক দেখানো মানসিকতা সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ - وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا -

(মুনাফিকগণ আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রতারিত করে। অথচ তাহারা নিজদিগকে প্রতারিত করিতেছে। আর যখন তাহারা নামাযে দণ্ডায়মান হয়, তখন উদাসীনভাবে দণ্ডায়মান হয়। তাহারা লোক দেখানো ইবাদত করে। আর তাহারা আল্লাহ্‌কে সামান্যই স্মরণ করিয়া থাকে।)

কুরআন তিলাওয়াতে মনোযোগের গুরুত্ব

হযরত জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইমরান জওনী, হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ, আবূ নু'মান মুহাম্মদ ইব্‌ন ফুযায়েল আমের ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'যতক্ষণ তোমাদের অন্তর কুরআন মজীদের প্রতি অভিনিবিষ্ট থাকে, শুধু ততক্ষণই উহা তিলাওয়াত করিবে। অভিনিবেশ ও মনোযোগ দূরীভূত হইবার পর উহার তিলাওয়াত স্থগিত রাখিবে।'

হযরত জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইমরান জওনী, সালাম ইব্‌ন আবূ মু'তী, আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী, আমর ইব্‌ন আলী ইব্‌ন বাহর আল-ফাল্লাস ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কুরআন মজীদের সহিত যতক্ষণ তোমাদের হৃদয় লাগিয়া থাকে, শুধু ততক্ষণই উহা তিলাওয়াত করিবে। মনোযোগ ও অভিনিবেশ দূরীভূত হইবার পর উহার তিলাওয়াত স্থগিত রাখিবে।'

উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবূ ইমরান হইতে হারিছ ইব্‌ন উবায়দ এবং সাঈদ ইব্‌ন যায়দ বর্ণনা করিয়াছেন। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা এবং আব্বানের বর্ণনায় উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে নহে; বরং হযরত জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিজস্ব উক্তি

হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। আবূ ইমরান হইতে ধারাবাহিকভাবে শু'বা ও গুনদুর বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ ইমরান বলেন- 'আমি উহা হযরত জুনদুব (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছি।' তেমনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সামিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইমরান ও ইব্ন আওফ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সামিত (রা) বলেন- 'তিনি উহা হযরত উমর ফারূক (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে তাঁহার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।' তবে হযরত জুনদুব (রা) হইতেই উহা অধিকতর সংখ্যক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহার নিকট হইতে উহার বর্ণিত হওয়াই অধিকতর সহীহ ও সঠিক।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ই উপরোক্ত হাদীস উক্ত রাবী আবূ ইমরান হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাম, আবদুস সামাদ ও ইসহাক ইব্ন মানসূরের সনদে একাধিক স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম আবার উহা আবূ ইমরান হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিস ইব্ন উবায়দ, আবূ কুদামা ও ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়াহিয়ার সনদেও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি (ইমাম মুসলিম) উহা আবূ ইমরান হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্বান আত্তার ও আহমদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন হাব্বান ইব্ন হিলালের সনদে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী অবশ্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাবী আব্বান এবং হাম্মাদ ইব্ন সালামা উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করেন নাই। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম তাবারানী উহা আবূ ইমরান হইতে ধারাবাহিকভাবে হারূন ইব্ন মূসা আল-আ'ওয়ার নাহবী, মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমান নাসায়ী আবার উহা আবূ ইমরান হইতে ধারাবাহিকভাবে হাজ্জাজ ইব্ন কুরাফসাহ, সুফিয়ান ও পরবর্তী বিভিন্ন মাধ্যমে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আবার উহা হযরত জুনদুব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইমরান, হাজ্জাজ, সুফিয়ান, যায়দ ইব্ন আবূ যারকা ও হারূন ইব্ন যায়দ ইব্ন আবূ যারকার সনদে হযরত জুনদুব (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি তিনি (ইমাম নাসাঈ) উহা হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সামিত (রা), আবূ ইমরান, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আওন, ইসহাক ইব্ন আজরাক ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীমের সনদে হযরত উমর (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ মন্তব্য করিয়াছেন ঃ রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আওন অন্য কোন হাদীসেই ভুল করেন নাই, তবে তিনি আলোচ্য হাদীসে ভুল করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে উহা হযরত জুনদুব (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস।' ইমাম তাবারানী উহা নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত জুনদুব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইমরান, হারিছ ইব্ন উবায়দ, মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম, সাঈদ ইব্ন মানসূর ও আলী ইব্ন আবদুল আযীয আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ (এখানে রাবী পূর্বোক্ত রিওয়ায়েতটি স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।)

উপরোক্ত আলোচনা আলোচ্য হাদীসের বিভিন্ন সনদের সহিত সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা। হাদীস শাস্ত্রের বিজ্ঞ ইমাম ও শায়খ ইমাম বুখারী উক্ত হাদীস সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাই সহীহ, সঠিক ও গৃহীতব্য। তিনি বলিয়াছেন—'উক্ত হাদীস যে হযরত জুনদুব

(রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে এবং উহা যে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী (حديث مرفوع), ইহাই অধিকতর সহীহ ও সঠিক। অধিকাংশ সনদে উহা ঐরূপেই বর্ণিত হইয়াছে।'

যাহা হউক উক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, যতক্ষণ তিলাওয়াতকারীর অন্তর তিলাওয়াতের প্রতি নিবিষ্ট থাকে এবং কোন আয়াত তিলাওয়াত করিবার কালে সে উহার মর্ম ও তাৎপর্য সম্বন্ধে চিন্তা ও অনুধাবন করিতে আগ্রহী ও ইচ্ছুক থাকে, শুধু ততক্ষণই কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার জন্যে নবী করীম (সা) স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়াছেন। তিলাওয়াত করিবার কালে কুরআন মজীদের আয়াতের প্রতি অন্তরের নিবিষ্টতা নষ্ট হইলে এবং উহার মর্ম ও তাৎপর্য সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করিতে মন অনাগ্রহী হইয়া পড়িলে নবী করীম (সা) তিলাওয়াত স্থগিত রাখিতে আদেশ দিয়াছেন। কারণ, অমনোযোগী অবস্থায় তিলাওয়াত করিলে তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যই বানচাল হইয়া যাইবে। বলাবাহুল্য, কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য হইতেছে—উহার মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করত তৎপ্রতি আমল করা। নবী করীম (সা) আরও বলিয়াছেন—'তোমাদের মধ্যে যেই নেক (নফল) কাজ করিবার সামর্থ্য ও শক্তি রহিয়াছে, শুধু তাহাই করিবে। কারণ, তোমরা যতক্ষণ বিরক্ত ও ক্লান্ত হইয়া না পড়, আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ বিরক্ত ও অনিচ্ছুক হন না।' নবী করীম (সা) আরও বলিয়াছেন —যে নেক আমল বা কাজ নেককার ব্যক্তি স্থায়ীভাবে করিতে থাকে, উহার পরিমাণ কম হইলেও উহা অধিকতর পছন্দনীয় নেক কাজ।'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাযাল ইব্ন সুবরাহ, আবদুল মালিক ইবন মায়সারাহ, শু'বা, সুলায়মান ইব্ন হারব ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন—একদা আমি জনৈক ব্যক্তিকে কুরআন মজীদের একটি আয়াত এমনভাবে তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম—যাহা হইতে স্বতন্ত্ররূপে আমি নবী করীম (সা)-কে উহা তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। আমি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে নবী করীম (সা)-এর নিকট লইয়া গেলাম। তিনি বলিলেন—'তোমাদের উভয়ের তিলাওয়াতই সঠিক ও শুদ্ধ। তোমরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব উচ্চারণে তিলাওয়াত করিও।' আমার মনে পড়ে, নবী করীম (সা) আরও বলিলেন—'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা আসমানী কিতাব লইয়া মতভেদে লিপ্ত হইয়াছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা উহার পরিণতিতে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন।'

ইমাম নাসাঈ উপরোক্ত হাদীস শু'বা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে উহার অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীসে কুরআন মজীদের কিরাআত লইয়া মতভেদ নিষিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত হাদীসই ইমাম বুখারী কর্তৃক 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়ে বর্ণিত সর্বশেষ হাদীস। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইমাম আহমদের পুত্র আবদুল্লাহ স্বীয় পিতার 'মুসনাদ' সংকলনে যে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, উহা উপরোক্ত হাদীসের প্রায় অনুরূপ। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যর ইব্ন হুবায়েশ, আসিম, আ'মাশ, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ উমুবী, আবূ মুহাম্মদ সাঈদ ইব্ন মুহাম্মদ আল জারমী ও আবদুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন—একদা কুরআন মজীদের একটি সূরা সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে মতভেদ দেকা দিল। আমাদের একজন উহার আয়াতের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ এবং অন্যজন ছত্রিশ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিল। আমরা মীমাংসার জন্যে নবী করীম (সা)-এর নিকট

উপস্থিত হইলাম। সে সময়ে হযরত আলী (রা) নবী করীম (সা)-এর সহিত কোন গোপন আলোচনায় রত ছিলেন। আমরা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলাম—'কিরাআতের বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে।' এতদশ্রবণে নবী করীম (সা)-এর চেহারা মুবারক রক্তিম হইয়া গেল। হযরত আলী (রা) বলিলেন—'তোমাদিগকে যেরূপে শিখানো হইয়াছে, সেইরূপে পড়িতে নবী করীম (সা) আদেশ করিতেছেন।' সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য।

কতিপয় জরুরী হাদীস

এই পরিচ্ছেদে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত, উহার ফযীলত এবং তিলাওয়াতকারীর মর্যাদার সহিত সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস বর্ণিত হইতেছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতিয়্যা, ফিরাস, শায়বান, মুআবিয়া ইব্ন হিশাম ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'কুরআন মজীদের ধারক, সংরক্ষক ও হাফিজ যখন জান্নাতে প্রবেশ করিবে, তখন তাহাকে বলা হইবে, পড়িতে থাক আর (জান্নাতের উপর তলায়) উঠিতে থাক। সে পড়িতে থাকিবে এবং প্রতিটি আয়াতে একটি করিয়া স্তর অতিক্রম করত উপরে উঠিতে থাকিবে। এইরূপে তাহার নিকট্ সংরক্ষিত শেষ আয়াতটি তিলাওয়াত করা পর্যন্ত সে উপরে উঠিতেই থাকিবে।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়ালীদ ইব্ন কয়স তাজীবী, বশীর ইব্ন আবূ আমর খাওলানী, হায়াত, আবূ আবদুর রহমান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'ষাট বৎসর পর একদল লোক আবির্ভূত হইবে যাহারা সালাত পরিত্যাগ করিবে এবং স্বীয় কুপ্রবৃত্তিসমূহ চরিতার্থ করিবার পশ্চাতে লাগিয়া থাকিবে। তাহারা ধ্বংস ও গোমরাহীতে নিপতিত হইবে। অতঃপর একদল লোকের আবির্ভাব ঘটিবে যাহারা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবে, কিন্তু উহা তাহাদের কণ্ঠদেশ অতিক্রম করিবে না। আর তিন শ্রেণীর লোক কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া থাকে ঃ মু'মিন, মুনাফিক ও ফাজির (পাপাসক্ত শ্রেণী)।'

উক্ত হাদীসের রাবী বশীর বলেন, আমি আমার উস্তাদ ওয়ালীদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই তিন শ্রেণীর লোকের পরিচয় কি ? তিনি বলিলেন, মুনাফিক শ্রেণী হইতেছে কুরআন মজীদের প্রতি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়। ফাজির শ্রেণী হইতেছে লোক দেখানো রিয়াকার সম্প্রদায়। ইহারা শুধু মানুষকে দেখাইবার জন্যে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া থাকে। মু'মিন শ্রেণী হইতেছে কুরআন মজীদের প্রতি পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপনকারী সম্প্রদায়।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল খাত্তাব, আবুল খায়ের, ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব, লায়ছ, হাজ্জাজ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধের বৎসরে একটি খেজুর বৃক্ষে হেলান দিয়া লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—'ওহে! আমি কি তোমাদিগকে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও নিকৃষ্টতম ব্যক্তির পরিচয় প্রদান করিব ? সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে স্বীয় অশ্ব অথবা উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া অথবা পদব্রজে গমনাগমন করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে কাজ করিয়া যায় ও জিহাদ করিতে

থাকে। আর নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হইতেছে সেই পাপাসক্ত ব্যক্তি যে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে, কিন্তু উহার কোন আদেশ-নিষেধের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না ও উহা পালন করে না।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতিয়্যা, আমর ইব্‌ন কায়স, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান হামদানী, হুসাইন ইব্‌ন আবদুল আ'লা, মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হাইয়াজ কূফী ও হাফিজ আবূ বকর আল- বায্‌যার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কুরআন মজীদের তিলাওয়াতে মগ্ন থাকিবার কারণে যে ব্যক্তি আমার নিকট দোয়া করিবার সময় ও সুযোগ পায় নাই, আমি তাহাকে শোকরগুযার কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্যে সংরক্ষিত উৎকৃষ্টতম পুণ্য ও নেকী প্রদান করিব।' নবী করীম (সা) আরও বলিয়াছেন, যেরূপে সমস্ত সৃষ্টির উপর আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে, সেইরূপে অন্যান্য সকল বাণী ও কালামের উপর আল্লাহ্‌র বাণী ও কালামের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে।'

উক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর হাফিজ আবূ বকর আল বায্‌যার মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 'উক্ত হাদীস মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ভিন্ন অন্য কাহারও মাধ্যমে বর্ণিত হয় নাই।'

হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বুদায়ল ইব্‌ন মায়সারাহ, আবদুর রহমান ইব্‌ন বুদায়ল ইব্‌ন মায়সারাহ, আবূ উবায়দা আল হাদ্দাদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

একদা নবী করীম (সা) বলিলেন—'মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার আপনজন ও নিজস্ব লোক রহিয়াছে।' নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসিত হইলেন—হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহারা কাহারা ? নবী করীম (সা) বলিলেন—'কুরআন মজীদের ধারক, সংরক্ষক ও বাস্তবায়নকারীগণই হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার আপনজন ও নিজস্ব লোক।'

হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাবিত, জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান, খালিদ ইব্‌ন খিদাশ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন শুআয়ব, সিমসার ও ইমাম আবুল কাসিম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত আনাস (রা) যখন কুরআন মজীদ খতম করিতেন, তখন তিনি স্বীয় সন্তান-সন্তুতি ও পরিবারের অন্যান্য লোকজনকে একত্রিত করিয়া তাহাদের জন্যে দোয়া করিতেন।'

হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, যায়দ ইব্‌ন ইব্বান, আ'মাশ, শরীক, হাতিম ইব্‌ন ইসমাঈল, মুহাম্মদ ইব্‌ন উব্বাদ মক্কী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ও হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'কুরআন মজীদ হইতেছে এইরূপ একটি সম্পদ যাহা অর্জিত হইবার পর কোন অভাবকেই অভাব বলা যায় না এবং যাহা ভিন্ন অন্য কোন সম্পদকেই সম্পদ বলা যায় না।'

হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদাহ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাররির, আবদুর রায্‌যাক, সালমা ইব্‌ন শাবীব ও হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'প্রত্যেক বস্তুরই অলংকার থাকে। কুরআন মজীদের অলংকার হইতেছে সুমধুর সুর।' উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাররির একজন দুর্বল রাবী।

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াফা খাওলানী, বিকর ইব্ন সাওয়াদা, ইব্ন লাহীআ, হাসান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত আনাস (রা) বলেন—একদা আমরা একদল লোক একস্থানে সমবেত ছিলাম। আমাদের মধ্যে আরব, অনারব, কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সকল শ্রেণীর লোকই ছিল। এই অবস্থায় নবী করীম (সা) আমাদের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন—'তোমরা সৌভাগ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছ। তোমরা আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করিয়া থাকো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল বর্তমান রহিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে মানুষের নিকট এইরূপ এক যামানা আসিবে, যখন তীরের ফলক কিংবা দণ্ড যেরূপ সরল ও সোজা করা হয়, লোকেরা উহাকে (কুরআন তিলাওয়াতকে) ঠিক সেইরূপ সরল ও সোজা করিবে। তাহারা দ্রুত তিলাওয়াত করিয়া নিজেদের পারিশ্রমিক আদায় করিবে এবং উহাতে তাহাদের বিলম্ব সহ্য হইবে না।'

হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, উমর ইব্ন নাবহান, আবদু রব্বিহী ইব্ন আবদুল্লাহ, আমর ইব্ন আবূ কয়স, আবদুল্লহ ইব্ন জুহাম, ইউসুফ ইব্ন মূসা ও হাফিজ আবূ বকর আল-বায্যার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যে গৃহে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা হয়, উহাতে অধিক পরিমাণে কল্যাণ বর্ষিত হয়। পক্ষান্তরে যে গৃহে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা হয় না, উহার কল্যাণের পরিমাণ কমিয়া যায়।'

হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ রাক্কাশী, আবূ উবায়দা, ফযল ইব্ন সুবহ ও হাফিজ আবূ ইয়ালা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

একদা হযরত আবূ মূসা (রা) একটি ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার চতুষ্পার্শে লোকজন জড়ো হইয়া গেল। তিনি তাহাদিগকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। একটি লোক নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল—হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, হযরত আবূ মূসা একটি গৃহে বসিয়া লোকদিগকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেছেন। নবী করীম (সা) বলিলেন—তুমি কি আমার জন্যে এইরূপ একটি স্থানে বসিবার ব্যবস্থা করিতে পার যেখানে তাহাদের কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না ? লোকটি নবী করীম (সা)-কে সেইরূপ একটি জায়গায় রাখিল। তিনি হযরত আবূ মূসা (রা)-এর তিলাওয়াত শুনিলেন। অতঃপর বলিলেন—'সে যেন হযরত দাঊদ (আ)-এর একটি বাঁশীর সাহায্যে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া থাকে।' উক্ত হাদীস অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। উহার অন্যতম রাবী ইয়াযীদ রাক্কাশী একজন দুর্বল রাবী।

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন, জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন, মুসআব ইব্ন সালাম ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত জাবির (রা) বলেন—একদা নবী করীম (সা) আমাদের সম্মুখে খুতবা প্রদান করিলেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা বর্ণনা করিবার পর বলিলেন—অতঃপর বলিবার বিষয় এই যে, সকল বাণীর মধ্যে অধিকতর সত্য বাণী হইতেছে কুরআন (আল্লাহ্র বাণী)। সকল পথের মধ্যে উৎকৃষ্টতম পথ হইতেছে সুন্নাহ (মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক প্রদর্শিত

পথ)। সকল বিষয়ের মধ্যে নিকৃষ্টতম বিষয় হইতেছে বিদআত (নব-উদ্ভাবিত বিষয়)। আর প্রতিটি বিদআত (শরীআত বিরোধী) হইতেছে গোমরাহী।' অতঃপর নবী করীম (সা)-এর কণ্ঠস্বর ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং তাঁহার গণ্ডদ্বয় ক্রমশ রক্তিম হইতে রক্তিমতর হইতে লাগিল।' এখানে উল্লেখ্য যে, নবী করীম (সা) যখন কিয়ামতের কথা উল্লেখ করিতেন, তখন তাঁহার মধ্যে ভীতিমূলক উত্তেজনা দেখা দিত। তিনি তখন এইরূপ ভঙ্গিতে কথা বলিতেন যাহাতে মনে হইত, যেন তিনি কোন সেনাদলের বিরুদ্ধে লোকদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। অতঃপর বলিলেন—'তোমাদের নিকট কিয়ামত আসিয়া পড়িয়াছে। আমার এবং কিয়ামতের মধ্যে এতটুকু দূরত্ব থাকা অবস্থায় আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি—এই বলিয়া নবী করীম (সা) স্বীয় তর্জনী এবং মধ্যমা অঙ্গুলির মধ্যকার ফাঁকটুকু দেখাইলেন—'কিয়ামত সকাল-বিকাল সর্বদা তোমাদের নিকট আগমন করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে কোন সম্পত্তি রাখিয়া গেলে উহা তাহার আপনজনদের প্রাপ্য হইবে। পক্ষান্তরে তাহার উপর কোন ঋণ থাকিয়া গেলে উহা পরিশোধ আমার দায়িত্ব। এইরূপে সে কোন সম্পত্তি না রাখিয়া গেলে তাহার (অসহায়) পরিজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমি বহন করিব।'

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির, উসামা ইব্ন যায়দ, লায়ছী, আবদুল ওহাব ইব্ন আতা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'নবী করীম (সা) মসজিদে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় তথায় একদল লোক কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেছিল। এতদ্দর্শনে তিনি বলিলেন—তোমরা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত কর এবং উহার সাহায্যে মহান আল্লাহকে পাইতে চেষ্টা কর। তোমাদের পর এক সময়ে এমন একদল লোক আবির্ভূত হইবে যাহারা উহাকে তীরের মত সোজা করিবে। তাহারা উহার ব্যাপারে ক্ষিপ্রতা ও তাড়াহুড়া করিবে এবং উহার বিনিময়ে যেহেতু পারিশ্রমিক পাইবে, তাই তাহা করিবে, উহাতে তাহাদের বিলম্ব সহ্য হইবে না।'

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির, হামীদ আল আ'রাজ, খালিদ, খালফ ইব্ন ওয়ালীদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত জাবির (রা) বলেন–একদা নবী করীম (সা) আমাদের নিকট আগমন করিলেন। সেই সময়ে আমরা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেছিলাম। আমাদের মধ্যে অনারব এবং দেহাতী (বেদুইন) লোকও ছিল। তিনি মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত শুনিলেন। অতঃপর বলিলেন–তোমরা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবে। কারণ, উহার সবটুকুই নেকীর কাজ। অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ একদল লোকের আবির্ভাব ঘটিবে যাহারা উহা তীরের ন্যায় সোজা করিবে। তাহারা উহার ব্যাপারে ত্বরা করিবে। বিলম্ব তাহাদের নিকট সহ্য হইবে না।'

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআল্লা কিন্দী, আ'মাশ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আজলাহ, আবূ কুরায়ব, মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা ও ইমাম আবূ বকর বায্যার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআল্লা কিন্দী, আ'মাশ, আবদুল্লাহ ইব্ন আজলাহ, আবূ কুরায়ব, মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা ও ইমাম আবূ বকর বায্যার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন—'নিশ্চয় এই কুরআন মজীদ সুপারিশ করিবে এবং উহার সুপারিশ গৃহীতও হইবে। যে ব্যক্তি উহা মানিয়া চলিবে, উহা তাহাকে জান্নাতে লইয়া

যাইবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে, উহা তাহাকে ঘাড়ে ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে দোযখে ফেলিয়া দিবে।' হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত জাবির (রা), আবূ সুফিয়ান, আ'মাশ, আবদুল্লাহ ইব্ন আজলাহ, আবূ কুরায়ব ও ইমাম আবূ বকর বায্যারও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। নবী করীম (সা)-এর বরাত দিয়া তিনি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর, আলী, মূসা ইব্ন আলী, বুকায়র ইব্ন ইউনুস, আহমদ ইব্ন আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ান, আবূ সখর ও হাফিজ আবূ ইয়া'লা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করে, তাহার জন্যে এক কিনতার (قنطار) পরিমাণ নেকী লেখা হয়। এক কিন্তার এক'শত রতল (رطل)-এর সমান। এক রতল বারো উকিয়ার (اوقية) সমান। এক উকিয়া ছয় দীনারের (دينار) সমান। এক দীনার চব্বিশ কীরাতের (قيراط) সমান এবং এক কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি তিনশত আয়াত তিলাওয়াত করে, তাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আরা স্বীয় ফেরেশতাগণকে বলেন—'আমার বান্দা ইহা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে যে, আমি তোমাদিগকে সাক্ষী বানাইব। হে ফেরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাকো—আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিলাম।' আর যদি কোন ব্যক্তির নিকট আল্লাহ্র তরফ হইতে কোন নেক কার্যের বিশেষ কোন ফযীলত বর্ণিত হয় এবং সে উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সওয়াব লাভ করিবার আশায় উক্ত ফযীলতের কার্য সম্পাদন করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সেই সওয়াব ও নেকী প্রদান করিয়া থাকেন। যদি উক্ত কার্য প্রকৃতপক্ষে সেইরূপ ফযীলতের কার্য নাও হয়, তথাপি সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে সেইরূপ সওয়াব লাভ করিবে।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ কাবূস, জারীর ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যাহার পেটে কুরআন মজীদের অংশ নাই, সে পরিত্যক্ত গৃহের সমতুল্য।' ইমাম আবূ বকর বায্যার বলেন—উক্ত হাদীস হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উপরোক্ত মাধ্যম ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইমরান ইব্ন আবূ ইমরান, আবূ শায়বাহ, উসমান ইব্ন আবূ শায়বাহ, মুহাম্মদ ইব্ন উসমান ইব্ন আবূ শায়াবাহ ও ইমাম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন।

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাব অনুসরণ করিয়া চলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে গোমরাহী হইতে বাঁচাইয়া সত্যপথে আনয়ন করেন এবং কিয়ামতের দিনে তিনি তাহাকে হিসাব-নিকাশের ভয়াবহতা হইতে মুক্ত রাখিবেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَيَشْقَى (যে ব্যক্তি আমার হিদায়েত অনুসরণ করিয়াছে, সে পথভ্রষ্ট হইবে না আর বদনসীবও হইবে না।)

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, আমর ইব্‌ন দীনার, ইব্‌ন লাহীআ, উসমান ইব্‌ন সালেহ, ইয়াহিয়া ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সালেহ ও ইমাম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া চিন্তান্বিত ও শংকাকুল হয়, সে কুরআন মজীদের সর্বোত্তম তিলাওয়াতকারী।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক, সাঈদ, আবূ সাঈদ বাক্কাল, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুলায়মান, নাঈম ইব্‌ন হাম্মাদ, আবূ ইয়াযীদ কারাতেসী ও ইমাম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'তোমরা মধুর সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিও।' ইমাম তাবারানী উপরোল্লিখিত সনদেই বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যাহারা কুরআন মজীদের ধারক, বাহক ও অনুসারী, তাহারাই আমার উম্মতের মধ্যে অধিকতর সম্ভ্রান্ত।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ধারাবাহিকভাবে যুরারাহ ইব্‌ন আওফা, কাতাদাহ, সালেহ মাররী, ইবরাহীম ইব্‌ন আবূ সুআয়দ যাররা, মু'আয ইব্‌ন মুছান্না ও ইমাম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন—একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করিল—কোন কাজ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রিয়তম ? নবী করীম (সা) বলিলেন—আল হাল্লুল মুরতাহিল (স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনশীল আগন্তুক)। প্রশ্নকারী আরয করিল—হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল হাল্লুল মুরতাহিল কে ? নবী করীম (সা) বলিলেন—কুরআন মজীদের যে ধারক ও সংরক্ষক এবং উহার প্রথমাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষাংশ পর্যন্ত ও উহার শেষাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমাংশ পর্যন্ত সমগ্র কুরআন মজীদ লইয়া চিন্তা ও গবেষণা করে, সেই হইতেছে اَلْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ

কুরআন মজীদ স্মরণ রাখিবার দোয়া

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালেহ ও ইকরামা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম করশী, হিশাম ইব্‌ন আম্মার, হুসায়ন ইব্‌ন ইসহাক তাসতারী ও ইমাম আবুল কাসিম তাবারানী 'আল মাজমাউল কারী' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, একদা হযরত আলী (রা) নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলেন—হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার অন্তর হইতে কুরআন মজীদ ছুটিয়া যায়। (অর্থাৎ আমি কুরআন মজীদ স্মরণ রাখিতে পারি না)। নবী করীম (সা) বলিলেন—'আমি কি তোমাকে এমন কতগুলি কালাম শিখাইব যাহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এবং তুমি উহা যাহাকে শিখাইবে, তাহাকে উপকৃত করিবেন?' হযরত আলী (রা) আরয করিলেন—হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার জন্যে আমার পিতা-মাতা কুরবান হউক। আমাকে উহা শিখান। নবী করীম (সা) বলিলেন—তুমি জুমুআর রাত্রিতে চারি রাক'আত নামায আদায় করিবে। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা ইয়াসীন, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা দুখান, তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা হা-মীম আস্ সাজদাহ এবং

চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা মুল্‌ক তিলাওয়াত করিবে। তাশাহ্‌হুদ শেষ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও প্রশংসা বর্ণনা করিবে, নবীগণের প্রতি দরূদ পাঠ করিবে এবং মু'মিনদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাগফিরাত কামনা করিয়া এই দোয়া করিবে ঃ

اللهم ارحمنى بترك المعاصى ابدا ما بقيتنى ـ وارحمنى من ان اتكلف ما لا يعنينى ـ وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنى ـ اللهم بديع السموات والارض ذا الجلال والاكرام والعزة التى لاترام ـ اسئلك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك ان تلزم قلبى حب كتابك كما علمتنى ـ وارزقنى ان اتلوه على النحو الذى يرضيك عنى ـ واسئلك ان تنور بالكتاب بصرى وتطلق به لسانى وتفرج به عن قلبى وتشرح به صدرى و تستعمل به بدنى وتقوينى على ذالك وتعيننى عليه ـ فانه لايعيننى على الخير غيرك ولاموفق له الا انت ـ

হে আল্লাহ্! আমাকে আমার সমগ্র জীবনে সর্বত্র পাপ বর্জনের ব্যাপারে সহায়তা কর। আর যাহা আমার জন্যে কোন কল্যাণ বহিয়া আনিবে না, তাহার জন্যে আমাকে কষ্ট করিতে না যাইবার তাওফীক দিয়া আমার প্রতি রহম কর। যাহার প্রতি আমি তাকাইলে তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে, উহার প্রতি তাকাইবার জন্যে আমাকে তাওফীক দান কর। আয় আল্লাহ্! তুমি আকাশসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি মহামহিম ও মহাপরাক্রমশালী। তোমার পরাক্রমের সমতুল্য পরাক্রম কেহ কামনা করিতে পারে না। আয় আল্লাহ্! আয় রহমান! তোমার পরাক্রম এবং তোমার চেহারার নূর ও জ্যোতির মাধ্যমে তোমার নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, তুমি তোমার কিতাবকে যেরূপে ভালবাসিতে আমাকে শিক্ষা দিয়াছ, উহার প্রতি সেইরূপ ভালবাসা আমার হৃদয়ে স্থায়ীভাবে বসাইয়া দাও।

আর কুরআন মজীদ যেভাবে তিলাওয়াত করিলে তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও, সেইভাবে উহা তিলাওয়াত করিবার জন্যে আমাকে তাওফীক দান কর। আর তোমার কাছে আবেদন জানাই যে, তুমি স্বীয় কিতাবের সাহায্যে আমার চক্ষু জ্যোতির্ময়, আমার জিহ্বাকে জড়তামুক্ত, আমার ভাষাকে অবাধ, আমার অন্তরকে উদার, আমার বক্ষকে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত এবং আমার দেহকে উহার আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থার বাস্তবায়নকারী ও রূপদাতা কর। তোমার নিকট আরও আবেদন জানাই, কুরআন মজীদ আমার ভিতর কায়েম করিবার ব্যাপারে তুমি আমাকে শক্তি দাও এবং সাহায্য কর। কারণ, তুমি ভিন্ন নেক কাজে আমাকে সাহায্য করিবার এবং তাওফীক দান করিবার অন্য কেহ নাই।'

অতঃপর নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন—'তুমি তিন অথবা পাঁচ অথবা সাত জুমআয় উপরোক্ত আমল করিবে। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে তুমি কুরআন মজীদ স্মরণ রাখিতে পারিবে। কোন মু'মিন উক্ত আমল করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইতে পারে না।' নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত আদেশের পর সাত জুমআ অতিবাহিত হইয়া গেলে হযরত আলী (রা) তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি এখন কুরআন মজীদ এবং পবিত্র হাদীস স্মরণ রাখিতে পারেন। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন—কা'বা ঘরের প্রভুর

শপথ! আলী মু'মিন। (হে আল্লাহ্!) তুমি আবুল হাসানকে ইলম দান করো, তুমি আবুল হাসানকে ইলম দান করো।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন রাবাহ ও ইকরামা, ইব্ন জুরায়জ, ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম, সুলায়মান ইব্ন আবদুর রহমান দামেশকী, আহমদ ইব্ন হাসান ও ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) স্বীয় 'জামে' সংকলনের 'দোয়া' অধ্যায়ে বর্ণনা করেন ঃ

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন— একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এই সময়ে হযরত আলী (রা) তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন—আমার পিতা-মাতা আপনার জন্যে কুরবান হউক। কুরআন মজীদ আমার অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়া যায়। আমি উহা মনে রাখিতে পারি না। নবী করীম (সা) তাঁহাকে বলিলেন—'ওহে আবুল হাসান! আমি কি তোমাকে কতগুলি কথা শিখাইব যদ্দারা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে উপকৃত করিবেন এবং তুমি যাহাকে উহা শিখাইবে, তাহাকেও উপকৃত করিবেন? আর তুমি যাহা স্বীয় অন্তরে ধারণ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তদ্দারা উহা তোমার পক্ষে দৃঢ়সংবদ্ধ করিয়া দিবেন?' হযরত আলী (রা) বলিলেন—হে আল্লাহ্র রাসূল! হ্যাঁ, আমাকে উহা শিক্ষা দিন। নবী করীম (সা) বলিলেন—'যখন শুক্রবারের রাত্রি আসে, তখন যদি পারো, উহার শেষ তৃতীয়াংশে নামায আদায় করিবে। রাত্রির উক্ত অংশের ইবাদত, বিশেষত কুরআন তিলাওয়াত ফেরেশতাগণ কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং উক্ত সময়ের দোয়া কবূল হইয়া থাকে। আমার ভাই হযরত ইয়াকূব (আ) স্বীয় পুত্রগণকে বলিয়াছিলেন ঃ

سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ (আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্যে আমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব।) তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—জুমআর রাত্রি আসিলে তিনি তাহাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করিবেন। রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে না পারিলে তুমি মধ্য রাত্রিতে নামায আদায় করিবে। উহাও না পারিলে রাত্রির প্রথম ভাগে নামায আদায় করিবে ও চারি রাকআত নামায পড়িবে। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা ইয়াসীন, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা দুখান, তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা আলিফ-লাম-মীম আস-সাজদাহ এবং চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা মুল্ক তিলাওয়াত করিবে। তাশাহ্হুদ শেষ করিবার পর সুন্দরভাবে আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও প্রশংসা বর্ণনা করিবে, আমার প্রতি এবং অন্যান্য সকল নবীর প্রতি সুন্দররূপে দরূদ পাঠ করিবে এবং মু'মিন নারী-পুরুষের জন্যে এবং যে সকল মু'মিন তোমার পূর্বে ঈমান আনিয়াছে, তাহাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। অতঃপর নির্দেশিত দোয়া পড়িবে। (এই স্থানে পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত দোয়া উল্লেখিত হইয়াছে। তবে ইহাতে وتستعمل به بدنى (আর তুমি উহাকে আমার দেহে বাস্তবায়িত করিবে) স্থলে وان تغسل به بدنى (আর তুমি উহা দ্বারা আমার দেহকে ধৌত করিয়া দিবে) বাক্যটি রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সর্বশেষে নিম্নোক্ত কথাগুলি সংযোজিত রহিয়াছে ঃ

ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم "আর মহা মর্যাদাশীল মহান আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত (নেকী করিবার এবং বদী হইতে বাঁচিবার) কোন যোগ্যতা ও ক্ষমতা নাই।"

নবী করীম (সা) বলিলেন—ওহে আবুল হাসান! তুমি উপরোক্ত আমল তিন অথবা পাঁচ অথবা সাত জুমআয় করিবে। আল্লাহ্র হুকুমে তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে। যে সত্তা আমাকে সত্য সহকারে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ! কোন মু'মিন ব্যক্তি উক্ত আমল করিলে সে উহার সুফল লাভ না করিয়া পারে না।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন—আল্লাহ্র কসম। পাঁচ বা সাত জুমআ অতিবাহিত হইবার পরই হযরত আলী (রা) নবী করীম (সা)-এর খেদমতে সেইরূপ মজলিসে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন—'হে আল্লাহ্র রাসূল! ইতিপূর্বে আমি তিলাওয়াত করিতে যাইতাম, দেখিতাম, উহা আমার স্মৃতি হইতে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। অথচ এখন আমি একসঙ্গে চল্লিশ বা উহার কাছাকাছি সংখ্যক আয়াত শিখিয়া থাকি। উহা যখন মুখস্থ তিলাওয়াত করিতে যাই, তখন মনে হয়, আল্লাহ্র কিতাব আমার সম্মুখে খোলা রহিয়াছে। ইতিপূর্বে আমি একটি হাদীস শুনিবার পর উহা যখন স্মরণ করিতে যাইতাম, দেখিতাম, উহা আমার স্মৃতিপট হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। আর বর্তমানে আমি একসাথে কতগুলি হাদীস শুনিয়া থাকি। উহা যখন স্মরণ করিতে যাই, উহার একটি বর্ণও স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত পাই না।' নবী করীম (সা) তাঁহাকে বলিলেন—'ওহে আবুল হাসান। কা'বা ঘরের প্রভুর কসম! তুমি মু'মিন।'

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন—'উক্ত হাদীস যদিও একটি মাত্র মাধ্যমে বর্ণিত; তথাপি উহা গ্রহ্যণযোগ্য। উপরোক্ত রাবী ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম ভিন্ন অন্য কাহারও মাধ্যমে উহা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না।' ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীস সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য করিলেও উহা সে ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম ভিন্ন অন্য রাবীর মাধ্যমেও বর্ণিত হইয়াছে, পাঠকগণ ইতিপূর্বে তাহা দেখিয়াছেন। হাকিম তাঁহার 'মুসতাদরাক' সংকলনে উহা উক্ত রাবী ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিমের মাধ্যমে বর্ণনা করত মন্তব্য করিয়াছেন—'উক্ত হাদীসের সনদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক নির্ধারিত হাদীস গ্রহণ সম্পর্কিত শর্তাবলী অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য। ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি উক্ত হাদীস ইব্ন জুরায়জ হইতে শুনিয়াছেন। অতএব, উক্ত হাদীসের সনদ নিশ্চিতভাবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য।' আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত ইবন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে', (উবায়দুল্লাহ) আমরী, ওয়াকী' ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন।

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'কুরআন মজীদের অবস্থা হইতেছে রশি দ্বারা বাঁধা উটের অবস্থার সমতুল্য। মালিক তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এবং উহা বাঁধিয়া রাখিলে উহা তাহার অধিকারে থাকে। পক্ষান্তরে, সে উহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে এবং উহা ছাড়িয়া দিলে উহা তাহার অধিকারের বাহিরে চলিয়া যায়।' ইমাম আহমদ আবার উহা উপরোক্ত রাবী উবায়দুল্লাহ আমরী হইতে উপরোক্ত বিভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং উবায়দুল্লাহ আমরী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ ও ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ আবার উহা হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রায্যাকের সনদে নাফে', আইয়ুব ও মা'মারও প্রায় অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার, মূসা'আর, হামীদ ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন আবুল হাওয়ার, মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার ও হাফিজ (আবূ বকর) আল-বায্যার বর্ণনা করেন ঃ

'একদা নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসিত হইলেন—কোন্ ব্যক্তির কিরাআত সর্বোত্তম ? নবী করীম (সা) বলিলেন—'যাহার কিরাআত শুনিলে মনে হয় যে, সে আল্লাহ্কে ভয় করে, তাহার কিরাআত সর্বোত্তম কিরাআত।'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যর, আসিম, সুফিয়ান, আবদুর রহমান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'(কিয়ামতের দিন) কুরআন মজীদের ধারক, সংরক্ষক ও বাস্তবায়নকারীকে বলা হইবে, তুমি উহা পড়িতে থাকো এবং (জান্নাতের সিঁড়ি দিয়া) উপরে উঠিতে থাকো। আর তুমি দুনিয়াতে যেরূপে ধীরগতিতে সুন্দর করিয়া তিলাওয়াত করিতে, সেইরূপেই তিলাওয়াত করিবে। তুমি সর্বশেষ আয়াত (জান্নাতের) যে স্তর বা মনযিলে তিলাওয়াত করিবে, উহাই তোমার মনযিল বা বাসস্থান হইবে।'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আবদুর রহমান হাবলী, হাই ইব্ন আবদুল্লাহ, ইব্ন লাহীআ, হাসান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল—হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করি; কিন্তু আমার স্মৃতি উহা ধরিয়া রাখিতে পারে না। নবী করীম (সা) বলিলেন—'তোমার অন্তরের ঈমান অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল। বান্দা কুরআন মজীদ লাভ করিবার পূর্বে ঈমান লাভ করিয়া থাকে।' ইমাম আহমদ উপরোক্ত সনদেই বর্ণনা করেন ঃ

একদা এক লোক তাহার এক পুত্রকে লইয়া নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইল। লোকটি আরয করিল—হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পুত্র দিনের বেলায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে এবং রাত্রিবেলায় ঘুমাইয়া থাকে। নবী করীম (সা) বলিলেন—'তুমি তাহার মধ্যে কি দোষ দেখিতেছ ? সে তো দিনের বেলায় আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল থাকে এবং গুনাহমুক্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে।'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আবদুর রহমান, হাই, ইব্ন লাহীআ, মূসা ইব্ন দাউদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—সিয়াম এবং কুরআন মজীদ কিয়ামতের দিনে বান্দার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সুপারিশ করিবে। সিয়াম বলিবে—হে প্রভু! আমি তাহাকে দিনের বেলায় খাদ্য পানীয় গ্রহণ এবং যৌন বাসনা চরিতার্থকরণ হইতে বিরত রাখিয়াছি। অতএব তাহার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবূল করো। পক্ষান্তরে কুরআন মজীদ বলিবে, আমি তাহাকে রাত্রিবেলায় নিদ্রা হইতে বিরত রাখিয়াছি। অতএব তাহার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবূল করো। উভয়ের সুপারিশই গৃহীত হইবে।'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে আবদুর রহমান ইব্ন জুবায়র, ইব্ন লাহীআ, হাসান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'আমার উম্মতের অধিকাংশ কারী হইবে মুনাফিক।'

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'কুরআন মজীদকে তোমরা শুদ্ধ ও সুস্পষ্ট করিয়া তিলাওয়াত করিও এবং উহার গভীর তাৎপর্যসমূহ বুঝিতে চেষ্টা করিও।'

হযরত ফুযালা ইব্ন উবায়দ ও হযরত তামীম দারী হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম, আবূ আবদুর রহমান, ইয়াহিয়া ইব্ন হারিছ মিযমারী, ইসমাঈল ইব্ন আব্বাস, মুহাম্মদ ইব্ন বুকায়র হায্রামী, মূসা ইব্ন হাযিম ইস্পাহানী ও ইমাম আবুল কাসিম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি রাত্রিতে দশটি আয়াত তিলাওয়াত করিবে, তাহার আমলনামায় এক কিনতার পরিমাণ নেকী লেখা হইবে। এক কিনতার পরিমাণ নেকী দুনিয়া ও উহাতে যাহা আছে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান। কিয়ামতের দিন তোমার প্রভু বলিবেন—'তুমি তিলাওয়াত করিতে থাকো আর প্রতিটি আয়াতের পরিবর্তে (জান্নাতের) একটি স্তর উপরে উঠিতে থাকো।' বান্দা যখন তাহার নিকট রক্ষিত সর্বশেষ আয়াতটির তিলাওয়াত সম্পন্ন করিবে, তখন তোমর প্রভু বলিবেন—'তুমি স্বীয় অধিকারে উহা গ্রহণ করো এবং দখল লও।' বান্দা তখন স্বীয় হস্তের ইঙ্গিতে আরয করিবে—প্রভু হে! তুমি তো শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী। (অর্থাৎ আমি কতটুকু অংশের দখল লইব, তাহা তো জানি না, বরং উহা সম্বন্ধে তুমিই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।) তোমার প্রভু বলিবেন—'তুমি এই সম্পূর্ণ জান্নাত ও উহার নিয়ামতের পরিপূর্ণ দখল লও।'

تمت بالخير

'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায় সমাপ্ত হইল এবং এতদ্বারা 'তাফসীরুল কুরআন' অধ্যায়ের উদ্বোধন করা হইল।

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَاتَصِفُوْنَ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন শুখায়র, কাতাদাহ, হুমাম, ওয়াকী' ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ের মধ্যে কুরআন মজীদ খতম করে, সে উহার অর্থ ও মর্ম বুঝিতে এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।' ইমাম আহমদ আবার উহা উপরোক্ত রাবী কাতাদাহ হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে শু'বা ও গুনদুরের অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ইহাকে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল মুহাজির, ইসমাঈল ইব্ন রাফে', ঈসা ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ হাজ্জাজ তামীমী, ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই ও ইমাম আবুল কাসেম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ শিক্ষা করে, নবূওত যেন তাহার দুই পাঁজরের মধ্যে (অন্তরে) স্থান গ্রহণ করে। তবে শুধু (পার্থক্য এই) তাহার নিকট ওহী প্রেরিত হয় না। আর যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ শিখিবার পর মনে করে যে, সে যাহা লাভ করিয়াছে, অন্য কেহ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন বস্তু লাভ করিয়াছে, সে ব্যক্তি দুইটি অপরাধে অপরাধী। এক, আল্লাহ্ তা'আলা যে বস্তুকে কম মর্যাদা দান করিয়াছেন, সে ব্যক্তি উহাকে অধিক মর্যাদার অধিকারী মনে করিল। দুই, আল্লাহ্ তা'আলা যে বস্তুকে মর্যাদা দান করিয়াছেন, সে ব্যক্তি উহাকে কম মর্যাদার অধিকারী মনে করিল। কুরআন মজীদের ধারকের পক্ষে ইহা সমীচীন নহে যে, মূর্খতার জবাব মূর্খতা, ক্রোধের জবাব ক্রোধ ও আঘাতের জবাব আঘাত দ্বারা প্রদান করিবে। বরং তাহার জন্যে ইহাই সমীচীন যে, সে কুরআন মজীদের ফযীলতের কারণে ক্ষমা-সুন্দর ব্যবহার করিবে।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, উব্বাদ ইব্ন মায়সারাহ, আবূ সাঈদ (বনূ হাশিম গোত্রের জনৈক মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম) ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবের একটি আয়াত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, তাহার জন্যে বহুগুণান্বিত একটি নেকী লেখা হয় আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবের একটি আয়াত নিজে তিলাওয়াত করে, কিয়ামতের দিনে উহা তাহার জন্যে নূর বা জ্যোতি হইবে।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শু'বা ও আবূ সালামা, যুহরী, আম্বাসা ইব্ন মিহরান, ইয়াহিয়া ইব্ন মুতাওয়াক্কিল, মুহাম্মদ ইব্ন হারব ও (হাফিজ আবূ বকর) আল-বায্যার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'কুরআন মজীদ সম্বন্ধে ঝগড়া করা কুফর।' উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আম্বাসা মন্তব্য করেন, উপরোক্ত সনদ শক্তিশালী নহে। তবে আমার নিকট উক্ত হাদীস অন্য এক সনদেও বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাকরাবীর পিতামহ, মাকরাবী, আবূ বকর ইব্ন ইদরীস ও হাফিজ আবূ ইয়ালা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

সূরা ফাতিহা

উপক্রমণিকা

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(অগাধ জ্ঞানদীপ্ত অনন্য ব্যক্তিত্ব প্রাজ্ঞ ইমাম পরম আল্লাহ্ভীরু ও আল্লাহ্প্রেমিক মনীষী শায়খ হাফিজ ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন খতীব আবূ হাফ্স উমর ইব্ন কাছীর আশ্শাফেঈ (র) বলেন)

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য যিনি স্বীয় কিতাব (আল-কুরআন) 'প্রশংসা' দিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। যেমন তিনি বলিয়াছেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (সকল প্রশংসা নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক, পরম দাতা ও দয়ালু, বিচার দিবসের বাদশাহ আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য।)

তেমনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا ـ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ـ وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ـ مَالَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلاَ لِاٰبَائِهِمْ ـ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ـ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلاَّ كَذِبًا ـ

(সকল প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের প্রাপ্য যিনি স্বীয় বান্দার উপর কিতাব নাযিল করিয়াছেন এবং উহাতে কোনরূপ বক্রতা রাখেন নাই। উহা মজবুত গ্রন্থ। উহা তাহার উপর এই উদ্দেশ্যে নাযিল করিয়াছেন যে, সে আল্লাহ্র তরফ হইতে আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিবে এবং যে সব মু'মিন নেক কাজ করিবে তাহাদিগকে এমন উত্তম প্রতিদানের (জান্নাতের) সুসংবাদ দিবে যেখানে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে। আর যাহারা পুরুষানুক্রমে অজ্ঞতাবশত বলিয়া বেড়ায়, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তান আছে, তাহাদিগকেও সাবধান করিয়া দিবে। তাহাদের মুখ নিসৃত উক্ত উক্তি বড়ই ঘৃণ্য। তাহারা মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলিতেছে না।)

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টিকার্যের বর্ণনাও 'প্রশংসা' দিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। যেমন বলিয়াছেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ - ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ -

(সকল প্রশংসা আল্লাহ্র প্রাপ্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আঁধার ও আলোর জন্ম দিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও কাফিররা স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর সমকক্ষ সত্তা গড়িয়া লয়।)

তারপর তিনি উহার পরিসমাপ্তির বর্ণনাও 'প্রশংসা' দিয়া শেষ করিয়াছেন। বেহেশত-দোযখ বিতরণোত্তর পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

وَتَرَى الْمَلاَئِكَةَ حَافِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

(আর তুমি ফেরেশতাদিগকে আরশের পরিবেষ্টকরূপে দেখিবে; তাহারা তদবস্থায় স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর প্রশংসা বর্ণনায় রত থাকিবে। অনন্তর তাহাদের (জ্বিন ও মানবের) ব্যাপারে ইনসাফভিত্তিক ফয়সালা প্রদান করা হইবে। তখন উচ্চারিত হইবে, সকল প্রশংসা নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক প্রভুর প্রাপ্য।)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ - لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -

(আর আল্লাহ্ তো তিনিই, যিনি ছাড়া অন্য কোন প্রভু নাই। পূর্বাপর সর্বকালের সকল প্রশংসার অধিকারী তিনিই। অনন্তর বিধি-বিধান তাঁহারই চলিবে এবং তোমরা তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইবে।)

অনুরূপ অপর একস্থানে বলিয়াছেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ -

(সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্ পাকের প্রাপ্য যাঁহার মালিকানায় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমুদয় বস্তু রহিয়াছে। আখিরাতের সমস্ত প্রশংসাও তাঁহারই প্রাপ্য। তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী।)

আদি ও অন্তে সর্বকালে ইতিপূর্বে সৃষ্ট ও ভবিষ্যতে সৃষ্টব্য সকল বস্তুর ব্যাপারেই সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য। তিনি সকল সৃষ্টির জন্যই প্রশংসার পাত্র। আল্লাহ্র নেক বান্দা তাই মুনাজাতে বলিয়া থাকে, 'হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু আল্লাহ্! আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যে পরিমাণ প্রশংসা ধরে এবং ভবিষ্যতেও তোমার নিত্য নতুন সৃষ্টির ভিতর যে পরিমাণ প্রশংসা ধরিবে, তত প্রশংসাই তোমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত।' আর এই কারণেই জান্নাতবাসীগণ তাহাদের জন্য আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত স্থায়ী নিয়ামত ও অনুগ্রহরাশি সন্দর্শন করিয়া এবং তাঁহার

বিশাল পরাক্রম ও কুদরত উপলব্ধি করিয়া নিজেদের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-বর্জনের সমসংখ্যক বার আল্লাহ্র গুণাবলী ও প্রশংসা বর্ণনা করিবে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ فِىْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ ـ دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ ـ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

(যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক কাজসমূহ সম্পাদন করিয়াছে, তাহাদের প্রতিপালক প্রভু এই ঈমান ও আমলের বদৌলতে তাহাদিগকে নিশ্চয়ই নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে লইয়া যাইবেন। সেইসব জান্নাতের নিম্নভাগে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকিবে। সেখানে তাহাদের স্বতোৎসারিত স্লোগান হইবে– 'হে আল্লাহ্, তুমি মহান, তুমি পবিত্র, তুমি সর্বগুণাধার।' আর সেখানে তাহাদের পারস্পরিক সম্বোধন হইবে 'শান্তি' (সবার উপর শান্তি বর্ষিত হউক)। তাহাদের সকল কথার শেষ কথা হইবে 'সকল প্রশংসা নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত।')

মোটকথা সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্ পাকের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যিনি একাধারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে রাসূলগণকে পাঠাইয়াছেন যেন (বিচার দিবসে) তাঁহার বিরুদ্ধে মানুষের পক্ষে কোন যুক্তি না থাকে। তিনি সর্বশেষে নিরক্ষর, আরবী ভাষাভাষী, মক্কা নিবাসী নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে পাঠাইয়াছেন। সেই সর্বশেষ নবী ছিলেন সর্বাধিক দীপ্ত ও অধিকতম আলোকময় পথের দিশারী। আল্লাহ্ তাঁহার নবূওতের ধারার প্রথম সময় হইতে কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের যে কোন অংশে পৃথিবীতে অবস্থানকারী প্রতিটি মানুষ ও জ্বিনের কাছে তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ اَلَّذِىْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىِ وَيُمِيْتُ ـ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ ـ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ـ

(তুমি বল, হে মানব সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্র রাসূল আর আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর একচ্ছত্র মালিক। তিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান আন ও তাঁহার সেই নিরক্ষর নবীর প্রতি আস্থাবান হও যে রাসূল নিজেও আল্লাহ্ ও তাঁহার বাণীর উপর ঈমান রাখে। অনন্তর তোমরা তাঁহাকে অনুসরণ কর; হয়ত ইহার ফলে তোমরা সঠিক ও সত্যপথ লাভ করিবে।)

অনুরূপ অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ (আমি এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছি যে, তোমাদিগকে এবং অন্যান্য যাহাদের নিকট ইহা পৌঁছিবে, তাহাদের সকলকেই ইহা দ্বারা সতর্ক করিব।)

অতএব আরবী হউক কিংবা আজমী, কৃষ্ণাঙ্গ হউক কিংবা শ্বেতাঙ্গ, এমনকি মানুষ হউক কিংবা জ্বিন, যাহারই নিকট আল-কুরআন পৌঁছিবে, তিনি তাহারই সতর্ককারীরূপে প্রেরিত হইয়াছেন।

অনুরূপ তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ (যে কোন শ্রেণীর যে কোন ব্যক্তিই উহা প্রত্যাখ্যান করিবে, দোযখ তাহারই জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে।)

মোটকথা আল্লাহ্ পাকের বাণী দ্বারা স্পষ্টত প্রমাণিত হইতেছে যে, উপরোল্লিখিত দলসমূহের যে ব্যক্তিই আল-কুরআন প্রত্যাখ্যান করিবে, তাহারই ঠিকানা হইবে জাহান্নাম।

তদ্রূপ অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَذَرْنِىْ وَ مَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثَ - سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَيَعْلَمُوْنَ (যে ব্যক্তি এই বাণীকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করে, দেখো, আমি তাহার সহিত কিরূপ আচরণ করি। শীঘ্রই আমি তাহাদিগকে (না ফরমানী কাজে) এইরূপ অবকাশ দিব, যাহাতে তাহারা (মহাক্ষতির ব্যাপারটা) বুঝিতেও না পারে।)

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সকলের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। মুজাহিদ উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, নবী করীম (সা) মানুষ ও জ্বিন সকলের প্রতি প্রেরিত হইয়াছেন। মোটকথা নবী করীম (সা) মানুষ ও জ্বিন উভয় জাতির প্রতিই রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করিয়াছেন, তিনি উহা তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত মহাগ্রন্থে সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে কোন বাতিল বা অসত্য প্রবেশ করিতে পারে না। উহা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হইতে অবতীর্ণ কিতাব। উক্ত মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করিতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ - وَمَا كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا -

(তাহারা কি আল-কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখে না? যদি উহা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহারো নিকট হইতে অবতীর্ণ হইত, তাহা হইলে তাহারা উহার ভিতর অনেক স্ববিরোধীতা দেখিতে পাইত।)

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيَاتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرُوْا اُوْلُوا الاَلْبَابِ -

(উহা সেই মুবারক কিতাব যাহা তোমার প্রতি এই উদ্দেশ্যে নাযিল করিয়াছি যে, লোকজন উহার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করিবে এবং জ্ঞানীগণ উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবে।)

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا (তাহারা কি আল-কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করে না? অথবা তাহাদের অন্তরসমূহ কি তালাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে?)

অতএব আল্লাহ্ পাকের কালামের অর্থ সঠিকরূপে জ্ঞাত হওয়া ও অপরকে উহা জ্ঞাত করা এবং উহার তাৎপর্য ও রহস্যাবলী মানুষের নিকট তুলিয়া ধরা আলেমগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُوْنَهُ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ـ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ـ

(অনন্তর আল্লাহ্ কিতাব প্রাপ্ত জাতির নিকট হইতে এই দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন যে, তোমরা অবশ্যই উহা সর্বসাধারণের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবে এবং উহার কিছুই গোপন করিবে না। তাহা সত্ত্বেও তাহারা উক্ত প্রতিশ্রুতি অবলীলাক্রমে ভঙ্গ করিল আর উহার পরিবর্তে তুচ্ছ স্বার্থ ক্রয় করিল। তাহারা যাহা ক্রয় করিতেছে তাহা বড়ই ঘৃণ্য ও জঘন্য।)

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اُولٰئِكَ لاَخَلاَقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَيُزَكِّيْهِمْ ـ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

(যাহারা আল্লাহ্র নিকট প্রদত্ত স্বীয় প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তুচ্ছ স্বার্থ ক্রয় করে, আখিরাতে তাহাদের ভাগ্যে (নিয়ামতের) কোন হিস্‌সা নাই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা না তাহাদের সহিত কথা বলিবেন, না তাহাদের প্রতি তাকাইবেন, না তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন। তাহাদের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাবদের নিন্দা করিয়াছেন। কারণ তাহারা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব উপেক্ষা করিয়া পার্থিব সম্পদ পুঞ্জীভূত করিয়াছে এবং আল্লাহ্র কিতাব অনুসরণ না করিয়া উহার বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। 'অতএব হে মুসলিম জাতি! যে পাপের কারণে আল্লাহ্ পাক পূর্ব গ্রন্থধারীদের নিন্দা করিয়াছেন, উহা হইতে বিরত থাকা আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। তেমনি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ তাঁহার কিতাব শিক্ষা করার ও অপরকে শিক্ষা দিবার এবং উহার অর্থ, তাৎপর্য ও রহস্যাবলী নিজেদের জ্ঞাত হইবার ও অপরকে জ্ঞাত করার যে আদেশ তিনি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, উহা পালন করা আমাদের জন্য ফরয।' এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَيَكُوْنُ كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ـ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ ـ اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ـ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

(মু'মিনদের জন্য কি এখনও সময় আসে নাই যে, আল্লাহ্র উপদেশ ও তাঁহার অবতীর্ণ সত্যের জন্য তাহাদের অন্তর সন্ত্রস্ত হইবে? আর তাহাদের জন্য কি সেই সময়ও নাই যখন তাহারা পূর্ববর্তী গ্রন্থধারীদের ন্যায় আর বিভ্রান্ত হইবে না? তাহাদের পূর্ব গ্রন্থধারীদের অন্তরসমূহ (প্রত্যাদেশ বিহীন অবস্থায়) বহুকাল থাকার পর কঠিন (সত্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ) হইয়া গেল। ফলে তাহাদের বিপুল সংখ্যক লোক অবাধ্যতাপরায়ণ হইল। তোমরা জানিয়া রাখ যে, পৃথিবীর মৃত্যুর পর (মানব জাতির আধ্যাত্মিক অধঃপতনের পর) আল্লাহ্ পাক উহাকে পুনর্জীবন

দান করিবেন। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য (স্বীয়) নিদর্শনাবলী সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছি। ফলে হয়ত তোমরা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করিবে।)

উপরের আয়াত দুইটির প্রথমটিতে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব গ্রন্থধারীদের আত্মিক অধঃপতনের উল্লেখ করিয়াছেন। আর দ্বিতীয়টিতে তিনি উল্লেখ করিলেন মৃত পৃথিবীকে পুনর্জীবন দানের ব্যাপারটি। ইহাতে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, পৃথিবী বিশুষ্ক হইলে (বৃষ্টি দ্বারা) যেভাবে তিনি উহাকে পুনর্জীবিত ও ফুলে-ফলে সুসজ্জিত করেন, তেমনি পাপাচার ও অনাচারে বিশুষ্ক মানুষের কঠিন অন্তরসমূহ ঈমান ও হিদায়েতের বৃষ্টি দ্বারা পুনর্জীবিত তথা আলোকপ্রাপ্ত করেন। আল্লাহ্ পাকের কাছে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদিগকেও অনুরূপ পবিত্র ও আলোকপ্রাপ্ত করেন। অবশ্যই তিনি উদারপ্রাণ মহান দাতা।

কুরআন পাকের ব্যাখ্যার সর্বোত্তম পন্থা কোনটি? এ প্রশ্নের জবাব এই কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা কুরআন মজীদ দ্বারা করাই সর্বোত্তম পন্থা। কারণ দেখা যায় যে, কুরআনের এক জায়গায় কোন বিষয় সংক্ষেপে বলা হইয়াছে অন্য জায়গায় উহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। তবে আয়াত বিশেষের বেলায় যদি সেরূপ না হয়, তখন রাসূলের সুন্নাহ্‌র সাহায্যে উহার ব্যাখ্যা দান করিতে হইবে। কারণ, সুন্নাহ্ কুরআনেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, মহানবী (সা) যেসব আহকাম ও ফয়সালা প্রদান করিয়াছেন, তাহা কুরআনের আলোকেই করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ - وَلَاتَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا -

(নিশ্চয় আমি তোমার কাছে সত্যবাহী মহাগ্রন্থটি এই উদ্দেশ্যে নাযিল করিয়াছি যে, ইহার আলোকে তুমি মানুষের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা প্রদান করিবে। অনন্তর তুমি আত্মসাৎকারীদের পক্ষাবলম্বন করিও না।)

অনুরূপ তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ -

(তোমার কাছে আমি এই জন্য কিতাব পাঠাইয়াছি যে, তাহাদের বিরোধ-বিসম্বাদের মূল সত্যটি তাহাদের নিকট পরিষ্কার করিয়া দিবে এবং ঈমানদারের জন্য উহা আলোকবর্তিকা ও কল্যাণ ভাণ্ডার হইয়া দেখা দিবে।)

তিনি আরও বলেন ঃ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (এবং আমি তোমার কাছে এই জন্য উপদেশগ্রন্থ পাঠাইয়াছি যে, মানব সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে যাহা কিছু বলা হইল তাহা সবই তুমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবে; তাহা হইলে হয়ত তাহারা চিন্তা-ভাবনা করিবে।)

এসব কারণে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'তোমরা শোন, আমাকে আল-কুরআন ও তৎসহ অনুরূপ অন্য এক বস্তু প্রদান করা হইয়াছে।' বলাবাহুল্য আল-কুরআনের সহিত প্রদত্ত

অনুরূপ অন্য বস্তুটি হইল আস্ সুন্নাহ্ (কথা ও কাজের মাধ্যমে মহানবী (সা) কর্তৃক বর্ণিত আল-কুরআনের ব্যাখ্যা) মহানবী (সা)-এর প্রতি কুরআনের মত সুন্নাহও অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে পার্থক্য এই, আল-কুরআন তাঁহাকে পড়িয়া শুনানো হইত। পক্ষান্তরে আস্সুন্নাহ্ তাঁহাকে পড়িয়া শুনানো হইত না (বরং ভাব ও বিষয়বস্তু তাঁহাকে জানানো হইত এবং তিনি নিজ ভাষায় উহা প্রকাশ করিতেন)। আল-কুরআনের ন্যায় আস্ সুন্নাহও যে মহানবীর উপর অবতীর্ণ হইত, ইমাম শাফেঈ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ বহু সংখ্যক দলীল দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। এই স্থানে উহা আলোচনার উপযোগী ক্ষেত্র নহে।

উপরের আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, আল-কুরআনের ব্যাখ্যা আমাদিগকে সর্বপ্রথম উহাতেই খুঁজিতে হইবে। উহাতে না পাইলে সুন্নাহ্ খুঁজিতে হইবে। প্রসঙ্গত নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ্য ঃ

বিখ্যাত সাহাবী মু'আয ইব্ন জাবালকে ইয়ামান প্রদেশের প্রশাসক করিয়া পাঠাইবার কালে নবী করীম (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কিসের সাহায্যে শাসনকার্য চালাইবে?' তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্র কিতাবের সাহায্যে। নবী করীম (সা) বলিলেন, উহাতে যদি (বিশেষ কোন সম্যসার সমাধান) না পাও? তিনি জবাব দিলেন, রাসূলের সুন্নাহ্র সাহায্যে। নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাতেও যদি না পাও? তিনি জবাব দিলেন (কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে) নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সমাধান বাহির করিতে চেষ্টা করিব। নবী করীম (সা) হৃষ্টচিত্তে তাঁহার বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিলেন, সেই আল্লাহ্র প্রশংসা করি যিনি স্বীয় রাসূলের প্রতিনিধিকে তাঁহার মনোপূত পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

হাদীসটি 'মুসনাদ' এবং 'সুনান' সংকলনে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত রহিয়াছে। (এই গ্রন্থে) যথাস্থানে উহা উল্লেখ করা হইয়াছে।

আল-কুরআনের বিশেষ কোন আয়াতের ব্যাখ্যা যদি আমরা কুরআন বা সুন্নাহ্র কোনটিতে না পাই তাহা হইলে আমাদিগকে এতদসম্পর্কিত 'আছার' বা সাহাবাদের বাণী অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ, তাঁহারা এই বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কেননা তাঁহারা এইরূপ কতগুলি প্রমাণ, চিহ্ন, নিদর্শন, অবস্থা ও প্রেক্ষিত প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, যাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ অন্যরা লাভ করেন নাই। তদুপরি তাঁহারা ছিলেন পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞান এবং নেক আমলের অধিকারী। ইল্ম ও আমলের দিক দিয়া প্রথম শ্রেণীর সাহাবীগণ তথা খোলাফায়ে রাশেদীন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) এবং অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় সাহাবাবৃন্দ এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুসরণযোগ্য।

মাসরূক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুয্যোহা, আ'মাশ, জাবির ইব্ন নূহ, আবূ কুরাইব এবং ইমাম আবূ জাফর ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন– 'আল্লাহ্র কসম! আমি আল-কুরআনের প্রতিটি আয়াতের শানে নুযূল এবং অবতরণ স্থান সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত রহিয়াছি। যদি আমি জানিতাম, আল্লাহ্র কিতাবে কেহ আমা অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী ও ব্যুৎপন্ন, তবে সম্ভবপর হইলে আমি (উক্ত জ্ঞান আহরণের জন্য) তাহার নিকট গমন করিতাম।' আবূ ওয়ায়েল হইতে আ'মাশ আরও বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, 'আমাদের মধ্যে যদি কেহ দশটি আয়াত শিখিত তবে সে সেগুলির অর্থ না বুঝিয়া এবং সেগুলির উপর আমল না করিয়া পরবর্তী কোন আয়াত শিখিত না।

আবূ আবদুর রহমান সালফী তাহার কুরআন শিক্ষক সাহাবাবৃন্দ হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার শিক্ষক সাহাবীরা বলিয়াছেন– 'আমরা মহানবী (সা)-এর নিকট হইতে এই নিয়মে আল-কুরআন শিখিতাম যে, দশটি আয়াত শিখিবার পর আমরা উহা পুরোপুরি আমল করিতাম এবং উহার পর পরবর্তী আয়াত শিখিতাম। অর্থাৎ পূর্বায়ত্ত দশটি আয়াত কার্যকরী না করিয়া পরবর্তী কোন আয়াত শিখিতাম না। এভাবে আমরা কুরআনের ইল্ম ও আমল একই সঙ্গে আয়ত্ত করিয়াছি।'

শীর্ষস্থানীয় সাহাবাবৃন্দের অন্যতম হইলেন মহানবী (সা)-এর খুল্লতাত ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)। জ্ঞান সমুদ্ররূপ এই মহাপণ্ডিত ব্যক্তিটি মহানবী (সা)-এর দোয়ার বরকতে আল-কুরআনের তাফসীকার ও প্রভাষক হইবার বিরাট সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। নবী করীম (সা) তাঁহার জন্য আল্লাহ্ পাকের কাছে প্রার্থনা করিলেন ঃ 'হে আল্লাহ্! তুমি তাহাকে দীনী ইল্মে ব্যুৎপত্তি দান কর এবং আল-কুরআনের রহস্যাবলী শিক্ষা দাও।'

মুসলিম হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্ন বিশর, ওয়াকী' এবং ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলিয়াছেন– হ্যাঁ, আল্ কুরআনের তাফসীরকার ও প্রভাষক হইতেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)। অনুরূপভাবে মাসরূক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুয্যোহা, মুসলিম ইব্ন সাবীহ, আ'মাশ, সুফিয়ান, ইসহাক আল আযরাক, ইয়াহিয়া ইব্ন দাউদ এবং ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলিয়াছেন– হ্যাঁ, আল-কুরআনের ব্যাখ্যাকার ও শিক্ষক হইলেন ইব্ন আব্বাস (রা)।

ইব্ন জারীর অন্যত্র উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে অন্যতম রাবী আ'মাশ হইতে জা'ফর ইব্ন আওন ও বিনদারের মাধ্যমেও বর্ণনা করিয়াছেন। সেই রিওয়ায়েতেও ইব্ন আব্বাস (রা) সম্পর্কে ইব্ন মাসউদ (রা) উপরোক্ত মন্তব্য করেন। উপরোক্ত বর্ণনার সূত্র যেহেতু বিশুদ্ধ, তাই সহীহ্ সনদে উক্ত মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হইল।

সঠিক ঐতিহাসিক বর্ণনামতে হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হিজরী বত্রিশ সনে ইন্তেকাল করেন। তাঁহার ইন্তেকালের পর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ছত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর উপরোক্ত মন্তব্যের পরও তিনি স্বীয় জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত করার জন্য অন্তত ছত্রিশ বৎসর সময় পাইয়াছিলেন। এখন ভাবিয়া দেখুন, হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর মন্তব্যের পরবর্তী এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কি বিপুল জ্ঞানরাশি আহরণ করিয়াছিলেন।

আবূ ওয়ায়েল হইতে আ'মাশ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আলী (রা) স্বীয় খিলাফতের সময় একবার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে হজ্জে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। তখন তিনি হাজীদের সামনে খুৎবা পাঠ করিলেন। সেখানে তিনি এক বর্ণনা মতে সূরা বাকারা ও অন্য বর্ণনামতে সূরা নূর পাঠ করত উহার তাফসীর বর্ণনা করিলেন। উক্ত তাফসীর এইরূপ অনুপম হইয়াছিল যে, রোমক, তুর্কী কিংবা কুর্দী সম্প্রদায়ের কাফিররা উহা শ্রবণ করিলেও সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিত।

হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উপরোক্ত পাণ্ডিত্যের কারণেই দেখা যায়, তাফসীকার ইসমাঈল ইব্ন আবদুর রহমান আস্ সুদ্দী আল কবীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উক্ত সাহাবীদ্বয় হইতে অধিকাংশ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। তবে অধিকাংশ

ক্ষেত্রে তিনি 'আহলে কিতাব' কর্তৃক তাঁহাদের নিকট বর্ণিত গল্প-কাহিনীও তাঁহাদের বরাত দিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। নবী করীম (সা) অবশ্য আহলে কিতাব হইতে কোন কথা বর্ণনা করিতে অনুমতি দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ 'আমার নিকট হইতে একটি বাণী পাইলেও উহা মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দাও। আর বনী ইসরাঈল হইতে কোন কিছু বর্ণনা করিতে পার। উহাতে কোন দোষ নাই। অতঃপর যে ব্যক্তি আমার নামে জ্ঞাতসারে মিথ্যা কথা চালাইবে, তাহার আবাস হইবে জাহান্নাম।' এই হাদীসটি ইমাম বুখারী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) ইয়ারমুকের যুদ্ধে আহলে কিতাবের গ্রন্থরাজী হইতে দুইখানা কিতাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে তিনি উহা হইতে বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করিতেন।

অবশ্য আহলে কিতাব হইতে প্রাপ্ত কথা ও কাহিনী দ্বারা কোন বিষয় প্রমাণিত করা যায় না। তবে (কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা) প্রমাণিত কোন বিষয় যখন আহলে কিতাবের নিকট প্রচার করা হয়, তখন দলীল হিসাবে তাহাদের কাছে উল্লেখ করা যায়। আহলে কিতাব হইতে প্রাপ্ত কথা ও কাহিনী তিন শ্রেণীর হইতে পারে। এক, কুরআন ও সুন্নাহ্ কর্তৃক সমর্থিত কথা ও কাহিনী। এই শ্রেণীটি বিশুদ্ধ তাই গ্রহণযোগ্য। দুই, কুরআন ও সুন্নাহ্ কর্তৃক মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত কথা ও কাহিনী। ইহা সুস্পষ্টত প্রত্যাখ্যেয়। তিন, কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা যেসব কথা ও কাহিনী সমর্থিত কিংবা অসমর্থিত কোনটাই হয় নাই। এই শ্রেণীর ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা নিরপেক্ষ হইবে। আমরা উহাকে সত্য বলিয়া যেমন গ্রহণ করিব না, তেমনি মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানও করিব না। তবে উপরের হাদীসের ভিত্তিতে আমরা উহা অপরের কাছে বর্ণনা করিতে পারি, তাহাতে কোন দোষ নাই। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব কথা ও কাহিনী দ্বারা দীন ইসলামের কোন উপকার সাধিত হয় না। যেহেতু স্বয়ং আহলে কিতাবের মধ্যে উহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আসহাবে কাহাফের নাম, তাহাদের কুকুরের রং, তাহাদের সংখ্যা, হযরত মূসা (আ)-এর লাঠির মূল বৃক্ষের নাম, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হাতে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব পাখী মারিয়া আবার জীবিত করিলেন সেইগুলির নাম, বনী ইসরাঈলদের নিহত ব্যক্তির হন্তা নির্ধারণার্থে জবাই করা গাভীর কোন অঙ্গ কাটিয়া উহার গাত্রে আঘাত করা হইল, উহার পরিচয়, কোন বৃক্ষ হইতে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর সহিত বাক্যালাপ করিলেন তাহার নাম ইত্যাদি লইয়া তাফসীকারদের ভিতর মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। অথচ এইগুলি নির্ণয়ের মধ্যে মানুষের ইহত্রিক বা পারত্রিক কোন লাভ নিহিত নাই। আর এই কারণেই আল্লাহ্ পাক উহা নির্ণয় করিয়া দেন নাই। তবে এই সব মতভেদ উল্লেখ করায় কোন দোষ নাই। যেমন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাও অনুরূপ মতভেদ উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'তাহাদের একদল বলে, আসহাবে কাহাফ তিনজন ছিলেন, আর চতুর্থটি ছিল তাহাদের কুকুর। অন্য দল বলে, তাহারা পাঁচজন ছিলেন, ষষ্ঠটি ছিল তাহাদের কুকুর। উভয় দলই অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িয়া থাকে। আবার একদল বলে, তাহারা সাতজন ছিলেন, অষ্টমটি ছিল কুকুর। তুমি বলিয়া দাও, তাহাদের সঠিক সংখ্যা আমার প্রতিপালক প্রভুই ভাল জানেন। স্বল্প সংখ্যক লোকই তাহাদের সঠিক সংখ্যা জ্ঞাত রহিয়াছে। তুমি তাহাদের সংখ্যা সম্পর্কে ভাসাভাসা আলোচনা করিতে পার। এই সম্পর্কে গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইও না। এমনকি তাহাদের নিকট ইহা লইয়া প্রশ্ন করিও না।'

উক্ত আয়াতে তৃতীয় শ্রেণীর কথা ও কাহিনীর ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কিংবা অকরণীয় বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'আলা আসহাবে কাহাফের সংখ্যা সম্বন্ধীয় তিনটি অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন। উহাদের প্রথম দুই অভিমতকে দুর্বল বলিয়া ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। তৃতীয় অভিমত সম্পর্কে প্রতিকূল বা অনুকূল কোন ফয়সালা প্রদান করেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, তৃতীয় অভিমত সত্য ও সঠিক। কারণ, উহা মিথ্যা ও বাতিল হইলে পূর্ববর্তী দুই অভিমতের ন্যায় উহাকেও দুর্বল বলিয়া ইঙ্গিত প্রদান করা হইত। অতঃপর বলা হইল, তাহাদের সংখ্যা জানার মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত নাই। তাই বলা হইল, 'তুমি বল, আমার রবই তাহাদের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে অধিকতর অবহিত রহিয়াছেন। স্বল্প সংখ্যক লোকই তাহাদের সঠিক সংখ্যা জানে। তুমি তাহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে শুধু হালকা আলোচনা করিতে পার। এ ব্যাপারে গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইও না। আর এই সম্বন্ধে তাহাদের কাহাকেও প্রশ্ন করিও না।' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে স্বল্প সংখ্যক বান্দাকে তাহাদের সঠিক সংখ্যা জানাইয়াছেন তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ তাহাদের সঠিক সংখ্যা জানে না। তাই তিনি অভিমত ব্যক্ত করিলেন, যে কাজে কোন লাভ নাই তাহাতে শক্তি ব্যয় করিয়া নিজকে কষ্ট দিও না আর এই সম্বন্ধে তাহাদিগকে প্রশ্ন করিতে যাইও না। কারণ, তাহারা এই সম্বন্ধে আনুমানিক কথা ছাড়া কিছুই জানে না।

এই প্রেক্ষিতে জানা গেল, কোন ব্যাপারে মতভেদ উল্লেখ করার সর্বোত্তম পন্থা এই যে, সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত যাবতীয় অভিমত উল্লেখপূর্বক উহাদের মধ্যকার বাতিল ও ভ্রান্ত অভিমতকে চিহ্নিত করিয়া সঠিক ও নির্ভুল অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করা। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অভিমতের পরিণতি বর্ণনা করিয়া মতভেদ জনিত তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটাইতে হইবে এবং অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় কাজে মনোনিবেশ পূর্বক সময়ের অপচয় রোধের পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। তাই যে ব্যক্তি কোন বিরোধমূলক ব্যাপারের যাবতীয় অভিমত উল্লেখ না করিয়া প্রতিকূল অভিমতগুলি বর্জন করে সে ব্যক্তি অপরাধী। কারণ, হয়ত তাহার বর্জিত অভিমতই সঠিক ও নির্ভুল অভিমত ছিল। এমতাবস্থায় তাহার পাঠক বা শ্রোতা তাহারই কারণে সত্য ও সঠিক বিষয়টি জানিবার ও উহা গ্রহণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত রহিল। তেমনি যে ব্যক্তি বিরোধীয় বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত যাবতীয় অভিমত উল্লেখপূর্বক উহাদের সঠিক ও ভ্রান্ত অভিমতকে চিহ্নিত করে না, সে ব্যক্তিও অপরাধী। কারণ, সে তাহার পাঠক বা শ্রোতাকে সঠিক ও ভ্রান্ত বিষয়টি জানিতে সাহায্য করে না। অনুরূপ যে ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে ভ্রান্ত অভিমতকে সত্য বলিয়া থাকে, সে ভ্রান্ত ধারণার পোষক ও প্রচারক। আবার যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মতভেদের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, সে ভ্রান্ত। তেমনি যে ব্যক্তি মূলত একই বস্তুকে বাহ্যত বিভিন্নরূপে দেখাইয়া বিভিন্নমতের উল্লেখ করে সেও ভ্রান্ত। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর লোক অপ্রয়োজনীয় কার্যে মূল্যবান সময়ের অপচয় ঘটায়। ইহারা অকার্যকর ও উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ পোষাক পরিধানকারী ব্যক্তি সমতুল্য। আল্লাহ্ই ন্যায় পথ অনুসরণের তওফীক দিয়া থাকেন।

কুরআনের কোন বিশেষ আয়াতের তাফসীর যদি কুরআন বা সুন্নাহ্র কোনটিতে না মিলে তখন কি করিতে হইবে? এ ব্যাপারে বিপুল সংখ্যক ইমামের অভিমত এই যে, এমতাবস্থায় তাবেঈদের (সাহাবায়ে কিরামদের দর্শন লাভকারী মু'মিনদের) তাফসীর গ্রহণ করিতে হইবে। প্রসঙ্গত বিখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ ইব্ন জাবিরের নাম উল্লেখ করা যায়। তাফসীর শাস্ত্রে তাঁহার

বিশেষ বুৎপত্তি ও পারদর্শীতা ছিল। উক্ত মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন সালেহ এবং তাঁহার নিকট হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ বলেন, আমি তিনবার সম্পূর্ণ কুরআনের তিলাওয়াত ও তাৎপর্য হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি। প্রতিটি আয়াত তিলাওয়াতের পর তাঁহাকে থামাইয়া উহার অর্থ ও তাৎপর্য তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছি।

ইব্‌ন আবূ মালিকা হইতে ধারাবাহিকভাবে উসমান মক্কী, তালিক ইব্‌ন গানাম, আবূ কুরাইব ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমাম ইব্‌ন মালিকা বলেন, আমি মুজাহিদকে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট কুরআন মজীদের তাফসীর জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়াছি। তখন তাঁহার কাছে লিখিত কুরআন মজীদ মওজুদ থাকিত। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁহাকে বলিতেন, 'লিখিয়া লও'। এভাবেই তিনি তাঁহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ কুরআনের তাফসীর অবহিত হইয়াছিলেন। এই কারণেই হযরত সুফিয়ান আছ ছওরী বলিতেন, 'মুজাহিদ হইতে তোমার কাছে তাফসীর পৌঁছিলে উহা তোমার জন্যে যথেষ্ট।"

প্রসঙ্গত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, ইকরামা (ইব্‌ন আব্বাসের (রা) ভৃত্য), আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ, হাসান বসরী, মাকরূক ইব্‌ন আজদা', সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, আবুল আলীয়া, রবী' ইব্‌ন আনাস, কাতাদাহ, যিহাক ইব্‌ন মুজাহিদ প্রমুখ তাবেঈ, তাবে' তাবেঈ ও তৎপরবর্তী ব্যক্তিবৃন্দের নাম উল্লেখ্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশেষ কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় তাহাদের বক্তব্যসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বক্তব্যসমূহের ভিতর শাব্দিক বিভিন্নতার দরুণ অজ্ঞ ব্যক্তিরা সেগুলিকে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ভাবিয়া বসিয়াছে। তাই তাহারা সেইগুলিকে পরস্পর বিরোধীরূপেই অপরের কাছে উপস্থাপন করিয়াছে। মূলত সেইগুলি আদৌ পরস্পর বিরোধী নহে। বরং কেহ হয়ত কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সহিত অবিচ্ছেদ্য অনুরূপ কোন বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, আবার কেহ হয়তো সরাসরি বিষয়টিই উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। এমতাবস্থায় উভয়ের ভিতরে কোন তাৎপর্যগত বিরোধ থাকিতে পারে না। এই কথাটুকু উপলব্ধি করা যে কোন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরই কর্তব্য। আল্লাহই সঠিক পথের সন্ধানদাতা।

তাবেঈদের অভিমত গ্রহণের প্রশ্নে শু'বা ইব্‌ন হাজ্জাজ প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ বলেন, 'যে ক্ষেত্রে শরীআতের কম গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়েই তাবেঈদের অভিমত গ্রহণ করা অপরিহার্য নহে, সেক্ষেত্রে তাফসীরের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে তাহাদের অভিমত গ্রহণ কিরূপে অপরিহার্য হইতে পারে ? তাই তাবেঈদের তাফসীর গ্রহণ করা অপরের জন্য অপরিহার্য নহে।' বস্তুত ইহাই সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত অভিমত। তবে কোন বিষয়ে তাঁহারা যদি অভিন্ন মত পোষণ করেন, উহা গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে অপরিহার্য। পক্ষান্তরে তাহারা যদি বিভিন্ন মত পোষণ করেন, তখন এক তাবেঈর মত যেরূপ অন্য তাবেঈর গ্রহণ করা অপরিহার্য নহে, তেমনি অন্য কাহারও জন্যেও উহা গ্রহণ করা অপরিহার্য হয় না। এইরূপ পরিস্থিতিতে আমাদিগকে কুরআন, সুন্নাহ, আছার কিংবা আরবী অভিধানের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

প্রসঙ্গত আল-কুরআনের শুধুমাত্র বুদ্ধিনির্ভর ব্যাখ্যা প্রদানের বিষয়টি বিবেচ্য। শুধু বুদ্ধির সাহায্যে তাফসীর করা হারাম। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আব্দুল আ'লা ইব্‌ন আমের ছা'লাবী, সুফিয়ান, ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশর ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি কিংবা অনুমানের সাহায্যে কুরআনের ব্যাখ্যা করিবে দোযখ তাহার ঠিকানা হইবে।' ইমাম

তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈও উক্ত হাদীস সুফিয়ান পর্যন্ত অভিন্ন রাবী এবং তাঁহার পর হইতে ভিন্ন রাবীর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদও হাদীসটি আবদুল আ'লা পর্যন্ত অভিন্ন রাবী এবং তাঁহার পর হইতে ভিন্ন রাবীর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী রাবী হইলেন আবূ আওয়ানা ও মুসাদ্দাদ। এই সনদে হাদীসটি মারফূ' হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ' বলিয়াছেন। ইব্ন জরীর উহাকে আবদুল আ'লা পর্যন্ত অভিন্ন রাবী এবং তাঁহার পর হইতে ভিন্ন রাবীর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী আবার অন্যত্র হানীফের বরাত দিয়া উহাকে 'মাওকুফ হাদীস' অর্থাৎ ইব্ন আব্বাসের উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ তিনি সাঈদ ইব্ন জুবায়র পর্যন্ত অভিন্ন রাবী এবং তাঁহার পর হইতে ধারাবাহিকভাবে বকর, লায়ছ ও মুহাম্মদ ইব্ন হামীদের বরাত দিয়া উহাকে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

হযরত জুনদুব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইমরান আল জওনী, সাহ্ল, হাইয়ান ইব্ন হিলাল, আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম, আম্বারী ও ইব্ন জরীর বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধির সাহায্যে কুরআনের তাফসীর বর্ণনা করে, সে ভ্রান্তির শিকার হয়।' আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈ উক্ত হাদীসটি সুহায়ল ইব্ন আবূ হায্মের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহাকে অসমর্থিত হাদীস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী 'সুহায়ল' কোন কোন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক বিরূপভাবে সমালোচিত হইয়াছে। কোন কোন রিওয়ায়েতে রহিয়াছে, 'যে ব্যক্তি নিজ বুদ্ধিতে আল্লাহ্র কিতাবের তাফসীর বর্ণনা করে, সে সঠিক তাফসীর করিলেও ভ্রান্তিতে পতিত।' নিজ বুদ্ধিতে সঠিক তাফসীর করিলেও সে এই কারণে ভ্রান্ত যে, অনুমানের ভিত্তিতে সে কোন বিষয়কে সত্য ও সঠিক বলিয়া দাবী করে। বর্ণিত তাফসীর সঠিক হইলেও তাহার অনুসৃত পন্থাটি ভ্রান্ত। যেহেতু কুরআনের তাফসীর কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা করিবার জন্য সে আদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং উহা লঙ্ঘন করিয়া সে সঠিক তাফসীর করা সত্ত্বেও ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়াছে। যেমন, কোন বিচারক অনুমানের ভিত্তিতে বিবদমান বিষয়ে রায় প্রদান করিলে সে জাহান্নামী হইবে। অবশ্য যে ব্যক্তির অনুমানভিত্তিক ব্যাখ্যা সঠিক হইবে, তাহার অপরাধ অনুমানভিত্তিক ভুল ব্যাখ্যাদানকারীর চাইতে কম। আল্লাহই ভাল জানেন।

কোন ব্যক্তি কাহারও বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করিয়া উহার সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিলে আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা অনুযায়ী সে মিথ্যুক সাব্যস্ত হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করিতে না পারিলে তাহারা (ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপকরা) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মিথ্যাবাদী হইবে।' এখানে দেখা যাইতেছে যে, অভিযোগকারী সত্য অভিযোগ উত্থাপন করিলেও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় মিথ্যাবাদী ঘোষিত হইয়াছে। কারণ, যেভাবে অভিযোগটি উত্থাপন তাহার জন্য বৈধ নহে, সে তাহাই করিয়াছে। যদিও ব্যাপারটি সত্য। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

উপরোক্ত কারণে পূর্বসূরী একদল বিশেষজ্ঞ অজ্ঞাত বিষয়ের তাফসীর করা হইতে সর্বদা বিরত থাকিতেন। আবূ মুআম্মার হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবার্রাহ, সুলায়মান ও শু'বা বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিয়াছেন, যদি আমি না জানিয়া অনুমানের ভিত্তিতে আল্লাহ্র কিতাব সম্বন্ধে কিছু বলি, তাহা হইলে কোন্ মাটি আমাকে বুকে নিবে আর কোন্ আকাশই বা আমাকে ছায়া দিবে?

ইবরাহীম তায়মী হইতে ধারাবাহিকভাবে আওয়াম ইব্‌ন হাওশাব, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ও আবূ উবায়দ কাসিম সালাম বর্ণনা করিয়াছেন, একবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট وَفَاكِهَةً وَأَبًّا আয়াতখণ্ডের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, না জানিয়া অনুমানের ভিত্তিতে আল্লাহ্ কিতাব সম্বন্ধে আমি যদি কিছু বলি, তাহা হইলে কোন্ যমীন আমাকে বুকে ধারণ করিবে আর কোন্ আসমান আমাকে ছায়া দিবে?

উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহ বিচ্ছিন্ন সনদে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হামীদ, ইয়াযীদ ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন, একদিন হযরত উমর (রা) মিম্বরে দাঁড়াইয়া وَفَاكِهَةً وَأَبًّا আয়াতাংশ পাঠ করিয়া বলিলেন, الفاكهة। (ফল) আমাদের নিকট জ্ঞাত; কিন্তু الأب শব্দের তাৎপর্য কি? অতঃপর নিজেই নিজেকে বলিলেন, 'ওহে উমর! ইহা অহেতুক প্রচেষ্টা।' হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ, সুলায়মান ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ একদিন আমরা হযরত উমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার জামার পৃষ্ঠভাগে চারিটি তালি ছিল। তিনি وَفَاكِهَةً وَأَبًّا আয়াতাংশ তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন, الأب শব্দের তাৎপর্য কি? অতঃপর নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ওহে উমর! ইহা অহেতুক প্রচেষ্টা, উহা না জানিলে তোমার কি ক্ষতি হইবে?"

উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত الأب শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর অজ্ঞতার তাৎপর্য এই যে, তাঁহারা উহার ধরণ ও শ্রেণী সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন এবং উহাই জানিতে আগ্রহী হইয়াছিলেন। নতুবা الأب শব্দের অর্থ যে এক শ্রেণীর তৃণ তাহা সর্বজনবিদিত ব্যাপার। অনুরূপ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا আয়াতাংশে উল্লেখিত حَبٌّ শব্দটির অর্থ শস্য হইলেও উহা কোন্ শ্রেণীর শস্য তাহা অজ্ঞাত রহিয়াছে।

ইব্‌ন আবূ মালিকাহ হইতে ক্রমাগত আইয়ুব ইব্‌ন আলীয়াহ্, ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এমন একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল যাহা সম্পর্কে অন্য কাহারো নিকট প্রশ্ন করা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ উহার উত্তর প্রদান করিতেন। কিন্তু হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) উক্ত আয়াত সম্বন্ধে কিছু বলিতে অসম্মতি জানাইলেন। উপরোক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ্।

ইব্‌ন আবূ মালিকাহ হইতে ক্রমাগত আইয়ুব, ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন যে, একদা জনৈক ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত এক হাজার বৎসরের সমান দিন সম্পর্কে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট প্রশ্ন করিলে তিনি তাহাকে পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, কুরআনে বর্ণিত পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান দিনটি কি? লোকটি বলিল, আমি তো উহা আপনার নিকট জানিতে চাহিতেছি। তিনি তখন বলিলেন, উপরোক্ত দিন দুইটি হইল কুরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলার উল্লেখিত দিন। আল্লাহ্ই উহাদের সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আল্লাহ্র কিতাব সম্বন্ধে যাহা জানিতেন না, তাহা অনুমান করিয়া বলা পছন্দ করিতেন না।

ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম হইতে ধারাবাহিকভাবে মাহদী ইব্‌ন মায়মূন, ইব্‌ন আলীয়াহ্, ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ একদা তালিক ইব্‌ন হাবীব হযরত

জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া একটি আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত জুনদুব (রা) তাহাকে বলিলেন- 'তুমি মুসলিম হইয়া থাকিলে তোমাকে কসম দিয়া বলিতেছি, (এই ব্যাপারে আমার অজ্ঞতার কারণে রাগ করিয়া) তুমি আমার নিকট হইতে উঠিয়া যাইও না।[১]

ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ হইতে লায়ছ বর্ণনা করেন, হযরত সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব (রা) কুরআন মজীদ সম্বন্ধে যতটুকু জানিতেন শুধু ততটুকুই বলিতেন, তিনি না জানিয়া অনুমানের ভিত্তিতে কিছুই বলিতেন না।

আমর ইব্‌ন মুর্‌রা হইতে শু'বা বর্ণনা করেন ঃ একদিন এক ব্যক্তি হযরত সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব (রা)-এর নিকট কুরআন পাকের একটি আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, 'আমার নিকট কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিও না; বরং সেই বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাসা কর যাহার সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস রহিয়াছে যে, তিনি কুরআন মজীদের সকল রহস্যই সুপরিজ্ঞাত (অর্থাৎ ইকরামার নিকট জিজ্ঞাসা কর)।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ ইয়াযীদ হইতে ইব্‌ন শাওয়াব বর্ণনা করেন যে, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ ইয়াযীদ বলেন ঃ 'আমরা সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেবের নিকট হালাল-হারাম সম্পর্কিত প্রশ্ন করিতাম। তিনি তাঁহার যুগের বিজ্ঞতম ব্যক্তি ছিলেন। (তাই এতদসম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি অসম্মত হইতেন না।) কিন্তু আমরা তাঁহার নিকট কুরআন পাকের কোন আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করিলে তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন- যেন উহা শুনিতে পান নাই।'

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ, আহমদ ইব্‌ন উবাদা আয্‌যাদী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর বলেন ঃ 'আমি মদীনা শরীফের ফকীহ্ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে দেখিয়াছি, তাহারা নিজদিগকে কুরআন মজীদের তাফসীর বর্ণনা করিবার অযোগ্য মনে করিয়া উহা এড়াইয়া চলিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব এবং নাফে'র নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিশাম ইব্‌ন উরওয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে লায়ছ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালেহ ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন, 'আমি (হিশাম) আমার পিতাকে (উরওয়া) কখনও কুরআন মজীদের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে শুনি নাই।'

মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন হইতে আইয়ূব ইব্‌ন 'আওন ও হিশাম আলুস্তোয়াঈ বর্ণনা করেন- 'আমি একদিন উবায়দা সালমানীর নিকট কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, কুরআনের কোন্ আয়াত কোন্ উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে তাহা যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়াছেন। এখন আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চল এবং দৃঢ়তার সহিত যথাবিহিত আমল ও আচরণ করিতে থাক।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার হইতে ক্রমাগত ইব্‌ন 'আওন, মুআয ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন ঃ 'ইব্‌ন মুসলিম বলেন, আল্লাহ্‌র কালামের কোন আয়াতের আলোচনার পূর্বে উহার আগে পরের আয়াত সম্বন্ধে গভীরভাবে গবেষণা করিও।'

---

১. মূল রিওয়ায়েতটিতে হযরত জুনদুব (রা) বলেন-

اخرج عليك ان كنت مسلما لما قمت عنى او قال ان تجالسنى

মুগীরা হইতে ধারাবাহিকভাবে হাশিম ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন, ইবরাহীম বলিয়াছেন, আমাদের যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হইতে বিরত থাকিতেন। তাঁহারা উহাকে ভীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আস সাফ্ফাহ হইতে শু'বা বর্ণনা করিয়াছেন যে, শা'বী বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমার কাছে কুরআনের প্রতিটি আয়াত সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতেছে আল্লাহ্র নিকট হইতে জানিয়া বর্ণনা করার কাজ।' (তাই তিনি উহার উত্তর দানে বিরত ছিলেন)।

শা'বী হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন আবূ যায়দাহ্, হাশিম ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন, মাসরূক বলিয়াছেন, 'তোমরা কুরআন মজীদের তাফসীর বর্ণনা করিবার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিও। কারণ, উহা হইল আল্লাহ্র নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়া বর্ণনা করার কাজ। উপরে প্রাথমিক যুগের ফকীহ ও ইমামবৃন্দ কর্তৃক অনুসৃত আল-কুরআনের তাফসীর সম্পর্কিত যে নেতিবাচক ভূমিকা বর্ণিত হইল, উহার ব্যাখ্যা হইল এই যে, কুরআন মজীদ সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা জানিতেন না, অনুমানের ভিত্তিতে তাহা বলিতেন না। পক্ষান্তরে শরী'আত ও অভিধানের সাহায্যে জ্ঞাত বিষয়কে মানুষের নিকট প্রকাশ করায় কোন দোষ নাই। তাই দেখা যায়, উল্লিখিত ফকীহ ও ইমামগণসহ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের কথা ও কাজে বিরোধ নাই। কারণ, তাঁহারা যাহা বলিতেন তাহাই বলিতেন এবং যাহা জানিতেন না তাহা অনুমান করিয়া বলিতেন না। মূলত ইহাই মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। অজ্ঞাত বিষয় অনুমান করিয়া বলা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি জ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করা কর্তব্য। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ 'তোমরা উহাকে (শরী'আতকে) মানুষের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবে এবং উহাকে গোপন করিবে না।'

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি কোন ইলম বা জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবার পর উহা গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন তাহাকে আগুনের লাগাম পরানো হইবে।'

উক্ত হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গত নিম্নোক্ত হাদীসটি পর্যালোচনা করা সমীচীন হইবে।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়াহ্, হিশাম ইব্ন উরওয়াহ্, আবূ জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ যুবায়রী, মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ ইব্ন উসামা, আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীয ও ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ 'হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-কে যে সকল আয়াতের ব্যাখ্যা শিখাইতেন, উহা ভিন্ন অন্য কোন আয়াতের ব্যাখ্যা নবী করীম (সা) বর্ণনা করিতেন না।'

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়াহ, হিশাম ইব্ন উরওয়াহ, জা'ফর ইব্ন খালিদ, মাআন ইব্ন ঈসা ও আবূ বকর, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ তারসূমী ও ইমাম জা'ফর ইব্ন জারীর বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মূলত উপরোক্ত হাদীসটি 'দুর্বল' ও উহা সহীহ হাদীসের পরিপন্থী বিধায় 'মুনকার' এবং অন্য কোন সনদে বর্ণিত না হওয়ায় 'গরীব'। শেষোক্ত সনদের অন্যতম 'রাবী' জা'ফর হইতেছে

ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন যুবায়ের ইব্‌ন আওয়াম আল কুরায়শী আয্ যুবায়রী। তাহার ব্যাপারে ইমাম বুখারীর মন্তব্য, হইল, 'তাহার বর্ণিত হাদীসের সমর্থনে অন্য কোন হাদীস পাওয়া যায় না।' হাফিজ আবুল ফাতাহ ইযদী তাহার সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, 'তাহার বর্ণিত হাদীস দুর্বল ও সহীহ হাদীসের বিরোধী হইয়া থাকে।'

ইমাম আবূ জা'ফর নিম্ন মর্মে উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন ঃ

'যে সকল আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে না আসা পর্যন্ত নবী করীম (সা)-এর পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভবপর ছিল না, উল্লেখিত হাদীসটি কেবল সেই সকল আয়াতের বেলায় প্রযোজ্য। তিনি শুধু সেই আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের ব্যাপারে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর উপর নির্ভর করিতেন।'

আলোচ্য হাদীসটি বিশুদ্ধ হইলে উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি সঠিক। কারণ; কুরআন পাকের কিছু কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন অন্য কেহ জানে না। তেমনি কতকগুলি আয়াতের ব্যাখ্যা শুধু বিশেষজ্ঞ আলেমগণই জানিতে পারেন। কতগুলি আয়াতের ব্যাখ্যা আরবী ভাষাভাষী আরবগণ জানিতে পারে এবং কতিপয় আয়াতের ব্যাখ্যা আরবী ভাষার সাহায্যে সকলেই জানিতে পারে। শেষোক্ত শ্রেণীর আয়াতের ব্যাখ্যা না বুঝার কাহারও কোন অজুহাত থাকিতে পারে না।

আবুয্ যানাদ হইতে ক্রমাগত সুফিয়ান, মুআম্মাল, মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশর ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ 'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– তাফসীরের চারিটি প্রকার রহিয়াছে। এক প্রকারের তাফসীর হইতেছে যাহা আরবী ভাষাবিদগণ ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে পারে। আরেক প্রকারের তাফসীর যে কোন আরবী ভাষা জ্ঞাত ব্যক্তিই বুঝিতে পারে। তাই তাহা না বুঝিবার পক্ষে কোন অজুহাত থাকিতে পারে না। অন্য প্রকার তাফসীর শুধু বিশেষজ্ঞ আলেমগণই বুঝিতে পারে। আরেক প্রকার তাফসীর আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন কেহই জানে না।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত উম্মে হানীর গোলাম আবূ সালেহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন সায়েব ক্বালবী, আমর ইব্‌ন হারছা, ইব্‌ন ওহাব, ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা সাদাফী ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, কুরআন মজীদের বিষয়বস্তুকে চারিটি স্তরে বিভক্ত করিয়া নাযিল করা হইয়াছে। এক স্তর হইতেছে হালাল-হারাম সম্পর্কিত সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাহা না বুঝিবার পক্ষে কাহারও কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। আরেক স্তর হইতেছে যাহা আরবী ভাষাবিদগণ ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। আরেক স্তর হইতেছে যাহা শুধু বিশেষজ্ঞ আলেমগণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন। অন্য স্তর হইতেছে 'মুতাশাবিহা আয়াত' যাহার অর্থ তাৎপর্য আল্লাহ্ ছাড়া কেহই জানে না। যে ব্যক্তি উহার অর্থ ও তাৎপর্য জানে বলিয়া দাবী করে, সে মিথ্যাবাদী।'

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন, উপরোক্ত হাদীসটির সূত্র দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। কারণ, উহার অন্যতম বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইব্‌ন সায়েব ক্বালবীর বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হয় না। তবে ইহা হইতে পারে যে, উক্ত বর্ণনাকারী ভুলক্রমে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উক্তিকে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী (হাদীসে মারফু') বলিয়া ফেলিয়াছেন। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

প্রয়োজনীয় কথা

হুমাম হইতে ধারাবাহিকভাবে হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল, কাযী ইসমাঈল ইব্‌ন ইসহাক ও আবূ বকর ইব্‌ন আম্বারী বর্ণনা করেন ঃ "কাতাদাহ বলিয়াছেন, হিজরতের পর অবতীর্ণ (মাদানী) সূরাসমূহ হইতেছে– বাকারা, আলে-ইমরান, নিসা, মায়িদা, বারাআহ্ (তাওবা), রা'আদ, নাহ্‌ল, হুজ্জ, নূর, আহযাব, মুহাম্মদ, ফাত্‌হ, হুজুরাত, আর-রহমান, হাদীদ, মুজাদালা, হাশর, মুমতাহিনা, সফ, জুমুআ, মুনাফিকূন, তাগাবুন, তালাক, সূরা তাহরীমের প্রথম দশ আয়াত, সূরা যিল্‌যাল ও নস্‌র। অবশিষ্ট সূরাসমূহ হিজরতের পূর্বে (মক্কী) অবতীর্ণ হইয়াছে।"

কুরআন মজীদের আয়াতের সংখ্যা সর্বসম্মতভাবে অন্যূন ছয় হাজার। তবে উহার সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের ভিতর মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন, ছয় হাজার। কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত চারিটি। কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত চৌদ্দটি। কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত উনিশটি। কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত পঁচিশটি। কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত ছাব্বিশটি। আবার কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত ছত্রিশটি।

আবূ আমর আদ্দানী স্বীয় গ্রন্থ 'আল-বয়ান' এ উপরোক্ত তথ্য প্রদান করিয়াছেন।

আতা ইব্‌ন ইয়াসার হইতে ফযল ইব্‌ন শাযান কর্তৃক বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী কুরআন মজীদের শব্দ সংখ্যা হইতেছে সাতাত্তর হাজার চারিশত উনচল্লিশ।

মুজাহিদ হইতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কাছীরের বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী কুরআন মজীদের অক্ষরের সংখ্যা হইতেছে তিন লক্ষ একুশ হাজার একশত আশি। ফযল ইব্‌ন আতা ইব্‌ন ইয়াসারের মতে উহার সংখ্যা হইতেছে তিন লক্ষ তেইশ হাজার পনের।

সালাম আবূ মুহাম্মদ আল হাম্মানী বলেন– একদা হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ কুরআন মজীদের কারী, হাফিজ এবং লেখকবৃন্দকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, 'কুরআনে কতগুলি অক্ষর আছে তাহা হিসাব করিয়া তোমরা আমাকে বল।' আমরা তাঁহার আদেশক্রমে হিসাব করিয়া দেখিলাম, উহাদের সংখ্যা হইতেছে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার সাতশত চল্লিশ। হাজ্জাজ বলিলেন, 'উহার মধ্যস্থল কোন্‌টি তাহা আমাকে জানাও।' হিসাব করিয়া দেখা গেল, উহার ঠিক মধ্যস্থল হইতেছে সূরা কাহাফের অন্তর্গত وليتلطف শব্দটির শেষ অক্ষর 'ফা' ও তৎপরবর্তী ولايشعرن শব্দটির প্রথম অক্ষর 'ওয়াও' এর মধ্যবর্তী স্থান। কুরআন মজীদের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ হইতেছে সূরা বারাআতের প্রথম একশত আয়াতের শেষ পর্যন্ত, দ্বিতীয় এক-তৃতীয়াংশ হইতেছে সূরা শু'আরার প্রথম একশত বা একশত এক আয়াতের শেষ পর্যন্ত এবং শেষ তৃতীয়াংশ হইতেছে অবশিষ্টাংশ। কুরআন মজীদের প্রথম এক সপ্তমাংশ হইতেছে فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ صَدَّ আয়াতাংশের শেষ অক্ষর 'দাল' পর্যন্ত। উহার দ্বিতীয় এক সপ্তমাংশ হইতেছে তাহার পর হইতে সূরা আ'রাফের অন্তর্গত اُولٰئِكَ حَبِطَتْ আয়াতাংশের শেষ অক্ষরে 'তা' পর্যন্ত। উহার তৃতীয় এক সপ্তমাংশ হইতেছে সূরা রা'আদের অন্তর্গত اُكُلُهَا শব্দের শেষ 'আলিফ' পর্যন্ত। উহার চতুর্থ এক সপ্তমাংশ হইতেছে তাহার পর হইতে সূরা হজ্জের অন্তর্গত جَعَلْنَا مَنْسَكًا আয়াতাংশের শেষ 'আলিফ' পর্যন্ত। উহার পঞ্চম এক-সপ্তমাংশ হইতেছে তাহার পর হইতে সূরা আহযাবের অন্তর্গত وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا

مُؤْمِنَةً আয়াতাংশের শেষ অক্ষর 'গোল তা' পর্যন্ত। উহার ষষ্ঠ সপ্তমাংশ হইতেছে তাহার পর হইতে সূরা ফাত্‌হের অন্তর্গত اَلظَّانِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ আয়াতাংশের 'ওয়াও' পর্যন্ত। উহার সপ্তমাংশ হইতেছে অবশিষ্টাংশ। পরিশেষে সালাম আবূ মুহাম্মদ বলেন, আমি চারি মাস সময় ব্যয় করিয়া উপরোক্ত তথ্য লাভ করি।'

কথিত আছে, হাজ্জাজ প্রতি রাত্রে কুরআন মজীদের এক-চতুর্থাংশ তিলাওয়াত করিতেন। তাঁহার তিলাওয়াতের প্রথম এক-চতুর্থাংশ ছিল সূরা আন'আমের শেষ পর্যন্ত। দ্বিতীয় এক চতুর্থাংশ তাহার পর হইতে সূরা কাহাফের وليتلطف শব্দ পর্যন্ত। তৃতীয় এক-চতুর্থাংশ ছিল তাহার পর হইতে সূরা যুমারের সমাপ্তি পর্যন্ত। চতুর্থ এক-চতুর্থাংশ ছিল তাহার পর হইতে কুরআন মজীদের অবশিষ্টাংশ।

শায়খ আবূ আমর আদ্‌দানী স্বীয় গ্রন্থ 'আল-বয়ান'-এ এইগুলি সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

উপরে কুরআনের অক্ষর ভিত্তিক বিভক্তির কথা আলোচিত হইয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিলাওয়াত প্রশিক্ষণের জন্য উহাকে ত্রিশ পারায় (খণ্ডে) বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রতি খণ্ডকে আবার চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে আমি কুরআন মজীদকে সাহাবা কর্তৃক বিভক্তিকরণ সম্পর্কিত হাদীসের উল্লেখ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত হযরত আওস ইব্‌ন হুযায়ফা হইতে মুসনাদে ইমাম আহমদ, সুনানে আবূ দাঊদ, সুনানে ইব্‌ন মাজাহ প্রভৃতি হাদীস সংকলনে বর্ণিত নিম্ন হাদীসটিও উল্লেখ করিতেছি।

হযরত আওস ইব্‌ন হুযায়ফা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় সাহাবাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা তিলাওয়াতের জন্য কুরআন মজীদকে কিভাবে ভাগ করেন ? তাঁহারা বলিলেন– প্রথম মনযিলে প্রথম তিনটি সূরা, দ্বিতীয় মনযিলে পরবর্তী পাঁচ সূরা, তৃতীয় মনযিলে পরবর্তী সাত সূরা, চতুর্থ মনযিলে পরবর্তী নয় সূরা, পঞ্চম মনযিলে পরবর্তী এগার সূরা, ষষ্ঠ মনযিলে পরবর্তী তের সূরা এবং সপ্তম মনযিলে সূরা কাহাফ হইতে অবশিষ্টাংশ।

সূরা শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, উহার অর্থ পৃথক ও উন্নত বিষয়। কুরআন পাকের পাঠক যেহেতু এক সূরা শেষ করিয়া আরেক সূরায় যাইতে এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উন্নীত হয়, তাই এই স্তরগুলিকে সূরা বলা হয়। আরব কবি নাবিগার নিম্নোক্ত পংক্তি হইতে সূরার অনুরূপ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়।

الم ترى ان الله اعطاك سورة - ترى كل ملك دونها يتذبذب -

'তুমি কি ভাবিয়া দেখ নাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এইরূপ একটি সূরা দান করিয়াছেন যাহার সম্মুখে প্রত্যেক রাজা প্রকম্পিত হয়?'

কেহ কেহ বলেন, সূরা অর্থ উঁচু বস্তু। যেমন নগর প্রাচীরকে سور البلد (শহর রক্ষার্থে নির্মিত উঁচু দেয়াল) বলা হয়। কুরআন পাকের প্রতিটি সূরার বিষয় বস্তুই যেহেতু অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ তাই উহা সূরা নামে অভিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, সূরা অর্থ খণ্ড, টুকরা, অংশ। যেমন পেয়ালায় অবস্থিত কোন দ্রব্যের অবিশিষ্টাংশকে اسار الاناس বলা হয়। কুরআন শরীফের প্রত্যেকটি সূরা যেহেতু উহার অংশ বা টুকরা, তাই উহা সূরা নামে অভিহিত।

সূরা শব্দের শেষোক্ত অর্থের ভিত্তিতে উহার ধাতু হইতেছে 'সীন' 'হামযাহ' ও 'রা'। سورة শব্দটি মূলত سؤرة ছিল। হামযার পূর্ববর্তী সীনের উপর পেশ থাকায় সহজ উচ্চারণের প্রয়োজনে হামযার স্থলে ওয়াও আসিয়াছে। (এরূপক্ষেত্রে আরবী শব্দ গঠনরীতিতে যদিও হামযার স্থলে ওয়াও আসা জরুরী নহে, তবে আনা যাইতে পারে।)

আবার কেহ কেহ বলেন, সূরা শব্দের অর্থ পরিপূর্ণ বস্তু। বয়স্কা উষ্ট্রীকে سورة বলা হয়। কুরআন মজীদের প্রত্যেকটি সূরা যেহেতু বিষয়বস্তুর বিচারে পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই উহা সূরা নামে অভিহিত হইয়াছে।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, সূরা শব্দের অন্যতম অর্থ পরিবেষ্টনকারী ও একত্রকারী বস্তু। নগর প্রাচীর যেহেতু নগরের ঘর-বাড়ী বেষ্টন করিয়া রাখে তাই হয়তো উহাকে سور البلد বলা হয়। যেহেতু কুরআন মজীদের প্রত্যেকটি সূরা উহার আয়াতসমূহকে পরিবেষ্টিত ও একত্রিত করিয়া রাখে, তাই উহা সূরা নামে অভিহিত হইয়াছে। سورة শব্দের বহুবচন হইতেছে سور অর্থাৎ 'ওয়াও' অক্ষরে যবর ও 'রা' অক্ষরে দুই পেশ দিয়া 'গোল তা' হযফ-করা হয়। কখনও উহার বহুবচন سورات আবার কখনও سورات হয়।

আয়াত (اية) শব্দের অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন। কুরআন পাকের প্রত্যেকটি বাক্য যেহেতু উহার পূর্বাপর বাক্য হইতে পৃথক হইবার চিহ্ন বহন করে, তাই উহাকে আয়াত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (اية) শব্দটি কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত বাক্যে চিহ্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ 'তাহার রাজ্যাধিকারী হইবার চিহ্ন এই যে, সেই সিন্দুকটি তোমাদের কাছে পৌঁছিবে।'

কবি নাবিগার নিম্নোক্ত পংক্তিতে উক্ত অর্থ প্রকাশ পায় ঃ

توهمت ايات لها فعرفتها ـ لستة اعوام وذا العام سابع

'তাহার কতগুলি চিহ্নকে আমি চিনিয়া লইয়াছিলাম। গত ছয় বছর ধরিয়া আমি সেইগুলি জানিয়া আসিয়া এখন সপ্তম বছরে উপনীত হইয়াছি।'

কেহ কেহ বলেন, আয়াত (اية) শব্দের অপর অর্থ দল বা বস্তুসমষ্টি। কুরআন মজীদের এক একটি বাক্য যেহেতু কতগুলি অক্ষরের সমষ্টি, তাই উহাকে আয়াত বলা হয়। দল বা সংঘ অর্থে আয়াত শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষায় মিলে। যেমন–

خرج القوم باياتهم

'গোত্রটি সদলবলে বাহির হইয়াছে।' অন্য উদাহরণ ঃ

خرجنا من النقيل لاحى مثلنا ـ باياتنا نزجى للقاح المطافلا

"আমরা বৎস বিশিষ্ট দুগ্ধবতী উষ্ট্রীগুলিকে ধীরে ধীরে চালনা করিতে করিতে সদলবলে গিরিবর্তদ্বয় হইতে বহির্গত হইলাম। কোন গোত্রই তখন আমাদের সমকক্ষ ছিল না।"

কেহ কেহ বলেন, আয়াত অর্থ বিস্ময়কর বস্তু। কুরআন মজীদের প্রতিটি বাক্য যেহেতু বিস্ময়কর এবং অনুরূপ দৃঢ় ভাবব্যঞ্জক বক্তব্য, শব্দবিন্যাস ও রচনা নৈপুণ্য সম্বলিত বাক্য রচনা করা মানুষের সাধ্যাতীত, তাই উহা আয়াত নামে অভিহিত হইয়াছে।

বিখ্যাত ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ সিবওয়াইর মতে, اية শব্দটি মূলত اَيَيَة ছিল। উহা شجرة শব্দের সমওযনের। হরকত বিশিষ্ট দুই 'ইয়া'র পূর্বে যবর বিশিষ্ট হামযাহ আসায় যে উচ্চারণগত জটিলতা সৃষ্টি হয় তাহা দূর করার জন্য এক 'ইয়া' আলিফে রূপান্তরিত হইয়া হামযার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ফলে اَيَيَة এখন اية হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ কাসাইর মতে اية শব্দটি মূলত اٰمنة ওযনে اَيِيَة ছিল। উচ্চারণের সুবিধার্থে প্রথম 'ইয়া'কে আলিফে পরিবর্তন করিয়া দুই আলিফের সমন্বয়ের কারণে এক আলিফ বাদ দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে اَيِيَة শব্দ অবশেষে اَيَة হইয়াছে।

খ্যাতনামা ব্যাকরণবিদ ফার্‌রার মতে اية শব্দটির মূলত اَيَّة ছিল। তাশদীদযুক্ত 'ইয়া' উচ্চারণে জটিলতার কারণে লুপ্ত হইয়া اية হইয়াছে। اية শব্দের বহুবচনে ايات - اى - ايات ব্যবহৃত হয়।

كلمة -এর অর্থ হইতেছে শব্দ। উহা দুই বা ততোধিক অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত হয়। শব্দের সর্বোচ্চ অক্ষর সংখ্যা হল দশ। দুই অক্ষরে গঠিত শব্দের উদাহরণ হইল ما ও لا এবং দশ অক্ষরের শব্দের উদাহরণ হইল ঃ

فَاَسْقَيْنَاكُمُوْهُ কিংবা اَنُلْزِمُكُمُوْهَا ও لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ একটিমাত্র শব্দ কখনও একটি আয়াত হয়। যেমন ঃ وَالْعَصْرِ - وَالضُّحٰى - وَالْفَجْرِ ইত্যাদি।

কূফার ব্যাকরণবিদদের মতে حم - يس - طه - الم প্রভৃতির প্রত্যেকটি এক একটি আয়াত। তাহারা এমনকি حم ও عسق -কে দুইটি পৃথক আয়াত মনে করেন। অন্যান্য ব্যাকরণবেত্তাদের মতে শেষোক্ত শব্দগুলি আয়াত নহে; বরং সূরার পূর্বে অবস্থিত অক্ষর সমষ্টি মাত্র।

আবূ আমর আদ্‌দানী বলেন ঃ সূরা আর-রহমানের অন্তর্গত مُدْهَامَّتَانِ শব্দটি ভিন্ন অন্য কোন শব্দ আয়াতের মর্যাদা পাইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

কুরতুবী বলেন, বিশেষজ্ঞগণের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, কুরআন মজীদে অনারবীয় ভাষার ব্যাকরণের নিয়মে একাধিক শব্দের সমাবেশ ও বিন্যাস নাই। তবে আরবীতে অনারবীয় কিছু নামবাচক বিশেষ্য রহিয়াছে। যেমন– لوط - نوح - ابراهيم ইত্যাদি। এই তিন শব্দ ভিন্ন অন্য কোন অনারবীয় শব্দ আরবীতে আছে কিনা তাহা লইয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম বাকিল্লানী ও ইমাম তাবারীর মতে আরবীতে উহা ভিন্ন অন্য কোন আজমী শব্দ নাই। তাঁহাদের মতে উহা ছাড়া যেসব শব্দ কুরআন মজীদে আজমী বলিয়া চিহ্নিত হইতেছে, মূলত উহা আরব-আজম উভয় অঞ্চলেই ব্যবহৃত হয়।

সূরা আল্-ফাতিহা

৭ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ॥

সূরা ফাতিহার নাম ফাতিহা বা ফাতিহাতুল কিতাব এইজন্য রাখা হইয়াছে যে, উহা আল্লাহ্র কিতাব কুরআন মজীদের শুরুতে অবস্থিত এবং উহার দ্বারা সকল নামাযে কিরাআত আরম্ভ করা হয় فاتحة الكتاب। (ফাতিহাতুল কিতাব) অর্থ গ্রন্থের প্রারম্ভিকা।

উহার আরেক নাম উম্মুল কিতাব। ام الكتاب। (উম্মুল কিতাব) অর্থ গ্রন্থ-জননী বা গ্রন্থের নির্যাস। হযরত আনাস (রা) বলেন, অধিকাংশ আহলে ইলম উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু হযরত হাসান ও ইব্ন সীরীন এই নাম পছন্দ করেন নাই। তাঁহারা বলেন, উম্মুল কিতাব হইতেছে লাওহে মাহফূজে সংরক্ষিত ফলক। হাসান বলেন, সুস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত (ايات محكمات) হইতেছে উম্মুল কিতাব। এইসব কারণেই তাঁহারা 'উম্মুল কুরআন' নামটি পছন্দ করেন নাই।

ইমাম তিরমিযী কর্তৃক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে– নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল 'আলামীন' হইতেছে 'উম্মুল কুরআন' 'উম্মুল কিতাব' 'আস্ সাবউল মাছানী' ও 'আল কুরআনুল আযীম'।

উক্ত হাদীসটি সহীহ। ইমাম তিরমিযী উহার সনদকে সহীহ্ বলিয়াছেন।

সূরাটির অপর নাম 'আলহামদু'। উহার আরেক নাম 'সালাত'। কারণ, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'সালাত'-কে আমার ও আমার বান্দাদের মধ্যে আধাআধি করিয়া ভাগ করিয়া লইয়াছি।' বান্দা যখন বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ। তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছে। (হাদীসে কুদসীর অংশ বিশেষ।)

হাদীসে উহার 'সালাত' নামে অভিহিত হইবার কারণ এই যে, উহা সালাতের একটি রুকন।[১]

---

১. ইমাম শাফেঈ বলেন, নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। ইমাম আবূ হানীফা বলেন, নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। ইমাম ইব্ন কাছীর ইমাম শাফেঈর ন্যায় নামাযে উহার তিলাওয়াতকে ফরয বলিয়াছেন। যাহা হউক, এইসব কারণেই উহা 'সালাত' নামে অভিহিত হইয়াছে।

সূরাটির অপর নাম الشفاء (আশ্‌শিফা) অর্থাৎ আরোগ্যদাতা, আরোগ্যর উপায় বা আরোগ্য। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ফাতিহাতুল কিতাব সর্বপ্রকার বিষক্রিয়ার শিফা। উক্ত হাদীস হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে ইমাম দারামী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

উহার আর এক নাম الرُّقْيَة (আর রুকিয়্যাহ) অর্থাৎ যাহা পড়িয়া ফুঁক দেওয়া হয়। কারণ, একদা হযরত আবূ সাঈদ (রা) জনৈক সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়িয়া বিষমুক্ত করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিরূপে জানিলে যে, উহা রুকিয়্যাহ? উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ্।

শা'বী হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উহাকে اساس القران (আসাসুল কুরআন) নাম দিয়াছেন, যাহার অর্থ কুরআনের ভিত্তি বা উহার মৌলিক অংশ। তেমনি তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমকে اساس الفاتحه (আসাসুল ফাতিহা) নাম দিয়াছেন।

সুফিয়ান ইবন উয়াইনিয়া সূরা ফাতিহাকে الواقية (আল-ওয়াকিয়া) নাম দিয়াছেন, যাহার অর্থ হইতেছে রক্ষক।

ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর নাম দিয়াছেন الكافية (আল-কাফিয়া)। অর্থাৎ প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট; কারণ, উহা কুরআন মজীদের নির্যাস বিধায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফলে সমগ্র কুরআনের প্রয়োজন উহা পূরণ করিতে পারে। পক্ষান্তরে উহাকে বাদ দিয়া কুরআনের অবশিষ্টাংশ উহার প্রয়োজন মিটাতেই পারে না। যেমন, বিচ্ছিন্ন সনদের কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, উম্মুল কুরআন অবশিষ্ট কুরআনের পরিবর্তে কাজ করিতে পারে। পক্ষান্তরে উহা ভিন্ন অন্যান্য অংশ উহার পরিবর্তে কাজ করিতে পারে না।

উহার এক নাম 'আস্‌সালাত' অর্থাৎ সালাতে অবশ্য পঠনীয় সূরা। উহার অপর নাম 'আল্ কানয্' (খনি, আকর)। আল্লামা যামাখশারী তাঁহার 'আল কাশ্‌শাফ' নামক তাফসীর গ্রন্থে উক্ত নাম দুইটি ব্যবহার করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), কাতাদাহ ও আবুল আলীয়ার মতে সূরা ফাতিহা মক্কী সূরা। পক্ষান্তরে হযরত আবূ হুরায়রা (রা), আতা ইব্ন ইয়াসার ও যুহরীর মতে উহা মাদানী সূরা। কথিত আছে, উহা দুইবার নাযিল হইয়াছে। একবার মক্কা শরীফে ও একবার মদীনা শরীফে। এই ব্যাপারে প্রথমোক্ত অভিমতই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। কারণ, সূরা ফাতিহা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ "নিশ্চয় আমি তোমাকে বারংবার পঠনীয় সাতটি আয়াত ও মহা মর্যাদাশীল কুরআন প্রদান করিয়াছি।'[১] আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম কুরতুবী বলেন, আবূ লায়ছ সমরকন্দী বর্ণনা করেন যে, সূরা ফাতিহার একার্ধ মক্কায় ও অপরার্ধ মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

উক্ত বর্ণনা অযৌক্তিক, তাই অগ্রহণযোগ্য। সূরা ফাতিহার সাত আয়াত সম্পর্কে উম্মতের ইজমা রহিয়াছে। এই ইজমার বিরুদ্ধে মাত্র দুইজনের দুইটি মত দেখা যায়। এক, আমর ইব্ন

---

১. উদ্ধৃত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সূরা ফাতিহা প্রত্যেক নামাযে বারবার পঠিত হয়। ইহা সর্বজনবিদিত যে, হিজরতের বহু পূর্বেই নামায ফরয হইয়াছে। সুতরাং হিজরতের বহু পূর্বেই যে এই সূরা মক্কা শরীফে নাযিল হইয়াছে তাহা অবধারিত সত্য।

উবায়দ বলেন, উহাতে আটটি আয়াত রহিয়াছে। দুই. হুসায়ন জা'ফী বলেন, উহাতে ছয়টি আয়াত রহিয়াছে।

কূফা নগরীর অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ, একদল সাহাবা ও তাবেঈ এবং পরবর্তী যুগের একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, بسم الله الرحمن الرحيم সূরা ফাতিহার একটি পূর্ণ আয়াত।

পক্ষান্তরে মদীনার কিরাআত বিশেষজ্ঞ ও ফকীহগণ বলেন, উহা সূরা ফাতিহার পূর্বে বা প্রথমাংশে অবস্থিত বিধায় আদৌ কোন আয়াত নহে।

কেহ কেহ বলেন, উহা পূর্ণ আয়াত নহে, আয়াতের অংশ। এতদসম্পর্কিত আলোচনা আল্লাহ্ চাহেন তো যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচিত হইবে। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার উপরে সকল কিছুই নির্ভরশীল।

সূরা ফাতিহার শব্দ সংখ্যা পঁচিশ এবং উহাতে একশত তেরটি অক্ষর রহিয়াছে। ইমাম বুখারী (র) তাফসীর সংক্রান্ত অধ্যায়ে প্রথম দিকে বলিয়াছেন ঃ

"সূরা ফাতিহাকে ام الكتب (উম্মুল কুতুব) নামে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয় যে, উহা কিতাবসমূহের (কুরআনের সূরাসমূহের) প্রারম্ভে লিখিত এবং নামাযসমূহের প্রারম্ভে পঠিত হয়।"

কেহ কেহ বলেন, কোন ব্যক্তি বা বস্তু একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুর একত্রকারী বা পরিচালক হইলে আরবী ভাষায় উক্ত বস্তু বা ব্যক্তিকে ام বলা হয়। এই কারণে মগজ বেষ্টনকারী মাথার খুলীকে বলা হয় ام الراس (উম্মুর রা'স)। যে পতাকার নীচে সেনাবাহিনী সমবেত হয় উহাকে ام (উম্মুন) বলা হয়। ইব্ন জারীর কবি যুর-রিম্মার নিম্নোক্ত পংক্তি স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে উল্লেখ করেন ঃ

على راسه ام لنا نقتدى بها - جماع امور ليس نعصى لها امرا

"উহার (বর্শার) মাথার উপর আমাদের একটি পতাকা রহিয়াছে যাহাকে আমরা নেতা মানিয়া চলি। উহা আমাদের কার্যাবলী সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল করিয়া রাখে। আমরা উহার কোন নির্দেশ অমান্য করি না।"

ইব্ন জারীর আরও বলেন, পবিত্র মক্কাকে উম্মুল কুরা (ام القرى) বলে। কারণ উহা সকল জনপদের সেরা জনপদ এবং অন্যান্য জনপদের জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করে। কেহ কেহ উক্ত নামকরণের কারণে এই বলেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য জনপদ উক্ত জনপদ হইতেই বিস্তার লাভ করিয়াছে।

সূরা ফাতিহার নাম ফাতিহা (প্রারম্ভিকা) হইবার কারণ এই যে, উহা দ্বারাই কিরাআত আরম্ভ হয় এবং সাহাবাগণ প্রথম লিপিবদ্ধ কুরআন মজীদ উহা দ্বারাই আরম্ভ করিয়াছেন। উহার এক নাম السبع المثانى (আস্ সাবউল মাছানী) অর্থাৎ বারংবার পঠনীয় সাতটি আয়াত। উহা উক্ত নামকরণের কারণ উল্লেখ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, উহা নামাযের বারংবার পঠিত হয় অর্থাৎ প্রতি রাক'আতেই উহা পাঠ করা হয়। অবশ্য المثانى শব্দের উপরোক্ত অর্থ ছাড়াও অন্য অর্থ রহিয়াছে। আল্লাহ্ চাহেন তো যথাস্থানে তাহা আলোচনা করা হইবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ আল মাকবারী, ইব্ন আবূ যিব, হাশিম ইব্ন হুশায়ম, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) সূরা ফাতিহা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, উহার নাম 'উম্মুল কুরআন' 'আস্ সাবউল মাছানী' ও 'আল্-কুরআনুল আযীম।'

ইমাম আহমদ উক্ত হাদীসটি উপরোল্লিখিত রাবী ইব্ন আবূ যিব হইতে উপরোক্ত সনদে এবং ইব্ন আমরের মাধ্যমে ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ আল মাকবারী, ইব্ন আবূ যিব, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা ও ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, সূরা ফাতিহার নাম 'উম্মুল কুরআন' 'ফাতিহাতুল কিতাব' ও 'আস্-সাবউল মাছানী।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ আল মাকবারী, নূহ ইব্ন আবূ বিলাল, আব্দুল হামীদ ইব্ন জা'ফর, আল মুআফী ইব্ন ইমরান, ইসহাক ইব্ন আব্দুল ওয়াহিদ আল মুসলী, মুহাম্মদ ইব্ন গালিব ইব্ন হারিছ ও আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদের বর্ণনা মতে হাফিজ আবূ বকর আহমদ ইব্ন মূসা ইব্ন মারদুবিয়্যাহ তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' সাতটি আয়াতের সমষ্টি। উক্ত সাত আয়াতের একটি হইল 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।' উহার নাম 'আস্সাবউল মাছানী, উম্মুল কুরআন ও আল্ কুরআনুল আযীম।'

ইমাম দারা কুতনীও উপরোক্ত হাদীসটি স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী (حديث مرفوع) হিসাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উপরোক্ত হাদীসের সনদের সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য।

ইমাম বায়হাকী হযরত আলী (কঃ), হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'তাঁহারা وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ আয়াতের অন্তর্গত سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ-এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, بسم الله الرحمن الرحيم হইতেছে সূরা ফাতিহার সাত আয়াতের এক আয়াত।'

উক্ত হাদীসের পূর্ণ বিবরণ بسم الله الرحمن الرحيم-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিবৃত হইবে।

ইবরাহীম হইতে আ'মাশ বর্ণনা করেন ঃ 'একদা হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) জিজ্ঞাসিত হইলেন– কুরআন মজীদের স্বীয় পাণ্ডুলিপিতে আপনি কেন সূরা ফাতিহা লিখেন নাই ? তিনি জবাব দিলেন– যদি লিখিতাম তাহা হইলে প্রত্যেক সূরার শুরুতেই লিখিতাম।'

আবূ বকর ইব্ন দাঊদ হযরত ইব্ন মাসঊদের উপরোক্ত জবাবের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন– অর্থাৎ যে স্থানে উহাকে নামাযে তিলাওয়াত করা হয়। (উল্লেখ্য,সাহাবাগণ নামাযে পঠনীয় অন্যান্য সূরাও প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িতেন। তাহার আগে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পড়িতেন। অতএব প্রত্যেক সূরার পূর্ববর্তী স্থানই হইতেছে সূরা সালাতের তিলাওয়াতের বা লিপিবদ্ধ করার স্থান।)

হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) আরও বলেন, যেহেতু মুসলমানদের উহা কণ্ঠস্থ রহিয়াছে, তাই উহা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করি নাই।

কেহ কেহ বলেন, 'সূরা ফাতিহা' সর্বপ্রথম নাযিল হইয়াছে। ইমাম বায়হাকী কর্তৃক সংকলিত 'দালায়েলুন নবূওত' গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে অনুরূপ তথ্য বিবৃত হইয়াছে। ইমাম বাকিল্লানীও এতদসম্পর্কিত তিনটি অভিমতের একটি অভিমত হিসাবে উহা উল্লেখ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, 'সূরা মুদ্দাছ্ছির' প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছে। হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত একটি সহীহ্ হাদীসে উক্ত তথ্য পাওয়া যায়।

অন্যদের মতে 'সূরা আলাক' প্রথম নাযিল হইয়াছে। শেষোক্ত অভিমতই সহীহ্ ও সঠিক। যথাস্থানে উহা প্রমাণসহ বিশদভাবে আলোচিত হইবে। আল্লাহ্ পাকের সাহায্য কামনা করিতেছি।

সূরা ফাতিহার ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

হযরত আবূ সাঈদ ইব্ন মু'আল্লা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাফ্স ইব্ন আসিম, খুবায়েব ইব্ন আবদুর রহমান, শু'বা, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত আবূ সাঈদ (রা) বলেন– একদিন আমার নামাযরত অবস্থায় নবী করীম (সা) আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার ডাকে সাড়া না দিয়া নামায পড়িতে থাকিলাম। নামায শেষ করিয়া তাঁহার নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আসিলে না কেন ? আমি আরয করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি নামায পড়িতেছিলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নাই ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ 'হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও রাসূল যখন তোমাদিগকে জীবনদায়ক কোন কিছুর দিকে আহবান করিবে তখন তোমরা তাঁহাদের ডাকে সাড়া দিবে।'

আমি চুপ থাকিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, 'মসজিদ হইতে তোমার বাহির হইবার পূর্বেই আমি তোমাকে অবশ্যই কুরআন মজীদের শ্রেষ্ঠতম সূরা চিনাইয়া দিব।' এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া মসজিদ হইতে বাহির হইবার আয়োজন করিলেন। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তো বলিয়াছেন, (মসজিদ হইতে নিষ্ক্রমণের পূর্বেই) আমাকে কুরআন মজীদের শ্রেষ্ঠতম সূরা চিনাইয়া দিবেন। তিনি বলিলেন– হ্যাঁ। উহা হইতেছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এবং উহাই 'আস্সাবউল মাছানী' ও 'আল-কুরআনুল আযীম'।

ইমাম বুখারী (র) উক্ত হাদীসটি উপরোল্লিখিত রাবী ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ আল কাত্তান হইতে উপরোক্ত সনদে এবং তাঁহার নিকট হইতে মুসাদ্দাদ ও আলী ইব্ন মাদানীর মাধ্যমে ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্যত্র ইমাম বুখারী, ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইব্ন মাজাহ উপরোক্ত হাদীসটি উহার অন্যতম রাবী শু'বা হইতে উক্ত সনদে এবং তাহা হইতে অন্যান্য বিভিন্ন রাবীর মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাঈদ ইব্ন মু'আল্লা, হাফ্স ইব্ন আসিম, খুবায়ব ইব্ন আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্ন মু'আয আনসারী এবং ওয়াকিদীও উপরোক্ত হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আমের ইব্ন কুরায়ের গোলাম আবূ সাঈদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'লা ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন ইয়াকূব আল খারকী এবং ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেন ঃ

'একদিন মসজিদে নববীতে হযরত উবাই ইব্ন কা'বের নামায আদায়ের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে ডাকিলেন। নামায শেষ করিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। উবাই ইব্ন কা'ব বলেন, নবী করীম (সা) তাঁহার হাত আমার হাতের উপর রাখিলেন। তখন তিনি মসজিদ হইতে বাহিরে যাইতেছিলেন। আমার হাতে হাত রাখিয়া তিনি বলিলেন, 'আমি তোমাকে এইরূপ একটি সূরা অবহিত করিব যাহার সমতুল্য সূরা না তাওরাতে, না ইন্জীলে, না কুরআনে নাযিল হইয়াছে। আশা করি উহার পূর্বে তুমি মসজিদ হইতে বাহির হইবে না।' আমি তাঁহার আশায় গতি মন্থর করিলাম। কিছুক্ষণ পর আরয করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে কোন্ সূরা জানাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ? তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'নামাযের শুরুতে তোমরা কোন সূরা তিলাওয়াত কর ?' আমি তাঁহাকে আলহামদু লিল্লাহ্ সূরাটি শেষ পর্যন্ত শুনাইলাম। তিনি তখন বলিলেন, উহা হইতেছে এই সূরা। উহাই 'আস্ সাবউল মাছানী' এবং আমার প্রতি অবতীর্ণ 'আল-কুরআনুল আযীম।'

এখানে উল্লেখ্য যে, ইমাম মালিক কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আবূ সাঈদ এবং তৎপূর্বে বর্ণিত হাদীসের রাবী আবূ সাঈদ ইব্ন মু'আল্লা একই ব্যক্তি নহেন। ইবনুল আছীর তাঁহার 'জামিউল উসূল' গ্রন্থে উভয় আবূ সাঈদকে একই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথমোক্ত আবূ সাঈদ হইতেছেন একজন আনসার সাহাবা। পক্ষান্তরে শেষোক্ত আবূ সাঈদ হইলেন একজন তাবেঈ এবং খুযাআ গোত্রের একজন গোলাম। প্রথমোক্ত হাদীসটি অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীস। পক্ষান্তরে শেষোক্ত হাদীসের রাবী আবূ সাঈদ তাবেঈ হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর সহিত সাক্ষাত লাভ করিবার এবং তাঁহার নিকট হইতে হাদীস শুনিবার সুযোগ ঘটিয়া না থাকিলে উহা বিচ্ছিন্ন সনদের (حديث منقطع) হাদীসে পরিণত হইবে। যদি অনুরূপ সুযোগ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা ইমাম মুসলিম কর্তৃক হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত নির্ধারিত শর্তসমূহে উত্তীর্ণ সহীহ ও অবিচ্ছিন্ন সনদের (حديث متصل) হাদীস বলিয়া বিবেচিত হইবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

উক্ত হাদীস হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নোক্ত সূত্রেও উক্ত হাদীস হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান, আ'লা ইব্ন আবদুর রহমান, আবদুর রহমান ইব্ন ইবরাহীম, 'আফ্ফান এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

একদিন হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) মসজিদে নামায আদায় করিতেছিলেন। নবী করীম (সা) তাহার নিকট আসিয়া ডাকিলেন, 'হে উবাই'। উবাই (রা) নবী করীম (সা)-এর প্রতি আড়চোখে তাকাইলেন, কিন্তু কোন সাড়া দিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি নামায সারিয়া নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন- আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নবী করীম (সা) জবাবে বলিলেন, ওয়া আলাইকাস্সালাম, হে উবাই, তুমি আমার ডাকে সাড়া দিলে না কেন ? তিনি আরয করিলেন- 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি নামাযে ছিলাম।' নবী করীম (সা) বলিলেন, আমার কাছে আল্লাহ্ তা'আলা যেই সব বাণী পাঠাইয়াছেন তাহাতে কি তুমি এই আয়াত দেখ নাই ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

'হে মু'মিনগণ! যাহা তোমাদিগকে জীবন দান করিবে তাহার দিকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল তোমাদিগকে আহ্বান করিলে তোমরা উহাতে সাড়া দিবে।' তিনি আরয করিলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, পুনরায় এইরূপ করিব না। নবী করীম (সা) বলিলেন, তুমি ইহা পছন্দ কর যে, আমি তোমাকে এমন একটি সূরা জানাইয়া দিব যাহার সমকক্ষ সূরা না তাওরাতে, না ইঞ্জীলে, না যবূরে, না কুরআনে নাযিল হইয়াছে ? উবাই (রা) বলেন, আমি মসজিদ হইতে বাহির হইবার পূর্বেই আমি তোমাকে উহা জানাইব।' অতঃপর নবী করীম (সা) আমার হাত ধরিয়া কথা বলিতে বলিতে মসজিদের দরজার দিকে আসিতে লাগিলেন। কথা বলা শেষ হইবার পূর্বেই যেন তিনি মসজিদের দরজায় পৌঁছিয়া না যান সেইজন্য আমি গতি মন্থর করিলাম। দরজার নিকট পৌঁছিয়া আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, যে সূরাটি আমাকে জানাইবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন উহা কোন সূরা ? নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন- নামাযের শুরুতে কোন্ সূরা পড় ?' আমি তাঁহাকে 'উম্মুল কুরআন' পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি তখন বলিলেন- যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাঁহার শপথ ! উহার সমকক্ষ সূরা আল্লাহ্ তা'আলা না তাওরাতে, না ইঞ্জীলে, না যাবূরে, না কুরআনে নাযিল করিয়াছেন। উহা হইতেছে 'আস্ সাবউল মাছানী' (নিত্যপাঠ্য বাণীসপ্তক)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ক্রমাগত আবদুর রহমান, আ'লা ইব্ন আবদুর রহমান, দারোয়াদী, কুতায়বা এবং ইমাম তিরমিযীও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে অবশ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ

'নবী করীম (সা) বলিলেন, উহা হইতেছে আমাকে প্রদত্ত 'আস্ সাবউল মাছানী' ও 'আল-কুরআনুল আযীম।'

ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসকে حديث حسن صحيح (হাসান সহীহ হাদীস) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুরায়রা (রা), আবদুর রহমান, আ'লা ইব্ন আবদুর রহমান, আবদুল হামীদ ইব্ন জা'ফর, আবূ উসামা, ইসমাঈল ইব্ন আবূ মুআম্মার এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহমদও উপরোক্ত হাদীস অনুরূপ বা প্রায় অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ক্রমাগত হযরত আবূ হুরায়রা (রা), আবদুর রহমান,'আ'লা ইব্ন আবদুর রহমান, আবদুল হামীদ ইব্ন জাফর, ফযল ইব্ন মূসা, আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্ন হারিছ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, উম্মুল কুরআনের সমতুল্য সূরা আল্লাহ্ তা'আলা না তাওরাতে, না ইঞ্জীলে নাযিল করিয়াছেন। উহা হইতেছে 'আস্ সাবউল মাছানী'। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, উহা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি করিয়া বিভক্ত।'

ইমাম তিরমিযী উহাকে একটিমাত্র সনদে বর্ণিত বিশেষ নিয়মে গ্রহণযোগ্য হাদীস (حديث حسن غريب) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত ইব্ন জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আকীল, হাশিম ইব্ন ফরীদ, মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

হযরত ইব্ন জাবির (রা) বলেন, আমি একদিন নবী করীম (সা)-এর নিকট গেলাম। তিনি তখন সবেমাত্র প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। আমি বলিলাম- আস্সালামু আলাইকা

ইয়া রাসূলাল্লাহ্। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। এইরূপে তিনবার তাঁহাকে সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তিনি শুধু হাঁটিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছিলাম। এক ফাঁকে তিনি বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি মসজিদে গিয়া উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত অবস্থায় বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি পবিত্রতা অর্জন করিয়া আমার নিকট আসিয়া আমাকে তিনবার বলিলেন- ওয়ালাইকাস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অতঃপর বলিলেন, ওহে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাবির! তোমাকে কি কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরাটি অবহিত করিব? আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, 'আল্‌হামদু সূরাটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত কর।'

উক্ত হাদীসের সনদ উত্তম। উহার অন্যতম রাবী ইব্‌ন আকীলকে বড় বড় ইমামগণ গুরুত্ব দিয়া থাকেন এবং তাঁহার বর্ণিত হাদীসকে প্রামাণ্য দলীল হিসাবে বিবেচনা করিয়া থাকেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাবির (রা) সম্পর্কে ইবনুল জাওযী বলেন, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাবির আল 'আবদী। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। হাফিজ ইব্‌ন আসাকির উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, তিনি হইলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাবির আল আনসারী আল বিয়াযী।

উপরোক্ত হাদীসও অনুরূপ অন্যান্য হাদীস দ্বারা অনেক আহলে ইলম প্রমাণ করেন যে, কুরআন মজীদের সকল আয়াত ও সকল সূরার মর্যাদা সমান নহে। বরং এক আয়াত অপর আয়াত অপেক্ষা এবং এক সূরা অপর সূরা অপেক্ষা অধিকতর ফযীলত ও মর্তবার অধিকারী। এই মতাবলম্বীদের মধ্যে ইসহাক ইব্‌ন রাহবিয়াহ্, আবূ বকর ইবনুল 'আরাবী, ইব্‌ন হিফার প্রমুখ মালেকী মাযহাবের আহলে ইমামগণের নাম উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে এক জামা'আত আহলে ইল্‌ম বলেন, কুরআন মজীদের কোন আয়াত অন্য আয়াত অপেক্ষা কিংবা কোন সূরা অন্য সূরা অপেক্ষা অধিকতর ফযীলত বা মর্যাদার অধিকারী নহে; বরং উহার সকল আয়াত ও সকল সূরা সমান ফযীলত ও মর্তবার অধিকারী। কারণ, সবই আল্লাহ্ তা'আলার বাণী। অধিকন্তু, এইরূপ পার্থক্য মানিয়া লইলে, যে আয়াত বা সূরাকে অধিকতর মর্যাদা ও ফযীলতের মনে করা হইবে, উহা ভিন্ন অন্যান্য আয়াত ও সূরাকে কম মর্যাদার মনে করা হইবে। ইহার ফলে মানুষের মনে কুরআন মজীদের সামগ্রিক মর্যাদাবোধ হ্রাস পাইবে।

ইমাম কুরতুবী বলেন, আল্ আশ্‌আরী, আবূ বকর বাকিল্লানী, আবূ হাতিম ইব্‌ন হাব্বান আল-বাস্তী, আবূ হাইয়ান ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া শেষোক্ত অভিমতের প্রবক্তা ছিলেন। স্বয়ং ইমাম মালিক হইতেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'বাদ, হিশাম, ওয়াহাব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্নার বর্ণনার ভিত্তিতে ইমাম বুখারী স্বীয় 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়ে বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা একবার সফরের অবস্থায় যাত্রা বিরতি করিলাম। সেখানে একটি মেয়ে আসিয়া আমাদিগকে বলিতে লাগিল, 'এই গোত্রের সর্দারকে সাপে কামড়াইয়াছে। আমাদের লোকজন বাড়ীতে নাই। আপনাদের মধ্যে কেহ ঝাড়ফুঁক জানেন কি ?' ইহা শুনিয়া আমাদের একজন তাহার সঙ্গে গেল। সে ঝাড়ফুঁক জানে বলিয়া আমাদের জানা ছিল না। অথচ তাহার ঝাড়ফুঁকের ফলে সর্পদষ্ট লোকটি বিষমুক্ত হইয়া গেল। লোকটি তাহাকে ত্রিশটি বকরী পুরস্কার দিল এবং আমাদের সকলকে দুধ পান করাইল। আমরা সেই সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম- তুমি কি ঝাড়ফুঁক জান ? ইহার পূর্বে তুমি কি ওঝাগিরি

করিয়াছ ? সে বলিল, আমি তো শুধু উম্মুল কুরআন পড়িয়া ঝাড়িয়াছি। আমরা পরস্পর বলাবলি করিলাম, 'নবী করীম (সা)-এর খেদমতে পৌছিয়া তাঁহার মতামত জানার পূর্বে এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা ঠিক হইবে না।'

অতঃপর আমরা মদীনায় পৌছিয়া নবী করীম (সা)-এর সমীপে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম। তিনি বলিলেন, সে কি করিয়া জানিল যে, উহা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করিলে রোগ সারে ? তোমরা সকলে (বকরীগুলি) ভাগ করিয়া লও এবং আমাকেও একভাগ দাও।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ক্রমাগত মা'বাদ ইব্ন সীরীন, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন, হিশাম, আবদুল ওয়ারিছ এবং আবূ মুআম্মারও উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম এবং ইমাম আবূ দাউদও হাদীসটি উপরোল্লিখিত রাবী ইব্ন সীরীন হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ইব্ন সীরীন হইতে হিশাম ইব্ন হাস্সান প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত কোন কোন রিওয়ায়েত অনুযায়ী স্বয়ং আবূ সাঈদ سليم (নিরাপদ) নামে আখ্যায়িত করিয়া থাকে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমান্বয়ে সাঈদ ইব্ন জারীর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ঈসা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, আম্মার ইব্ন যারীক এবং আবুল আহওয়াস সালাম ইব্ন সালীম প্রমুখ রাবীর বর্ণনা সূত্রে ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ (র) বর্ণনা করেন ঃ

'একদা নবী করীম (সা)-এর সহিত হযরত জিবরাঈল (আ) উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময়ে উপর হইতে একটি উচ্চ শব্দ নবী করীম (সা)-এর কানে আসিল। হযরত জিবরাঈল (আ) উপরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ইহা আকাশে একটি সদ্য উন্মুক্ত দ্বারের আওয়াজ। ইতিপূর্বে উহা কখনও উন্মুক্ত হয় নাই। অতঃপর উহার মধ্য দিয়া একজন ফিরিশতা অবতীর্ণ হইলেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আপনাকে দুইটি নূর প্রদানের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। ইতিপূর্বে কোন নবীকে উহা প্রদান করা হয় নাই। উহাদের একটি হইতেছে 'ফাতিহাতুল কিতাব' ও অপরটি হইল 'সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ।' উহার যে অংশটিই আপনি পড়িবেন, তদ্দারা প্রার্থিত যে কোন বিষয় আপনাকে প্রদান করা হইবে। (সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিবেদনযোগ্য অতীব প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রার্থনা বর্ণিত হইয়াছে।)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'লা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াকুব আল খারকী, সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আল-হানযালী অথবা ইসহাক ইব্ন রাহবিয়াহ এবং ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেন ঃ

"নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন বর্জিত কোন নামায পড়ে, তাহার সেই নামায অসম্পন্ন, অসম্পন্ন, অসম্পন্ন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে (উক্ত হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে) একজন বলিলেন, 'আমরা তো ইমামের পেছনে নামায পড়ি।' তিনি বলিলেন, তথাপি মনে মনে উহা পাঠ কর। কারণ, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ সূরা সালাতকে আমি আমার ও বান্দার মধ্যে আধাআধি করিয়া ভাগ করিয়া দিয়াছি। আমার বান্দা যাহা চায় তাহা তাহাকে প্রদান করা হয়। যখন সে বলে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ। তখন আল্লাহ্ বলেন– বান্দা আমার প্রশংসা করিয়াছে। যখন সে বলে, اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। তখন আল্লাহ্ বলেন– বান্দা

আমার গুণ বর্ণনা করিয়াছে। যখন সে বলে, مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন আল্লাহ্ বলেন, বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছে।

(হযরত আবূ হুরায়রা (রা) একবারের বর্ণনায় 'বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছে' স্থলে 'বান্দা আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে' বলা হইয়াছে।)

যখন সে বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ইহা আমার ও বান্দার ভিতর জড়িত বিষয়। তাই বান্দা যাহা চাহিয়াছে, তাহা সে পাইবে। অবশেষে যখন সে বলে–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ -

তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ইহা আমার বান্দার অংশ। আমার বান্দা যাহা চাহিয়াছে, তাহা সে পাইবে।"

ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত হাদীসটি ইসহাক ইব্‌ন রাহবিয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্‌ন যুহরার গোলাম আবূ সায়েব, আ'লা ইব্‌ন আবদুর রহমান, মালিক ও কুতায়বা উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। একই সনদে ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন ইসহাক ও আ'লা ইব্‌ন আবদুর ইব্‌ন ইয়াকূব আল খারকী, আবূ সায়েব, 'আলা ইব্‌ন আবদুর রহমান ও ইব্‌ন আবূ উয়ায়য প্রমুখ রাবীর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযীর মতে উহা حديث حسن বিশেষ নিয়মে গ্রহণযোগ্য হাদীস। তিনি এই সম্পর্কে আরও বলিয়াছেন যে, 'আমি একদিন আমার উস্তাদ আবূ যুহরার নিকট উক্ত হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন, হাদীসটির উভয় সনদই শুদ্ধ। আবদুর রহমান হইতে' আলা ইব্‌ন আবদুর রহমানের সনদ যেরূপ সহীহ, তেমনি সহীহ আবূ সায়েব হইতে আ'লা ইব্‌ন আবদুর রহমানের সনদ।

হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা), আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াকূব আল খারকী, আ'লা ইব্‌ন আবদুর রহমান প্রমুখ রাবীর সনদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইমাম আহমদও উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কা'ব ইব্‌ন উজরাহ্, সাঈদ ইব্‌ন ইসহাক, মুতরাফ ইব্‌ন তরীফ, আব্বাস ইব্‌ন সাঈদ, যায়দ ইব্‌ন হাব্বাব, সালেহ ইব্‌ন মিসমার আল্ মারূযী ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইয়াছেন, আমি (সূরা) সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি করিয়া ভাগ করিয়া দিয়াছি। সে যাহা চাহিবে তাহা সে পাইবে।' তাই যখন বান্দা বলে ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন, বান্দা আমার প্রশংসা করিতেছে। যখন সে বলে ঃ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন আল্লাহ্ পাক বলেন আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করিতেছে। যখন সে বলে ঃ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন আল্লাহ্ বলেন, ইহা আমার প্রাপ্য অংশ। সূরার অবশিষ্টাংশ তাহার প্রাপ্য।' উপরোক্ত হাদীসটি উল্লিখিত সনদ ভিন্ন অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই।

উক্ত হাদীস সম্পর্কে জরুরী আলোচনা

॥ এক ॥

হাদীসে صلوة শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা হইয়াছে صلوة -কে আমার ও বান্দার মধ্যে আধাআধি করিয়া ভাগ করিয়া দিয়াছি। উক্ত সালাত শব্দের মর্মার্থ কিরাআত (নামাযে পঠিতব্য)। নিম্নোক্ত আয়াতে কিরাআত অর্থে সালাত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

وَلَاتَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا - وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلاً 'তোমরা কিরাআত না জোরে পড়, না আস্তে; বরং মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কর।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উপরোক্ত আয়াতের অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন।

তাহা ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাঁহার ও তাঁহার বান্দার মধ্যে সালাতের আধাআধি বিভক্তিকরণের ব্যাপারেও বুঝা যায় যে, সালাত সেখানে কিরাআত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিভক্তি সম্পর্কিত বিশ্লেষণই দেখা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ফাতিহাকে তাঁহার ও বান্দার মধ্যে আধাআধি করিয়া দিয়াছেন।

উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, নামাযে কিরাআত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উহা নামাযের গুরুত্ব সম্পন্ন ফরযসমূহের অন্যতম। কারণ, উক্ত হাদীসে ইবাদতের অর্থে নির্ধারিত সালাত শব্দকে উহার একটি অংশ, 'কিরাআত' অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। এই ধরনের ব্যবহারের অন্য ক্ষেত্রেও উদাহরণ মিলে। এক জায়গায় قران শব্দ দ্বারা صلوة অর্থ বুঝানো হইয়াছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ - اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا 'অনন্তর তুমি ফজরের সালাত কায়েম কর। নিশ্চয় ফজরের সালাত পর্যবেক্ষিত হয়।'

উক্ত আয়াতে দেখা যাইতেছে قُرْاٰنَ الْفَجْرِ শব্দ দ্বারা 'ফজরের সালাত' অর্থ বুঝানো হইয়াছে। এতদসম্পর্কিত বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের হাদীসেও অনুরূপ অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে 'ফজরের সালাতকে রাতের ফেরেশতাগণ ও দিনের ফেরেশতাগণ প্রত্যক্ষ করেন।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযে কিরাআত ফরয। ফকীহ ও আলিমগণের ইহাই সর্ববাদীসম্মত অভিমত। তবে নামাযে কি কুরআনের যে কোন আয়াত তিলাওয়াত করা ফরয, না নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয, তাহা লইয়া ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার শিষ্যগণ সহ একদল ফুকাহার অভিমত এই যে, নামাযে নির্দিষ্টরূপে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নহে; বরং কুরআন মজীদের যে কোন স্থান হইতে কিয়দংশ পাঠ করা ফরয। কারণ, নামাযে কিরাআত ফরয হওয়া সম্পর্কিত আয়াতে নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহার কথা বলা হয় নাই; বরং উহাতে সাধারণভাবে কুরআন মজীদের যে কোন অংশ পাঠের কথা বলা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

فَاقْرَأُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ 'কুরআন হইতে যতটুকু পার পড়।'

অনুরূপভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসেও কুরআনের যে কোন স্থান হইতে কিয়দংশ পাঠ করার নির্দেশ পাওয়া যায়।

হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

"একদা জনৈক ব্যক্তি যথাযথভাবে নামায আদায়ে অপারগ হইয়া উহার অঙ্গহানি ঘটাইলে নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ নামাযে দাঁড়াইয়া 'আল্লাহু আকবার' বল; অতঃপর কুরআন মজীদের যতটুকু পার পড়।"

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে নামাযে নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করিতে নির্দেশ দেওয়া হয় নাই; বরং কুরআন মজীদের যে কোন অংশ পাঠ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফেঈ (র), ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ও তাঁহাদের শিষ্যগণ সহ অধিকাংশ ফুকাহার অভিমত এই যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয এবং ইহা ব্যতীত নামায শুদ্ধ হইবে না। কারণ, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন ছাড়া নামায পড়ে তাহার নামায অপূর্ণ থাকে।' এই ব্যাপারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক পূর্বে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) خداج শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহার অর্থ অপূর্ণ বা অসম্পন্ন।'

অনুরূপ আরেক হাদীস হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাহমূদ ইব্‌ন রবী' ও যুহরী প্রমুখ রাবীর সনদে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনাটি এই ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি (নামাযে) ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করে না তাহার নামায হয় না।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইব্‌ন খুযায়মা ও ইব্‌ন হাব্বান তাঁহাদের সংকলন গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে সালাতে উম্মুল কুরআন পঠিত হয় না, তাহা আদায় হয় না।'

আলোচ্য বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এতদসম্পর্কিত বিতর্ক বেশ দীর্ঘ। আমি উভয় অভিমতের প্রবক্তাদের বক্তব্য প্রমাণ সহ সংক্ষেপে তুলিয়া ধরিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের সকলকে করুণাসিক্ত করুন।

॥ দুই ॥

অতঃপর প্রশ্ন জাগে, সালাতের প্রতি রাক'আতেই কি ফাতিহা পাঠ করা ফরয, না শুধু এক বা একাধিক রাক'আতে উহা ফরয?

ইমাম শাফেঈ (র) সহ একদল ফকীহ্‌র অভিমত হইল, প্রতি রাক'আত নামাযে ফাতিহা পাঠ করা ফরয। আরেক দল ফকীহ বলেন, সালাতের শুধু অধিকাংশ রাক'আতে ফাতিহা পাঠ করা ফরয।

হাসান বসরী সহ বসরা নগরীর অধিকাংশ ফকীহ্‌র মতে মাত্র এক রাক'আতে ফাতিহা পাঠ করা ফরয। এই মতের প্রবক্তাগণ বলেন, 'যে ব্যক্তি ফাতিহা পাঠ করে না, তাহার নামাযই হয় না' হাদীসে কত রাক'আতে ফাতিহা পাঠ করিতে হইবে তাহা নির্দিষ্টভাবে বলা হয় নাই। তাই নামাযের রাক'আতের ন্যূনতম সংখ্যক এক রাক'আতে ফাতিহা পাঠ করিলেই ফরয আদায় হইবে।

অবশ্য হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নুযরাহ ও আবূ সুফিয়ান সা'দী প্রমুখ বর্ণনাকারীর সূত্রে ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র) বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফরয সহ অন্যান্য সালাতের প্রত্যেক রাক'আতে আলহামদু (সূরা) পাঠ না করে তাহার সালাত আদায় হয় না।'

তবে উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতা তর্কাতীত ও সংশয়মুক্ত নহে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ, সুফিয়ান ছাওরী ও ইমাম আওযাঈ বলেন, সালাতে নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করা আদৌ ফরয নহে; বরং কুরআন মজীদের যে কোন স্থান হইতে কিছু অংশ পাঠ করিলে কিরাআত পাঠের ফরয আদায় হইবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاقْرَأُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ 'কুরআন মজীদ হইতে যতটুকু পার পড়।'[১] আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। এই সম্পর্কে 'আহকামুল কবীর' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

॥ তিন ॥

প্রশ্ন জাগে যে, সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা কি মুক্তাদীর জন্যও ফরয। এ সম্পর্কে ফকীহ্বৃন্দের তিনটি অভিমত রহিয়াছে।

প্রথম অভিমত এই যে, সালাতে ফাতিহা পাঠ করা যেরূপ ইমামের উপর ফরয, তেমনি মুক্তাদীর উপরও ফরয। কারণ, উপরোল্লেখিত হাদীসসমূহ ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের বেলায়ই সমান প্রযোজ্য। উহার কোন হাদীসেই সালাতে ফাতিহা পাঠের অপরিহার্যতাকে শুধু ইমামের সহিত সংশ্লিষ্ট করা হয় নাই।

দ্বিতীয় অভিমত এই যে, সশব্দ যথা, ফজর, মাগরিব, 'ইশা কিংবা নিঃশব্দ যথা জোহর ও আসর, কোন নামাযেই মুক্তাদীর উপর সূরা ফাতিহা বা কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা ফরয নহে। কারণ হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ من كان له امام فقراءة الامام له قراءة অর্থাৎ ইমামের কিরাআতই মুক্তাদীর কিরাআত। অবশ্য উক্ত হাদীসের সনদ দুর্বল। ওয়াহাব ইব্ন কায়সানের বরাত দিয়া ইমাম মালিক উহাকে জাবির (রা)-এর নিজস্ব উক্তি (حديث موقوف) হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

তৃতীয় অভিমত হইল এই যে, নিঃশব্দ নামাযে কিরাআত পাঠ করা মুক্তাদীর উপর ফরয। এই অভিমতের প্রবক্তাগণ পূর্বোল্লেখিত আয়াত ও হাদীসকেই নিজেদের সমর্থনে পেশ করেন।

---

১. কুরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াত ও পূর্বোল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহা নহে; বরং কুরআন মজীদের যে কোন স্থান হইতে কিয়দংশ পাঠ করা ফরয। এই প্রেক্ষিতে হানাফী মাযহাবে সালাতে নির্দিষ্টরূপে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয নহে। তবে হাদীস দ্বারা যেহেতু প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতিহা ছাড়া সালাত পূর্ণ হয় না, তাই হানাফী মাযহাবে প্রত্যেক প্রকারের সালাতে প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করাকে ওয়াজিব বলিয়াছে। হানাফী মাযহাবে ফরয ও ওয়াজিবের ব্যবধান খুবই সামান্য। উভয় প্রকারের কার্যকেই এই মাযহাবে প্রায় সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। সুতরাং এই ধারণা ঠিক নহে যে, হানাফী মাযহাবে সালাত আদায়ে সূরা ফাতিহার গুরুত্ব স্বীকৃত নহে। —অনুবাদক

তাঁহারা বলেন, সশব্দ নামাযে কিরাআত পাঠ করা মুক্তাদীর উপর ফরয নহে। কারণ, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হইতে ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'মুক্তাদীর অনুসরণের জন্যই ইমামকে ইমাম বানানো হয়। অতএব যখন সে তাকবীর বলে, তখন তোমরাও তকবীর বলিবে। আর যখন সে কিরাআত পড়ে তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে চুপ থাকিও।' অতঃপর হাদীসের অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়।

ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'সে (ইমাম) যখন কিরাআত পড়ে, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে চুপ থাকিও।'

মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজও উপরোক্ত হাদীসকে সহীহ হাদীস বলিয়াছেন। উপরোক্ত হাদীস দুইটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সশব্দ নামাযে কিরাআত পাঠ করা মুক্তাদীর জন্য ফরয নহে। ইমাম আহমদ (র) হইতেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে।

সূরা ফাতিহা সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানগুলি স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরার উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত মাসআলাগুলি আলোচনা করিলাম। সূরা ফাতিহা ভিন্ন অন্য কোন সূরার সহিত এতসব মাসায়েল সংশ্লিষ্ট নহে।

হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইমরান আল জুনী, গাস্‌সান ইব্‌ন উবায়দ, ইবরাহীম ইব্‌ন সাঈদ আল জাওহারী ও হাফিজ আবূ বকর আল বায্‌যার বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যখন তুমি বিছানায় শায়িত হও, তখন যদি 'আলহামদু' ও 'কুল হুয়াল্লাহ' সূরা পাঠ কর, তাহা হইলে তুমি মৃত্যু ভিন্ন অন্য সব বিপদ হইতে মুক্ত থাকিবে।'

আউযুবিল্লাহর ব্যাখ্যা ও বিধান

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَامُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ـ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ـ اِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ

'ক্ষমাশীলতা অবলম্বন কর, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদের পরিহার কর। এক্ষেত্রে যদি কখনও শয়তানের প্ররোচনা আসে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাও। নিশ্চয় তিনি সব শোনেন, সবই জানেন।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ـ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ـ وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ

'উত্তম ব্যবহার দ্বারা নিকৃষ্ট ব্যবহারকে প্রতিরোধ কর। তাহারা যাহা (মিথ্যা) আরোপ করে তাহা আমি ভালভাবেই জানি। তাই তুমি বল, প্রভু হে, শয়তানের প্ররোচনা হইতে আমি

তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। এবং হে পরোয়ারদিগার, আমার নিকট তাহাদের উপস্থিতি হইতে আমি তোমার কাছে আশ্রয় লইতেছি।

তিনি আরও বলেন ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ـ وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ـ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ـ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

'উত্তম ব্যবহার দ্বারা (নিকৃষ্ট ব্যবহারের) জবাব দাও। দেখিবে তোমার চরম শত্রু পরম বন্ধুতে পরিণত হইয়াছে। উহা শুধু সহিষ্ণু ব্যক্তিরাই পারে এবং বিরাট সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা ছাড়া উহা কেহ পারে না। তারপর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা আসে, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।'

উপরোক্ত আয়াতত্রয়ের সমার্থক অন্য কোন আয়াত নাই। উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা মানব-শত্রুর সহিত ক্ষমাশীল, সহনশীল ও উদার ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। এরূপ ব্যবহারে শত্রুর অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক সুপ্ত সদগুণাবলী জাগ্রত হইবে এবং নিজে নিকৃষ্ট স্বভাব ও আচরণের জন্য লজ্জিত হইবে। পরন্তু সৎ ও ভদ্র ব্যবহার করিতে উদ্বুদ্ধ হইবে। পক্ষান্তরে শয়তান-শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা শুধু তাঁহার নিকট আশ্রয় চাহিতে উপদেশ দিয়াছেন। কারণ, শয়তান মানুষের মহৎ, উদার ও ক্ষমাশীল ব্যবহারের কোন মূল্য দেয় না। সে মানব জাতির জনক আদম ও তাহার মধ্যকার তীব্র শত্রুতার কারণে মানুষের ধ্বংস ভিন্ন অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত নহে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰبَنِىْ اٰدَمَ لاَيَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ 'হে আদম সন্তান! শয়তান যেভাবে তোমাদের পিতা মাতাকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়াছে, তদ্রূপ সে তোমাদিগকেও যেন বিপথগামী না করে।'

তিনি আরও বলেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ـ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ ـ

'নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাহাকে শত্রুই বিবেচনা করিও। সে তাহার দলে যোগদানকারীদিগকে দোযখের বাসিন্দা হইবার জন্য আহবান জানায়।'

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ط بِئْسَ لِلظَّالِمِيْنَ بَدَلاً ـ

'শয়তান ও তাহার মানসপুত্রগণ তোমাদের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও আমাকে ছাড়িয়া তোমরা তাহাদিগকে বন্ধু বানাইবে? দূরাচারদের পরিণাম বড়ই খারাপ।'

শয়তান হযরত আদম (আ)-কে শপথ করিয়া বলিয়াছিল, নিশ্চয়ই সে তাহার কল্যাণ চাহে। ইহা হইতে সহজেই অনুমেয় যে, সে আমাদের সহিত কিরূপ আচরণ করিবে। শয়তান তো বলিয়াই রাখিয়াছে ঃ

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ - اِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ 'তোমার মহা মর্যাদার শপথ! তাহাদের সকলকে আমি বিভ্রান্ত করিব। বাদ থাকিবে শুধু তোমার নিবেদিত বান্দারা।' শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা হইতে বাঁচার পন্থা নির্দেশ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ - اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ -

"যখন তুমি কুরআন তিলাওয়াত কর, তখন বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। যাহারা ঈমান আনিয়া স্বীয় প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল হইয়াছে, তাহাদের উপর শয়তানের আধিপত্য নাই। শয়তানের কর্তৃত্ব চলে তাহাদের উপর যাহারা তাহাকে বন্ধু ভাবিয়াছে এবং আল্লাহ্র সহিত শির্কে লিপ্ত হইয়াছে।"

একদল ফকীহ্ ও কারী বলেন, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শেষে তিলাওয়াতকারী শয়তান হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। তাঁহারা উপরোক্ত আয়াতের এইরূপ অর্থই করেন। তাঁহারা বলেন, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তিলাওয়াত শেষে তাঁহার নিকট শয়তান হইতে পানাহ চাহিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন, তিলাওয়াত রূপ ইবাদত সম্পন্ন করিবার পর তিলাওয়াতকারীর মনে ইবাদতের অহংকার আসিতে পারে। তাহা দূর করাও শয়তান হইতে আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ চাওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং উহা তিলাওয়াতের পরে হওয়াই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত।

আবুল কাসিম ইউসুফ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন জুনাদাহ আল্ হাযলী আল্ মাগরেবী স্বীয় গ্রন্থ 'আল ইবাদাতুল কামিল' এ উল্লেখ করেন যে, ইব্‌ন ফাফুফা ও আবূ হাতিম সাজিস্তানী বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত হামযা উপরোল্লেখিত মতের সমর্থক ছিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। তবে তাঁহার বরাত দিয়া বর্ণিত উক্ত বর্ণনার কোন সমর্থন মিলে না। মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে ইব্‌ন সীরীন হইতে অনুরূপ একটি অভিমত উধৃত করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, ইবরাহীম নাখঈ, দাউদ যাহেরী এবং ইব্‌ন আলী আল ইস্পাহানীও উক্ত অভিমত পোষণ করিতেন।

মাজমূআহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বকর ইবনুল আরাবী ও ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, ইমাম মালিক (র) বলিয়াছেন, তিলাওয়াতকারী তিলাওয়াত শেষে শয়তান হইতে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাইবে। ইবনুল 'আরাবী অবশ্য উক্ত অভিমতকে সমর্থনের অযোগ্য বলিয়াছেন।

ইমাম কুরতুবী আরেকটি অভিমত উধৃত করিয়াছেন। তাহা এই যে, তিলাওয়াতকারী তিলাওয়াতের পূর্বে ও পরে উভয় সময় শয়তান হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। ইমাম রাযীও উপরোক্ত অভিমত উধৃত করিয়াছেন।

উক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ বলেন, এই অভিমত তিলাওয়াতের পূর্ব আর পরের ঝগড়ার অবসান ঘটায় এবং উভয় মতের ভিতর সমন্বয় সাধন করে।

অধিকাংশ ফকীহ্‌র অভিমত এই যে, তিলাওয়াতকারী তিলাওয়াতের পূর্বে শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে যাহাতে শয়তান প্ররোচনা দিয়া তিলাওয়াতকারীকে তিলাওয়াত হইতে বিরত রাখিতে না পারে। এই মতটিই সর্বত্র খ্যাত ও সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত।

এই মতের প্রবক্তারা বলেন, اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ অর্থ হইতেছে, 'যখন তুমি কুরআন তিলাওয়াত করিতে ইচ্ছা কর।' দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহারা বলেন ঃ

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ الخ আয়াতে اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ অর্থ হইতেছে 'যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হইতে ইচ্ছা কর।' اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ -এর শেষোক্ত অর্থই সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল মুতাওয়াক্কিল আত্তাজী, আলী ইব্‌ন আলী আর রিফাঈ আল্ য়াশকারী, জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান; মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আনাস এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) রাত্রে নামাযে দাঁড়াইয়া তাকবীরে তাহরীমার পর বলিতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

অতঃপর বলিতেন ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অতঃপর বলিতেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ ـ

(বলাবাহুল্য ইহা কিরাআতের পূর্বের ব্যাপার)।

ইমাম নাসাঈ, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ উপরোক্ত হাদীসটি উহার অন্যতম রাবী জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান হইতে ঊর্ধ্বতন সনদাংশ সহ বিভিন্ন অধস্তন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলিয়াছেন, এতদসম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে উপরোক্ত হাদীসই অধিকতর খ্যাত।

কেহ কেহ الهمز ـ النفخ ـ النفث শব্দত্রয়ের অর্থ করিয়াছেন যথাক্রমে গলা টিপিয়া হত্যা করা, অহংকার ও কবিতা।

হযরত যুবায়র আল মুতইম (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে' ইব্‌ন যুবায়র আল মুতইম, আসিম আল গুয্‌যী, আম্‌র ইব্‌ন মুররা, শু'বা প্রমুখ রাবীর বরাত দিয়া ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ বর্ণনা করেন ঃ

"হযরত যুবায়র আল মুতইম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিয়াছি, তিনি নামাযের প্রারম্ভে তিনবার বলিতেন ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا

অতঃপর তিনি বলিতেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا

অতঃপর তিনবার বলিতেন ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

অতঃপর বলিতেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْثِهٖ

আমর ইব্ন মুর্রা (রাবী) বলেন, الهمز। অর্থ গলা টিপিয়া হত্যা করা النفخ। অর্থ অহংকার ও النفث। অর্থ কবিতা।

হযরত ইবন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আব্দুর রহমান সালমী, আতা ইব্ন সায়েব, ইবন ফুযায়েল, আলী ইব্ন মুনযির ও ইমাম ইব্ন মাজাহ্ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَهَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ -

রাবী বলেন– الهمز। অর্থ গলা টিপিয়া হত্যা করা النفخ। অর্থ অহংকার ও النفث। অর্থ কবিতা।

হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা) হইতে জনৈক ব্যক্তি, তাহার নিকট হইতে ইয়ালা ইব্ন আতা, তাহার নিকট হইতে শরীক, তাহার নিকট হইতে ইসহাক ইব্ন ইউসুফ ও তাহার নিকট হইতে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) নামাযে দাঁড়াইয়া তিনবার الله اكبر। বলিতেন, তিনবার لا اله الا الله। বলিতেন, তিনবার سبحان الله وبحمد বলিতেন। অতঃপর বলিতেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ -

হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ক্রমাগত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র, ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ, আলী ইব্ন হিশাম, ইব্ন বারীদ, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন ইবন কূফী ও হাফিজ আবূ ইয়ালা আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন মুছান্না মওসেলী বর্ণনা করেন ঃ

'একদা দুইটি লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে ঝগড়া করিতেছিল। ক্রোধে তাহাদের একজনের নাসিকা স্ফীত হইয়া উঠিল। রাসূল (সা) বলিলেন, 'আমি একটি বাক্য জানি। এই ব্যক্তি তাহা উচ্চারণ করিলে সে যাহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে তাহা দূর হইয়া যাইবে। বাক্যটি হইতেছে ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ 'বিতাড়িত শয়তান হইতে আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় লইতেছি।'

ইমাম নাসাঈও اليوم والليلة। গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীস উহার অন্যতম রাবী ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ হইতে উর্ধ্বতন সনদ সহ পরবর্তী ফযল ইব্ন মূসা ও ইউসুফ ইব্ন মূসা আল মারূযীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত মু'আয ইব্ন জাব্বাল (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, আব্দুল মালিক ইব্ন উমায়র, যায়দাহ ইব্ন কুদামা প্রমুখ রাবীর মাধ্যমেও ইমাম নাসাঈ উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র হইতে ক্রমাগত সুফিয়ান ছাওরী, ইব্ন মাহদী ও বিন্দারের সনদে ইমাম নাসাঈ উহা اليوم। والليلة। গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন। ইমাম তিরমিযীও উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন। উপরোক্ত রাবী আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র হইতে ক্রমাগত জারীর ইব্ন আবদুল হামীদ, ইউসুফ ইব্ন মূসা ও যায়দার বরাতে ইমাম আবূ দাউদ উহা বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদও উপরোক্ত রাবী

আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র হইতে আবূ সাঈদের বরাতে বর্ণনাটি উধৃত করেন। মোটকথা, ইমাম নাসাঈ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম আহমদ ভিন্ন ভিন্ন সনদে একই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। বর্ণনাটি এই ঃ

"একদিন দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে ঝগড়া করিতেছিল। তাহাদের একজন ভীষণ উত্তেজিত হইল। আমার (মু'আয ইব্ন জাবাল) মনে হইল ক্রোধে তাহার নাসিকা স্ফীত হইল। রাসূল (সা) বলিলেন, 'আমি একটি বাক্য জানি। এই ব্যক্তি তাহা উচ্চারণ করিলে সে যেই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, নিশ্চয় তাহা দূর হইবে।' আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উহা কি? তিনি বলিলেন, সে পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ "আয় আল্লাহ্, আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে তোমার নিকট আশ্রয় লইতেছি।' হযরত মু'আয (রা) তাহাকে উহা পড়িতে বলিলেন। কিন্তু সে তাহা পড়িল না এবং তাহার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।"

ইমাম তিরমিযী বলিয়াছেন, হাদীসটি مرسل (বিচ্ছিন্ন)। কারণ, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর সাক্ষাত পান নাই। কারণ, তিনি বিশ হিজ্রীর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা সম্ভবত হাদীসটি হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে সরাসরি এবং হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে পরোক্ষভাবে শুনিয়াছেন। কারণ, উক্ত ঘটনা একাধিক সাহাবা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

হযরত সুলায়মান ইব্ন সা'দ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে 'আদী ইব্ন ছাবিত, আ'মাশ, জারীর, উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন ঃ

"একদিন দুই ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর সামনে ঝগড়া করিতেছিল। আমরা তাঁহার খেদমতে উপবিষ্ট ছিলাম। তাহাদের একজন ক্রোধান্বিত হইয়া অন্যজনকে গালি দিতেছিল। তাহার মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল। নবী করীম (সা) বলিলেন, 'আমি একটি বাক্য জানি। এই ব্যক্তি উহা পাঠ করিলে যাহা দ্বারা সে আক্রান্ত হইয়াছে, নিশ্চয় তাহা দূর হইয়া যাইবে। সে শুধু বলিবে ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ উপস্থিত লোকগণ তাহাকে বলিল, আল্লাহ্র রাসূল কি বলিতেছেন তাহা শুনিতেছ না? সে বলিল, আমি পাগল নহি।"

ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম নাসাঈ উক্ত হাদীসটি অন্যতম রাবী আ'মাশ হইতে পূর্ববর্তী সনদে ও পরবর্তী স্তরে ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেন।

استعاذه। (শয়তান হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা) সম্পর্কে বহু হাদীস রহিয়াছে। সকল হাদীস উল্লেখের স্থান ইহা নহে। আল্লাহ্ চাহেন তো আমার 'কিতাবুল আযকার' ও 'ফাযায়েলুল আ'মাল' গ্রন্থদ্বয়ে উহা বিশদভাবে আলোচিত হইবে। আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত জিবরাঈল (আ) কুরআন মজীদ লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রথমবার আসিয়া তাঁহাকে استعاذه। পাঠ করার জন্য বলেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক, আবূ রাওক, বাশার ইব্ন আম্মারাহ, উসমান ইব্ন সাঈদ, আবূ কুরায়ব ও ইমাম জা'ফর ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত জিবরাঈল (আ) প্রথমবার কুরআনের বাণী লইয়া নবী করীম (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'হে মুহাম্মদ! 'ইস্তিআযাহ্' পাঠ করুন। নবী করীম (সা) পড়িলেন ঃ أَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন, আপনি বলুন ঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতঃপর বলিলেন ঃ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ الخ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, 'এই সূরাই হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অবতীর্ণ প্রথম সূরা।'

অবশ্য উক্ত হাদীস সমর্থিত নহে। শুধু জানাইবার জন্যই উহা উল্লেখ করিলাম। উহার সনদ দুর্বল। তাহা ছাড়া উহা حديث منقطع (ছিন্নসূত্রের হাদীস)। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

অধিকাংশ ফকীহর মতে الاستعاذه ফরয বা অপরিহার্য নহে; বরং উহা মুস্তাহাব। ইমাম রাযী বলেন, 'আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ্র মতে, নামাযের ভিতরে ও বাহিরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের পূর্বে ইস্তি'আযাহ ওয়াজিব। ইব্‌ন সীরীন বলিয়াছেন, জীবনে একবার ইস্তি'আযাহ করিলেই ওয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে। 'আতা ইব্‌ন আবূ বিরাহ্র পক্ষে ইমাম রাযী নিম্নোক্ত দলীল পেশ করেন ঃ

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাঠের সময়ে ইস্তিআযাহ্ করার আদেশ করিয়াছেন। আদিষ্ট কাজ স্পষ্টতই ওয়াজিব। ইহার সপক্ষে তিনি নবী করীম (সা)-এর কার্যধারাও প্রমাণ হিসাবে পেশ করিয়াছেন। নবী করীম (সা) তিলাওয়াতের পূর্বে সর্বদা ইস্তি'আযাহ্ করিতেন। অধিকন্তু উহা দ্বারা শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা প্রতিহত হয়। মূলত যে কার্যের সহায়তা ব্যতীত ওয়াজিব কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহাও ওয়াজিব হয়। সুতরাং ইস্তি'আযাহ্ ওয়াজিব। উহা ওয়াজিব হইবার ইহাও একটি পূর্বশর্ত।

কেহ কেহ বলেন, ইস্তিআযাহ শুধু নবী করীম (সা)-এর জন্য ওয়াজিব ছিল। তাঁহার উম্মতের উপর ওয়াজিব নহে। ইমাম মালিক (র) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি ফরয নামাযে ইস্তিআযাহ্ করিতেন না। তিনি শুধু রমযানের প্রথ রজনীতে সুন্নাত (তারাবীহর) নামাযে ইস্তিআযাহ্ করিতেন।

ইমাম শাফেঈ (র) তাঁহার الاملاء গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ মুসল্লীরা সরবে ইস্তিআযাহ্ পড়িবে। তবে নীরবে পড়িলে ক্ষতি নাই। তিনি তাঁহার الام গ্রন্থে বলেন, উহা উচ্চ কি অনুচ্চ যে কোন স্বরে পড়িলেই চলিবে। কারণ, হযরত উমর (রা) অনুচ্চ স্বরে ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) উচ্চ স্বরে পড়িতেন।

ইমাম শাফেঈ (র) প্রথম রাক'আত ভিন্ন অন্যান্য রাক'আতে ইস্তিআযাহ্ পাঠ করাকে মুস্তাহাব বলেন কিনা তাহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। একদলের মতে তিনি মুস্তাহাব বলেন। অন্যদলের মতে তিনি মুস্তাহাব বলেন না। শেষোক্ত মতই সবল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম শাফেঈ (র) ও ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, ইস্তি'আযাহ্ পাঠে أَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বলিলেই চলিবে।

কেহ কেহ বলেন, উহাতে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়িতে হইবে।

কেহ আবার أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ পড়িতে বলেন। সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম আওযাঈ (র) প্রমুখ বলেন ঃ

'পূর্ববর্ণিত আয়াত ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে ইস্তিআযাহ্ নিম্নরূপ ঃ

أَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

তবে উপরোক্ত হাদীস অধিকতর অনুসরণযোগ্য। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, নামাযে যে ইস্তিআযাহ্ পড়ার বিধান রয়েছে, উহা কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের কারণে প্রদত্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, উক্ত বিধান নামাযের কারণে প্রদত্ত হইয়াছে। তাই ইমাম আবূ ইউসূফ বলেন, মুক্তাদী নামাযে কিরাআত পড়িবে না বটে, তা'আউয পড়িবে। তেমনি ঈদের নামাযে তাকবীরে তাহরীমার পরও অতিরিক্ত তাকবীরের পূর্বে ইস্তিআযাহ পড়িবে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ ফকীহ বলেন, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীরের পর ইস্তিআযাহ্ পড়িতে হইবে।

ইস্তিআযার বিস্ময়কর উপকার এই যে, অন্যায় অশ্রাব্য বাক্য উচ্চারণের ফলে মুখে যে অপবিত্রতা লাগিয়া যায়, ইস্তিআযার ফলে তাহা ধৌত হয়। প্রকৃতপক্ষে মুখ হইতেছে পবিত্র কালাম তিলাওয়াতের অঙ্গ। ইস্তিআযার বদৌলতে উহা পাক কালাম তিলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্তিআযাহ্ দ্বারা শয়তানের মোকাবেলার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। ফলে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বান্দার নির্ভরতা ও অসহায়তা প্রকাশ পায়।

শয়তান মানুষের অদৃশ্য নিশ্চিত শত্রু। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত মানুষ তাহার অকল্যাণ হইতে বাঁচিতে পারে না। মানুষ মানুষের শত্রুতাকে উদারতা ও মহানুভবতা দিয়া বশ করিতে পারে, কিন্তু শয়তান উহাতে বশ হয় না। ইস্তিআযাহ্ সম্পর্কিত শুরুর তিন আয়াত ও নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ছাড়া শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা মানুষের নাই। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلاً "নিশ্চয় আমার নেক বান্দার উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকিবে না। তোমার প্রতিপালকই অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট।"

এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে ইস্তিআযাহ্ মানুষের জন্য অপরিহার্য। মানুষের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ফিরিশতা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। (অথচ শয়তানের আক্রমণ তো আরও মারাত্মক) এই প্রেক্ষিতেও ইস্তিআযার গুরুত্ব অপরিসীম।

মানুষের আক্রমণে নিহত হইলে শহীদের মর্যাদা পায়। অথচ শয়তানের আক্রমণে পর্যুদস্ত হইলে আল্লাহ্র রহমত হইতে বঞ্চিত হয়। মানুষের হাতে পরাজয় বরণ করিলে আল্লাহ্র কাছে পুরস্কার পায়। পক্ষান্তরে শয়তানের কাছে পরাজিত হইলে পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত হয়। তাই ইস্তিআযার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শয়তান মানুষকে দেখে, কিন্তু মানুষ শয়তানকে দেখে না। তাই যে আল্লাহ্ শয়তানকে দেখেন, কিন্তু শয়তান তাঁহাকে দেখে না, সেই মহান শক্তির আশ্রয় ছাড়া শয়তানের হামলা হইতে বাঁচার বিকল্প পথ নাই। ইস্তিআযার গুরুত্ব এখানেই।

ইস্তিআযার অর্থ নিরূপণ

الاستعاذه। শব্দের অর্থ হইতেছে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষতি হইতে বাঁচার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাওয়া। العياذه। শব্দটি ক্ষতি প্রতিরোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে اللعياذ। শব্দ ব্যবহৃত হয় কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য সাহায্য প্রার্থনা অর্থে। কবি মুতানাব্বীর নিম্নোক্ত পংক্তিতে উক্ত শব্দদ্বয় পরস্পর পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ

يامن الوذ به فيما اؤمله * ومن اعوذبه فمن احاذره

لايجبر الناس عظما انت كاسره * ولايهيضون عظما انت جابره

'ওহে সেই সত্তা, কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করার জন্য আমি যাহার সাহায্য প্রার্থী এবং অবাঞ্ছিত বস্তু হইতে বাঁচার জন্য যাহার আশ্রয় প্রার্থী; তুমি হে হাড্ডি গুড়া কর, তাহা কেহ জোড়া দিতে পারে না এবং যে হাড্ডি তুমি জুড়িয়া রাখ, তাহা কেহই ভাঙ্গিতে পারে না।'

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -এর তাৎপর্য হইতেছে এই যে, যে কার্য সম্পাদনের জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি তাহা সম্পাদনের ও যাহা হইতে বিরত থাকার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি তাহা পরিহারের পথে বিতাড়িত শয়তান যাহাতে বাধা সৃষ্টি করিয়া বিপরীত কিছু না ঘটাইতে পারে তাহার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। কারণ, আল্লাহ্ ছাড়া কেহই শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা হইতে বাঁচাইতে পারে না। এই কারণেই মানুষের শত্রুতা প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা উদারতা ও ক্ষমাশীলতার উপদেশ দিলেও শয়তানের শত্রুতার হাত হইতে বাঁচার জন্য তিনি তাঁহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতে আদেশ দিয়াছেন। শয়তানের প্রকৃতি এতই জঘন্য ও অপবিত্র যে, উদারতা বা মহানুভবতাকে সে কোন মূল্যই দেয় না। মানুষ যত বড় শত্রুই হউক, উদারতা ও মহানুভবতা অনেক সময় তাহাকে অভিভূত করে এবং শত্রুতা ভুলিয়া সে বন্ধু হইয়া যায়। কিন্তু শয়তানকে কখনও উদারতা ও মহানুভবতা অভিভূত করিতে পারে না, পারে না শত্রুতা হইতে বিন্দুমাত্র নিরস্ত করিতে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এই দুই শ্রেণীর শত্রুর মোকাবিলার জন্য দুই রূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইস্তিআযা সম্পর্কিত আলোচনার শুরুতে উদ্ধৃত তিনটি আয়াতে উক্ত দুইরূপ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। সূরা আ'রাফে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ -

এই অংশে মানুষের শত্রুতার প্রতিষেধক নির্দেশ করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

এই অংশে শয়তানের শত্রুতার দাওয়াই বাতলানো হইয়াছে।

সূরা মু'মিনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ -

এখানেও মানুষের শত্রুতার প্রতিকার ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ -

এখানে আবার শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

সূরা 'হা-মীম আস্ সাজদায়' তিনি বলেন ঃ

وَلاَتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ - وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ -

এই অংশে মানুষের শত্রুতা ও হামলা প্রতিহত করার ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ - اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

এই অংশে শয়তানের শত্রুতা ও হামলা প্রতিহত করার ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

الشيطان শব্দের বিশ্লেষণ

الشيطان শব্দের ধাতু হইতেছে ش - ط - ن উহার অর্থ বিদূরিত বস্তু বা ব্যক্তি। শয়তান যেহেতু স্বভাব প্রকৃতিতে মানুষ হইতে দূরে অবস্থান করে, তাই তাহাকে শয়তান বলা হয়। তাহা ছাড়া স্বীয় অবাধ্য স্বভাবের দরুণ সে যাবতীয় কল্যাণ হইতে বিদূরিত বিধায় তাহাকে শয়তান বলা হয়।

কেহ কেহ বলেন, الشيطان শব্দের ধাতু হইল ش - ا - ط উহার অর্থ হইতেছে 'উত্তপ্ত বস্তু'। আগুন হইতে সৃষ্ট বলিয়া শয়তানকে শয়তান বলা হয়।

একদল বলেন, শয়তানকে উপরোক্ত উভয় অর্থেই শয়তান বলা হয়। তাই উহার ধাতু ও নামকরণ সম্পর্কিত উভয় ব্যাখ্যাই সঠিক।

আরবী সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই যথার্থ। কবি উমাইয়া ইব্ন আবুস্ সালত হযরত সুলায়মান (আ)-কে প্রদত্ত ঐশ্বর্য ও পরাক্রম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

ايما شاطن عصاه عكاه - ثم يلقى فى السجن والاغلال 'যদি শয়তানও তাহার অবাধ্য হইত, তাহা হইলে তিনি তাহাকেও গ্রেফতার করিয়া জেলখানায় জিঞ্জীরাবদ্ধ করিতেন।'

কবি এখানে শয়তানকে বুঝাইবার জন্য شاطن শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 'শাতেন' শব্দের শব্দমূল ش - ط - ن যদি উহার শব্দমূল ش - ا - ط হইত, তাহা হইলে তিনি شاطن শব্দের পরিবর্তে شائط শব্দ ব্যবহার করিতেন।

অনুরূপ কবি নাবিগা যুবয়ানী (যিয়াদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন যুব্বাব য়্যারবূ ইব্‌ন মুর্‌রা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যুরয়ান) বলেন ঃ

نأت بسعاد عنك نوى شطون - فباتت ولك له ادبها رهين

'দূরবর্তী পথ সুআদকে তোমার নিকট হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে। সেখানেই সে নিশিযাপন করিয়াছে। অথচ হৃদয় তাহার নিকট বন্ধক রহিয়াছে।'

এখানে কবি দূরবর্তী شطون শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। উহার ধাতু হইতেছে ش - ط - ن যদি ش - ا - ط শব্দমূল হইত, তাহা হইলে তিনি شطون শব্দের বদলে شائط শব্দ ব্যবহার করিতেন।

খ্যাতনামা ব্যাকরণবিদ সিবওয়াই বলেন, আরবগণ বলিয়া থাকে تشيطن فلان অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি শয়তানের ন্যায় কার্য করিয়াছে! تشيطن শব্দের ধাতু ش - ا - ط হইলে উক্ত অর্থে তাহারা تشيطن না বলিয়া تشيط বলিত। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় شيطان শব্দটির অর্থ হইতেছে বিদূরিত বস্তু বা ব্যক্তি এবং উহার ধাতু হইতেছে ش - ط - ن

উপরোক্ত অর্থই সঠিক বিধায় দূরে অবস্থানকারী জ্বিন, ইনসান বা অন্য কোন প্রাণীকে شيطان নামে আখ্যায়িত করা হয়। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا -

"অনন্তর এইরূপে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু সৃষ্টি করিয়াছি। তাহারা সত্য হইতে দূরে অবস্থানকারী জ্বিন ও ইনসান। তাহারা একে অপরের নিকট প্রতারণামূলক চটকদার কথা পৌঁছায়।"

উক্ত আয়াতে সত্য হইতে দূরে অবস্থানকারী জ্বিন ও ইনসান উভয়কেই شيطان বলা হইয়াছে।

অনুরূপভাবে হযরত আবূ যর (রা) হইতে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَيَاطِيْنِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ -

(মানুষ শয়তান ও জ্বিন শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।) আমি (আবূ যর) আরয করিলাম, 'মানুষের মধ্যেও কি শয়তান রহিয়াছে?' তিনি বলিলেন, হ্যাঁ।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আবূ যর (রা) বলেন ঃ 'একদা নবী করীম (সা) বলিলেন– নারী, গাধা ও কালো কুকুর নামায ভঙ্গ করে। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! লাল ও হলুদ কুকুর হইতে কালো কুকুরের বিধান ভিন্ন কেন? তিনি বলিলেন ঃ الكلب الاسود شيطان (কালো কুকুর শয়তান)।

আযলাম হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়দ ইব্‌ন আযলাম, হিশাম ইব্‌ন সা'দ ও ইব্‌ন ওহাব বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

একদা হযরত উমর (রা) একটি তুর্কী অশ্বে আরোহণ করিলেন। অশ্বটি দাম্ভিকের ন্যায় হেলিয়া-দুলিয়া চলিতেছিল। তিনি উহাকে চাবুক মারিতে লাগিলেন। উহাতে তাহার অহংকারী ভাব আরও বাড়িয়া গেল। তখন তিনি উহা হইতে অবতরণ করিলেন। তারপর খাদেমগণকে বলিলেন, তোমরা আমাকে একটি শয়তানের পিঠে চড়াইয়াছ? উহার অহংকারী চলার ভঙ্গী আমার মনেও অহংকার জাগাইতেছিল বলিয়া আমি নামিয়া পড়িয়াছি।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

الرجيم শব্দের বিশ্লেষণ

الرجيم শব্দটি الفعيل ওযনে সৃষ্ট ও المفعول ওযনের অর্থবোধক المفعول -এর মতই কর্মবাচ্যের অর্থ প্রকাশ করে। তাই উহার অর্থ দাঁড়ায় বিতাড়িত ও বিদূরিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رَجُوْمًا لِّلشَّيَاطِيْنِ 'নিশ্চয় আমি পৃথিবী সন্নিহিত আকাশকে আলোকমণ্ডলী দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি এবং সেইগুলিকে শয়তানের জন্য ক্ষেপণাস্ত্র বানাইয়াছি।'

তিনি আরও বলেন ঃ

انَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَايَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاءِ الاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ـ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ـ اِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ـ

'নিশ্চয় আমি পৃথিবী দৃষ্ট আকশকে নক্ষত্ররাজী দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি এবং উহাকে সকল অবাধ্য শয়তান হইতে হিফাজতের ব্যবস্থা করিয়াছি। উহারা সর্বোচ্চ মর্যাদার ফেরেশতাদের সংলাপ শুনিতে পারে না, চতুর্দিক হইতে তাহাদের উপর ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়। অনন্তর তাহাদের জন্য রহিয়াছে অনিবার্য আযাব। তথাপি কেহ যদি ছোঁ মারিয়া কোন কথা লইয়া পালায়, তাহা হইলে উজ্জ্বল আলোকপিণ্ড তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِيْنَ ـ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ ـ اِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ـ

'নিশ্চয় আমি আকাশে কক্ষপথ সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে দর্শকদের জন্য সুসজ্জিত করিয়াছি। আর উহাকে সকল বিতাড়িত শয়তান হইতে হিফাজতের ব্যবস্থা করিয়াছি। তবে যদি কেহ আড়ি পাতে, তাহা হইলে উজ্জ্বল নক্ষত্র তাহাকে ধাওয়া করে।'

এতদ্ভিন্ন অনুরূপ আরও আয়াত রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন ঃ الرجيم শব্দের অর্থ الرجم (নিক্ষেপক)। শয়তান যেহেতু মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনার তীর নিক্ষেপ করে, তাই তাহাকে الرجيم নামে অভিহিত করা হয়। অবশ্য পূর্বোক্ত তাৎপর্যই বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ।

'অশেষ দাতা ও অপরিসীম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে'

বিসমিল্লাহ্র বিশ্লেষণ

সাহাবায়ে কিরাম বিসমিল্লাহ্ দিয়া আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব আল-কুরআনুল করীম শুরু করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, উহা সূরা নামলের একটি আয়াত। তবে উহা সূরাগুলির শুরুতে অবস্থিত আয়াত বা আয়াতের অংশ কিনা তাহাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

একদল বলেন, উহা সূরা বারাআত ভিন্ন অন্য সকল সূরার প্রত্যেকটির পূর্বে অবস্থিত একটি পূর্ণ আয়াত। এই মতের পরিপোষক হইলেন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত ইব্ন উমর (রা), হযরত ইব্ন জুবায়র (রা), হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত আলী (রা), 'আতা, তাউস, সাঈদ ইব্ন জাবির, মাকহূল, যুহরী, আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক, ইমাম শাফেঈ। এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহমদ, ইসহাক ইব্ন রাহবিয়াহ্, আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইব্ন সাল্লাম প্রমুখ।

ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফা এবং তাঁহাদের শিষ্যবৃন্দ বলেন, উহা কোন সূরারই পূর্বে অবস্থিত আয়াত বা আয়াতাংশ নহে। তাহাদের মতে 'বিসমিল্লাহ্' কুরআন মজীদের কোন আয়াত নহে। সূরার প্রারম্ভে শুধুমাত্র বরকত হাসিলের জন্য উহা সংযোজিত হইয়াছে।

ইমাম শাফেঈর একটি অভিমত এই যে, উহা সূরা ফাতিহার শুরুতে অবস্থিত একটি আয়াত। তবে অন্য কোন সূরার পূর্বে অবস্থিত 'বিসমিল্লাহ্' সেই সূরার আয়াত নহে।'

ইমাম শাফেঈর অপর এক মতে উহা প্রত্যেক সূরার পূর্বে অবস্থিত সেই সূরার একটি আয়াতাংশ। অবশ্য তাঁহার এই শেষোক্ত অভিমত দুইটি আদৌ তাঁহার কিনা তাহা নিশ্চিত নহে।

দাউদ জাহেরী বলেন, উহা প্রত্যেক সূরার প্রারম্ভে অবস্থিত একটি স্বতন্ত্র আয়াত। তবে কোন সূরার অংশ নহে। ইমাম আহমদ হইতেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। আবূল হাসান কারখী হইতেও আবূ বকর রাযী অনুরূপ অভিমত উধ্বৃত করিয়াছেন। আবূ বকর রাযী ও আবূল হাসান কারখী উভয়ই ইমাম আবূ হানীফার শীর্ষস্থানীয় শিষ্য ছিলেন। অন্যত্র এইসব ব্যাপার বিশদভাবে আলোচিত হইবে। এতক্ষণে 'বিসমিল্লাহ' শরীফের সূরা ফাতিহার আয়াত হওয়া প্রসঙ্গে উপরোক্ত আলোচনা করা হইল।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সহীহ সনদে ইমাম আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা)-এর নিকট بسم الله الرحمن الرحيم আয়াতটি নাযিল হইলেই তিনি বুঝিতেন, 'একটি সূরা শেষ হইল এবং আরেকটি সূরা শুরু হইতেছে।'

হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্ নিশাপুরীও স্বীয় সংকলন গ্রন্থ মুস্তাদরাকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতেও উহা حديث مرسل (বিচ্ছিন্ন) হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত উম্মে সালামা (রা) হইতে ইব্ন খুযায়মা তাঁহার 'সহীহ' নামক সংকলন গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) নামাযে সূরা ফাতিহার পূর্বে بسم الله الرحمن الرحيم পাঠ করিতেন এবং উহাকে আয়াত হিসাবে গণ্য করিতেন।'

হাদীসটি উম্মে সালামা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ মালীকাহ, ইব্ন জুরায়জ, উমর ইব্ন হারূন বলখী প্রমুখ রাবী বর্ণনা করেন। অবশ্য উমর ইব্ন হারূন বলখী একজন দুর্বল রাবী। তবে ইমাম দারা কুতনী হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আলী (ক), হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোল্লিখিত বিভিন্ন অভিমতের ভিত্তিতে বিভিন্ন ফকীহ সরব নামাযে বিসমিল্লাহ্ সরবে বা নীরবে পাঠ করা সম্পর্কে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

যাঁহারা উহাকে সূরা ফাতিহার অংশ কিংবা যে কোন সূরার পূর্বে অবস্থিত স্বতন্ত্র আয়াত বলেন না, তাঁহারা উহাকে সরবে পড়িতে নিষেধ করেন। যাঁহারা উহাকে সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার পূর্বে অবস্থিত স্বতন্ত্র আয়াত বলেন, তাঁহারাও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন, উহা সূরাসমূহের পূর্বে অবস্থিত উহাদের আয়াত বা আয়াতাংশ, তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

ইমাম শাফেঈর মাযহাব এই যে, সরব নামাযে উহাকে সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার সহিত সরবে পড়িতে হইবে। ইহা বিপুল সংখ্যক সাহাবা, তাবেঈ ও বিভিন্ন ইমামের মাযহাবও বটে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত ইব্ন উমর (রা), হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং হযরত মু'আবিয়া (রা) উহা সরবে পড়িতেন। ইমাম ইব্ন আবদুল বার ও ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) ও হযরত আলী (ক) উহা সরবে পড়িতেন। খতীব বর্ণনা করেন, খোলাফায়ে রাশেদীন উহা সরবে পড়িতেন। অবশ্য খতীবের বর্ণিত রিওয়ায়েতের কোন সমর্থন মিলে না। নিম্নোক্ত তাবেঈগণ উহা সরবে পড়িতেন ঃ

সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরামা, আবূ কুলাবাহ, যুহরী, আলী ইব্ন হাসান, মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হাসান, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব, 'আতা, তাউস, মুজাহিদ, সালেম, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল করযী, উবায়দ, আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম, আবূ ওয়ায়েল, ইব্ন সীরীন, মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির, আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, নাফে' [ইব্ন উমর (রা)-এর গোলাম], যায়দ ইব্ন আসলাম, উমর ইব্ন আবদুল আযীয, আযরাক ইব্ন কায়স, হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত, আবূশ শাছা', মাকহুল এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন মা'কাল।

উপরোল্লিখিত ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে উপস্থিত যুক্তি ও প্রমাণ এই যে, বিসমিল্লাহ যেহেতু সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার অংশ, তাই সরব নামাযে সূরার অন্যান্য আয়াতের মতই উহা সরবে পড়িতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত ইমাম নাসাঈ তাঁহার সুনান সংকলনে, ইব্‌ন খুযায়মা ও ইব্‌ন হাব্বান তাঁহাদের স্ব-স্ব 'সহীহ' সংকলনে এবং হাকিম তাঁহার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেন ঃ

'একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নামাযে সরবে বিসমিল্লাহ পড়িলেন। তারপর নামায শেষে বলিলেন, নবী করীম (সা)-এর নামাযের সহিত আমার নামাযেরই অধিকতর সাদৃশ্য রহিয়াছে।'

ইমাম দারা কুতনী, ইমাম বায়হাকী ও খতীব প্রমুখ উহাকে সহীহ হাদীস বলিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) بسم الله الرحمن الرحيم দিয়া নামায আরম্ভ করিতেন।'

ইমাম তিরমিযী বলেন, উক্ত হাদীসের সনদ দুর্বল। হাকিম তাঁহার মুস্তাদরাক সংকলনে বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) নামাযে সরবে বিসমিল্লাহ্ পড়িতেন।'

হাকিম উক্ত হাদীসকে 'সহীহ হাদীস' বলিয়াছেন। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা)-এর কিরাআত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) মদ্দের সহিত উহা টানিয়া টানিয়া পড়িতেন। তিনি মদ্দের সহিত 'বিসমিল্লাহির' মদ্দের সহিত 'রাহমানির' ও মদ্দের সহিত 'রহীম' পড়িতেন।'

হযরত উম্মে সালমা, (রা) হইতে ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদে, ইমাম আবূ দাউদ স্বীয় সুনানে ও হাকিম স্বীয় মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) ওয়াকফ (বিরতি) সহ কিরাআত পড়িতেন। তিনি (বিরতি চিহ্নে থামিয়া থামিয়া) এইরূপে পড়িতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ -

ইমাম দারা কুতনী উহাকে 'সহীহ হাদীস' বলিয়াছেন। হযরত আনাস (রা) হইতে হাকিম স্বীয় মুস্তাদরাকে এবং ইমাম আবূ আবদুল্লাহ শাফেঈ স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ

'একদা হযরত মু'আবিয়া (রা) মদীনা শরীফে নামায আদায় করিতে গিয়া উহাতে بسم الله الرحمن الرحيم পড়িলেন না। উপস্থিত মুহাজির সাহাবাবৃন্দ উক্ত কার্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। দ্বিতীয়বার তিনি বিসমিল্লাহ সহ নামায আদায় করিলেন।

নামাযে সরবে বিসমিল্লাহ্ পড়ার সপক্ষে উপরোক্ত হাদীস ও আছারই যথেষ্ট। উক্ত অভিমতের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য আরও হাদীস ও আছারের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উহার বিরোধী অসমর্থিত হাদীস ও রিওয়ায়েতের পর্যালোচনা, সেইগুলির সনদের দুর্বলতা ও সবলতা ইত্যাদি আলোচনার স্থান ইহা নহে। অন্যত্র তাহা আলোচনা করা হইবে।

আরেকদল ফকীহ ও বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, মুসল্লীরা নামাযে বিসমিল্লাহ্ নীরবে পড়িবে। ইহা খোলাফায়ে রাশেদীন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্ফাল (রা), বিপুল সংখ্যক তাবেঈ এবং পরবর্তী যুগের ফকীহ ইমাম আবূ হানীফা, সুফিয়ান ছাওরী ও ইমাম আহমদের অভিমত।

ইমাম মালিক বলেন, মুসল্লীরা সরবে কি নীরবে কোনভাবেই বিসমিল্লাহ্ পড়িবে না। ইমাম মালিকের সমর্থকগণ তাঁহার অভিমতের সপক্ষে নিম্নলিখিত রিওয়ায়েত পেশ করেন।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন ঃ 'নবী করীম (সা) তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিতেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ। বলিয়া কিরাআত আরম্ভ করিতেন।'

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন ঃ 'হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম (সা), হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমান (রা)-এর পিছনে নামায পড়িয়াছি। তাঁহারা 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দ্বারা (কিরাআত) শুরু করিতেন।' ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় ইহাও রহিয়াছে যে, তাঁহারা কিরাআতের পূর্বে বা পরে বিসমিল্লাহ্ পড়িতেন না।'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) হইতেও 'সুনান' সংকলনে অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।

উপরে ভিন্ন ভিন্ন মতের সপক্ষে বিভিন্ন রিওয়ায়েত পেশ করা হইল। উপরোক্ত অভিমতসমূহের মধ্যকার পার্থক্য খুবই সামান্য। কারণ, এই ব্যাপারে সকলেই একমত যে, সরবে কি নীরবে বিসমিল্লাহ্ পাঠকারী সকলের নামাযই শুদ্ধ হইবে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ও সকল অনুগ্রহ তাঁহারই তরফ হইতে সমাগত।

বিসমিল্লাহ্র ফযীলত

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, ওয়াহাব আল-জুনদী, সালাম ইব্ন ওয়াহাব আল-জুনদী, যায়দ ইব্ন মুবারক সানআনী, জা'ফর ইব্ন মুসাফির, আবূ হাতিম, আল্লামা ইমাম আবিদ আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হাতিম স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ

"একদা হযরত উসমান (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট بسم الله الرحمن الرحيم সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, "উহা আল্লাহ্ তা'আলার একটি নাম। চোখের পুতুল ও উহার শ্বেতাংশ যেরূপ পরস্পর সন্নিহিত ও ঘনিষ্ঠ, আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠতম নাম ও বিসমিল্লাহ সেরূপ পরস্পর সন্নিহিত ও ঘনিষ্ঠ।"

আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যাও উপরোক্ত হাদীসটি উহার অন্যতম রাবী যায়দ ইব্ন মুবারক হইতে উহার ঊর্ধ্বতন সনদাংশ সহ ও পরবর্তী স্তরে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্ন মুবারক ও সুলায়মান ইব্ন আহমদের সনদে বর্ণনা করেন।

হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতিয়্যা, মুসআব, ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহিয়া, ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ এবং পরবর্তী স্তরে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি সূত্রে হাফিজ ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা তাঁহাকে শিক্ষকের নিকট অর্পণ করিলেন যাহাতে শিক্ষক তাঁহাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করেন। শিক্ষক তাঁহাকে বলিলেন 'লিখ'। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লিখিব? শিক্ষক বলিলেন, লিখ بسم الله الرحمن الرحيم। তিনি প্রশ্ন করিলেন, বিসমিল্লাহ্র অর্থ ও তাৎপর্য কি? তিনি বলিলেন الباء। অক্ষরের

তাৎপর্য হইতেছে بهاء (মহান মর্যাদা), السين। অক্ষরের তাৎপর্য হইতেছে سناء (নূর বা জ্যোতি), الميم। অক্ষরের তাৎপর্য হইতেছে مملكة (সার্বভৌম ক্ষমতা), الله। শব্দের অর্থ হইতেছে (সকল প্রভুর প্রভু), الرحمن। শব্দের অর্থ হইতেছে, দুনিয়া ও আখিরাতের করুণাদাতা এবং الرحيم। শব্দের অর্থ হইতেছে, আখিরাতে কৃপা বর্ষণকারী।'

হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতিয়্যা, মুসআব ও ইব্ন মাস্উদ, জনৈক অজ্ঞাতনামা বর্ণনাকারী, ইব্ন আবূ মালীকাহ, ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহিয়া, ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ, ইবরাহীম ইব্ন আ'লা ওরফে ইব্ন রিবরীক প্রমুখ বর্ণনাকারীর সূত্রে ইব্ন জারীরও উপরোক্ত রিওয়ায়েত উদ্ধৃত করেন। তবে উপরোক্ত রিওয়ায়েত অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। হয়ত উহা নবী করীম (সা) ভিন্ন অন্য কাহারও উক্তি। ইহাও হইতে পারে যে, উহা ইসরাঈলীদের মনগড়া কাহিনী। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। ইব্ন জুয়াইবির অনুরূপ একটি কাহিনী যিহাক হইতে তাহার নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বুরাইদার পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরাইদা সুলাইমান ইব্ন বুরাইদা অথবা আবদুল করীম আবূ উমাইয়া, ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ প্রমুখ রাবীর সনদে ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলেন, আমার প্রতি এমন একটি আয়াত নাযিল হইয়াছে যাহা সুলায়মান (আ) ও আমি ভিন্ন অন্য কোন নবীর প্রতি নাযিল হয় নাই। উহা হইতেছে, بسم الله الرحمن الرحيم

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন আবূ রিহাহ, উমর ইব্ন যর, মু'আফী ইব্ন ইমরান, আবদুল করীম কবীর ইব্ন মু'আফী ইব্ন ইমরান ও ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন ঃ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' নাযিল হইবার পর মেঘ পূর্বদিকে সরিয়া গেল, বায়ু প্রবাহ বন্ধ হইয়া গেল, সমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, চতুষ্পদ প্রাণীসমূহ উৎকর্ণ হইল, অগ্নিপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশ শয়তানমুক্ত হইল এবং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মর্যাদা ও পরাক্রমের শপথ করিয়া বলিলেন- তাঁহার এই নাম যাহাতে উৎকীর্ণ হইবে তাহাতেই তিনি বরকত দিবেন।'

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়েল, আ'মাশ ও ওয়াকী' বর্ণনা করেন ঃ

'যদি কেহ জাহান্নামের উনিশ দারোগার হাত হইতে আল্লাহ্র রহমতে মুক্তি পাইতে চায় তাহা হইলে সে যেন بسم الله الرحمن الرحيم পাঠ করে। আল্লাহ্ তা'আলা উহার এক এক অক্ষরকে তাহার এক এক দারোগার হাত হইতে রক্ষাকারী বানাইবেন।'

ইব্ন আতিয়্যা এবং কুরতুবীও উক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্ন আতিয়্যা উহার তাৎপর্যও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহার সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করিয়াছেন ঃ

'একদা এক ব্যক্তি ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا দোয়াটি পাঠ করিলে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমি দেখিতে পাইলাম যে, ত্রিশোর্ধ সংখ্যক ফিরিশতা উহা লইয়া দ্রুত যাইতেছেন।'

উক্ত দোয়ায় ত্রিশোর্ধ সংখ্যক অক্ষর রহিয়াছে বলিয়াই উহার নেকীবাহক ফেরেশতার সংখ্যাও ত্রিশোর্ধ ছিল। ইব্ন আতিয়্যা হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর উক্ত অভিমতের সমর্থনে এইরূপ আরও হাদীস পেশ করিয়াছেন।

নবী করীম (সা) এর সওয়ারীতে তাঁহার পশ্চাতে উপবেশনকারী জনৈক সাহাবা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ তামীমা, 'আসিম, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

'সওয়ারী সহচর বলেন, একদিন নবী করীম (সা) সহ তাঁহার সওয়ারী হোঁচট খাইল। আমি বলিয়া উঠিলাম, শয়তান গোল্লায় যাউক। নবী করীম (সা) বলিলেন, শয়তান গোল্লায় যাউক কথাটি বলিও না। উহা বলিলে শয়তান গর্বে ফুলিয়া ওঠে এবং ভাবে 'আমিই তাহাকে নিজ ক্ষমতায় ফেলিয়া দিয়াছি।' পক্ষান্তরে যদি 'বিসমিল্লাহ' পাঠ কর তাহা হইলে সে দুঃখ ও সংকোচে ক্ষুদ্র মক্ষিকার মত হইয়া যাইবে।'

আবুল মালীহ ইব্ন উসামা ইব্ন উমায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে তামীমা হাজিমী, খালিদ হাজ্জা প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম নাসাঈ তাঁহার 'আল ইয়াওমু ওয়াল লায়লা' গ্রন্থে এবং ইব্ন মারদুবিয়া তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ

"একদিন আমি নবী করীম (সা)-এর সওয়ারীতে তাঁহার পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলাম।' অতঃপর রাবী উপরোক্ত ঘটনা উল্লেখের পর বলেন, 'নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন, এইরূপ বলিও না, উহাতে শয়তান ফুলিয়া উঠিয়া ঘরের মত (বিশাল বস্তু) হইয়া যাইবে। বরং 'বিসমিল্লাহ্' বলিও। উহাতে সে মক্ষিকার মত হইয়া যাইবে।"

বিসমিল্লাহ্র বরকত ও প্রভাবেই শয়তানের এই দশা ঘটে। এই কারণেই প্রত্যেক কথা ও কার্যের পূর্বে বিসমিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'বিসমিল্লাহ্ ব্যতীত কোন কাজ শুরু হইলে উহা বরকতশূন্য থাকে।' পায়খানায় যাওয়ার সময়ও বিসমিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। অনুরূপ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ওযূ করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এবং হযরত আবূ সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) হইতে মুসনাদে আহমদ ও সুনান সংকলনে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাম না লইয়া ওযূ করে তাহার ওযূ হয় না।"

উক্ত হাদীস حديث حسن (বিশেষ বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য)।

কোন কোন ফকীহ বলেন, স্মরণে থাকিলে ওযূ করার আগে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। কেহ কেহ আবার বলেন, স্মরণ থাকুক আর না থাকুক, ওযূ করার প্রাক্কালে বিসমিল্লাহ্ বলা ওয়াজিব।

ইমাম শাফেঈ সহ একদল ফকীহর মতে যবেহ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। আরেক দল বলেন, স্মরণে থাকিলে যবেহের পূর্বে বিসমিল্লাহ্ বলা ওয়াজিব। অন্যদল বলেন, স্মরণ থাকুক বা না থাকুক, যবেহ করার আগে উহা বলা ওয়াজিব। এই সম্পর্কে ইন্শাআল্লাহ্ যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচনা করিব।

ইমাম রাযী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বিসমিল্লাহ্র ফযীলতের কতিপয় হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হাদীস এই ঃ

'হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- যখন তুমি স্বীয় স্ত্রীর সহিত যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হও, তখন আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিও। যদি তোমার ঔরসে কোন সন্তান জন্ম নেয়, তাহা হইলে তাহার নিজের ও বংশধরদের নিঃশ্বাসের সমসংখ্যক নেকী তোমাকে প্রদান করা হইবে।'

ইমাম রাযীর উধৃত উক্ত হাদীস ভিত্তিহীন। আমি (ইব্ন কাছীর) নির্ভরযোগ্য কি অনির্ভরযোগ্য কোন হাদীস গ্রন্থে উক্ত হাদীস দেখি নাই।

আহারের পূর্বেও বিসমিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

'নবী করীম (সা) স্বীয় পালক পুত্র (হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর পূর্ব স্বামীর সন্তান) উমর ইব্ন আবূ সালামাকে একদিন বলেন, আল্লাহ্র নাম লইয়া খাও, ডান হাতে খাও এবং যে খাদ্য তোমার দিকে থাকে তাহা হইতে খাও।'

একদল ফকীহর মতে আহারের পূর্বে বিসমিল্লাহ্ বলা ওয়াজিব। স্ত্রী সহবাসের পূর্বেও বিসমিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যদি কেহ স্ত্রী সংগমের পূর্বে বলে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

(আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করিতেছি। হে আল্লাহ্ শয়তানকে আমাদের নিকট হইতে এবং আমাদিগকে যাহা দান করিবে তাহা হইতে দূরে রাখ) - তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে কোন সন্তান দিলে শয়তান কখনও তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।'

بسم الله বাক্যাংশটি কোন্ উহ্য শব্দের সহিত সম্পৃক্ত সে সম্বন্ধে ব্যাকরণবিদদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল ব্যাকরণবিদ বলেন, উহা একটি উহ্য অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত। আরেকদল উহাকে একটি উহ্য সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত করেন। উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা যায়, মতভেদ খুবই সামান্য। কারণ, উভয় দলের মতের ভিত্তিতে بسم الله -এর সহিত সমাপিকা কি অসমাপিকা ক্রিয়া যাহাই যোগ করা হউক না কেন, সংগঠিত পূর্ণ বাক্যের অর্থে তেমন কোন তারতম্য হয় না।

অবশ্য প্রত্যেক দলের মতের সমর্থনে কুরআন মজীদে দলীল রহিয়াছে। যাহারা বলেন بسم الله এর পূর্ণরূপ হইতেছে بسم الله ابتدائى (আল্লাহ্র নামে আমার কার্যারম্ভ) তাহারা এই আয়াত পেশ করেন ঃ

وَقَالَ ارْكَبُوْا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ الرَّحِيْمٌ

(অনন্তর সে (নূহ) বলিল, তোমরা উহাতে চড়, আল্লাহ্র নামে উহার গতি ও স্থিতি। নিশ্চয় আমার প্রভু ক্ষমাশীল, করুণাময়।)

আরেকদল বলেন, بسم الله -এর পূর্ণরূপ হইতেছে ابدا بسم الله (আল্লাহ্র নামে আরম্ভ কর) অথবা ابتدات بسم الله (আল্লাহ্র নামে আমি আরম্ভ করিলাম)। ক্ষেত্রভেদে

কখনও অনুজ্ঞাবোধক, কখনও বা সংবাদ জ্ঞাপক বাক্য হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে পড়।)

মূলত উভয় মতই সঠিক ও শুদ্ধ। কারণ, সমাপিকা ক্রিয়ার জন্য অসমাপিকা ক্রিয়া অপরিহার্য। অতএব সমাপিকা বা অসমাপিকা যে কোন প্রকারের ক্রিয়ার সহিত উহা সম্পৃক্ত হইতে পারে। যে কাজ আরম্ভ করা হইবে তাহার প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী সমাপিকা বা অসমাপিকা ক্রিয়া উহ্য মানিতে হইবে। উহা দাঁড়ানো, বসা, খাওয়া, পান করা, কিরাআত পড়া, ওযূ করা, নামায পড়া ইত্যাকার যে কোন ক্রিয়া হইতে পারে। এই সকল ক্রিয়া যাহাতে বরকতময় ও সুসম্পন্ন হয় এবং আল্লাহ্র নিকট কবূল হয় তজ্জন্যই যে কোন ক্রিয়া আল্লাহ্র নামে শুরু করা উচিত ও বিধেয়। আল্লাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক, আবূ রওক ও বাশার ইব্ন আম্মারা প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম ইব্ন জারীর ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা)-এর নিকট হযরত জিবরাঈল (আ) সর্বপ্রথম এই বাণী লইয়া অবতীর্ণ হন, (হে মুহাম্মদ) বলুন, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم। অতঃপর বলুন بسم الله الرحمن الرحيم

রাবী বলেন, হযরত জিবরাঈল (আ)-এর উদ্দেশ্য ছিল, নবী করীম (সা) যেন তিলাওয়াত, উঠা, বসা, এক কথায় সকল কাজই আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করেন।

اسم -এর তাৎপর্য

কোন বস্তুর اسم (নাম) এবং উহার مسمّى (সত্তা) এই দুইয়ের সম্পর্কের প্রকৃতি নিরূপণ লইয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল বলেন, নাম ও সত্তা এক ও অভিন্ন। আবূ উবায়দা, সিবওয়াই (ব্যাকরণবিদ), বাকিল্লানী ও ইব্ন ফুরক এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

ইমাম রাযী (ইবনুল খতীব অর-রী) বলেন, বস্তুর নাম ও সত্তা অভিন্ন বটে, কিন্তু নাম ও নামকরণ (تسمية) এক নহে। পক্ষান্তরে মুতাযিলা সম্প্রদায় বলে বস্তুর নাম ও নামকরণ অভিন্ন বটে, কিন্তু নাম ও সত্তা এক নহে।

আমার (ইব্ন কাছীর) মতে ইহাই গ্রহণযোগ্য যে, বস্তুর اسم উহার مسمى নহে, تسمية ও নহে, اسم -ই। অর্থাৎ নাম আদৌ সত্তা নহে, নামকরণও নহে, নাম নামই (অন্য কিছু) একত্রীকৃত কিছু অক্ষর-ও কতিপয় স্বরের সমাহার যে কোন বস্তুসত্তা নহে, তাহা সহজেই অনুমেয়। যদি কেহ বলেন, বস্তুর নামের তাৎপর্য হইতেছে ইহার সত্তা তাহা অবশ্যই বিতর্কাতীত। তাই তাহা আলোচনায় সময়ক্ষেপণ নিষ্প্রয়োজন।

ইমাম রাযী প্রমাণ করিতে চাহেন যে, নাম ও সত্তা পৃথক ও স্বতন্ত্র। তিনি যুক্তি দেখান যে, কোন কোন ক্ষেত্রে নামের অস্তিত্ব মিলে, কিন্তু উহার সত্তার অস্তিত্ব থাকে না। যেমন المعدوم (অস্তিত্বহীন বস্তু) নামটি। পৃথিবীতে 'অস্তিত্বহীন বস্তু' নামটি বিদ্যমান বটে, কিন্তু উহার কোন সত্তার অস্তিত্ব নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার একই বস্তুর একাধিক নাম থাকে। যেমন সমার্থক শব্দাবলী। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার একই নামের একাধিক সত্তা বিদ্যমান। যেমন একাধিক অর্থবোধক শব্দাবলী। এই সকল বিষয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বস্তুর নাম ও উহার সত্তা সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। তাহা ছাড়া বস্তুর নাম হইল দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতাবিহীন

عرض (বিষয়)। সুতরাং উহা কোন পদার্থই নহে। পক্ষান্তরে সত্তা হইতেছে সম্ভাব্য অথবা ও গভীরবিহীন (ذات)। উহা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতার কোন এক বা একাধিক গুণের অধিকারী।

নাম ও সত্তার পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে আরও প্রমাণ রহিয়াছে। মূলত নাম ও সত্তা এক হইলে 'আগুন' ও 'বরফ' এই নাম দুইটি মুখে উচ্চারণ করা মাত্র উচ্চারণকারী উহার উষ্ণতা ও শৈত্য অনুভব করিত। অন্যান্য নামের বেলায়ও এই কথা প্রযোজ্য।

আরও প্রমাণ রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا 'আল্লাহ্‌র সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে। তোমরা সেইসব নামে তাঁহাকে ডাক।'

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রহিয়াছে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার একাধিক নাম রহিয়াছে। অথচ এই সকল নামের সত্তা শুধু একটিই। উহা হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার ذات বা সত্তা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (তোমার মহান প্রভুর নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা কর।)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নামসমূহকে নিজের সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছেন। একটি জিনিস অন্য একটি জিনিসের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইলে জিনিস দুইটির স্বাতন্ত্র্য বহাল থাকে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও সত্তা অভিন্ন নহে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন বস্তু বা ব্যক্তির নাম ও সত্তা এক ও অভিন্ন নহে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ فادعوه بها (অনন্তর তোমরা সেইসব নামে তাঁহাকে ডাক)। যাহাকে ডাকা হয় এবং যাহা দ্বারা ডাকা হয়, এই দুই ব্যাপার এক নহে। অতএব আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও সত্তা অভিন্ন নহে। ইহা দ্বারা নাম ও সত্তার স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হয়।

পক্ষান্তরে যাহারা বলেন যে, নাম ও সত্তা এক ও অভিন্ন, তাহারা নিম্নোক্ত আয়াতকে নিজেদের স্বপক্ষে পেশ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ "তোমার প্রভুর পরাক্রমশালী মহা সম্মানিত নাম বরকতময়।"

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নিজকে বরকতময় আখ্যায়িত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাই হইতেছে বরকতময়। অতএব তাঁহার নাম ও সত্তা উভয়ই এক। ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন বস্তু বা ব্যক্তির নাম ও সত্তা এক ও অভিন্ন।

উপরোক্ত যুক্তির উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও নাম উভয়ই বরকতময়। আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার বরকতের কারণেই তাঁহার নামও বরকতময়। তাঁহার সত্তা গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত বলিয়া তাঁহার নামও গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত। এই কারণেই উপরোক্ত আয়াতে তিনি তাঁহার নামকে বরকতময় বলিয়াছেন।

নাম ও সত্তাকে যাহারা অভিন্ন বলেন, তাহাদের অপর যুক্তি হইল এই যে, কেহ যদি তাহার স্ত্রী যয়নাব সম্বন্ধে বলে, 'যয়নাবকে তালাক দিলাম' তাহা হইলে তাহার স্ত্রী যয়নাব তালাক

প্রাপ্তা হইয়া যায়। নাম ও সত্তা যদি অভিন্ন না হইত এবং তাহা যদি পরস্পর স্বতন্ত্র হইত, তাহা হইলে এরূপ ক্ষেত্রে যয়নাব তালাকপ্রাপ্তা হইত না। কারণ লোকটা যয়নাবের সত্তাকে নহে, বরং 'যয়নাব' নামকে তালাক দিয়াছে।

উপরোক্ত যুক্তির উত্তর এই যে, 'লোকটির কথায় যয়নাব নাম্নী সত্তা তালাকপ্রাপ্তা হইয়া যায়।'

ইমাম রাযী আরেকটি কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'নাম ও নামকরণ' এই দুইটি এক নহে। কোন সত্তাকে বুঝাইবার জন্য নির্ধারিত প্রতীক হইল 'নাম'। পক্ষান্তরে 'নামকরণ' হইল সেই প্রতীককে নির্ধারিত বস্তুর সহিত সংযোগ কার্য।

الله শব্দের গঠন প্রকৃতি ও তাৎপর্য

الله শব্দটি মহাবিশ্বের একমাত্র মহান প্রতিপালক মহাপ্রভুর নাম। কেহ কেহ বলেন, উহাই الاسم الاعظم (ইসমে আজম)। কারণ, আল্লাহ শব্দের মধ্যে সকল গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰه اِلاَّ هُوَ - عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ - هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ - اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ - سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى - يُسَبِّحُ لَه مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

(আল্লাহ্ হইতেছেন সেই সত্তা যিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই। তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত। তিনি পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু। আল্লাহ্ হইতেছেন সেই সত্তা যিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, পবিত্র, শান্তিদাতা, আশ্রয়দাতা, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাক্ষমতাবান, সর্বোন্নত মর্যাদার অধিকারী। মানুষ তাঁহার সহিত যাহাদিগকে অংশীদার বানায় তাহাদের হইতে তিনি পূর্ণমাত্রায় পবিত্র। আল্লাহ্ হইতেছেন সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক, শ্রেষ্ঠতম রূপদাতা, তাঁহার সুন্দর সুন্দর গুণবাচক নাম রহিয়াছে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল কিছুই তাঁহার পবিত্রতা-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত অন্যান্য সকল গুণকে الله-এর সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। অনুরূপভাবে অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلِلّٰهِ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا (আল্লাহ্র সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে, তোমরা সেইসব নামে তাঁহাকে ডাক।)

তিনি আরও বলেন ঃ

قُلِ ادْعُو اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامًا تَدْعُوْا فَلَهُ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى "তুমি বলিয়া দাও, আল্লাহ্কে ডাক, অথবা রহমানকে ডাক, যাহাকেই ডাক না কেন, তাঁহার (আল্লাহ্র) সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রহিয়াছে। যে ব্যক্তি উহা আয়ত্ত করিবে সে জান্নাতে যাইবে।'

ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতেও আল্লাহ্ তা'আলার নামের সংখ্যার উল্লেখ রহিয়াছে। অবশ্য উভয় রিওয়ায়েতে নামের সংখ্যার বিষয়ে বিভিন্নতা রহিয়াছে। ইমাম রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে জনৈক বর্ণনাকারী হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার পাঁচ হাজার নাম রহিয়াছে। এক হাজার নাম আল-কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর ভিতরে, এক হাজার নাম তাওরাত কিতাবে, এক হাজার নাম ইঞ্জীল কিতাবে এবং এক হাজার নাম যবূর কিতাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য এক হাজার নাম লওহে মাহফূজে লিখিত রহিয়াছে।

'আল্লাহ্' একটি অনন্য নাম। মহাবিশ্বে একক মহান প্রতিপালক প্রভু ভিন্ন অন্য কেহ উক্ত নামে অভিহিত নহে। এই কারণেই আরবী ভাষায় উহার সম-ধাতুজ কোন সমাপিকা ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয় না। তাই একদল বিশেষজ্ঞ বলেন যে, উহা اسم جامد যাহা গঠনগত দিক দিয়া একক শব্দ।[১] ইমাম কুরতুবী এই মতের সমর্থক বিপুল সংখ্যাক বিশেষজ্ঞের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ইমাম শাফেঈ, খাত্তাবী, ইমামুল হারামাইন, ইমাম গায্যালী প্রমুখ সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ খলীল ও সিবওয়াই বলেন ঃ الله শব্দের অন্তর্গত আলিফ ও লাম উহার অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রমাণ স্বরূপ খাত্তাবী এই উদাহরণ পেশ করেন যে, সম্বোধনে আমরা يا الله বলিয়া থাকি; কিন্তু يا الرحمن বলি না। ইহাতে বুঝা যায়, উহার ال অক্ষরদ্বয় উহার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাহা না হইলে উহাতে ال বহাল রাখিয়া সম্বোধন অব্যয় স্থাপন করা হইত না।

কেহ কেহ বলেন, الله শব্দটি اسم مشتق যাহা অন্য শব্দ হইতে গঠিত শব্দ। এই অভিমতের প্রবক্তাগণ কবি রুবাহ ইব্‌ন আজ্জাজের নিম্নোক্ত কবিতাংশকে নিজেদের অভিমতের পক্ষে উপস্থাপন করেন ঃ

لله در الغانيات المده - سبحن واسترجعنا من تألهى

'প্রশংসাকারিণী গায়িকাগণ কতই না সৌভাগ্যবতী। কারণ, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছে এবং মা'বূদ বনিয়া যাওয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।'

এখানে কবি تأله শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। উহা ا - ل - ه। এই তিনটি আরবী অক্ষর দ্বারা গঠিত একটি مصدر উহার আরেক রূপ হইতেছে الاهة। যাহার সমাপিকা ক্রিয়ার রূপ হইতেছে اله يأله (আলাহা-য়্যা'লুহু)। আল্লাহ্ শব্দের মূল অক্ষরও ا - ل - ه। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ শব্দের ধাতু হইতে সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া তৈরী হয়। অতএব উহা اسم مشتق।

---

১. যে বিশেষ্য বা বিশেষণ না কোন শব্দ হইতে গঠিত এবং না উহা হইতে কোন শব্দ গঠিত হয় তাহাকে اسم جامد বলা হয়। পক্ষান্তরে যে বিশেষ্য বা বিশেষণ অন্য শব্দ হইতে গঠিত এবং উহা হইতে অন্য শব্দ গঠিত হয় তাহাকে اسم مشتق বলা হয়।

অনুরূপভাবে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি এইরূপ পড়িতেন ঃ

اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا الْاَرْضِ وَيَذَرُكَ وَالاٰهَتَكَ "আপনি কি মূসা ও তাহার গোত্রকে এমন সুযোগ দিবেন যাহাতে তাহারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা ঘটায় এবং আপনাকে আর আপনার দাসত্বকে ত্যাগ করে?"

অর্থাৎ লোকেরা ফিরআউনের দাসত্ব করিত এবং সে কাহারও দাসত্ব করিত না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)- এর কিরাআত অনুযায়ী আয়াতে الاهة অসমাপিকা ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে উহা আল্লাহ্ শব্দের সমধাতুজাত অসমাপিকা ক্রিয়া।

মুজাহিদও الله শব্দকে اسم مشتق বলিয়াছেন। উক্ত অভিমতের পক্ষে কেহ কেহ নিম্নের আয়াত পেশ করেন ঃ

وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ (তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বত্রই 'আল্লাহ্'।)

উপরোক্ত মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলিতেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ "তিনি সেই সত্তা যিনি গগনমণ্ডলীতেও প্রভু, পৃথিবীতেও প্রভু।"

প্রথম আয়াতে 'আল্লাহ্' শব্দটি দ্বিতীয় আয়াতে 'ইলাহ' শব্দের মতই اسم مشتق রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ, উহার সহিত 'ফিস্ সামাওয়াতি' ও 'ফিল্ আরদি' স্থানবাচক শব্দদ্বয় সম্পৃক্ত হইয়াছে। ইহা اسم مشتق -এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ সিবওয়াই বিখ্যাত ব্যাকরণবেত্তা খলীল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ الله শব্দটি পূর্বে اله ছিল উহা فعال ওযনে গঠিত শব্দ ছিল। প্রথম অক্ষর أ (হামযাহ) বিলুপ্ত হইয়া তদস্থলে ال যুক্ত হইয়াছে। সিবওয়াই উহার নজীর হিসাবে দেখান যে, الناس শব্দটি পূর্বে اناس ছিল এবং প্রথম অক্ষর (হামযাহ) বিলুপ্ত হইয়া তদস্থলে ال স্থাপিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, الله শব্দটি পূর্বে لاه ছিল। অধিকতর অর্থ প্রকাশার্থে উহাতে ال সংযুক্ত হইয়াছে। সিবওয়াইরও এই মত। নিম্নোক্ত পংক্তিতে উহার ব্যবহার দেখা যায় ঃ

لاه ابن عمك لا افضلت فى حسب ـ عنى ولا انت ديانى فتخزونى

'তোমার চাচাত ভাই (কবি নিজে) একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। আমার উপর না তোমার বংশগত মর্যাদার প্রাধান্য রহিয়াছে, না কোনরূপ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাই তুমি আমাকে অপমান করিতে পার না।'

খ্যাতনামা ব্যাকরণবিদ কাসাঈ ও ফার্‌রা বলেন, الله শব্দটি পূর্বে الاله ছিল। মধ্যাক্ষর (হামযাহ) বিলুপ্ত করিয়া প্রথম ل কে দ্বিতীয় ل এর সহিত مدغم (যুক্ত) করা হইয়াছে। ফলে الاله শব্দটি الله শব্দে পরিণত হইয়াছে। যেমন لكنا هو الله ربى আয়াতের অন্তর্গত لكنا শব্দটি পূর্বে لكن انا ছিল। দ্বিতীয় শব্দের আদ্যাক্ষরটি ن এর সহিত مدغم (যুক্ত) করা

হইয়াছে ; এইরূপে لكن انا শব্দটি لكنا হইয়াছে। উল্লেখ্য, হাসান উহাকে পূর্বরূপেই পড়িতেন।

الله শব্দের অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী বলেন, الله শব্দটি وله শব্দ হইতে গঠিত হইয়াছে। وله অর্থ হইল সে হয়রান পেরেশান হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। শব্দমূল হইল الوله অর্থাৎ হতবুদ্ধি হওয়া, বুদ্ধি বিভ্রাট ঘটা। যেমন رجل واله ও امرأة ولهى او مولوهة অর্থ যথাক্রমে মরু প্রান্তরে পরিত্যক্ত হতবুদ্ধি পুরুষ ও মহিলা। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর কূল কিনারা পাইবার বিষয়ে তিনি মানুষ ও তাহার চিন্তা শক্তিকে হয়রান করিয়া দেন, তাই তাঁহার নাম الله হইয়াছে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ অনুসারে الله শব্দটি পূর্বে الوله ছিল و অক্ষরটিকে বিলুপ্ত করিয়া তদস্থলে أ বসানো হইয়াছে। যেমন وشاح হইতে اشاح ও وسادة হইতে اسادة হইয়াছে। উক্ত শব্দদ্বয়ের و অক্ষরকে বিলুপ্ত করিয়া তদস্থলে أ বসানো হইয়াছে।

ইমাম রাযী বলেন, কাহারও কাহারও মতে الله শব্দটি اله ক্রিয়া হইতে গঠিত হইয়াছে الهت الى فلان আমি অমুকের নিকট গিয়া শান্তি লাভ করিয়াছি, কিংবা আমি অমুকের নিকট বসবাস করিয়াছি অথবা আমি অমুকের নিকট স্থিতি লাভ করিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা সচ্চিদানন্দ সত্তা, সকল গুণের পূর্ণ রূপের তিনি একক অধিকারী। মানুষের আত্মা এবং তাহার বুদ্ধি-অনুভূতি সেই সর্বগুণাকার পরম সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি ও তাহার স্মরণ ভিন্ন অন্য কিছুতেই শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। তাই তাঁহার নাম الله হইয়াছে। নিম্নের আয়াতে ইহার সমর্থন মিলে।

أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ 'শুনিয়া রাখ, আল্লাহ্র স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।'

ইমাম রাযী আরও বলিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, الله শব্দটি لاه - يلوه ক্রিয়া হইতে গঠিত হইয়াছে। لاه অর্থ সে লুক্কায়িত রহিয়াছে। যেহেতু আল্লাহ্র পূর্ণ স্বরূপের উপলব্ধি দৃষ্টির নাগালের বাহিরে অবস্থিত, তাই তাঁহার নাম الله হইয়াছে।

ইমাম রাযী আরও বলিয়াছেন- কেহ কেহ বলেন, الله শব্দ اله ক্রিয়া হইতে গঠিত হইয়াছে। اله الفصيل أو لع يامه অর্থ শাবক উহার মাতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে কিংবা শাবক উহার মাতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে।' যেহেতু বান্দা সর্বাবস্থায় বিনয় ও কান্নাকাটির সহিত আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয়ে ছুটিয়া যায় এবং তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরে, তাই তাঁহার নাম الله হইয়াছে।

ইমাম রাযী আরও বলিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, الله শব্দটি اله ক্রিয়া হইতে গঠিত হইয়াছে। اله الرجل يأله অর্থ লোকটি তাহার উপর আপতিত বিপদে ভীত হইয়া পড়িয়াছে, অতঃপর অমুক তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছে। এখানে দেখা যাইতেছে اله ক্রিয়াটি 'বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ভীত হওয়া' ও 'বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করা' এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্ তা'আলাই সকল সৃষ্টিকে যাবতীয় বিপদ হইতে আশ্রয় প্রদান করেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَهُوَ يُجِيْرُ وَلاَيُجَارُ عَلَيْهِ 'নিশ্চয় তিনি আশ্রয় প্রদান করেন এবং তাঁহার অমতে কেহ কাহাকেও আশ্রয় প্রদান করিতে পারে না।' তেমনি সকল দান ও নি'আমাত আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে আসে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ 'অনন্তর তোমাদের নিকট বর্তমান সকল নি'আমাতই আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে আসে।' আল্লাহ্ তা'আলাই সকল সৃষ্টিকে রিযিক দান করেন। তাই তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَيُطْعَمُ 'তিনিই খোরাক দেন এবং তাঁহাকে কেহ খোরাক দেয় না।'

সকল বস্তু ও ঘটনার স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি বলেন ঃ

قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ 'বল, সবই আল্লাহ্র তরফ হইতে হয়।'

এক কথায় আল্লাহ্ তা'আলাই সকল সৃষ্টিকে বিপদে-বিপাকে আশ্রয় দেন এবং সর্বাবস্থায় প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করেন। তাই তাঁহার নাম اَللّٰهُ হইয়াছে।

ইমাম রাযীর ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, اَللّٰهُ শব্দটি নিশ্চিতরূপে اسم غير مشتق যাহা অন্য কোন শব্দ হইতে গঠিত নহে। প্রসিদ্ধ ব্যাকারণবিদ খলীল ও সিবওয়াই এবং অধিকাংশ ফকীহ্ ও ফিকাহ্র নীতি নির্ধারক বিশেষজ্ঞদের অভিমত উহাই। ইমাম রাযী উক্ত অভিমতের সপক্ষে অনেক প্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছেন। নিম্নে উহার কয়েকটি প্রমাণ পেশ করিতেছি।

এক- اَللّٰهُ শব্দটি اسم مشتق হইলে উক্ত শব্দে নিহিত অর্থ ও তাৎপর্যের অধিকারী সকল বস্তু বা ব্যক্তি اَللّٰهُ নামে অভিহিত হইতে পারে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বের মহান প্রতিপালক প্রভু ভিন্ন অন্য কেহ উক্ত নামে অভিহিত নহে, হইতে পারে না।

দুই- আল্লাহ্ তা'আলার অন্যান্য নাম اَللّٰهُ নামের গুণবাচক নাম হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন আমরা বলি, আল্লাহ্ তা'আলা الرحمن। তিনি الرحيم। তিনি الملك। তিনি القدوس। ইত্যাদি। ইহাতে প্রমাণিত হয় اَللّٰهُ শব্দটি اسم مشتق নহে।

তিন- আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন অন্য কেহ اَللّٰهُ নামে অভিহিত নহে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং বলেন ঃ

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا 'তুমি কি তাঁহার নামসম্পন্ন অন্য কাহাকেও জান?'

ইহাতেও প্রমাণিত হয়, আল্লাহ্ শব্দটি ইসমে মুশতাক নহে। ইমাম রাযী বলেন ঃ اَللّٰهُ العزيز الحميد (মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রশংসিত সত্তা আল্লাহ্) আয়াতাংশের অন্তর্গত اَللّٰهُ শব্দটিকে কেহ কেহ اعراب الجر (সম্বন্ধকারকের) বিভক্তি দিয়া পড়েন। সেই ভিত্তিতে তাহারা বলে, এখানে اَللّٰهُ শব্দটি পূর্ববর্তী শব্দের বিশেষণ হইয়াছে। ইহা اسم مشتق -এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আল্লাহ্ শব্দটি اسم مشتق বটে। ইমাম রাযী বলেন, ইহা ঠিক নহে। কারণ, এখানে اَللّٰهُ শব্দটি বিশেষণ নহে; বরং عطف البيان (পূর্ববর্তী শব্দের পরিচায়ক

সংযোজিত শব্দ)। সুতরাং এই আয়াতাংশ দ্বারা اَلله শব্দের اسم مشتق হওয়া প্রমাণিত হয় না।

আমার (ইব্‌ন কাছীর) মতে الله শব্দের اسم جامد হইবার পক্ষে ইমাম রাযীর উপস্থাপিত প্রমাণসমূহ সবল নহে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইমাম রাযী বলিয়াছেন- কেহ কেহ বলেন اَللهُ শব্দটি আরবী নহে, হিব্রু শব্দ। তিনি এই মতকে দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বলেন। আমার (ইব্‌ন কাছীর) মতেও উহা দুর্বল ও বর্জনীয় বটে।

ইমাম রাযী বলেন ঃ জগতে দুই শ্রেণীর মানুষ রহিয়াছে। এক শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার মা'রিফাত ও পরিচয়ের মহাসমুদ্রে পৌঁছিয়া তথায় বিচরণ ও পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহারা আল্লাহ্‌র নূর ও জ্যোতির জগতে মহা সুখে ঘুরিয়া বেড়ান। আরেক শ্রেণীর লোক আল্লাহ্ তা'আলার মা'রিফাত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া বিভ্রান্তির অন্ধকারে হয়রান পেরেশান অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ায়। এই দুই শ্রেণীর মানুষ আধ্যাত্মিক জগতের দুই মেরুতে অবস্থান করিলেও একটি বিষয়ে তাহাদের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য রহিয়াছে। উহা এই যে, উভয় শ্রেণীই আধ্যাত্মিক জগতে ঘূর্ণায়মান ও পরিক্রমশীল রহিয়াছে। তবে এক শ্রেণীর জন্য সেই পরিক্রমা ও ঘূর্ণন সুখকর; আরেক শ্রেণীর জন্য দুঃখজনক। ইমাম রাযীর মতে উপরোক্ত কারণে وله ক্রিয়া হইতে اَللهُ নামটি সৃষ্টি হওয়াও যুক্তিযুক্ত।

ব্যাকরণবেত্তা খলীল ইব্‌ন আহমদ বলেন, اَللهُ শব্দটি اله ক্রিয়া হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ, সকল সৃষ্টি তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, اَللهُ শব্দটি لاه ক্রিয়া হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। لاه অর্থ সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করিয়াছে বা সে উপরে উঠিয়াছে। لاهت الشمس অর্থ সূর্য উপরে উঠিয়াছে। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সর্বগুণে সর্বক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আছেন, তাই তাঁহার নাম আল্লাহ্ হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, اَللهُ শব্দটি اله ক্রিয়া হইতে গঠিত হইয়াছে। اله الرجل অর্থ লোকটি অমুককে প্রভু বানাইয়াছে কিংবা লোকটি দাসত্ব করিয়াছে অথবা লোকটি অনুগত হইয়াছে। তেমনি تاله الرجل অর্থ লোকটি কুরবানী করিয়াছে কিংবা লোকটি ইবাদত করিয়াছে অথবা লোকটি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সকল সৃষ্টির দাসত্ব, আনুগত্য, ইবাদত ও কুরবানী পাইবার যোগ্য, তাই তাঁহার নাম আল্লাহ্ হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) পড়িতেন ঃ

وَيَذَرَكَ وَ اِلاَهَتَكَ তাঁহার পাঠ অনুসারে উক্ত আয়াতাংশে যে الاهة উহা اله (সে ইবাদত করিয়াছে) সমাপিকা ক্রিয়াটির অসমাপিকা রূপ। 'আল্লাহ্' শব্দটি পূর্বে 'আল্ ইলাহ' ছিল ইহার শব্দমূল أ - ل - ه (হামযাহ্-লাম-হা)। আদ্যাক্ষর হামযাহ্ বিলুপ্ত করিয়া অতিরিক্ত ال এর ل বর্ণটি শব্দমূলের দ্বিতীয় বর্ণ ل এর সহিত সংযুক্ত (مدغم) করা হইয়াছে। ফলে لا له শব্দটি الله হইয়াছে। অতঃপর সম্মানার্থে দ্বিত্বপ্রাপ্ত লাম বর্ণের পূর্বে অতিরিক্ত লাম বসাইয়া اَللهُ করা হইয়াছে।

الرحمن الرحيم -এর তাৎপর্য

الرحمن ও الرحيم শব্দদ্বয় رحمة (সদয় হওয়া, কৃপাকারী) শব্দ হইতে গঠিত হইয়াছে। উভয় শব্দই اسم فاعل مبالغه (আধিক্যবোধক বিশেষ্য বা বিশেষণ)। তবে الرحمن হইতে ব্যাপকতর আধিক্য প্রকাশ পায়। ইমাম ইব্ন জারীরের একটি উক্তি দ্বারা বুঝা যায়, বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, উভয় শব্দই اسم فاعل مبالغة শ্রেণীভুক্ত এবং প্রথমটিতে দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক অর্থ রহিয়াছে। অন্য এক বিশেষজ্ঞও স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত ঈসা (আ) বলিয়াছেন, الرحمن অর্থ ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে অতিশয় করুণা বর্ষণকারী এবং الرحيم অর্থ হইতেছে পরকালে অশেষ করুণা বর্ষণকারী।

কেহ কেহ বলেন ঃ আলোচ্য শব্দদ্বয় اسم جامد কারণ, উহা اسم مشتق হইলে উহার সহিত مرحوم (কৃপাপ্রাপ্ত) ব্যক্তিরও উল্লেখ ঘটিত। অবশ্য الرحيم শব্দের সহিত مرحوم ব্যক্তিদের উল্লেখ ঘটিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا এই আয়াতাংশে رحيم এর مرحوم হইল মু'মিনীন।

ইবনুল আম্বারী তাঁহার الزاهر গ্রন্থে বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ মুবার্রাদের এই বক্তব্য উধৃত করেন যে, الرحمن আরবী শব্দ নহে; হিব্রু শব্দ।

আবূ ইসহাক আয্ যাজ্জাজ স্বীয় 'মাআনিল কুরআন' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'আহমদ ইব্ন ইয়াহিয়া বলেন, الرحيم শব্দটি আরবী এবং الرحمن শব্দটি হিব্রু। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উভয় শব্দ একত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন।' অতঃপর আবূ ইসহাক মন্তব্য করেন, উক্ত অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে।

ইমাম কুরতুবী বলেন, আলোচ্য শব্দদ্বয় যে اسم مشتق শ্রেণীভুক্ত ইমাম তিরমিযী (র) কর্তৃক বর্ণিত ও তৎকর্তৃক সহীহ আখ্যায়িত নিম্নোক্ত হাদীসই তাহার প্রমাণ ঃ

হযরত আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা) বলেন, আমি নবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আমার নাম الرحمن (করুণাময়), আমি الرحم (জরায়ু) সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহা হইতে আমার একটি নাম গঠন করিয়াছি। যে ব্যক্তি الرحم-এর সম্পর্ক (রক্ত-সম্পর্ক) অক্ষুণ্ন ও অবিচ্ছিন্ন রাখিবে, আমি তাহার সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উহা ছিন্ন করিবে, আমি তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিব।'

ইমাম কুরতুবী বলেন, উপরোক্ত হাদীস দ্বারা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য শব্দদ্বয় اسم مشتق শ্রেণীভুক্ত। অতএব এ সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করা অযৌক্তিক ও নিরর্থক। তিনি আরও বলেন, আরবরা যে الرحمن নামটি তাহাদের কাছে অপরিচিত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিল, উহা শব্দটির আরবী শব্দ না হওয়ার ব্যাপার নহে, বরং আল্লাহ্ তা'আলার الرحمن নাম হওয়ার ব্যাপারটি। আল্লাহ্র গুণবাচক নামসমূহ সম্পর্কে তাহাদের সম্যক জ্ঞান

ছিল না। এই ব্যাপারে তাহারা ছিল অজ্ঞ ও মূর্খ। ইমাম কুরতুবী আরও বলেন ঃ الرحمن। ও الرحيم। এই উভয় শব্দের অর্থ একই। যেমন ندمان (সহচর, বন্ধু) ও نديم (সহচর, বন্ধু) উভয় শব্দের একই অর্থ।

কেহ কেহ বলেন, فعلان ও فعيل এই দুই ওযনের শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রথমোক্ত ওযনের শব্দ শুধু ক্রিয়ার আধিক্যমূলক কর্তৃবাচক বোধক اسم فاعل مبالغه। হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন رجل غضبان (অতিশয় রাগান্বিত ব্যক্তি)। পক্ষান্তরে শেষোক্ত ওযনের শব্দ কখনও কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য বা বিশেষণ (اسم فاعل) এবং কখনও কর্মবাচ্যে বিশেষ্য বা বিশেষণ (اسم مفعول) হয়।

আবূ আলী ফারেসী বলেন, الرحمن। শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। উহার অর্থ মু'মিন-কাফির সকলের প্রতি করুণা বর্ষণকারী। উহা আল্লাহ্ তা'আলার সার্বজনীন ও সর্বশ্রেণীর করুণার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে الرحيم। শব্দ শুধু মু'মিনের প্রতি করুণা বর্ষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا 'অনন্তর তিনি মু'মিনদের প্রতি কৃপাপরায়ণ।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আলোচ্য শব্দদ্বয় কৃপামূলক দুইটি শব্দ (رقيقان) উহাদের একটি অপরটি অপেক্ষা অধিকতর কৃপামূলক (ارق)।

খাত্তাবী প্রমুখ বিশেষজ্ঞ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উক্ত ارق। শব্দের প্রয়োগের যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সম্ভবত এরূপ স্থলে ارق। শব্দ প্রয়োগ করেন নাই; বরং তিনি ارفق। শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। নিম্নোক্ত হাদীসেও অনুরূপ স্থলে رفق। শব্দের সমধাতুজাত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ঃ

নবী করীম (সা) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলার নাম رفيق (বিনম্র)। তিনি সকল কাজে رفق (বিনয়) পছন্দ করেন। তিনি কঠোরতায় যাহা দান করেন না, বিনয়ে তাহা দান করেন।'

ইব্ন মুবারক বলেন, الرحمن। শব্দের অর্থে এরূপ কৃপাপরায়ণকে বুঝায় যাহার নিকট কৃপা প্রার্থনা করিলে তিনি কৃপা প্রদর্শন করেন। পক্ষান্তরে الرحيم। শব্দের দ্বারা এরূপ কৃপাপরায়ণকে বুঝায় কৃপা প্রার্থনা না করিলে যিনি অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কৃপা প্রার্থনা না করিলে যে তিনি অসন্তুষ্ট হন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালেহ ফারেসী প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ্ কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে তাহা বিবৃত হইয়াছে ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে না, তিনি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।'

জনৈক কবি বলেন ঃ

الله يغضب ان تركت سؤاله ـ وبنى ادم حين يسئل يغضب

"আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তুমি না চাহিলে তিনি অসন্তুষ্ট হন আর মানুষের নিকট চাহিলে সে অসন্তুষ্ট হয়।"

আযরামী হইতে ধারাবাহিকভাবে উসমান ইব্‌ন যুফার, আস্ সুরী ইব্‌ন ইয়াহিয়া তামিমী এবং ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আযরামী বলেন, الرحمن হইলেন সকল সৃষ্টির প্রতি কৃপাপরায়ণ। পক্ষান্তরে الرحيم হইলেন মু'মিনদের প্রতি কৃপাপরায়ণ। বিশেষজ্ঞগণ উপরোক্ত বিশ্লেষণের সমর্থনে আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন ঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمٰنُ 'অতঃপর 'রহমান' পূর্ণ পরাক্রমে আরশে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।'

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى 'রহমান পূর্ণ পরাক্রমে আরশে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।'

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ الرحمن শব্দের সহিত لاستوى (পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া) শব্দ উল্লেখ করিয়া এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন যে, الرحمن হিসাবে তাঁহার অনুগ্রহ সকল সৃষ্টিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। পক্ষান্তরে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا 'তিনি মু'মিনদের প্রতি রহীম (কৃপাপরায়ণ)।' এখানে আল্লাহ্ তা'আলা الرحيم শব্দের সহিত শুধু মু'মিনদের উল্লেখ করিয়া এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন যে, الرحيم হিসাবে তাঁহার রহমত শুধু মু'মিনদের প্রতি অবতীর্ণ হয়।

উপরোল্লিখিত দ্বিবিধ প্রয়োগ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, الرحمن শব্দ الرحيم হইতে অধিকতর مبالغه বা আধিক্যবোধক। কারণ الرحمن হইলেন দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সকল সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ। পক্ষান্তরে الرحيم শুধু মু'মিনদের প্রতি কৃপাপরায়ণ।

তবে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত দোয়ায় রহিয়াছে ঃ

رحمن الدنيا والاخرة ورحيمها

'দুনিয়া ও আখিরাত উভলোকের রহমান ও উহার রহীম।' الرحمن নামটি শুধু আল্লাহ্ তা'আলারই নাম। সৃষ্টির কেহই উক্ত নামে আখ্যায়িত নহে।

এ সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامًا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى 'তুমি বল, তোমরা আল্লাহ্ নামে ডাক আর আর রহমান নামে ডাক, যে নামেই ডাক না কেন, অনন্তর তাঁহার সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে।'

তিনি আরও বলেন ঃ

وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُعْبَدُوْنَ -

'তোমার পূর্বে আমি যে সকল রাসূল পাঠাইয়াছি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, আমি কি আর-রহমানের পরিবর্তে অন্য মা'বূদগুলি নিযুক্ত করিয়াছি?'

মিথ্যাবাদীকুল শিরোমণি মুসাইলামা নিজকে ইয়ামামা অঞ্চলের 'আর-রহমান' আখ্যায়িত করার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিল! আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে 'কায্‌যাব' নামে কুখ্যাত করিয়াছেন। মানুষ তাহাকে 'মুসায়লামাতুল কায্‌যাব' নামে স্মরণ করিয়া থাকে। আরবে তাহার নাম সর্বত্র মিথ্যাবাদীর উপমায় প্রবাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কেহ কেহ আবার বলেন, الرحيم শব্দটি الرحمن শব্দ হইতে আধিক্যবোধক শব্দ। কারণ الرحمن শব্দের তাকীদ (التاكيد) হিসাবে الرحيم শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে। ইহা সুপরিজ্ঞাত ব্যাপার যে, দুইটি বিষয়ের মধ্য হইতে একটি যদি অপরটির তাকীদের জন্য আসে, তাহা হইলে তাকীদের জন্য ব্যবহৃত বিষয়টি অধিকতর শক্তিশালী হইয়া থাকে।

মূলত উক্ত অভিমত ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে الرحيم শব্দটি الرحمن শব্দটির শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাকীদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। বরং উহা صفت (গুণবাচক শব্দ) হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। صفت গুণ موصوف (গুণান্বিত) একে অপরের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজনীয় নহে।

الله শুধু মহা বিশ্বের মহান প্রভুর নাম। সৃষ্টির কেহই এই নামে অভিহিত নহে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নামসমূহের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম উক্ত নাম ব্যবহার করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও الرحمن নামে অভিহিত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى (ইহাতে বুঝা যায়, الله নামের মত الرحمن নামেও শুধুমাত্র তিনিই অভিহিত হইতেন।)

মুসাইলামাতুল কায্‌যাব নিজকে الرحمن নামে অভিহিত করিলেও তাহার অনুসারী পথভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য কেহই উহা স্বীকার করে নাই। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলা الله নামের অব্যবহিত পরেই الرحمن নামটি উল্লেখ করিয়াছেন।

الرحيم আল্লাহ্ পাক ছাড়া অন্য কাহাকেও অভিহিত করা যাইতে পারে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ -

'নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতে একজন রাসূল আগমন করিয়াছে। তোমাদের অনভিপ্রেত বিষয়গুলি সেই রাসূলের নিকট কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। সে তোমাদের অত্যন্ত অভিলাষী, মু'মিনদের প্রতি সে বড়ই স্নেহপরায়ণ ও দয়ালু (রহীম)।

তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার অন্যান্য নামেও তিনি ভিন্ন অন্য কেহ অভিহিত হইতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا خَلَقْنَا الاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيْهِ - فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

'নিশ্চয় আমি মানুষকে পরীক্ষা করিবার জন্য (নর-নারীর) মিশ্র শুক্র হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহাকে سميع (শ্রবণকারী) ও بصير (দর্শনকারী) বানাইয়াছি।

বিসমিল্লাহর ভিতর আর-রহমান নামের পরেই আল্লাহ্ তা'আলা 'আর-রহীম' নামটি উল্লেখ করিয়াছেন। সারকথা এই যে, আল্লাহ্ পাকের নামসমূহ দুই প্রকারে বিভক্ত। এক প্রকারের নাম শুধু তাঁহার জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কেহ এই নামে অভিহিত হইতে পারে না। যেমন আল্লাহ্, আর-রহমান, আল্-খালিক, আর্-রাযিক প্রভৃতি নাম। আরেক প্রকারের নামের প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক। এই প্রকারের নামে অন্য কেহও অভিহিত হইতে পারে। বলাবাহুল্য যে, শেষোক্ত নামসমূহ হইতে প্রথমোক্ত নামসমূহ অধিকতর খ্যাত ও মর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহ্ তা'আলার একাধিক নাম। ব্যবহারের ক্ষেত্রে নামের খ্যাতি ও মর্যাদার ভিত্তিতে উহার বিন্যাস বাঞ্ছনীয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বাক্যটিতে প্রথমে 'আল্লাহ্, তারপর 'আর-রহমান' ও শেষে 'আর-রহীম' নামটি উল্লেখ করিয়াছেন।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, الرحمن নামে যেহেতু الرحيم হইতে গুণের আধিক্য বিদ্যমান, তথাপি الرحيم নামটি উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল কিসে? ইহার ভিতরে কি অন্য কোন রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে?

আতা খোরাসানী হইতে ইমাম ইব্ন জারীর উক্ত প্রশ্নের নিম্নরূপ জবাব বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'আল্লাহ্ তা'আলার কোন সৃষ্টির জন্য الرحمن নাম গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন সৃষ্টি উক্ত নাম গ্রহণ করিয়াছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে 'আর-রহমান' নামের পরে 'আর-রহীম' নাম উল্লেখ করিয়া দ্বৈত ব্যবহারের মাধ্যমে নামটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছেন। এখন এই নামে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য আর কাহাকেও বুঝাইবে না এবং অন্যের জন্য এই বিশিষ্ট নাম ব্যবহারের দ্বার রুদ্ধ হইল।' আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার এই 'আর-রহমান' নামটি আরবদের নিকট অপরিচিত ছিল। এই কারণেই তিনি বলিয়াছেন ঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامًا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى -

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করিবার কালে নবী করীম (সা) যখন হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন লিখ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তখন কাফির আরবরা বলিয়া উঠিল, আমরা 'আর-রহমান' চিনি না, 'আর-রহীম'ও চিনি না। নিম্নোক্ত আয়াতও কাফিরদের এই অজ্ঞতার সাক্ষ্য দেয় ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا مَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا -

"অতঃপর যখন অহাদের বলা হয়, তোমরা 'আর-রহমান'-কে সিজদা কর, তখন তাহারা বলে, 'আর-রহমান' কি বস্তু? তুমি যাহাকে সিজদা করিতে বলিবে আমরা কি তাহাকেই সিজদা করিব? অনন্তর তাহাদের বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া যায়।"

কোন কোন বর্ণনায় আছে কাফিররা বলিত, আর-রহমান বলিতে আমরা তো শুধু ইয়ামামার আর-রহমানকে জানি।

আরবদের নিকট الرحمن নামের এই অপরিচিতির কারণে বিসমিল্লাহ শরীফে উহার সহিত الرحيم নাম জুড়িয়া দেওয়া হয়। তবে আরবদের নিকট الرحمن নামটি অপরিচিত ছিল এই তথ্যটি সঠিক বলিয়া মানা যায় না। মূলত উক্ত নাম তাহাদের অবিদিত ছিল না। অবশ্যই তাহারা উহা জানিত। তথাপি সত্যের প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাহারা না জানার ভান করিত। জাহেলী যুগের কবিতায় তাহারা আল্লাহ্‌কে আর-রহমান নামে আখ্যায়িত করিত। ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন, জাহেলী যুগের জনৈক কবির নিম্ন পংক্তিতে উহার প্রমাণ মিলে ঃ

الا ضربت تلك الفتاة هجينها ـ الا قضب الرحمن ربى يمينها

"সেই যুবতী কেন সেই হীনমনা লোকটিকে মারিল না? আমার প্রতিপালক প্রভু 'আর-রহমান' তাহার দক্ষিণ হস্ত কেন কর্তন করিলেন না?" অনুরূপ সালামা ইব্‌ন জুন্দুব নামক জাহেলী যুগের জনৈক কবির রচনায় দেখিতে পাই ঃ

عجلتم علينا اذ عجلنا عليكم ـ وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق

"আমরা তোমাদের উপরে যেরূপ ত্বরিত হামলা করিয়াছি, তেমনি তোমরাও আমাদের উপরে ত্বরিত হামলা করিয়াছ। অবশ্য 'আর-রহমানের' ইচ্ছায়-ই দৃঢ়তা বা শৈথিল্য ঘটিয়া থাকে।"

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যাহ্‌হাক, আবূ রওক, বিশার ইব্‌ন আম্মারা, উসমান ইব্‌ন সাঈদ, আবূ কুরাইব এবং ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

الرحمن শব্দটি الفعلان ওযনে সৃষ্ট। উহা الرحمة শব্দ হইতে সংগঠিত। আরবী ভাষায় উহার প্রচলন রহিয়াছে। الرحمن - الرحيم শব্দদ্বয়ের অর্থ হইতেছে, 'তিনি যাহার প্রতি কৃপা প্রদর্শন ও রহমত বর্ষণ করিতে চাহেন, তাহার প্রতি অতিশয় কৃপাপরায়ণ ও রহমত বর্ষণকারী। তেমনি তিনি যাহার প্রতি কঠোর ও শক্ত ব্যবহার করিতে চাহেন, তাহার প্রতি অতি কঠোর ও শক্ত। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিটি নামের তাৎপর্য অনুরূপ হইবে।"

হযরত হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে 'আওফ, হাম্মাদ ইব্‌ন মাস'আদা, মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশার ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

হযরত হাসান বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন অন্য কাহাকেও الرحمن নামে অভিহিত করা নিষিদ্ধ।'

হযরত হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আশহাব, যায়দ ইব্‌ন হাব্বাব, আবূ সাঈদ ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ আল কাত্তান এবং ইমাম ইব্‌ন হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

'আর-রহমান' নাম ধারণ করা কোন মানুষের জন্য বৈধ নহে। আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত নাম শুধু নিজের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।"

হযরত উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

'নবী করীম (সা) কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত অংশ নিম্নে বর্ণিত নিয়মে প্রত্যেক আয়াতের শেষ ও শুরুর বর্ণকে পৃথক রাখিয়া তিলাওয়াত করিতেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ

এখানে তিনি বিসমিল্লাহ শরীফের শেষ মীমকে আলহামদু শব্দের হামযাহ হইতে পৃথক করিয়া তিলাওয়াত করিতেন।

একদল কিরাআত বিশেষজ্ঞ উপরোক্ত নিয়মেই পড়েন। আরেক দল কিরআত বিশেষজ্ঞ الرحيم শব্দের 'মীম' শব্দকে الحمد শব্দের হামযাহর সহিত মিলাইয়া পড়েন। তাহার দুইটি অস্বরান্তিক ব্যঞ্জন বর্ণের পরস্পর সন্নিহিত হইবার কারণে 'মীম' বর্ণটিকে 'যের' দিয়া পড়েন। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের অভিমত ইহাই। কূফাবাসীর মাধ্যমে ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ 'কাসাঈ' বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন কোন আরব বিশেষজ্ঞ বিসমিল্লাহ শরীফের শেষ 'মীম'কে যবর দিয়া এবং 'আলহামদু' শব্দের হামযাহকে উহ্য করিয়া পড়েন। তাহারা 'মীম' বর্ণকে 'সাকিন' করিয়া হামযাহ বর্ণের যবরকে সেখানে স্থানান্তরিত করেন। যেমন ঃ الـم - اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ।

এখানে اَللّٰهُ শব্দের হামযার যবরকে الـم আয়াতের মীমে স্থানান্তরিত করিয়া উক্তরূপে পড়া হয়।

ইব্ন আতিয়্যা অবশ্য বলিয়াছেন, আমার জানা মতে কেহ উক্ত আয়াত দুইটি উপরোক্ত নিয়মে পড়েন নাই।

সূরা আল্-ফাতিহার তাফসীর শুরু

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥

১. যাবতীয় প্রশংসা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক প্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

তাফসীর ঃ বিখ্যাত সাতজন কিরাআত বিশেষজ্ঞের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়াতের الحمد শব্দের 'দাল' বর্ণে 'পেশ' (হরকত) হইবে। বাক্য বিচারে উহা বাক্যের উদ্দেশ্য অংশ। সুফিয়ান ইব্ন 'উয়ায়না ও রূবাহ ইব্ন 'আজ্জাজ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা বলেন, الحمد পদে এখানে কর্মকারকের বিভক্তি হিসাবে 'যবর' হইবে। উহার পূর্বে কোন অসমাপিকা ক্রিয়া উহ্য রহিয়াছে এবং الحمد পদটি উহারই কর্মকারক হইয়াছে।

ইব্ন আবূ আবালাহ এইরূপে পড়িতেন ঃ اَلْحَمْدُ لُلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ তিনি الحمد পদের د বর্ণের পেশ হরকতের সহিত সাদৃশ্য বিধানের জন্য لله পদদ্বয়ের প্রথম ل বর্ণে 'পেশ' দিয়া পড়িতেন। আরবী ভাষায় অনুরূপ সাদৃশ্য বিধানের একাধিক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কিন্তু এখানে উপরোক্ত নিয়মে পাঠ অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের পাঠের পরিপন্থী।

হযরত হাসান ও হযরত যায়দ ইবাল সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা لله পদের প্রথম লামের হরকতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থে الحمد পদের শেষ বর্ণ দালে যের দিয়া নিম্নরূপ পড়িতেন ঃ اَلْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বাক্যের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কারণ, তিনি স্বীয় বান্দাগণকে অসংখ্য নি'আমাত ও অবদানে বিভূষিত ও ধন্য করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ইবাদতের জন্য এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধ পালনের জন্য স্বীয় বান্দাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৈকল্যহীন ও কার্যোপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তাহাদের বিশ্বময় রূযী ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার নিকট

তাহাদের প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও তাহাদিগকে অগণ্য ও অপরিমেয় সুখকর নি'আমাত ভোগ করাইতেছেন। যে আলোকময় পথে চলিলে মানুষ আখিরাতে চিরস্থায়ী সুখ ও আনন্দ লাভ করিতে পারিবে, স্বীয় কৃপাপরায়ণতার কারণে তিনি তাহাদিগকে সেই পথ দেখাইয়াছেন। এরূপ অজস্র নি'আমাত দ্বারা তিনি মানুষকে লালন-পালন করিতেছেন। তাঁহার নি'আমাতের সংখ্যা তিনি ভিন্ন অন্য কেহ গুনিয়া শেষ করিতে পারে না। এইসব নি'আমাত দানের ক্ষেত্রে তাঁহার কোন শরীক নাই। তাঁহার যে সকল সৃষ্টিকে মানুষ মা'বূদ বানাইয়া লইয়াছে, তাহাদেরও সেক্ষেত্রে কোন কৃতিত্ব বা কর্তৃত্ব নাই। তেমনি মানুষ যাহাদের মা'বূদ বানায় নাই তাহাদেরও উহাতে কোন কৃতিত্ব বা কর্তৃত্ব নাই। এইসব নি'আমাত শুধু একক আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে তাঁহার বান্দাগণের প্রতি প্রেরিত হইয়াছে। তাই সকল প্রশংসা সকল সময়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই প্রাপ্য।

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলিয়াছেন, الحمد لله বাক্য দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যক্ষভাবে নিজের প্রশংসা করিয়া পরোক্ষভাবে স্বীয় বান্দাগণকে তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিতে নির্দেশ দিয়েছেন। উহা দ্বারা যেন তিনি বলিতেছেন, তোমরা বল, الحمد لله।

ইমাম ইব্‌ন জারীর আরও বলিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, الحمد لله বাক্যটির তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সকল মহৎ গুণের কারণে সকল প্রশংসা তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। পক্ষান্তরে الشكر لله বাক্যের তাৎপর্য এই যে, 'আল্লাহ্ তা'আলার নি'আমাত সমূহের কারণে সকল প্রশংসা তাঁহার জন্য নিবেদিত।' ইমাম ইব্‌ন জারীর এই মত প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন—'সকল আরবী ভাষাবিদ الحمد ও الشكر শব্দদ্বয়কে সমার্থক শব্দ হিসাবে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।' সূফী সম্প্রদায়ের ইমাম জা'ফর সাদিক (র) হযরত ইব্‌ন 'আতা (র) ও সালমী উক্ত শব্দদ্বয় সম্বন্ধে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, প্রত্যেক شاكر-ই الحمد لله বলিতে পারে। অর্থাৎ الحمد ও الشكر শব্দদ্বয় সমার্থক।

ইমাম কুরতুবী ইমাম ইব্‌ন জারীরের উপরোক্ত অভিমতের সমর্থনে বলিয়াছেন, الحمد لله شكرا বাক্যটি শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এখানেও الحمد ও الشكر শব্দদ্বয় সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ, شكرا শব্দটি এবং উহার উহ্য সমাপিকা ক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত বাক্যটি الحمد لله বাক্যের তাকীদ অথবা তাফসীরের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

আমার (ইব্‌ন কাছীর) মতে, ইমাম ইব্‌ন জারীরের উপরোক্ত অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, পরবর্তী যুগের বিপুল সংখ্যক বিশেষজ্ঞ এই অভিমত পোষণ করেন যে, الحمد শব্দের তাৎপর্য হইতেছে কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন দক্ষতা বা নৈপুণ্যের কারণে অথবা অপরের প্রতি তৎকর্তৃক প্রদত্ত নি'আমতের কারণে কথার মাধ্যমে উক্ত সত্তাকে প্রশংসা করা অথবা তাহার প্রতি নিবেদিত প্রশংসা। পক্ষান্তরে الشكر শব্দের তাৎপর্য হইতেছে কোন ব্যক্তি বা সত্তার পক্ষ হইতে অপরের প্রতি প্রদত্ত নি'আমতের কারণে মন, মুখ অথবা অন্য কোন অঙ্গের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তাকে প্রশংসা করা অথবা উক্ত সত্তার প্রতি নিবেদিত প্রশংসা। কবি বলেন :

افادتكم النعماء منى ثلاثة - يدى ولسانى وضميرى المحجبا

'আমার তিনটি অঙ্গ তোমাদিগকে নি'আমত দান করিয়াছে; আমার হস্ত, আমার জিহ্বা ও আমার অদৃশ্য অন্তর।'

الحمد। ও الشكر। শব্দদ্বয়ের কোন্‌টির অর্থ ব্যাপকতর সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, 'আলহামদু'র অর্থ 'আশ্‌শুকরো' হইতে ব্যাপকতর। আরেক দল বলেন, 'আশ্ শুকরোর অর্থ আলহাম্দু হইতে ব্যাপকতর। তবে সঠিক কথা এই যে, উহার কোনটির অর্থই অন্যটি হইতে সার্বিকভাবে ব্যাপকতর নহে; বরং উহাদের প্রত্যেকটির অর্থই অপরটির অর্থ অপেক্ষা এক দিক দিয়া ব্যাপকতর এবং অন্য দিক দিয়া সংকীর্ণতর। (আরবী ভাষায় দুই শব্দার্থের এই সম্পর্ককে বলে 'নি'সবাতুল উমূম ওয়াল খুসূস'।) যেই কারণে কাহারও প্রতি الحمد। বা الشكر। নিবেদিত হয়, সেই কারণের বিবেচনায় الحمد। শব্দের অর্থ الشكر। শব্দের অর্থ হইতে ব্যাপকতর। কারণ, কোন ব্যক্তি বা সত্তার অন্তর্নিহিত গুণ কিংবা অপরের প্রতি তাহার প্রদত্ত নি'আমতের কারণে তাহার প্রতি হামদ নিবেদিত হয়। পক্ষান্তরে শোকর নিবেদিত হয় কেবলমাত্র শেষোক্ত কারণে। পক্ষান্তরে যে সব অঙ্গের মাধ্যমে কাহারও প্রতি শোকর বা হামদ নিবেদিত হয়, সেই অঙ্গসমূহের বিবেচনায় শোকর হামদ অপেক্ষা ব্যাপকতর। কারণ শোকর আদায়ে হস্ত, অন্তর, জিহ্বার যে কোন অঙ্গ ব্যবহার করা যায়। কিন্তু হামদ আদায়ে শুধুমাত্র জিহ্বা কাজে আসে। আবার কাহারও বদান্যতার কারণে যেরূপ হামদ ব্যবহৃত হয়, তেমনি তাহার অশ্ব চালনায় নৈপুণ্যের জন্যও হামদ ব্যবহার করা যায়। অথচ শোকর কেবল কাহারও বদান্যতার কারণে আদায় করা যায়, কিন্তু কাহারও অশ্ব চালনায় নৈপুণ্যের জন্য করা যায় না। পরবর্তী যুগের জনৈক বিশেষজ্ঞের লিখিত অভিমতের ইহাই সারকথা। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

আবূ নসর ইসমাঈল ইব্‌ন হাম্মাদ জওহরী বলেন, الحمد। (প্রশংসা) শব্দটি الذم। (নিন্দা) শব্দের বিপরীতার্থক। ক্রিয়া রূপ حمد (সে প্রশংসা করিয়াছে), يحمد (সে প্রশংসা করে বা করিবে) الحمد - المحمدة। (প্রশংসা করা), محمود - حميد (প্রশংশিত) التحميد। (অধিক প্রশংসা করা)। الحمد। শব্দের অর্থ الشكر। শব্দের অর্থ হইতে ব্যাপকতর। الشكر। শব্দের তাৎপর্য হইতেছে উপকারীর উপকারের কারণে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করা। অথবা উপকারীর উপকারের প্রতি আদায়কৃত কৃতজ্ঞতা। যেমন شكرته (আমি তাহার কৃতজ্ঞতা আদায় করিয়াছি) এবং شكرت له (আমি তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করিয়াছি) এই উভয়বিধ প্রয়োগই শুদ্ধ। তবে শেষোক্ত প্রয়োগে অধিকতর ব্যঞ্জনা-নৈপুণ্য বিদ্যমান। পক্ষান্তরে المدح। (প্রশংসা করা) শব্দটির অর্থ الحمد। শব্দের অর্থ অপেক্ষা ব্যাপকতর। কারণ, জীবিত, মৃত, প্রাণী, অপ্রাণী সকলের প্রতিই উপকারের পূর্বে কি পরে সকল অবস্থায়ই এবং ব্যক্তির নৈপুণ্য-দক্ষতা কিংবা অপরের প্রতি কৃত উপকার ইত্যাকার সকল কারণেই المدح। (প্রশংসা) প্রযুক্ত হইতে পারে। পক্ষান্তরে الحمد। অপ্রাণীর প্রতি নহে, বরং শুধু প্রাণীর প্রতি এবং মৃতের প্রতি নহে, বরং শুধু জীবিতের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে।

'আল্‌হাম্‌দু'র তাৎপর্য

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবূ মালীকাহ, হাজ্জাজ, হাফ্‌স্‌, আবূ আম্মার আল কাতীঈ, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

একদা হযরত উমর (রা) বলিলেন, আমরা الله ا سبحان ও الله ا لا اله ا لا -এর তাৎপর্য জানি, কিন্তু الحمد لله এর তাৎপর্য কি? ইহাতে হযরত আলী (রা) বলিলেন, 'উহা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নিজের জন্য মনোনীত ও তাঁহার মনঃপূত একটি বাক্য।'

উক্ত রিওয়ায়েতকে অন্যতম রাবী হাফ্‌স হইতে আবূ মুআম্মার ভিন্ন অন্য এক রাবী এইরূপ বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত উমর (রা) একদিন হযরত আলী (ক) সহ অন্যান্য সঙ্গীদের বলিলেন, আমরা سبحان الله ও الله ا لا اله ا لا এবং الله اكبر -এর তাৎপর্য জানি; কিন্তু الحمد لله -এর তাৎপর্য কি? তখন হযরত আলী (ক) বলিলেন, উহা আল্লাহ্ তা'আলার নিজের জন্য মনোনীত ও মনঃপূত একটি বাক্য। উহা পাঠ করা তাঁহার নিকট প্রিয় কার্য।

ইউসুফ ইব্‌ন মিহির হইতে আলী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন জাদ'আন বর্ণনা করেন ঃ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ الحمد لله কৃতজ্ঞতা প্রকাশক একটি বাক্য। বান্দা যখন বলে الحمد لله তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শোকর আদায় করিয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিমও এই রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমাগত যাহ্‌হাক, আবূ রওক, বিশ্‌র ইব্‌ন আম্মারাহ প্রমুখ বর্ণনাকারীর সূত্রে ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত আব্বাস (রা) বলেন, الحمد لله হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁহার সৃজন, পথ প্রদর্শন ইত্যাকার নি'আমাত সমূহের জন্য শোকর আদায়।'

কা'ব আহবার বলেন, الحمد لله হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা।

যাহ্‌হাক বলেন الحمد لله হইল আল্লাহ্ তা'আলার চাদর। এই মর্মে হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে।

হাকাম ইব্‌ন উমায়র (রা) হইতে ক্রমাগত মূসা ইব্‌ন আবূ হাবীব, মূসা ইব্‌ন ইবরাহীম, বাকীয়্যা ইব্‌ন ওয়ালিদ, সাঈদ ইব্‌ন আমর সুকূনী ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যখন তুমি বল, الحمد لله رب العالمين তখন তুমি উহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় কর। উহার ফলে আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে আরও নি'আমাত দিবেন।'

'হযরত আসওয়াদ ইব্‌ন সারী' (রা) হইতে ক্রমাগত হাসান, আওফ, রওহ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

হযরত আসওয়াদ ইব্‌ন সারী' (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রসংশাসূচক একটি কবিতা রচনা করিয়াছি। উহা

কি আপনাকে শুনাইব? নবী করীম (সা) বলিলেন, শুনিয়া রাখ, তোমার প্রতিপালক প্রভু প্রশংসা পছন্দ করেন।

হযরত আসওয়াদ ইব্‌ন সারী' (রা) হইতে ক্রমাগত হাসান, ইউনুস ইব্‌ন উবায়দ, ইব্‌ন আলীয়্যা, আলী ইব্‌ন হাজার ও ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ক্রমাগত তালহা ইব্‌ন ফারাশ, মূসা ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন কাছীর প্রমুখ বর্ণনাকারীর সূত্রে ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, শ্রেষ্ঠতম যিকর হইতেছে, لا اله الا الله এবং শ্রেষ্ঠতম দোয়া হইল الحمد لله।

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীসকে মাত্র একটি সূত্রে বর্ণিত বিশেষ নিয়মে গ্রহণযোগ্য হাদীস حديث حسن صحيح বলেন।

হযরত আনাস (রা) হইতে ইমাম ইব্‌ন মাজাহ বর্ণনা করেন – নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কাহাকেও কোন নি'আমাত দান করিবার পর যদি সে বলে, الحمد لله। তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয় তাহাকে তৎকর্তৃক প্রত্যাহৃত নি'আমাত হইতে উৎকৃষ্ট নি'আমাত দান করেন।'

হযরত আনাস (রা) হইতে ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে ও 'নাওয়াদিরুল উসূল' গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের কাহারও অধিকারে যদি দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ আসিয়া যায়, অতঃপর সে বলে, الحمد لله। তাহা হইলে তাহার الحمد لله। উক্ত ধন-সম্পদ হইতে মূল্যবান হইবে।'

কুরতুবী প্রমুখ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ তাহার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা তাহার প্রাপ্ত পার্থিব ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান হইবে। কারণ, পার্থিব সম্পদ স্থায়ী নহে, উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে আলহামদু লিল্লাহর নেকী ও সওয়াব স্থায়ী, উহা ধ্বংস হইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَالْبَاقِيَاتُ الصّٰلِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلاً ـ

"ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি শুধু পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ। পক্ষান্তরে তোমার প্রভুর কাছে পুরস্কার ও ভাল আশার ক্ষেত্রে স্থায়ীত্বশীল নেককার্য উত্তম।"

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) একদিন সাহাবাদের বলেন, একদা আল্লাহ্ তা'আলার জনৈক বান্দা বলিল, يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ ـ

(হে আমার প্রতিপালক প্রভু! তোমার মহা পরাক্রম ও বিপুল প্রতিপত্তি যেরূপ 'হাম্‌দ'-এর যোগ্য তোমার প্রতি সেরূপ হাম্‌দ (প্রশংসা) নিবেদন করিতেছি।) এতদশ্রবণে কিরামান-কাতেবীন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। তাহারা উহার পরিবর্তে কত নেকী লিখিবেন তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আরয করিলেন,

'হে আমাদের প্রভু! জনৈক বান্দা একটি বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে। উহার পরিবর্তে কত নেকী লিখিব উহা আমাদের জ্ঞাত নহে।' বান্দা কি বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে তাহা আল্লাহ্ তা'আলা ভালরূপে জানিতেন। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বান্দা কি বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে? ফেরেশতাদ্বয় আরয করিলেন, হে পরোয়ারদিগার! বান্দা বলিয়াছে, 'ইয়া রাব্বী লাকাল হামদু কামা য়্যাম্বাগী লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আজীমি সুলতানিকা।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদ্বয়কে বলিলেন, 'আমার বান্দা যাহা বলিয়াছে তাহা অবিকল লিখিয়া রাখ। সে যখন আমার নিকট আসিবে, তখন আমি উহার প্রতিদান দিব।'

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ একদল বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, 'আলহাম্দু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' বলা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা হইতে অধিকতর নেকীর কাজ। কারণ, শেষোক্ত বাক্যে শুধু তাওহীদের ঘোষণা রহিয়াছে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত বাক্যে তাওহীদ ও হাম্দ দুইটি বিষয় নিহিত রহিয়াছে।'

আরেক দল বলেন, শেষোক্ত বাক্য প্রথমোক্ত বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠতর। কারণ, উহা দ্বারা মানুষের মু'মিন হওয়া না হওয়া নির্ণীত হয়। উহার দাবীতে কোন জাতি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিম জাতির পক্ষ হইতে অমুসলিম জাতিসমূহের নিকট উহা মানিয়া লইবার দাবী জানানো হয় এবং উহা মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলে যতক্ষণ না তাহা মানিয়া লয়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক হাদীসে অনুরূপ বিধান বিবৃত হইয়াছে।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

'নবী করীম (সা) বলেন, আমার পূর্ববর্তী নবীগণ ও আমি যত কথা উচ্চারণ করিয়াছি, উহার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কথা হইতেছে, لا اله الا الله وحده لاشريك له

(আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই।)

ইতিপূর্বেও হযরত জাবির (রা) হইতে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলেন– افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله

ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসকে حديث حسن (বিশেষ নিয়মে বিশুদ্ধ) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ আয়াতের শুরুর ال (আলিফ-লাম) অক্ষরদ্বয় হাম্দের সকল শ্রেণীকে উহার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। আরবী ভাষায় এরূপ 'আলিফ-লাম'কে আলিফ-লামে ইস্তিগরাকী (استغراقى) বলে। তাই الحمد অর্থ সকল শ্রেণীর সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। হাদীছে বর্ণিত আছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–

اللهم لك الحمد كله - ولك الملك كله - وبيدك الخير كله - واليك يرجع الامر كله - الحديث

'হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসাই তোমার প্রাপ্য। সকল আধিপত্যই তোমার জন্য সংরক্ষিত। সকল মঙ্গলই তোমার হাতের মুঠায়। তাই সকল কাজই তোমার কাছে প্রত্যাবৃত্ত হয়...... (অসমাপ্ত)।'

الرب। শব্দের অর্থ হইতেছে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সত্তা; প্রভু, প্রতিপালক, ক্রমোন্নতি বিধায়ক ও ক্রমবিকাশ সাধক। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই الرب। নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। তাঁহার কোন সৃষ্টি উক্ত নামে অভিহিত হইতে পারে না। তবে বস্তু বিশেষের মালিক হিসাবে সংশ্লিষ্ট বস্তুর উল্লেখসহ কোন সৃষ্টিকেও উক্ত নামে অভিহিত করা যায়। যেমন رب الدار। (ঘরের মালিক)। কেহ কেহ বলেন, الرب। নামটিই আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠতম নাম (الاسم الاعظم)।

العالمين। শব্দটি عالم শব্দের বহুবচন العالم। অর্থ আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য সকল অস্তিত্বশীল বস্তু। ইহা একটি বহুবচন পদ, ইহার সমধাতুজ কোন একবচনার্থক পদ নাই। العوالم। বলিতে মহাবিশ্বে বিদ্যমান সৃষ্টির বিভিন্ন প্রকার ও শ্রেণীকে বুঝায়। উহার প্রত্যেক শ্রেণীও পৃথকভাবে العالم। নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমাগত যাহ্হাক, আবূ রওক ও বিশর ইব্ন আম্মারাহ বর্ণনা করেন ঃ 'আলহামদু লিল্লাহ'র তাৎপর্য হইতেছে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তন্মধ্যকার সকল জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বস্তুর মালিক ও প্রভু।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও ইকরামা বর্ণনা করেন ঃ রব্বুল আলামীনের তাৎপর্য হইতেছে 'জ্বিন ও মানবমণ্ডলীর রব (প্রতিপালক প্রভু)।' সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুজাহিদ ও ইব্ন জুরায়জও উহার অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) হইতেও উহার অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম উহার সনদকে অগ্রহণযোগ্য বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী উপরোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতাংশ পেশ করিয়াছেন ঃ

لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا (যাহাতে সে [নবী (সা)] সকল জ্বিন ও মানবের জন্য সতর্ককারী হয়।)

এখানে العالمين। শব্দের তাৎপর্য শুধু জ্বিন ও মানব জাতি। বিখ্যাত ভাষাবিদ ফার্রা ও আবূ উবায়দ বলেন, العالم। শব্দটি শুধু বোধসম্পন্ন সৃষ্টির ব্যাপারে প্রযুক্ত হয়। নির্বোধ সৃষ্টির ব্যাপারে العالم। শব্দের প্রয়োগ ঘটে না। মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা ও শয়তান-ইহারা العالم। পদবাচ্য। পশু শ্রেণী 'আল্-আলম' পদবাচ্য নহে।

যায়দ ইব্ন আসলাম ও আবূ মুহায়মিন বলেন-প্রাণীমাত্রই العالم। পদবাচ্য। কাতাদাহ বলেন, সৃষ্টির প্রতিটি শ্রেণী العالم। পদবাচ্য।

الجعد। (নীচাশয় ব্যক্তি) ও الحمار। (গর্দভ) নামে খ্যাত উমাইয়া খলীফা মারোয়ান ইব্ন হাকামের জীবনীতেও হাফিজ ইব্ন আসাকির লিখিয়াছেন, মারোয়ান বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলার সতের হাজার মাখলূক (عالم)। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টি উহার একটি। অবশিষ্ট আলমসমূহের খবর একমাত্র আল্লাহ্ই রাখেন।'

আবূল 'আলীয়া হইতে ক্রমাগত রবী' ইব্ন আনাস ও আবূ জা'ফর রাযী 'রব্বুল আলামীন'-এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ 'মানব জাতি একটি আলম। জ্বিন জাতি একটি আলম।

এতদ্ব্যতীত আঠার হাজার অথবা চৌদ্দ হাজার আলম রহিয়াছে (রাবীর সঠিক সংখ্যা স্মরণ নাই)। ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে রহিয়াছে। পৃথিবীর চারিটি দিক রহিয়াছে। প্রত্যেক দিকে সাড়ে তিন হাজার আলম রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে নিজের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।'

ইব্ন জারীর ও ইব্ন হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ উহা শুধু ইব্ন 'আলীয়া হইতে বর্ণিত হইয়াছে। অন্য কেহ উহা বর্ণনা করেন নাই। এরূপ কথা প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করা যায় না।

সাবী' আল হুমায়রী হইতে ক্রমাগত মু'তাব ইব্ন সামী, ফুরাত ইব্ন ওয়ালীদ, ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম, হিশাম ইব্ন খালিদ, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম 'রব্বুল আলামীন'-এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

সাবী' বলিয়াছেন, 'পৃথিবীতে এক হাজার আলম আছে। তন্মধ্যে ছয়শত আছে জলভাগে ও চারিশত স্থলভাগে।'

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব হইতেও অনুরূপ বর্ণনা মিলে। স্বয়ং নবী করীম (সা) হইতেও উপরোক্ত মর্মে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির, মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন কায়সার, আবূ উব্বাদ উবায়দ ইব্ন ওয়াকিদ আল কয়সী, মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও তাঁহার নিকট হইতে হাফিজ আবূ ইয়ালা আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন মুছান্না স্বীয় 'মুসনাদ' সংকলনে বর্ণনা করেন ঃ

হযরত জাবির (রা) বলেন, হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের সময় একবার রাষ্ট্রে পঙ্গপাল দেখা দিল। তিনি লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পাইলেন, এই দেশে কেহ পঙ্গপাল দেখে নাই। তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া পঙ্গপাল সম্পর্কে জানার জন্য ইয়ামান, সিরিয়া ও ইরাকে লোক পাঠাইলেন। ইয়ামানের সংবাদ সংগ্রাহক সেখান হইতে কতগুলি পঙ্গপাল ধরিয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল। তিনি উহা দেখিয়া 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া উঠিলেন। অতঃপর বলিলেন-আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, 'আল্লাহ্ তা'আলা এক হাজার উম্মত (প্রজাতি) সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের ছয়শত জলভাগে আছে ও চারিশত আছে স্থলভাগে। আর উহাদের মধ্য হইতে প্রথম বিলুপ্ত হইবে পঙ্গপাল। উহার ধ্বংস প্রাপ্তির পর একের পর এক সকল প্রজাতি এরূপ দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে যেভাবে ছিন্নমালার দানাগুলি পর পর দ্রুত পতিত হয়।'

উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন কায়সান একজন যঈফ রাবী।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব হইতে বাগবী বর্ণনা করেন ঃ সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা এক হাজার আলম সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের মধ্য হইতে ছয়শত জলভাগে রহিয়াছে এবং চারিশত রহিয়াছে স্থলভাগে।'

ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন-আল্লাহ্ তা'আলা আঠার হাজার আলম সৃষ্টি করিয়াছেন। দুনিয়া উহাদের মধ্যকার একটি আলম।

মুকাতিল বলেন-আলমের সংখ্যা হইতেছে আশি হাজার।

কা'ব আহবার বলেন-আলমের সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন অন্য কেহ জানে না।

ইমাম বাগবী উপরোক্ত অভিমতসমূহ তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত খুদরী (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা চল্লিশ হাজার আলম সৃষ্টি করিয়াছেন। সমগ্র দুনিয়া উহাদের মধ্য হইতে মাত্র একটি আলম।

যাজ্জাজ বলেন—'আলম' বলিতে দুনিয়া ও আখিরাতে সৃষ্ট ও সৃজিতব্য প্রতিটি বস্তু ও বিষয়কেই বুঝায়।

ইমাম কুরতুবী মন্তব্য করেন, যাজ্জাজের উক্ত অভিমতই সহীহ ও সঠিক। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ - قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط اِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ -

(ফিরআউন বলিল, 'রব্বুল আলামীন' আবার কি বস্তু? সে (মূসা) বলিল, তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যকার সকল বস্তুর প্রতিপালক প্রভু—যদি তোমরা বিশ্বাস করিতে।)

ইমাম কুরতুবী বলেন, "আল-আলম' 'আল-আলামাত' (চিহ্ন নিদর্শন)' হইতে উৎপন্ন।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকেই 'আলম' বলা হয় যে, উহা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, একত্ব ও মাহাত্ম্যের এক একটি আলামত ও নিদর্শন। কবি ইবনুল মু'আয বলেন ঃ

فيا عجبا كيف يعصى الا له - ام كيف يجحده الجاحد

وفى كل شئ له اية - تدل على انه واحد

'কী আশ্চর্য! মানুষ কিভাবে স্বীয় প্রভুর নাফরমানী করে অথবা নাস্তিক কিভাবে তাঁহার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে? প্রত্যেকটি বস্তুতেই তো তাঁহার অস্তিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে। উক্ত নিদর্শন বলিয়া দেয় যে, তিনি এক, অদ্বিতীয়।'

(٢) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ

২. অশেষ দয়াময়, অসীম দয়ালু।

তাফসীর ঃ বিসমিল্লাহ্ শরীফের ব্যাখ্যায় ইহা আলোচিত হইয়াছে। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

ইমাম কুরতুবী বলেন رب العالمين শব্দ দুইটির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পরাক্রম ও ক্ষমতা সম্বন্ধে মানুষকে পরিজ্ঞাত করিয়া তাঁহার আযাবের ব্যাপারে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে الرحمن الرحيم শব্দ দুইটি উল্লেখ করিয়া তিনি তাহাদের মনে আশার সঞ্চার তথা তাঁহার রহমত লাভ করিবার আগ্রহ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। এভাবে অন্যত্রও তিনি তাঁহার বান্দাগণকে একদিকে তাঁহার রহমতের আশা প্রদান ও অন্যদিকে তাঁহার আযাবের ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন তিনি বলিয়াছেন ঃ

نَبِّئْ عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ -

'আমার বান্দাগণকে খবর দাও যে, আমি অশেষ ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। পক্ষান্তরে আমার শাস্তিও বড় যন্ত্রণাদায়ক।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ـ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 'নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা ; পক্ষান্তরে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ঈমানদাররা যদি জানিত, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কত শাস্তি রহিয়াছে, তাহা হইলে কেহই জান্নাতের আশা করিতে সাহসী হইত না। পক্ষান্তরে কাফিররা যদি জানিতে পাইত, আল্লাহ্ তাআলার নিকট কত রহমত রহিয়াছে, তাহা হইলে কেহই তাঁহার রহমত হইতে নিরাশ হইত না।

(٣) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

৩. 'প্রতিদান দিবসের বাদশাহ'।

তাফসীর ঃ একদল বিশেষজ্ঞ আলোচ্য আয়াতের প্রথম শব্দকে ملك এবং আরেকদল বিশেষজ্ঞ مالك রূপে পড়িয়াছেন। উভয় কিরাআতই শুদ্ধ এবং বিখ্যাত সাত কিরাআতের অন্তর্ভুক্ত। কেহ কেহ উহাকে লামে সাকিন দিয়া ملك এবং কেহ কেহ مليك রূপেও পড়িয়াছেন কিরাআত শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ নাফে' উহার শেষে ى বর্ণ যুক্ত করিয়া ملكى রূপে পড়িয়াছেন।

একদল বিশেষজ্ঞ প্রথমোক্ত দুই কিরাআতের মধ্য হইতে প্রথম কিরাআতকে ও অন্যদল বিশেষজ্ঞ দ্বিতীয় কিরাআতকে অর্থগত দিক দিয়া শ্রেয়তর ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়াছেন। তবে উভয় কিরাআতকেই তাঁহারা শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বলেন।

আল্লামা যামাখশারী ملك রূপ কিরাআতকে শ্রেয়তর বলিয়াছেন। কারণ, উহা পবিত্র মক্কা ও পবিত্র মদীনার অধিবাসীদের কিরাআত।

তাহা ছাড়া আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (আজ কাহার কর্তৃত্ব?)

কিংবা قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ (তাঁহার কথাই সত্য হইবে এবং তাঁহারই রাজত্ব হইবে।)

'এই দুই আয়াতে কিয়ামতের দিনে الملك (রাজত্ব) একমাত্র তাঁহারই বলা হইয়াছে। উক্ত الملك এর অধিকারী সত্তাকে الملك বলাই শ্রেয়। ইমাম আবূ হানীফা হইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি উহাকে مَلَكَ রূপে পড়িতেন। কারণ, الملك শব্দ হইতে مالك ملك ও مملوك এই তিনরূপ শব্দই গঠিত হইয়া থাকে। অবশ্য তাঁহার এই মতের বর্ণনাকারী একজন মাত্র এবং ইহা তাঁহার নিকট হইতে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য সূত্রের বর্ণনার পরিপন্থী।

ইব্ন শিহাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল মুতরাফ, আবদুল ওয়াহাব ইব্ন আদী ইব্ন ফযল, আবূ আব্দির রহমান ইযদী ও আবূ বকর ইব্ন দাউদ বর্ণনা করেন ঃ

ইব্ন শিহাব বলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, নবী করীম (সা), হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত মুআবিয়া (রা) ও তৎপুত্র ইয়াযীদ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পড়িতেন।'

উক্ত রিওয়ায়েতের সমর্থনে অন্য কোন রিওয়ায়েত নাই।

তিনি আরও বলেন ঃ

يَوْمَ يَأْتِى لاَتُكَلَّمُ نَفْسٌ اِلاَّ بِاِذْنِه ـ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ (যেদিন উহা আসিবে, সেদিন তাঁহার অনুমতি ছাড়া কেহ কিছু বলিতে পারিবে না.... ।)

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ -এর তাৎপর্য এই যে, দুনিয়ায় যদিও অন্যান্য বিচারপতি ছিল, কিন্তু আখিরাতের অন্য কাহারো হাতে বিচারের ক্ষমতা থাকিবে না। সেদিন তাঁহার বিচারকার্যে অন্য কেহ শরীক হইতে পারিবে না।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক আরও বর্ণনা করেন ঃ يَوْمِ الدِّيْنِ -এর তাৎপর্য এই যে, উহা সকল মানব ও জ্বিনের হিসাবের দিন। উহা কিয়ামতের দিন। সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে তাহাদের কর্মফল প্রদান করিবেন। ভাল কর্মে ভাল ফল ও মন্দ কর্মে মন্দ ফল প্রদত্ত হইবে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যদি কাহাকেও ক্ষমা করেন, তাহা স্বতন্ত্র কথা।'

হযরত আব্বাস (রা) ছাড়াও অন্যান্য অনেক সাহাবা, তাবেঈ ও পূর্বসূরী বিভিন্ন তাফসীরকার উহার অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। মূলত উহাই আয়াতের স্বাভাবিক তাফসীর।

অবশ্য ইমাম ইব্‌ন জারীর কোন কোন তাফসীরকার হইতে বর্ণনা করেন, مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ -এর তাৎপর্য হইতেছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত ঘটাইয়া বিচার দিবস কায়েমের ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতাবান।' ইমাম ইব্‌ন জারীর এই উধৃতি দানের পর মন্তব্য করেন, বর্ণনাটি দুর্বল ও গ্রহণের অযোগ্য।

মূলত আয়াতের উভয়বিদ তাফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। তাহা ছাড়া উভয় পক্ষ উভয় তাফসীরকেই শুদ্ধ মনে করেন। তবে আয়াতের পূর্বাপর আয়াত বিবেচনা করিলে প্রথমোক্ত তাৎপর্যই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়। আয়াতের প্রথমোক্ত তাৎপর্যের সহিত নিম্নোক্ত আয়াতের সাদৃশ্য রহিয়াছে ঃ

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِيْنَ عَسِيْرًا

(সেদিন রহমানেরই রাজত্ব কার্যকর হইবে এবং কাফিরের জন্য হইবে কঠিন দিন।) পক্ষান্তরে আয়াতের শেষোক্ত তাৎপর্যের সাদৃশ্য নিম্নোক্ত আয়াতে পাওয়া যায় ঃ

وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنَ (যেদিন তিনি বলিবেন, হও, অনন্তর হইয়া যাইবে।)

আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বজ্ঞ। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই الملك। (শাহানশাহ)। যেমন তিনি বলেন ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ (আল্লাহ্ হইতেছেন সেই সত্তা যিনি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি শাহানশাহ, পবিত্রতম, শান্তির উৎস।)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বান্দার ঘৃণ্যতম আখ্যা হইতেছে ملك الاملاك (শাহানশাহ)। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কেহ مالك (শাহানশাহ) নহেন।'

ইব্‌ন শিহাব আরও বলেন, সর্বপ্রথম মারোয়ান উহাকে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ -এ রূপান্তরিত করেন।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলি, মারওয়ানের নিকট مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর বিশুদ্ধতার প্রমাণ ছিল বলিয়াই তিনি উহাকে ঐরূপ পড়িয়াছেন। ইব্‌ন শিহাব সেই প্রমাণ সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন না। আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইব্‌ন মারদুবিয়্যা কর্তৃক উদ্ধৃত একাধিক সনদে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) উহাকে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ রূপে পড়িতেন। مالك শব্দটি ملك (মালিকানা স্বত্ব) শব্দ হইতে গঠিত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ (নিশ্চয় আমি পৃথিবী ও উহাতে অবস্থিত সকল কিছুর মালিক এবং উহার সকল কিছুই আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে।)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ (বল, আমি মানুষের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাহিতেছি–মানুষের মালিকের নিকট।)

অপরদিকে দেখা যায় ملك শব্দটি الملك (কর্তৃত্ব) শব্দ হইতে গঠিত হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (আজ কাহার কর্তৃত্ব? একক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র।) তিনি আরও বলেন ঃ

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ (তাঁহার কথাই কার্যকর এবং রাজত্ব শুধু তাঁহারই)।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِيْنَ عَسِيْرًا

(সেদিন শুধু রহমানেরই রাজত্ব চলিবে আর কাফিরের জন্য হইবে বড়ই কঠিন দিন।)

আলোচ্য আয়াতসমূহে বিচার দিবসে আল্লাহ্ তা'আলার কর্তৃত্বের কথা বলা হইয়াছে। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে, অন্য সময়ে তাঁহার কর্তৃত্ব চলিবে না। কারণ, রব্বুল আলামীন হিসাবে সকল সৃষ্টির উপর সকল সময়ে তাঁহার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিচার দিবসের কর্তৃত্বকে জোর দিয়া বলার কারণই এই যে, সেদিন তাঁহার অনুমতি ছাড়া কাহারও কিছুই বলার বা করার ক্ষমতা থাকিবে না। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لاَّيَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ

(সেদিন রূহ ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে এবং রহমানের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেহ কথা বলিতে পারিবে না।)

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَخَشَعَتِ الاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلاَ تَسْمَعُ اِلاَّ هَمْسًا (অনন্তর সেদিন রহমানের ভয়ে কণ্ঠস্বরগুলি অনুচ্চ হইবে। ফলে তুমি ফিস ফিস শব্দ ছাড়া কিছুই শুনিতে পাইবে না।)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে আরও বর্ণিত হইয়াছে ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীন নিজ হস্তে ধারণ করিয়া বলিবেন, আমিই শাহানশাহ (الملك)। কোথায় পৃথিবীর রাজা-বাদশাহগণ (ملوك)? কোথায় পরাক্রমশালী আমীর উমারাবৃন্দ (الجبارون)? কোথায় দাম্ভিক নাফরমানকুল (المتكبرون)? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন—আজ সর্বময় কর্তৃত্ব কাহার হস্তে? একমাত্র মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র হস্তে।'

পৃথিবীতে আল্লাহ্ ভিন্ন তাঁহার সৃষ্টিও যে ملك নামে অভিহিত হইয়াছে, উহাতে শাহানশাহ বা রাজাধিরাজের অধিনস্থ রাজা অর্থ প্রকাশ করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا (নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তালূতকে রাজা (ملك) করিয়া পাঠাইয়াছেন।)

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا (আর তাহাদের পশ্চাতে জনৈক রাজা ছিল যে রাজা (ملك) জোর করিয়া প্রত্যেকটি নৌকা লইয়া যাইত।)

তিনি আরও বলেন ঃ

اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا (কারণ, তিনি তোমাদের মধ্যে নবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে রাজা (ملك) বানাইয়াছেন।)

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ... مثل الملوك على الاسرة

সিংহাসনারূঢ় বাদশাহদের দৃষ্টান্ত হইতেছে .... ।'

اَلدِّيْنُ অর্থ প্রতিদান, কর্মফল, প্রতিফল, হিসাব-নিকাশ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ (সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের যথাযথ প্রতিফল দিবেন।)

তিনি আরও বলেন ঃ

اَئِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ '(অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন) আমাদিগকে কি সত্যই কর্মফল দেওয়া হইবে'?

হাদীস শরীফে আছে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت -

'সেই ব্যক্তি প্রকৃত বুদ্ধিমান যে ব্যক্তি নিজের হিসাব নিজেই লইল এবং মরণোত্তর জীবনের জন্য কাজ করিল।'

হযরত উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ

حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا وتأهبوا للعرض الاكبر على من لاتخفى عليه اعمالكم -

"তোমাদের হিসাব লওয়ার আগেই নিজেরা নিজেদের হিসাব গ্রহণ কর। তোমাদের আমল পরিমাপিত হইবার পূর্বেই নিজেরা নিজেদের আমল মাপিয়া লও। যাঁহার কাছে তোমাদের কোন কাজই গোপন থাকিবে না, তাঁহার বৃহত্তম দরবারে হাজির হইবার প্রস্তুতি গ্রহণ কর।"

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لاَتَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ "যেদিন তোমাদের হাজির করা হইবে সেদিন তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকিবে না।"

(٤) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

৪. 'আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য কামনা করি।'

তাফসীর ঃ বিখ্যাত সাত কিরাআত বিশেষজ্ঞসহ অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ ايـاك শব্দের ى কে তাশদীদ (দ্বিত্ব) সহকারে পড়িয়াছেন। আমর ইব্ন যায়দ নামক জনৈক কিরাআত বিশেষজ্ঞ উহাকে তাশদীদ ছাড়া প্রথম বর্ণ أ (হামযাহ)-কে যের দিয়া পড়িয়াছেন। অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য কিরাআত বিশেষজ্ঞের কিরাআতের বিরোধী বিধায় আমর ইব্ন যায়দের উক্ত কিরাআত প্রত্যাখ্যানযোগ্য বটে। তাহা ছাড়া ايـا শব্দের অর্থ সূর্যের কিরণ।

কেহ কেহ أ (হামযাহ)-কে যবর দিয়া ও ى-কে তাশদীদ দিয়া أيَّاك পড়িয়াছেন।

কেহ কেহ আবার أ এর স্থলে ه বসাইয়া ى-কে তাশদীদ দিয়া هيَّاك পড়িয়াছেন। আরবী সাহিত্যে অনুরূপ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। যেমন কবি বলেন ঃ

فهياك والامر الذى ان تراحبت ـ موارده ضاقت عليك مصادره

'সাবধান! কোন কার্যের প্রবেশ পথ সুগম হইলেও যদি উহার নিষ্ক্রমণ পথ দুর্গম হয়, তাহা হইতে দূরে থাকিও।'

ইয়াহিয়া ইব্ন ওয়াহাব ও আ'মাশ ভিন্ন অন্য সকল বিশেষজ্ঞ نستعين শব্দের প্রথম ن এ যবর দিয়া পড়িয়াছেন। উক্ত বিশেষজ্ঞদ্বয় উহাকে যের সহকারে পড়িয়াছেন। অবশ্য বনী আসাদ, রবীআহ ও বনী তামীম গোত্রত্রয় সমাপিকা ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের বহুবচনে অনুরূপভাবেই উচ্চারণ করিয়া থাকে।

العبادة শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল নীচতা, নত হওয়া। যেমন طريق المعبد অর্থ পদদলিত রাস্তা। তেমনি بعير معبد অর্থ পরিত্যক্ত উট।

শরীয়তের পরিভাষায় العبادة অর্থ পূর্ণ প্রীতি, ভীতি ও বিনয়ের সমাহার। اياك কর্মকারককে ক্রিয়ার পূর্বে স্থাপন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইবাদতকে একমাত্র তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট হওয়াকে বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কাহারও ইবাদত করি না।

তেমনি আমরা তোমারই নিকট সাহায্য চাহি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কাহারও সাহায্য চাহি না। পূর্ণ ইবাদত ইহাই।

পূর্বসূরী জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, 'সূরা ফাতিহা কুরআনের তত্ত্বকথা এবং اياك نعبد واياك نستعين আয়াতটি সূরা ফাতিহার মূলতত্ত্ব। 'ইয়্যাকা না'বুদু' বলিয়া বান্দা সকল শিরক বর্জন করে এবং 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন' বলিয়া বান্দা নিজস্ব ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে যথেষ্ট না ভাবিয়া নিজেকে আল্লাহ্র সাহায্যের কাছে সোপর্দ করে। অন্যান্য অনেক আয়াতে মানুষকে উহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ـ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ "অতএব তাঁহার ইবাদত কর এবং তাঁহার নিকট নিজকে সঁপিয়া দাও। অনন্তর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের আমল সম্পর্কে অনবহিত নহেন।"

তিনি আরও বলেন ঃ

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا "বল, তিনি 'আর-রহমান'। আমরা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহারই উপর আমরা ভরসা করিয়াছি।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا "তিনি পূর্ব-পশ্চিম তথা সমগ্র সৃষ্টির প্রতিপালক প্রভু। তিনি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই। অতএব তাঁহাকেই অভিভাবক বানাও।"

পূর্ব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নাম পুরুষ হিসাবে উল্লেখিত হইবার পর আলোচ্য আয়াতে তাঁহার জন্য মধ্যম পুরুষ ব্যবহৃত হইয়াছে। বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করিবার পর যেন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হাজির হইয়াছে। তাই এখন তিনি তাঁহার জন্য মধ্যম পুরুষ ব্যবহার করিয়া বান্দাকে তাঁহার নিকট স্বীয় নিবেদন পেশ করিতে বলিতেছেন। ইহা দ্বারা তিনি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী আয়াতে তিনি স্বীয় মহিমান্বিত নামসমূহ উল্লেখ করিয়া যেরূপ নিজের প্রশংসাগুলি উল্লেখ করিলেন, বান্দা যেন সেরূপ উহা উল্লেখের মাধ্যমে তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করে। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেহ যদি তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা ছাড়া নামায আদায় করে, তাহা হইলে তাহা আদায় হইবে না।

'হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি সালাতে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করে না, তাহার সালাত হয় না।' হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ক্রমাগত আবদুর রহমান, আ'লা ইব্ন আবদুর রহমান (হারাকার গোলাম) প্রমুখ বর্ণনাকারীর সনদে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন ঃ

'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সালাত (ফাতিহা)-কে আধাআধি ভাগ করিয়া দিয়াছি। উহার মাধ্যমে বান্দা যাহা চায় তাহা পাইবে। বান্দা যখন বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করিয়াছে। সে যখন বলে اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করিয়াছে। সে যখন বলে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন, আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছে। সে যখন বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন, ইহা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত রহিয়াছে। আমার বান্দা যাহা চাহিয়াছে তাহা সে পাইবে। সে যখন বলে,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ -

তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ইহা আমার বান্দার প্রাপ্য অংশ। অনন্তর সে যাহা চাহিয়াছে তাহা সে পাইবে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ 'ইয়্যাকা না'বুদু'র তাৎপর্য হইতেছে–'হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি, একমাত্র তোমাকেই ভয় করি এবং একমাত্র তোমারই নিকট রহমত পাইতে আশা রাখি। আমরা না অন্য কাহারও ইবাদত করি, না অন্য কাহাকেও ভয় করি, আর না অন্য কাহারও নিকট রহমত পাবার আশা করি। 'ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন'-এর তাৎপর্য হইল যে, আমরা তোমার ইবাদত সহ সকল কার্যে তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।'

কাতাদাহ বলিয়াছেন–'আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহারই ইবাদত করিতে এবং সকল কাজে তাঁহারই সাহায্য কামনা করিতে স্বীয় বান্দাগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছেন।'

اِيَّاكَ نَعْبُدُ। বাক্যটি وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ বাক্যের পূর্বে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করাই বান্দার মূল উদ্দেশ্য ও কাজ। পক্ষান্তরে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইল উক্ত মূল উদ্দেশ্য ও কাজের সহায়ক ব্যাপার। সুতরাং উদ্দেশ্যকে সহায়কের পূর্বে উল্লেখ করাই সমীচীন। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

প্রশ্ন হইতে পারে, আলোচ্য আয়াতের ক্রিয়াদ্বয়ের জন্য বহুবচন কর্তা ব্যবহারের কারণ কি? নামাযে প্রত্যেক মুসল্লীই একক ও স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একমাত্র তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনার সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা জানায়। এমতাবস্থায় ক্রিয়ার কর্তা তো বহু নহে, একজন। অনেক সময় সম্মান প্রদর্শনের জন্য এক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বহুবচন ব্যবহৃত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে শব্দটি বহুবচন হইলেও উহার পদবাচ্য একবচন হয়। ইহা সেরূপ সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও নহে। তাই উহা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

তাফসীরকারগণ উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, প্রত্যেক মুসল্লীই জামাআতে হউক কিংবা একাকী হউক, ইমাম কিংবা মুক্তাদী হইক, যেইরূপেই নামায আদায় করুক না কেন, সে নিজের ও তাঁহার মু'মিন ভাইদের পক্ষ হইতেই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করার এবং কেবলমাত্র তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করার সংকল্প জ্ঞাপন করে বলিয়াই বহুবচন ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, হয়ত এক্ষেত্রে ক্রিয়ার কর্তা একজনই। কিন্তু সম্মানার্থে তাহার জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। বান্দা যখন আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল হয়, তখন সম্মানিত বান্দায় পরিণত হয়। তাই আল্লাহ্ যেন তাহাকে বলিতেছেন, নামাযরত অবস্থায় তুমি সম্মানিত বিধায় তোমার একার জন্য বহুবচন ব্যবহার কর এবং বল, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ।

কিন্তু নামাযের বাহিরে তোমার সহিত লক্ষ-লক্ষ বান্দা থাকিলেও অন্যান্য বান্দার পক্ষ হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন নিবেদন পেশ করিও না; বরং নিজের একার পক্ষ হইতে কর। তখন اعبد কি استعين ইত্যাকার শব্দ ব্যবহার কর। কারণ, প্রত্যেক বান্দাই আল্লাহ্র নিকট মুখাপেক্ষী।

কেহ কেহ উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, আল্লাহ্ যেরূপ মহান, তেমনি তাঁহার ইবাদতও মহৎ কাজ। এই কারণে উক্ত মহৎ কার্য সম্পাদনকারীকে সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষাই এখানে দেওয়া হইয়াছে। অনেকের নিকট প্রিয়জনের দাসত্বও সম্মান ও গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কবি বলেন ঃ

لاتدعنى الابيا عبدها - فانه اشرف اسمائى

'ওহে তাঁহার দাস'—এই সম্বোধন ছাড়া আমাকে অন্য কোনভাবে সম্বোধন করিও না। উহাই হইতেছে আমার অধিকতর সম্মানিত নাম।'

اعبد (আমি ইবাদত করি) ও استعين (আমি সাহায্য প্রার্থনা করি) ইত্যাদি একবচন শব্দ ব্যবহার করিলে প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট বান্দা একাই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করে এবং সে একাই উক্ত মহা মর্যাদা ও মহা সম্মানের অধিকারী। পক্ষান্তরে বান্দার নিজের ও অন্যান্যের পক্ষ হইতে আল্লাহ্র ইবাদত করার কথা ব্যক্ত করিবার মধ্যে অধিকতর বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পায়। এই জন্যই ক্রিয়ায় বহুবচন কর্তা ব্যবহৃত হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত যে মহা মর্যাদার কাজ তাহা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিভিন্ন সময়ে عبد নামে আখ্যায়িত করা হইতেও প্রকাশ পায়।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ (সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত যিনি স্বীয় عبد -এর প্রতি আল-কিতাব নাযিল করিয়াছেন।)

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে عبد নামে অভিহিত করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, রাসূলুল্লাহ (সা) উপর আল-কিতাব অবতীর্ণ করার ভিতর দিয়া আল্লাহ্ তাঁহাকে মহা সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। আর সে ক্ষেত্রেই তাঁহাকে عبد নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا "অতঃপর তাহারা এইজন্য ধিক্কার দিয়াছে যে, আল্লাহ্র عبد যখন দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকে, তখন তাহারা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরার উপক্রম করে।"

এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামাযরত অবস্থার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে নিজের আব্দ নামে অভিহিত করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, রাসূলুল্লাহ্র নামাযরত অবস্থা তাঁহার একটি সম্মানজনক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلاً "যে সত্তা স্বীয় বান্দাকে নৈশভ্রমণ করাইয়াছেন তিনি পবিত্র ও মহান।"

এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বীয় গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত বায়তুল মুকাদ্দাস পরিভ্রমণ করাইবার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে স্বীয় 'আব্‌দ' নামে অভিহিত করেন। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্ তা'আলার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনাবলী দেখিতে যাওয়া ছিল রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনের সবচাইতে গুরুত্ববহ সম্মানজনক ঘটনা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরোক্ত মহা মর্যাদাকর অবস্থাসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে নিজের 'আব্‌দ' নামে আখ্যায়িত করায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার 'আব্‌দ' হওয়া তথা তাঁহার ইবাদত করা মহা মর্যাদার বিষয়। কাফিরদের সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনেক সময়ে খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেন। এইরূপ মনঃক্ষুণ্ণ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে লিপ্ত হইতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ ـ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ـ

'আমি নিশ্চয় জানি যে, তাহারা যাহা বলে তাহাতে তোমার মনঃক্ষুণ্ণ দশা ঘটে। তুমি স্বীয় প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ কর ও নামায পড়িতে থাক। তোমার নিকট নিশ্চিত ব্যাপার (মৃত্যু) না পৌঁছা পর্যন্ত স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করিতে থাক।'

ইমাম রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কেহ কেহ বলেন ঃ مقام العبودية (দাসত্বের স্থান) مقام الرسالة (রিসালাতের স্তর) হইতে উর্ধ্বে অবস্থিত। কারণ, রিসালাত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে প্রদত্ত হয় আর আবদিয়াত বান্দার পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌র দরবারে নিবেদিত হয়। তাহা ছাড়া রাসূল স্বীয় উম্মতের কল্যাণ সাধন করেন আর আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই স্বীয় আব্‌দের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।'

ইমাম রাযীর উদ্ধৃত উপরোক্ত অভিমত ও উহার সমর্থনে প্রদত্ত যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইমাম রাযী উহাকে দুর্বল বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য বলিয়া আখ্যায়িত করেন নাই।

একদল আধ্যাত্মিক সাধক (সূফী) বলেন ঃ নেকী লাভ অথবা আযাব ঠেকানোর উদ্দেশ্যে যে ইবাদত করা হয়, তাহা অনর্থক ইবাদত। কারণ, তাহা এক ধরনের স্বার্থপরতা। তেমনি যদি আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-নিষেধ পালনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ইবাদত করা হয়, তাহাও নিম্নস্তরের ইবাদত। পক্ষান্তরে সকল মহৎ গুণের পূর্ণতার অধিকারী মহান পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভালবাসার কারণে ও তাঁহার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যে ইবাদত করা হয়, তাহাই উত্তম ইবাদত। এই কারণেই মুসল্লীরা নামাযের নিয়্যত اصلى لله (আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নামায পড়িতেছি) বলিয়া থাকে। নেকী হাসিল ও আযাব ঠেকানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়িলে উহা বাতিল হইয়া যাইবে।'

একদল তত্ত্ববিদ উপরোক্ত অভিমতের বিরোধিতা করিয়া বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলাকে পাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার ইবাদত করা এবং নেকী হাসিল ও আযাব ঠেকানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা একই কথা। ইহা পরস্পর বিরোধী নহে। এই দুই ধারণা একই সঙ্গে অন্তরে পোষণ করিয়া নামায পড়া সম্ভব।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নবী করীম (সা)-এর নিকট একদিন এক বেদুইন

আরয করিল, আমি আপনার ন্যায় অথবা মুআযের ন্যায় সুন্দরভাবে স্বীয় নিবেদন নীরবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পেশ করিতে পারি না। আমি শুধু আল্লাহ্র নিকট জান্নাত লাভের ও দোযখ হইতে পরিত্রাণের প্রার্থনা করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমরাও উহারই চতুষ্পার্শ্বে থাকিয়া নীরবে নিবেদন জানাই। (অর্থাৎ আমরাও উহার কাছাকাছি বা উহাকে কেন্দ্র করিয়া নিবেদন জানাই।)

(৫) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝

৫. 'আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর।'

তাফসীর ঃ অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ الصراط কে ص দিয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ উহাকে س দিয়া السراط রূপে পড়িয়াছেন। কেহ কেহ উহাকে ز দিয়া الزراط পড়িয়াছেন। বিখ্যাত ভাষাবিদ ফার্‌রা বলেন, বনী আজারাহ ও বনী কলব গোত্রদ্বয় الصراط শব্দকে الزراط রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকে।

সূরার প্রথম অংশে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে। এখানে তাঁহার নিকট বান্দার প্রার্থনা নিবেদিত হইতেছে। যেমন 'হাদীসে কুদসী'তে বর্ণিত হইয়াছে ঃ (আল্লাহ্ তা'আলা বলেন) উহার (ফাতিহার) অর্ধেক আমার অংশ এবং অর্ধেক আমার বান্দার অংশ। আর আমার বান্দা যাহা চাহিবে, তাহা পাইবে।'

প্রার্থনার সর্বোত্তম পদ্ধতি ইহাই যে, প্রার্থনাকারী স্বীয় প্রার্থনা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পেশ করিবার পূর্বে তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিবে। উদ্ধৃতির প্রার্থনা অন্য যে কোন পদ্ধতির প্রার্থনা হইতে উত্তম এবং উহা মঞ্জুর লাভের সম্ভাবনা বেশী। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে উক্ত পদ্ধতিতে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিতেছেন। বান্দা প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করিবে। অতঃপর নিজের ও অন্যান্য মু'মিন ভাইদের অভাব ও প্রয়োজন তাঁহার নিকট নিবেদন করিবে। ইহাই আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক বান্দার জন্য মনোনীত প্রার্থনা সম্পর্কিত সর্বোত্তম পন্থা।

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বান্দার কোন কিছু প্রার্থনা করিবার একাধিক পন্থা রহিয়াছে। একটি হইল আল্লাহ্ তা'আলার নিকট স্বীয় প্রয়োজন সরাসরি জ্ঞাপন করা। অপরটি হইল, তাঁহার নিকট স্বীয় প্রয়োজন প্রকাশ করা। আলোচ্য আয়াত প্রথম প্রকারের প্রার্থনার দৃষ্টান্ত।

প্রার্থনা দ্বিতীয় পদ্ধতির আবার দুই রূপ। একটি রূপ এই যে, উহার পূর্বে কোন স্তুতি বাক্য উচ্চারিত হয় না; বরং সরাসরি বক্তব্য পেশ করা হয়। যেমন হযরত মূসা (আ) বলিয়াছেন ঃ

رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ "হে আমার প্রতিপালক প্রভু! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণ অবতীর্ণ করিবে, আমি তাহার অবশ্যই মুখাপেক্ষী।"

দ্বিতীয় পদ্ধতির প্রার্থনার দ্বিতীয় রূপ হইল এই যে, প্রার্থনার পূর্বে বান্দা আল্লাহ্র গুণ বর্ণনা সহকারে বক্তব্য পেশ করিবে। যেমন হযরত ইউনুস (আ) বলিয়াছেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ 'তুমি ভিন্ন অন্য কোন মাবূদ নাই। তুমি মহান ও পবিত্র। নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি।'

প্রার্থনার আরেকটি পদ্ধতি এই যে, প্রার্থনাকারী শুধু প্রার্থনা পূরণকারীর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করিবে। যেমন কবি বলেন ঃ

أأذكر حاجتى ام قد كفانى * حياؤك ان شيمتك الحياء

اذا اثنى عليك المرء يوما * كفاه من تعرضه الثناء

'আমি কি আমার প্রয়োজনকে উল্লেখ করিব অথবা আপনার মহা সম্ভ্রমবোধই আমার জন্য যথেষ্ট? নিঃসন্দেহে আপনার স্বভাব হইতেছে লজ্জা। কেহ আপনার একবার প্রশংসা করিলে তাহার আর কিছু বর্ণনা করার প্রয়োজন হয় না।'

আয়াতের الهداية ক্রিয়াটির অর্থ হইতেছে 'সরল পথ প্রদর্শন করা, সরল পথে পরিচালনা করা ও সরল পথে পৌঁছাইয়া দেওয়া।' الهداية ক্রিয়াটি কয়েক নিয়মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উহার মুখ্য কর্মের পূর্বে কখনও বা الى ও ل এই দুই حرف الجر (কারক অব্যয়) ব্যবহৃত হয়। কখনও বা উহার পূর্বে কোন কারক অব্যয় ব্যবহৃত হয় না। আলোচ্য আয়াতটি শেষোক্ত প্রকারের দৃষ্টান্ত।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ অর্থ আমাদিগকে সরল পথ দেখাইয়া উহাতে পৌঁছাইয়া দাও; আমাদিগকে সরল পথের সন্ধান দাও, আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর ও আমাদের সামনে সরল পথ সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধর। এই শেষোক্ত অর্থ প্রকাশের একটি দৃষ্টান্ত হইল এই ঃ

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 'আমি তাহার নিকট ন্যায়-অন্যায় দুইটি বিষয়ই স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছি।' الهداية শব্দের ক্রিয়াপদের প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত ঃ

اِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ 'তিনি তাহাকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাকে সরল পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।' উহার আরেকটি দৃষ্টান্ত ঃ

فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ 'তাহাদিগকে দোযখের পথে লইয়া যাও।'

অন্য প্রকারের একটি দৃষ্টান্ত ঃ

وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ 'অনন্তর তুমি তাহাদিগকে নিশ্চয়ই সরল পথ প্রদর্শন করিতেছ।' উহার দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا (জান্নাতীরা বলিবে) সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্ তা'আলার যিনি আমাদিগকে এখানে পৌঁছাইয়াছেন।' ইমাম আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর বলেন—তাফসীরকারগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, الصراط المستقيم অর্থ 'পূর্ণরূপে বক্রতামুক্ত সরল সুস্পষ্ট পথ।' সকল আরব গোত্রই এই অর্থে উহা ব্যবহার করে। কবি জারীর ইব্‌ন আতিয়্যা আল্ খাতফী নিম্ন পংক্তিতে উহাকে উক্ত অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন ঃ

امير المؤمنين على صراط ـ اذا اعوج الموارد مستقيم

"যখন সব পথ বক্র হইয়া যায়, আমীরুল মু'মিনীন তখনও বক্রতামুক্ত সরল পথে অবস্থান করেন।"

অনুরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আরবগণ الصراط শব্দকে রূপকভাবে কথা, কার্য, গুণ, অবস্থা ইত্যাদির অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে। বক্র কথা, কার্য, গুণ বা অবস্থা বুঝাবার জন্য তাহারা উক্ত শব্দের সহিত المعوج (বক্র) বিশেষণ প্রয়োগ করে। صِرَاطًا الْمُسْتَقِيْم সরল কথা, কার্য, গুণ বা অবস্থা। صراط معوج বক্র কথা, কার্য, গুণ বা অবস্থা।

তাফসীরকারগণ বিভিন্নরূপে اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে তাহাদের শব্দ প্রয়োগে বিভিন্নতা থাকিলেও তাৎপর্য একই দাঁড়ায়। অর্থাৎ সকলের কথার তাৎপর্য হইল এই যে, 'সিরাতুল মুস্তাকীম' হইতেছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্যের পথ।'

একদল তাফসীরকার বলেন ঃ اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হইতেছে 'আল্লাহ্‌র কিতাব আল কুরআন'। হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছ আওয়ার, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র সাঈদ ইব্‌ন মুখতার তাঈ, হামযাহ-আয-যাইয়াত, ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়ামান, হাসান ইব্‌ন আরাফা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হইতেছে 'আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব।'

এই রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী হামযাহ ইব্‌ন হাবীব আয্ যাইয়াত হইতে উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং পরবর্তী বিভিন্ন সনদে ইমাম ইব্‌ন জারীরও উপরোক্ত হাদীস উদ্ধৃত করেন।

আমার রচিত فضائل القران -এ হযরত আলী (ক) হইতে ক্রমাগত হারিছ আ'ওয়ার প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত যে. 'মারফূ হাদীস' উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার একাংশ এই ঃ

'(নবী করীম (সা) বলেন) আল-কুরআন হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার শক্ত রজ্জু; উহা সূক্ষ্ম জ্ঞানে পরিপূর্ণ উপদেশ গ্রন্থ এবং উহাই হইতেছে 'সিরাতুল মুস্তাকীম'।'

উক্ত বর্ণনা 'মওকূফ হাদীস' রূপে হযরত আলী (ক)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবেও বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হওয়ার পরিবর্তে হযরত আলী (ক)-এর উক্তি হওয়াই অধিকতর স্বাভাবিক ও সম্ভবপর। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়েল, মনসূর ও হযরত ছাওরী বর্ণনা করেন ঃ

اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হইতেছে, 'আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব।'

আরেকদল তাফসীরকার বলেন اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হইতেছে ইসলাম। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক বর্ণনা করেন ঃ

"হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (সা)-কে বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন, اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ 'উহা হইতেছে আল্লাহ্‌র দীন। উহাতে কোনরূপ বক্রতা নাই।'

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মালিক, আবূ সালেহ ও ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুর রহমান আস সুদ্দীয়্যুল কবীরও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ সহ একদল সাহাবা হইতে ক্রমাগত মুররা হামদানী ও ইসমাঈল ইব্ন আবদুর রহমান আস সুদ্দীয়্যুল কবীর বর্ণনা করেন ঃ اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হইতেছে ইসলাম।

হযরত জাবির (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ উকায়ল বর্ণনা করেন ঃ اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হইল ইসলাম'। উহা আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী স্থান হইতে প্রশস্ত।

ইবনুল হানাফিয়্যাহ বলেন, اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হইতেছে আল্লাহ্র সেই দীন যাহা ছাড়া অন্য কোন দীন তিনি কবূল করেন না।'

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন, اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ অর্থ ইসলাম।

হযরত নাওয়াস ইব্ন সুমআন হইতে ক্রমাগত জুবায়র ইব্ন নাফীর, মু'আবিয়া ইব্ন সালেহ, লায়ছ ইব্ন সা'দ, আবুল আ'লা হাসান ইব্ন সাওয়ার ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলেন–আল্লাহ্ তা'আলা একটি উপমা দিয়াছেন। একটি সরল রাস্তা রহিয়াছে (اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ)। উহার উভয় পার্শ্বে একটি করিয়া দেওয়াল রহিয়াছে। দেওয়াল দুইটিতে কতগুলি উন্মুক্ত দ্বার রহিয়াছে। দ্বারগুলিতে পর্দা ঝুলিয়া রহিয়াছে, রাস্তার ফটকে একজন আহ্বায়ক রহিয়াছে। সে লোকদিগকে ডাকিয়া বলিতেছে–'ওহে লোক সকল! তোমরা সবাই এই রাস্তায় আস। উহা ছাড়িয়া বাঁকা রাস্তায় যাইও না।' উক্ত রাস্তার উপরও একজন আহ্বায়ক আছে। কেহ দেওয়ালের কোন দুয়ারের পর্দা তুলিতে চাহিলে সে ডাকিয়া বলে–খবরদার, উহা তুলিও না। তুলিলে বিপথগামী হইবে। সেই সরল রাস্তাটি ইসলাম। দেওয়াল দুইটি হইল আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমানা। পর্দা টানানো দুয়ারগুলি হইতেছে নিষিদ্ধ কাজসমূহ। রাস্তার ফটকে আহ্বানরত ব্যক্তি হইতেছে আল-কিতাব। রাস্তার উপর অবস্থানরত লোকটি হইল মু'মিনের বিবেক।'

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইমাম ইব্ন জারীরও উক্ত হাদীস উহার অন্যতম বর্ণনাকারী লায়ছ ইব্ন সা'দ হইতে ঊর্ধ্বতন সনদে এবং পরবর্তী স্তরে অন্য সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত নাওয়াস ইব্ন সুমআন (রা) হইতে ক্রমাগত জারীর ইব্ন নাফীর, খালিদ ইব্ন মা'দান, বাজীর ইব্ন সা'দ,. বাকীয়্যাহ, আলী ইব্ন হাজার, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

উহার সনদ حسن صحيح (বিশেষ নিয়মে গ্রহণযোগ্য)। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

মুজাহিদ বলেন– اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -এর তাৎপর্য হইতেছে الحق (সত্য)। তাই اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর অর্থ 'আমাদিগকে সত্য পথ প্রদর্শন কর।'

উক্ত তাৎপর্য অধিকতর ব্যাপক এবং উহা পূর্বোক্ত তাৎপর্য সমূহের বিরোধী নহে।

আসিম আহওয়ান হইতে ক্রমাগত হামযাহ ইব্ন মুগীরাহ, আবূন নযর হাশিম ইব্ন কাসিম প্রমুখ রাবীর সনদে আবূ হাতীম ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

'একদা আবুল আলীয়্যা বলেন, اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হইল নবী করীম (সা) এবং তাঁহার পরবর্তী দুই খলীফা।'

বর্ণনাকারী আসিম বলেন, আমরা আবুল আলীয়্যার এই ব্যাখ্যা হযরত হাসান বসরীর নিকট উল্লেখ করিলাম। তিনি বলিলেন, আলীয়্যা ঠিকই বলিয়াছেন।

উপরে বর্ণিত তাফসীরসমূহের প্রত্যেকটি শুদ্ধ ও সঠিক। উহাদের একটি অপরটির সহিত সংঘর্ষশীল নহে। বরং উহাদের একটি আরেকটির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং একটি আরেকটির সমর্থক ও পরিপূরক। কারণ, যে ব্যক্তি নবী করীম (সা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর (রা)-কে অনুসরণ করে সে ব্যক্তি সত্যকেই অনুসরণ করে। তেমনি যে ব্যক্তি 'সত্য' কে অনুসরণ করে, সে ইসলামকেই অনুসরণ করে। তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামকে অনুসরণ করে, সে কুরআনকেই অনুসরণ করে। 'আল-কুরআন' হইল আল্লাহ্র কিতাব, তাঁহার মজবুত রশি এবং তাঁহার সরল ও সোজা পথ। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলারই প্রাপ্য।

হযরত আব্দুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়েল, আ'মাশ, ইয়াহিয়া ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন আবূ যায়দাহ, ইবরাহীম ইব্ন মাহদী আল মাসীসী, মুহাম্মদ ইব্ন ফযল সাকতী ও ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেন ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ বলিয়াছেন الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ। হইল, নবী করীম (সা)-এর প্রদর্শিত পথ।

ইমাম জা'ফর ইব্ন জারীর বলেন, আমার নিকট اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -এর অধিকতর গ্রহণযোগ্য তাৎপর্য হইতেছে এই ঃ

('হে প্রভু!) তোমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও দানে ধন্য বান্দাদের জন্য তুমি যে সব কথা ও কাজ পছন্দ ও মনোনীত করিয়া তাহাদিগকে উহা করার তাওফীক দান করিয়াছ, আমাদিগকে উহার উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকার তাওফীক দান কর।'

মূলত উপরোক্ত পথই হইতেছে সিরাতুল মুস্তাকীম। কারণ, নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ সহ অন্যান্য নেককার বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ দান ও নি'আমতে ভূষিত ছিলেন। তাই তাঁহাদিগকে অনুসরণ করার তাওফীক ও সৌভাগ্য যাহারা লাভ করে তাহারা রসূলগণকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইবার, আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবকে আঁকড়াইয়া থাকিবার, তাঁহার আদেশ-নিষেধ পালন করিবার এবং নবী করীম (সা), খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য নেককার বান্দাকে অনুসরণ করিবার তাওফীক ও সৌভাগ্য লাভ করে। আর ইহাই হইতেছে الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ।

প্রশ্ন হইতে পারে, মু'মিন বান্দা তো হিদায়েতের নি'আমতে ভূষিত হইয়াই মু'মিন হইয়াছে। সে কেন প্রতি সালাতে আবার অহরহ হিদায়েত বর্ণনা করিবে? ইহা কি 'অর্জিত বস্তু পুনঃঅর্জনের' প্রচেষ্টার শামিল নহে?

উত্তরে বলা যায়, উহা অর্জিত বিষয় পুনঃঅর্জনের (تحصيل حاصل) অহেতুক প্রচেষ্টা নহে। কারণ, মু'মিন ব্যক্তির اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ। কামনার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, 'প্রভু যতটুকু হিদায়েত আমাকে দান করিয়াছ, উহাতে আমাকে অবিচল রাখ এবং যে হিদায়েত আমি এখনও লাভ করি নাই তাহা আমাকে দান করা আমার জ্ঞানের পরিধিকে আরও বাড়াইয়া দাও; অধিকতর ইলম ও মা'রিফাত সমৃদ্ধ করিয়া দাও এবং আমাকে অধিকতর নেক আমল করার তওফীক দাও।'

বলাবাহুল্য, অনুরূপ সবিস্তার প্রার্থনায় 'তাহসীলে হাসিল' অনুসৃত ও অপরিহার্য হয় না; বরং প্রত্যেক মু'মিনের জন্য উহা জরুরী। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দার অভাব ও প্রয়োজন

মিটাইবার জন্য সদা প্রস্তুত। যে বান্দা বারংবার কান্নাকাটি করিয়া তাহার অভাব পূরণের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে থাকে তাহার প্রার্থনা তিনি অবশ্যই মঞ্জুর করেন।

উক্ত মর্মে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِىْ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ـ

'হে মু'মিন সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপর, তাঁহার রাসূলের উপর, রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপর এবং অতীতে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান রাখ।'

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের নিশ্চয়ই নতুন করিয়া ঈমান আনিতে নির্দেশ দেন নাই; বরং অর্জিত ঈমানের উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকিতে এবং অধিকতর ইলম ও মারিফাতের দ্বারা উহাকে সবল ও সমৃদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছেন। ইহা অবশ্যই অর্জিত বিষয় পুনরর্জনের আদেশ নহে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

বস্তুত হিদায়েত লাভ করার পর হিদায়েত প্রাপ্ত ব্যক্তি যাহাতে হিদায়েতের উপর অবিচল থাকিতে পারে এবং উহা আরও সবল ও সমৃদ্ধ করিতে পারে, তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বারংবার প্রার্থনা করা তাহার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং মু'মিনদের নিম্নরূপ প্রার্থনা করিতে বলেন ঃ

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ـ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

'হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! আমাদিগকে হিদায়েত দান করিবার পর আমাদের অন্তরগুলি বিপথগামী করিও না। অনন্তর তুমি আমাদিগকে নিজের তরফ হইতে আরও রহমত দান কর। নিশ্চয় তুমি মহা দানশীল।'

হযরত আবূ বকর (রা) মাগরিবের নামাযের তৃতীয় রাকআতে ফাতিহা পড়ার পর উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিতেন।

উপরোক্ত আলোচনা সমুহের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হইতেছে এই ঃ হে আল্লাহ্! আমাদিগকে হিদায়েতে অবিচল রাখ এবং বিপথগামী হইতে দিও না। (পরন্তু আমাদিগকে অধিকতর হিদায়েত প্রদান কর)।

(٦) صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

(٧) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

৬. 'তাহাদের পথ যাহাদের তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছে;

৭. যাহারা অভিশপ্ত নহে এবং পথভ্রষ্টও নহে।'

তাফসীর ঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ বান্দা যখন বলে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ـ তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'ইহা আমার বান্দার অংশ এবং আমার বান্দা যাহা চাহিয়াছে তাহা পাইবে।'

মূলত হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত তাৎপর্য অধিকতর ব্যাপক ও প্রশস্ত।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলোচ্য আয়াতের প্রথম শব্দ غير -কে পূর্ববর্তী আয়াতাংশ اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ -এর صفت হিসাবে الجر বিভক্তি সহকারে (যের দিয়া) পড়িয়াছেন।

আল্লামা যামাখ্শারী বলেন, কেহ কেহ উহাকে পূর্ববর্তী আয়াতের عليهم শব্দের অন্তর্গত هم সর্বনামের حال (হাল) হিসাবে نصب বিভক্তি সহকারে (যবর দিয়া) পড়িয়াছেন। নবী করীম (সা) এবং হযরত উমর (রা) উক্তরূপে পড়িতেন। ইব্ন কাছীর হইতেও অনুরূপ আয়াত বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাকে نصب দিয়া পড়িলে পূর্ববর্তী আয়াতের অন্তর্গত انعمت সমাপিকা ক্রিয়াটি উহার নসব বিভক্তির عامل (সংঘটক) হইবে।

আয়াতত্রয়ের তাৎপর্য এই ঃ আমাদিগকে সরল পথ দেখাও–যাহাদিগকে বিশেষ দানে বিভূষিত করিয়াছ সেই নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও অন্যান্য নেককারগণের পথ–তাহারাই (হিদায়েতপ্রাপ্ত, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি অনুগত এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-নিষেধ পালনকারী; যাহারা অভিশপ্ত তাহাদের পথে নহে। কাহারা অভিশপ্ত? যাহারা সত্যকে জানিয়া বুঝিয়া এবং চিনিয়াও উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহারাই অভিশপ্ত। সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা নহে; বরং সত্যের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা হইতেছে তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যাহারা পথভ্রষ্ট তাহাদের পথও নহে। কাহারা পথভ্রষ্ট? যাহারা অজ্ঞতার কারণে সত্যভ্রষ্ট ও সত্য হইতে বিচ্যুত তাহারাই পথভ্রষ্ট। সত্য-বিদ্বেষ নহে; বরং সত্যের প্রতি অনীহা হইতেছে তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

আয়াতে اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ -এর পূর্বে যে غير শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে الضالين -এর পূর্বে উহারই সমার্থক لا শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ও اَلضَّالِّيْنَ একই শ্রেণীভুক্ত নহে; বরং দুইটি পৃথক শ্রেণী। তাহাদের এই পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত প্রদানের জন্যই الضالين শব্দের পূর্বে لا শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত শ্রেণী দুইটি হইতেছে যথাক্রমে ইয়াহুদী জাতি ও নাসারা জাতি। الضالين হইল ইয়াহুদী জাতি এবং اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ হইল নাসারা জাতি।

এক দল ব্যাকরণবিদ বলেন, আয়াতে প্রযুক্ত غير শব্দটি استثناء (ইস্তিছনা) হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাকে استثناء ধরিলে উহা استثناء منقطع হইবে। কারণ, অভিশপ্ত শ্রেণী ও পথভ্রষ্ট শ্রেণী উভয়ই আল্লাহ্র দানে বিভূষিত শ্রেণী হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র।

আয়াতের اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ও الضالين শব্দ দুইটির প্রত্যেকটির পূর্বে উহার مضاف হিসাবে صراط শব্দটি উহ্য রহিয়াছে। বাক্যটির পূর্ণরূপ হইল ঃ

غير صراط المغضوب عليهم ولاصراط الضالين

অর্থাৎ (আমাদিগকে সরল পথ দেখাও–যাহাদের তুমি বিশেষ অনুগ্রহে ভূষিত করিয়াছ তাহাদের পথ) যে পথ অভিশপ্তদের পথ হইতে ভিন্ন এবং পথভ্রষ্টদের পথ নহে।

পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয়ে বলা হইয়াছে, 'আমাদিগকে সরল পথ দেখাও, যাহাদের তুমি অনুগ্রহে ভূষিত করিয়াছ তাহাদের পথ দেখাও।' উক্ত বক্তব্যের আলোকে বিবেচনা করিলে আলোচ্য

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এর অর্থ হইতেছে, যাহাদিগকে তুমি বিবেকদানে বিভূষিত করিয়াছ তাহাদের পথ।'

মূলত ইহা পূর্ব বর্ণিত الصراط المستقيم এর ব্যাখ্যা। ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদদের মতে ইহা الصراط المستقيم এর بدل (বদল)। অবশ্যই ইহা الصراط المستقيم এর عطف البيان ও হইতে পারে।।[১] আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদের বিশেষ দানে বিভূষিত করিয়াছেন, সূরা নিসায় তিনি তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ - وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا - ذَالِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا -

'অনন্তর যাহারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে অনুসরণ করে, তাহারা সেই সকল বান্দার সহিত থাকিবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ দানে ধন্য করিয়াছেন। তাহারা হইতেছে নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেক্কারগণ। কতই উত্তম সঙ্গী তাহারা। আল্লাহ্র তরফ হইতে এই দান। এই ব্যাপারে আল্লাহ্র জ্ঞানই যথেষ্ট।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এর তাৎপর্য হইতেছে ঃ

'তোমার দাসত্ব ও আনুগত্যের দানে যাহাদের ধন্য করিয়াছ, তাহাদের পথ; তাহারা হইতেছেন তোমার ফেরেশতাবৃন্দ, নবীকুল, সিদ্দীকগণ ও নেক্কার সম্প্রদায়।'

নিম্নোক্ত আয়াতও আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا -

রবী' ইব্ন আনাস (রা) হইতে আবূ জাফর রাযী বর্ণনা করেন ঃ اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এর তাৎপর্য হইল শুধু 'নবীগণ'।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করেন, اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ -এর তাৎপর্য হইল 'মু'মিনগণ'। মুজাহিদও অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন।

ওয়াকী' বলেন ঃ উহারা হইতেছেন 'মুসলমানগণ'।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ 'উহারা হইতেছেন নবীকুল ও তাঁহাদের অনুসারীবৃন্দ।'

---

১. একই বস্তুর পরিচয়ের জন্য ব্যবহৃত দুইটি সমান পরিচয় জ্ঞাপক শব্দের দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির بدل (বদল) বলা হয়। পক্ষান্তরে একই বস্তুর পরিচয়ের জন্য দুইটি পদ ব্যবহৃত হইলে এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটি অপেক্ষা অধিকতর পরিচিত হইলে দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির عطف البيان (আতফুল বয়ান) বলা হয়। –অনুবাদক

আয়াতের পূর্বোল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের পূর্বে صراط শব্দকে উহাদের مضاف হিসাবে উহ্য মানাই সঙ্গত। সাহিত্যে موصوف -কে উহ্য রাখিয়া শুধু উহার صفت -কে উল্লেখ করার প্রথা রহিয়াছে। যেমন কবি বলেন–

كانك جمل من جمال بنى اقيش - يقعقع عند رجليه بشن

"তুমি যেন বনূ উকায়শ গোত্রের একটি উষ্ট্র যাহা দুই পায়ের সাথে একটি মশক লইয়া চলে।"

উক্ত চরণের বাক্যটি ছিল এইরূপ ঃ

كانك جمل من جمال بنى اقيش

صفت অথচ উহাকে উহ্য রাখিয়া শুধু উহার موصوف শব্দের من جمال শব্দটি جمل উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে উক্ত আয়াতে صراط শব্দটি একবার اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ও একবার الضالين শব্দের مضاف হইয়াছে। উহা উহ্য রাখিয়া শুধু مضاف اليه উল্লেখ করা হইয়াছে।

একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, و لا الضالين শব্দের অন্তর্গত لا শব্দটি অতিরিক্ত। এখানে উহা কোন অর্থ প্রদান করে নাই। বাক্যটি মূলত এইরূপ ছিল ঃ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّيْنَ

সাহিত্যে এইরূপ ব্যবহারের প্রচলন রহিয়াছে। যেমন কবি আজ্জাজ বলেন ঃ

فى بئر لاحور - السعى وماشعر

'যে অজ্ঞাতসারে দৌড়াইয়া কূপে পড়িয়া গেল।' এখানে حور শব্দের পূর্ববর্তী لا শব্দটি অতিরিক্ত। উহা কোন অর্থ প্রদান করে নাই। মূল বাক্যটি এইরূপ ছিল ঃ

فى بئر حور -سعى وما شعر

মূলত উক্ত বিশেষজ্ঞদের এই মতটি ভ্রান্ত। আমি ইতিপূর্বে উক্ত لا শব্দের ব্যবহারের তাৎপর্য ও রহস্য বর্ণনা করিয়াছি, উহাই সঠিক ও শুদ্ধ। এখানে لا শব্দটি অতিরিক্ত ও অর্থহীন নহে বলিয়াই হযরত উমর (রা) لا শব্দের জায়গায় উহার সমার্থক শব্দ غير আনিয়া আয়াতটি এইরূপে পড়িতেন ঃ غير المغوب عليهم وغير الضالين

আসওয়াদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ ও আবূ মু'আবিয়ার একটি বর্ণনার ভিত্তিতে আবূ উবায়দ কাসিম ইব্ন সালাম স্বীয় فضائل قران গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ

হযরত উমর (রা) এইরূপে পড়িতেন– غير المغضوب عليهم وغير الضالين

উক্ত বর্ণনার সূত্র শুদ্ধ। হযরত উবাই ইব্ন কা'ব সম্বন্ধেও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনিও আলোচ্য আয়াতটি উক্তরূপে পড়িতেন। তাহাদের এইরূপ পড়ার ব্যাখ্যা স্বরূপ বলা হয় যে, তাহারা উহা আদত হিসাবে নহে; বরং আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে উক্তরূপে পড়িতেন।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এখানে لا শব্দটি অতিরিক্ত ও অনর্থক নহে। কেহ যাহাতে الضالين শব্দকে الذين انعمت عليهم এর و শব্দ দ্বারা সংযোজিত বিধায় একই অর্থবোধক

না মনে করে, তজ্জন্য ও বিশেষত শব্দ দুইটি যে দুইটি পৃথক শ্রেণীর জন্য ব্যবহৃত তাহা বুঝাইবার জন্য الضالين। শব্দের পূর্বে ﻻ শব্দ বসানো হইয়াছে। কারণ, যাহারা সত্যকে জানিয়া, বুঝিয়া, চিনিয়া শুধুমাত্র বিদ্বিষ্ট হইয়া উহা প্রত্যাখ্যান করে, তাহারা হইল المغضوب عليهم। পক্ষান্তরে যাহারা সত্যকে জানিতে, বুঝিতে ও চিনিতে চেষ্টা করে না, তাহারা হইল الضالين। প্রথমোক্ত দল হইল ইয়াহূদী সম্প্রদায় ও শেষোক্ত দল হইল নাসারা সম্প্রদায়। মু'মিন সম্প্রদায় যেন এই উভয় দল এবং তাহাদের ধ্যান-ধারণা ও আমল-আখলাক হইতে দূরে থাকে, তজ্জন্য উভয় দলকে পৃথকভাবে দেখাবার উদ্দেশ্যে الضالين। শব্দের পূর্বে ﻻ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইয়াহূদীরা সত্যকে জানিত, কিন্তু মানিত না। পক্ষান্তরে নাসারারা সত্যকে জানিতে চেষ্টা করিত না। মু'মিনকে সত্য জানিতেও হইবে, মানিতেও হইবে।

ইয়াহূদী ও নাসারা এই উভয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই একদিকে যেমন পথভ্রষ্ট, অন্যদিকে তেমনি অভিশপ্ত। তবে অভিশপ্ত হওয়া ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং পথভ্রষ্ট হওয়া নাসারা সম্প্রদায়ের মূল বৈশিষ্ট্য।

ইয়াহূদী সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ 'যাহাদের আল্লাহ্ অভিশপ্ত কারিয়াছেন এবং যাহাদের উপর তাঁহার গযব আপতিত হইয়াছে।' পক্ষান্তরে নাসারা সম্প্রদায় সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا - وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ 'তাহারা ইতিপূর্বে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং অনেক লোকও পথভ্রষ্ট করিয়াছে। অনন্তর তাহারা সত্যপথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।'

اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ। যে ইয়াহূদী জাতি এবং الضالين। যে নাসারা জাতি তাহা একাধিক হাদীস ও প্রাথমিক যুগের মনীষীদের উক্তি দ্বারা সুপ্রমাণিত। হযরত 'আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রা) হইতে যথাক্রমে আব্বাস ইবনে হুবায়শ, সিমাক ইব্‌ন হারব, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) কর্তৃক প্রেরিত অশ্বারোহী বাহিনী আমার ফুফুসহ একদল লোককে গ্রেফতার করিয়া লইয়া গেল। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিগণ নবী করীম (সা)-এর নিকট নীত হইয়া তাঁহার সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলে আমার ফুফু বলিলেন-'হে আল্লাহর রাসূল! আমার তত্ত্বাবধায়ক ও সেবক আমার নিকট হইতে দূরে রহিয়াছে। আমি অত্যন্ত বৃদ্ধা। আমার নিজের কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন (আমাকে মুক্তি দিন)। আল্লাহ আপনার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিবেন।' নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন, আপনার তত্ত্বাবধায়ক কে? আমার ফুফু বলিলেন-'আদী ইব্‌ন হাতেম।' নবী করীম (সা) বলিলেন-সেই 'আদী ইব্‌ন হাতেম, যে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল হইতে ভাগিয়া গিয়াছে? অতঃপর তিনি আমার ফুফুকে মুক্তি দিলেন। মুক্তি দিবার পর তিনি একটি লোক সঙ্গে করিয়া আমার ফুফুর নিকট আসিলেন এবং সেই লোকটির দিকে ইঙ্গিত করিয়া আমার ফুফুকে বলিলেন-ইহার নিকট হইতে সওয়ারী অশ্ব চাহিয়া নিন। আমার ফুফুর ধারণা, সেই লোকটি আলী হইবেন। আমার ফুফু অশ্ব চাওয়া মাত্র তিনি তাহাকে অশ্ব দিলেন। আমার ফুফু আমাদের নিকট পৌঁছিয়া আমাকে বলিলেন-'তুমি যাহা করিয়াছ তোমার পিতা জীবিত থাকিলে উহা করিত না। মুহাম্মদ

(সা) একজন সহৃদয় মহামানব। এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিল। সে তাঁহার দানে অনুগৃহীত হইল। আরেক ব্যক্তি আসিল। সেও তাঁহার দানে ধন্য হইল। (এইরূপ তাঁহার ভাণ্ডার মানব কল্যাণে নিয়োজিত)। আমি ('আদী ইব্ন হাতেম) নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাজির হইলাম। দেখিলাম, তাঁহার নিকট নারী কি শিশুরাও আসে। তিনি তাহাদের সহিত নিরহংকারভাবে মেলামেশা করেন এবং তাঁহার চরিত্র এত মধুর যে, তাহারা নিঃসংকোচে তাঁহার নিকট আসা-যাওয়া করে। আমি বুঝিতে পাইলাম যে, তিনি রোমক সম্রাট কি পারস্য সম্রাটের মত (দাম্ভিক) নহেন। আমাকে তিনি বলিলেন—হে 'আদী! কেন তুমি لا اله الا الله বলিতেছ না? আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? কেন তুমি الله اكبر বলিতেছ না? আল্লাহ অপেক্ষা মহান কিছু আছে কি? ইহা শুনিয়া আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম। দেখিলাম, তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডল আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, المغضوب عليهم হইতেছে ইয়াহুদী জাতি এবং الضالين হইতেছে নাসারা জাতি (অসমাপ্ত)।'

ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীছের অন্যতম রাবী সিমাক হইতে উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং পরবর্তী স্তরে অন্য রাবীর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহা সিমাক ইব্ন হারব ভিন্ন অন্য কোন রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। উহা غريب হাদীস হইলেও حسن غريب (বিশেষ বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য)।

হযরত আদী ইব্ন হাতেম হইতে যথাক্রমে মারী ইব্ন কিতরী, সিমাক ইব্ন হারব, হাম্মাদ ইব্ন সালামা প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত আছে ঃ

"হযরত 'আদী ইব্ন হাতেম (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন المغضوب عليهم হইল ইয়াহুদীরা এবং الضالين হইল নাসারারা।"

'আদী ইব্ন হাতেম (রা) হইতে যথাক্রমে শা'বী, ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ, সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনিয়া প্রমুখ বর্ণনাকারীর সনদেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত 'আদী ইব্ন হাতেম (রা)-এর আলোচ্য হাদীসটি একাধিক সূত্রে ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উহাদের উল্লেখ দীর্ঘ হইবে বলিয়া এখানে উহা পরিত্যক্ত হইল।

জনৈক সাহাবী হইতে যথাক্রমে আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক, বুদাইল ইব্ন উকায়লী, মা'মার ও আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেন ঃ

وادى القرى (ওয়াদিউল কোরা) নামক স্থান দিয়া একদিন নবী করীম (সা) যাইতেছিলেন। বনূ কয়েন গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! المغضوب عليهم এবং الضالين কাহারা ? তিনি বলিলেন, المغضوب عليهم হইল ইয়াহুদী জাতি এবং الضالين হইল নাসারা জাতি। জারীর, উরওয়াহ ও খালিদ আল হাজ্জা উপরোক্ত হাদীস আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক হইতে حديث مرسل (সাহাবী রাবীর নাম উহ্য) হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যত্র উরওয়ার এক রিওয়ায়েতের সনদে সাহাবা রাবী হিসাবে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর নাম উল্লেখিত হইয়াছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা) হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক, বুদায়ল ইব্ন মায়সারাহ্, ইবরাহীম ইব্ন তোহমান প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি একদিন নবী করীম (সা)-এর নিকট المغضوب عليهم এবং الضالين -এর পরিচয়

জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন المغضوب عليهم। ইয়াহুদী জাতি এবং الضالين। নাসারা জাতি।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ মালিক, আবূ সালেহ ও সুদ্দী এবং হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) সহ একদল সাহাবী হইতে যথাক্রমে মুবার্রা হামদানী ও সুদ্দী বর্ণনা করেন ঃ 'উল্লিখিত সাহাবীগণ বলেন, المغضوب عليهم। হইল ইয়াহুদী জাতি এবং الضالين। হইতেছে নাসারা জাতি।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্‌হাক এবং ইবন জুরায়জ বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– المغضوب عليهم। হইতেছে ইয়াহুদী জাতি ও الضالين। হইতেছে নাসারা জাতি।'

রবী' ইব্‌ন আনাস, আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম প্রমুখ বহুসংখ্যক তাফসীরকারও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন, 'আল মাগ্‌দূবি আলায়হিম' এবং 'আদ্‌দাল্লীন' এর উপরোক্ত তাফসীরের পরিপন্থী কোন তাফসীর কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমি জ্ঞাত নহি। উপরোল্লেখিত হাদীস ও নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ হইতেছে মুফাস্‌সিরগণ কর্তৃক বর্ণিত এতদসম্পর্কিত তাফসীরের ভিত্তি ও উহার যথার্থতার প্রমাণ।

সূরা বাকারায় 'বনী ইসরাঈল' সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ ج فَبَاۤءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ط وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ -

'তাহারা যে জিনিসের বিনিময়ে নিজেদের বিক্রয় করিয়াছে, উহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। উহা এই যে, আল্লাহ তা'আলা যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহারা বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহার উপর চাহেন স্বীয় কৃপা বর্ষণ করেন। তাহারা ক্রোধের পর ক্রোধে দিশাহারা হইয়া ফিরিতেছে। অনন্তর কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।'

সূরা মায়িদায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَالِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ط اُولٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَاۤءِ السَّبِيْلِ -

'বল, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র নিকট প্রাপ্তব্য প্রতিদানের দিক দিয়া নিকৃষ্টতম লোকদের পরিচয় দিব? স্বয়ং আল্লাহ্ যাহাদের অভিশপ্ত করিয়াছেন, যাহাদের উপর তাঁহার গযব আপতিত হইয়াছে এবং যাহাদের মধ্য হইতে তিনি বানর, শুকর ও তাগুতের গোলামে পরিণত করিয়াছেন তাহারাই। তাহাদের অবস্থান খুবই নিকৃষ্ট এবং সত্য হইতে তাহারা সর্বাধিক বিচ্যুত।'

তিনি আরও বলেন ঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ - ذَالِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ - كَانُوْا لاَيَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ - لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ -

"বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা দাউদ এবং ঈসা ইব্ন মরিয়মের মুখে অভিশপ্ত হইয়াছে। উহা এইজন্য যে, তাহারা অবাধ্য হইত এবং সীমা লঙ্ঘন করিত। তাহারা যে পাপাচারে লিপ্ত ছিল তাহা হইতে বিরত হইত না। তাহাদের আচরণ ছিল বড়ই জঘন্য।'

জীবন চরিত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে ঃ একদা যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল সত্য ধর্মের সন্ধানে একদল সঙ্গীসহ সিরিয়া গমন করেন। ইয়াহুদীরা তাহাকে বলিল, তুমি আল্লাহর গযব মাথায় না লইয়া আমাদের ধর্মে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যায়দ বলিলেন, আমি উহা সহিতে পারিব না। তিনি ইয়াহুদী ধর্ম বা নাসারা ধর্ম কোনটিই গ্রহণ করিলেন না। অথচ তিনি মুশরিকদের ধর্ম ও মূর্তিপূজা হইতেও দূরে রহিলেন। তিনি স্বীয় বিবেক বুদ্ধি ও সহজাত স্বভাব অনুযায়ী চলিতে লাগিলেন। তাহার সঙ্গীগণ খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করিল। কারণ, তাহারা উহাকে ইয়াহুদী ধর্ম অপেক্ষা সত্যের কাছাকাছি মনে করিল। হযরত ওরাকা ইব্ন নওফিল (রা) তাহাদের অন্যতম ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে নবী করীম (সা)-এর মাধ্যমে হিদায়েতের নি'আমত দ্বারা সৌভাগ্যবান করিয়াছিলেন। নবূওত লাভ করিবার কালে নবী করীম (সা) যে ওহী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি (হযরত ওরাকা) উহার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন।

'দাল্লীন' ও 'জাল্লীন' সমস্যা

'আরবী ض বর্ণ ও ظ বর্ণের মধ্যকার উচ্চারণগত ব্যবধান খুবই সামান্য। উহাদের উচ্চারণ স্থান পরস্পর কাছাকাছি অবস্থিত। ض এর উচ্চারণ স্থান হইতেছে জিহবার তিন দিকের প্রান্তভাগ এবং তৎসন্নিহিত দন্তমূল। পক্ষান্তরে ظ এর উচ্চারণ স্থান হইতেছে জিহ্বার অগ্রভাগ এবং উপরস্থ মাড়ির সম্মুখের দন্তদ্বয়ের অগ্রভাগ। তদুপরি বর্ণদ্বয় উভয়ই الحروف المطبقه حروف الرخوه ও والحروف المجهوره শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত কারণে উহার উচ্চারণগত পার্থক্য নিরূপণ করা এবং তদনুযায়ী উহাদের সঠিক উচ্চারণ স্থান হইতে উচ্চারণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে বেশ কষ্টকর। তাই একদল ফকীহ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত বর্ণদ্বয়ের একটির উচ্চারণ স্থানে অপরটি উচ্চারণ করা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমাযোগ্য ত্রুটি বলিয়া পরিগণিত হইবে। উক্ত অভিমতই সঠিক ও শুদ্ধ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

উল্লেখ্য যে, ض বর্ণকে আমিই অধিকতর শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিয়া থাকি—নবী করীম (সা)-এর বাণী বলিয়া কথিত এই উক্তিটি ভিত্তিহীন। উহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বাণী নহে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ফাতিহার বিষয়বস্তু

মহা মর্যাদাশীল সপ্ত আয়াত বিশিষ্ট সূরা ফাতিহায় আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

সকল প্রশংসার মালিক ও প্রাপক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। সকল প্রশংসা তাঁহারই জন্য নিবেদিত। তিনি মহা বিশ্বের প্রতিপালক প্রভু, পরম করুণাময় ও নিরতিশয় কৃপাপরায়ণ।

নিশ্চয় একদিন মানুষের ভাল-মন্দ কার্যের বিচার অনুষ্ঠিত হইবে। সেই দিন সকল কর্তৃত্ব ও এখতিয়ার আল্লাহ্ তা'আলা স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। সুতরাং একদিকে যেমন বদকারদের স্বীয় পাপাচারের শাস্তি এড়াইবার কোন পথ থাকিবে না, অন্যদিকে তেমনি নেককারদের স্বীয় পুণ্য কাজের পুরস্কার লাভের পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকিবে।

মানুষ একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও ইবাদত করিবে এবং নিজ দাসত্ব ও ইবাদতে তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না।

মানুষ নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর না করিয়া একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার হাতে নিজেকে সঁপিয়া দিবে। সত্য ও ন্যায়ের পথে চলিতে সে সর্বদা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে।

মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সঠিক ও সরল পথের নির্দেশনা প্রার্থনা করিবে। পৃথিবীতে সে সরল পথে চলিতে পারিলে আখিরাতেও জান্নাতে প্রবেশের পথ তাহার জন্য সহজ সরল হইয়া যাইবে। পৃথিবীর সরল পথ হইতেছে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারদের পথ। যাহারা বস্তু জগতে তাঁহাদের অনুসৃত আধ্যাত্মিক পথে চলিবে এবং তাঁহাদের সহিত আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে অবস্থান করিবে, তাহারা পারলৌকিক জীবনেও তাঁহাদের পথ ধরিয়া অনন্ত জান্নাত ধামে প্রবেশ ও বসবাসের সৌভাগ্য লাভ করিবে। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁহার রাসূল, তাঁহার কিতাব ও আখিরাতের উপর ঈমান আনিয়া এবং নেক কাজ করিয়া চির আনন্দ নিকেতন জান্নাত ধামে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করা।

আধ্যাত্মিক জীবন অনুসরণের জন্য যেরূপ সঠিক ও সরল পথ রহিয়াছে, তেমনি ভ্রান্ত ও বাঁকা পথও রহিয়াছে। উক্ত ভ্রান্ত ও বক্র পথে চলিয়া একদল মানুষ অভিশপ্ত এবং অন্য দল পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাদের পথ হইতে মানুষকে সর্বদা দূরে থাকিতে হইবে। মানুষ তাহাদের পথ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। তাহাদের বিভ্রান্তির ফাঁদে জড়াইলে পারলৌকিক জীবনে যন্ত্রণাময় মহাশাস্তি মানুষের চিরসাথী হইবে। সুতরাং তাহাদের চক্রান্ত ও প্রতারণা হইতে মানুষকে সদা সতর্ক থাকিতে হইবে।

সূরা ফাতিহার কয়েকটি সূক্ষ্ম ও অনবদ্য শব্দ প্রয়োগ ধারা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

আল্লাহ্ তা'আলা الانعام। ক্রিয়াটি কর্তৃবাচ্যে ব্যবহার করিয়া নিজেকে উহার কর্তা বানাইয়াছেন। পক্ষান্তরে الغضب। ক্রিয়াটির কর্তা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা হইলেও তিনি কর্তা হিসাবে নিজেকে উল্লেখ না করিয়া উক্ত ক্রিয়া হইতে কর্মবাচ্যের বিশেষণ (اسم مفعول) ব্যবহার করিয়াছেন। الغضب। ক্রিয়াটির প্রকৃত কর্তা যে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ "তুমি কি তাহাদের কথা ভাবিয়াছ, আল্লাহ্ যাহাদের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন তাহাদেরকে যাহারা বন্ধু বানাইয়াছে?"

আরেকটি উদাহরণ। যদিও আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষকে পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী হওয়ার শক্তি যোগাইয়া থাকেন, তথাপি এখানে তিনি নিজেকে কর্তা হিসাবে উল্লেখ করিয়া اضلال। ক্রিয়াটি ব্যবহার করেন নাই। বরং মানুষকে কর্তা বানাইয়া اضلال। ক্রিয়া হইতে কর্তৃবাচ্যের বিশেষণ (اسم فاعل) ব্যবহার করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলাই যে মানুষকে গোমরাহ হইবার শক্তি দান করেন নিম্নোক্ত আয়াতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে ঃ

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ـ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَه وَلِيًّا مُّرْشِدًا 'আল্লাহ্ যাহাকে সঠিক পথ দেখান সেই পথপ্রাপ্ত আর তিনি যাহাকে বিপথগামী করেন তাহার জন্য তুমি কোন দিশারী বন্ধু পাইবে না।'

অনুরূপ আরেকটি আয়াত এই ঃ

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهُ ـ وَيَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ "আল্লাহ্ যাহাদের পথভ্রষ্ট করেন, তাহাদের আর কোন পথ প্রদর্শক জোটে না। আর তিনি যাহাদের হাল ছাড়িয়া দেন, তাহারা স্বীয় অবাধ্যতার আবর্তে ঘুরপাক খাইয়া পেরেশান হইয়া ফিরে।"

উপরোল্লিখিত আয়াতগুলি ছাড়া আরও একাধিক আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে হিদায়েতপ্রাপ্ত বা পথভ্রষ্ট করেন। القدرية। সম্প্রদায় ও উহার অনুসারীগণ বলেন ঃ বান্দা নিজেই হিদায়েত অথবা গোমরাহীর পথ গ্রহণ করিয়া থাকে। সে এক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীন।

কাদরিয়া সম্প্রদায়ের উপরোক্ত মতবিশ্বাস ভ্রান্ত ও বাতিল। তাহারা নিজেদের বিদআতী বিশ্বাসের সমর্থনে কুরআন মজীদের متشابه (দ্ব্যর্থবোধক) আয়াত পেশ করিয়া থাকে। অথচ যে সকল আয়াত দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের উক্ত বিশ্বাস ভ্রান্ত, তাহারা তাহা পরিত্যাগ করে। গোমরাহ ফির্কার অবস্থাই এইরূপ।

সহীহ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে রাসূল (সা) বলিয়াছেন, 'কোন দলকে কুরআনের 'মুতাশাবাহা' আয়াতের পশ্চাতে পড়িতে দেখিলে তোমরা বুঝিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কথাই (সূরা আলে-ইমরানে) বলিয়াছেন। অতএব তোমরা তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিও।'

উক্ত আয়াতে রাসূল (সা) নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন ঃ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهٖ ـ

"যাহাদের অন্তরে বক্রতা রহিয়াছে তাহারা ফিতনা সৃষ্টির জন্যে এবং ভ্রান্ত অর্থ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে উহার (মুতাশাবাহা আয়াতের) পশ্চাতে পড়িয়া যায়।"

আল্লাহ্ তা'আলার শোকর যে, কুরআন মজীদে বিদআতীদের আকীদা-বিশ্বাসের পক্ষে প্রকৃত কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই। কারণ, কুরআন মজীদ আসিয়াছে সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিল পৃথক করিয়া দিতে। উহাতে কোনরূপ স্ববিরোধিতার লেশমাত্র নাই। কারণ, উহা সর্বজন প্রশংসিত শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী মহান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে অবতীর্ণ গ্রন্থ।

'আমীন' প্রসঙ্গ

ফাতিহা পাঠের শেষে امين (আমীন) বলা মুস্তাহাব। امين শব্দটি يس (য়্যা-সীন) শব্দের সমওজন বিশিষ্ট। উহার অর্থ–'আয় আল্লাহ্ কবূল কর।'

কেহ কেহ উহার প্রথম বর্ণ أ- (হামযাহ)-এর পর আলিফ যোগ না করিয়া উহাকে امين রূপে পড়েন।

'আমীন' বলা যে মুস্তাহাব নিম্নোক্ত হাদীস হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত ওয়ায়েল ইব্‌ন হুজর (রা) হইতে ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত ওয়ায়েল ইব্‌ন হুজর (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে غير المغضوب عليهم ولا الضالين পাঠের পর امين বলিতে শুনিয়াছি। তিনি আওয়াজ লম্বা করিয়া (مدبها صوته) উহা পাঠ করিয়াছেন।'

ইমাম আবূ দাউদের বর্ণনায় রহিয়াছে رفع بها صوته তিনি উচ্চস্বরে উহা পাঠ করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীসটি حديث حسن অর্থাৎ বিশেষ বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য। হযরত আলী (ক), হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) প্রমুখ সাহাবা হইতেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'নবী করীম (সা) غير المغضوب عليهم ولا الضالين পাঠের পর বলিতেন امين 'আমীন'। প্রথম কাতারের মুসল্লীগণ উহা শুনিতে পাইতেন।'

ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ উহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্র রিওয়ায়েতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে, 'মসজিদে امين শব্দের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইত।' ইমাম দারা কুতনীও উক্ত হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি উহাকে حديث حسن বা গ্রহণযোগ্য হাদীস বলিয়াছেন।

হযরত বিলাল (রা) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিয়াছেন–'আমার পূর্বে امين বলিবেন না।' ইমাম আবূ দাউদ এই বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আবু নসর কুশায়রী উল্লেখ করিয়াছেন–'হযরত হাসান ও হযরত জা'ফর সাদেক امين শব্দের م বর্ণকে তাশদীদ দিয়া উহাকে أمين البيت الحرام আয়াতের অন্তর্গত أمين শব্দের ন্যায় উচ্চারণ করিতেন।'

আমাদের (ইব্‌ন কাছীরের) ফকীহগণ ও অন্য একদল ফকীহ বলেন–নামাযের বাহিরে 'আমীন' বলা মুস্তাহাব এবং নামাযের ভিতরে আমীন্ বলা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্। মুসল্লী একাকী হউক কিংবা ইমাম হউক অথবা মুক্তাদী হউক–যে কোন অবস্থায় 'আমীন' বলা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্। কারণ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'ইমাম যখন আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন

বলিবে। কারণ, যাহার آمين। ফেরেশতাগণের আমীনের সহিত মিলিয়া যাইবে, তাহার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।'

ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় রহিয়াছে-নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'যদি কেহ নামাযে বলে, آمين। আর আকাশের ফেরেশতারাও বলেন, 'আমীন' এবং একটি অপরটির সহিত মিলিয়া যায়, তবে তাহার অতীতের গুনাহ মাফ হইয়া যায়।'

একদল বিশেষজ্ঞ 'যদি ফেরেশতাদের আমীন বলার সহিত মুসল্লীর আমীন বলা মিলিয়া যায়'-এই বাক্যের এইরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন, 'যদি উভয়ের আমীন কবূল হইয়া যায়।'

আরেকদল উহার এইরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'যদি উভয়ের آمين। ইখলাসপূর্ণ হয়।'

হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ইমাম যখন বলে, ولا الضالين। তখন তোমরা বলিবে آمين। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উক্ত দোয়া কবূল করিবেন।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে যাহ্হাক ও যোয়াইবের বর্ণনা করেন-আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! آمين। শব্দের অর্থ কি? তিনি জবাবে বলিলেন-'হে আমার প্রতিপালক! তুমি উহা কবূল কর।'

জওহারী বলেন-آمين। অর্থ 'এইরূপ হউক।' ইমাম তিরমিযী বলেন- آمين। অর্থ 'আমাদিগকে নিরাশ করিও না।'

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ বলেন آمين। অর্থ 'আয় আল্লাহ্! আমাদের দোয়া কবূল কর।'

ইমাম কুরতুবী উল্লেখ করিয়াছেন-'মুজাহিদ, ইমাম জা'ফর সাদেক এবং হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ বলেন, آمين। শব্দটি আল্লাহ্ তা'আলার একটি নাম। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ একটি বর্ণনা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী حديث مرفوع হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আবূ বকর ইবনুল আরাবী উহাকে অশুদ্ধ ও অনির্ভরযোগ্য বলিয়াছেন। তাঁহার মতে উহা রাসূল (সা)-এর বাণী নহে।'

ইমাম মালিক (র)-এর শিষ্যবর্গ বলেন-ইমাম 'আমীন' বলিবেন না, তবে মুক্তাদী 'আমীন' বলিবে। কারণ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ সালেহ, সাম্মী ও ইমাম মালিক বর্ণনা করেন- "ইমাম যখন বলে ولا الضالين তখন তোমরা বলিবে آمين।।"

এতদ্ব্যতীত হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে-নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ইমাম যখন পড়িবে ولا الضالين তখন মুক্তাদিরা বলিবে آمين।।

ইতিপূর্বে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হাদীসের বর্ণনায় রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (স) বলিয়াছেন, ইমাম যখন آمين। বলে, তোমরাও তখন آمين। বলিবে।'

ইতিপূর্বে উল্লিখিত অন্য বর্ণনায়ও রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) غير المغضوب عليهم ولا الضالين। পাঠ করার পর آمين। বলিতেন।'

সরব নামাযে মুক্তাদী সরবে آمين। বলিবে, না নীরবে বলিবে, তাহা লইয়া আমাদের (শাফেঈ) মাযহাবের ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। তাহাদের মতভেদের সারসংক্ষেপ

এই যে, ইমাম যদি امين বলিতে ভুলিয়া যান, তাহা হইলে মুক্তাদী জোরে 'আমীন' বলিবে। ইহা আমাদের (শাফেঈ) মাযহাবের সর্বসম্মত অভিমত। ইমাম যদি জোরে 'আমীন' বলে, তাহা হইলে আমাদের মাযহাবের উত্তরসূরী ফকীহদের অভিমত অনুযায়ী মুক্তাদী আস্তে 'আমীন' বলিবে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এরও মাযহাব। ইমাম মালিক (রা) হইতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

উক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ বলেন–امين একটি যিক্র। নামাযের মধ্যে অন্যান্য যিক্র যেরূপ জোরে পড়া হয় না, উহাও তেমনি জোরে পড়া হইবে না।

পক্ষান্তরে আমাদের (শাফেঈ) মাযহাবের পূর্বসূরীদের অভিমত এই যে, ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ই জোরে 'আমীন' বলিবে। ইহা ইমাম আহমদেরও মাযহাব। ইমাম মালিক (র) হইতেও অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ দলীল হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন ঃ

'হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইমাম ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করেন, 'নবী করীম (সা) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ পাঠ করার পর امين বলিতেন এবং প্রথম কাতারের মুসল্লীগণ উহা শুনিতে পাইতেন। তখন উহা মসজিদে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইত।'

আমাদের (শাফেঈ) মাযহাবের ফকীহগণের তৃতীয় একটি অভিমত রহিয়াছে। উহা এই যে, মসজিদ ছোট হইলে মুক্তাদীগণ জোরে 'আমীন' বলিবে না। কারণ, সকল মুক্তাদীই ইমামের পাঠ শুনিতে পায়। কিন্তু মসজিদ বড় হইলে মুক্তাদীরাও জোরে 'আমীন' বলিবে যাহাতে মসজিদের সর্বত্র 'আমীন' শব্দের ধ্বনি পৌঁছিয়া যায়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন ঃ

'একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইয়াহুদী জাতির বিষয় উল্লেখ করা হইলে তিনি বলিলেন–আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে জুমআর নামাযের মত এক নি'আমাত দান করিয়াছেন যাহা হইতে ইয়াহুদীগণ বঞ্চিত রহিয়াছে। তিনি আমাদিগকে কিবলা দান করিয়াছেন যাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত রহিয়াছে। ইয়াহুদীগণ আমাদের জুমআর নামায, আমাদের কিবলা ও ইমামের পিছনে আমাদের امين বলার প্রতি যতখানি ঈর্ষা পোষণ করে, ততখানি ঈর্ষা অন্য কিছুতেই পোষণ করে না।'

ইমাম ইব্ন মাজাহ্ও অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। উহা এইরূপ ঃ

"(নবী করীম (সা) বলিলেন)–ইয়াহুদীগণ তোমাদের সালাম বিনিময় করা এবং امين বলার কারণে তোমাদের প্রতি যেরূপ ঈর্ষা পোষণ করে, সেরূপ ঈর্ষা আর কিছুতে পোষণ করে না।" হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইমাম ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, তোমাদের امين বলার কারণে ইয়াহুদীগণ তোমাদের প্রতি যেরূপ ঈর্ষা পোষণ করে সেরূপ ঈর্ষা অন্য কোন কারণে করে না। অতএব তোমরা বেশী করিয়া امين বল।'

উপরোক্ত রিওয়ায়েতের সনদে তালহা ইব্ন আমর একজন দুর্বল রাবী।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– امين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين ('আমীন' হইতেছে মু'মিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত 'মহর'।)

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমাকে নামাযের মধ্যে ও (অন্যত্র) দোয়ার পরে امين বলার বিধান প্রদান করা হইয়াছে। আমার পূর্বে হযরত মূসা (আ) ব্যতীত অন্য কেহ উক্ত বিধান প্রাপ্ত হন নাই। মূসা (আ) দোয়া করিতেন আর হারূন (আ) امين বলিতেন। তোমরা দোয়ার পর امين বলিবে। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দোয়া কবূল করিবেন।'

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে কোন কোন বিশেষজ্ঞ নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা পরবর্তী বিষয় প্রমাণ করেন ঃ

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالاً فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ج رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ـ قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَاتَتَّبِعَانِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ ـ

"মূসা বলিল–হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি ফিরআউন ও তাহার অনুসারীদের পার্থিব জীবনে ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর দান করিয়াছ। হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! তাহারা উহার বদৌলতে মানুষদিগকে তোমার পথ হইতে বিচ্যুত করিতেছে। হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! তুমি তাহাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস এবং তাহাদের অন্তর কঠিন কর, যাহাতে তাহারা আযাব না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে। আল্লাহ্ বলিলেন, তোমাদের উভয়ের দোআ কবূল করা হইল। এখন তোমরা অবিচল থাক এবং অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করিও না।"

উক্ত আয়াতের قال موسى দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়াটি করিয়াছিলেন হযরত মূসা (আ) একাই। অথচ আয়াতের قداجيبت دعوتكما অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাঁহারা উভয়ই দোয়া করিয়াছিলেন। ইহার সমন্বয় পাওয়া যায় পূর্বোক্ত হাদীসে। আয়াতের পরস্পর বিরোধীরূপে প্রতিভাত বিষয়টির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া পেশ করিয়াছেন হযরত মূসা (আ) এবং হযরত হারূন (আ) امين বলিয়া শরীক হইয়াছেন। এই কারণে তিনিও দোয়াকারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন এবং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা 'তোমাদের উভয়ের দোয়া কবূল করা হইল' বলিয়া উহার স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন।

এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে কেহ দোয়া করিতে থাকিলে যাহারা 'আমীন' বলে তাহারাও দোআকারীরূপে গণ্য হয়। অতএব মুক্তাদী ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়িবে না। কারণ, তাহার امين বলাই ফাতিহা পাঠের স্থলাভিষিক্ত হইবে।

এই কারণেই হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'যে ব্যক্তি মুক্তাদী হইয়া ইমামের পিছনে নামায পড়ে, ইমামের কিরাআতই তাহার কিরাআত বলিয়া গণ্য হইবে।'

উক্ত হাদীস ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। হযরত বিলাল (রা) বলিতেন-'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পূর্বে আপনি آمين বলিবেন না।'

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সরব নামাযে কিরাআত পড়া মুক্তাদীর জন্য ফরয নহে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে যথাক্রমে কা'ব, ইব্ন আবূ সালীম, লায়ছ, জারীর, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালাম, আহমদ ইব্ন হাসান ও ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ইমাম যদি غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ বলিয়া آمين বলে আর উহার সঙ্গে বিশ্ববাসী ও আকাশের বাসিন্দাদের آمين মিলিয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার অতীতের গুনাহ মাফ করিয়া দেন। যে ব্যক্তি آمين না বলে, তাহার অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার সমতুল্য, যে ব্যক্তি একটি দলের সহিত মিলিয়া যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইল। অতঃপর দলের লোকেরা লটারী করিয়া প্রত্যেকের গনীমতের অংশ বুঝিয়া নিল। সে জিজ্ঞাসা করিল-আমার অংশ পাইলাম না কেন? উত্তর আসিল-তুমি آمين বল নাই, তাই।

تمت بالخير

॥ সূরা ফাতিহার তাফসীর সমাপ্ত ॥

Contents

তৃতীয় অধ্যায়

আলিফ-লাম পারা

Contents

সূরা আল্ বাকারা

২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকূ', মাদানী

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ॥

সূরা বাকারার ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ

ইমাম আহমদ (র) বলেন–আমাকে আরেম, তাহাকে মু'তামার, তাহাকে তাহার পিতা, তাঁহাকে এক ব্যক্তি তাহার পিতা হইতে, তাহাকে মা'কিল ইব্ন ইয়াসার বর্ণনা করেন ঃ

'রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল-বাকারা কুরআনের শীর্ষভাগে অবস্থিত সর্বোন্নত চূড়া। উহার প্রত্যেকটি আয়াতের সঙ্গে আশিজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হইয়াছেন। 'আল্লাহু লাইলাহা ইল্লাহু আল হাইয়্যুল কাইয়্যুম' শীর্ষক আয়াতটি আরশের নীচ হইতে বাহির করিয়া সূরা বাকারায় শামিল করা হইয়াছে। সূরা ইয়াসীন কুরআনের হৃদয় সদৃশ। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও পারলৌকিক সুফল লাভের জন্য উহা পাঠ করে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যুপথযাত্রীর সামনে সূরাটি পড়িও।'

এই সনদটি শুধু ইমাম আহমদই উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত অপর এক সনদে তিনি বলেন ঃ আমাকে আরেম, তাঁহাকে আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক, তাহাকে সুলায়মান আত্তায়মী, তাঁহাকে আবূ উসমান (হিন্দী নহে), তাঁহাকে তাঁহার পিতা ও তাঁহাকে মা'কিল ইব্ন ইয়াসার বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'সূরাটি মরণাপন্ন ব্যক্তির সম্মুখে পাঠ করিও।' অর্থাৎ সূরা ইয়াসীন।

এই হাদীসের সনদে পূর্বোক্ত সনদের বেনামী ব্যক্তির নাম ব্যক্ত হইয়াছে এবং এই সনদে আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী হাকীম ইব্ন জুবায়রের সূত্রে নিম্ন হাদীসটি উদ্ধৃত করেন। হাকীম ইব্ন জুবায়র (জঈফ) আবূ সালেহ হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'রাসূল (সা) বলিয়াছেন–প্রত্যেকটি বস্তুর শীর্ষ আছে। আল-কুরআনের শীর্ষ হইল সূরা বাকারা এবং উহাতে শ্রেষ্ঠতম আয়াত (আয়াতুল কুরসী) বিদ্যমান।'

সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হইয়াছে যে, সুহায়ল ইব্‌ন আবি সালেহ তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন-'তোমাদের ঘরগুলিকে কবরে পরিণত করিও না। নিশ্চয় যেই গৃহে সূরা বাকারা তিলাওয়াত হয়, সেই গৃহে শয়তান প্রবেশ করে না।'

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ' বলিয়াছেন। আবূ উবায়দ আল কাসিম ইব্‌ন সালাম বলেন ঃ আমাকে ইব্‌ন আবূ মরিয়ম, তাহাকে ইব্‌ন লাহীয়াহ, তাহাকে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব, তাহাকে সিনান ইব্‌ন সা'আদ ও তাহাকে আনাস বিন মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ

'নিশ্চয় শয়তান যেই গৃহে সূরা বাকারা পড়িতে শোনে, সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া যায়।'

সিনান ইব্‌ন সা'আদ কিংবা সা'আদ ইব্‌ন সিনানকে ইব্‌ন মাঈন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের হাদীসকে আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) প্রমুখ 'মুনকার' বলিয়াছেন।

আবূ উবায়দ বলেন-আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর, তাহাকে শু'বা, তাহাকে সালাম ইব্‌ন কোহায়েল, তাহাকে আবুল আহওয়াস ও তাহাকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ

'কোন ঘরে সূরা বাকারা পড়িতে শুনিলে শয়তান অবশ্যই সেই ঘর হইতে পলায়ন করে।'

বর্ণনাটি ইমাম নাসাঈ 'আল ইয়াওম ওয়াল লাইলা' গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাকিম তাঁহার 'মুস্তাদরাক' এ উহা শু'বার সূত্রে উদ্ধৃত করিয়া বলেন, হাদীসটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য উহা সহীহাইনে উদ্ধৃত হয় নাই।

ইব্‌ন মারদুবিয়্যা বলেন-আমাকে আহমদ ইব্‌ন কামিল, তাহাকে আবূ ইসমাঈল তিরমিযী, তাঁহাকে আইয়ুব ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল, তাহাকে আবূ বকর ইব্‌ন আবূ উয়ায়স, তাহাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন আজলান, তাহাকে আবূ ইসহাক, তাহাকে আবুল আহওয়াস ও তাহাকে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ

'তোমাদের কাহাকেও যেন এইরূপ দেখিতে না পাই যে, পায়ের উপর পা চড়াইয়া গান করিতেছ এবং সূরা বাকারা পাঠ ছাড়িয়া দিয়াছ। নিশ্চয় শয়তান সেই ঘর হইতে পালায় যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়। নিকৃষ্টতম ঘর সেইটি যেখানে কুরআন তিলাওয়াত হয় না।'

ইমাম নাসাঈ তাঁহার 'আল ইয়াওমু ওয়াল লাইলাহ্' নামক সংকলন গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্‌ন নসর হইতে ও তিনি আইয়ুব ইব্‌ন সুলায়মান হইতে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন।

ইমাম দারেমী তাঁহার সনদে ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেন ঃ

'এমন কোন ঘর হয় না যেখানে সূরা বাকারা তিলাওয়াত হইলে শয়তান হাওয়া ছাড়িতে ছাড়িতে পালায় না।' তিনি আরও বলেন, 'প্রত্যেকটি বস্তুর শীর্ষভাগ আছে এবং আল-কুরআনের শীর্ষভাগ হইল আল-বাকারা। তেমনি প্রত্যেকটি বস্তুরই নির্যাস আছে এবং আল কুরআনের নির্যাস হইল বৃহদায়তন সূরাগুলি।'

ইমাম শা'বীর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে ঃ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন-'রাত্রিকালে যে ব্যক্তি সূরা বাকারার দশটি আয়াত তিলাওয়াত করে, সেই ঘরে সেই রাত্রিতে শয়তান প্রবেশ করে না। আয়াত দশটি হইল, সূরা বাকারার শুরুর চারি আয়াত, আয়াতুল কুরসী, উহার

পরবর্তী দুই আয়াত ও সূরার শেষ তিন আয়াত।' অপর এক বর্ণনায় আছে–সেই রাত্রিতে সেই বাড়ির বাসিন্দাগণকে শয়তান কিংবা কোন অনভিপ্রেত বস্তু কোন ক্ষতি করিতে পারে না। উক্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া পাগলের উপর ফুঁক দিলে পাগল ভাল হয়।

সহল ইব্ন সা'আদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন–প্রত্যেকটি বস্তুর চূড়া আছে এবং আল-কুরআনের চূড়া হইল সূরা বাকারা। অনন্তর যে ব্যক্তি কোন রাত্রে তাহার গৃহে উহা তিলাওয়াত করে, শয়তান তিন রাত্রি পর্যন্ত সেই ঘরে প্রবেশ করে না। যদি কেহ তাহার ঘরে দিনে উহা পাঠ করে, তাহা হইলে তিন দিন অবাধ্য শয়তান সেই ঘরে ঢোকে না।"

বর্ণনাটি আবুল কাসিম আত-তাবারানী, আবূ হাতিম ও ইব্ন হিব্বান নিজ নিজ সহীহ সংকলনে উদ্ধৃত করেন। ইব্ন মারদুবিয়্যা উহা আল আয্রাক ইব্ন আলী হইতে, তিনি হাসান ইব্ন ইবরাহীম হইতে, তিনি খালিদ ইব্ন সাঈদ আল মাদানী হইতে, তিনি আবূ হাযেম হইতে ও তিনি সহল হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন হিব্বানের মতে খালিদ ইব্ন সাঈদ আল্ল মাদায়নী' (আল মাদানী নহে)।'

তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ্ আবদুল হামীদ ইব্ন জা'ফর হইতে, তিনি সাঈদ আল মাকরাবী হইতে, তিনি আবূ আহমদের গোলাম আতা হইতে এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ক্ষুদ্র দল অভিযানে পাঠাইতে গিয়া প্রত্যেককে কুরআন পাক হইতে তিলাওয়াত করিতে বলিলেন। তখন যে যাহা জানিত তাহাই পাঠ করিল। তিনি তখন এক তরুণের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–তোমার কতটুকু জানা আছে? সে বলিল, আমি অমুক অমুক আয়াত ও সূরা বাকারা জানি। তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন–সূরা বাকারা তোমার মুখস্থ আছে? সে বলিল–হ্যাঁ। তিনি বলিলেন–যাও, তুমিই এই অভিযানে নেতৃত্ব দিবে। তখন একজন সম্ভ্রান্ত প্রধান ব্যক্তি বলিলেন–আল্লাহর কসম! আমি সূরা বাকারা এইজন্য মুখস্থ করি নাই যে, উহা আমল করিতে পারিব না। রাসূল (সা) বলিলেন–কুরআন শিখ ও উহা পাঠ কর। যে ব্যক্তি কুরআন শিখে, পাঠ করে ও উহা আমল করে সে হইল সুগন্ধি বিচ্ছুরক মিশ্কপূর্ণ পাত্রের মত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআন শিখিয়া আমল করে না, সে যেন মিশ্কপূর্ণ সুগন্ধিবিহীন আবদ্ধ পাত্র।'

উপরোক্ত বর্ণনাটি ইমাম তিরমিযী উদ্ধৃত করিয়া বলেন, হাদীসটি 'হাসান সহীহ।' তারপর উহা তিনি লায়ছ হইতে, তিনি সাঈদ হইতে, তিনি আবূ আহমদের গোলাম আতা হইতে 'মুরসাল হাদীস' হিসাবে বর্ণনা করেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইমাম বুখারী বলেন–লায়ছ বলিয়াছেন যে, আমাকে ইয়াযীদ ইবনুল হাদী, তাঁহাকে মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ও তাঁহাকে উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) বর্ণনা করেন ঃ

'তিনি এক রাত্রে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করিতেছিলেন। তাঁহার পাশেই তাঁহার ঘোড়াটি বাঁধা ছিল। হঠাৎ ঘোড়াটি লাফালাফি জুড়িয়া দিল। তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করিলেন। ঘোড়াটিও স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তখন আবার তিলাওয়াত শুরু করিলেন। ঘোড়াটি আবার লাফাইতে লাগিল। তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করিয়া তাকাইলেন। ঘোড়াটিও সুস্থ হইয়া দাঁড়াইল। তিনি আবার তিলাওয়াত শুরু করিতেই ঘোড়া আবার লাফানো শুরু করিল। তাঁহার পুত্র ইয়াহিয়া

ঘোড়ার কাছাকাছি ঘুমাইতেছিল। তাঁহার ভয় হইল, পুত্রের গায়ে ঘোড়ার পায়ের আঘাত লাগিবে। তাই তিনিই পুত্রকে তুলিয়া আনিতে গেলেন। তখন একবার আকাশের দিকে তাকাইলেন এবং যাহা দেখার তাহা দেখিলেন। ভোর হওয়া মাত্র তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়া আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করিলেন। রাসূল (সা) শুনিয়া বলিলেন–'তুমি তিলাওয়াত বন্ধ করিলে কেন?' তিনি বলিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহিয়া আঘাত পাইবে এই ভয়ে বন্ধ করিয়াছি। কারণ, সে ঘোড়াটির কাছাকাছি ছিল। আমি তাহাকে সরাইতে গিয়া আকাশের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম, একটি ছায়াপথে যেন সারিবদ্ধ দীপমালা জ্বলজ্বল করিতেছে। উহা ভালভাবে দেখার জন্য বাহির হইলাম। তখন উহা শূন্যে মিলাইয়া গেল।' রাসূল (সা) বলিলেন–তুমি কি জান উহা কি ছিল? তিনি বলিলেন–না। রাসূল (সা) বলিলেন–তাহারা ছিলেন একদল ফেরেশতা। তোমার তিলাওয়াতের সুরে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন। যদি তুমি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করিতে তাহা হইলে তাঁহারাও সকাল পর্যন্ত থাকিতেন। লোকজন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইত এবং ফেরেশতাগণও তাহাদের দৃষ্টির আড়ালে যাইতেন না।'

ইমাম আবূ উবায়দ আল কাসিম ইব্ন সালাম তাঁহার 'ফাযায়েলুল কুরআন' গ্রন্থে এই বর্ণনাটি আবদুল্লাহ ইব্ন সালেহ ও ইয়াহিয়া ইব্ন বুকায়র লায়ছ হইতে বর্ণনা করেন। উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) হইতে উহা ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই সব ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত।

ছাবিত ইব্ন কয়স ইব্ন শিমাস (রা)-এর ক্ষেত্রেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে এবং আবূ উবায়দ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন ঃ আমাকে ইবাদ ইব্ন ইবাদ, তাঁহাকে জারীর ইব্ন হাযিম, তাহাকে তাহার চাচা জারীর ইব্ন ইয়াযীদ বলিয়াছেন যে, তাহাকে মদীনার প্রবীণ ব্যক্তিরা বর্ণনা করিয়াছেন–তাহারা রাসূল (সা)-এর খিদমতে হাজির হইয়া আরয করিলেন, 'আপনি কি দেখিতে পাইয়াছেন যে, ছাবিত ইব্ন কয়স ইব্ন শিমাসের গৃহটি সারারাত্রি দীপমালার আলোকে ঝলমল করিতেছিল?' রাসূল (সা) জবাবে বলিলেন–'সম্ভবত সে সূরা বাকারা পড়িয়াছিল।' বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি ছাবিতকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন–হ্যাঁ, আমি সূরা বাকারা পড়িয়াছিলাম।

এই সনদটি উত্তম। অবশ্য কিছুটা অস্পষ্টতা বিদ্যমান। হাদীসটি 'মুরসাল'। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সূরা আলে ইমরানসহ সূরা বাকারার ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনা

ইমাম আহমদ বলেন–আমাকে আবু নাঈম, তাহাকে বাশার ইব্ন মুহাজির, তাহাকে আব্দুল্লাহ ইব্ন বুরাইদ তাহার পিতা বুরাইদা এই বর্ণনা শুনাইয়াছেন ঃ

'আমি নবী করীম (সা)-এর দরবারে বসা ছিলাম। আমি শুনিতে পাইলাম, তিনি বলিতেছেন–'সূরা বাকারা শিখ। উহা গ্রহণে বরকত ও বর্জনে আক্ষেপ মিলে। উহার উপর বাতিল শক্তির কোন ক্ষমতা চলে না।' বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকিলেন। অতঃপর বলিলেন–'সূরা আল-বাকারা ও সূরা আলে ইমরান শিখ। কারণ, উহারা দুইটি আলোকপিণ্ড। কিয়ামতের দিন উহাদের পাঠকমণ্ডলীকে শামিয়ানা, মেঘপুঞ্জ কিংবা পাখীর ঝাঁকের মত মাথার উপরে আসিয়া ছায়া দিবে। কিয়ামতের দিন কুরআন পাঠক কবর

হইতে উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে কুরআন এক তরুণের বেশে তাহার সামনে হাজির হইয়া বলিবে-আমাকে চিনিয়াছ কি? সে বলিবে-না, আমি তোমাকে চিনি না। তখন সেই তরুণ বলিবে-আমি তোমার সহচর কুরআন। আমি তোমাকে দিনের ক্ষুৎপিপাসা ও রাতের নিদ্রা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলাম। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসার পিছনে লাগে। আজ সকল ব্যবসা তোমার পেছনে জড়ো হইয়াছে। তারপর তাহার ডানে প্রশস্ত রাজ্য এবং বামে স্থায়ী নিকেতন জান্নাত প্রদত্ত হইবে। তাহার মস্তকে মহামর্যাদার মুকুট স্থাপন করা হইবে। তাহার পিতামাতাকে এমন পোষাকে অলংকৃত ও সজ্জিত করা হইবে পৃথিবীবাসী তাহাদের সামনে কখনও যাহা উপস্থিত করিতে পারে না। তাহারা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিবে-আমাদিগকে কেন ইহা পরানো হইল? জবাব আসিবে-তোমাদের সন্তানের কুরআন তিলাওয়াতের জন্য। অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে ঃ কুরআন তিলাওয়াত করিতে করিতে জান্নাতের সিঁড়ির ধাপগুলি অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে থাক।' যত উর্ধ্বে গিয়া তাহার তিলাওয়াত শেষ হইবে তত উর্ধ্বে তাহার কক্ষ নির্ধারিত থাকিবে। তিলাওয়াত ধীরে চলুক কি দ্রুত, ফল একইরূপে পাইবে।

ইব্ন মাজাহ বাশার ইব্ন মুহাজির হইতে এই হাদীসের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি 'হাসান' শ্রেণীভুক্ত। কারণ, ইমাম মুসলিম বাশারের হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্ন মাঈন তাহাকে ছিকাহ রাবী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, তাহার হাদীস গ্রহণে দোষ নাই। অবশ্য ইমাম আহমদ তাহার বর্ণিত এই হাদীসকে 'মুনকার' বলিয়াছেন। তবে তাহার হাদীস 'মু'তাবার বটে, কিন্তু উহাতে কখনও অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ ঘটে। ইমাম বুখারী বলেন, তাহার কোন কোন হাদীসের বিরোধিতা করা হইয়াছে। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তাহার হাদীস উদ্ধৃত করা হয়, কিন্তু উহা দলীল হিসাবে কখনও পেশ করা হয় না। ইব্ন আদী বলেন, তাহার বর্ণিত হাদীস অনুসৃত হয় না। দারা কুতনী বলেন, তাহার হাদীস সবল নহে।

আমি বলিতেছি, তাহার এই হাদীসের কোন কোন অংশের সমর্থন অন্য হাদীসে মিলে। আবূ উমামা আল বাহেলীর হাদীস এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। ইমাম আহমদ বলেন-আমাকে আব্দুল মালেক ইব্ন উমর, তাহাকে হিশাম, তাহাকে ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর, তাহাকে আবূ সালাম ও তাহাকে আবূ উমামা বর্ণনা করেন ঃ

سمعت رسول الله صلعم يقول اقرءوا القرأن فانه شافع لاهله يوم القيامة اقرءوا الزهراوين البقرة وال عمران فانهما يأتيان يوم القيامة كانهما عمامتان او كانهما غيايتان او كانهما فرقان من طير صواف يحاجان عن اهلهما يوم القيامة ثم قال اقرءوا البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة لاتستطيعها البطلة -

'আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'কুরআন পড়। কিয়ামতের দিন কুরআন উহার পাঠকদের জন্য শাফাআতকারী হইবে। তোমরা যুগ্ম আলোকপিণ্ড অর্থাৎ আল্ বাকারা ও আলে ইমরান তিলাওয়াত কর। কিয়ামতের দিন উহারা দুই খণ্ড মেঘ কিংবা শামিয়ানা কিংবা

পাখীর ঝাঁক হইয়া পাঠকারীর মাথার উপর ছায়া দিবে।' অতঃপর তিনি বলেন, 'সূরা বাকারা পড়। উহা গ্রহণে বরকত ও বর্জনে দুঃখ দেখা দেয় এবং কোন যাদুকর উহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।'

ইমাম মুসলিমও 'সালাত' অধ্যায়ে মুআবিয়া ইব্‌ন সালামের অনুরূপ একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। মুআবিয়া ইব্‌ন সালাম তাহার ভাই যায়দ ইব্‌ন সালাম হইতে, তিনি তাহার দাদা আবূ সালাম হইতে, তিনি আবূ উমামা সদী ইব্‌ন আজলান আল বাহেলী হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

উক্ত হাদীসে উল্লেখিত 'আয যহরাওয়ান' অর্থ আলোকপিণ্ডদ্বয়। 'আল গায়ায়াত' অর্থ উপরে ছায়াদায়ক শামিয়ানা। 'আল-ফুরক' অর্থ খণ্ড বস্তু। 'আস্ সাওয়াফ' অর্থ ঝাঁক বাঁধা। 'আল্ বুতলাত' অর্থ যাদু। 'লা তাস্তাতী'হা' অর্থ উহা আয়ত্ত করিতে পারে না। কেহ বলেন, উহার পাঠকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আন্ নাওয়াস ইব্‌ন সিম্‌আনের হাদীসও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ইমাম আহমদ বলেন–আমাকে ইয়াযীদ, তাহাকে ওয়ালিদ ইব্‌ন মুসলিম, তাঁহাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাজির, তাঁহাকে ওয়ালিদ ইব্‌ন আবদুর রহমান আল জারশী ও তাঁহাকে জুবায়র ইব্‌ন নফীর বর্ণনা করেন যে, আমাকে আন্ নাওয়াস্ ইব্‌ন সিমআন বলেন ঃ

'আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, কিয়ামতের দিন কুরআন ও উহার বাআমল পাঠকদের একত্রিত করা হইবে। সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান তাহাদের অগ্রভাগে থাকিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন এমন তিনটি উদাহরণ পেশ করিলেন যাহা আমি ভুলি নাই। তিনি বলিলেন–সূরা দুইটি দুই খণ্ড মেঘ, শামিয়ানা কিংবা দুই ঝাঁক পাখীর মত পাঠকদের মাথার উপর থাকিয়া ছায়া দান করিবে।'

ইমাম মুসলিম উক্ত বর্ণনাটি ইসহাক ইব্‌ন মনসূর হইতে, তিনি ইয়াযীদ ইব্‌ন আব্দে রব্বিহি হইতে উদ্ধৃত করেন। ইমাম তিরমিযী উহা আল ওয়ালিদ ইব্‌ন আবদুর রহমান আল্ জারশী হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলেন–হাদীসটি 'হাসান গরীব' শ্রেণীভুক্ত।

আবূ উবায়দ বলেন–আমাকে হাজ্জাজ, তাহাকে হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা, তাহাকে আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র বর্ণনা করেন যে, আমাকে যতদূর মনে পড়ে হাম্মাদ আবূ মুনীব হইতে ও তিনি তাহার চাচা হইতে এই বর্ণনা শুনান ঃ

'এক ব্যক্তি সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান পড়িল। যখন সে নামায শেষ করিল, কা'ব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান পড়িয়াছ ? সে বলিল–হ্যাঁ। কা'ব বলিলেন, যাঁহার মুঠায় আমার প্রাণ তাঁহার শপথ। নিশ্চয় উহার ভিতর আল্লাহ্‌র এমন নাম রহিয়াছে যেই নামে কোন কিছু প্রার্থনা করিলেই কবূল হয়। লোকটি বলিল–উহা কোন্ নাম আমাকে বলুন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে তাহা বলিব না। কারণ, আমার ভয় হয় তুমি তাহা দ্বারা এমন কিছু প্রার্থনা করিবে যাহা তোমার, নয় তো আমার ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। আমাকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালেহ, তাঁহাকে মুআবিয়া ইব্‌ন সালেহ, তাঁহাকে সালেহ ইব্‌ন আমের বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ উমামাকে বলিতে শুনিয়াছেন–'তোমাদের এক ভাই স্বপ্নে দেখিল, মানুষ দল বাঁধিয়া পাহাড়ের উপত্যকায় বিচরণ করিতেছে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে দুইটি সবুজ বৃক্ষ হইতে গায়েবী আওয়াজ আসিতেছে,

"তোমাদের মধ্যে সূরা বাকারার পাঠক আছে কি ? তোমাদের ভিতরে সূরা আলে ইমরানের পাঠক আছে কি ?" বর্ণনাকারী বলেন, 'এক ব্যক্তি বলিল, হ্যাঁ। অমনি বৃক্ষ দুইটি তাহার দিকে ফলসহ ঝুঁকিয়া পড়িল। তখন সে উহার সহিত ঝুলিয়া পড়িল। তাহাকে লইয়া গাছ দুইটি আবার পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া গেল।'

আমাকে আব্দুল্লাহ ইব্ন সালেহ মুআবিয়া ইব্ন সালেহ হইতে ও তিনি আবূ ইমরান হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি উম্মে দারদাকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

'এক ব্যক্তি নিয়মিত কুরআন পাঠ করিত। একবার সে তাহার প্রতিবেশির উপর চড়াও হইয়া তাহাকে হত্যা করিল। ফলে সেও পাকড়াও হইল এবং নিহত হইল। সেই হইতে প্রতিদিন তাহার নিকট হইতে একটি করিয়া সূরা বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। শেষ পর্যায়ে অবশিষ্ট রহিল আল-বাকারা ও আলে ইমরান। এক সপ্তাহ পর আলে ইমরান বিদায় নিল। আল-বাকারা পরবর্তী সপ্তাহও অপেক্ষা করিল। তখন উহাকে বলা হইল ঃ

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ 'আমার বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। আমি কোন বান্দার উপর জুলুম করি না।' অতঃপর সূরা বাকারাও বিশাল মেঘখণ্ডে রূপান্তরিত হইয়া বিদায় নিল।'

আবূ উবায়দ বলেন–'আমার মনে হয়, সূরা দুইটি তাহার সঙ্গে কবরে থাকিয়া তাহাকে বিপদাপদ হইতে রক্ষা করিতেছিল। উহারা তাহারা শেষ প্রহরী হিসাবে কাজ করিতেছিল।'

তিনি আরও বলেন–আমাকে আবূ মাসহার আল্ গাচ্ছানী সাঈদ ইব্ন আব্দুল আযীয আত্তানূখী হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আল জারশী বলিতেন–'যে ব্যক্তি দিবাভাগে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান পাঠ করে সে নিফাক হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি সূরা দুইটি রাত্রে পাঠ করে সে ফজর পর্যন্ত নিফাক হইতে বাঁচিয়া থাকে।' বর্ণনাকারী বলেন–ইয়াযীদ প্রতিদিন ও প্রতিরাতে কুরআনের অন্যান্য অংশ ছাড়াও সূরা দুইটি পাঠ করিতেন।

আমাকে ইয়াযীদ ওরাকা ইব্ন আয়াস হইতে, তিনি সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ বলিয়াছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন–'যে ব্যক্তি আল-বাকারা ও আলে ইমরান রাত্রি বেলায় পাঠ করে, সে অনুগতদের তালিকাভুক্ত হয়।'

হাদীসটি 'মাকতু' (বিচ্ছিন্ন সূত্রের)। অবশ্য সহীহদ্বয়ে এই প্রমাণ মিলে যে, রাসূল (সা) একই রাক'আতে সূরাদ্বয় (রাতের নামাযে) পাঠ করিতেন।

দীর্ঘ সাত সূরার ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ

আবূ উবায়দ বলেন–আমার নিকট হিশাম ইব্ন ইসমাঈল আদ্ দামেশকী, তাঁহার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন শুআয়ব, তাঁহার নিকট সাঈদ ইব্ন বাশীর, তাঁহার নিকট কাতাদাহ, তাঁহার নিকট আবুল মালীহ, তাঁহার নিকট ওয়াইলা ইবনুল আসকা' নবী করীম (সা) হইতে নিম্নোক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলেন–আমাকে তাওরাতের স্থলে সাতটি দীর্ঘ সূরা ও ইঞ্জীলের স্থলে দু'শ আয়াত বিশিষ্ট সূরা ও যবূরের স্থলে বারংবার পঠনীয় সূরাসমূহ প্রদান করা হইয়াছে এবং দীর্ঘ সূরাগুলি দিয়া আমাকে মর্যাদায় ভূষিত করা হইয়াছে।'

হাদীসটি 'গরীব' ও ইহার অন্যতম রাবী সাঈদ ইব্ন বাশীর বিতর্কিত। অবশ্য আবূ উবায়দ উহা আব্দুল্লাহ ইব্ন সালেহ হইতে, তিনি লায়ছ হইতে, তিনি সাঈদ ইব্ন আবূ হিলাল হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

অতঃপর তিনি (আবূ উবায়দ) বলেন-আমাকে ইসমাঈল ইব্ন জা'ফর, তাহাকে আমর ইব্ন আবূ আমর (মতলব ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন হান্তাবের ভৃত্য), তাহাকে হাবীব ইব্ন হিন্দ আল-আসলামী, তাহাকে উরওয়া ও তাহাকে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'যে ব্যক্তি দীর্ঘ সাত সূরা পড়িল সে হৃষ্টচিত্ত হইল।' এই হাদীসটিও 'গরীব'। হাবীব ইব্ন হিন্দ আসলামী হইলেন হাবীব ইব্ন হিন্দ ইব্ন আসমা ইব্ন হিন্দাব ইব্ন হারিছাল আসলামী। তাহার নিকট হইতে আমর ইব্ন আমর ও আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ বুকরাতা হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হাতিম আররাযী তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং কোন ত্রুটির কথা বলেন নাই। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ইমাম আহমদও উক্ত হাদীস সুলায়মান ইব্ন দাঊদ ও হুসায়ন হইতে এবং তাহারা উভয়ে ইসমাঈল ইব্ন জা'ফর হইতে বর্ণনা করেন। ইহা ছাড়াও তিনি আবূ সাঈদ হইতে, তিনি সুলায়মান ইব্ন বিলাল হইতে, তিনি হাবীব ইব্ন হিন্দ হইতে, তিনি উরওয়া হইতে ও তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন-'যে ব্যক্তি কুরআনের প্রথম সাত সূরা ধারণ করিল, সে পরিতুষ্ট হইল।'

ইমাম আহমদ বলেন-আমাকে হুসায়ন, তাহাকে ইব্ন আবূয্ যিনাদ, তাহাকে আল-আরাজ ও তাহাকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রাসূল (সা) হইতে উক্ত বর্ণনা শুনাইয়াছেন।

আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমদ বলেন-কিতাবে এইভাবে আছে। অথচ আমি দেখিতেছি 'তিনি তাহার পিতা হইতে ও তিনি আল আ'রাজ হইতে'। আমার পিতা কি পূর্ব সনদে বেখেয়াল হইলেন, না উহাই ঠিক তাহা বলিতে পারি না। হাদীসটি 'মুরসাল'।

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (সা) একটি ক্ষুদ্র অভিযান পাঠাইতে গিয়া সূরা বাকারা মুখস্থ করার কারণে এক কিশোরকে উক্ত অভিযানের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি বলিলেন-'যাও, তুমিই দলের নেতা।' ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ বলিয়াছেন।

আবূ উবায়দ বলেন-হাশীম আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, আমাকে আবূ বাশার সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে এই খবর পৌঁছাইয়াছেন যে, وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ আয়াতের বারংবার পঠিতব্য সাত সূরা হইল সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়িদা, সূরা আন'আম, সূরা আ'রাফ ও সূরা ইউনুস।

মুজাহিদ বলেন, উহা দীর্ঘ সাত সূরা। মাকহুল, আতিয়া ইব্ন কয়স, আবূ মুহাম্মদ আল ফারেসী, শাদ্দাদ ইব্ন আওস, ইয়াহিয়া ইবনুল হারিস আয্ যিমারী প্রমুখও উক্ত আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। উহার সংখ্যাগত বিন্যাসে সূরা ইউনুস সপ্তম সূরা।

সূরা বাকারা সম্পর্কিত জরুরী আলোনা

আল-বাকারা সর্বসম্মতভাবে মাদানী সূরা। ইহা প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরা সমূহের অন্যতম। অবশ্য-

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ আয়াতটি শেষদিকে অবতীর্ণ আয়াত বলিয়া মনে করা হয়। তেমনি সুদ সম্পর্কিত আয়াতগুলিও শেষ পর্যায়ের আয়াত।

খালিদ ইব্ন মা'দান বলেন-আল-বাকারা কুরআনের ছাউনি। একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, সূরা রাকারায় এক হাজার সংবাদ, এক হাজার নির্দেশ ও এক হাজার নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে। উহার পরিসংখ্যান বিশারদরা বলেন-উহাতে দুইশত সাতাশিটি আয়াত, ছয় হাজার দুইশত একুশটি শব্দ ও পঁচিশ হাজার পাঁচ শত অক্ষর রহিয়াছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে 'আতার বরাত দিয়া ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করেন-সূরা বাকারা মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

আব্দুল্লাহ ইব্ন জুবায়র হইতে যথাক্রমে মুজাহিদ ও খাসীফ বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন-সূরা বাকারা মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

ওয়াকিদী বলেন, আমাকে যিহাক উসমান ইব্ন আবুয্ যিনাদ হইতে, তিনি খারিজা ইব্ন যায়দ ইব্ন ছাবিত হইতে ও তিনি তাহার পিতা যায়দ ইব্ন ছাবিত হইতে বর্ণনা করেন ঃ সূরা বাকারা মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

এইভাবে বহু আলিম, ইমাম ও মুফাস্সির সূরা বাকারাকে মাদানী বলিয়াছেন। এই ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই।

ইব্ন মারদুবিয়্যা বলেন-আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন মুআম্মার, তাহাকে আল হাসান ইব্ন আলী ইবনুল ওয়ালিদ আল ফারেসী ও তাঁহাকে খলফ ইব্ন হিশাম এবং অন্য সনদে আমাকে ঈসা ইব্ন মায়মূন, তাহাকে মূসা ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা ইত্যাকারের কুরআনের সূরাগুলির নামকরণ করিও না। বরং 'গাভী সম্পর্কে যেই সূরায় আলোচিত হইয়াছে' কিংবা 'ইমরান গোত্র সম্পর্কে যেই সূরায় আলোচিত হইয়াছে' এইভাবে কুরআনের সূরাগুলির উল্লেখ কর।'

এই হাদীসটি 'গরীব' শ্রেণীভুক্ত। ইহা রাসূল (সা)-এর বক্তব্য হইতে পারে না। কারণ, ঈসা ইব্ন মায়মূন হইল আবূ সালামাহ আল খাওয়াস। তাহার রিওয়ায়েত যঈফ এবং উহা কোন দলীল হইতে পারে না। পক্ষান্তরে সহীহদ্বয়ে ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ বায়তুল্লাহ ডানে এবং মীনা বামে রাখিয়া 'বাতনে ওয়াদী' হইতে রাসূল (সা) যখন শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার উপর 'সূরা বাকারা' অবতীর্ণ হয়।' সহীহদ্বয়ে হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়্যাহ শু'বা হইতে, তিনি আকীল ইব্ন তালহা হইতে ও তিনি উতবা ইব্ন মারছাদ হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা নবী করীম (সা) সাহাবাদের বিলম্ব দেখিয়া ডাক দিলেন, 'হে সূরা বাকারার সহচরবৃন্দ।'

আমার ধারণা হইতেছে, ইহা হুনায়নের যুদ্ধের ঘটনা। সেই দিন যখন ঘোরতর যুদ্ধে মুসলমানরা দিশাহারা ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, তখন তাহাদের নব উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য হযরত আব্বাসকে তিনি নির্দেশ দিলেন। তখন তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাইলেন–'ইয়া আসহাবুশ্ শাজারা!' অর্থাৎ 'হে বাইআতে রিযওয়ান গ্রহণকারীগণ।' অন্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে 'ইয়া আসহাবা সূরা আল-বাকারা।' এই আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণ দৃঢ়তা ফিরিয়া পাইল এবং চতুর্দিক হইতে ছুটিয়া আসিল।

ইয়ামামার যুদ্ধেও এইরূপ ঘটিয়াছিল। মুসায়লামার বনূ হানীফা গোত্রের মরণপণ হামলায় মুসলমান সৈন্যরা পলায়নোন্মুখ হইলে আনসার ও মুহাজিরগণ পরস্পরকে এইরূপ সম্বোধন করিলেন–'হে সূরা বাকারার সঙ্গীবৃন্দ।' ইহার ফলে তাহারা নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। আল্লাহ্ পাক সকল সাহাবার উপরই সন্তুষ্ট রহিয়াছেন।

সূরা বাকারার তাফসীর শুরু

(১) الٓمّٓ ۚ

১. আলিফ্-লাম-মীম।

তাফসীর ঃ হুরূফে মুকাত্তা'আত ঃ কুরআনের সূরাসমূহের শুরুতে অবস্থিত স্বতন্ত্র অক্ষরগুলি সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

একদল বলেন, উহা আল্লাহ্ পাকের বিশেষত সংকেতসূচক। উহার অর্থ ও তাৎপর্য একমাত্র তিনিই জানেন। তাই উহার অর্থ তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত থাকিবে। কোন মানুষ উহার ব্যাখ্যা প্রদান করিবে না। ইমাম কুরতুবী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে ইহাই বলিয়াছেন। তিনি হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) প্রমুখ এক কথায় সকলেরই এই মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আমের আশ্ শা'বী, সুফিয়ান আছ ছাওরী, আর রবী' ইব্ন খায়ছাম প্রমুখও উক্ত অভিমতের সমর্থক। আবূ হাতিম ইব্ন হাব্বানের মতও ইহাই।

অপর দল উহার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন, উহা সংশ্লিষ্ট সূরার নাম। আল্লামা আবুল কাসিম মাহমুদ ইব্ন উমর আয্যামাখশারী তাঁহার তাফসীরে বলেন, উক্ত মতই অধিকাংশের মত। বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ সিবওয়াইর মতে উহার সমর্থনে দলীল রহিয়াছে। সহীহদ্বয়ে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) শুক্রবার ফজরের নামাযে 'আলিফ-লাম-মীম-আস্ সাজ্দা' ও 'হাল আতা আলাল ইনসান' পাঠ করিতেন।

সুফিয়ান আছছাওরী বলেন, মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবূ নজীহ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন–"আলিফ–লাম-মীম, হা-মীম, আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ ও সোয়াদ ইত্যাদি কুরআনের কুঞ্জী। আল্লাহ্ তা'আলা উহা দ্বারা কুরআনের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন।" মুজাহিদ

হইতে অন্যরাও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। মুজাহিদের অন্য এক বর্ণনা ইব্‌ন আবূ নজীহ হইতে শিবলী ও তাঁহার নিকট হইতে আবূ হুযায়ফা মূসা ইব্‌ন মাসউদ এইরূপ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন—আলিফ-লাম-মীম কুরআনের অন্যতম নাম। কাতাদাহ এবং যায়দ ইব্‌ন আসলামও তাহাই বলেন। এই মতটি আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলামের মতের সহিত সামঞ্জস্যশীল। 'কুরআনের নাম' ও 'সূরার নাম' এই দুই মতে মূলত পার্থক্য নাই। কারণ, কুরআনের সূরাও কুরআন নামে অভিহিত হইতে পারে।

অবশ্য উক্ত মতটি অবাস্তব। কারণ, আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ বলিতে সম্পূর্ণ কুরআন বুঝায় না। উহা বলিলে সূরা আ'রাফই বুঝায়। সুতরাং সূরার নাম আর কুরআনের নাম এক কথা নহে। আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত।

এক দল বলেন, উহা আল্লাহ্ তা'আলার নাম। আশ্ শা'বী বলেন—আল্লাহ্ তা'আলার সাংকেতিক নামে সূরা শুরু করা হইয়াছে। সালেম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুর রহমান (আস্সুদ্দী উল-কবীর) উক্ত একই কথা বলিয়াছেন। আস্ সুদ্দী হইতে শু'বা বর্ণনা করেন, আমার কাছে এই খবর পৌঁছিয়াছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, 'আলিফ্-লাম-মীম' আল্লাহ্ তা'আলার একটি প্রধান নাম। শু'বার হাদীসের বরাত দিয়া ইব্‌ন আবূ হাতিম তাহাই বর্ণনা করেন। ইব্‌ন জারীর বিন্দার হইতে, তিনি ইব্‌ন মাহদী হইতে, তিনি শু'বা হইতে বর্ণনা করেন যে, শু'বা বলেন—'আমি সুদ্দীকে হা-মীম, তোয়া-সীন ও আলিফ-লাম-মীম' সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন উহা আল্লাহ্‌র বিশেষ নাম। ইব্‌ন জারীর বলেন, আমাকে যথাক্রমে মুহাম্মদ ইবনুল মুছনী, আবুন্ নু'মান ও শু'বা ইস্‌মাঈল আস্-সুদ্দী হইতে ও তিনি মুর্‌রাহ্ আল-হামদানী হইতে এই বর্ণনা শুনান যে, মূর্রা আল হামদানী বলেন, আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, হযরত আলী ও ইব্‌ন আব্বাস হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন যে, উহা কসম বিশেষ। আল্লাহ্ তা'আলা উহা দ্বারা কসম করিয়াছেন। মূলত উহা আল্লাহ্‌র নাম। ইকরামা হইতে যথাক্রমে খালিদ আল হিজা, ইব্‌ন আলীয়া, ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইকরামা বলিয়াছেন 'আলিফ-লাম-মীম, একটি শপথ বাক্য।' ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম শরীক ইব্‌ন আবদুল্লাহ হইতে, তিনি আতা ইবনুস সায়েব হইতে, তিনি আবুয্ যোহা হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন—আলিফ-লাম-মীম অর্থ 'আনাল্লাহু আ'লামু' (আমি আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত)। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়রও এইরূপ বলিয়াছেন।

আস্সুদ্দী আবূ মালেক ও আবূ সালেহ হইতে ইব্‌ন আব্বাসের এক বর্ণনা এবং মুররাতুল হামদানী ইব্‌ন মাসউদের এবং অন্য এক সাহাবীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। উহাতে বলা হয় 'আলিফ-লাম-মীম' বর্ণ বিশেষ এবং আল্লাহ্ তা'আলার নাম।

আবূ জা'ফর আর্ রাযী রবী' ইব্‌ন আনাস হইতে, তিনি আবুল আলীয়া হইতে বর্ণনা করেন—আল্লাহ্ পাকের কালামে 'আলিফ-লাম-মীম' অক্ষর তিনটি আরবী ঊনত্রিশ অক্ষরেরই অন্তর্ভুক্ত অক্ষর। তবে উহাতে সব রকম স্বাদই নিহিত। উহার প্রত্যেক অক্ষরই আল্লাহ্‌র নামের কুঞ্জী। উক্ত অক্ষরের প্রত্যেকটিই আল্লাহ্‌র নি'আমাত ও আযাবের পরিচায়ক। উহাতে কোন জাতির আবির্ভাবকাল ও আয়ুষ্কাল সম্পর্কিত তত্ত্বও বিদ্যমান। ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ) সবিস্ময়ে বলিলেন—আমার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, মানুষ তাঁহার নাম দ্বারা কথা বলে ও

তাঁহার রুজী খাইয়া বাঁচে, তারপরও কি করিয়া তাঁহার বিদ্রোহী হয়? ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, 'আলিফ' তাঁহার আল্লাহ্ নামের আদি অক্ষর, 'লাম' আল্লাহ্র লতীফ (মেহেরবান) নামের এবং 'মীম' আল্লাহ্র 'মজীদ' (মহীয়ান) নামের প্রথম অক্ষর। 'আলিফ দ্বারা 'আলাউল্লাহ' (আল্লাহ্র নি'আমত) 'লাম' দ্বারা 'লুতফুল্লাহ' (আল্লাহ্র কৃপা ও 'মীম' দ্বারা 'মাজদুল্লাহ' (আল্লাহ্র মহানুভবতা) প্রকাশ পায়। তাহা ছাড়া 'আলিফ' দ্বারা এক বছর, 'লাম' দ্বারা ত্রিশ বছর ও 'মীম' দ্বারা চল্লিশ বছর বুঝায়।

ইব্ন জারীরও অনুরূপ বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি এই সমস্ত বক্তব্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া সবগুলির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। মূলত এইগুলি পরস্পর বিরোধী নহে। উহা একই সঙ্গে সূরার নাম, ও আল্লাহ্র নাম দুইটিই হইতে পারে। ইহা যেন আল্লাহ্র নামেই সূরার নাম রাখা হইল। উহার প্রত্যেকটি অক্ষরই তাঁহার নাম ও গুণের পরিচায়ক। আল্লাহ্ তা'আলা অনেক সূরাই তাঁহার হাম্দ, তাসবীহ ও তা'জীমমূলক আয়াত দ্বারা শুরু করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন–উক্ত অক্ষরগুলির দ্বারা কোথাও আল্লাহ্র নাম, কোথাও তাঁহার গুণ, কোথাও বা তাঁহার নির্ধারিত কোন কাল ইত্যাদি বুঝানো হইলে কোনই অসুবিধা দেখা দেয় না। যেমন রবী' ইব্ন আনাস আবুল আলীয়া হইতে বর্ণনা করেন–একই শব্দ স্থান বিশেষ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। 'উম্মত' শব্দটি কুরআনে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'উম্মত' শব্দ দ্বারা দীন বুঝানো হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ "(মুশরিকরা বলে) নিশ্চয় আমরা বাপ-দাদাকে এই দীনের উপর পাইয়াছি,"

কুরআনে 'অনুগত' অর্থে উহার ব্যবহারের উদাহরণ এই ঃ

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ "নিশ্চয় ইবরাহীম আল্লাহ্র অনুগত ও একনিষ্ঠ সত্যানুসারী ছিল। সে আদৌ মুশরিক ছিল না।"

কুরআনে 'দল' অর্থে 'উম্মত' ব্যবহারের নমুনা ঃ

وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ "একদল মানুষকে সেখানে তৃষ্ণা নিবারণে রত দেখিতে পাইল।"

আল্লাহ্ পাক এক জায়গায় 'জাতি বা সম্প্রদায়' অর্থও নিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً "আমি প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়ের কাছে রাসূল পাঠাইয়াছি।"

কখনও তিনি উহ্য 'কাল' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন ঃ

وَقَالَ الَّذِىْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ "দুইজনের মধ্যকার মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিছুকাল বিস্মৃতির পর বলিল।"

এখানে 'উম্মত' শব্দের 'কাল' অর্থ গ্রহণই সঠিক মত। সুতরাং উক্ত অক্ষরগুলিও এইরূপ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ইব্ন আবূ হাতিমের সমগ্র বিশ্লেষণের ইহাই সারকথা। কিন্তু আবূল আলীয়ার অভিমতের সহিত ইহার মিল নাই। আবূল আলীয়া মনে করেন, উক্ত অক্ষর একই সঙ্গে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ

করে বটে, কিন্তু 'উম্মত' কিংবা এই ধরনের শব্দ বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত একই সঙ্গে নহে; বরং পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। উহার একই সঙ্গে বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ সম্ভবপর নহে। এই প্রশ্নে উসূলবিদদের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। তাহা সবিস্তারে আলোচনার স্থান ইহা নহে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

তারপর 'উম্মত' শব্দটি উহার প্রতিটি অর্থ প্রকাশ করে পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাহিদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া। কিন্তু উক্ত অক্ষরগুলি একই সঙ্গে বিভিন্ন নামের সম মর্যাদায় অর্থ প্রদান করে। চিন্তা-ভাবনা ছাড়া ব্যাপারটি বোধগম্য হইবার নহে। এই ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে এবং নির্দ্বিধায় অনুসরণের মত কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নাই। বিভিন্ন অর্থবোধক অক্ষরের যে একই সঙ্গে পরিবেশ-পরিস্থিতির ইঙ্গিত ছাড়াই সকল অর্থ সমভাবে প্রকাশের ক্ষমতা রহিয়াছে তাহা সুপ্রমাণিত সত্য নহে। যেমন কবি বলেন :

قلنا قفي لنا فقالت قاف ـ لاتحسبي انا نسينا الايجاف

'আমরা বলিলাম, দাঁড়াও। সে বলিল, দাঁড়াইতেছি। ভাবিও না, গর্ত ভুলিয়াছি।

অন্য কবি বলেন :

ما للظلم عال كيف لايا ـ ينقد عنه جلده اذا يا

ইব্‌ন জারীর বলেন—এখানে কবি যেন বলিতে চাহেন, যখন এই কাজ করিবে, তখন যে উহা করিবে তাহার জন্য 'ইয়া' যথেষ্ট হইবে।

অপর কবি বলেন :

بالخير خيرات وان شرا فا ـ ولا اريد الشر الا ان تا

"ভাল করিলে ভাল পাইবে, মন্দ করিলে মন্দ পাইবে। তুমি মন্দ না চাহিলে আমি মন্দের ইচ্ছা রাখি না।'—কবি এখানে 'ফা' অক্ষর 'ফাশাররুন' এবং 'ওয়া' অক্ষর 'তাশাও' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

বলাবাহুল্য, এই অর্থ পরিবেশ-পরিস্থিতির চাহিদা মোতাবেকই গ্রহণ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম কুরতুবী প্রসঙ্গত এই হাদীস পেশ করেন :

مَنْ اَعَانَ عَلى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ ...... الحديث ـ

সুফিয়ান ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমান হত্যার জন্য সামান্য কথা দিয়াও সাহায্য করে অর্থাৎ اقتل (হত্যা কর) শব্দের শুধু اق বলে, তাহা হইলেও উপরোক্ত হাদীসের নির্দেশিত ব্যবস্থার আওতায় আসিবে।'

খাসীফ বলেন—মুজাহিদ বলিয়াছেন, সূরার শুরুতে অবস্থিত প্রতিটি মুকাত্তাআত হরফই নির্দিষ্ট হরুফে হিজা। কোন কোন আরবী ভাষাবিদ উহাদের হরুফুল মু'জাম বলিয়াছেন। কিছু উল্লেখ করাই অবশিষ্টগুলির জন্য যথেষ্ট বিধায় অবশিষ্টগুলির উল্লেখ বর্জন করা হয়। যেমন কেহ বলিল, যে, আমর 'আলিফ' 'বা' 'তা' 'ছা' লিখে। উহার অর্থ সে আটাশটি হরুফুল মু'জামের সকলই লিখে। তবে প্রথম কয়েকটি উল্লেখ করাই যথেষ্ট বিধায় অবশিষ্টগুলির উল্লেখ বর্জিত হইয়াছে। উক্ত বিশ্লেষণ ইব্‌ন জারীরের।

আমার মতে সূরার শুরুতে উল্লেখিত অক্ষর মোট চৌদ্দটি। অবশিষ্ট অক্ষরের পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়া উহা ব্যবহৃত হইয়াছে। অক্ষরগুলি হইল– আলিফ-লাম-মীম, সোয়াদ-রা, ক্বাফ-হা-ইয়া-আ্ইন, তোয়া-সীন, হা-কাফ-নূন। এইগুলি শব্দাকারে একত্র করিলে বাক্যরূপ হয় نص حكيم قاطع له سر এইগুলি মোট অক্ষরের অর্ধেক। যেগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে, অবশ্যই উহা বর্জিতগুলি হইতে উত্তম।

ইহা অক্ষরগুলির শব্দ ও পদ প্রকরণের বর্ণনা মাত্র। আল্লামা যামাখশারী বলেন–উপরোক্ত চৌদ্দটি অক্ষর উচ্চারণগত দিক হইতে অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্ব বিচারে যে কয়টি শ্রেণীবিভাগ আরবী বর্ণমালার ক্ষেত্রে রহিয়াছে তাহার সবগুলিই জুড়িয়া আছে। যেমন, মাহমুসাত ওয়াল মাজহুরাত–আর রুখওয়াত ওয়াশ শাদীদাহ-আল মুত্বাকাত ওয়াল মাফতুহাত–আল মুস্তালিয়াত ওয়াল মুনখাফায়াত–আল কলকলা। তিনি এইগুলি সবিস্তারে বিশ্লেষণের পর বলেন–সেই মহান সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করি যাঁহার প্রত্যেকটি কাজেই নিহিত রহিয়াছে অজস্র কলাকৌশল। এই সীমিত জিনিসের বিশ্লেষণও অতি ব্যাপক হয়। ইহা হইতেই বিষয়টির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়। কেহ কেহ সকল কথার সারসংক্ষেপ এই বলিয়াছেন–আল্লাহ্ পাক এই অক্ষরগুলি অহেতুক প্রয়োগ করেন নাই। কেবল মূর্খরাই বলিতে পারে যে, এই সব অর্থহীন অক্ষর প্রয়োগ কুরআনে ঘটিয়াছে। ইহা চরম ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা। এই ভ্রান্তির অবসানের জন্যই অক্ষরগুলির অর্থ ও তাৎপর্য বলা হইয়াছে। সেইগুলির মধ্য হইতে নির্দোষগুলি গ্রহণ যোগ্য। অন্যথায় এই ব্যাপারে চুপ থাকাই ভাল মনে করিয়াছি। আমাদের শেষ কথা হইল ঃ

اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا "আমাদের প্রভুর নিকট হইতে যাহা কিছু আসে তাহার সকল কিছুর উপরই ঈমান আনিয়াছি।"

উলামায়ে কিরামও এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন অর্থ ও তাৎপর্যের উপর একমত হইতে পারেন নাই। তাহাদের বিভিন্ন মতের যাহার কাছে যেই মত সঠিক ও সুপ্রমাণিত মনে হয়, সে তাহা গ্রহণ করিতে পারে। অন্যথায় সত্য সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এক্ষেত্রে চুপ থাকাই শ্রেয়।

যাহারা মনে করেন যে, সূরার শুরুতে প্রযুক্ত উক্ত অক্ষরগুলির নিজস্ব কোন অর্থ নাই এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রযুক্তও হয় নাই, তাহাদের মতও বিভিন্ন। তাহাদের একদল বলেন, শুধু সূরাকে বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অভিমত উদ্ধৃত করেন ইমাম ইব্ন জারীর। এই মতটি দুর্বল। কারণ, উক্ত অক্ষরগুলি ছাড়াও সূরার পার্থক্য ও বিভক্তি সুস্পষ্ট। এমন সূরাও আছে যাহার শুরুতে উহা ব্যবহৃত হয় নাই। কোন সূরায়, পড়ায় এবং কোন সূরায় লিখায় বিসমিল্লাহ দিয়া শুরুর ব্যবস্থা রহিয়াছে।

তাহাদের অন্যদল বলেন–উহা দ্বারা শুরুর মাধ্যমে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণই উদ্দেশ্য। মুশরিকরা কুরআন শুনিত না এবং অপরকেও না শোনার জন্য উপদেশ দিত। কারণ, উহা শুনিলেই আকৃষ্ট হইত। এই মতও ইব্ন জারীর উদ্ধৃত করেন। ইহাও দুর্বল অভিমত। কারণ, এই যুক্তি সত্য হইলে সকল সূরায়ই উহা প্রযুক্ত হইত। অন্তত অধিকাংশ সূরায় অবশ্যই হইত। তাহা তো হয় নাই। আরেক কথা, শ্রোতার মনোযোগের জন্য হইলে শুধু সূরার শুরুতে কেন, যে কোন আয়াতের শুরুতে উহার প্রয়োগ ঘটিতে পারিত। তাহা ছাড়া যে সকল সূরায় উহা সংযুক্ত হইয়াছে যথা আল-বাকারা ও আলে ইমরান, তাহা মাদানী সূরা এবং মদীনায় মুশরিকদের মনোযোগ আকর্ষণের ব্যাপারটি ছিল অনুপস্থিত। সুতরাং এই যুক্তি ভ্রান্তিকর।

তাহাদের অপর দল বলেন, কুরআনের উচ্চতম মর্যাদা ও অপরিসীম তাৎপর্যময়তা প্রকাশের জন্যই সূরা শুরুর উক্ত অক্ষরগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন সৃষ্টি যেন উহার মোকাবিলা করিতে না পারে। কারণ, উক্ত মুকাত্তাআত হরূফের তাৎপর্য উদ্ধার কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। এই অভিমত হইল ইমাম রাযীর। তিনি তাঁহার তাফসীরে ইহা মুবার্রাদের বরাতে সবিস্তারে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বিশেষজ্ঞদের এই সম্পর্কিত অভিমতও তিনি একত্রিত করিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী, বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ফার্রা ও ভাষাবিদ কুতরাব হইতেও এই অভিমত উদ্ধৃত করেন। আল্লামা যামাখশারী তাঁহার 'তাফসীরে কাশ্শাফে' উহার পুনরাবৃত্তি করেন এবং উহার জোর সমর্থন জোগান। আশ্ শায়খ আবুল আব্বাস ইমাম ইব্ন তায়মিয়া এই অভিমতই সমর্থন করেন। আমার শায়খ হাফিজ ও মুজতাহিদ আবুল হুজ্জাজ আল মিয্যী আমাকে তাঁহার এই অভিমত অবহিত করেন।

আল্লামা যামাখশারী বলেন—উক্ত চতুর্দশ অক্ষর একসঙ্গে কুরআনের সূরাতে না আনার পিছনে হিকমত আছে। তাহা এই, বিভিন্ন সূরাতে বারবার আসায় আলংকারিক দিক হইতেও সুন্দর হইয়াছে। ফলে উহার স্থায়িত্ব ও কল্যাণকারিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কুরআনে বেশ কিছু কাহিনীকে স্থায়ীভাবে ফলপ্রসূ করার জন্য বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে।

কখনও অক্ষরগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন ص - ن - ق ; কখনও দুই অক্ষর মিলিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে, যেমন حم ; কখনও আবার তিন অক্ষর এক সঙ্গে ব্যবহার করা হইয়াছে, যেমন الم ; কখনও চার অক্ষর মিলাইয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, যেমন المر - المص ; কোথাও আবার পাঁচ অক্ষর এক সঙ্গে ব্যবহার করা হইয়াছে, যেমন كهيعص - حمعسق । কারণ আরবী ভাষায় এক, দুই, তিন, চার ও পাঁচ অক্ষরের শব্দই বাক্যে ব্যবহারের রীতি রহিয়াছে। উহার বেশী অক্ষরের শব্দ ব্যবহারের রীতি নাই।

আমি বলিতেছি, এই কারণে যে সকল সূরা 'হরূফে মুকাত্তাআতে' দ্বারা শুরু হইয়াছে, তাহাতে অবশ্যই কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, উহার মু'জিযা ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইবে। অনুরূপ স্থানগুলি পাঠ করিলেই এই সত্যটি জানা যাইবে। উনত্রিশটি সূরায় মুকাত্তাআত হরূফ ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন ঃ

الٓمٓ - ذَالِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ । 'আলিফ-লাম-মীম। এই কিতাব সংশয় মুক্ত।'

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

الٓمٓ - اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ط نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ -

'আলিফ-লাম-মীম। আল্লাহ্ এক। তিনি ছাড়া কোন প্রভু নাই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তিনি তোমার নিকট যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন উহা সত্য এবং তোমার সম্মুখে অন্য যে সব কিতাব রহিয়াছে তাহার সত্যতা ঘোষণাকারী।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

الٓمٓصٓ - كِتَابٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ

আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ। তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ হইল। উহা হইতে তোমার অন্তরে কোন জটিলতা দেখা দিবে না।'

الٓر ـ كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ج بِاِذْنِ رَبِّهِمْ

'আলিফ-লাম-রা। আমি তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যেন উহা মানুষকে তাহাদের প্রভুর ইচ্ছায় অন্ধকার হইতে আলোর পথে বাহির করিয়া নেয়।'

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

الٓمّٓ ـ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ لاَرَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ 'আলিফ-লাম-মীম। রব্বুল আলামীনের তরফ হইতে কিতাবের অবতরণের ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নাই।'

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

حٰمٓ ج تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 'হা-মীম। পরম দাতা ও অশেষ করুণাময়ের তরফ হইতে কিতাবের অবতরণ ঘটিয়াছে।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

حٰمٓ ج عٓسٓقٓ ـ كَذَالِكَ يُوْحِىْ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اَللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

'হা-মীম-আইন-সীন-কাফ। এভাবে অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ও মহা কুশলী আল্লাহ্ তোমার নিকট ওহী নাযিল করেন এবং তোমার পূর্ববর্তীদের নিকটও।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ ও অনুরূপ অন্যান্য আয়াত প্রমাণ করে যে, উপরে বর্ণিত অভিমত সঠিক। অবশ্য গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকের জন্য উহা সহজেই বোধগম্য হয়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

যাহারা অক্ষরগুলিকে কালনির্দেশক মনে করেন এবং উহা হইতে তাহারা দুর্যোগ, দুর্বিপাক ও ঘটনা প্রবাহের কাল নির্ণয় করেন, তাহাদের দাবী অসার। তাহারা বেঘাটে নামিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসও যঈফ। সহীহ্ মানিয়া লইলে উহা দ্বারাও তাহাদের মতবাদ বাতিলের প্রমাণ মিলে। কিতাবুল মাগাযী প্রণেতা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বর্ণনা করেন–আমাকে আল কালবী আবূ সালেহ হইতে ইব্‌ন আব্বাসের বরাত দিয়া জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রুবাবের এই হাদীস শুনাইয়াছেন ঃ

'একদা আবূ ইয়াসার ইব্‌ন আখতাব একদল ইয়াহুদী সহকারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসেন। তখন তিনি সূরা বাকারার 'আলিফ-লাম-মীম-যালিকাল কিতাবু লারায়বা ফীহ' আয়াত পাঠ করিতেছিলেন। তারপর সে তাহার ভাই হুয়াই ইব্‌ন আখতাবের কাছে আসিল। সেও তখন একদল ইয়াহুদী পরিবৃত্ত ছিল। তখন সে তাহার ভাইকে বলিল, জান, আল্লাহ্র কসম, আমি মুহাম্মদকে আল্লাহ্র অবতীর্ণ আয়াত 'আলিফ-লাম-মীম-যালিকাল কিতাবু লারায়বা ফীহ' পড়িতে শুনিয়াছি। হুয়াই ইব্‌ন আখতাব প্রশ্ন করিল, তুমি উহা নিজের কানে শুনিয়াছ? সে জবাব দিল, হ্যাঁ। (বর্ণনাকারী বলেন) অতঃপর হুয়াই ইব্‌ন আখতাব সমবেত ইয়াহুদী সমভিব্যহারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গেল। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল–সে কি আপনার উপর অবতীর্ণ 'আলিফ-লাম-মীম-যালিকাল কিতাবু লারায়বা ফীহ' আয়াত পাঠ করিতে শুনিয়াছে? জবাবে রাসূল (সা) বলিলেন–হ্যাঁ। তখন সে প্রশ্ন করিল, উহা লইয়া কি আপনার নিকট আল্লাহ্র তরফ হইতে জিবরাঈল আসিয়াছিল? তিনি বলিলেন–হ্যাঁ। তখন সে বলিল, অতীতের যত নবীর কাছে ওহী পাঠানো হইয়াছে, কাহাকেও তাহাদের জাতি

ও রাষ্ট্রের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে জানানো হয় নাই। এই বলিয়া সে দাঁড়াইয়া তাহার দলের মধ্যে গেল এবং বলিল, আলিফে এক, লামে ত্রিশ ও মীমে চল্লিশ মিলিয়া মোট একাত্তর বৎসর। তোমরা কি এমন নবীর দীন কবূল করবে যাহার উম্মত ও হুকুমতের আয়ুষ্কাল মাত্র একাত্তর বৎসর? তারপর সে রাসূল (সা)-এর কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, হে মুহাম্মদ! আপনার কাছে ইহা ছাড়াও কি কোন আয়াত আসিয়াছে? তিনি জবাব দিলেন—হ্যাঁ। সে প্রশ্ন করিল, তাহা কি? তিনি বলিলেন, আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ। সে বলিল—ইহা তো অধিকতর ভারী ও দীর্ঘ। আলিফে এক, লামে ত্রিশ, মীমে চল্লিশ ও সোয়াদে নব্বই মিলিয়া একশত একষট্টি বৎসর হইল। আবার সে প্রশ্ন করিল, হে মুহাম্মদ! আরও কোন আয়াত আসিয়াছে কি? তিনি জবাব দিলেন—হ্যাঁ। সে জিজ্ঞাসা করিল—তাহা কি? তিনি বলিলেন, আলিফ-লাম-মীম-রা। সে বলিল, ইহা তো আরও ভারী ও লম্বা হইল। আলিফে এক, লামে ত্রিশ, রা-এ দুইশত, মোট দুইশত একত্রিশ বৎসর হইল। সে পুনরায় প্রশ্ন করিল, হে মুহাম্মদ! আপনার কাছে আরও আয়াত আসিয়াছি কি? তিনি জবাব দিলেন—হ্যাঁ। সে প্রশ্ন করলি, উহা কি? তিনি বলিলেন, আলিফ-লাম-মীম-র। সে বলিল—ইহা তো অনেক ভারী ও দীর্ঘ হইয়া গেল। আলিফে এক, লামে ত্রিশ, মীমে চল্লিশ ও র-এ দুইশত, মোট দুইশত একাত্তর হইয়া গেল। হে মুহাম্মদ! আমাদের কাছে ব্যাপারটা ঘোলাটে হইয়া গেল। আপনাদের আয়ুষ্কাল কি সর্বোচ্চটি, না সর্বনিম্নটি তাহা বুঝা গেল না। অতঃপর সে দলবলকে বলিল, ইহার নিকট হইতে চল। আবূ ইয়াসার তখন তাহার ভাই হুয়াই ইব্ন আখতাব ও দলবলকে বলিল—হয়ত মুহাম্মদ ও তাহার উম্মতের জন্য উক্ত সকল সংখ্যা মিলাইয়া মোট সাত শত চারি বৎসর আয়ুষ্কাল নির্ধারিত হইয়াছে। তাহারা বলিল—আমাদের কাছে ব্যাপারটি ঘোলাটে হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই প্রেক্ষিতেই একদল মনে করেন—

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ .

আয়াত[illegible] দলের উক্ত মন্তব্য উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে। অবশ্য উপরোক্ত হাদীসের মূল বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবন সায়েব আল কলবী হইতে বর্ণিত একক সূত্রের হাদীস কখনও দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। তাহা ছাড়া এই হাদীসকে নির্ভরযোগ্য ধরা হইলে কুরআনে ব্যবহৃত চৌদ্দটি মুকাত্তাআত হরফই গণনা করিতে হইবে। তাহা হইলে আয়ুষ্কাল অনেক দীর্ঘ হইয়া যাইবে। তারপর পুনরাবৃত্তি গণনায় আনিলে তো আরও বেশী দীর্ঘ হইবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য

(٢) ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

২. 'এই কিতাব সংশয় মুক্ত; মুত্তাকীদের পথ প্রদর্শক।'

তাফসীর ঃ ইব্ন জারীর বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, ذالك الكتاب অর্থ 'এই কিতাব।' তাহা ছাড়া মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আস সুদ্দী,মাকাতিল,

ইব্ন হাইয়ান, যায়দ ইব্ন আসলাম ও ইব্ন জুরায়জও এই মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন, ذالك নিকট ও দূর উভয় ইঙ্গিতবহ বিধায় আরবরা هذا অর্থেও ব্যবহার করে এবং একটির স্থলে অবাধে অপর শব্দটি ব্যবহার করে। তাহাদের বাগবিধিতে এই রীতি সুপ্রচলিত। ইমাম বুখারী (র) মুআম্মার ইবনুল মুছান্না হইতে এবং তিনি আবূ উবায়দা হইতে অনুরূপ অভিমতই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আল্লামা যামাখশারী (র) বলেন 'যালিকা' শব্দ দ্বারা পূর্বোক্ত 'আলিফ-লাম-মীম'-এর দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন لَا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ (এখানে শেষোক্ত 'যালিকা' পূর্বোক্ত আয়াতাংশের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে) কিংবা ذَالِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ (এখানে প্রথমোক্ত 'যালিকুম' পূর্বোক্ত আয়াতাংশের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে) অথবা ذَالِكُمُ اللّٰهُ (এখানেও প্রথমোক্ত 'যালিকুম' পূর্বোক্ত আয়াতাংশের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে)। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম কুরতুবী সহ একদল তাফসীরকার বলেন, ذالك দ্বারা আল-কুরআনের দিকে ইশারা করা হইয়াছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উহা নাযিলের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। কেহ বলিয়াছেন, উহার ইঙ্গিত তাওরাতের দিকে। কেহ বলেন, ইঞ্জীলের দিকে। এভাবে দশটি মত পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশের মতেই উহা দুর্বল। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

'আল-কিতাব' অর্থ 'আল-কুরআন'। ইব্ন জারীর প্রমুখ 'যালিকাল কিতাবু' দ্বারা 'তাওরাত-ইঞ্জীল' বুঝানোর যে অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা অবাস্তব কথা ও অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। কেবলমাত্র অজ্ঞরাই এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারে।

الريب অর্থ الشك (সংশয়, সন্দেহ)। আস্সুদ্দী আবূ মালিক ও আবূ সালেহ হইতে এবং তাহারা ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন মুর্রা আল হামদানী হইতে এবং তাঁহারা ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা হইতে এই বর্ণনাই শুনিয়াছেন যে, لاريب فيه অর্থ لاشك فيه (উহাতে সন্দেহ নাই)। আবূ দারদা, ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আবূ মালিক, ইব্ন উমরের খাদেম নাফে', আতা, আবুল আলীয়া, রবী' ইব্ন আনাস, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, আস্সুদ্দী, কাতাদাহ্ ও ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালেদেরও এই মত। ইব্ন আবূ হাতিম বলেন–ইহার বিরোধী কেহ আছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

কখনও الريب ব্যবহৃত হয় التهمة (অপবাদ) অর্থে। যেমন কবি জামীল বলেন ঃ

بثينة قالت جميل اربتني ـ فقلت كلانا يابثين مريب

(বুছায়ানা অভিযোগ করিল–হে জামীল! তুমি আমাকে অপবাদ দিয়াছ। আমি জবাবে বলিলাম–হে বুছায়ানা! আমরা উভয়েই উভয়কে অপবাদ দিয়াছি।)

উহা কখনও 'প্রয়োজন' অর্থে আসে। যেমন অপর কবি বলেন ঃ

قضينا من تهامة كل ريب ـ وخيبر ثم اجمعنا السيوفا

'তেহামা ও খায়বার প্রান্তরেই আমরা সব প্রয়োজন মিটাইলাম। অতঃপর আমরা তরবারি গুটাইয়া নিলাম।'

তাই আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এই কিতাবের অর্থাৎ কুরআনের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ সংশয় নাই। ইহা নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্র নিকট হইতেই অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন সূরা সাজ্দায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

الٓمٓ - تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ "রব্বুল আলামীনের তরফ হইতে এই কিতাবের অবতরণের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নাই।"

একদল বলেন, উক্ত আয়াতে ذَالِكَ الْكِتَابُ উদ্দেশ্য এবং لَارَيْبَ فِيْهِ উহার নৈয়ার্থক বিধেয় এবং অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এই কিতাবের ভিতরে সন্দেহের কোন ব্যাপার নাই বিধায় তোমরা উহাতে কোনরূপ সংশয় পোষণ করিও না।

একদল কিরাআত বিশেষজ্ঞ لَارَيْبَ বলিয়া থামেন এবং فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ পড়েন। মূলত উত্তম হইল لَارَيْبَ فِيْهِ বলিয়া থামা। কারণ, তখন هدى কুরআনের গুণবাচক বিশেষ্য হয়। ফলে فيه هدى হইতে لَارَيْبَ فِيْهِ অধিকতর অলংকার সম্মত হয়।

আরবী ভাষার বাগবিধি মতে هدى গুণবাচক হিসাবে 'মারফূ' হইতে পারে, আবার অবস্থা প্রকাশক হিসাবে 'মানসূব'ও হইতে পারে। এখানে 'হিদায়েত'-কে 'মুত্তাকীর' জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ ط وَالَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ط اُولٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ -

'বল, উহা (কুরআন) ঈমানদারের জন্য পথ প্রদর্শক ও রোগ বিদূরক এবং বেঈমানদের জন্য বধিরত্ব ও অন্ধত্ব প্রদায়ক। তাই তাহারা (যেন) পরস্পরকে দূরবর্তী স্থান হইতে সম্বোধন করে।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ط وَلَايَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا -

"অনন্তর আমি কুরআন হইতে যাহা নাযিল করি, তাহা ঈমানদারদের জন্য শেফা ও রহমত। অবশ্য জালিমদের উহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া কোনই লাভ হয় না।"

এই সকল আয়াত প্রমাণ করে যে, কেবলমাত্র ঈমানদাররাই কুরআন দ্বারা উপকৃত হইবে, অন্য কেহ নহে। কারণ, কুরআন নিজেই هدى বা পথ প্রদর্শক। তাই উহা অনুসরণকারীই শুধু পথপ্রাপ্ত হইবে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ - وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ -

"হে মানব! তোমাদের সামনে প্রভুর তরফ হইতে উপদেশ গ্রন্থ পৌঁছিয়াছে। উহা তোমাদের (আত্মিক রোগের জন্য) দাওয়াই বিশেষ। ঈমানদারদের জন্য উহা হিদায়েত ও রহমতস্বরূপ।"

আস্‌সুদ্দী আবূ মালিক ও আবূ সালেহ হইতে, তাঁহারা ইব্‌ন আব্বাস ও মুর্‌রাহ আল-হামদানী হইতে এবং তাহারা ইব্‌ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা হইতে বর্ণনা করেন ঃ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থ মুত্তাকীদের আলোস্বরূপ। আবূ রওক যিহাক হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মুত্তাকী হইল সেই সকল ঈমানদার যাহারা শিরক পরিহার করিয়া আল্লাহ্‌র অনুগত থাকিয়া নেক আমল করে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, ইকরামা, যায়দ ইব্‌ন ছাবিতের গোলাম মুহাম্মদ আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ মুত্তাকী সেই সকল লোক যাহারা আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে তাঁহার নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়াইয়া চলে এবং তাঁহার রহমতের আশায় আদেশসমূহ মানিয়া চলে।

সুফিয়ান আছ ছাওরী জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে আ'মাশের এই অভিমত উদ্ধৃত করেন ঃ মুত্তাকী হইতে হইলে আল্লাহ্ যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা বর্জন কর এবং যাহা ফরয করিয়াছেন তাহা আদায় কর।

আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশ বলেন–আ'মাশ আমাকে মুত্তাকীর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যাহা জানি তাহা বলিলাম। তিনি বলিলেন–আল কালবীকে জিজ্ঞাসা কর। আমি আল কালবীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন-যাহারা কবীরা গুনাহ এড়াইয়া চলে তাহারা মুত্তাকী। আমি এই জবাব আ'মাশের কাছে বিবৃত করিলাম। তিনি বলিলেন–অবশ্য এই ধরনেরই। মোটকথা তিনি উহা অস্বীকার করিলেন না।

কাতাদাহ বলেন–মুত্তাকীর গুণ স্বয়ং আল্লাহ্ বলিয়া দিয়াছেন। তাহা হইল اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ এবং উহার পরবর্তী অংশ। ইমাম ইব্‌ন জারীর এই অভিমত গ্রহণ করিয়া বলেন, উক্ত আয়াতসমূহে সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। যথা অদৃশ্য বস্তুতে বিশ্বাস, নামায কায়েম ইত্যাদি।

আতিয়া আস সাফী হইতে আতিয়া ইব্‌ন কয়স ও রবীআ ইব্‌ন ইয়াযীদ, তাহাদের নিকট হইতে আবদুল্লাহ, তাহার নিকট হইতে আবূ আকীল আবদুল্লাহ ইব্‌ন আকীল ও তাহার নিকট হইতে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) বর্ণনা করেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, 'কোন বান্দাই মুত্তাকী গণ্য হইবে না যতক্ষণ পাপ কাজের ভয়ে পাপের কাছাকাছি কাজও পরিহার না করিবে।' ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান গরীব' বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন–আমাকে আমার পিতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইমরান হইতে, তিনি ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মান আর-রাযী হইতে, তিনি মুগীরা ইব্‌ন মুসলিম হইতে ও তিনি মায়মূন আবূ হামযাহ হইতে বর্ণনা করেন যে, মায়মূন বলিয়াছেন, আবূ ওয়ায়েলের সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন মাআযের অন্যতম সহচর আবূ আফীফ সেখানে হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া সাকীফ ইব্‌ন সালামা বলিয়া উঠিলেন, হে আবূ আফীফ! মু'আয ইব্‌ন জাবালের কোন বর্ণনা কি আমাদিগকে শুনাইবেন না? তিনি বলিলেন–হ্যাঁ। আমি তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি, 'কিয়ামতের দিন এক জায়গায় সকলকে আবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, মুত্তাকীরা কোথায়? তখন মুত্তাকীরা রহমানুর রহীমের এক বাহুতে দণ্ডায়মান হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা ও তাহাদের মাঝখানে পর্দা থাকিবে না এবং তিনিও তখন অদৃশ্য থাকিবেন না।' আমি তখন প্রশ্ন করিলাম,

মুত্তাকী কাহারা? তিনি জবাব দিলেন—'যাহারা শিরক ও মূর্তিপূজা হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং নিষ্ঠার সহিত আল্লাহ্র ইবাদত করে তাহারাই জান্নাতে যাইবে।' কখনও الهدى শব্দটি স্থিতিশীল দৃঢ় ঈমানের অন্তরকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে বান্দার অন্তরে ঈমানের স্থিতিশীলতা ও দৃঢ়তা সৃষ্টি একমাত্র আল্লাহ্ পাকের কুদরতে হইতে পারে।

কারণ, তিনি বলেন ঃ

اِنَّكَ لاَتَهْدِى مَنْ اَحْبَبْتَ 'নিশ্চয় তুমি যাহাকে পছন্দ করিবে তাহাকেই হিদায়েতের আলো প্রদান করিতে পারিবে না।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ "তাহাদের হিদায়েত লাভের জিম্মাদারী তোমার উপরে নহে।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ 'আল্লাহ্ যাহার বিভ্রান্তি মঞ্জুর করিবেন তাহার আর কোন পথ প্রদর্শক জুটিবে না।'

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ج وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا "আল্লাহ্ যাহাকে পথ দেখান সে পথপ্রাপ্ত হয়। আর তিনি যাহার বিভ্রান্তি মঞ্জুর করেন, কখনও তাহার জন্য তুমি অভিভাবক ও পথ প্রদর্শক পাইবে না।'

এই সব আয়াত প্রমাণ করে, অন্তরে স্থিতিশীল ঈমান সৃষ্টি করা আল্লাহ্র কাজ এবং উহা করার ক্ষমতা কোন বান্দার নাই।

কখনও উক্ত শব্দ দ্বারা সত্য প্রকাশ ও উহার ব্যাখ্যাদানের অর্থ গ্রহণ করা হয়। এই অর্থে সত্যের দিকে ইঙ্গিত দান ও উহার জন্য দলীল প্রদানই হিদায়েত। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ "আর নিশ্চয় তোমার পথ প্রদর্শন সরল পথের দিকেই।'

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ "তুমি শুধুই সতর্ককারী এবং প্রত্যেক জাতির জন্যই পথ প্রদর্শক থাকে।"

তিনি আরও বলেন ঃ

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى "ছামূদ জাতিকে আমি হিদায়েত দান করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা হিদায়েতের বদলে অন্ধত্ব পছন্দ করিল।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ "আমি তাহাদিগকে ভাল-মন্দ দুইটি পথ প্রদর্শন করিয়াছি। النجدين শব্দের 'ভাল-মন্দ পথদ্বয়' অর্থই উত্তম। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

তাকওয়ার আসল অর্থ হইল খারাপ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা। মূলত উহা ছিল وقوى ও الوقاية। কবি নাবেগা বলেন ঃ

سقطه النصيف ولم ترد اسقاطه - فتناولته واتقتنا باليد

'ইনসাফের পতন হইল, যদিও তুমি তার পতন চাও না। অগত্যা আমাদের হাত খানাপিনা বাঁচাইয়াই চলিল।'

অন্য কবি বলেন–

فالقت قناعا دونه الشمس واتقت - باحسن موصولين كف ومعصم

"সে ওড়না উড়াইয়া সূর্য কিরণ আড়াল করিল এবং এভাবে স্বীয় হাত ও তালু দিয়া সুন্দরভাবে নিজকে বাঁচাইল।'

বর্ণিত আছে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে 'তাকওয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, আপনি কি কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিয়াছেন? তিনি জবাবে বলিলেন–হ্যাঁ। উবাই প্রশ্ন করিলেন–তখন আপনি কি করেন? তিনি উত্তর দিলেন–সতর্কতার সহিত কাঁটার আঁচড় হইতে শরীর ও কাপড় বাঁচাইয়া চলি। উবাই (রা) বলিলেন–উহাই তাকওয়া।

ইবনুল মু'তায তাঁহার কবিতায় এই অর্থেই উহা ব্যবহার করেন। যেমন ঃ

خل الذنوب صغيرها - وكبيرها ذاك التقى

واصنع كماش فوق ارض - الشوك يحذر مايرى

لاتحقون صغيرة - ان الجبال من الحصى

"ছোট বড় সব পাপ ছাড়, উহাই তাকওয়া। কণ্টকাকীর্ণ পথ চলিতে পথিক যে সতর্কতা অবলম্বন করে, তাহাই কর। ছোট পাপ উপেক্ষা করিও না। নিশ্চয় ক্ষুদ্র কাঁকর হইতে পাহাড়ের সৃষ্টি।"

একদা আবূ দারদা এই চরণ আবৃত্তি করেন ঃ

يريد المرء ان يؤتى مناه * ويابى الله الا ما ارادا

يقول المرء فائدتى ومالى * وتقوى الله افضل ما استفادا

"মানুষের কামনা যে, তাহার মনস্কাম পূর্ণ হউক। কিন্তু আল্লাহ্ যাহা চান না, তাহা হয় না। মানুষ বলিতে থাকে, আমার স্বার্থ, আমার সম্পদ। অথচ সকল স্বার্থ ও সম্পদের চাইতে তাকওয়া উত্তম।"

সুনানে ইব্ন মাজাহ্য় আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষের সেরা উপকারী তাকওয়া, উহার পর নেককার স্ত্রী। স্বামী তাহাকে দেখিলে তৃপ্ত হয়। তাহাকে সে হুকুম করিলে তামিল করে। কোন কসম করিলে তাহা পূর্ণ করে। স্বামীর অবর্তমানে তাহার সম্পদ ও নিজের সতীত্বকে হেফাজত করে।

(٣) الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

৩. যারা অদৃশ্য বস্তুর উপর ঈমান আনে এবং তাহারা সালাত কায়েম করে আর আমি তাহাদিগকে যে রুযী দিয়াছি তাহা হইতে বিতরণ করে।

তাফসীর ঃ হযরত আবদুল্লাহ হইতে পর্যায়ক্রমে আবূল আওয়াস, আবূ ইসহাক, আ'লা ইবনুল মুসাইয়াব ইব্ন রাফে' ও আবূ জা'ফর আর-রাযী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন–সত্যকে স্বীকার করাই ঈমান। আলী ইব্ন তালহা প্রমুখ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন–তাহারা ঈমান আনে অর্থ তাহারা সত্যকে স্বীকার করে। ইমাম যুহরী হইতে মুআম্মার বর্ণনা করেন–ঈমান অর্থ আমল করা। রবী' ইব্ন আনাস হইতে আবূ জা'ফর আর-রাযী বলেন–ঈমান আনা অর্থ আল্লাহ্কে ভয় করা।

ইব্ন জারীর বলেন–ঈমান বিল গায়েবের উত্তম ব্যাখ্যা ইহাই যে, কথায়, বিশ্বাসে ও কাজে উহার পূর্ণ প্রতিফলন। আল্লাহ্কে ভয় করার যে ঈমান তাহার অর্থ হইল মুখের স্বীকৃতিকে কাজে পরিণত করা। ঈমান এমন একটি শব্দ যাহার অর্থ আল্লাহ্কে, তাঁহার কিতাবকে ও তাঁহার রাসূলকে বিশ্বাস করা এবং এই বিশ্বাসকে কথায় ও কাজে প্রতিফলিত করা।

আমার মতে, আভিধানিক অর্থে ঈমান হইল নিছক সত্যের স্বীকৃতি বা আস্থা স্থাপন। কুরআনেও আল্লাহ্ পাক এই অর্থে ঈমান শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ "সে আল্লাহ্র উপর এবং ঈমানদারদের উপর আস্থা রাখে।"

তেমনি তিনি হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতার কাছে তাঁহার ভাইদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন ঃ

وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِيْنَ "আপনি আমাদের উপর আস্থা আনিতেছেন না। অথচ আমরা সত্যবাদী ছিলাম।"

তেমনি আল্লাহ্ পাক আমলের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে ঈমানের উল্লেখ করেন ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ "যাহারা সত্যকে স্বীকার করিয়াছে এবং ভাল কাজ করিয়াছে, তাহারা নহে।"

অবশ্য যখন শরীয়তের পরিভাষায় ব্যাপক অর্থে ঈমানের ব্যবহার ঘটে, তখন অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা ও কাজে পরিণত করার অর্থই প্রকাশ পায়।

অধিকাংশ ইমামই এই মতের অনুসারী। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, আবূ উবায়দা প্রমুখ অধিকাংশ ইমামের ইজমা হইল–'কওল ও আমলই ঈমান এবং উহার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে।' এই মর্মে আমরা বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম ভাগে স্বতন্ত্রভাবে এই প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। আল্লাহ্ পাকেরই প্রশংসা করি এবং তাঁহারই কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

ঈমানকে যাহারা خشية (ভয়) অর্থে ব্যবহারের পক্ষপাতী তাহারা দলীল হিসাবে আল্লাহ্ পাকের নিম্ন বাণীসমূহ পেশ করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ "নিশ্চয় যাহারা তাহাদের অদৃশ্য প্রভুকে ভয় করে।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ "যে বা যাহারা অদৃশ্য রহমানকে ভয় করিল এবং বিনীত হৃদয়ে উপস্থিত হইল।"

তাহাদের মতে خشية (ভয়) ঈমান ও ইলমের সারবস্তু। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا "একমাত্র আলিম বান্দারাই আল্লাহ্‌কে ভয় করে।"

তাহাদের একদল বলেন-ঈমানদাররা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে উভয়ভাবে আস্থা স্থাপন করে এবং তাহাদের ঈমান মুনাফিকের ঈমানের মত নহে। মুনাফিক সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ - اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ -

"তাহারা যখন ঈমানদারদের দেখা পায়, তখন বলে, আমরা তো ঈমান আনিয়াছি। পক্ষান্তরে যখন তাহাদের শয়তান সহচরদের সঙ্গে সংগোপনে মিলিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা ঈমানদারের সহিত ঠাট্টাকারী বৈ নহি।"

তিনি আরও বলেন ঃ

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ - وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ -

"যখন তোমার নিকট মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ তো জানেন অবশ্যই তুমি তাঁহার রাসূল। তাই আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।"

এই প্রেক্ষিতে আয়াতের অন্তর্গত بالغيب কথাটি حال বা অবস্থা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ মানুষ হইতে যাহা অদৃশ্য অবস্থায় বিরাজ করিতেছে।

অবশ্য এখানে ব্যবহৃত الغيب -এর তাৎপর্য নিয়া পূর্বসূরীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে। মূলত তাহাদের সবগুলি মতই সঠিক। উহার তাৎপর্যের আওতায় সবগুলিই পড়ে।

আয়াতের يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ -এর তাৎপর্য সম্পর্কে আবূ জা'ফর আর-রাযী রবী' ইব্‌ন আনাসের বরাত দিয়া আবুল আলীয়ার এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন ঃ উহার তাৎপর্য হইল আল্লাহ্‌র উপর, ফেরেশতার উপর, আসমানী গ্রন্থসমূহের উপর, রাসূলদের উপর, আখিরাতের উপর, জান্নাত-জাহান্নামের উপর, আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিতির উপর, মরণোত্তর জীবনের উপর,

পুনরুত্থানের উপর, এক কথায় এই সকল অদৃশ্য জিনিসের উপর ঈমান আনা। কাতাদাহ ইব্ন দুআমাও এই মত পোষণ করেন।

আস্‌সুদ্দী আবূ মালিক ও আবূ সালেহ হইতে এবং তাহারা ইব্ন আব্বাস ও মুর্‌রাহ আল-হামদানীর বরাতে ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা হইতে এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন ঃ الغيب। বলিতে বান্দার দৃষ্টির অগোচরে অবস্থিত বস্তু তথা জান্নাত-জাহান্নাম সহ কুরআনে বর্ণিত অদৃশ্য বিষয়সমূহকে বুঝায়।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ হইতে, তিনি ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন بالغيب অর্থ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যাহা কিছু আসিয়াছে।

সুফিয়ান আছ ছাওরী আসিম হইতে ও তিনি যর হইতে বর্ণনা করেন ঃ الغيب। অর্থ আল-কুরআন। আতা ইব্ন আবূ রুবাহ বলেন—আল্লাহ্‌র উপর যে ঈমান আনে সে অবশ্যই অদৃশ্য বস্তুর উপর ঈমান আনিল। ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ বলেন ঃ গায়েবের উপর ঈমান আনা অর্থ ইসলামের নির্দেশিত অদৃশ্য বস্তুর উপর ঈমান আনা। যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ গায়েবের উপর ঈমান অর্থ তকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন। এই সকল অভিমত পরস্পর সন্নিহিত এবং তাৎপর্যগতভাবে একই। কারণ, উপরোক্ত সকল অদৃশ্য বস্তুর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব।

সাঈদ ইব্ন মনসূর বলেন—আমার কাছে আবূ মুআবিয়া আ'মাশ হইতে, তিনি আম্মার ইব্ন উমায়র হইতে এবং তিনি আব্দুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"আমরা আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদের কাছে বসা ছিলাম। সেখানে রাসূল (সা)-এর সাহাবাদের উপর কি কি অবস্থা গিয়াছে তাহার বর্ণনা চলিতেছিল। তখন আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন—মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যাপারটি আমাদের কাছে তো প্রকাশ্য ব্যাপার ছিল। মহান অদ্বিতীয় মা'বূদের শপথ! তাঁহাকে না দেখিয়া যাহারা ঈমান আনিবে, তাহাদের ঈমানের চাইতে উত্তম ঈমান কাহারো নহে। অতঃপর তিনি—

الٓمٓ - ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ - هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ - اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ। পর্যন্ত তিলাওয়াত করিলেন।

ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন মারদুবিয়্যা অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাকিম তাঁহার 'মুস্তাদরাক' সংকলনে আ'মাশের সূত্রে উহা বর্ণনা করেন। অতঃপর বলেন, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ। অবশ্য তাঁহারা উহা উদ্ধৃত করেন নাই।

ইমাম আহমদ উক্ত হাদীসের সম তাৎপর্যের একটি হাদীস বর্ণনা করেন। বর্ণনাটি ইব্ন মুহায়রীযের। তাঁহার নিকট হইতে পর্যায়ক্রমে খালিদ ইব্ন সুরাইক, আসাদ ইব্ন আব্দুর রহমান, আওয়াঈ ও আবুল মুগীরার মাধ্যমে তাঁহার কাছে পৌঁছে। ইব্ন মুহায়রীয বলেন ঃ আমি আবূ জুমআকে বলিলাম, রাসূল (সা) হইতে আপনার শুনা একটি হাদীস আমার কাছে

বর্ণনা করুন। তিনি বলিলেন, হাঁ! আমি তোমাকে একটি উত্তম হাদীস শুনাইব। আমরা একদিন রাসূল (সা)-এর সহিত নাশতা করিতেছিলাম। আমাদের সংগে আবূ উবায়দা ইবনুল জার্রাহ। ছিলেন। তিনি আরয করিলেন-'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনার সাক্ষাতে ঈমান আনিয়াছি এবং আপনার সঙ্গে থাকিয়া জিহাদ করিয়াছি। সুতরাং আমাদের চাইতে উত্তম কেহ হইবে কি? তিনি বলিলেন-হ্যাঁ। তোমাদের পরে যাহারা আমাকে না দেখিয়া ঈমান আনিবে তাহারা উত্তম।'

আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়্যা ভিন্ন সূত্রে তাহার তাফসীর গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। সালেহ ইব্‌ন জুবায়র হইতে মুআবিয়া ইব্‌ন সালেহ ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালেহ এবং আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হইতে ইসমাঈল ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর তাঁহার কাছে উহা বর্ণনা করেন। বর্ণনাটি এই ঃ

সালেহ ইব্‌ন জুবায়র বলেন-একদা বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায আদায় উপলক্ষে রাসূল (সা)-এর সহচর আবূ জুমআ আনসারী (রা) আমাদের মাঝে আসিলেন। আমাদের সঙ্গে তখন রিজা ইব্‌ন হায়াত (রা) ছিলেন। তিনি যখন আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, আমরাও তাঁহাকে আগাইয়া দেওয়ার জন্য সঙ্গে গেলাম। তাঁহাকে আগাইয়া দিয়া যখন ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইলাম, তখন তিনি বলিলেন-নিশ্চয় তোমাদিগকে আমি এক উদ্দীপনামূলক বিনিময় হিসাবে রাসূল (সা)-এর একটি হাদীস শুনাইতে চাই। আমরা বলিলাম-আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন। আপনি উহা শুনান। তিনি বলিলেন-আমরা রাসূল (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-ও ছিলেন। উহা ছিল অন্তরঙ্গ পরিবেশে উত্তম সাহচর্য। তাই আমরা বলিলাম-হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এমন কোন মানব গোষ্ঠী আছে কি যাহারা আমাদের চাইতে বেশী সওয়াবের অধিকারী? আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আপনার অনুসরণ করিতেছি। তিনি বলিলেন-ইহাতে তোমাদের অসুবিধা কি? তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র রাসূল বিদ্যমান এবং আসমান হইতে অহরহ ওহী নাযিল হইতেছে। কিন্তু তোমাদের পরবর্তী যেই মানব গোষ্ঠী উহা গ্রন্থাকারে পাইয়া ঈমান আনিবে এবং উহার বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিবে, তাহারা তোমাদের দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে।"

এই হাদীসটি তিনি ভিন্ন সূত্রেও বর্ণনা করেন। যুমরাতা ইব্‌ন রবীআ মারযূফ ইব্‌ন নাফে' হইতে, তিনি সালেহ ইব্‌ন জুবায়র হইতে ও তিনি আবূ জুমআ হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

এই হাদীস দ্বারা বিভিন্ন অবস্থায় আমলের সওয়াবে বিভিন্নতা প্রমাণিত হয়। এই প্রশ্নে হাদীসবেত্তাদের ভিতর মতান্তর রহিয়াছে। আমি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রথম দিকে উহা সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। পরবর্তীদের প্রশংসা এই বিশেষ ক্ষেত্রেই নির্ধারিত। সাধারণভাবে পূর্বসূরীরা উত্তম।

অনুরূপ আরেকটি হাদীস হাসান ইব্‌ন উরফা আল-আবদী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন-আমার কাছে ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়াশ আল হেমসী আলমুগীরা ইব্‌ন কয়স আত্ তামিমী হইতে, তিনি আমর ইব্‌ন শুআয়ব হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিকট কাহাদের ঈমান বিস্ময়কর? সাহাবারা জবাব দিলেন-ফেরেশতাদের। তিনি বলিলেন-তাহাদের ঈমান না আনার কোন প্রশ্নই নাই। কারণ, তাহারা আল্লাহ্‌র সমীপে রহিয়াছেন। তাহারা

বলিলেন—নবীগণের। তিনি বলিলেন—তাঁহাদের ঈমান না আনার প্রশ্নই আসে না। কারণ তাহাদের নিকট ওহী নাযিল হয়। তাহারা বলিলেন—তাহা হইলে আমাদের। তিনি বলিলেন—তোমাদের ঈমান না আনার কি কারণ থাকিতে পারে? আমি স্বয়ং তোমাদের সামনে দীপ্যমান। অতঃপর তিনি বলিলেন—জানিয়া রাখ, আমার কাছে তাহাদের ঈমান বিস্ময়কর যাহারা তোমাদের পরে আসিবে এবং গ্রন্থাকারে আল্লাহ্‌র কিতাব পাইয়া ঈমান আনিবে ও উহার বিধি-বিধান আমল করিবে।

আবূ হাতিম আর রাযী বলেন—আল মুগীরা ইব্‌ন কয়স আল বসরীর হাদীস 'মুনকার' বলিয়া অভিহিত হয়।

আমার বক্তব্য এই যে, আবূ ইয়ালা তাঁহার মুসনাদে, ইব্‌ন মারদুবিয়্যাহ তাঁহার তাফসীরে এবং হাকিম তাঁহার 'মুস্তাদরাক' সংকলনে মুহাম্মদ ইব্‌ন হামিদ হইতে, তিনি যায়দ ইব্‌ন আসলাম হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি উমর (রা) হইতে ও তিনি রাসূল (সা) হইতে অনুরূপ কিংবা উহার কাছাকাছি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম উহার সূত্রকে সহীহ বলিয়াছেন। তবে সহীহদ্বয়ে উহা উদ্ধৃত হয় নাই। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতেও 'মারফূ হাদীস' হিসাবে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন—আমার কাছে আমার পিতা, তাহার কাছে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল মুসনাদী তাহার কাছে ইসহাক ইব্‌ন ইদরীস সরাসরি বর্ণনা করেন এবং ইবরাহীম ইবন জা'ফর ইব্‌ন মাহমুদ ইব্‌ন সালামা আনসারী ও জা'ফর ইব্‌ন মাহমুদ তাহার দাদী বুদায়লা হইতে খরব পৌঁছান যে, বুদায়লা বলিয়াছেন : 'আমি জোহর কি আসর নামায হারিছা মসজিদে আদায় করিতেছিলাম। ঈলিয়া মসজিদ (বায়তুল মুকাদ্দাস) আমাদের কিবলা ছিল। সবেমাত্র দুই রাকাআত পড়িয়াছি, এমন সময় খবর আসিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিবলা পরিবর্তন করিয়া বায়তুল হারামের দিকে মুখ করিয়াছেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া গেলাম। এবং মেয়েদের জায়গায় পুরুষ ও পুরুষের জায়গায় মেয়েরা ঠাঁই নিল। তারপর আমরা বাকী দুই রাকআত নামায বায়তুল হারামকে কিবলা করিয়া আদায় করিলাম।

ইবরাহীম বলেন—বনূ হারিছার এক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছেন যে, রাসূল (সা) এই খবর শুনিয়া বলিলেন—'তাহারাই অদৃশ্য বস্তুর উপর ঈমান আনিল।'

হাদীসটি একই সূত্রে বর্ণিত বিধায় 'গরীব' শ্রেণীভুক্ত।

হযরত আব্বাস (রা) বলেন, وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ আরকান-আহকাম সহকারে সালাত কায়েম করে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন, ইকামাতে সালাত বলিতে রুকূ', সিজদা, তিলাওয়াত, খুশূ ও কিবলামুখী হওয়া পূর্ণ করাকে বুঝায়।

কাতাদাহ বলেন—ইকামাতে সালাত হইল উহার ওয়াক্ত, ওযূ, রুকূ' ও সিজদার হেফাজত করা।

মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান বলেন—সালাত কায়েমের অর্থ হইল উহার ওয়াক্তের হিফাজত, উহার জন্য পবিত্রতা অর্জনে পূর্ণতা, উহার রুকূ-সিজদা সুসম্পন্ন করা, উহাতে কুরআন তিলাওয়াত করা, তাশাহহুদ পড়া ও নবী (সা)- এর উপর দরূদ পাঠ করা। এই হইল ইকামাতে সালাত।

আলী ইব্ন তালহা প্রমুখ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন– وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের সম্পদের যাকাত প্রদান করে।

আস্ সুদ্দী আবূ মালিক ও আবূ সালেহ হইতে তাঁহারা ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুর্রাহ হামদানী হইতে এবং তাঁহারা ইব্ন মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম হইতে وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ -এর অর্থ বর্ণনা করেন, 'পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করা।' অবশ্য এই অভিমত যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বেকার।

যিহাক হইতে জুয়ায়র বর্ণনা করেন–এখানে 'খরচ করা' অর্থ সামর্থ্যানুযায়ী আল্লাহ্র ওয়াস্তে দান করা এবং কৃচ্ছ্রতা অনুসরণ করা। অতঃপর সূরা তওবার সপ্ত আয়াতে নির্ধারিত সাদকা ফরয হয় এবং উহার ফলে এই অনির্ধারিত দানের বিধান বাতিল হয়।

কাতাদাহ বলেন– وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ অর্থ আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তাহা সবই খরচ কর। কারণ, এই সম্পদ তোমার কাছে আমানত ও ঋণস্বরূপ আসিয়াছে। হে আদম সন্তান! অচিরেই এই সম্পদ ও তোমার ভিতর বিচ্ছেদ ঘটিবে।

ইব্ন জারীর এই অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন যে, এই আয়াতাংশ দ্বারা যাকাত ও পারিবারিক খরচপত্র উভয়ই বুঝানো হইয়াছে। তিনি আরও বলেন–এই আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা হইল পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় প্রয়োজনের সকল খাতে উহা খরচ করা। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, গরীব-দুঃখী ও রাষ্ট্রীয় চাহিদার সকল ক্ষেত্রে খরচের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা উহা সাধারণভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে সব ধরনের খরচের মধ্যে যাকাত অধিক প্রশংসিত ও উত্তম।

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে বহুবার সালাতের সহিত ইনফাকের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই জন্য যে, সালাত হইল আল্লাহ্র প্রতি বান্দার কর্তব্য ও আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত ইবাদত। আল্লাহ্র একত্ব ঘোষণা, তাঁহার প্রশংসা করা, তাঁহার উপর নির্ভর করা ইত্যাদি উক্ত নির্ধারিত ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ইনফাক হইল বান্দার প্রতি বান্দার কর্তব্য। আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে বান্দার কল্যাণ সাধনই ইহার লক্ষ্য। এই ক্ষেত্রে উত্তম হইল দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন, গোত্রীয় লোকজন ও চাকর-চাকরাণীগণ। তারপর পাড়া-প্রতিবেশী ও অন্যান্য দেশবাসী। এই ধরনের সকল ওয়াজিব খাত ও যাকাতের ফরয খাত ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত।

এই কারণে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলেন–ইসলামের ভিত্তি হইল পাঁচটি যেমন–(১) কলেমা (২) নামায (৩) রোযা (৪) হজ্জ ও (৫) যাকাত। এই সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

আরবদের পরিভাষায় সালাত অর্থ দোআ। কবি আল আশা বলেন ঃ

لها حارس لايبرح الدهر بيتها ـ وان ذبجب صلى عليها وزمزما

وقـابـلـهـا الـريـح فـى دنـهـا ـ وصلى عـلـى دنـهـا وارتـسـم

কবি আরও বলেন ঃ

تقول بنتى وقد قربت مرتحلا ـ يـارب، ذنـب ابـى الاوصـاب والوجـعـا

عليك مثل الذى صليت فاغتمضى ـ نوما فان لجنب المرء مضطجعا

ইব্ন জারীর দলীল হিসাবে কবি আশার উক্ত পংক্তিগুলি আবৃত্তি করেন।

উপরোক্ত পংক্তিগুলিতে কবি দোআ অর্থে সালাত ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাই সালাতের প্রকাশ্য অর্থ। শরীঅতের পরিভাষায় বিশেষ ওয়াক্তে বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ বিশেষ শর্ত সহকারে রুকূ-সিজদাসহ বিশেষ ধরনের ক্রিয়াকলাপকে সালাত বলে।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন—সালাতকে এই জন্য সালাত বলা হয় যে, মুসল্লী সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সওয়াব কামনা করে এবং নিজ প্রভুর কাছে স্বীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করে।

কেহ কেহ বলেন– صلوة শব্দটি الصلوين (মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বস্থ শিরাদ্বয়) শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেহেতু নামাযের ভিতর রুকূ সিজদার সময়ে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বের শিরা দুইটি নড়াচড়া করে, তাই উহাকে 'সালাত' বলা হয়। ইহা হইতেই ঘোড়ার স্তনের পেছনের অংশকে المصلى বলা হয়। ইহা বিতর্কিত মত।

কেহ কেহ উহাকে الصلى হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন। উহার অর্থ বস্তুর পারস্পরিক সংমিশ্রণ বা সংযোজন। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَا يَصْلَاهَا اِلَّا الْاَشْقَى "জঘন্য পাপী ব্যতীত কেহই জাহান্নামে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত থাকিবে না।"

কেহ কেহ বলেন, صلوة শব্দটি تصلية শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মানুষ জাহান্নামের 'তাসলিয়া' (কাষ্ঠ) হইবে। কিন্তু সালাত উহার বিনিময় হইয়া মানুষকে মুক্তি দিবে। কারণ, আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ "নিশ্চয় সালাত অনাচার ও পাপ কার্য হইতে বিরত রাখে এবং অবশ্যই আল্লাহ্‌র যিক্‌র শ্রেষ্ঠতম কাজ।"

মূলত দোআ অর্থের 'সালাত' হইতেই উহার উৎপত্তি। ইহাই স্বাভাবিক ও সুপ্রসিদ্ধ অভিমত। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই যথাস্থানে করা হইবে।

(٤) وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

৪. আর যাহারা তোমার ও তোমার পূর্ববর্তীদের নিকট যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস রাখে এবং পরকালের উপর সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করে।

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন– وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যাহা তোমার নিকট আসিয়াছে ও যাহা তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদের নিকট আসিয়াছে তাহার উপর ঈমান রাখে এবং রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না ও তাহাদের নিকট তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে যাহা আসিয়াছে তাহা

লইয়া ঝগড়া করে না। আর وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ অর্থ পুনরুত্থান, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব, মীযান এই সকল কিছুর উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করে।

আখিরাতের নাম আখিরাত এই জন্য রাখা হইয়াছে যে, উহা পার্থিব জীবনের পরে আসিবে।

এই আয়াতে কাহাদের গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা লইয়া ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে কি পূর্ববর্তী আয়াতে যাহাদের গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাদেরই গুণ বর্ণিত হইয়াছে, না অন্য কোন দলের? অন্যদল হইলে তাহারা কাহারা?

ইব্ন জারীর এই ব্যাপারে তিনটি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এক, প্রথমে যাহাদের গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে, দ্বিতীয়বারেও তাহাদেরই গুণ বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা হইল সকল স্তরের মু'মিন, হোক আরব মু'মিন কিংবা আহলে কিতাব সহ অন্যান্য মু'মিন। এই মতের প্রবক্তা হইলেন মুজাহিদ, আবুল আলীয়াহ, রবী' ইব্ন আনাস ও কাতাদাহ। দুই. তাহারা একই দল এবং তাহারা আহলে কিতাবের মু'মিনগণ। প্রথমোক্ত দল ও দ্বিতীয় দলের গুণ বর্ণনার মাঝখানে واو ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন ধরনের গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন ঃ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى - الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى فَجَعَلَهٗ غُثَاءً اَحْوٰى -

"তোমার সর্বোন্নত প্রভুর তাসবীহ পাঠ কর, যিনি সৃষ্টি করিয়া সামঞ্জস্য দান করিয়াছেন; যিনি প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়া তদনুসারে পথের দিশা দিয়াছেন এবং যিনি তৃণগুল্মের উদ্গম ঘটাইয়াছেন। অতঃপর উহা কৃষ্ণবর্ণ বিশুষ্ক করিয়াছেন।"

জনৈক কবির কাব্যেও এইরূপ প্রয়োগ রহিয়াছে। যেমন ঃ

الى الملك القوم وابن الهمام - وليث للكتيبة فى المزدحم

এখানেও একই মওসুফের বিভিন্ন সিফাতের একটির সহিত অন্যটির সংযোগের জন্য واو ব্যবহার করা হইয়াছে।

তিন. প্রথমোক্ত আয়াতে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী আরব মু'মিনগণ এবং পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী হইল আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারা মু'মিনগণ। আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রা), ইব্ন মাসউদ (রা) ও অন্যান্য বহু সাহাবার এই অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)-ও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ইহার সমর্থনে আল্লাহ্ পাকের এই বাণী পেশ করেন ঃ

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خَاشِعِيْنَ -

"আহলে কিতাবের ভিতর এমন লোকও রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ্র উপর ঈমান রাখে এবং তোমাদের ও তাহাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপর ঈমান রাখে। তাহারা আল্লাহ্কে ভয় করে।"

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِه هُمْ بِه يُؤْمِنُوْنَ ـ وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِه اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِه مُسْلِمِيْنَ ـ اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَؤُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

"পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব প্রদান করা হইয়াছে, তাহারা তাহার উপর ঈমান রাখে। যখন তাহাদের কাছে (কুরআন) পড়া হয়, তখন বলে, আমরা উহার উপরও ঈমান আনিলাম। উহা আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রেরিত সত্য, আমরা ইহার পূর্বেও মুসলমানই ছিলাম। এই লোকদের দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে। কারণ, তাহারা সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছে এবং খারাপটি বদলাইয়া ভালটি গ্রহণ করিয়াছে। আর তাহাদিগকে আমি যাহা কিছু রুযী দান করিয়াছি তাহা (আমার নির্দেশিত পথে) খরচ করে।"

ইহার সমর্থনে সহীহদ্বয়ের শা'বী বর্ণিত হাদীস রহিয়াছে। ইমাম শা'বী আবূ বুরদা হইতে ও তিনি আবূ মূসা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন–তিন দলকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে। এক, আহলে কিতাবের যে ব্যক্তি তাহার নবীর উপর ও আমার উপর ঈমান আনিয়াছে। দুই, যে গোলাম আল্লাহ্র হক ও তাহার মালিকের হক দুইটিই যথাযথভাবে আদায় করে। তিন, যে ব্যক্তি নিজ দাসীকে আদব-কায়দা ভালভাবে শিখাইয়া আযাদ করত বিবাহ দিয়া দিল।

ইমাম ইব্ন জারীর (র) তাঁহার মতের সমর্থনে যে দলীল পেশ করিয়াছেন, উহার সহিত কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনারও সম্পর্ক রহিয়াছে। এই সূরার শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরের পরিচয় দিয়াছেন। সেখানে যেভাবে তিনি কাফিরের দুই শ্রেণী দেখাইয়াছেন, কাফির ও মুনাফিক, তেমনি মু'মিনের দুই শ্রেণী দেখাইলেন–আরব মু'মিন ও কিতাবী মু'মিন।

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, মুজাহিদের অভিমতই সুস্পষ্ট। তিনি ছাওরী হইতে, তিনি জনৈক ব্যক্তি হইতে ও তিনি মুজাহিদ হইতে অভিমতটি উদ্ধৃত করেন। তাহা ছাড়া একাধিক ব্যক্তি ইব্ন আবূ নাজীহ্র বরাত দিয়া মুজাহিদের অভিমতটি বর্ণনা করেন। মুজাহিদ বলেন ঃ

"সূরা বাকারার প্রথম চারি আয়াতে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে, পরবর্তী দুই আয়াতে কাফিরের চরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে, পরবর্তী তের আয়াতে মুনাফিকের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। প্রথম চারি আয়াতে সাধারণত প্রত্যেক মু'মিনের গুণাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে, সে আরবী কি কিতাবী কি আজমী কি মানব কি জ্বিন যাহাই হউক না কেন। উক্ত গুণাবলী আলাদা আলাদা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা ঠিক হইবে না। প্রত্যেকের জন্যই উক্ত গুণাবলী অপরিহার্য। কারণ, এক দলের জন্য ঈমান বিল গায়েব, সালাত ও যাকাত শর্ত করা হইবে এবং রাসূল (সা) এবং পূর্ববর্তী রাসূলদের নিকট অবতীর্ণ কিতাবের উপর ও আখিরাতের উপর ঈমান আনা শর্ত করা হইবে না, ইহা ঠিক হইতে পারে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য উক্ত গুণাবলীর সবগুলিই শর্ত করিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَالْكِتَابِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِه وَالْكِتَابِ الَّذِىْ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ـ

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল, রাসূলের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ, এমনকি পূর্ববর্তী রাসূলগণের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীর উপর ঈমান আন।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلاَ تُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَّاحِدٌ -

"আহলে কিতাবদের সহিত উত্তম পন্থায় তর্ক করিও। তবে তাহাদের জালিমদের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদিগকে এই কথা বল যে, আমাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার সব কিছুর উপর আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং আমাদের প্রভু ও তোমাদের প্রভু তো একজনই।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ .

"হে আহলে কিতাব! আমি এখন যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহার উপর ঈমান আন। উহা তো তোমাদের কিতাবেরও সত্যতা ঘোষণা করিতেছে।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرَاةَ وَالاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ -

"বল, হে আহলে কিতাব, তোমাদের কোন ভিত্তিই নাই যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাত, ইঞ্জীল ও এখন তোমাদের সম্মুখে যাহা অবতীর্ণ হইল তাহা কায়েম না করিবে।"

এই সবগুলি একত্র করিয়াও আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ - كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ -

"রাসূল তাহার প্রভুর তরফ হইতে তাহার উপর অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান আনিয়াছে এবং মু'মিনগণও। তাহারা সকলেই আল্লাহ্র উপর, তাহার ফেরেশতার উপর, তাঁহার কিতাবের উপর ও তাঁহার রাসূলদের উপর ঈমান আনিয়াছে। (তাহারা বলে) আমরা তাঁহার রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করি না।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ . "আর যাহারা আল্লাহ্র উপর ও তাঁহার রাসূলদের উপর ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে নাই।"

এই সমস্ত আয়াতে একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, সকল মু'মিনই আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁহার রাসূলগণ ও তাঁহার কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনয়ন করিয়া থাকেন। তবে আহলে

Contents

কিতাবদ্বয়ের মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। কারণ, তাঁহারা পূর্ববর্তী কিতাবের সকল কিছুর উপর যেরূপ ঈমান আনিয়াছিল, তেমনি এই কিতাবের সকল কিছুর উপর ঈমান আনিয়াছে। তাই তাহারা দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী। পক্ষান্তরে অন্য মু'মিনগণ তাহাদের কিতাবের তো সকল কিছুর উপর ঈমান আনিয়াছে কিন্তু পূর্ববর্তী কিতাবের উপর মোটামুটিভাবে ঈমান রাখে। যেমন–সহীহ বুখারীতে আছে,–'আহলে কিতাব যদি তোমাদের কাছে কিছু বর্ণনা করে তাহা হইলে মিথ্যা বলিও না, সত্যও বলিও না। এই কথা বল, আমাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, আমরা উহার উপর ঈমান রাখি।'

অবশ্য কখনও আবার অন্য মু'মিনেরও মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্ণতম ও ব্যাপকতম ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের ফলে আহলে কিতাবের দীক্ষিত মু'মিনের চাইতে ঈমানের পাল্লা ভারী হইয়া থাকে। তাহার ফলে কিতাবী মু'মিনের প্রাপ্ত দ্বিগুণ সওয়াবও অন্য মু'মিনরা অতিক্রম করিয়া থাকে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

(৫) أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

৫. তাহারা তাহাদের প্রভুর নির্দেশিত হিদায়েতের উপর রহিয়াছে এবং তাহারাই সাফল্যমণ্ডিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাকের বাণী أُولَٰئِكَ অর্থ পূর্বোক্ত গুণাবলী যথা অদৃশ্য বস্তুতে ঈমান, সালাত কায়েম, আল্লাহ্ প্রদত্ত রুযী বিতরণ, রাসূল (সা) ও পূর্ববর্তী রাসূলদের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহ ও আখিরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস। মূলত হারাম কার্যাবলী হইতে বাঁচিয়া নেক কাজ করার শক্তি ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য উক্ত গুণাবলী অপরিহার্য। আল্লাহ্র বাণী عَلَىٰ هُدًى অর্থ আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রেরিত আলো, বর্ণনা ও প্রজ্ঞা। আয়াতাংশ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ অর্থ ইহ ও পারলৌকিক সাফল্য অর্জন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ হইতে, তিনি ইকরামা হইতে, তিনি সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ও তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রেরিত নূর ও উহার ধারক কুরআনের উপর স্থিতি লাভ। আর أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ অর্থাৎ তাহারা বাঞ্ছিত বস্তু পাইল এবং অবাঞ্ছিত বস্তু হইতে রেহাই পাইল।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ -এর তাৎপর্য হইল এই যে, তাহারা তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে প্রাপ্ত আলো ও দলীলের সাহায্যে দৃঢ়তা সহকারে সঠিক পথে চলার শক্তি অর্জন করিয়াছে। আর أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ অর্থাৎ তাহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং আল্লাহ্, রাসূল ও কিতাবের উপর ঈমান আনিয়া নেক আমল করার মাধ্যমে তাহারা যাহা কিছু আশা করিয়াছে, তাহা পাইয়াছে। অর্থাৎ জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে ও আল্লাহ্ তাঁহার দুশমনদের জন্য যে জাহান্নাম তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে রেহাই লাভ করিয়াছে।

ইব্ন জারীর অন্য এক দলের এই অভিমত উদ্ধৃত করেন যে, أُولَٰئِكَ ইঙ্গিতবহ পদটির পুনরাবৃত্তিমূলক أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ও أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ দ্বারা আহলে কিতাবদের ইয়াহুদী মু'মিন ও নাসারা মু'মিনদের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই অভিমত যে ঠিক নহে, তাহা পূর্বেই বলা হয়াছে। বরং উহা আরবী, আজমী, কিতাবী অকিতাবী সর্বস্তরের ঈমানদারের প্রতি ইঙ্গিতবহ। উক্ত অবস্থায় وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ পূর্বের সহিত সম্পর্কহীন হইয়া 'মুবতাদা' হিসাবে মারফূ' বিশিষ্ট হয় এবং উহার 'খবর' হিসাবে أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ আসে। কিন্তু গ্রহণযোগ্য মত আস সুদ্দী উদ্ধৃত করেন। তিনি আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রাহ আল হামদানী হইতে এবং তাঁহারা ইব্ন মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবা হইতে বর্ণনা করেন ঃ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ হইল আরব মু'মিনগণ এবং وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ হইল কিতাবী মু'মিনগণ এবং উভয় গ্রুপকে একত্র করিয়া বলা হইল أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মু'মিনদের জন্য চারি আয়াতে বর্ণিত সকল গুণাবলী সর্বপ্রকারের মু'মিনের থাকিতে হইবে। কাতাদাহ, রবী' ইব্ন আনাস ও আবুল আলীয়া মুজাহিদ হইতে এই অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন-আমাকে আমার পিতা, তাঁহাকে ইয়াহিয়া ইব্ন উসমান ইব্ন সালেহ আল মিসরী, তাঁহাকে তাঁহার পিতা ও তাঁহাকে ইব্ন লাহিআ বলেন-আমাকে উবায়দুল্লাহ ইবনুল মুগীরা ও আবুল হায়ছাম সুলায়মান ইব্ন আব্দুল্লাহ হইতে এবং তাহারা আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের বরাতে নবী করীম (সা) হইতে এই হাদীস শুনান ঃ

একদিন নবী করীম (সা)-কে বলা হইল-হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কুরআন হইতে তিলাওয়াত করি এবং আশান্বিত হই। আবার এমন কিছু আয়াত তিলাওয়াত করি যাহাতে নিরাশ হইয়া পড়ি। তখন তিনি বলিলেন-আমি কি তোমাদের কাহারা জান্নাতী ও কাহারা জাহান্নামী তাহা বলিব? সবাই বলিল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল বলুন। তখন তিনি 'আলিফ-লাম-মীম যালিকাল কিতাবু' হইতে 'মুফলিহুন' পর্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন-ইহারা জান্নাতী। আমি আশা করি, তোমরা তাহাদের দলে। অতঃপর তিনি 'ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ' হইতে 'আযাবুন আজীম' পর্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন-ইহারা হইল জাহান্নামী। তাহারা বলিল-হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তাঁহাদের মত নহি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন-হ্যাঁ।

(٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

৬. নিশ্চয় যাহারা কাফির তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর একই কথা, তাহারা ঈমান আনিবে না।

তাফসীর ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا। অর্থাৎ সত্য যাহাদের নিকট আচ্ছাদিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ক্ষেত্রে এই বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে সতর্ক করা আর না করা সমান কথা, তাহারা কিছুতেই ঈমান আনিবে না।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ -

"নিশ্চয় যাহাদের ব্যাপারে তোমার প্রভুর কথা বাস্তব হইয়া ধরা দিয়াছে, তাহাদের কাছে যাবতীয় নিদর্শন হাজির হইলেও তাহারা ঈমান আনিবে না, যতক্ষণ না তাহারা স্বচক্ষে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে।"

আল্লাহ্ পাক আহলে কিতাবের ইসলাম দুশমনদের সম্পর্কে বলেন ঃ

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ "আহলে কিতাবদের নিকট যদি তুমি সকল প্রমাণাদিও সমুপস্থিত কর, তবু তাহারা কিছুতেই তোমার কিবলা অনুসরণ করিবে না।"

অর্থাৎ যাহার পাপী হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার নেক্কার হওয়ার ভাগ্য হইবে না। তেমনি তিনি যাহার বিভ্রান্তি মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার জন্য কেহ পথ প্রদর্শক হইতে পারে না। তাই তাহাদের জন্য তুমি দুঃখ করিও না। তুমি তাহাদের কাছে তোমার রিসালাতের জিম্মাদারী আদায় কর। যাহারা তোমার ডাকে সাড়া দিবে, তাহারাই সৌভাগ্য লাভ করিবে আর যাহারা সাড়া দিল না, তাহাদের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইও না। "তোমার কাজ আমার বাণী পৌঁছানো আর আমার কাজ হিসাব-নিকাশ লওয়া। তুমি সতর্ককারী মাত্র আর আল্লাহ্ তা'আলাই সকল ব্যাপারের অভিভাবক।"

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বরাত দিয়া 'আলী ইব্ন আবূ তালহা আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন–রাসূল (সা) চাহিতেন যেন সকল লোক ঈমান আনে এবং তাঁহার নির্দেশিত হিদায়েতের পথ অনুসরণ করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন, আল্লাহ্ পাকের ইলমে হিদায়েত লাভের সৌভাগ্য যাহাদের রহিয়াছে তাহারাই ঈমান আনিবে। আর যাহাদের সেই সৌভাগ্য নাই তাহারা ঈমান আনিবে না।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন–আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ইকরামা কিংবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ তোমার নিকট যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যাহারা অস্বীকার করে এবং বলে, আমরা আমাদের উপর তোমার পূর্বেই যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপর ঈমান রাখি। سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ তাহারা তোমাকে অস্বীকার করিয়া নিজেদের কিতাবই অস্বীকার করিয়াছে। কারণ, তাহাদের কিতাবে তোমার উল্লেখ রহিয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে যে পাক্কা ওয়াদা গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহারা তাহার বিরোধী হইয়াছে। তাহারা যখন নিজেদের উপর ও তোমার উপর অবতীর্ণ উভয় কিতাব অস্বীকার করিতেছে, তখন তাহারা তোমার সতর্কতার প্রতি কি করিয়া কর্ণপাত করিবে? তাহারা তো জানিয়া শুনিয়াই কুফরী করিতেছে।

আবূ জা'ফর আর রাযী রবী' ইব্ন আনাস হইতে ও তিনি আবুল আলীয়া হইতে বর্ণনা করেন-আলোচ্য আয়াতদ্বয় আহযাবের যুদ্ধের সেই সব নেতা সম্পর্কে আসিয়াছে যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَى اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا اَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ـ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ـ

"তুমি কি তাহাদের দেখ নাই যাহারা আল্লাহ্র প্রদত্ত নি'আমতকে কুফরীর বিনিময়ে বদল করিয়াছে,....ইত্যাদি।

আলোচ্য আয়াতের অর্থ 'আলী ইব্ন তালহা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই সঠিক ও সুস্পষ্ট। আমি উহা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। অবশিষ্ট আয়াতের তাৎপর্যও উহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

এই প্রসঙ্গে ইব্ন আবূ হাতিম একটি বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি বলেন-আমাকে আমার পিতা, তাহাকে ইয়াহিয়া ইব্ন উসমান ইব্ন সালেহ আল মিসরী, তাহাকে তাহার পিতা ও তাহাকে ইব্ন লাহি'আ বলেন-আমাকে উবায়দুল্লাহ ইবনুল মুগীরা ও আবুল হায়ছাম সুলায়মান ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে এবং তাহারা আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে রসূলে পাক (সা) সম্পর্কিত নিম্ন ঘটনাটি বর্ণনা করেন ঃ

একদা নবী করীম (সা)-এর কাছে আরয করা হইল-হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করিয়া অত্যন্ত আশান্বিত হই; আবার কিছু আয়াত তিলাওয়াত করিয়া নিরাশ হইয়া পড়ি। তখন তিনি বলিলেন-আমি কি তোমাদিগকে জান্নাতী ও জাহান্নামীর পরিচয় দিব? সকলেই বলিল-হ্যাঁ, দিন। তখন তিনি ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ হইতে 'লায়ু'মিনূন' পর্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন-ইহারা জাহান্নামী। তাহারা বলিল-'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তাহাদের মত নহি।' তিনি বলিলেন-হ্যাঁ।

পাক কালামের لَايُؤْمِنُوْنَ পূর্বে বিষয়ের তাকীদজনিত বাক্য আর سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ তাহারা সর্বাবস্থায়ই কাফির থাকিবে। তাই আল্লাহ্ لَايُؤْمِنُوْنَ বলিয়া উহাতে তাকীদ সংযোগ করিলেন। لَايُؤْمِنُوْنَ আবার খবরও হইতে পারে। তখন اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا হইবে মুবতাদা। সেক্ষেত্রে سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ বাক্যটি জুমলা-ই-মু'তারাযা (বাক্যের মধ্যে স্বতন্ত্র বাক্য) হইবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

(٧) خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ط وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ز وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

৭. আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরে ও কর্ণকুহরে মোহর লাগাইয়াছেন ও তাহাদের চক্ষে ছানি পড়িয়াছে এবং তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ আস্ সুদ্দী বলেন ঃ خَتَمَ اللّٰهُ অর্থ আল্লাহ্ সীল মারিয়াছেন। কাতাদাহ বলেন-তাহাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করায় তাহারা শয়তানের অনুগত হইয়াছে। তাই

আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরে ও কর্ণকুহরে মোহর লাগাইয়াছেন এবং চক্ষে তাহাদের পর্দা পড়িয়াছে। ফলে তাহারা সঠিক পথ দেখিতে পায় না, সঠিক কথা শুনিতে পায় না ও সঠিক ব্যাপার বুঝিতে পায় না।

ইব্ন জুরায়জ বলেন–মুজাহিদ বলিয়াছেন, خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ অর্থাৎ পাপের কালিমা অন্তরের চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে। ফলে উহা মোহরের কাজ দিতেছে। ইব্ন জুরায়জ বলেন–অন্তর ও কর্ণকুহরের জন্য মোহর শব্দ ব্যবহারের প্রচলন রহিয়াছে। ইব্ন জুরায়জ আরও বলেন–আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাছীর বর্ণনা করেন যে, তিনি মুজাহিদকে বলিতে শুনিয়াছেন, الران। শব্দটি الطبع। হইতে সহজতর ও الطبع। শব্দ اقفال। হইতে সহজতর এবং اقفال। কুরআনে ব্যবহৃত তিন শব্দের ভিতরে কঠিনতর অর্থ প্রকাশ করে।

আ'মাশ বলেন–মুজাহিদ আমাদিগকে তাঁহার হাত দেখাইয়া বলিলেন–অন্তরটিও এইরূপ অর্থাৎ হাতের তালুর মতই। যখন বান্দা কোন পাপ করে তখন একটি অঙ্গুলি বন্ধ হইয়া যায়। এইভাবে পর পর পাপ করিতে থাকিলে একে একে পাঁচটি আঙ্গুল বন্ধ হইয়া মুষ্টিবদ্ধ হয়। ফলে সেই হাতের তালুতে আর কিছুই ঢুকিতে পারে না। ইহাকেই বলে অন্তরে মোহর মারা।

ইব্ন জারীর আবূ কুরাইব হইতে, তিনি ওকী' হইতে, তিনি আ'মাশ হইতে ও তিনি মুজাহিদ হইতে অনুরূপ বর্ণনা শুনান।

ইব্ন জারীর বলেন যে, কেহ কেহ বলেন, خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ বাক্যটির দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অহংকার ভরে ঘাড় ফিরানোর খবর দিলেন। সত্যের ডাক শুনিয়াও তাহারা দম্ভভরে ঘাড় ফিরাইয়া নিল। যেমন বলা হয়, অমুক ইহা যেন শুনিতেই পায় না। ইহা তখনই বলা হয়, যখন কেহ কথা শুনিতেই রাযী হয় না এবং দম্ভভরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রাখে।

ইব্ন জারীর বলেন–উক্ত অভিমত ঠিক নহে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তো খবর দিলেন তাহাদের অন্তরে ও কর্ণ কুহরে তাঁহারই মোহর মারার।

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই, ইমাম ইব্ন জারীরের এই অভিমত খণ্ডনের জন্য আল্লামা যামাখশারী সুদীর্ঘ বহাস করিয়াছেন। তিনি আয়াতটির পাঁচটি ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। উহার প্রত্যেকটিই অত্যন্ত দুর্বল। তাহার মু'তাযেলী ধ্যান-ধারণা তাঁহাকে এই ধরনের ভুল ব্যাখ্যা দানে উৎসাহিত করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং বান্দার অন্তরে মোহর লাগাইলেন ইহা তাঁহার কাছে খারাপ লাগিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা খারাপ কিছু করিতে পারেন না বলিয়া তিনি সেই সব ব্যাখ্যার আশ্রয় লইয়াছেন। অথচ তিনি যদি আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণীগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে অনুরূপ ভুল করিতেন না। যেমন ঃ

فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ "তাহারা যখন অন্তর বাঁকা করিল তখন আল্লাহ্ তা'আলাও তাহাদের অন্তর বাঁকা করিয়া দিলেন।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُ بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -

"আমি তাহাদের অন্তর ও চক্ষু এমনভাবে ফিরাইয়া দেই যেন তাহারা প্রথম হইতেই ঈমান আনে নাই এবং তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতার ক্ষেত্রে এমন সুযোগ দেই, যেন তাহারা উধভ্রান্তের মত চক্কর খাইতে থাকে।"

এই ধরনের আয়াতগুলি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই অন্তরসমূহে মোহর মারিয়াছেন। ফলে তাহারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হয় না। ইহাই সঠিক বিচার। যেহেতু সে জানিয়া শুনিয়া সত্য ত্যাগ করিয়া বাতিলের অনুসরণ করিতেছে, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ব্যাপারে ইনসাফ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার কোন খারাপ কাজ নহে, ইনসাফ তো সুন্দর কাজ। তিনি যদি এইটুকু জানিতে ও বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিতেন না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম কুরতুবী বলেন–উম্মতের ইজমা এই তাৎপর্যের উপরে যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং কোন কোন বান্দার সজ্ঞাত কুফরীর অপরাধে তাহার অন্তরে সীল মারিয়া দেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ "বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কুফরীর কারণে তাহাদের অন্তরে ছাপ মারিয়া দেন।"

তিনি প্রসঙ্গত অন্তর পরিবর্তনের تقليب القلوب হাদীস উদ্ধৃত করেন। ইহাতে বলা হইয়াছে–"হে অন্তর পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর স্থির করিয়া দাও।"

তিনি হযরত হুযায়ফা (রা)-এর হাদীসও উদ্ধৃত করেন। হযরত হুযায়ফা (রা) নবী করীম (সা)-এর এই বর্ণনা শুনান ঃ

"নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'ফিতনা অন্তরের উপর বেষ্টনীর কাজ করে। উহা প্রভাব গ্রহণকারী অন্তরকে ধাপে ধাপে বিন্দু বিন্দু কালো দাগের আস্তরে আবদ্ধ করিয়া দেয়। যে অন্তর ফিতনার প্রভাব অস্বীকার করে, উহা সমগ্র অন্তরকে শুভ্র সমুজ্জ্বল করিয়া দেয়। ফলে কোন দিনই ফিতনা তাহারা ক্ষতি করিতে পারে না। পক্ষান্তরে ফিতনা গ্রহণকারীরা সেই মসীলিপ্ত অন্তরটি উপুড় করা কলসের মত ভাল-মন্দ চিনার ও গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া যায়।" (অসমাপ্ত)

ইব্ন জারীর বলেন- এই প্রশ্নে আমার কাছে এই হাদীসের বর্ণনাটি যথাযথ মনে হয়। আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন বিশার, তাহাকে সাফওয়ান ইব্ন ঈসা, তাহাকে আজলান কা'কা' হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা) বলিয়াছেন- কোন মু'মিন যখন একটি পাপ করে, তখন তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি তওবা করে ও অনুতপ্ত হয়, তখন উহা মুছিয়া যায়। পক্ষান্তরে যদি পাপ বাড়িতেই থাকে, তখন কালো দাগ বৃদ্ধি পাইয়া অন্তর গ্রাস করিয়া ফেলে। উহাই অন্তরের মরিচা। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

كَلَّا بَلْ سكت رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ "কখনই তাহা নহে; বরং তাহাদের পাপাচারের কারণে অন্তরে তাহাদের মরিচা পড়িয়া গিয়াছে।"

এই হাদীসটি উক্ত বর্ণনাসহ ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ কুতায়বা ও লায়ছ ইব্ন সা'দ হইতে উদ্ধৃত করেন। উহা ইব্ন মাজাহ উদ্ধৃত করেন হিশাম ইব্ন আম্মার হইতে এবং তিনি হাতিম, ইসমাঈল ও ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম হইতে এবং তাহারা উহা বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইব্ন আজলান হইতে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ' বলিয়াছেন।

ইব্ন জারীর বলেন- রাসূল (সা) বলিয়াছেন, পাপ যখন অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তখন অন্তরকে তালাবদ্ধ করিয়া দেয়। তখনই উহাতে আল্লাহ্র তরফ হইতে মোহর লাগিয়া যায়। ফলে সেই অন্তরে ঈমান প্রবেশের কোন রাস্তা থাকে না। আর কুফরও উহা হইতে বাহির হইতে পারে না। ইহাই মোহর লাগানো ও ছাপ মারা যাহা আল্লাহ্ তা'আলা خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ আয়াতে প্রকাশ করিয়াছেন।

মোহর লাগানো ও সীল মারা পাত্র হইতে উহা না ভাঙ্গিয়া যে কোন কিছু ঢুকানো ও বাহির করা যায় না, তাহা তো সকলেই দেখিয়া থাকে। তেমনি মোহার লাগানো ও সীল মারা অন্তরেও উহার সীল ও মোহর অপসারণ না করা পর্যন্ত ঈমান ঢুকিতে কিংবা কুফর বাহির হইতে পারে না।

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ -এর পর পূর্ণ বিরতি হইবে এবং ইহা একটি পূর্ণ বাক্য। কারণ মোহর বা সীল শুধু অন্তর ও কর্ণকুহরের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। الْغِشَاوَةُ অর্থ পর্দা বা আবরণ যাহা চক্ষুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রা আল-হামদানী হইতে ও তাঁহারা ইব্ন মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবা হইতে বর্ণনা করেন ঃ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ অর্থ তাহারা বুঝিতে পায় না, শুনিতেও পায় না এবং তাহাদের চোখে পর্দা সৃষ্টি করায় তাহারা দেখিতেও পায় না।

ইব্ন জারীর বলেন- আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ তাঁহাকে তাঁহার পিতা, তাঁহাকে তাঁহার চাচা হুসায়ন ইব্ন হাসান তাঁহার পিতা ও তাঁহার পিতা তাহার দাদা হইতে এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই বর্ণনা শুনান ঃ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, "আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরে ও কর্ণকুহরে মোহর লাগাইয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষে পর্দা ফেলিয়াছেন।" তিনি আরও বলেন- আমাকে কাসিম, তাঁহাকে হুসায়ন ইব্ন দাউদ, তাঁহাকে হাদ্দাদ ইব্ন মুহাম্মদ আল আ'ওয়ার ও তাঁহাকে ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ মোহর হইল অন্তর ও কর্ণে এবং পর্দা হইল চক্ষে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

فَاِنْ يَّشَاءِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ "আল্লাহ্ যদি চাহিতেন তাহা হইলে তোমার অন্তরে তিনি মোহর লাগাইয়া দিতেন।"

তাই তিনি বলেন, মোহর হইল অন্তর ও কর্ণে এবং চক্ষে হইল পর্দা।

ইব্ন জারীর বলেন- কেহ কেহ جعل ক্রিয়াকে উহ্য ধরিয়া غشاوة শব্দটিকে নসবযুক্ত করেন। যেমন কুরআনের حُوْرٌ عِيْنٌ আয়াতাংশেও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। কবি বলেন ঃ

علفتها تبنا وماء باردا - حتى شتت هما لة عيناها

এই চরণে سقيتها উহ্য থাকিয়া ماء باردا -কে নসবযুক্ত করিয়াছে।

অন্যত্র কবি বলেন ঃ

ورأيت زوجك فى الوغى - متقلدا سيفا ورمحا

এই চরণে معتقلا শব্দ উহ্য থাকিয়া رمحا শব্দকে নসবযুক্ত করিয়াছে।

সূরার প্রথম চারি আয়াতে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর পরবর্তী আলোচ্য দুই আয়াতে কাফিরের পরিচয় তুলিয়া ধরিয়া এখন আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। মুনাফিকদের মুখে থাকে ঈমান ও অন্তরে বিরাজ করে কুফর। যেহেতু এই ব্যাপারটি ধরিতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হয়, তাই ইহার আলোচনা দীর্ঘতর হইয়াছে। মুনাফিকের বিভিন্ন চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য ও উপমা দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। তদুপরি সূরা 'বারাআত' ও সূরা আল-মুনাফিকূন' মুনাফিকদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহা ছাড়া সূরা 'নূর' সহ অন্যান্য সূরায় তাহাদের পরিচয় তুলিয়া ধরা হইয়াছে যেন মু'মিনরা মুনাফিকদের সহিত মিশিয়া না যায় এবং তাহাদের প্রতারণা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত

(٨) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

(٩) يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৮. একদল মানুষ বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান আনিয়াছি'; অথচ তাহারা মু'মিন নহে।

৯. তাহারা আল্লাহ্ এবং মু'মিনদেরকে ধোঁকা দেয়। মূলত তাহারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়; অথচ তাহারা তাহা বুঝে না।

তাফসীর ঃ নিফাক হইল খারাপ ভাব লুকাইয়া রাখিয়া ভাল ভাব প্রকাশ করা। উহা কয়েক প্রকারের। এক, বিশ্বাসগত। ইহার অধিকারী জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হইবে। দুই, কর্মগত। উহা শ্রেষ্ঠতম পাপ। ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে উহা সবিস্তারে আলোচিত হইবে।

ইব্‌ন জুরায়জ বলেন- মুনাফিকের কথা ও কাজ পরস্পর বিরোধী। তাহার বাহিরের সহিত ভিতরের মিল নাই। সে মুখে একরূপ, মনে অন্যরূপ। তাহার প্রকাশ্য দিক ও অপ্রকাশ্য দিক বিপরীতমুখী। নিফাকের পরিচয়বাহী সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, মক্কায় নিফাক ছিল না। সেখানকার অবস্থা ইহার বিপরীত ছিল। যাহারা ভিতরে মু'মিন ছিল তাহাদেরও অনেকে প্রকাশ্যে কুফরী ভাব দেখাইতে বাধ্য হইত। অতঃপর যখন রাসূল (সা) মদীনায় হিজরত করিলেন এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রের আনসারগণ তাহাদের সঙ্গী হইলেন, তখন তাহারা জাহেলী যুগের আরব মুশরিকদের মতই মূর্তিপূজা করিত। মুসলমানদের সঙ্গে আহলে কিতাবের ইয়াহুদীগণও পূর্ব পুরুষের রীতির উপর বহাল থাকিয়া চুক্তিবদ্ধ মিত্ররূপে যুক্ত হইল। তাহাদের তিন গোত্র ছিল। খাযরাজদের মিত্রগোত্র বনূ কায়নুকা এবং আওসদের মিত্র গোত্র বনূ নজীর ও বনূ কুরায়জা।

রাসূল (সা) যখন মদীনায় আগমন করিলেন, আওস ও খাযরাজ গোত্রের অনেকেই তখন ইসলাম গ্রহণ করিল। কিন্তু ইয়াহুদী গোত্রসমূহের আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম সহ কম সংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করিল। তখনও নিফাক জন্ম নেয় নাই। কারণ, তখনও মুসলমানদের এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখা দেয় নাই যাহা কাহারও ভয়ের কারণ হইতে পারে। তখনও রাসূল (সা) ও তাঁহার সহচরবৃন্দ ইয়াহুদী গোত্র ও মদীনার পার্শ্ববর্তী আরব গোত্রগুলির সহায়তার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। যখন বদরের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ঘটিয়া গেল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বাণীর বাস্তবায়ন ঘটাইলেন ও ইসলাম-মুসলিমের মর্যাদা সমুন্নত করিলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সলূল তখন মুখ খুলিল। সে মদীনার সর্বাধিক প্রভাবশালী নেতা ছিল। খাযরাজ গোত্রের হইয়াও সে জাহেলী যুগে আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের সরদার ছিল। তাহারা এমনকি তাহাকে মদীনার অধিপতি করার খেয়ালে ছিল। ইত্যবসের কল্যাণবাহী ইসলাম আসিল। তাহাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া উহাতে নিমগ্ন হইল। ইহাতে তাহার অন্তর্দাহ দেখা দিল। আশাহত হইয়া সে মুসলিম বিদ্বেষী হইল। বদর যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পর সে ঘাবড়াইল এবং প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করিল। তাহার গোত্রীয় সঙ্গীদেরও সে সেভাবে ইসলাম গ্রহণের পরামর্শ দিল। তাহাদের সঙ্গে আহলে কিতাবেরও কিছু লোক মুসলমান হইল। এখান হইতেই মদীনা ও উহার আশে পাশের এলাকায় মুনাফিক মুসলমান সৃষ্টি হইল।

পক্ষান্তরে মুহাজিরদের ভিতরে কোন মুনাফিক ছিল না। তাঁহারা তো ইসলামের জন্য হিজরত করিয়া আসিয়াছেন। ইহা নহে যে, হিজরত করিতে তাহাদিগকে কেহ বাধ্য করিয়াছে। তাঁহারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। তাহাদের ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-পুত্র, সহায়-সম্পদ সকলই বিসর্জন দিয়া আসিয়াছেন শুধু পরকালে আল্লাহ্র কাছে উহার বিনিময় লাভের আশায়।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন- আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ইকরামা কিংবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ আউস ও খাযরাজ গোত্রের মুনাফিক ও তাহাদের অনুসারীবৃন্দ।

এভাবেই অন্যান্য ব্যাখ্যাদাতাগণ হইতেছেন আবুল 'আলীয়া, আল-হাসান, কাতাদাহ ও আস্ সুদ্দী। মু'মিনগণ যেন ধোঁকায় না পড়ে তাই আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিলেন। মুনাফিকদের আবির্ভাবে মুসলমানরা ভীষণ ফাসাদে পড়িয়া গেলেন। যাহাদের ঈমানদার বলিয়া বিশ্বাস হয়, মূলত তাহারাই কাফির, ইহা হইতে বিপদের কথা আর কি হইতে পারে? তাই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে জানাইয়া দিলেন যে, তাহারা সামনে যতই ঈমানের কথা বলুক, পিছনে তাহারা অন্যরূপ। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ

অর্থাৎ তাহারা এই কথাটি শুধু তোমার সামনে আসিলে বলে, মূলত তাহারা ইহা বলে না। তাই তাহারা দুইবার তাকীদমূলক শব্দ اِنَّ ও لَ ব্যবহার করিয়াছে। তেমনি তাহারা যদিও জোর দিয়া বলে যে, আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর তাহারা ঈমান আনিয়াছে, মূলত ইহা সত্য নহে। উক্ত আয়াতে যেইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রদত্ত সাক্ষ্যকে মিথ্যা বলিয়া

আখ্যায়িত করিয়াছেন, তেমনি আলোচ্য আয়াতেও তিনি জানাইয়া দিলেন- মূলত তাহারা মু'মিন নহে।

আয়াতাংশ يُخَدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ তাহারা ভিতরে কুফরী বিশ্বাস নিয়া বাহিরে যে ঈমানের কথা বলিতেছে, তাহা এই বোকা ধারণা নিয়া যে, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ধোঁকায় ফেলিয়া তাঁহার নিকট হইতে ফায়দা লুটিতে পারিবে। কারণ, মু'মিনদের কিছু লোককে এইভাবে ধোঁকা দিয়া ফায়দা লুটিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রেক্ষিতে বলেন ঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَىْءٍ اَلاَ اِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ -

"আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন তাহাদের সকলকে একত্রিত করিবেন, তখন তাহারা আল্লাহ্র কাছেও হলফ করিয়া বলিবে, যেভাবে তোমাদের কাছে হলফ করিয়া বলিতেছে। তাহারা মনে করিবে, তাহাদের একটা ভিত্তি হইল। জানিয়া রাখ, তাহারাই নিশ্চিতভাবে কাফির।"

তাই তাহাদের ধারণার ভ্রান্তি আল্লাহ্ তা'আলা এইভাবে তুলিয়া ধরিলেন-

وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা এই চাতুর্য দ্বারা নিজেদেরই ধোঁকা দিতেছে, অন্য কাহাকেও নহে। অথচ তাহারা তাহা বুঝিতেছে না।

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ "নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহ্কে ধোঁকা দেয়, মূলত তাহারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়।"

একদল কিরাআতবিদ وَمَايَخْدَعُوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ পড়েন। অর্থগত দিক হইতে উহাতে কোন তারতম্য হয় না।

ইব্‌ন জারীর বলেন- যদি কেহ প্রশ্ন তোলে যে, মুনাফিকরা আল্লাহ্ এবং মু'মিনদের কি করিয়া ধোঁকা দেয়? তাহারা তো বাঁচার জন্য মনের বিপরীত কথা মুখে বলিয়া থাকে। জবাবে বলা যায়, আরবে বাঁচার জন্যও যদি কেহ এরূপ বলে তাহাকেও প্রতারক বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং ভাষারীতি অনুসারে ঠিকই হইয়াছে। দুনিয়ায় নিরাপত্তার জন্য তাহারা আল্লাহ্ ও মু'মিনদের প্রতারণামূলক কথা শুনাইতেছে। মূলত উহা তাহাদের পরকালের নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত করিতেছে বিধায় তাহারা নিজেদেরকেই প্রতারিত করিতেছে। তাহারা বাহ্যিক ঈমানের কথা বলিয়া আশা করিতেছে, পরকালেও তাহারা পার পাইবে এবং উহার সকল সুবিধা ভোগ করিবে। কিন্তু গিয়া দেখিবে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও কঠিন শাস্তি তাহাদিগকে অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশার শিকার করিবে। সুতরাং তাহাদের মন যাহা বুঝাইয়াছিল তাহা তাহাদের কাছে চরম প্রতারণা হইয়া ধরা দিবে। ভাল আশা করিয়া গিয়া মন্দ পাওয়াই তো প্রতারিত হওয়া। খারাপ কাজ করিয়া ভাল আশা করাটাই তো প্রতারণামূলক ব্যাপার। এই কারণেই বলা হইয়াছে ঃ

وَمَايَخْدَعُوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُوْنَ ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন- আমাদিগকে 'আলী ইব্‌ন মুবারক এই খবর পৌঁছাইয়াছেন যে, যায়দ ইব্‌ন মুবারককে মুহাম্মদ ইব্‌ন ছওর ইব্‌ন জারীর হইতে يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ -এর নিম্ন ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেন ঃ

يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ অর্থাৎ প্রকাশ্যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলিয়া বেড়ায় যেন তাহাদের জান-মাল রক্ষা পায়, কিন্তু ভিতরে তাহারা বিপরীত বিশ্বাস রাখে।"

সাঈদ ইব্ন কাতাদাহ আলোচ্য আয়াতদ্বয় সম্পর্কে বলেন ঃ 'অনেকের মতেই মুনাফিকের মূল চরিত্র হইল কপটতা। অর্থাৎ মুখে স্বীকার করা ও অন্তরে অস্বীকার করা, কথার বিপরীত কাজ করা, সকালে এক রকম ও সন্ধ্যায় আরেক রকম হওয়া, জো বুঝিয়া নৌকা ছাড়া এবং হাওয়া বুঝিয়া বাদাম উড়ানো।'

(١٠) فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ ۙ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ○

১০. তাহাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ব্যাধি বাড়াইয়া দিলেন। আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কারণ তাহারা মিথ্যা বলিত।

তাফসীর ঃ আস্ সুদ্দী আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্‌রা আল-হামদানী হইতে ও তাঁহারা ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা হইতে বর্ণনা করেন ঃ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ অর্থাৎ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সংশয় এবং فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا অর্থাৎ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বাড়াইয়া দিলেন।

ইব্ন ইসহাক মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ হইতে, তিনি ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ অর্থ সন্দেহ রোগ। মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান বসরী, আবুল আলীয়া, রবী' ইব্ন আনাস ও কাতাদাহ এই মতই পোষণ করেন।

ইকরামা ও তাউস বলেন ঃ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ অর্থাৎ রিয়া। ইব্ন আব্বাসের বরাতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ অর্থাৎ নিফাক এবং فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا অর্থাৎ নিফাক বাড়াইয়া দিলেন। ইহা প্রথমোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন- فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ অর্থাৎ দীনি ব্যাধি, শারীরিক ব্যাধি নহে। তাহারা মুনাফিক আর তাহাদের ব্যাধি হইল সেই সংশয় যাহা তাহাদিগকে ইসলামে ঢুকাইয়াছে। فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا অর্থাৎ তাহাদের رجس (মনঃপীড়া) বাড়াইয়া দিয়াছেন। অতঃপর তিনি পড়িলেন ঃ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ - وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ -

"যাহারা মু'মিন, তাহাদের ঈমান বাড়িয়া গিয়াছে এবং তাহারা মহা আনন্দিত। পক্ষান্তরে যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে, তাহাদের মনঃপীড়ার সহিত আরও অন্তর্জ্বালা সংযুক্ত হইয়াছে।"

তিনি বলেন, উহার অর্থ ক্ষতির উপর ক্ষতি এবং ভ্রান্তির উপর ভ্রান্তি। আবদুর রহমান (র) ইহাকে 'হুস্‌ন' (ভাল কাজ) বলিয়াছেন। কারণ, উহা যথাযথ কর্মফল। পূর্বসূরীদের মত ইহাই। আল্লাহ্ পাকের কালামে ইহার আরও দলীল আছে। যেমন ঃ

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ "যাহারা হিদায়েত গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের হিদায়েতের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাহারা পরহেযগার হইয়াছে" আয়াতাংশ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ -কে يكذّبون পড়া হয়। মুনাফিকদের এইরূপ দুইটি চরিত্রই ছিল। তাহারা নিজেরা তো মিথ্যা বলিত, অপরকেও মিথ্যাবাদী বলিত।

ইমাম কুরতুবী ও অন্যান্য তাফসীরকার রাসূলুল্লাহ (সা) জানিতে পাইয়াও কেন মুনাফিকদের হত্যা করেন নাই, এই প্রশ্নের জবাবে সহীহদ্বয়ে উদ্ধৃত হাদীসটি পেশ করেন। উহাতে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) হযরত উমর (রা)-কে বলেন, 'মুহাম্মদ তাহার সঙ্গীদের হত্যা করেন, এই কথা আরবরা বলাবলি করুক তাহা আমি পছন্দ করি না।' তিনি ভয় পাইতেন যে, ইহার ফলে বহু আরব ইসলাম গ্রহণ হইতে বিরত থাকিবে। কারণ, মুনাফিকরা প্রকাশ্যে মুসলমান নামে পরিচিত। তাহাদের অন্তরের কুফরী আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন, সাধারণ মানুষ জানে না। সুতরাং কি কারণে তাহাদের হত্যা করা হইল তাহা বুঝানো কঠিন হইবে। এই ভুল বুঝাবুঝির ফলে সাধারণ আরবরা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হইয়া পড়িবে। তাহারা বলিয়া বেড়াইবে, মুহাম্মদ তাহার সঙ্গীদেরও কখন কি কারণে হত্যা করে তাহা কেহ জানিতে পারে না।

ইমাম কুরতুবী বলেন– আমাদের আলিম সম্প্রদায়ের ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞের অভিমত ইহাই। মুনাফিকদের অন্তরের কলুষতা জানা সত্ত্বেও তিনি তাহাদের সহিত সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া চলিতেন। ইব্‌ন আতিয়্যা বলেন- ইমাম মালিকের অনুসারীবৃন্দের নীতি ইহাই। মুহাম্মদ ইবনুল জুহুম কাজী ইসমাঈল আবহারী ও ইবনুল মাজেশুন এই মতের ভিত্তিতে দলীল পেশ করিয়াছেন। একটি দলীল এই, ইমাম মালিক (র) বলেন- রাসূল (সা) উম্মতকে ইহাই জানাইয়া দিলেন যে, বিচারক কখনও তাহার জানার উপর ভিত্তি করিয়া রায় দিবে না।

ইমাম কুরতুবী বলেন- অন্যান্য মাসআলায় মতভেদকারী সর্বস্তরের আলিম এই ব্যাপারে একমত যে, বিচারক নিজের অবগতির উপর ভিত্তি করিয়া রায় দিবেন না। তিনি বলেন- ইমাম শাফেঈ (র)-ও ইহা হইতে দলীল গ্রহণ করিয়াছেন যে, রাসূল (সা) মুনাফিকদের অন্তরের কথা জানা সত্ত্বেও মুখে ইসলাম প্রকাশ করায় তাহাদের হত্যা কার্য হইতে বিরত ছিলেন। কারণ, বিচার অন্তরের কথার ভিত্তিতে হইবে না, হইবে মুখের কথার ভিত্তিতে। সহীহদ্বয় ও অন্যান্য হাদীস সংকলনে ইহার সমর্থনে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। যেমন রাসূল (সা) বলেন ঃ

"আমি (অবিশ্বাসী) লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। যতক্ষণ তাহারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' না বলিবে, ততক্ষণ যুদ্ধ চলিবে। যখন উহা বলিবে, তখন আমার হাত হইতে তাহাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ হইবে। হ্যাঁ, কিসাসের প্রশ্ন ভিন্ন। আর তাহাদের অন্য কোন ব্যাপার থাকিলে উহার হিসাব তাহারা আল্লাহ্‌র কাছে দিবে।"

উক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই, যখনই কেহ মুখে কলেমা বলিবে, তখন তাহাকে মুসলমান ধরা হইবে এবং সে ইসলামী বিধানের আওতায় আসিবে। অন্তরে তাহার যাহাই থাকুক না কেন। যদি উহা ভাল হয়, পরকালেও উহার সুফল পাইবে। যদি অন্তর খারাপ হয়, তাহা হইলে

দুনিয়ায় মুসলমান হিসাবে বিবেচিত হইয়াও কোন লাভ হইবে না। ত্রুটিপূর্ণ ঈমানের কারণে তাহারা চরম শাস্তি পাইবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ط قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ ـ

"(বিপন্ন মুনাফিকরা) মু'মিনদের ডাকিয়া বলিবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গী ছিলাম না? তাহারা বলিবে– হ্যাঁ, কিন্তু তোমরাই তোমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে রাখিয়া বিপদগ্রস্ত করিয়াছ এবং তোমাদের ভ্রান্ত প্রত্যাশা তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। এখন তো আল্লাহ্র ফয়সালা আসিয়া গিয়াছে।"

তাহারা হাশরের মাঠে একত্রে উঠিলেও যখন আল্লাহ্র ফয়সালা জারী হইবে, তখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। বিভিন্ন হাদীসে আছে, তাহারা মু'মিনদের সহিত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সিজদাবনত হইতে ব্যর্থ হইবে।

একদল অবশ্য বলেন- যেহেতু রাসূল (সা) বিদ্যমান ছিলেন, তাই তাহাদের ক্ষতি সাধনের সুযোগ ছিল না বিধায় তাহাদের নিফাক জানা সত্ত্বেও হত্যা করা হয় নাই। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর পরে অবস্থা অন্যরূপ বিধায় যাহাদের নিফাক প্রকাশ হইয়া যাইবে এবং সকল মুসলমানও জানিতে পাইবে, তাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে। ইমাম মালিক (র) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা) যুগের মুনাফিকরা এই যুগের কাফির।

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই ঃ কোন মুসলমানের কুফরী প্রকাশ পাইলে, তাহার হত্যার ব্যাপারে আলিমদের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। তাহাকে কি তওবা করিতে বলা হইবে, না সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হইবে? তাহার কুফরী কি একবার প্রকাশ পাইলেই হইবে, না বারংবার প্রকাশ পাইতে হইবে? তাহার স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামে প্রত্যাবর্তন কিংবা ভয়ে ইসলামে প্রত্যাবর্তন, ইহার কোন্টির কি বিধান? এইরূপ বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। উহা তাফসীরে আলোচনার স্থান নহে। ফিকাহ্ গ্রন্থই উহা আলোচনার উপযুক্ত স্থান।

জরুরী আলোচনা

যাহারা বলেন, রাসূল (সা) কিছুসংখ্যক মুনাফিক সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাহাদের দলীল হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা)-এর হাদীস। উহাতে চৌদ্দজনের কথা বলা হইয়াছে। তাহারা তবূক যুদ্ধের সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গভীর অন্ধকারে কূপে ফেলিয়া হত্যার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্র ফাঁস করিয়া দেন। হুযায়ফা (রা)-কে তাহাদের নাম জানানো হইয়াছে। তবে উপরে বর্ণিত হিকমতের কারণেই হয়ত তাহাদের হত্যা করা হয় নাই, কিংবা অন্য কারণেও হইতে পারে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। তাহাদের ছাড়া অন্য মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُوْنَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ـ

"তোমাদের চতুষ্পার্শ্বে আরব মুনাফিকরা রহিয়াছে, মদীনার নিফাক বিশিষ্টরাও রহিয়াছে। তুমি তাহাদিগকে চিন না, আমি চিনি।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَيُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا اِلاَّ قَلِيْلاً ـ مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلاً ـ

"মুনাফিকরা যদি ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর নিয়া মদীনায় ফিতনা সৃষ্টি হইতে বিরত না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আমি ইহার প্রতিকার করিব। ফলে তাহাদের নগণ্য লোকই মদীনায় তোমার কাছে ঠাঁই পাইবে। তাহারা অভিশপ্ত। যেখানেই যাইবে পাকড়াও হইবে এবং ঢালাওভাবে হত্যা করা হইবে।"

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, রাসূল (সা) তাহাদিগকে সরাসরি চিনিতেন না। তবে তাহাদের বর্ণিত চরিত্রাবলীর আলোকে তিনি কিছু কিছু লোককে চিহ্নিত করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ نَشَاءُ لَاَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْلِ ـ

"আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে তাহাদের চেহারা দেখাইয়া দিতে পারি। তবে তুমি অবশ্যই তাহাদের কথা ও কাজে চিনিতে পারিবে।"

সর্বাধিক খ্যাত মুনাফিক হইল আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সলূল। যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) মুনাফিক সম্পর্কিত আয়াতের গুণাবলীর আলোকে তাহার ব্যাপারে রাসূল (সা)-কে সাক্ষ্যদান সত্ত্বেও রাসূল (সা) অন্যান্য সাহাবা সহ তাহার জানাযা আদায় করেন। একদা হযরত উমর (রা) তাহার ব্যাপারে পদক্ষেপের প্রশ্ন তুলিলে রাসূল (সা) বলিলেন- 'আরবরা বলাবলি করিবে যে, মুহাম্মদ তাহার সঙ্গী হত্যা করে, আমি ইহা পছন্দ করি না।' অন্য রিওয়ায়েতে আছে– তাহার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া বা না নেয়ার অধিকার আমাকে দেওয়া হইয়াছে। আমি পদক্ষেপ না নেয়া পছন্দ করিয়াছি।' আরেক রিওয়ায়েতে আছে ঃ আমি যদি জানিতাম, তাহার জন্য সত্তর বারের বেশী ক্ষমা চাহিলে সে ক্ষমা পাইবে, তাহা হইলে তাহাও করিতাম।'

(١١) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ○

(١٢) اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ○

১১. আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিও না,' তাহারা বলে, আমরা তো মীমাংসাকারী।'

১২. খবরদার! নিশ্চিতভাবে তাহারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তাঁহারা তাহা বুঝে না।

তাফসীর ঃ আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে আবূ মালিক হইতে তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রাতুত তাইয়েব আল হামদানী হইতে এবং তাঁহারা ইব্ন

মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ لاَ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ মুনাফিকবৃন্দ আর কুফরী ও নাফরমানী কাজ।

আবূ জা'ফর রবী' ইব্ন আনাস ও তিনি আবুল আলীয়া হইতে বর্ণনা করেন وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ পৃথিবীতে নাফরমানী ছড়াইও না। তাহাদের কাজটি ছিল আল্লাহ্র নাফরমানী করা। কারণ, পৃথিবীতে যাহারা আল্লাহ্র নাফরমানী করে তাহারাই ফাসাদ সৃষ্টি করে। মূলত আল্লাহ্র কথা শুনা ও মানার ভিতরেই পৃথিবীর শান্তি শৃঙ্খলা নিহিত।

রবী' ইব্ন আনাস ও কাতাদাহরও এই মত। ইব্ন জুরায়জ মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন ঃ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ যখন তাহারা আল্লাহ্র নাফরমানী করিয়া ফিরে, তখন তাহাদিগকে বলা হয়, এই সকল কাজ করিও না। তাহারা জবাবে বলে, 'আমরা তো হিদায়েতের উপর থাকিয়া মীমাংসাকারীর কাজ করিতেছি।'

ওয়াকী', ঈসা ইব্ন ইউনুস ও ইছাম ইব্ন আলী আ'মাশ হইতে, তিনি মিনহাল ইব্ন আমর হইতে, তিনি উব্বাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ আল আসাদী হইতে ও তিনি হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ তিনি আলোচ্য প্রথম আয়াত সম্পর্কে বলেন, এই আয়াতের চরিত্র সম্পন্ন লোক পরে আর আসে নাই।

ইব্ন জারীর বলেন- আমাকে আহমদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীম, তাঁহাকে আবদুর রহমান ইব্ন শরীক, তাঁহাকে তাঁহার পিতা আ'মাশ হইতে ও তিনি যায়দ ইব্ন ওহাব প্রমুখ হইতে ও তাঁহারা সালমান ফারসী (রা) হইতে আলোচ্য প্রথম আয়াত সম্পর্কে এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন ঃ তাহারা আর আসে নাই।

ইব্ন জারীর বলেন- সালমান (রা) হয়ত ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতে বর্ণিত চরিত্রের অধিকারী মহা ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুনাফিক নবী করীম (সা)-এর যমানায় ছিল। আমাদের যমানায় সেইরূপ জঘন্য চরিত্রের লোক অনুপস্থিত।

ইব্ন জারীর আরও বলেন- মুনাফিকরা আল্লাহ্র নাফরমানী করিয়া পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে। তাহাদের সংশয়, তাহাদের অবৈধ কার্যকলাপ, বৈধ ও অপরিহার্য কাজ বর্জন এবং দীনের মৌলিক ধ্যান-ধারণায় সন্দেহ পোষণ ইত্যাদিই মস্ত ফাসাদ সৃষ্টিকারী। কারণ, মৌলিক বিশ্বাসে সংশয়ীদের কোন আমলই কবূল হয় না। তজ্জন্য চাই শর্তহীন দৃঢ় বিশ্বাস। তাহারা নিজেদের সংশয়ী মন লইয়া মু'মিনদের ব্যাপারে ভ্রান্ত প্রচারণা চালায়। কাফির বন্ধুদের কাছে মু'মিনদের গোপন ব্যাপারগুলি ফাঁস করিয়া দেয়। এই সব হইল জঘন্য ফাসাদের কাজ। সুযোগ মাত্রই তাহারা মু'মিনদের ভিতরে থাকিয়া তাহাদের সর্বনাশ সাধন করে। অথচ এই কাজগুলিকে তাহারা মনে করে, খুব ভাল কাজ করিতেছে, মু'মিন ও কাফিরের বিরোধে আপোষ মীমাংসার কাজ করিতেছে।

হাসানও তাহাই বলেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির বড় কাজই হইল কোন মু'মিনের কাফিরের সহিত বন্ধুত্ব রাখা। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ -

"কাফিররা পরস্পর বন্ধু। তোমরাও যদি তাহা না হও (বরং মু'মিন ও কাফিরে বন্ধুত্ব স্থাপন কর) তাহা হইলে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি হইবে এবং উহা হইবে মস্ত বড় ফাসাদ।"

তাই আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরের বন্ধুত্ব নাকচ করিয়া দিলেন। তিনি বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَتُرِيدُوْنَ أَنْ تَجْعَلُوْا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا ـ

"হে মু'মিনগণ। তোমরা মু'মিন ভিন্ন কোন কাফিরকে বন্ধু বানাইও না। তোমরা কি চাও, আল্লাহ্র সকাশে তোমাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলীল দাঁড় করাইতে?"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ـ

"নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে ঠাঁই পাইবে। কখনও তাহাদের জন্য তুমি মদদগার পাইবে না।"

মুনাফিকদের মৌখিক ঈমান যেহেতু মু'মিনদিগকে ধোঁকায় ফেলে, তাই নিফাকের ফাসাদ সুস্পষ্ট। কারণ, তাহারা প্রতারণামূলক চটকদার কথা বলিয়া মু'মিনদের ভুলায় এবং মু'মিনদের ভিতরের কথা নিয়া কাফির বন্ধুদের বন্ধুত্ব রক্ষা করে। যদি তাহারা পূর্বাবস্থায় বহাল থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তো তাহাদের ক্ষতি ভয়াবহ। পক্ষান্তরে যদি তাহারা ইখলাসের সহিত ঈমান আনিয়া থাকে এবং কথা ও কাজে এক হয়, তাহাতেও তাহারা কাফিরের সহিত বন্ধুত্বের কারণে কল্যাণ ও মুক্তি পাইবে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَتُفْسِدُوْا فِى الْأَرْضِ قَالُوْا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ অর্থাৎ আমরা মু'মিন ও কাফিরের সেতুবন্ধ হিসাবে কাজ করিতেছি যেন উভয় দলের মধ্যে আপোষ ও শান্তি বজায় রাখিতে পারি।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ হইতে, তিনি ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের নিম্নরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করেন ঃ

অর্থাৎ আমরা মু'মিন ও আহলে কিতাব এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোষ চাহিতেছি। ইহার জবাবেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لاَّيَشْعُرُوْنَ "খবরদার! নিশ্চিতভাবে তাহারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তাহারা তাহা বুঝিতেছে না।"

অর্থাৎ জানিয়া রাখ, তাহারা যাহাকে নির্ভরযোগ্য ভাবিতেছে এবং যে কাজকে আপোষের কাজ মনে করিতেছে, উহাই আসলে ফাসাদের মূল। কিন্তু তাহাদের বোকামীর কারণে তাহারা উহার ফাসাদ হওয়াটা ঠিক পাইতেছে না।

(١٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ○

১৩. আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'অন্যান্য লোকের মত তোমরাও ঈমান আন। তাহারা বলে, 'নির্বোধদের মত কি আমরাও ঈমান আনিব?' জানিয়া রাখ, তাহারাই নির্বোধ। কিন্তু তাহারা তাহা জানে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যখন মুনাফিকদিগকে বলা হয়, অন্যান্য লোক যেইভাবে আল্লাহ্র উপর, ফেরেশতার উপর, কিতাবের উপর, রাসূলের উপর, মরণোত্তর পুনরুত্থানের উপর, এক কথায় জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি যত কিছু মু'মিনদিগকে জানানো হইয়াছে উহার সকল কিছুর উপর ঈমান আনিয়াছে, তোমরাও সেইভাবে ঈমান আন এবং আল্লাহ্র রসূলের অনুগত হইয়া শরীআতের সকল বিধি-নিষেধ মানিয়া চল, তখন তাহারা বলে, আমরা কি নির্বোধদের (সাহাবায়ে কিরামের) মত ঈমান আনিব (আল্লাহ্র লা'নত হউক)?

আবুল 'আলীয়া ও আস্ সুদ্দী অনুরূপ ব্যাখ্যা নিজ নিজ তাফসীর গ্রন্থে ইব্ন আব্বাস (রা), ইব্ন মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। রবী' ইব্ন আনাস, আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম প্রমুখ অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। তাহারা আরও বলেন- মুনাফিকরা বলিতে চাহে, আমরা কি নির্বোধদের সমপর্যায়ে নামিয়া গিয়া একাকার হইব?

سفيه শব্দের বহুবচন سفهاء যেমন حكيم শব্দের বহুবচন حكماء এবং حليم শব্দের বহুবচন حلماء 'সফীহ' শব্দের অর্থ নির্বোধ, দুর্বল চিন্তা ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানের অধিকারী। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা নারী ও বালকদিগকে 'সুফাহা' আখ্যা দিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا "নির্বোধদের হাতে তোমাদের সম্পদ দিও না যাহা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জীবন ধারণের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।"

সর্বস্তরের আলিম এখানে 'সুফাহা' অর্থ করিয়াছেন নারী ও বালক। আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের উত্তরে তাহাদের ব্যবহৃত শব্দটিই ফেরত দিয়াছেন। পরন্তু اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ বলিয়া অত্যধিক জোরের সহিত নির্বুদ্ধিতাকে তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া দিলেন, وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ বলিয়া তিনি জানাইয়া দিলেন, তাহাদের নির্বুদ্ধিতা এমনই চরম যে, তাহাদের নিজেদের অবস্থা সম্পর্কেও খবর নাই। ফলে তাহারা অন্ধত্বের চূড়ায় পৌঁছিয়াছে এবং হিদায়েত হইতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে।

(١٤) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ○

(١٥) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ○

১৪. যখন তাহারা মু'মিনদের সহিত মিলিত হয়, তাহারা বলে, 'আমরা মু'মিন।' আর যখন তাহারা তাহাদের শয়তান নেতাদের সহিত সংগোপনে মিলিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গী, আমরা কেবল তামাশা করিতেছি।

১৫. আল্লাহ্ তা'আলাও তাহাদের সহিত তামাশা করিতেছেন এবং তাহাদের নাফরমানীর রশি ঢিল দিয়াছেন যেন তাহারা উদভ্রান্তের মত ঘুরপাক খায়।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যখন উক্ত মুনাফিকরা মু'মিনগণের সহিত সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি, অথচ তাহাদের অন্তর নিফাক, জালিয়াতি ও কপটতাপূর্ণ থাকে এবং মু'মিনদের কাছে প্রতারণামূলকভাবে ঈমানের কথা, বন্ধুত্বের কথা ও সংহতির কথা বলে। তাহাদের উদ্দেশ্য হইল মু'মিনদের সুযোগ-সুবিধা ও গনীমতের সম্পদে শরীক হওয়া। وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ অর্থাৎ চলিয়া গেলে এবং একান্তে মিলিত হইলে। এখানে خلو। ব্যবহৃত হইয়াছে انصرفوا। অর্থে এবং الى। -এর সহিত متعدى হইয়াছে। ফলে গোপন দায়িত্ব পালনের পর প্রত্যাবর্তনের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। অবশ্য কেহ কেহ الى। এখানে مع অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে প্রথম মতটিই উত্তম। ইমাম ইব্ন জারীরের বক্তব্য তাহাই।

আস্ সুদ্দী আবূ মালিক হইতে বর্ণনা করেন, خلو। অর্থ مضو। (গমন করে) এবং شياطينهم অর্থ ইয়াহুদী ও মুশরিক সর্দার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীরে আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রা আল হামদানী এবং তাঁহারা ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ অর্থাৎ কাফির নেতৃবৃন্দের নিকট যখন যায়।

যিহাক হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ অর্থাৎ যখন তাহারা তাহাদের সঙ্গীদের সহিত মিলিত হয়। তাহারাই তাহাদের কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ অর্থাৎ ইয়াহুদী। তাহারাই রাসূল (সা)-এর রিসালাত প্রাপ্তি ও ওহী মিথ্যা বলিয়া থাকে।

মুজাহিদ বলেন ঃ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ দ্বারা তাহাদের মুনাফিক ও মুশরিক সহচরবৃন্দের কথা বুঝানো হইয়াছে।

কাতাদাহ বলেন ঃ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ বলিয়া তাহাদের মুশরিক ও পাপিষ্ঠ নেতাদের কথা বুঝানো হইয়াছে।

আবূ মালিক, আবুল আলীয়া, আস্ সুদ্দী রবী' ইব্ন আনাস প্রমুখ উহার অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর বলেন, পথভ্রষ্টকারী সকল কিছুকেই শয়তান বলা হয়। উহা জ্বিনও হইতে পারে, মানুষও হইতে পারে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ـ

"এভাবেই প্রত্যেক নবীর জন্য আমি জ্বিন ও মানব শয়তানকে দুশমন বানাইয়া দেই। তাহারা একদল অপর দলের ভিতর কথা ছড়ায় এবং চটকদার কথা বলিয়া ধোঁকা দেয়।"

আল্ মুসনাদে আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত আছে- নবী করীম (সা) বলেন, আমরা জ্বিন ও ইনসান শয়তান হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। আমি প্রশ্ন করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইনসানও কি শয়তান হয়? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ।

انا معكم আয়াতাংশ সম্পর্কে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ হইতে, তিনি ইকরামা কিংবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ উহার তাৎপর্য হইল, তোমরা যাহার উপর আছ, আমরাও তাহার উপর আছি। আর اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ -এর তাৎপর্য হইল, সেই সম্প্রদায়ের সহিত আমরা শুধু তামাশা করিতেছি বা খেলা করিতেছি।

যিহাক ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ অর্থাৎ 'রাসূলের সহচরদের সহিত হাসি-তামাশা করিতেছি।' রবী' ইব্ন আনাস এবং কাতাদাহও এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই ছলা-কলার জবাবে বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ইব্ন জারীর ইহার ব্যাখ্যায় বলেন- আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাহাদের এই ঠাট্টার জবাব দিবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُنْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ج قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ط فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ ط بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ـ

'মুনাফিক নর-নারী সেই দিন মু'মিনদিগকে বলিবে, একটু আস্তে চল, তোমাদের আলোকে আমাদিগকেও চলিতে দাও। জবাবে বলা হইবে, তোমাদের পিছনে দেখ, সেখান হইতে আলো নাও। তাহারা পিছনে দেখা মাত্র উভয়ের মাঝখানে দেয়াল দাঁড়াইয়া যাইবে। উহার অভ্যন্তর ভাগে থাকিবে রহমত ও বহির্ভাগে থাকিবে আযাব।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَايَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا ـ

"আর অবিশ্বাসীরা কখনও যেন ধারণা না করে যে, তাহাদের কল্যাণের জন্য আমি তাহাদিগকে সময় সুযোগ দিতেছি; আমি তো তাহাদিগকে পাপ বৃদ্ধির সুযোগ দিতেছি।"

এইসব আয়াত এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে কাফির ও মুশরিকদের সহিত আল্লাহ্ তা'আলার 'ইস্তিহযার' (ঠাট্টার) স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে خديعة - مكر - سخرية ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ একদল বলেন, يستهزئ بهم বলা হইয়াছে মুনাফিকদের সতর্কীকরণের জন্য। তাহাদের পাপাচারকে ভর্ৎসনা করার জন্যই অনুরূপ পরিভাষার প্রয়োগ ঘটিয়াছে। ইব্‌ন জারীর আরও বলেন, ধোঁকা বা উপহাস শব্দটির ব্যবহার এইভাবে ঘটিয়াছে যে, কোন ধোঁকাবাজ ধোঁকা দিতে ব্যর্থ হইয়া পাকড়াও হইলে যেমন পাকড়াওকারী বলিয়া থাকে, ধোঁকা দিতে আসিয়া তুমি নিজেই ধোঁকা খাইলে, ইহাও তেমনি। কেহ উপহাস করিতে গিয়া নিজেই উপহাসের পাত্র হইলে যাহা হয়, ইহাও তাহাই। এই আলোকেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ "আর তাহারা কূটচক্রান্ত করিল এবং আল্লাহ্ তাহাদের কূটচক্রান্ত ব্যর্থ করিলেন। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা সর্বোত্তম কূটচক্র প্রতিবিধায়ক।"

আল্লাহ্ তা'আলার 'ইস্তিহযা'-ও এই অর্থে। কারণ, মকর বা ইস্তিহযা আল্লাহ্ পাকের কাজ নহে। আল্লাহ্ পাকের কাজ উহার প্রতিবিধান করা। এই প্রতিবিধান করাটাই তাহাদের জন্য উক্ত অর্থ প্রদান করিতেছে।

অন্য একদল বলেন– আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اِنَّمَا نَحْنُ - اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ فيسخرون منهم سخر الله منهم এবং يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ও مُسْتَهْزِئُوْنَ কিংবা نسو الله فنسيهم অথবা অনুরূপ কোন বাণী মূলত প্রতিকার প্রতিবিধান অর্থে আসিয়াছে। তাহাদের উক্ত কার্যাবলীর যথাবিহীত শাস্তি তাহারা ভোগ করিবে, ইহাই উক্ত আয়াতসমূহের তাৎপর্য। একই শব্দের দুই অর্থে ব্যবহারের নজীর কুরআনে অন্যত্র বিদ্যমান। যেমন جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا কিংবা فَمَنِ اعْتَدٰى فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ আয়াতদ্বয়ে প্রথমোক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ জুলুম ও দ্বিতীয়োক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ ইনসাফ। এখানে عدوان ও سيئة পাশাপাশি দুইবার ব্যবহৃত হইয়া দুই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এই ধরনের শব্দগুলি কুরআনে প্রয়োগভেদে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

ইব্‌ন জারীর আরও বলেন- একদল লোক বলেন, আলোচ্য আয়াত আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে মুনাফিকদের ব্যাপারে খবর হিসাবে অবতীর্ণ হইয়াছে। উহাতে তাহারা কি করিতেছে এবং উহার স্বাভাবিক ফল তাহারা কি পাইবে তাহা বলা হইয়াছে। তাহা এই যে, তাহারা তাহাদের মন্ত্রণাদাতাদের কাছে গিয়া বলে, আমরা তোমাদের নীতিতেই অটল থাকিয়া মুহাম্মদ ও তাহার উপর অবতীর্ণ ওহী মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি। তবে আমরা তাহাদের কাছে গিয়া যাহা বলিয়াছি তাহা ঠাট্টা হিসাবে বলিয়াছি। তাই আল্লাহ্ তা'আলা জানাইলেন, ইহার ফলে তাহারা পার্থিব জীবনে জান-মালের নিরাপত্তা পাইবে বটে, কিন্তু পরকালে তাহারা বিপরীত ফল দেখিয়া নিজেরাই ঠাট্টার শিকার হইবে। তাহারা চরম লাঞ্ছনা ও শাস্তি ভোগ করিবে।

অবশেষে ইব্ন জারীর উক্ত শব্দাবলীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন– ধোঁকা, উপহাস, খেল-তামাশা, কূটচক্রান্ত ইত্যাদি শাব্দিক অর্থে আল্লাহ্ পাকের তরফ হইতে ব্যবহার হইতে পারে না। ইহা সর্বসম্মত অভিমত। হ্যাঁ, উহা প্রতিদান, প্রতিবিধান ও জবাব অর্থে পরোক্ষভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় দোষ নাই। তিনি বলেন- আমার এই বক্তব্যের সমর্থনে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা পাওয়া যায়। আমাকে আবূ কুরায়ব, তাঁহাকে আবূ উসমান, তাঁহাকে বাশার আবূ রওক হইতে এবং আবূ রওক যিহাক হইতে ও যিহাক ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ অর্থাৎ 'তাহাদের তামাশার প্রতিদানমূলক তামাশা। فِى طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ আয়াতাংশ সম্পর্কে আস্ সুদ্দী আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি মুর্‌রা আল হামদানী হইতে ও তিনি ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

উহার তাৎপর্য হইল, তাহাদিগকে ঢিল দেওয়া, সময় দেওয়া। মুজাহিদ বলেন- তাহাদিগকে বাড়াইয়া দেওয়া। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ ط بَلْ لَّاَيَشْعُرُوْنَ -

"তাহারা কিভাবে যে, তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমি বাড়াইয়া দিতেছি তাহাদের কল্যাণের জন্য? বরং তাহারা বুঝিতেছে না।"

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ "শীঘ্রই আমি এমনভাবে রশি টান দিব যে, তাহারা কোথা হইতে কি হইল তাহা জানিতেই পাইবে না।"

একদল বলেন, পাপের বর্ণনার পরে নি'আমাত লাভের বর্ণনা মূলত প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنَا هُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ -

"যখন তাহারা সকল উপদেশ ভুলিয়া যায়, তখন সকল সুযোগ-সুবিধার দুয়ার আমি খুলিয়া দেই। যখন তাহারা ইহাতে উল্লসিত হয়, অমনি অকস্মাৎ তাহাদিগকে পাকড়াও করি। ফলে তাহারা হতভম্ব হয়।"

অতঃপর বলেন ঃ

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ "এইভাবে জালিম জাতির সমূলে উচ্ছেদ ঘটে এবং সমস্ত প্রশংসা নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই।"

ইব্ন জারীর বলেন- সঠিক ব্যাখ্যা এই, 'আমি তাহাদিগকে পাপ পথে সুযোগ দিয়া বিভ্রান্তির চরমে পৌঁছার জন্য বাড়াইয়া দিব।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا يُؤْمِنُوْا بِهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -

"আমি তাহাদের অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ বিপরীতমুখী করিয়া দিব, কারণ তাহারা শুরু হইতেই ঈমান আনে নাই এবং তাহাদিগকে লাগামহীন করিব যেন তাহাদের সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তাহারা ঘুরপাক খাইয়া মরে।"

الطغيان অর্থ কোন কিছুতে সীমালঙ্ঘন করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِى الْجَارِيَةِ "পানি যখন সীমা ছাড়াইল, তখন তোমাদিগকে আমি নৌকায় তুলিলাম।"

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ অর্থ তাহারা তাহাদের কুফরীর আবর্তে ঘুরপাক খাইয়া ফিরিবে। আস্ সুদ্দী নিজস্ব সনদে সাহাবা হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করেন। আবুল 'আলীয়া, কাতাদাহ, রবী' ইব্ন আনাস, মুজাহিদ, আবূ মালিক ও আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ, অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং বলেন–তাহাদের কুফরী ও গোমরাহীর আবর্তে তাহারা পেরেশান হইয়া ঘুরিয়া মরিবে।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ العمه অর্থ বিভ্রান্তি। যখন কেহ পথ হারায়, তখন বলা হয় عمه فلان يعمه عمها و عموها অমুক চরমভাবে বিভ্রান্ত হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ অর্থ তাহারা তাহাদের বিভ্রান্তি, কুফরী, ইতরামী ও হিংসার পংকিলতায় নিমজ্জিত হইয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিবে এবং বাহির হইয়া আসার পথ খুঁজিয়া পাইবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়াছেন, তদুপরি সীল লাগাইয়াছেন। তাহাদের চোখ পর্দা পড়িয়া অন্ধ হওয়ায় হিদায়েতের পথ দেখিতে পায় না ও সঠিক পথের সন্ধান পায় না।

কেহ কেহ বলেন, عمى হইল চোখের অন্ধত্ব ও عمه হইল অন্তরের অন্ধত্ব। কালামে পাকে অন্তরের অন্ধত্বের জন্য عمى -ও ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ

فَاِنَّهَا لاَتَعْمَى الاَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ

"অনন্তর নিশ্চয় তাহাদের চোখ অন্ধ হয় নাই, অন্ধ হইয়াছে তাহাদের বুকে লুকানো অন্তরগুলি।"

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই, 'আমহুন' শব্দের বহুবচন 'উমহুন' এবং চূড়ান্ত বহুবচন হইল 'উমাহাউ'। যেমন কাহারও উট নিরুদ্দেশ হইলে বলা হয় ذهب ابله العمهاء তাহার উট হারাইয়া গিয়াছে।

(١٦) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَٰلَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ○

১৬. উহারাই হিদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করিল। তাই তাহাদের বাণিজ্য লাভজনক হইল না এবং তাহারা পথপ্রাপ্ত হইল না।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুর্রা আল-হামদানী, আবূ সালেহ, আবূ মালিক ও তাঁহার নিকট হইতে আস্ সুদ্দী নিজ তাফসীর বর্ণনা করেন।

أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلَٰلَةَ بِالْهُدَىٰ অর্থ ঃ 'উহারা গোমরাহী গ্রহণ করিল ও হিদায়েত বর্জন করিল।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন জুবায়র কিংবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন।

أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلَٰلَةَ بِالْهُدَىٰ অর্থ ঃ ঈমানের বিনিময়ে কুফরী খরীদ করা।

মুজাহিদ বলেন ঃ ঈমান আনিয়া পুনরায় কাফির হইল।

কাতাদাহ বলেন ঃ সুপথ ছাড়িয়া যাহারা ভ্রান্তপথ পছন্দ করিল।

কাতাদাহর এই বক্তব্যের সহিত আল্লাহ্ পাকের এই আয়াতের মিল রহিয়াছে ঃ

فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوْا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى "অথচ ছামূদ গোত্রকে আমি হিদায়েত দান করিয়াছিলাম। অতঃপর তাহারা হিদায়েত ছাড়িয়া অন্ধত্ব পছন্দ করিল।"

এই ব্যাপারে তাফসীরকারদের মূল বক্তব্য পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই ঃ মুনাফিকরা হিদায়েতের বদলে গোমরাহী গ্রহণ করিল। তাহারা সত্য পথের বিনিময়ে ভ্রান্তপথ কিনিল। মূলত أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلَٰلَةَ بِالْهُدَىٰ আয়াতের অর্থ ইহাই যে, তাহারা হিদায়েতের মূল্যে গোমরাহী কিনিল। এইদল ঈমান আনয়নকারী মুনাফিক হইতে পারে, বেঈমান মুনাফিকও হইতে পারে। ঈমান আনিয়া ঈমানের বদলে আবার কুফরী ক্রয়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ "ইহা এই জন্য যে, তাহারা ঈমান আনিয়া আবার কাফির হইল। তাই তাহাদের অন্তরসমূহে সীল মারিয়া দেওয়া হইল।"

মুনাফিকদের আরেকদল হইল যাহারা হিদায়েতের উপরে গোমরাহীকে প্রাধান্য দিয়া তাহাই অনুসরণ করিতেছে। মোটকথা তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণী রহিয়াছে। তাই আল্লাহ্ বলেন, فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ অর্থাৎ এই ব্যবসায়ে তাহারা মুনাফা পাইল না এবং তাহাদের ছলাকলা তাহাদিগকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে ব্যর্থ হইল।

ইব্ন জারীর বলেন—আমাকে বশীর, তাঁহাকে ইয়াযীদ, তাঁহাকে কাতাদাহর বরাতে সাঈদ বর্ণনা করেন—কাতাদাহ বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র কসম! তোমরা অবশ্যই দেখিতেছ, তাহারা সঠিক পথ ছাড়িয়া ভুল পথে চলিয়া গিয়াছে, দল ছাড়িয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে,

নিরাপত্তা ছাড়িয়া তাহারা বিপদ মাথায় লইয়াছে, সুন্নাত ছাড়িয়া তাহারা বিদ্আত অনুসরণ করিয়াছে ইত্যাদি। কাতাদাহ হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ, ইয়াযীদ ইব্ন যরী' ও ইব্ন আবূ হাতিমও এই বর্ণনা শুনান।

(১৭) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ۝

(১৮) صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝

১৭. তাহাদের উপমা হইল সেই দলের মত, যে দলটি আগুন জ্বালাইল। অতঃপর যখন দলটির চতুর্দিক আলোকিত হইল, আল্লাহ্ তা'আলা তখন সেই আলো তুলিয়া নিলেন, আর তাহাদিগকে অন্ধকারে ছাড়িয়া দিলেন, তাহারা দেখিতে পাইতেছে না।

১৮. তাহারা বধির, বোবা, অন্ধ, ফিরিতেও পারিতেছে না।

তাফসীর ঃ আরবী ভাষায় مثل -কে مثل বলা হয়। উহার বহুবচনে امثال হয়। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلاَّ الْعَالِمُوْنَ "আর এই সকল উপমা যাহা মানুষের জন্য উপস্থাপিত হয় তাহা আলিমগণ ছাড়া কেহ বুঝিতে পায় না।"

যাহারা হিদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অবস্থা প্রকাশের জন্য এই উপমা প্রদান করিয়াছেন। তাহারা যেন দৃষ্টিশক্তির বিনিময়ে অন্ধত্ব ক্রয় করিল। ইহা যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালাইয়া চতুর্দিক আলোকিত করিয়া আশে পাশের সব কিছু দেখিতেছিল। তারপর হঠাৎ আগুন নিভিয়া গেল। ফলে সে অধিকতর অন্ধকারে নিপতিত হইল। এখন আর কিছুই দেখিতে পায় না। তাই পথও চলিতে পারে না। এই অবস্থায় সে যেন বোবা, বধির ও অন্ধের মত যথাবস্থায় দণ্ডায়মান রহিল। যেখান হইতে আসিয়াছে সেখানেও ফিরিয়া যাইতে পারিতেছে না।

ঠিক এই অবস্থাই মুনাফিকদের। তাহারা হিদায়েতের আলো বিক্রয় করিয়া গোমরাহীর অন্ধকার ক্রয় করিয়াছে। সঠিক পথের চাইতে ভ্রান্তপথ পছন্দ করিয়াছে। এই উপমা প্রমাণ করে যে, তাহারা ঈমান আনয়নের পর পুনরায় কাফির হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আমি যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহা ইমাম রাযী তাঁহার তাফসীরে আস্ সুদ্দীর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—এখানে ব্যবহৃত উপমাটি অত্যন্ত যথাযথ হইয়াছে। কারণ, তাহারা ঈমান আনিয়া প্রথমে আলো অর্জন করিল। পরবর্তীকালে নিফাক অনুসরণ করিয়া আলো হারাইয়া অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। অর্থাৎ তাহারা চরম পেরেশানারীর মধ্যে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। কারণ দীনের ক্ষেত্রে পেরেশানীর চাইতে বড় পেরেশানী আর কিছুই নাই।

ইব্‌ন জারীর মনে করেন, এই উপমার উপমিত মুনাফিকগণ কখনই ঈমান আনে নাই। তাহার দলীল এই আয়াত ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইয়া দিলেন যে, মুনাফিকগণ আদৌ মু'মিন নহে। সুতরাং তাহাদের ঈমান আনার প্রশ্ন কোথায়?

আসলে সঠিক ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই উপমা তাহাদের নিফাক ও কুফর উভয় অবস্থার জন্য তুলিয়া ধরিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের সাময়িক ঈমান অর্জনের ব্যাপারটির ইহাতে কোন অন্তরায় দেখা দেয় না। পরে অবশ্য এই ঈমান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদের অন্তরে সীল মারা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর প্রাসঙ্গিক এই আয়াতটি উদ্ধৃত করেন নাই। যেমন ঃ

ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَايَفْقَهُوْنَ "তাহা এই জন্য যে, তাহারা ঈমান আনিয়া পুনরায় কাফির হইল, তাই তাহাদের অন্তরে সীল মারা হইল, তাই তাহারা বুঝিতে পায় না।"

এই কারণেই অনুরূপ উপমা আসিয়াছে। তাৎপর্য এই, মুখে কলেমা আওড়াইয়া তাহারা দুনিয়ার জীবন আলোকিত করিল। কিন্তু কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির অন্ধকারে তাহারা নিমজ্জিত হইবে। তেমনি দলকে বহুবচনের বদলে একবচনে ব্যবহারও ঠিক হইয়াছে। কারণ, কুরআনের অন্যত্রও এরূপ ব্যবহার দেখা যায়। যেমন ঃ

رَئَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ـ

অর্থাৎ তাহাদের চোখ ছানাবড়া হওয়ায় মনে হইতেছে তাহাদের উপর মৃত্যু চাপিয়া বসিয়াছে। এখানেও বহুবচনের বিনিময়ে একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। দলের একজনকে বলিয়া পূর্ণ দলকে বুঝানোর অন্যতম নজীর এই ঃ

مَاخَلْقُكُمْ وَلَابَعْثُكُمْ اِلاَّ كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ "তোমাদের সৃজন ও পুনরুত্থান একজনের সৃজন ও পুনরুত্থানের মতই।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا

"তাহাদের 'তাওরাত' বহনের উপমা হইল গাধার বোঝা বহনের মত।"

একদল বলেন- مَثَلُ الَّذِىْ اسْتَوْقَدَ نَارًا মূলত ছিল مثل قصتهم كقصة الذين استوقد نارا অপর দল বলেন-অগ্নি প্রোজ্জ্বলক এখানে দলের পক্ষ হইতে আগুন জ্বালাইল। আরেক দল বলেন- الذى এখানে الذين অর্থ প্রকাশের জন্য আসিয়াছে। যেমন কবি বলেন ঃ

وان الذى حانت بفلج دماءهم ـ هم القوم كل القوم يا ام خالد

এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হইল এই, আলোচ্য আয়াতেও দেখিতে পাই আল্লাহ্ তা'আলা একবচন ব্যবহার করিয়া বহুবচনের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি একবচনে فما اضائت

ماحوله এর জবাবে বহুবচনে ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ ব্যবহার করিয়াছেন। তেমনি وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَايُبْصِرُوْنَ আয়াতাংশেও বহুবচনই ব্যবহৃত হইয়াছে। তেমনি صم بكم عمى এর পর فهم لايرجعون ব্যবহার করা হইয়াছে। আরবী ভাষায় এই ধরনের বাক্য সর্বাধিক আলংকারিক বলিয়া বিবেচিত। আয়াতাংশ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ অর্থ যেই আলো তাহাদের কল্যাণ সাধন করিতেছিল তাহা তুলিয়া লওয়া হইল এবং তাহাদের জন্য অবশিষ্ট রহিল ক্ষতিকর ধোঁয়া ও দহন। আর وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ অর্থাৎ যেই সংশয়, কুফর ও নিফাকের অন্ধকারে তাহারা ছিল আবার সেইখানেই নিক্ষিপ্ত হইল। لايبصرون অর্থাৎ এখন আর তাহারা কল্যাণের পথ দেখিতে পায় না, উহা চিনিতেও পারে না। এই চরম দুর্গত অবস্থায় তাহারা صم অর্থাৎ কল্যাণের কথা শুনিতে পায় না, بكم অর্থাৎ তাহারা কল্যাণের কোন কথা বলিতে পারে না, عمى অর্থাৎ তাহারা বিভ্রান্তির অন্ধকারে থাকায় কল্যাণের পথ দেখিতে পায় না। এই অবস্থায় আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاِنَّهَا لَاتَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِى الصُّدُوْرِ "অবশ্য তাহাদের চোখ অন্ধ হয় না, অন্ধ হইয়াছে তাহাদের বুকে নিহিত অন্তরসমূহ।"

সুতরাং لايرجعون অর্থাৎ তাহারা যেই সত্য পথে ছিল উহাতে আর ফিরিয়া যাইতে পারিতেছে না। কারণ, সুপথের বিক্রয়মূল্যে তাহারা বিপথ ক্রয় করিয়াছে।

আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে পূর্বসূরীদের বক্তব্য

ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুর্‌রা আল হামদানী, আবূ সালেহ ও আবূ মালিকের বর্ণনার বরাতে আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীরে বর্ণনা করেন ঃ فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَاحَوْلَهٗ অর্থাৎ মদীনায় দলে দলে লোক যখন নবী করীম (সা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করিল, তখন তাহারাও ইসলামে প্রবেশ করিল। অতঃপর তাহারা মুনাফিক হইল। এই ব্যাপারটি সেই ব্যক্তির মত যে লোক আগুন জ্বালাইয়া চারিদিক আলোকময় করত ভাল-মন্দ দেখিয়া নিজেকে বাঁচাইয়া চলার ব্যবস্থা করিল। হঠাৎ আগুন নিভিয়া গেল। এখন আর সে ভাল-মন্দ দেখিতে পায় না এবং নিজেকে বাঁচাইয়াও চলিতে পারে না। মুনাফিকদের এই দশা। তাহারা শির্কের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। যখন ইসলাম গ্রহণ করিল, ভাল, মন্দ, হালাল, হারাম সবকিছু চিনিতে পাইল। তারপর আবার যখন কাফির হইল, ভাল, মন্দ ও হালাল, হারাম বোধ হারাইল।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বলেন–নূর হইল তাহাদের মুখে উচ্চারিত ঈমানের কথা এবং জুলমাত হইল তাহাদের মুখের কুফরী ও নিফাকের বাক্যাবলী। তাহারা হিদায়েতে ছিল এবং পরে তাহারা পথ হারাইয়াছে।

মুজাহিদ বলেন ঃ فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَاحَوْلَهٗ বলিতে মু'মিনের সঙ্গে হিদায়েতের দিকে তাহাদের অগ্রসর হওয়াকে বুঝায়।

আতা আল খোরাসানী বলেন– مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا আয়াতাংশ হইল মুনাফিকদের উদাহরণ। তাহারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল-মন্দ দেখে ও চিনে বটে; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি

অন্ধ হওয়ায় তাহা কবূল করিতে পারে না। ইকরামা, হাসান, সুদ্দী, রবী', ইবান প্রমুখ হইতে ইব্ন আবূ হাতিম অনুরূপ ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেন।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামও আলোচ্য আয়াতাংশের অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি প্রসঙ্গত আরও বলেন-যখন তাহারা ঈমান আনিল, তাহাদের অন্তরে ঈমানের আলো জ্বলিল, যেভাবে আগুন জ্বালাইলে চারিদিক আলোকিত হয়। তারপর যখন কাফির হইল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ঈমানের আলো বিলুপ্ত করিলেন, যেভাবে আগুন নিভিয়া গেলে আলো বিলুপ্ত হয়। ফলে তাহারা অন্ধকারে পতিত হইয়া কিছুই দেখিতে পাইল না।

ইব্ন জারীরের বক্তব্যের সমর্থনে হযরত আব্বাস (রা) হইতে একটি বর্ণনা 'আলী ইব্ন আবূ তালহা উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন আলোচ্য উপমাটি আল্লাহ্ পাক মুনাফিকদের জন্য প্রদান করিয়াছেন। তাহারা মুখে ইসলামের কথা বলিয়া মুসলমানরূপে গণ্য হয়। তাহাদের সমাজে বিবাহ-শাদী করে। তাহাদের সম্পত্তির ওয়ারিস হয়। তাহাদের গনীমতের মালের অংশ পায়। যখন মুনাফিকদের মৃত্যু হয়, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার এই সম্মান ও অধিকার লোপ করেন। ঠিক আগুন নিভিয়া গেলে যেভাবে আলো লোপ করা হয় তেমনি।

আবুল 'আলীয়া হইতে পর্যায়ক্রমে রবী' ইব্ন আনাস ও আবূ জা'ফর আর রাযী বর্ণনা করেন-আলোচ্য উপমার তাৎপর্য এই যে, আগুন নিভিয়া গেলে যেভাবে আলো চলিয়া যায়, তেমনি মুনাফিকের ঈমানের আলো কুফরীতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। যখন মুনাফিক মুখে কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করে, তখন সে আলো পায়। যখন আবার সংশয় জাগে, অমনি অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়।

যাহ্হাক বলেন ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ। অর্থাৎ তাহারা ঈমানের কথা বলিয়া যে নূর অর্জন করিয়াছিল তাহা আল্লাহ্ তুলিয়া নেন।

আবদুর রায্যাক মা'মারের বরাতে কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন ঃ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ। আয়াতের তাৎপর্য এই যে, কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাহাদিগকে আলো জোগাইল। দুনিয়ায় মু'মিন সাজিল। উহার ফলে তাহাদের পানাহার জুটিল। তাহাদের বিবাহ-শাদীর ব্যবস্থা হইল। জীবন-সম্পদের নিরাপত্তা হইল। যখন মারা যাইবে, আল্লাহ্ তা'আলা সেই আলো কাড়িয়া নিয়া তাহাদিগকে চরম অন্ধকারে নিক্ষেপ করিবেন। ফলে তাহারা কিছুই দেখিতে পাইবে না।

উক্ত আয়াত সম্পর্কে সাঈদ কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন ঃ মুনাফিকরা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিয়া দুনিয়ার জীবন আলোকময় করে। মু'মিনদের সঙ্গে বিবাহ-শাদী করে। তাহাদের গনীমতের সম্পদের ভাগ পায়। তাহাদের সম্পত্তির ওয়ারিস হয়। তাহাদের হাতে জান-মাল নিরাপত্তা পায়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুনাফিক এই পার্থিব আলো হইতে বঞ্চিত হয়। কারণ, তাহার অন্তরে ঈমান নাই। তাহার আমলও সঠিক নহে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে 'আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন ঃ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّايُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী আযাবের অন্ধকারে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন জুবায়র কিংবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ অর্থাৎ তাহারা কুফরীর

অন্ধকার ছাড়িয়া ঈমানের আলোকে আসিয়া সব কিছু দেখিতে পাইতেছিল। অতঃপর আবার কুফরী ও নিফাক গ্রহণ করিয়া সেই আলো নিভাইয়া দিল। ফলে হিদায়েতের পথ দেখিতে পায় না এবং সত্যের উপর কায়েম হইতে পারিতেছে না।

আস্‌ সুদ্দী তাঁহার তাফসীরে স্বসনদে বর্ণনা করেন- وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ অর্থাৎ তাহাদের নিফাকীর অন্ধকারে।

হাসান বসরী বলেন- وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لاَّيُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ মৃত্যুর পর মুনাফিকদের বদ আমলগুলি অন্ধকার হইয়া দেখা দিবে। কোন নেক আমল সে পাইবে না যাহা প্রমাণ দিবে যে, সে কলেমা-গো ছিল। আস্‌ সুদ্দী স্বসনদে বর্ণনা করেন- صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ অর্থাৎ তাহারা বধির, বোবা ও অন্ধ।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে 'আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন ঃ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ অর্থাৎ তাহারা হিদায়েতের কথা শুনে না, সুপথ দেখে না এবং উহা বুঝেও না। আবুল আলীয়া ও কাতাদাহ ইব্‌ন দুআমাও এই মত ব্যক্ত করেন।

فَهُمْ لاَيَرْجِعُوْنَ আয়াতাংশ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হিদায়েতের পথে ফিরিবে না। রবী' ইব্‌ন আনাসও অনুরূপ বলেন।

আস্‌ সুদ্দী স্বসনদে বলেন- فَهُمْ لاَيَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ তাহারা ইসলামে ফিরিয়া আসিবে না। لاَيَرْجِعُوْنَ সম্পর্কে কাতাদাহ বলেন-তাহারা তওবা করিবে না আর উপদেশও লাভ করিবে না।

(١٩) اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ○

(٢٠) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৯. "অথবা আকাশের মেঘ-বৃষ্টির মত যাহাতে অন্ধকার, বজ্র ও বিদ্যুৎ বিদ্যমান। তাহারা মৃত্যুর (বজ্রের) ভয়ে কানে আঙ্গুল দেয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়া আছেন।

২০. যখন বিদ্যুৎ চমকায়, তাহাদের চোখের জ্যোতি লইয়া যায়। যখন আলো দেয় তখন তো চলে, আঁধার হইয়া গেলেই দাঁড়াইয়া থাকে। আল্লাহ্ যদি চাহিতেন, অবশ্যই তাহাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

তাফসীর ঃ ইহা মুনাফিকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় উপমা। এই শ্রেণীর মুনাফিকরা কখনও ইসলামকে সত্য ভাবে, কখনও সংশয়ে ভোগে। তাহাদের অন্তরসমূহ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ও বিশ্বাস-অবিশ্বাসে দোদুল্যমান। الصيب অর্থ বৃষ্টি। ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস, অন্যান্য সাহাবাবৃন্দ, আবুল আলীয়া, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আতা, হাসান বসরী, কাতাদাহ, 'আতিয়া আওফী, 'আতিয়া খোরাসানী, আস্ সুদ্দী ও রবী' ইব্ন আনাস এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

যিহাক বলেন, الصيب অর্থ মেঘ। কিন্তু বৃষ্টি অর্থই খ্যাত হইয়াছে। উহা আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায়ই বর্ষিত হয়। অন্ধকারাচ্ছন্নতাই সংশয়, অবিশ্বাস ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। رعد অর্থ বজ্র, যাহার গর্জন অন্তরে ভয়ের উদ্রেক করে। মুনাফিকদের জন্য অত্যধিক ভীতিপ্রদ ও কম্পন সৃষ্টিকারী। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ 'তাহারা ভাবে, প্রত্যেকটি বজ্রই তাহাদের উপর পড়িবে।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ط وَمَاهُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ - لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاءً اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ -

"তাহারা আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলে, অবশ্যই তাহারা তোমাদের লোক। অথচ তাহারা তোমাদের লোক নহে। অধিকন্তু তাহারা বিভেদ সৃষ্টিকারী দল। যদি তাহারা আশ্রয় পাইত, পাইত কোন গুহা কিংবা প্রবেশস্থল, সেইদিকে ছুটিয়া যাইত এবং উহাতেই ঢুকিয়া পড়িত।"

والبرق অর্থ বিদ্যুৎ ঝলক যাহা এই শ্রেণীর মুনাফিকের অন্তরে মাঝে মধ্যে চমকায় অর্থাৎ ঈমানের আলো দেখা দেয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ - وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ -

অর্থাৎ এই অবস্থায় তাহারা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া পড়ে। মৃত্যু তখন তাহাদের কাছে বজ্রতুল্য মনে হয়। তাহারা কানে আঙ্গুল দিয়া মরণোত্তর জীবনের সুকঠিন শাস্তির কথা এড়াইতে চায়। অথচ আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতা ও ইচ্ছার বাহিরে যাইবার কোন ক্ষমতাই তাহাদের নাই। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ - فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ - بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُّحِيْطٌ -

"তুমি কি ফিরআউন ও ছামূদের বাহিনীর ঘটনা শুনিয়াছ? তাহারা অবিশ্বাসী থাকিয়া দীনকে মিথ্যা বলিয়াছিল। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পিছন হইতে তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিলেন।"

এইরূপ এক প্রসঙ্গেই তিনি বলেন ঃ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ

অর্থাৎ সেই (ঈমানী) বিদ্যুতের কাঠিন্য ও শক্তি তাহাদের চোখে অন্ধকার নামাইয়া আনে। আর তাহাদের দুর্বল দৃষ্টিশক্তি ও শিথিল ঈমান তাহা সহ্য করিতে পারে না।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে 'আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন ঃ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ অর্থাৎ কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতে মুনাফিকদের নাম না বলিলেও তাহাদের সকল পরিচয় ও চক্রান্ত তুলিয়া ধরায় তাহারা চোখে অন্ধকার দেখিতেছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন–আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ অর্থাৎ সত্যের অত্যুজ্জ্বল আলোর ঝলকানি। যখন উহা চমকায় তখন চলে আর যখন লোপ পায় তখন থমকিয়া দাঁড়ায়। মানে, যখন ঈমানের আলো জাগে এবং সেই আলোকে কোন আমল দেখে তো উহা অনুসরণ করে। কিন্তু যখন আবার সংশয় মাথাচাড়া দেয়, তখন অন্ধকার দেখিতে পায় এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া থামিয়া যায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে 'আলী ইব্‌ন তালহা বর্ণনা করেন ঃ كُلَّمَا اَضَاءَلَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ অর্থাৎ মুনাফিকরা যখন ইসলামের বিজয় দেখিতে পায়, তখন নিশ্চিন্ত মনে আগাইয়া আসে। আর যখন ইসলামের উপর কোন বিপদাপদ দেখে, অমনি থমকিয়া দাঁড়ায় এবং কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرُ نِ اطْمَاَنَّ بِهٖ

"একদল লোক (ইসলামের) কিনারায় দাঁড়াইয়া আল্লাহ্র ইবাদত করে। যখন তাহারা ভাল অবস্থা দেখে তখন নিশ্চিন্ত হয়।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র কিংবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ ও ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ

كُلَّمَا اَضَاءَلَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا . অর্থাৎ যখন সত্য চিনিতে পায়, তখন তাহা নিয়া কথা বলে এবং অনুসরণও করে। কিন্তু যখন তাহাদের সংশয়ী মন কুফরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, তখন হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া যায়।

আবুল আলীয়া, হাসান বসরী, কাতাদাহ, রবী' ইব্‌ন আনাস ও আস্ সুদ্দী নিজস্ব সনদে সাহাবায়ে কিরাম হইতে উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। ইহাই সঠিক ও সর্বাধিক পরিচিত ব্যাখ্যা। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

কিয়ামতের দিনেও আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারগণকে প্রত্যেকের ঈমান অনুসারে নূর বা আলো প্রদান করিবেন। তাহারা নিজ নিজ প্রাপ্ত নূরের আলোকে পথ চলিবে। নূরের কম বেশীর উপর চলার দ্রুততা ও মন্থরতা নির্ভর করিবে। একদল এমন হইবে যাহারা কখনও আলো পাইবে, কখনও অন্ধকারে থাকিবে। একদল পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া যাইবে। খালেস মুনাফিকরা আদৌ আলো পাইবে না ; তাহাদের ঈমানের নূর তখন নির্বাপিত থাকিবে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُنْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ج قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ط

"সেইদিন মুনাফিক নর-নারীরা ঈমানদারগণকে বলিবে আমাদিগকেও একটু দেখ, তোমাদের আলোতে আমাদিগকেও চলিতে দাও। বলা হইবে, তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরিয়া আলো জোগাড় কর।'

মু'মিনদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ -

"সেইদিন ঈমানদার নর-নারী দেখিতে পাইবে, তাহাদের সামনে ও ডানে শুধু আলো আর আলো ছড়াইয়া রহিয়াছে। আজ তোমাদের জন্য সুখবর। তাহা হইল নিম্নভাগে ঝর্ণাধারা প্রবহমান জান্নাত।"

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ لَايُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

"সেইদিন আল্লাহ্ তা'আলা নবী ও ঈমানদারগণকে লাঞ্ছিত করিবেন না। তাহাদের সামনে ও ডাইনে নূর ছড়াইয়া থাকিবে। তাহারা বলিবে, হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আমাদের নূর পরিপূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

প্রাসঙ্গিক হাদীসসমূহ

সাঈদ ইব্ন আবূ আরুবা কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন ঃ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ আয়াতটি সম্পর্কে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– মু'মিনদের কাহারাও নূর এত বেশী হইবে যে, মদীনা হইতে এডেন পর্যন্ত স্থান আলোকময় হইবে। কাহারও নূর আবার এত কম হইবে যে, শুধু দুই কদম স্থান আলোকিত হইবে। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম ইমরান ইব্ন দাউদ আল কাত্তান হইতে ও তিনি কাতাদাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

মিনহাল ইব্ন আমর কায়স ইবনুস সুকান হইতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ প্রত্যেক ঈমানদারকে তাহার ঈমান অনুপাতে নূর প্রদান করা হইবে। কেহ একটা খেজুর বৃক্ষ আলোকিত করার মত নূর পাইবে। কেহ আবার তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিমাণ নূর পাইবে যাহা কখনও জ্বলিবে, কখনও নিভিবে।

ইব্ন জারীর ইব্ন মুছান্না হইতে, তিনি ইব্ন ইদরীস হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে তিনি মিনহাল হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা, তাঁহাকে মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ আত্ তানাফেযী ও তাঁহাকে ইব্ন ইদরীস বলেন–আমার পিতা মিনহাল ইব্ন আমর হইতে, তিনি কায়স ইবনুস সুকান হইতে ও তিনি আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ নিজ নিজ আমল মোতাবেক। কেহ পথ চলিবে

পাহাড় পরিমাণ নূর সামনে নিয়া, কেহ খেজুর গাছ পরিমাণ নূর নিয়া এবং ন্যূনতম পরিমাণ হইবে একটি বৃদ্ধাঙ্গুলির সমান নূর। কখনও উহা প্রোজ্জ্বল হইবে, কখনও উহা নির্বাপিত হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিমও বলেন-আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-আহমাযী, তাঁহাকে আবূ ইয়াহিয়া আল হাম্মানী, তাঁহাকে উকবা ইবনুল য়্যাকজান, তাঁহাকে ইকরামা এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন-কিয়ামতের দিন এমন কোন তাওহীদ বিশ্বাসী হইবে না যাহাকে নূর দেওয়া হইবে না। তবে মুনাফিকের নূর নির্বাপিত হইবে, উহা দেখিয়া মু'মিনরা ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিয়া উঠিবে-হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য পূর্ণ নূর প্রদান করুন।

আয্ যিহাক ইব্ন মুযাহিম বলেন-কিয়ামতের দিন দুনিয়ায় ঈমানদার বলিয়া পরিচিত ছিল এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নূর দেওয়া হইবে। কিন্তু যখন পথপ্রান্তে পৌঁছিবে, তখন মুনাফিকের নূর নিভিয়া যাইবে। তখন ঈমানদারগণ ঘাবড়াইয়া বলিবে-হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! আমাদিগকে পূর্ণ পথ চলিবার নূর প্রদান করুন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থিরিকৃত হইল যে, মানুষ কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। খালেস মু'মিন। সূরা বাকারার প্রথম চারি আয়াতে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। খালেস কাফির। তাহাদের বর্ণনা পরবর্তী দুই আয়াতে প্রদত্ত হইয়াছে মুনাফিক। তাহারা দুই শ্রেণীর। খালেস মুনাফিক। আগুন জ্বালানোর উপমা দিয়া তাহাদের পরিচয় তুলিয়া ধরা হইয়াছে। দ্বিধাগ্রস্ত মুনাফিক। কখনও ঈমানের আলোকে প্রদীপ্ত হয়, কখনও কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। তাহাদিগকে বজ্র ও বিদ্যুতের উপমা দিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত দলের অবস্থা হইতে তাহাদের মুনাফেকীর অবস্থা লঘুতর।

এই বর্ণনার সহিত সূরা নূরের বর্ণনার কোন কোন দিকের মিল রহিয়াছে। সেখানে মু'মিনদের উপমা বর্ণনা করা হইয়াছে। মু'মিনের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা যে হিদায়েতের নূর সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাকে কাঁচের চিমনী পরিবৃত্ত প্রদীপের সহিত উপমা দিয়াছেন এবং সেইটিকে উপমা দিয়াছেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের সহিত। উহাই মু'মিনের অন্তরের যথার্থ রূপ। দীপ্ত ঈমান ও নির্ভেজাল পরিচ্ছন্ন শরীঅতের স্থায়ী প্রভাব উহাকে অনুরূপ করিয়াছে। শীঘ্রই এই ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ্ বিস্তারিত আলোচনা আসিতেছে।

অতঃপর সেই সব কাফির বান্দার উপমা প্রদান করা হইয়াছে, যাহারা মনে করে তাহাদেরও ধর্মীয় ভিত্তি রহিয়াছে। আসলে তাহাদের কোনই ভিত্তি নাই। তাহারাই 'জাহিলে মুরাক্কাব' অর্থাৎ ভেজাল মূর্খ। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً حَتّٰى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا -

'কাফিরদের আমলগুলি হইল মরীচিকার মত। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি দেখিয়া পানি মনে করে। যখন কাছে আসে, তখন কিছুই পায় না।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরের দ্বিতীয় দলের উপমা দিলেন। তাহারা হইল নির্ভেজাল মূর্খ।

তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَوْكَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِىٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْدٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَاهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ـ

"অথবা সেই গভীর সমুদ্র গর্ভের অন্ধকারের মত ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে যাহার উপরিভাগ আচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং তাহার উপরে কালো মেঘ, আঁধারের উপর আঁধার-হাত বাহির করিলেও দেখা যায় না। আল্লাহ্ যাহাকে আলো যোগান নাই, তাহার কোন আলো থাকে না।"

কাফিরকে এখানে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অনুসৃত কাফির ও অনুসারী কাফির। সূরা হজ্জের শুরুতে তাহাদের বর্ণনা রহিয়াছে। যেমন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيْدٍ ـ

"একদল মানুষ না জানিয়া আল্লাহ্র ব্যাপারে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং অন্ধভাবে প্রতি ক্ষেত্রে বিতাড়িত শয়তানকে অনুসরণ করে।"

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَاهُدًى وَّلَا كِتَابٍ مُّنِيْرٍ ـ

"একদল মানুষ না জানিয়া আল্লাহ্র ব্যাপারে ঝগড়া করে। না তাহারা হিদায়েতের উপর আছে, না আছে তাহাদের কোন আলোদায়ক গ্রন্থ।"

সূরা ওয়াকিআর শুরুতে ও শেষভাগে তিনি মু'মিনদের শ্রেণীভাগ দেখাইয়াছেন। এই সূরায় তিনি মু'মিনদের দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সাবেকূন বা মুকার্‌রাবূন ও আসহাবে ইয়ামীন বা আবরার।

এসব আয়াতের সারকথা হইল এই ঃ মু'মিন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী হইলেন 'মুকার্‌রাবীন' বা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভকারী প্রিয় বান্দাগণ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছেন 'আবরার' বা সাধারণ স্তরের নেককার বান্দাগণ। তেমনি কাফিররাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী হইল কুফরের দিকে আহ্বানকারী বিশিষ্ট কাফির দল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রহিয়াছে কুফর অনুসরণকারী সাধারণ কাফিররা। মুনাফিকদেরও দুই শ্রেণী রহিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর মুনাফিক সেই সব কট্টর মুনাফিক যাহাদের অন্তরে ঈমানের লেশমাত্র নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনাফিকের অন্তরে কিছু ঈমান থাকিলেও নিফাকের সকল চরিত্র তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ

'মহানবী (সা) বলিয়াছেন-তিনটি চরিত্র যাহার মধ্যে রহিয়াছে সে কট্টর মুনাফিক। আর যাহার মধ্যে উহার একটি চরিত্র পাওয়া যাইবে, সে তাহা বর্জন না করা পর্যন্ত তাহাকে মুনাফিক চরিত্রের লোক বলিতে হইবে। সেই চরিত্র তিনটি হইল (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন সে অঙ্গীকার করে, ভঙ্গ করে (৩) যখন সে আমানত রাখে, খেয়ানত করে।'

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মধ্যে যেমন ঈমানী চরিত্র বিদ্যমান থাকে, তেমনি মুনাফিকী চরিত্রও বিদ্যমান থাকিতে পারে। ইহা যেমন আকীদা-বিশ্বাসে দেখা দিতে পারে, তেমনি দেখা দিতে পারে আমল-আখলাকে। কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় এবং পূর্বসূরী আলিমগণ এই অভিমতই পোষণ করিতেন। ইতিপূর্বে এই ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে উহা ইনশাআল্লাহ্ সবিস্তারে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ নযর ও আবূ মুআবিয়া, শায়বান, লায়ছ, আমর ইব্‌ন মুর্‌রাহ, আবুল বুখতারী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

'মহানবী (সা) বলিয়াছেন—মানুষের আত্মা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর আত্মা প্রদীপের মত উজ্জ্বল এবং হীরকের মত স্বচ্ছ ধবধবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর আত্মা আবৃত ও রুদ্ধ। তৃতীয় শ্রেণীর আত্মা অন্ধত্বের রোগে আক্রান্ত ও চতুর্থ শ্রেণীর আত্মা ঈমান ও নিফাকের সংমিশ্রণে ঘোলাটে বর্ণ। প্রথম শ্রেণীর আত্মা মু'মিনদের যাহা ঈমানের নূরে দীপ্ত-সমুজ্জ্বল। দ্বিতীয় শ্রেণীর আত্মা কাফিরদের যাহাতে আলো প্রবেশের কোন পথ নাই। তৃতীয় শ্রেণীর আত্মা কট্টর মুনাফিকদের যাহা ইসলামের আলো পাইয়াও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। চতুর্থ শ্রেণীর আত্মা সাধারণ মুনাফিকদের যাহাতে ঈমানের আলো ও কুফরীর অন্ধকারের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ঈমানের উদাহরণ হইল সেই সবুজ শসাটি যাহা পবিত্রতম পানির আদ্রতা লাভ করিয়া দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। আর মুনাফিকীর উদাহরণ হইল সেই বিষ ফোঁড়া বা ক্ষতস্থানটি যাহা হইতে অহরহ পুঁজ ও রক্ত প্রবাহিত হয়। সুতরাং এই দুইটি মৌল জিনিসের মধ্যে যেইটি বিজয়ী হয়, সেইটি অপরটির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।' উক্ত হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ ও উত্তম।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলে তাহাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি হরণ করিয়া তাহাদিগকে বধির ও অন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা সকল কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে ইকরামা বা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ, ও ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, সত্যের পরিচয় পাইয়াও যখন তাহারা উহা বর্জন করিল, তখন আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করিতে পারেন। আর اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ এর মর্ম সম্পর্কে তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ শাস্তিদান কিংবা ক্ষমা প্রদর্শন উভয় ব্যাপারেই পূর্ণ ক্ষমতাবান।

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ 'আল্লাহ্ পাক এখানে নিজেকে সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান বলিয়া এই কারণে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুনাফিকগণ যেন তাঁহার শাস্তি প্রদানের সম্ভাবনায় ভীত হইয়া পথে আসে। তাঁহার শাস্তি যে তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহা তিনি এখানে তাহাদের অবহিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে তাহাদের অন্ধ ও বধির করার ক্ষমতা রাখেন তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানে قدير শব্দ قادر অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন عليم বলিয়া عالم অর্থ গ্রহণ করা হয়।'

ইব্‌ন জারীর ও তাঁহার অনুসারী ব্যাখ্যাকারগণ বলেন–আলোচ্য আয়াতের উদাহরণ দুইটি দ্বারা এক শ্রেণীর মুনাফিকের কথাই বুঝানো হইয়াছে। এখানে اَوْكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ আয়াতাংশে او শব্দটি 'ও' বা 'এবং' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যেমন কালামে মজীদের–

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا (তাহাদের পাপ ও কুফরী অনুসরণ করিও না।)

আয়াতে او শব্দ 'ও' বা 'এবং' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা এই আয়াতে او শব্দটি 'ইচ্ছা' ও 'মর্জী' অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ মুনাফিকদের জন্য বর্ণিত উদাহরণদ্বয়ের তোমার ইচ্ছা মাফিক প্রথম উদাহরণ অথবা দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ণনা কর।

ইমাম কুরতুবী বলেন–এখানে او শব্দটি 'সমতুল্য' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন আরবী ভাষায় বলা হয়, جالس الحسن او ابن سيرين (হাসানের নিকট উপবিষ্ট হওয়া ইব্‌ন সিরীনের নিকট বসার সমতুল্য।) আল্লামা যামাখশারীও এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সেক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়ায়, উহাদের জন্য এই দুই উদাহরণের যেইটিই ব্যবহার কর, করিতে পার। কারণ, একটি অপরটির সমতুল্য এবং উভয়টিই তাহাদের জন্য যথার্থ।

আমার (ইব্‌ন কাছীরের) মতে উদাহরণগুলির প্রত্যেকটি মুনাফিকদের শ্রেণী অনুসারে প্রযোজ্য হইবে। কেননা তাহাদের অবস্থাভেদে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা তওবায় ومنهم - ومنهم - ومنهم বলিয়া উহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা ও চারিত্রিক বিভিন্নতা তুলিয়া ধরিয়াছেন। সুতরাং উপরোক্ত উদাহরণদ্বয় উহাদের দুই শ্রেণীর অবস্থা ও চরিত্রের সহিত সাদৃশ্য রাখে। যেমন সূরা নূরে অনুসারী কাফির ও অনুসৃত কাফিরের বর্ণনা প্রথমে وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ (কাফিরদের কাজ মরুর বুকের মায়া মরীচিকার মত) আয়াতে এবং পরে اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ (অথবা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যকার প্রগাঢ় অন্ধকারের মত) আয়াতে প্রদান করা হইয়াছে। সূরা নূরের এই আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে নেতৃস্থানীয় অনুসৃত কাফিরের উদাহরণ বর্ণনা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে গণ্ডমুর্খ অনুসারী কাফিরের উদাহরণ পেশ করা হইয়াছে।

তাওহীদের প্রমাণ

(٢١) يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

(٢٢) الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

২১. হে মানব! তোমরা ইবাদত কর সেই প্রতিপালকের যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন; হয়ত তোমরা মুত্তাকী হইতে পারিবে।

২২. অনন্তর তিনিই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ গড়িয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন। অতএব জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ করিও না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁহার একত্ব ও প্রভুত্বের বর্ণনা দিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টিকুলকে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ববান করিয়া নিজ বান্দাদের প্রতি বদান্যতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নানাবিধ নি'আমাত দান করিয়া তাহাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। পৃথিবীকে বিছানার মত আরামদায়ক করিয়া উহার বিভিন্নস্থানে পাহাড়-পর্বত স্থাপন পূর্বক সুস্থির ও অবিচলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তেমনি আকাশকে তিনি তাহাদের জন্য ছাদরূপে গড়িয়া রাখিয়াছেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাকের অন্যত্র বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّهُمْ عَنْ اٰيَاتِهَا مُعْرِضُوْنَ "আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদরূপে গড়িয়া রাখিয়াছি। অথচ তাহারা উক্ত নিদর্শনাবলী হইতে ঘাড় ফিরাইয়া নেয়।"

পূর্বোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ হইতে পানি বর্ষণ বলিতে ভূ-পৃষ্ঠের প্রয়োজনের সময় মেঘ হইতে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বুঝাইয়াছেন। তিনি মেঘ হইতে বারি সিঞ্চনের সাহায্যে ক্ষেত-খামারের ফসল ও বাগ-বাগিচায় ফল-মূল উৎপন্ন করেন। উহাই মানবকুল ও পশুপাখীর জীবিকায় পরিণত হয়। এই ব্যাপারটি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ـ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ـ

"তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুস্থিররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং আকাশকে গড়িয়াছেন ছাদরূপে। অতঃপর তোমাদিগকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর বিভিন্ন

ভাল ভাল সুস্বাদু খাবার সরবরাহ করিয়াছেন। এই হইলেন তোমাদের আল্লাহ্। অনন্তর বড়ই মেহেরবান সেই নিখিল সৃষ্টির মহান প্রতিপালক।"

বস্তুত এই সকল আয়াতের সারকথা হইল যে, আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। সমগ্র বিশ্বময় বসবাসকারী জীবকুল ও ছড়ানো সীমাহীন সম্পদের একমাত্র প্রভুত্ব ও মালিকানা তাঁহারই। সুতরাং তিনিই ইবাদত লাভের একমাত্র অধিকারী এবং অন্য কাহারও ইহাতে বিন্দুমাত্র অংশ নাই। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দিলেন :

فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ "সুতরাং তোমরা জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার বানাইও না।"

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে : ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন–আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা বড় পাপ কোন্টি? রাসূল (সা) জবাব দিলেন–আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কাহাকেও অংশীদার করা এবং কোন দিক দিয়া কাহাকেও তাঁহার সমকক্ষ ভাবা। অথচ তিনিই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা (অসমাপ্ত)।

তেমনি মু'আয (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে :

নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন–তোমরা জান কি, বান্দার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার বড় দাবী কি? অতঃপর বলিলেন–তাহা হইল একমাত্র তাঁহারই ইবাদত করা এবং কোনভাবেই কাহাকেও তাঁহার অংশীদার না করা।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–তোমরা কখনও এইরূপ বলিও না, আল্লাহ্ ও অমুক যাহা চাহেন, বরং এইরূপ বল, 'যাহা আল্লাহ্ চাহেন' অথবা 'যাহা অমুক চাহেন।'

তোফায়েল ইব্ন সাখবারাহ (উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকার বৈপিত্রেয় ভাই) হইতে যথাক্রমে রবী' ইব্ন হারাশ, আব্দুল মালিক ইব্ন উমায়র ও হাম্মাদ ইব্ন সালামা বর্ণনা করেন :

তোফায়েল ইব্ন সাখবারাহ বলেন–আমি একদিন স্বপ্নে একদল লোক দেখিতে পাইয়া প্রশ্ন করিলাম–তোমরা কাহারা? তাহারা জবাব বলিল–আমরা ইয়াহুদী। অতঃপর আমি প্রশ্ন করিলাম–তোমরা উযায়রকে আল্লাহ্র পুত্র বল কেন? তাহারা পাল্টা প্রশ্ন করিল–'তোমরা 'আল্লাহ্ যাহা চাহেন ও মুহাম্মদ যাহা চাহেন' বল কেন? অতঃপর আরেকদল লোক দেখিতে পাইয়া প্রশ্ন করিলাম–তোমরা কাহারা? তাহারা জবাবে বলিল-আমরা খৃস্টান। আমি প্রশ্ন করিলাম–তোমরা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বল কেন? তাহারা পাল্টা প্রশ্ন করিল–তোমরা আল্লাহ্ ও মুহাম্মদ যহাা চাহেন' বল কেন? অতঃপর সকাল বেলা আমি কয়েকজনকে এই স্বপ্নের কথা বলিলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া সম্পূর্ণ স্বপ্ন বিবৃত করিলাম। রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন–তুমি এই স্বপ্ন আর কাহাকেও শুনাইয়াছ? আমি বলিলাম–হ্যাঁ। তখন তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রসংশা করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিলেন–এই বালক একটি স্বপ্ন দেখিয়াছে, আমি উহা তোমাদিগকে জানাইতেছি। তাহা এই, তোমরা এমন সব কথা বলিয়া থাক যাহা তোমাদেরকে বলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং 'আল্লাহ্ ও মুহাম্মদ যদি চাহেন'–এমন কথা আর কখনও বলিও না। পক্ষান্তরে এইরূপ বল–'একমাত্র আল্লাহ্ পাকের যাহা মর্জী হয়।'

ইব্ন মারদুবিয়্যা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ্ হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মাজাহ্ও আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র হইতে বর্ণিত উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে ইয়াযীদ ইবনুল আসিম ও আল্ আযলাহ ইব্ন আবদুল্লাহ আলকিন্দী ও সুফিয়ান ইব্ন সাঈদ আছছাওরী বর্ণনা করেন ঃ

এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে বলিল-'আল্লাহ্ ও আপনি যাহা চাহেন।' তখন নবী করীম (সা) বলিলেন-তুমি কি আমাকে আল্লাহ্র সমতুল্য করিয়াছ?বরং এইরূপ বল, 'একমাত্র আল্লাহ্ যাহা চাহেন।'

ইব্ন মারদুবিয়্যাও এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ, ইব্ন মাজাহ ও ঈসা ইব্ন ইউনুসও আযলাহ হইতে বর্ণিত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লিখিত হাদীসসমূহে আল্লাহ্ পাকের একত্বের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও সমতুল্য অংশীদার বানাইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ

'ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন-আল্লাহ্ পাক يَـٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ আয়াতটি কাফির ও মুনাফিক উভয় গ্রুপের জন্য নাযিল করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে 'তোমাদের প্রতিপালক শুধু ও তোমাদেরই সৃষ্টিকর্তা নহেন, এমনকি তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তাঁহার সহিত কোন দিক দিয়া কাহাকেও শরীক করিও না এবং এককভাবে তাঁহারই প্রভুত্ব স্বীকার কর।'

فَلَاتَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, 'আল্লাহ্র সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিও না এবং কাহাকেও তাঁহার সমতুল্য ভাবিও না। কারণ, তাহারা তোমাদের ক্ষতি বা উপকার কোনটাই করিতে পারে না। তাহারা তোমাদের প্রতিপালকও নহে এবং তোমাদিগকে ও অন্যান্যকে জীবিকাও সরবরাহ করিতে পারে না। তোমরাও একথা ভালভাবেই জান। তোমরা ইহাও ভাল করিয়া জান যে, আল্লাহ্র রাসূল তোমাদিগকে যে নির্ভেজাল একত্ববাদের আহ্বান জানাইতেছেন, তাহার সত্যতা সম্পর্কে লেশমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।"

কাতাদাহ্ও আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে ইকরামা, শাবীব ইব্ন বাশার, আবূ আসিম, আবূ যিহাক ইব্ন মুখাল্লাদ, আবূ আমর, আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন আবূ আসিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

فَلَاتَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادً আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন-রাতের আঁধারে কাঁকর বিছানো পথে চলমান পিপীলিকার চাইতেও শির্ক অতিশয় গুপ্ত ও সূক্ষ্ম জিনিস। মানুষ বলিয়া থাকে, 'আল্লাহ্র কসম ও তোমার জীবনের কসম! এই কুকুরটি না থাকিলে আমার ঘরে চোর আসিত এবং ঘরে হাঁসগুলি না থাকিলে সবকিছু চুরি হইয়া যাইত, ইত্যাদি। এইগুলি শিরিকী কথা এবং আল্লাহ্র সহিত শরীক করার শামিল। 'যাহা আল্লাহ্ চাহেন ও যাহা তুমি চাহ'-এই ধরনের বাক্যও শিরিকী বাক্য এবং তাওহীদের পরিপন্থী। 'আল্লাহ্ না হইলে এবং তুমি না হইলে (আমার সর্বনাশ হইত)'-এইরূপ কথাও শিরিকী কথা।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে 'আল্লাহ্ যাহা চাহেন এবং আপনার যাহা মর্জী হয়' বলিলে তিনি প্রশ্ন করিলেন-তুমি কি আমাকে আল্লাহ্র সমতুল্য মনে কর?

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক না করিলে তোমরা উত্তম জাতি। কিন্তু তোমরা এইরূপ বলিয়া থাক যে, 'আল্লাহ্ যাহা চাহেন ও অমুকে যাহা চাহেন।' ইহা শিরিকী বাক্য।

আবুল আলিয়্যা বলেন-'আল্লাহ্র সহিত তোমরা কাহাকেও শরীক করিও না এবং কাহাকেও তাঁহার সমতুল্য ভাবিও না।'

রবী' ইব্ন আনাস, কাতাদাহ, সুদ্দী, আবূ মালিক, ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ প্রমুখ মনীষীগণ অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন।

মুজাহিদ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-'আল্লাহ্ তা'আলা যে একক ও অদ্বিতীয় সত্তা এবং কোন দিক দিয়া কেহ তাঁহার সমকক্ষ নহে, একথা তাওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করিয়াও তোমরা জানিতে পাইয়াছ। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও তাঁহার শরীক করিও না।'

ইমাম আহমদ বলেন-আমার কাছে আফ্ফান, তাঁহার কাছে আবূ খলফ মূসা ইব্ন খলফ, তাহার কাছে ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর, তাঁহার কাছে যায়দ ইব্ন সালাম তাহার দাদা আর হারিছুল আশআরী হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'মহানবী (সা) বলিয়াছেন-আল্লাহ্ পাক ইয়াহিয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ)-কে তাঁহার নিজের আমলের ও বনী ইসরাঈলদের আমল করাবার জন্য পাঁচটি কাজের আদেশ দিয়াছিলেন। হযরত ইয়াহিয়া (আ) বেখেয়ালে তাহা বনী ইসরাঈলদের জানাইতে বিলম্ব করায় হযরত ঈসা (আ) তাঁহাকে বলিলেন, আল্লাহ্ পাক আপনার চলার ও বনী ইসরাঈলদের চালাবার জন্য যে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিলেন, তাহা তো এখনও আপনি তাহাদের জানাইলেন না। উহা কি আমি তাহাদের জানাইব? তিনি বিব্রত হইয়া বলিলেন, আমিই জানাইব। আপনি জানাইলে আমার ভয় হয়, আমার উপর আযাব আসিবে, হয়তো যমীন আমাকে গ্রাস করিয়া নিবে। অতঃপর ইয়াহিয়া (আ) বনী ইসরাঈলদের বায়তুল মুকাদ্দাসে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানাইলেন উহা জনসমাগমে পরিপূর্ণ হইল। তখন তিনি মিম্বরে উপবিষ্ট হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা জ্ঞাপন ও গুণগান করিয়া বলিলেন-আল্লাহ্ পাক আমার ও তোমাদের অনুসরণের জন্য পাঁচটি কাজের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

প্রথম কাজটি হইল, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করিবে এবং কাহাকেও তাঁহার সহিত শরীক করিবে না। ইহার উদাহরণ হইল এই যে, এক ব্যক্তি রৌপ্য বা স্বর্ণের বিনিময়ে একটি ভৃত্য ক্রয় করিল এবং তাহাকে আয়-উপার্জনের কাজে নিয়োগ করিল। কিন্তু সে উপার্জিত সম্পদ নিজ প্রভুর বদলে অন্যকে দেয়। তোমরা কি ভৃত্যটির এই আচরণে সন্তুষ্ট হইতে পার? তাই যেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সৃষ্টি করিয়া জীবিকার ব্যবস্থা করিতেছেন, তোমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। দ্বিতীয় কাজটি হইল নামায কায়েম করা। নামাযে যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা এদিক-সেদিক না তাকায়, ততক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার চেহারার দিকে তাকাইয়া থাকেন। সুতরাং তোমরা

এদিক-ওদিক না তাকাইয়া মনোযোগের সহিত নামায পড়িবে। তৃতীয় নির্দেশ হইল, তোমরা রোযা রাখিবে। ইহার উদাহরণ হইল এই যে, এক ব্যক্তির নিকট একটি মিশকের পাত্র রহিয়াছে এবং তাহার সঙ্গীরা উহা হইতে সুঘ্রাণ লাভ করিতেছে। তেমনি রোযাদারের মুখ হইতে আল্লাহ্ তা'আলা মিশক হইতেও বেশী সুঘ্রাণ লাভ করেন। আল্লাহ্ পাকের চতুর্থ নির্দেশ হইল দান-সাদকা করা। ইহার উপমা এই যে, এক ব্যক্তিকে গলায় রশি লাগাইয়া হত্যা করার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে। তখন সে তাহার যাহা কিছু সম্পদ আছে তাহা মুক্তিপণ হিসাবে দিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইল। তোমাদের প্রতি পঞ্চম নির্দেশটি হইল সর্বদা আল্লাহ্ পাকের যিকির করা। ইহার উদাহরণ হইল এইরূপ যে, এক ব্যক্তি তাহার পশ্চাতে দ্রুতগতিতে ছুটিয়া আসা শত্রুর হাত হইতে বাঁচার জন্য একটি সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নিয়া প্রাণে বাঁচিল। মানুষ আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল হইলে শয়তানের আক্রমণ হইতে এইভাবে রক্ষা পাইয়া থাকে।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর মহানবী (সা) বলিলেন-আমিও তোমাদের এমন পাঁচটি কাজের আদেশ দিতেছি যাহা আল্লাহ্ পাক আমাকে করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। উহা হইল সংঘবদ্ধ থাকা, নেতার কথা শ্রবণ করা, নেতার অনুগত হওয়া, আল্লাহ্র জন্য হিজরত করা ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। যে ব্যক্তি সংঘবদ্ধতা ছাড়িয়া এক বিঘত দূরে সরিল, সে তাহার গর্দান হইতে ইসলামের রজ্জু ছুঁড়িয়া ফেলিল। অবশ্য ফিরিয়া আসিলে অন্য কথা। যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের পথে ডাকিবে, সে জাহান্নামের জ্বালানীতে পরিণত হইবে। সাহাবারা প্রশ্ন করিলেন-হে আল্লাহ্র রাসূল? যদি সে নামায রোযা করে, তবুও? মহানবী (সা) জবাব দিলেন-হ্যাঁ, যদিও সে নামায রোযা করে এবং নিজেকে মুসলমান ভাবে, তবুও। আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের যেভাবে মুসলিম, মু'মিন, আল্লাহ্র বান্দা ইত্যাদি নামে সম্বোধন করিয়াছেন, তোমরাও তাহাদের সেই সব নামে সম্বোধন করিবে। কখনও জাহিলী নামে ডাকিবে না।'

মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে 'সহীহ-হাসান' বলিয়াছেন। এই হাদীস দ্বারা তাওহীদ প্রমাণিত হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং রিযিকের ব্যবস্থা করিতেছেন, সুতরাং তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না।'

ইমাম রাযী সহ অনেক তাফসীরকার এই হাদীস দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। উর্ধ্বজগত ও নিম্ন জগতের সৃষ্টিকুল, সৃষ্টিকুলের আকৃতি-প্রকৃতির অশেষ বৈচিত্র্য, বিশ্বপ্রকৃতি ও উহার সুশৃঙ্খল রীতি-নীতি এবং অজস্র কল্যাণকর ব্যবস্থাপনা মহাকুশলী সৃষ্টিকর্তার কুদরত ও হিকমতের নিদর্শনরূপে সর্বত্র বিরাজমান।

ইমাম রাযী বলেন ঃ জনৈক নিরক্ষর আরবের কাছে আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ চাওয়া হইলে সে উত্তর দিল, না দেখিয়া যেভাবে আমরা উটের অস্তিত্ব এবং পায়ের দাগ দেখিয়া আগন্তুকের আগমনের কথা বুঝিতে পাই, সেভাবেই গ্রহ-নক্ষত্রপূর্ণ আকাশ, বৈচিত্র্য বিমণ্ডিত পৃথিবী ও তরঙ্গায়িত সমুদ্রের লীলাখেলা দেখিয়া আল্লাহ্র অস্তিত্ব উপলব্ধি করি।

ইমাম রাযী আরও বলেন ঃ বাদশাহ হারুন অর রশীদ ইমাম মালিক (র)-এর নিকট আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ জানিতে চাহিলে তিনি জবাব দিলেন-মানুষের ভাষা, কণ্ঠস্বর ও সুর বৈচিত্র্যের মধ্যেই আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ বিদ্যমান।

তেমনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে কতিপয় নাস্তিক আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি জবাব দিলেন-'এসব কথা এখন রাখ। আমি এখন অন্য এক চিন্তায় নিমগ্ন। একদল

লোক বলিয়া গেল, বাণিজ্যিক মালামাল বোঝাই বিরাট এক নৌকা আপন হইতেই চলিতেছে এবং সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা নির্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। অথচ উহার কোন চালক নাই।' প্রশ্নকারী নাস্তিকগণ বলিল, আপনি কি চিন্তায় অযথা সময় নষ্ট করিতেছেন? কোন জ্ঞানী লোকের পক্ষে কি এমন কথা বলা সম্ভব? এত বড় নৌকা তরঙ্গসংকুল সমুদ্রে নাবিক ছাড়া কি করিয়া চলিতে পারে? তখন ইমাম আবূ হানীফা (র) বলিলেন, তোমাদের জ্ঞানের কথা ভাবিয়া আমারও অনুশোচনা জাগে। একটি নৌকা যদি নাবিক ছাড়া না চলিতে পারে, তাহলে এই বিশাল ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডলী ও উহার অসংখ্য সৃষ্টিকুল কি করিয়া পরিচালক ছাড়া সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে পারে? জানিয়া রাখ, সেই পরিচালকই হইলেন নিখিল সৃষ্টির স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক আল্লাহ্ তা'আলা। নাস্তিকরা তাঁহার জবাবে বিস্মিত ও হতভম্ব হইল এবং জবাবের সারবত্তা ও সত্যতা উপলব্ধি করিয়া মুসলমান হইয়া গেল।

ইমাম শাফেঈ (র)-এর কাছে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হইলে তিনি জবাব দিলেন—তুত গাছের পাতা এক, তার রং এক, স্বাদ এক, রসও এক। গরু ছাগল, হরিণ, মাকড়, মক্ষিকা, গুটি পোকা ইত্যাকার বহু প্রাণী ও কীট-পতঙ্গ উহার পাতা খায় ও রস পান করে। অথচ গুটি পোকা দেয় রেশম, মক্ষিকা দেয় মধু, ছাগল-গরু দেয় দুধ ও গোবর এবং হরিণ মিশ্‌ক উপহার দেয়। একই পাতায় এভাবে বিভিন্ন উপাদান সৃষ্টির পেছনে কি কোন কুশলী স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভূত হয় না? তিনিই আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর নিকট এক সময় আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দাবী করা হইলে তিনি জবাব দিলেন—মনে কর, এখানে এমন একটি সুদৃঢ় দুর্গ রহিয়াছে যাহার কোন দরজা-জানালা নাই। এমনকি কোন ছিদ্রও নাই। দুর্গটির বহির্ভাগ রৌপ্যের ও অভ্যন্তরভাগ স্বর্ণের প্রভায় দীপ্যমান। ডান-বাম ও উপর-নীচ সব দিক দিয়াই দুর্গটি আবদ্ধ। উহাতে জীব-জানোয়ার তো দূরের কথা, বায়ুও প্রবেশ করিতে পারে না। হঠাৎ উহার একটি দেয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িল। অমনি উহা হইতে চক্ষু-কর্ণ বিশিষ্ট সুন্দরকায় এমন একপ্রাণী বাহির হইল যাহারা কণ্ঠে রহিয়াছে মন ভুলানো মিষ্টি মধুর কল-কাকলী। বলতো সেই আবদ্ধ দুর্গে সৃষ্ট এই জীবের কোন স্রষ্টা রহিয়াছেন কিনা? সেই সৃষ্টিকর্তাই হইলেন মানব সত্তার অতীত এক মহান সত্তা। তাঁহার ক্ষমতা ও শক্তি কি সীমিত, না সীমাহীন? তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

ইমাম সাহেব ডিমকে দুর্গের সহিত তুলনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের পক্ষে ইহা একটি বড় প্রমাণ। আবূ নুআস (র)-এর কাছে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হইলে তিনি জবাব দিলেন—

تأمل فى نبات الارض وانظر - الى اثار ما صنع المليك - عيون من لجين شاخصات باحداق هى الذهب السبيك - على قضب الزبرجد شاهدات - بان الله ليس له شريك -

আকাশ হইতে বারিবর্ষণ, উহা দ্বারা ধরার বুকে ফসল, ফলমূল ও গাছপালা-তরুলতার জন্মলাভ ও কচি-কচি ডগায় নানাবিধ ফুলের সমারোহ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বের অকাট্য প্রমাণ।'

ইবনুল মু'তায বলেন–

فيا عجبا كيف يعصى الا له ام كيف يجحده الجاحد ۔ وفى كل شىء له اية
۔ تدل على انه واحد ۔

'আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণের কথা ভাবিলে মনে বিস্ময় সৃষ্টি হয়। মানুষ কতই না বেপরোয়া হওয়ার প্রয়াস চালায়। অথচ তাহার আশে পাশের প্রত্যেকটি বস্তুই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বের সাক্ষ্য দিতেছে।'

মহামানবগণ বলিয়াছেন–আকাশমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং উহার উচ্চতা ও প্রশস্ততা এবং হাতে বিচরণশীল সমুজ্জ্বল গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে তাকাও। এদিক-সেদিক প্রবহমান নদ-নদীগুলি পর্যবেক্ষণ কর। দেখ, উহারা কিভাবে স্বীয় স্রোতধারার মাধ্যমে ক্ষেত-খামারের ফসল আর বাগ-বাগিচার গাছপালা ও ফল-মূলের তৃষ্ণা মিটাইয়া যমীনকে সবুজ শ্যামল করিয়া তোলে। ক্ষেত্র-খামার ও বাগিচার ফসল ও ফল-মূলের দিকে তাকাইয়া দেখ, উহারা কিভাবে একই পানির কল্যাণে বিচিত্র রং, রূপ, ঘ্রাণ, স্বাদ লাভ করিতেছে। এমনকি সেইগুলির উপকারীতায়ও রহিয়াছে অশেষ বৈচিত্র। বস্তু জগতের বৈচিত্র্য বিমণ্ডিত এই সৃষ্টিকুল তাহাদের ভাষায় প্রতিনিয়ত জানাইতেছে যে, তাহাদের এক মহান কুশলী সৃষ্টিকর্তা রহিয়াছেন এবং সেই সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয় বলিয়াই এত সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্তভাবে সব কিছু চলিতেছে। এইসব সৃষ্টি প্রত্যেকটি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির সামনে আল্লাহ্‌র অশেষ মহত্ত, অসীম ক্ষমতা, অপরিসীম দয়া ও অনাবিল প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার অনুপম ও অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন তুলিয়া ধরিতেছে। তাঁহার এতসব নজীরবিহীন নি'আমাত কি তাঁহার সীমাহীন বদান্যতার পরিচয় দেয় না? আমরা কায়মনে বিশ্বাস করি, তিনি ব্যতীত আর কোন প্রতিপালক নাই। তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই আমাদের উপাস্য প্রভু। তিনিই আমাদের একমাত্র রক্ষক ও ত্রাণকর্তা। তাই তিনি ব্যতীত আর কোন সত্তা আমাদের অবনত মস্তকে প্রদত্ত সিজদা লাভের যোগ্য নহে। হে দুনিয়ার মানুষ! আমি একমাত্র তাঁহারই দয়ার উপর নির্ভরশীল। আমার যাহা কিছু আশা ভরসা একমাত্র তাঁহারই কাছে। আমার মাথা অবনত করা ও উত্তোলন করা একমাত্র তাঁহারই দরবারে। আমার সকল প্রত্যাশা তাঁহারই কৃপার সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহারই দয়া ও অনুগ্রহের আশায় কেবলমাত্র তাঁহারই নাম জপনা করিতেছি।

কুরআনের চ্যালেঞ্জ

(٢٣) وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص
وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(٢٤) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَ
الْحِجَارَةُ ۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝

২৩. আমি আমার বান্দার উপর যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমাদের সন্দেহ সৃষ্টি হইয়া থাকিলে, তোমরা উহার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর। তোমাদের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের অন্য যত প্রভু আছে তাহাদেরও ডাকিয়া লও।

২৪. তারপরও যদি না পার এবং কখনই পারিবে না, তখন সেই আগুনকে ভয় কর যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও প্রস্তর। উহা কাফিরদের জন্যই প্রস্তুত করা হইয়াছে।

তাফসীর ঃ তাওহীদ ও একত্ববাদের আলোচনার পর আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূলের রিসালাত এবং নবূওতের সত্যতা ও শুদ্ধতা প্রথাসিদ্ধ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাই তিনি কাফিরদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আমার বান্দা মুহাম্মদের প্রতি আমি যে কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহা সম্পর্কে তোমাদের যদি সংশয় সৃষ্টি হইয়া থাকে যে, উহা আল্লাহ্র কথা নহে, মুহাম্মদ নিজেই উহার রচয়িতা, তাহা হইলে কুরআনের কোন সূরার মত একটি সূরা রচনা করিয়া তোমরা দেখাও। এই ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যে কোন ব্যক্তি বা শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে পার। কিন্তু তোমরা সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারাও তাহা পারিবে না।

ইব্ন আব্বাস (রা) উপরোক্ত আয়াতের شهداءكم শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, শব্দটির অর্থ হইল 'তোমাদের সাহায্যকারী' অর্থাৎ তোমাদের সাহায্যকারীগণকে অনুরূপ সূরা প্রণয়নের কাজে ডাক।

আবূ মালিকের উদ্ধৃতি দিয়া সুদ্দী বলিয়াছেন, শব্দটির অর্থ হইল তোমরা যাহাদিগকে আল্লাহ্র অংশীদার বানাইয়াছ, তাহাদিগকে ডাক। অর্থাৎ অন্য যতসব সহায়তাকারী তোমাদের রহিয়াছে তাহাদেরকে, এমনকি আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের যে সকল মা'বূদ রহিয়াছে তাহাদিগকেও ডাকিয়া সকলে মিলিয়া অনুরূপ একটি সূরা তৈরি কর।

উক্ত শব্দের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলিয়াছেন, ইহা দ্বারা আরবী ভাষাবিদ পণ্ডিত ও আরবের শাসকবর্গকে বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কবি-সাহিত্যিক ও কর্ণধার-পরিচালক মণ্ডলীকে এই কাজে সাহায্যের জন্য ডাকিয়া লও। কিন্তু ডাকিলেও লাভ হইবে না, সূরা তো দূরের কথা, একটি লাইনও রচনা করিতে সক্ষম হইবে না।

আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের বহুস্থানে এইভাবে চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ পাক সূরা আল-কাসাসে বলেন ঃ

قُلْ فَأْتُوْا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ -

"হে নবী! বলিয়া দাও, যদি তোমাদের দাবী সত্য হয়, তবে তাওরাত ও কুরআনের চাইতে অধিক পথ প্রদর্শনকারী কোন কিতাব আল্লাহ্র নিকট হইতে নিয়া আস। আমিও সেই কিতাবকে অনুসরণ করিব।"

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا -

"হে নবী! জানাইয়া দাও, সমগ্র মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায় একত্রিত হইয়াও যদি কুরআনের ন্যায় গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত হয়, তবুও অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবে না। যদিও সকলের সমবেত প্রচেষ্টা উহাতে নিয়োজিত হয়।"

আল্লাহ্ পাক সূরা হূদে ঘোষণা করেন ঃ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ـ

"তাহারা কি বলিতেছে যে, তুমি নিজেই এই কুরআন রচনা করিয়াছ? তুমি বল, তোমরা উহার মত দশটি সূরা রচনা করিয়া দেখাও এবং সেই কাজে আল্লাহ্ ব্যতীত যদি কেহ ক্ষমতা রাখে, তাহাকেও ডাকিয়া লও–যদি তোমাদের দাবী সত্য হইয়া থাকে।"

আল্লাহ্ পাক সূরা ইউনুসে বলেন ঃ

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ـ

"এই কুরআন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও মনগড়া রচনা নহে। পরন্তু ইহা পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহকে সত্যায়িত করে। আর ইহা সবিস্তারে বর্ণিত কিতাব। নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের তরফ হইতে অবতীর্ণ এক সংশয় মুক্ত কিতাব। তাহারা কি ইহাকে মিথ্যা বলিতেছে? তুমি বল, কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করিয়া দেখাও। আল্লাহ্ ব্যতীত যদি কাহারও ক্ষমতা থাকে তাহাকেও ডাকিয়া যদি পার তাহা হইলেও তোমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণ কর।"

এই ধরনের আয়াত প্রথমে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়া মক্কাবাসীকে জব্দ করিয়া কুরআন ও কুরআনের নবীর বিশুদ্ধতা ও সত্যতা প্রমাণ করে। অতঃপর মদীনায়ও একই উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আয়াতটির অন্তর্গত مثله শব্দের সর্বনাম দ্বারা কি বুঝানো হইয়াছে তাহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। এক দলের মতে এই সর্বনাম দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হইয়াছে। তখন আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় কুরআনের সূরার মত কোন সূরা রচনা করিয়া দেখাও।' অপর দল বলেন, উক্ত সর্বনামটি দ্বারা মহানবী (সা)-কে বুঝানো হইয়াছে। সেক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়ায়–'মুহাম্মদের মত নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে যদি এরূপ সূরা তৈরি করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তোমরাও করিয়া দেখাও।'

প্রথম অভিমতের প্রবক্তা হইলেন মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র)। ইব্ন জারীর, তাবারী, যামাখশারী, ইমাম রাযী প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত উমর, ইব্ন মাসঊদ, ইব্ন আব্বাস (রা) ও হাসান বুসরী (র) সহ অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ হইতেও এই অভিমতেরই সমর্থন মিলে।

প্রথমোক্ত অভিমতের প্রাধান্য লাভের আরও কারণ আছে। এক, ইহা দ্বারা এককভাবে ও সমবেতভাবে উভয় পন্থায়ই সকলের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষিত অশিক্ষিতের যেমন পার্থক্য করা হয় নাই, তেমনি পার্থক্য করা হয় নাই আহলে কিতাব-গায়ের আহলে কিতাবেরও। সুতরাং ইহা নিরক্ষরদের প্রতি চ্যালেঞ্জের তুলনায় ব্যাপক ও সার্বজনীন। দুই. উপরোক্ত অন্য আয়াতে 'অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করিয়া দেখাও' বাক্যাংশটিও প্রমাণ করে যে, উক্ত সর্বনামটির ইঙ্গিত কুরআনের প্রতি, মুহাম্মদের প্রতি নহে। তিন, কুরআনের এই বারংবার চ্যালেঞ্জে আরবী ভাষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক যাহার সাহায্য নিয়া সম্ভব তাহাদের সকলকেই শামিল করার আহ্বান জানানো হইয়াছে। তাই ইহা বিশেষ শ্রেণীর চ্যালেঞ্জ নহে; বরং সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি সর্বকালের জন্য সার্বিক চ্যালেঞ্জ। ফলে বারংবার ইহার উল্লেখ আসিয়াছে এবং পরিশেষে সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে,তোমরা পার নাই আর কখনও পারিবে না।' মূলত মক্কা ও মদীনার তদানীন্তন সুধীমণ্ডলী চরম বিরোধী মনোভাব রাখিয়াও এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। কুরআন কিংবা উহার দশটি সূরা অথবা উহা ক্ষুদ্রতম সূরাটির কোন আয়াতের অনুরূপ কিছু রচনা করিতেও অপারগ রহিয়াছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা لَنْ تَفْعَلُوْا (কখনই পারিবে না) ঘোষণা দ্বারা চ্যালেঞ্জের উপসংহার টানিলেন।

لَنْ تَفْعَلُوْا শব্দে ব্যাকরণবিধি অনুসারে ভবিষ্যৎ কালের নিশ্চিত না সূচক (نفى تاكيد) অব্যয় لن ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা কুরআন পাকের অন্যতম মু'জিযা। একমাত্র কুরআনই নির্দ্বিধায় সর্বকালের স্বীয় অবিসংবাদিতার ঘোষণা দিতে পারে। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে এইরূপ রচনা কখনও কাহারো পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভবপর নহে। নিখিল সৃষ্টির যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁহার রচনার সমকক্ষ কিছু রচনা করা কোন সৃষ্টির পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইবে? কুরআন নিয়া যাহারা গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করিয়াছে, তাহারা একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, ইহার ভাষাশৈলীগত বাহ্যিক রূপ ও মর্মগত আত্মিক স্বরূপ উভয় দিক দিয়াই ইহা অতুলনীয় ও অবিসংবাদিত। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

"الٓرٰ - كِتَابٌ اُحْكِمَتْ اٰيَاتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ" "ইহা এমন কিতাব যাহার আয়াতগুলি প্রথমে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। অতঃপর মহাজ্ঞানী ও মহাসংবাদ দাতার তরফ হইতে উহার বিশদ রূপ দান করা হইয়াছে।"

তাই কুরআনের ভাষা অত্যন্ত সুসংবদ্ধ ও উহার মর্ম অতিশয় ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। ভাব ও ভাষা উভয় দিক দিয়াই উহা নজীরবিহীন ও বিস্ময়কর। সমগ্র জগত উহার সমকক্ষতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অপারগতার স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। উহাতে একদিকে যেমন অতীতের ইতিহাস যথাযথভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলীও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হইয়াছে। ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দ সম্পর্কিত সকল কিছুই সুনিপুণভাবে উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাই আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করিলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً "তোমার প্রতিপালক তাঁহার বাণীকে সত্য ও সঙ্গতভাবেই পূর্ণাঙ্গতা দান করিয়াছেন।"

অর্থাৎ সংবাদদাতা হিসাবে সত্য সংবাদ ও বিধান দাতা হিসাবে ন্যায়ানুগ বিধান প্রদান করিয়াছেন। ইহার প্রতিটি বিষয়ই সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড ও পথ প্রদর্শক। ইহাতে কোন

রূপকথা, কিংবদন্তী ও কিংবা কাল্পনিক মিথ্যাচারের লেশমাত্র নাই। মিথ্যা ও কল্পনার ছড়াছড়ি ছাড়া কবিদের কাব্যগাথা রচিত হয় না। উহা ছাড়া নাকি তাহাদের কবিতা-কাব্যের আকর্ষণ উৎকর্ষ সৃষ্টি হয় না। তাই জনৈক কবি বলেন ঃ أَعْجَبُهُ أَكْذَبُهُ

অর্থাৎ কল্পনাপ্রসূত মিথ্যার প্রলেপ যত বেশী থাকিবে, কবিতার সৌন্দর্য, কমনীয়তা, মাধুর্য ও মাদকতা ততই বিকশিত হইবে ও পাঠককুলের কাছে তত বেশী সমাদৃত হইবে। উহার অবর্তমানে কবিতা হইবে নিষ্প্রাণ ও ব্যর্থ। তাই বড় বড় কবিরা বিরাট বিরাট কাব্য নারীর রূপ-গুণকীর্তন, পানীয় ও পানপাত্রের বিবরণ, উট-ঘোড়ার সৌন্দর্য বর্ণনা, ব্যক্তি বিশেষের প্রশংসা অর্চনা, যুদ্ধ বিগ্রহের লোমহর্ষক কাহিনী ও বিস্ময়কর চাতুর্যকলা কিংবা ভীতিপ্রদ রোমাঞ্চকর গল্প-গুজবে ভরপুর। উহা দ্বারা কবির শিল্প সৌকর্য ও অন্তর্লীণ মনোবিকারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে বটে; কিন্তু মানব সমাজ আদৌ উপকৃত হয় না। গোটা কাব্যের দু'একটি পংক্তি ছাড়া সবটুকুই অর্থহীন প্রলাপে পর্যবসিত হয়।

পক্ষান্তরে আল্-কুরআনের আগাগোড়া অত্যন্ত উঁচুমানের বাকভঙ্গী ও অতুলনীয় ভাষালংকারে সমুজ্জ্বল ও অনুপম উপমায় সুষমামণ্ডিত প্রতীয়মান হইবে। আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ও গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষী মণ্ডলীই কেবল কুরআনের ভাষাশৈলী ও ভাব সম্পদের গভীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ। কুরআন যখন কোন সংবাদ পরিবেশন করে, হউক তাহা দীর্ঘ কিংবা হ্রস্ব, একবারের জায়গায় যদি তাহা বারংবারও বলা হয়, তথাপি উহার স্বাদ ও মাধুর্যে বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে না। যতই পাঠ করিবে ততই যেন অনির্বচণীয় এক স্বাদে চিত্ত উত্তরোত্তর আপ্লুত হইয়াই চলিবে। উহার পৌনঃপুনিক পাঠে যেমন সাধারণ পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। তেমনি অসাধারণ পাঠকরাও বিন্দুমাত্র অস্বস্তিবোধ করেন না।

আল্-কুরআনের সতর্ক বাণী ও ভীতি প্রদর্শনমূলক বক্তব্যসমূহ অবলোকন ও অনুধাবন করিলে সুকঠিন মানবাত্মা তো দূরের কথা, সুদৃঢ় পর্বতমালা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত ও প্রকম্পিত না হইয়া পারে না। তেমনি উহার আশ্বাসবাণী ও পুরস্কার বিবরণী অবলোকন ও অনুধাবন করিলে অন্ধ মনের বন্ধ দুয়ার প্রলুব্ধ ও উন্মুক্ত হইয়া যায়, রুদ্ধ কর্ণ কুহরও প্রত্যাশ্যার পদধ্বনি শুনিতে পায় আর মৃত অন্তরাত্মা ইসলামের অমিয় সুধা পানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই সব কিছু মিলিয়া অজান্তে হৃদয়রূপ বেতারযন্ত্রে বাজিয়া ওঠে আরশের আকাশ বাণীর প্রচারিত আল্লাহ্ প্রেমের মন মাতানো রাগ-রাগিণীর সুমধুর সুর লহরী। এখানে কয়েকটি আয়াত উদাহরণ স্বরূপ পেশ করিতেছি। যেমন উদ্দীপক বাণী ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

"নেক কাজের প্রতিদানে নয়ন জুড়ানো কি জিনিস নয়নের অগোচরে বিরাজ করিতেছে তাহা কেহই জানে না।"

অথবা ঃ

وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الاَعْيُنُ - وَاَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ -

"উহাতে (জান্নাতে) মনের চাহিদা মিটানো আর নয়নের পরিতৃপ্তি লাভের সমস্ত ব্যবস্থাই বিদ্যমান। সেখানে তোমাদের অবস্থান হইবে চিরন্তন।"

কিংবা ভীতিপ্রদ বক্তব্য ঃ

اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ "ভূখণ্ডের কোন এক দিক তোমাদের সহ ধ্বসিয়া যাওয়া সম্পর্কে তোমরা কি নিশ্চিন্ত হইয়া গেলে?"

অথবা ঃ

ءَاَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ - اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا - فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ -

"তোমরা কি উর্ধ্বজগতের সেই প্রবলতম সত্তার ব্যাপারে নির্ভিক হইলে, যিনি তোমাদিগকে অকস্মাৎ ভূমি সহ ধ্বসাইয়া দিবেন? তোমরা কি মহাকাশের সেই মহাপ্রতাপান্বিত সত্তার ব্যাপারে বেপরোয়া হইলে, যিনি মহাশূন্য হইতে কঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন? শীঘ্রই এই সতর্কতার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবে।"

কিংবা হুঁশিয়ারীমূলক ঃ

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْبِهِ "আমি প্রত্যেককেই পাপের জন্য পাকড়াও করি।"

অথবা ঃ

اَفَرَأَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنَا هُمْ سِنِيْنَ ثُمَّ جَاءَ هُمْ مَاكَانُوْا يُوْعَدُوْنَ - مَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ -

"তুমি কি দেখ নাই আমি বেশ কয়েক বৎসর তাহাদিগকে ফায়দা লুটিবার সুযোগ দিয়াছি। অতঃপর তাহাদের সামনে প্রতিশ্রুত ব্যাপার হাজির হইয়াছে। তখন ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাহাদের কোন উপকারে আসে নাই।"

আল-কুরআনকে এইভাবে ভাব ও ভাষায় সুসমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত করা হইয়াছে। ইহার বিষয় বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। ভাষালংকারের ঔজ্জ্বল্য, উপদেশের প্রাচুর্য, যুক্তি প্রমাণের অজস্রতা ও তত্ত্বজ্ঞানের বহুলতা কুরআনকে গ্রন্থ জগতে অবিসংবাদীতা দান করিয়াছে। বিধি-নিষেধের বাণীসমূহকে অত্যন্ত ন্যায়ানুগ, কল্যাণকর, আকর্ষণীয় ও প্রভাবময় করা হইয়াছে। ইব্ন মাসউদ (রা) সহ অনেক বিশেষজ্ঞ মনীষী বলিয়াছেন–'ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানূ' শুনার সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগের সহিত কান পাতিয়া পরবর্তী বক্তব্য শুন। কারণ, উহার পর হয় কোন কল্যাণের পথে ডাকা হইবে, নয় তো কোন অকল্যাণ হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হইবে।

আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ

يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ -

'(আল-কুরআন) তাহাদিগকে ন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করিতে নিষেধ করে এবং তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তুসমূহ অবৈধ করে আর পায়ের বেড়ী ও গলার ফাঁস হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দেয়।'

আল-কুরআনের কিয়ামত সম্পর্কিত আয়াতসমূহ সেই দিনের বিভীষিকাময় বর্ণনা, জান্নাতের সীমাহীন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিবরণ, জাহান্নামের অপরিসীম দুঃখ দুর্দশার চিত্র, নেককারদের বিভিন্ন লোভনীয় পুরস্কার ও বদকারদের নানাবিধ ভয়াবহ শাস্তি, পার্থিব জগতের সঞ্চয়-সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অসারতা ও পারলৌকিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অবিনশ্বরতা ইত্যাকার শিক্ষা ও কল্যাণমূলক আলোচনায় ভরপুর। এই সব বর্ণনা মানুষকে ন্যায়ের পথে উদ্বুদ্ধ করে, হৃদয়কে সন্ত্রস্ত ও বিগলিত করে এবং শয়তানের প্ররোচনাসৃষ্ট অন্তরের কালিমা ধুইয়া-মুছিয়া সাফ করিয়া দেয়।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ মানুষের আস্থা লাভের জন্য প্রত্যেক নবীকে কিছু কিছু মু'জিযা দান করা হইয়াছে। আমার মু'জিযা হইল আল-কুরআন। তাই আমি আশা রাখি যে, অন্যান্য নবীর তুলনায় আমার উম্মতের সংখ্যা অধিক হইবে। (কারণ, অন্যান্য নবীর মু'জিযা তাহাদের ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আল-কুরআন মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের পরেও বর্তমান রহিয়াছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত উহা বহাল থাকিবে।)

উপরোক্ত হাদীসে মহানবী (সা)-এর উক্তি 'আমার মু'জিযা হইল আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ'-এর তাৎপর্য এই যে, তাঁহাকে প্রদত্ত আল-কুরআন সর্বকালের সকল মানুষের কাছে অবিসংবাদী গ্রন্থরূপে বিরাজ করিবে। কোন কালের কোন মানুষই ইহার শ্রেষ্ঠত্বের কাছে মাথা নত না করিয়া পারিবে না। এই অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আর কোন আসমানী গ্রন্থের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। তাই আল-কুরআন যুগে যুগে মহানবী (সা)-এর নবূওতকেও সত্যায়িত করিয়া চলিবে। অবশ্য আল কুরআন ছাড়াও মহানবী (সা)-এর অন্যান্য মু'জিযা রহিয়াছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আল-কুরআনের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত ও মু'তাযিলা শাস্ত্রবিদগণ অনেক যুক্তি প্রমাণ তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাহাদের বক্তব্যের সারকথা হইল এই, কুরআন মূলতই সৃষ্টিকর্তার অবতীর্ণ কিতাব বিধায় কোন সৃষ্টির পক্ষে উহার মত কিছু রচনা করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই উহার অপ্রতিদ্বন্দ্বীতা সুপ্রমাণিত সত্য। পক্ষান্তরে যদি তর্কের খাতিরে মানিয়া লওয়া হয় যে, কুরআন স্রষ্টার অবতীর্ণ গ্রন্থ নহে, তাই উহার মত কিছু রচনা করা কোন সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব, তাহা হইলেও কুরআনের বারংবার চ্যালেঞ্জ সত্ত্বের উহার কট্টর বিরোধীরাও অদ্যাবধি উহার মত কিছু রচনা করিতে চরম অপারগতা প্রকাশ করায় কুরআনের অপ্রতিদ্বন্দ্বীতা সুপ্রমাণিত সত্যে পরিণত হইল। ইমাম রাযী এই প্রসঙ্গে কুরআনের ক্ষুদ্রতর সূরা 'আল আস্‌র'-এর অনুরূপ কিছু রচনা করিতেও বিরুদ্ধবাদীদের ব্যর্থতার কথা সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছেন।

আলোচ্য وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ আয়াতাংশের وقودها শব্দের, و অক্ষরটি যবর দিয়া পাঠ করা হয়। তাই ইহার অর্থ হইতেছে 'যাহা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়।' যেমন কাষ্ঠ। কুরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَاَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا । "জালিমগণ জাহান্নামের কাষ্ঠে পরিণত হইবে।"

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ - لَوْ كَانَ هٰؤُلَاءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا - وَكُلٌّ فِيْهَا خَالِدُوْنَ -

"তোমরা এবং তোমাদের উপাস্যমণ্ডলী অবশ্যই জাহান্নামের কাষ্ঠে পরিণত হইবে। তোমরা সকলেই উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে। তোমাদের উপাস্যরা যথার্থ প্রভু হইলে কখনই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইত না অথচ উহারা হইবে জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা।"

এখানে حجارة বলিতে সুকঠিন বিশাল কালো গন্ধক পাথরকে বুঝানো হইয়াছে। উহা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইলে উহার উত্তাপ তীব্রতর ও স্থায়ী হয়। ইহা হইতে আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে রক্ষা করুন।

আবদুল মালিক ইব্ন মাইসারাহ আয যাররূদ, আবদুর রহমান ইব্ন ছাবিত ও আমর ইব্ন মায়মূন ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ الحجارة। অর্থ বিরাট কালো গন্ধক পাথর। আল্লাহ্ পাক আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির সময়ই কাফিরদের জন্য উহা সৃষ্টি করিয়া প্রথম আসমানে রাখিয়া দিয়াছেন।' ইব্ন জারীরও একই ভাষায় হাদীসটি বর্ণনা করেন। আবূ হাতিমও উহা উদ্ধৃত করেন। হাকিম স্বীয় 'মুস্তাদরাক'-এ উহা বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তমাফিক হইয়াছে।

আস্ সুদ্দী আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবূ মালিক, আবূ সালেহ, ইব্ন আব্বাস ও মুররাহ ইব্ন মাসউদ ও একদল সাহাবা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। উহাতে বলা হয়-আয়াতাংশের অর্থ হইল, 'তোমরা সেই অনলকুণ্ড হইতে বাঁচিয়া থাক যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর।" এখানে পাথর বলিতে কালো গন্ধক পাথরের কথা বুঝানো হইয়াছে। উহা দ্বারা আগুন প্রজ্বলিত করিয়া শাস্তি দেওয়া হইবে।

মুজাহিদ বলেন ঃ মৃত লাশের দুর্গন্ধের চাইতেও গন্ধক পাথরের দুর্গন্ধ তীব্রতর হইবে।

আবূ জা'ফর ইব্ন আলী বলেন ঃ এখানে পাথর দ্বারা গন্ধক পাথর বুঝানো হইয়াছে।

ইব্ন জুরায়জ বলেন ঃ জাহান্নামে কালো গন্ধক পাথর থাকিবে। আমাকে আমর ইব্ন দীনার বলিয়াছেন-ইহা দ্বারা বিশাল কালো গন্ধক পাথরের কথা বলা হইয়াছে।

একদল ব্যাখ্যাকার বলেন ঃ الحجارة বলিতে মূর্তি ও প্রতিমায় ব্যবহৃত পাথরের কথা বলা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ "নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের অন্যান্য উপাস্য প্রভুরা জাহান্নামের কাষ্ঠ হইবে।"

ইমাম কুরতুবী এই অভিমত ব্যক্ত করেন। ইমাম রাযীও এই অভিমতের প্রবক্তা। তাঁহারা উভয়েই এই ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। তাহারা বলেন-গন্ধক পাথর দ্বারা আগুন জ্বালানো কোন নতুন কথা নহে। সুতরাং এখানে প্রতিমা ও দেব-দেবীর আকার বিশিষ্ট পাথর হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

অবশ্য তাহাদের এই যুক্তি যথাযথ নহে। কারণ, গন্ধক পাথরের জ্বালানো আগুন অন্যান্য বস্তুর সাহায্যে জ্বালানো আগুনের তুলনায় অনেক বেশী তীব্র। উহার উত্তপ্ততা ও দহন ক্ষমতা সর্বাধিক। সুতরাং প্রথমোক্ত অন্যান্য ব্যাখ্যাকারের অভিমতই গ্রহণযোগ্য। মূলত আয়াতের

উদ্দেশ্য হইল জাহান্নামীদের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নির উত্তপ্ততা ও দহন ক্ষমতার তীব্রতা বর্ণনা করা। সেক্ষেত্রে প্রতিমা-মূর্তির সাধারণ পাথরের চাইতে গন্ধক পাথর বহুগুণ বেশী কার্যকর। তাই প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَا هُمْ سَعِيْرًا "যখন অগ্নি শিখার তীব্রতা কমিয়া যায়, তখন আমি উহা বাড়াইয়া দেই।"

ইমাম কুরতুবীও এই মতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহার মতে এখানে সেই পাথরকেই বুঝানো হইয়াছে যাহা আগুনের তীব্রতা ও দহন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর। কারণ, জাহান্নামীদেরকে কঠোর শাস্তিদান এখানে উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর নিকট হইতে বর্ণিত অনেক হাদীস পাওয়া যায়। একটি হাদীস এই ঃ

كل مـؤذ فى النار ইহার অর্থ দুইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এক. 'মানুষকে কষ্টদায়ক প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাইবে।' দুই. 'জাহান্নামে প্রত্যেক শ্রেণীর কষ্টদায়ক বস্তু থাকিবে।' অবশ্য হাদীসটি ত্রুটিমুক্ত ও সুপরিচিত নহে।

أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই যে, জাহান্নাম কাফিরদের জন্য তৈরি করিয়া রাখা হইয়াছে। এখানে اعدت এর অন্তর্গত সর্বনামটির ইঙ্গিত সুস্পষ্টতই মানুষ ও পাথর দ্বারা প্রজ্বলিত জাহান্নামের দিকে। অবশ্য উক্ত সর্বনামটি পাথরের স্থলাভিষিক্তও হইতে পারে। তখন অর্থ দাঁড়ায়, পাথরগুলি কাফিরদের শাস্তি প্রদানের জন্য তৈরি করিয়া রাখা হইয়াছে। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে অনুরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। মূলত এই অর্থ দুইটির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। একটি অপরটির পরিপূরক ও পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আগুন ছাড়া যেমন পাথর জ্বলে না, তেমনি পাথর ছাড়া আগুনের দহন ক্ষমতা বাড়ে না। সুতরাং উভয় বস্তুইও কাফিরদের কঠোর শাস্তি বিধানের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইব্‌ন ইসহাক এই মর্মে একটি হাদীস মুহাম্মদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন–কাফিরদের জন্য সেইগুলি প্রস্তুত রাখা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতাংশ দ্বারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ইমামগণ প্রমাণ দেন যে, 'সৃষ্টির সূচনাকাল হইতেই জাহান্নাম তৈরি করিয়া রাখা হইয়াছে।' জাহান্নাম যে বাস্তব আকারে বর্তমানে রহিয়াছে তাহার প্রমাণ অনেক হাদীস দ্বারাই পাওয়া যায়। যেমন–জান্নাত ও জাহান্নামের ঝগড়ার বর্ণনা, জাহান্নামের প্রার্থনা মোতাবেক উহাকে বৎসরে শীত ও গ্রীষ্মে দুই বার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের অনুমতি প্রদানের বর্ণনা ইত্যাদি। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, আমরা একটি বিকট শব্দ শুনিয়া মহানবী (সা)-এর নিকট উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন ঃ

'ইহা সত্তর বৎসর পূর্বে জাহান্নামের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত পাথরের জাহান্নামে পতিত হওয়ার আওয়াজ।' তেমনি সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কিংবা মি'রাজের ঘটনাবলী বর্ণনামূলক হাদীসসমূহেও প্রমাণ মিলে যে, আল্লাহ্ পাক জান্নাত ও জাহান্নাম তৈরি করিয়া রাখিয়াছেন। তবে মু'তাযিলাগণ অজ্ঞাতবশত ইহা স্বীকার করে না। অবশ্য স্পেনের কাজী মান্যার ইব্‌ন সাঈদ আল বালুতী ইহা স্বীকার করিয়াছেন। মু'তাযেলী হইয়াও তিনি জান্নাত-জাহান্নাম বর্তমান থাকিবার অভিমত সমর্থন করিয়াছেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ আলোচ্য আয়াতাংশ ও সূরা ইউনুসের بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ আয়াতাংশের বক্তব্য হইতেই বুঝা যায় যে, কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ উহার ছোট বড় যে কোন সূরার বেলায়ই প্রযোজ্য। কারণ, ব্যাকরণবিদদের মতে শর্তের সহিত অনির্দিষ্ট বিশেষ্য যুক্ত হইলে উহার যে কোন অংশের ক্ষেত্রেই উহা প্রযোজ্য, বিশেষ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে না। সুতরাং ছোট বড় সকল সূরাই যে অবিসংবাদিতার দাবীদার তাহা প্রমাণিত হইল। তাই এই ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারগণ শ্রেণী নির্বিশেষে মতৈক্য পোষণ করেন।

ইমাম রাযী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে উহার মীমাংসা প্রদান করেন। তিনি বলেন ঃ যদি প্রশ্ন করা হয় যে, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ চ্যালেঞ্জের আওতায় সূরা আল্ আসর, সূরা কাওসার ও সূরা কাফিরূন-এর মত ক্ষুদ্র সূরা শামিল করা হইলে এই ধরনের কিংবা উহার কাছাকাছি সূরা রচনা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। সেক্ষেত্রে এগুলিকে চ্যালেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করা দীনের উপর অপবাদ চাপানোর নামান্তর নহে কি? ইহার জবাবে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই সকল সূরা যদি ভাষালংকারের বিচারেও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়া চলে তাহা হইলেও আমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। অবশ্য এই জবাব আমাদের নিকট দুর্বলতর বিবেচিত হইতে পারে। উহার আরেক জবাব হইল এই, যদি তাহা সম্ভব বলিয়া আপাতত মানাও হয়, তথাপি উহার চরম বিরুদ্ধবাদীরাও উহা করিতে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হওয়ায় আমাদের দাবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের প্রধান যুক্তি হইল এই যে, স্রষ্টার ছোট বড় কোন বাণীর সমকক্ষ বাণী সৃষ্টি করা কোন সৃষ্টির পক্ষে আদৌ সম্ভব নহে।

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, মানুষ যদি শুধু সূরা আল্ কাওসার নিয়া চিন্তা-ভাবনা করে তাহা হইলেই কুরআনের যে কোন অংশের অবিসংবাদী হওয়া সম্পর্কে তাহারা নিশ্চিত হইতে পারে। আমর ইবনুল আস (রা) হইতে আমাদের কাছে এই বর্ণনা পৌঁছিয়াছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদল প্রতিনিধিসহ মুসায়লামাতুল কায্যাবের কাছে গিয়াছিলেন। মুসায়লামা তাহাকে প্রশ্ন করিল–তোমাদের মক্কার বন্ধুর নিকট সদ্য কি কোন ওহী নাযিল হইয়াছে? তিনি জবাব দিলেন–হ্যাঁ, তাহার নিকট অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ এক অনুপম সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে। সে প্রশ্ন করিল–উহা কি? তিনি জবাবে সূরা আল্ কাওসার পাঠ করিলেন। সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল–আমার উপরও তদ্রূপ একটি সূরা নাযিল হইয়াছে। তিনি প্রশ্ন করিলেন–তাহা কোন সূরা? সে জবাবে পাঠ করিল ঃ

يا وبر يا وبر - انما انت اذنان وصدر - وسائرك حقرفقر -

"হে ইঁদুর! হে ইঁদুর! তোর আছে শুধু দুইটি কান ও বুক। আর তো সবই তোর নগণ্য ও হীন।"

উহা পাঠান্তে সে জিজ্ঞাসা করিল–সূরাটি কিরূপ হে আমর! তিনি জবাব দিলেন–আল্লাহ্র কসম! তুমি অবশ্যই জান যে, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানি।

(٢٥) وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ۗ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৫. যাহারা ঈমানদার ও নেক কাজ করিয়াছে, তাহাদিগকে সেই জান্নাতের সুসংবাদ দাও যাহার নিম্নভাগে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। যখন তোমাদিগকে উহা হইতে ফলমূল খাইতে দেওয়া হইবে, তখন বলিবে, ইহা তো আমাদিগকে পূর্বেও দেওয়া হইত; দৃশ্যত তাহাদিগকে পূর্বানুরূপ ফলমূলই দেওয়া হইবে। সেখানে তাহাদের জন্য পূত-পবিত্র স্ত্রীগণ রহিয়াছে এবং তাহারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ও রসূলের দুশমনদের কুফরী ও নিফাকের জন্য নির্ধারিত কঠোর শাস্তি ও লাঞ্ছনার বর্ণনা প্রদানের পরক্ষণেই স্বীয় বন্ধুদের ঈমানদারী ও নেক আমলের অশেষ মর্যাদা ও পুরস্কারের বর্ণনা প্রদান করিতেছেন। এই কারণেই কুরআন পাক 'মাছানী' নামে অভিহিত বলিয়া একদল আলিম অভিমত প্রকাশ করেন। এই অভিমতটি সঠিক। আমি যথাস্থানে সবিস্তারে ইহা আলোচনা করিব। উহাতে দেখাইব, কুরআনে সাধারণত ঈমানের পাশাপাশি কুফরীর, সৎ কাজের পাশাপাশি অসৎ কাজের, ভালর পাশাপাশি মন্দের, জান্নাতের পাশাপাশি জাহান্নামের এক কথায় পরস্পর বিপরীত বিষয়গুলি পাশাপাশি উল্লেখ করা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-'নেককার ঈমানদারদের খবর দাও, তাহাদের জন্য রহিয়াছে পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান জান্নাত।' এখানে জান্নাতের অবস্থান ও উহার কিছু পরিচয় তুলিয়া ধরা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, উহার বাগ-বাগিচা ও ঘর-বাড়ী বিরাজমান এবং সেইগুলির পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান রহিয়াছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-জান্নাতের পাদদেশে প্রবহমান নহরগুলি (লেকের মতই) অগভীর হইবে, আর হাউজে কাওছারের দুই তীরে লালা-মতির গড়া বিরাট প্রাসাদ সাজানো রহিয়াছে। উহার মাটি মিশ্কে আম্বরের সুগন্ধে ভরপুর। উহার পথে বিছানো কাঁকরগুলো হইল লাল-জহরত, পান্না-চুন্নি সদৃশ। আমরা আল্লাহ্র কাছে উহার প্রত্যাশী। তিনি পরম করুণাময় ও অশেষ দানশীল।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন-আমাকে রবী' ইব্ন সুলায়মান বর্ণনা করেন, তাঁহাকে আসাদ ইব্ন মূসা, তাঁহাকে আবূ ছওবান, তাঁহাকে আতা ইব্ন কুর্রা ও তাঁহাকে আব্দুল্লাহ ইব্ন জমরা হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে এই হাদীসটি শুনান ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, জান্নাতের নহরগুলি টিলার তলদেশ কিংবা মিশ্কের পাহাড়ের পাদদেশে হইতে প্রবাহিত হয়।"

আবূ হাতিম আরও বলেন-আমাদের নিকট আবূ সাঈদ ওয়াকী' আ'মাশ হইতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মুর্রাহ হইতে ও তিনি মাসরূক হইতে এই হাদীসটি শুনান ঃ জান্নাতের নদী-নালা মিশকের পাহাড় হইতে প্রবাহিত হইতেছে।

كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ مِنْ قَبْلُ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা সুদ্দী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও একদল সাহাবা হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্রাহ, ইব্ন আব্বাস, আবূ সালেহ ও আবূ মালিক বর্ণিত এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন ঃ

"পূর্বেও আমাদিগকে ইহা দেওয়া হইয়াছে"–কথাটির তাৎপর্য এই যে, পার্থিব জগতের ফল-মূলের অনুরূপ ফলমূল জান্নাতে পাইয়া তাহারা বলিবে, ইহা তো আমরা দুনিয়াতেও পাইয়াছিলাম। কাতাদাহ এবং আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামও এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ইব্ন জারীরও এই ব্যাখ্যা সমর্থন করেন।

قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইকরামা বলেন–ইহার অর্থ হইল, 'গতকাল যাহা পাইয়াছিলাম, আজও তাহাই পাইলাম।' রবী' ইব্ন আনাস এই ব্যাখ্যার সমর্থক। উহার ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন–'ইহা পূর্বের মতই দেখায়।' ইব্ন জারীরও এই ব্যাখ্যা সমর্থন করেন। অন্যান্য ব্যাখ্যাকার বলেন, জান্নাতে প্রদত্ত ফলমূলের পারস্পরিক সাদৃশ্য এত বেশী থাকিবে যে, ভিন্ন ভিন্ন ফলমূল দেখিয়াও জান্নাতীরা বলিবে, ইহাতো পূর্বেও পাইয়াছি।

وَاُوْتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا আয়াতাংশ সম্পর্কে সুনায়দ ইব্ন দাউদ বলেন–আমাদের কাছে মাসীসার শায়েখ আওযাঈর বরাতে ইয়াহিয়া ইব্ন কাছীরের এই বর্ণনাটি শুনান ঃ জান্নাতীগণকে খাঞ্চাপূর্ণ আহার্য দান করা হইলে উহা ভক্ষণ করিবে। অতঃপর অন্য আহার্য প্রদান করা হইলে তাহারা বলিবে, এই বস্তুই তো আমাদিগকে পূর্বে দেওয়া হইত। তখন ফেরেশতাগণ বলিবেন–আকার-আকৃতি একরূপ হইলেও স্বাদ ও প্রকৃতি ভিন্ন।

ইমাম আবূ হাতিম বলেন–আমাদিগকে আমার পিতা, তাঁহাকে সাঈদ ইব্ন সুলায়মান ও তাঁহাকে আমির ইব্ন ইয়াসাফ ইয়াহিয়া ইব্ন কাছীর হইতে এই বর্ণনা শুনান ঃ জান্নাতের তৃণ হইবে জাফরানী রঙের এবং উহার টিলাগুলি মিশকের ঘ্রাণে ভরপুর হইবে। গেলমানগণ খাঞ্চা ভরা ফল-মূল লইয়া জান্নাতীদের কাছে ঘুরিতে থাকিবে। জান্নাতীরা উহা হইতে আহার করিবে। দ্বিতীয়বার অনুরূপ ফল-মূল লইয়া আসিলে তাহারা বলিবে, ইহাতো তোমরা একটু আগেই আমাদিগকে খাওয়াইয়াছ। তখন গেলমানরা বলিবে–ইহা খাইয়া দেখুন, রঙ-রূপ এক দেখা গেলেও স্বাদ-স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। وَاُوْتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا -এর তাৎপর্য ইহাই।

وَاُوْتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا প্রসঙ্গে আবূ জা'ফর রাযী রবী' ইব্ন আনাসের বরাত দিয়া আবুল আলীয়া হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'জান্নাতের ফলমূলসমূহ বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হইলেও স্বাদ হইবে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।' ইব্ন আবূ হাতিম, রবী' ইব্ন আনাস ও সুদ্দী হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম ইব্ন জারীর সুদ্দীর সনদে বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। ইব্ন মাসউদও একদল সাহাবা হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্রাহ, ইব্ন আব্বাস, আবূ সালেহ, আবূ মালিক ও সুদ্দীর বরাতে বর্ণনা করেন ঃ জান্নাতী ফলমূলের পারস্পরিক সাদৃশ্যতা হইবে বাহ্যিক আকার-আকৃতির, স্বাদ-প্রকৃতির নহে। ইব্ন জারীর এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন।

ইকরামা বলেন-বেহেশ্‌তের ফলমূল দুনিয়ার ফলমূলের সহিত দৃশ্যত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে বটে, কিন্তু দুনিয়ার ফলমূলের চাইতে বেহেশ্‌তের ফলমূল অনেক উত্তম হইবে।

সুফিয়ান ছাওরী আ'মাশ হইতে, তিনি আবূ জবিয়ান হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'দুনিয়ার কোন বস্তুই জান্নাতের কোন বস্তুর মত হইবে না, কেবলমাত্র নাম ছাড়া। অন্য এক হাদীসেও ইহার সমর্থন মিলে। উহাতে বলা হইয়াছে, 'দুনিয়ার কোন বস্তুই জান্নাতে পাওয়া যাইবে না, শুধু উহার নাম পাওয়া যাইবে।' বর্ণনাটি আবূ মু'আবিয়া হইতে ছওরী ও ইব্‌ন আবূ হাতিমের মাধ্যমে ইব্‌ন জারীর উদ্ধৃত করেন। আলোচ্য আয়াতাংশ প্রসঙ্গে আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম বলেন-জান্নাতীরা দুনিয়ার ফলমূলের মতই জান্নাতী ফলমূল দেখিয়াও বলিতে পারিবে, উহা আঙ্গুর, ইহা আপেল ইত্যাদি। তাই তাহারা বলিবে, ইহাতো আমরা দুনিয়াতেও খাইয়াছি। সুতরাং জান্নাতের ফলমূল দৃশ্যত দুনিয়ার ফলমূলের মতই হইবে, তবে স্বাদ হইবে ভিন্নতর।

لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বরাত দিয়া ইব্‌ন আবূ তালহা বলেন- জান্নাতের দম্পতি সর্বপ্রকার অপবিত্রতা ও কষ্ট হইতে মুক্ত হইবে। মুজাহিদ বলেন ঃ তাহারা ঋতুস্রাব, মল-মুত্র, সর্দি-কাশি, বীর্য-প্রসূতি ইত্যাকার সকল ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত থাকিবে। কাতাদাহ বলেন- জান্নাতের দম্পতিগণ দৈহিক ও আত্মিক সর্ববিধ অপবিত্রতা হইতে মুক্ত থাকিবেন। তিনি অপর এক বর্ণনায় বলেন ঃ তাহাদের ঋতুস্রাব কিংবা অন্য কোনরূপ কষ্ট-ক্লেশ থাকিবে না। আতা, হাসান, যিহাক, আবূ সালেহ, আতিয়্যা ও সুদ্দী প্রমুখ হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্‌ন জারীর বলেন- আমার কাছে ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা ও ইব্‌ন ওহাব আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম হইতে বর্ণনা করেন ঃ জান্নাতের হুরগণ এমন পূত-পবিত্র হইবেন যে, তাহাদের কখনও ঋতুস্রাব হইবে না। হযরত হাওয়া (আ)-কে তদ্রূপ সৃষ্টি করা হইয়াছিল। তাই তিনি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিলে আল্লাহ্‌ পাক তাহাকে বলেন ঃ আমি তোমাকে জান্নাতে পূত-পবিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলাম। শীঘ্রই তোমাকে এই (গন্দম) বৃক্ষের মতই ঋতু প্রভাবাধীন ও ফলপ্রসূ করিব। অবশ্য হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল (গরীব)।

হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়্যাহ বলেন ঃ নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ সাঈদ খুদরী (রা), আবূ নাজরাহ, কাতাদাহ, শু'বা আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক, আব্দুর রায্‌যাক ইব্‌ন উমর আল বাযীঈ, মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ আলকিন্দী, আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল খাওয়ারী ও জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হরবের বর্ণিত একটি হাদীস ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেন। উহাতে বলা হয়- وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ আয়াতাংশ সম্পর্কে নবী করীম (সা) বলেন, জান্নাতীরা মল-মূত্র, হায়েয-নিফাস, সর্দি-কাশি, থুথু-বমি ইত্যাকার ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র ও মুক্ত হইবে।

এই হাদীসটিও সনদের দিক দিয়া দুর্বল (গরীব)। অবশ্য হাকিম স্বীয় 'মুস্তাদরাক' সংকলনে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াকূব, আল হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আফ্‌ফান ও মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দের ধারাবাহিক সনদে উক্ত হাদীস উদ্ধৃত করিয়া বলেন- হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ। কিন্তু, তাঁহার এই দাবী পর্যালোচনা সাপেক্ষ বটে। কারণ, আব্দুর রায্‌যাক ইব্‌ন আমর আল বাযীঈ বলিয়াছেন, এই হাদীসের অন্যতম রাবী আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান আল্‌ বুস্তীর বর্ণনাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ নহে।

এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, এই হাদীসের বর্ণনার সহিত ইতিপূর্বে উদ্ধৃত কাতাদার বর্ণিত হাদীসের সুস্পষ্ট মিল রহিয়াছে। وَهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল এই, জান্নাতীরা উহাতে অনন্তকাল অবস্থান করিবে এবং ইহাই সৌভাগ্যের পূর্ণতা বটে। এই স্থানের মতই ইহার নিয়ামতসমূহও চিরস্থায়ী। এখানে মৃত্যু ও বিলুপ্তির বিভীষিকা চিরতরে অন্তর্হিত। জান্নাতীগণ এই স্থান ও ইহার নিয়ামত হইতে কখনও বঞ্চিত হইবে না। এখানে অনন্তকাল পর্যন্ত তাহারা অজস্র নিয়ামত ভোগ করিতে থাকিবে। মহা মহীয়ান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদিগকে জান্নাতীগণের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি অসীম দয়ালু ও অপরিসীম দাতা।

কুরআনে প্রদত্ত উপমা ও ইহার প্রতিক্রিয়া

(٢٦) إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهٖ إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۝

(٢٧) الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۠ وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ أَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মশা কিংবা তদুর্ধ্ব কিছু দ্বারা উদাহরণ দিতে লজ্জা পান না। অনন্তর যাহারা ঈমানদার, তাহারা জানেন, নিশ্চয় উহা তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে আগত সত্য। পক্ষান্তরে যাহারা কাফির, তাহারা বলে, এই (তুচ্ছতম) উদাহরণ পেশের ভিতর আল্লাহ্র কি অভিপ্রায় রহিয়াছে? (এইভাবে) অনেককে উহা দ্বারা পথভ্রষ্ট রাখেন ও অনেককে আবার পথপ্রাপ্ত করেন। মূলত ফাসিকগণ ব্যতীত কাহাকেও পথভ্রষ্ট রাখেন না।

২৭. তাহারাই আল্লাহ্র সহিত সুদৃঢ় ওয়াদা করিয়া উহা ভঙ্গ করিয়াছে এবং আল্লাহ্র নির্দেশিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে ও পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারাই নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত।'

তাফসীর ঃ ব্যাখ্যাকার আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে ইব্ন মাসউদ ও একদল সাহাবা (রা) হইতে মুর্রা, ইব্ন আব্বাস, আবূ সালেহ্ ও আবূ মালিকের পর্যায়ক্রমিক একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। উহাতে বলা হয়– মুনাফিকদের উপমা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাকের অবতীর্ণ। مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا আয়াত ও أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ আয়াত সম্পর্কে মুনাফিকরা প্রশ্ন তুলিল, মহান আল্লাহ্ কখনও এই সব নগণ্য ও ক্ষুদ্র উপমা পেশ করিতে পারেন না। এই প্রশ্নের জবাবেই উপরোক্ত আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়।

মুআম্মার ও কাতাদাহর উদ্ধৃতি দিয়া আবদুর রায্যাক বলেন ঃ

আল্লাহ্ পাক যখন পাক কালামে মাকড়শা ও মশা-মাছির উপমা পেশ করেন, তখন মুশরিকগণ বলিল, আল্লাহ্র কালামে মাকড়শা ও মশা-মাছির মত ক্ষুদ্র কীট-পতংগের উপমা দেওয়া হইবে কেন? তখন আল্লাহ্ পাক إِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحْيِ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا আয়াত নাযিল করেন।

কাতাদাহর বরাত দিয়া সাঈদ বলেন– আল্লাহ্ পাক সত্য প্রকাশের জন্য ছোট বড় যে কোন বস্তুর উল্লেখ করিতে সংকোচ বোধ করেন না। পাক কালামে মাকড়শা ও মশার উল্লেখ করা হইলে ভ্রান্ত লোকরা বলিল, এহেন ক্ষুদ্র বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করার ভিতর আল্লাহ্র কি অভিপ্রায় থাকিতে পারে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা إِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحْيِ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا আয়াত নাযিল করেন।

(আমার বক্তব্য) পূর্বোল্লেখিত কাতাদাহর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে। আসলে তাহা ঠিক নহে। পরে কাতাদাহর উদ্ধৃতি দিয়া সাঈদ যাহা বর্ণনা করেন তাহাই সঠিক মনে হইতেছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন জারীরও মুজাহিদের বরাতে কাতাদাহ হইতে বর্ণিত দ্বিতীয় ভাষ্যের অনুরূপ ভাষ্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম বলেন– হাসান ও ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ হইতেও সুদ্দী ও কাতাদাহর অনুরূপ ভাষ্য বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে আবূ জা'ফর রাযী রবী' ইব্ন আনাসের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন– আল্লাহ্ পার্থিব ভোগ বিলাসমত্ত দুনিয়াদার লোকদিগকে সতর্ক করার জন্য এই উদাহরণ পেশ করেন যে, মশা যতক্ষণ উপবাস থাকে, ততক্ষণ উহা বাঁচিয়া থাকে এবং যখনই সে আহার করিয়া মোটা-তাজা হয়, তখনই তাহার মৃত্যু হয়। উপমাটির তাৎপর্য এই যে, দুনিয়াদার মানুষ ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকিয়া যখন ফুলিয়া ফাঁপিয়া মোটা-তাজা হইতে থাকে, তখন অকস্মাৎ তাহাদের উপর আল্লাহ্র গজব পতিত হয়।

যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ 'যখন তাহারা আমার উপদেশের কথা ভুলিয়া যায়, তখন তাহাদের জন্য আমি প্রত্যেকটি বস্তুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেই।'

ইব্ন জারীরও অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন আবূ হাতিম, রবী' ইব্ন আনাস ও আবুল আলীয়া হইতে আবূ জা'ফর বর্ণিত হাদীসেও অনুরূপ অভিমতের সমর্থন মিলে।

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল নিয়া যে বিভিন্ন মত দেখা যায়, তাহার কোন্টি সত্য তাহা আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। তবে ইব্ন জারীর সুদ্দীর বিবরণকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, তাহার বর্ণনা পূর্ববর্তী আয়াতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত উক্ত আয়াতাংশের অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা ছোট বড় যে কোন বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করিতে সংকোচ বোধ করেন না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহা বর্ণনা করিতে ভীত হন না।

এই আয়াতাংশে مَا শব্দটি স্বল্পতা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আরবী ব্যাকরণের 'বদলের' নিয়মমাফিক بعوضة শব্দটি জবরের স্থানে অবস্থান করিতেছে। আরবীতে لاضربن ضربا ما অর্থ হইল 'আমি অবশ্যই খুব অল্প মারিব।' সুতরাং এখানে مَا দ্বারা ক্ষুদ্রকায় বস্তু

বুঝানো হইয়াছে। অথবা এখানে بعوضة শব্দটি অনির্দিষ্ট বিশেষ্য এবং بعوضة শব্দটি উহার বিশেষণরূপে আসিয়াছে। ইব্‌ন জরীরের মতে এখানে ما শব্দটি اسم موصول (সংযোজক বিশেষ্য) এবং بعوضة শব্দটি তদনুসারে হরকত গ্রহণ করিয়াছে। আরবী ভাষায় ما ও من শব্দদ্বয় নিজ নিজ অবস্থানুসারে صله -কে হরকত প্রদান করে। কারণ, উহা কখনও نكره হয় এবং কখনও আবার معرفه হয়। হাস্‌সান বিন ছাবিতের একটি পংক্তিতে উহার ব্যবহার লক্ষ্যণীয় ঃ

يكفى بنا فضلا على من غيرنا ـ حب النبى محمدايانا ـ

(মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য ভালবাসায় আমাদের অন্তর যে পরিপূর্ণ, অন্যান্যের উপর আমাদের মহত্ত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য ইহাই যথেষ্ট।)

কাহারও মতে, এখানে জেরদায়ক শব্দ উহ্য থাকায় بعوضة জবর বিশিষ্ট হইয়াছে। মূল বাক্যটি এইরূপ ছিল ঃ مَثَلاً مَّا بَيْنَ بَعُوْضَةً الى مَا فَوْقَهَا

ব্যাকরণবিদ কাসাঈ ও ফার্‌রা এই অভিমত পোষণ করেন। যিহাক ও ইবরাহীম ইব্‌ন আবলাহ্ পেশ দিয়া بعوضة পড়েন। ইব্‌ন জিন্নীর মতে بعوضة সংযোজক বিশেষ্য ما -এর صله হিসাবে বিরাজ করিতেছে। যেমন কালামে পাকে আছে ঃ تماما على الذى احسن 'পুণ্যবানকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে।'

সিবুওয়াই বলেন, এখানে ما শব্দটি الذى শব্দের সমার্থক। সুতরাং ইহার অর্থ এই দাঁড়ায়, 'সমালোচক তোমার নিকট যাহা বলে আমি তদ্রূপ নহি।'

বস্তুত এখানে فما فوقها -এর অর্থ সম্পর্কে দুইটি মত দেখা যায়। প্রথম মত হইল এই, ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার দিক দিয়া ইহা হইতেও ক্ষুদ্রতর ও তুচ্ছতর বস্তুর উপমা দিতেও আল্লাহ্ তা'আলা সংকোচ বোধ করেন না। যেমন কেহ কাহারও কৃপণতা বা নীচতা সম্পর্কে কোন উপমা পেশ করিলে শ্রোতারা বলিয়া উঠে, সেই ব্যক্তি উহার চাইতেও অধম। কাসাঈ, আবূ উবায়দুল্লাহ প্রমুখ এই অভিমতের প্রবক্তা। হাদীস শরীফেও بعوضة শব্দ ব্যবহৃত হইয়া অনুরূপ অর্থ প্রদান করিয়াছে। মহানবী (সা) বলেন ঃ

لو ان الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ـ لما سقى الكافر منها شربة ماء

(পার্থিব জগতের মূল্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যদি মশার একটি ডানা সমতুল্য হইত, তাহা হইলেও তিনি কাফিরদিগকে উহার এক গ্লাস পানিও পান করিতে দিতেন না।)

দ্বিতীয় মত অনুসারে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষুদ্রতম মশা হইতে শুরু করিয়া উপরের যে কোন বস্তুর উপমা দিতে লজ্জিত হন না। এই মতটির প্রবক্তা হইলেন কাতাদাহ ও ইব্‌ন দুআমা। আল্লামা ইব্‌ন জারীরও এই মত পছন্দ করিয়াছেন। মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর বর্ণিত এক হাদীসে এই মতের সমর্থন মিলে। মহানবী (সা) বলেন ঃ

ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها الا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة ـ

(কোন মুসলমান একটি কাঁটা বিদ্ধ হইলে কিংবা উহা হইতে কোন বড় আঘাত পাইলে উহার বিনিময়ে তাহার গুনাহ মার্জনা হয় এবং আল্লাহ্র দরবারে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।)

মোটকথা, উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মশা কিংবা উহার ছোট ও বড় যে কোন বস্তুর সাহায্যে উপমা পেশ করিতে দ্বিধান্বিত হন না। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

يَـا اَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ ط اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُـوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّ لَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ ط وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَيَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ط ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ـ

'হে মানব! একটি উদাহরণ পেশ করা হইতেছে, মনোযোগ দিয়া শুন। আল্লাহ্কে ছাড়িয়া তোমরা যাহাদিগকে প্রভু বলিয়া ডাকিতেছ, তাহারা সকলে একত্রিত হইয়াও একটি মাছি সৃষ্টি করিতে পারিবে না। তেমনি মাছি তাহাদের কিছু ছিনাইয়া নিলেও তাহারা উহা ফেরৎ আনিবার ক্ষমতা রাখে না। বান্দা যেমন দুর্বল, মা'বূদও (তেমনি দুর্বল)। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ج اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ط وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ـ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ

(আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে তাহারা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যেন মাকড়শা। মাকড়শার বানানো আশ্রয়গৃহটি অবশ্যই সর্বাধিক নাজুক। তাহারা যদি ইহা জানিত।)

তিনি আরও বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ ـ تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ط وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ـ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ نِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ـ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِيْنَ وقف وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَايَشَاءُ ـ

'তোমরা কি দেখ নাই কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা উদাহরণ পেশ করেন? কলেমা তায়্যিবা যেন একটি পবিত্র বৃক্ষ। উহার শিকড় সুপ্রতিষ্ঠিত ও শাখা-প্রশাখা নভোমণ্ডলী জুড়িয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্র ইচ্ছায় প্রতি মুহূর্তে উহা ফল দান করে। আল্লাহ্র এই উপমা প্রদান মানুষের উপদেশ গ্রহণের জন্য। তেমনি অপবিত্র কলেমার উপমা হইল একটি অপবিত্র বৃক্ষ। উহা ভূমির উপরে ভাসমান। উহার কোনই স্থিরতা নাই। আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারগণকে দুনিয়া ও আখিরাতে সুদৃঢ় বক্তব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং জালিমদিগকে পথভ্রষ্ট রাখেন। আল্লাহ্র যেমন ইচ্ছা তেমনই করেন।'

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لاَّيَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ 'আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক পরাধীন ভৃত্যের উপমা পেশ করিলেন, স্বেচ্ছায় যাহার কিছুই করার ক্ষমতা নাই।'

তিনি আরও বলেন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا اَبْكَمُ لاَيَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰهُ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ ط هَلْ يَسْتَوِىْ هُوَ لا وَمَنْ يَّأْمُرُ بِالْعَدْلِ ـ

'আল্লাহ্ পাক দুই ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করিতেছেন। একজন বোবা ও বধির ; সে কিছু করিতে পারে না, প্রভুর উপর বোঝা হইয়া আছে। অন্যজন ভাল কাজ করে ও ভাল কাজের নির্দেশ দেয়। উভয় কি সমান হইতে পারে?'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِنْ اَنْفُسِكُمْ ط هَلْ لَّكُمْ مِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيْمَا رَزَقْنَاكُمْ ـ

'তোমাদের জন্য আল্লাহ্ পাক তোমাদের দ্বারাই উদাহরণ পেশ করিতেছেন। আমি তোমাদিগকে যে সম্পদ দান করিয়াছি, তোমাদের ভৃত্যগণকে কি উহার অংশীদার মনে কর?'

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيْهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُوْنَ 'আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করিতেছেন, যাহার সমমানের অনেক ঝগড়াটে অংশীদার রহিয়াছে।'

তিনি আরও বলেন ঃ

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلاَّ الْعٰلِمُوْنَ 'এইসব উদাহরণ আমি মানুষের জন্য তুলিয়া ধরিয়াছি। তবে আলিম ছাড়া উহা কেহ বুঝিতে পারে না।'

আল-কুরআনে আরও অজস্র উদাহরণ বিদ্যমান। প্রথম যুগের কোন এক মনীষী বলিয়াছেন, আমি কুরআনের কোন উপমার তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হইলে অনুশোচনায় কাঁদিয়া ফেলি। কারণ, আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন, এইসব উদাহরণ আমি মানুষের জন্য পেশ করিয়াছি বটে। কিন্তু আলিম ছাড়া কেহ উহা বুঝিতে পারিবে না।

اِنَّ اللّٰهَ لاَيَسْتَحْىِ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا আয়াত প্রসঙ্গে মুজাহিদ বলেন ঃ ঈমানদারগণ আল্লাহ্ তা'আলার যে কোন ছোট বড় উদাহরণের উপর ঈমান রাখে এবং উহা আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রদত্ত বলিয়া বিশ্বাস করে। সেই সব উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ আয়াত প্রসঙ্গে কাতাদাহ বলেন ঃ 'ঈমানদারগণ জানে যে, এই উপমা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে।' মুজাহিদ, হাসান ও রবী' ইব্ন আনাস অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আবুল আলীয়া উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ ঈমানদারগণ জানে যে, উহা আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রদত্ত সঠিক উপমা।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلاً আয়াতাংশের অনুরূপ আয়াত সূরা মুদ্দাচ্ছিরেও আসিয়াছে।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا اَصْحَابَ النَّارِ اِلاَّ مَلاَئِكَةً وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا وَّلاَيَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكَافِرُوْنَ ـ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلاً ط كَذَالِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ ط

'আমি জাহান্নামীদেরকে ফেরেশতা মুক্ত রাখি নাই এবং উহাদের সংখ্যাকে কাফিরদের দুর্ভাবনার ব্যাপারে পরিণত করিয়াছি। আহ্‌লে কিতাবগণও ইহা বিশ্বাস করে এবং ঈমানদারগণের ঈমান আরও বৃদ্ধি করে। এই বিষয়ে আহ্‌লে কিতাব ও ঈমানদারগণের কোন সংশয় নাই। কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের লোক ও কাফিররা প্রশ্ন তোলে, এই উপমা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা কি বুঝাইতে চাহেন? এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট রাখেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখান। তোমার প্রতিপালকের সেনা-সৈন্যের হদিস তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও জানা নাই।'

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا ـ وَمَايُضِلُّ بِهٖ اِلاَّ الْفَاسِقِيْنَ আয়াত সম্পর্কে আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে ইব্ন মাসউদ ও একদল সাহাবা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্‌রাহ, ইব্ন আব্বাস, আবূ সালেহ ও আবূ মালিক বর্ণিত এক হাদীস উদ্ধৃত করেন। উহাতে বলা হয় ঃ আয়াতে 'বহু লোককে পথভ্রষ্ট রাখেন' বক্তব্যটি মুনাফিকদের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। তেমনি 'বহু লোককে পথ প্রদর্শন করেন' বক্তব্যটি দ্বারা ঈমানদারগণকে বুঝানো হইয়াছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত উপমাকে মিথ্যা জানার দরুন উহাদের ভ্রান্তি বাড়িয়া যায় এবং উহাদের অন্তরের ব্যাধি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ফলে উহারা অধিকতর বিভ্রান্ত হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র দেওয়া উপমা বিশ্বাস করায় ঈমানদারগণের ঈমানে সংযোজন ঘটে এবং তাহাদের ঈমান প্রবলতর হয়। ফলে তাহারা আরও পথপ্রাপ্ত হয়। ইহাই আল্লাহ্ তা'আলার ভ্রান্ত করা ও পথ দেখানোর তাৎপর্য। আলোচ্য আয়াতের 'ফাসিক ব্যতীত কাহাকেও পথভ্রষ্ট রাখেন না' বক্তব্যটিও মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلاَّ الْفَاسِقِيْنَ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে আবুল আলীয়া বলেন ঃ ফাসিক বলিতে মুনাফিকদের বুঝানো হইয়াছে। রবী' ইব্ন আনাসও এই অভিমত প্রকাশ করেন। মুজাহিদের বরাত দিয়া ইব্ন জুরায়জ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ এখানে ফাসিক অর্থ কাফির। কারণ, এই উপমার তাৎপর্য তাহারা বুঝিয়াও অস্বীকার করিতেছে।

وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلاَّ الْفَاسِقِيْنَ আয়াতাংশ সম্পর্কে কাতাদাহ বলেন ঃ আল্লাহ্ পাকের উপমা শুনিয়াও তাহারা মানে না বলিয়া ফাসিক আখ্যা পাইয়াছে। তাহাদের ফাসেকী কার্যের দরুন তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট রাখা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা, তাঁহাকে ইসহাক ইব্ন সুলায়মান, তাঁহাকে আবূ সিনান, তাঁহাকে আমর ইব্ন মুর্‌রাহ, তাঁহাকে মাসআব ইব্ন সা'দ ও তাহাকে

তাঁহার পিতা সা'দ এই বর্ণনা শুনান যে, । يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا আয়াতাংশ দ্বারা খারেজী সম্প্রদায়কে বুঝানো হইয়াছে।

শু'বা আমর ইব্ন মুর্‌রাহ হইতে, তিনি মাসআব ইব্ন সা'দ হইতে ও তিনি সা'দ হইতে বর্ণনা করেন– اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ আয়াতাংশ দ্বারা হরুরীয়াগণকে বুঝানো হইয়াছে।

সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের সূত্রে বর্ণিত উক্ত হাদীসের সনদ যদিও শুদ্ধ, তথাপি ব্যাখ্যাটিকে শাব্দিক বলা যায় না, উহাকে মর্মগত ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। কারণ, নাহরাওয়ানে যাহারা হযরত আলী (রা)-এর দল ত্যাগ করিয়া খারেজী হইল, তাহারা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আবির্ভূত হইয়াছে। সুতরাং এই আয়াতের মাধ্যমে খারেজীদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার শানে নুযূল খারেজীরা নহে। ইমামের আনুগত্য পরিত্যাগ ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বর্জনের কারণে তাহাদিগকে উক্ত আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। আর এই কারণেই তাহাদিগকে খারেজী বলা হয়। আভিধানিক অর্থে আনুগত্য হইতে যাহারা খারিজ হয় তাহাদিগকে খারেজী বলে। আরবী পরিভাষায় 'ফাসিক' অর্থও আনুগত্য মুক্ত। উপরের খোসার বন্ধন মুক্ত হইয়া যখন শাঁস বাহির হয়, তখন আরবগণ বলেন, فسقت তাই আরবী ভাষায় ইঁদুরকে فويسقة বলা হয়। কারণ, ইহা মাটির আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া মানুষের ক্ষতি করে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

خمس فواسق يقتان فى الحل والحرم ـ الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب والعقور ـ

'পাঁচ শ্রেণীর অনিষ্টকর জীব হারাম শরীফে কিংবা বাহিরে যেখানে পাইবে হত্যা করিবে। উহা হইল কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও কালো কুকুর।'

এই হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, কাফির, মুনাফিক ও পাপী সব শ্রেণীই ফাসিক পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত। তবে কাফিরের পাপ ও অত্যাচার অধিক প্রকট ও প্রবল। তাই আলোচ্য আয়াতে ফাসিক বলিতে কাফিরগণকেই বুঝানো হইয়াছে। পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী ও উহার ভাষ্য হইতেও তাহাই প্রমাণিত হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

'যাহারা আল্লাহ্র সহিত অঙ্গীকার করার পর উহা ভঙ্গ করে ও আল্লাহ্ পাক যে সম্পর্ক বহাল রাখার নির্দেশ দেন তাহা ছিন্ন করে এবং ভূ-পৃষ্ঠে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।'

উপরে বর্ণিত বিশেষণগুলি কেবল কাফিরদেরই বৈশিষ্ট্য। মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য ইহার বিপরীত।

যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ط اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُوْلُوا الْاَلْبَابِ - اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَايَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ - وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ - ......
وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ط اُولٰۤئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ -

'যে ব্যক্তি তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার কাছে অবতীর্ণ বাণীকে সত্য বলিয়া জানে, সে কি এই ব্যাপারে অন্ধ ব্যক্তির সমান হইতে পারে? শুধুমাত্র জ্ঞানীগণই উপদেশ গ্রহণ করে। যাহারা আল্লাহ্র সহিত কৃত ওয়াদা রক্ষা করে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না, আল্লাহ্ নির্দেশিত সম্পর্ক বহাল রাখে এবং তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে ও সন্ত্রস্ত থাকে কঠিন শাস্তির ভয়ে...... পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহ্কে প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ্র নির্দেশিত সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং ভূ-পৃষ্ঠে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাহারাই অভিশপ্ত আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে বড়ই নিকৃষ্ট নিবাস।'

এই আয়াতে কাফিরদের যে অঙ্গীকার ভঙ্গের কথা বলা হইয়াছে তাহা কোন্ অঙ্গীকার উহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। একদল বলেন– আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীর মাধ্যমে অবতীর্ণ কিতাবে মানুষকে যে সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহা অমান্য করাকেই 'অঙ্গীকার ভঙ্গ করা' বলা হইয়াছে।

অপর দল বলেন, এখানে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ফাসিক বলিতে আহলে কিতাবের কাফির ও মুনাফিকদের বুঝানো হইয়াছে। কারণ, তাহারা তাওরাত-ইনজীলের বিধান মানিয়া চলার অঙ্গীকার করিয়াছিল। উহাতে মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের পর তাঁহাকে ও তাঁহার উপর অবতীর্ণ গ্রন্থকে মানিয়া চলার নির্দেশ রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহাকে ভালভাবে চিনিতে পারিয়াও মানিয়া নেয় নাই। ইহাকেই বলা হইয়াছে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

ইব্ন জারীর এই অভিমত পছন্দ করিয়াছেন। মাকাতিল ইব্ন হাইয়ানও এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন।

তৃতীয় দল বলেন– এখানে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ফাসিক বলিতে সকল কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের বুঝানো হইয়াছে, কোন শ্রেণী বিশেষকে বুঝানো হয় নাই। কারণ, সকল মানুষের নিকট হইতে আল্লাহ্র একক প্রভুত্বকে মানিয়া চলার অঙ্গীকার নেওয়া হইয়াছিল। অথচ উহারা প্রাকৃতিক জগতের অজস্র নিদর্শন ও নবী রাসূলদের প্রদর্শিত অসংখ্য মু'জিযা দেখিয়াও আল্লাহ্র একক প্রভুত্ব মানিয়া নেয় নাই। ইহাই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

মাকাতিল ইব্ন হাইয়ানের একটি বর্ণনা এই মতকে সমর্থন করে। ইমাম রাযীও এই মতের দিকে ঝুঁকিয়াছেন। তিনি বলেন, আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ্ কোন্ জিনিসের অঙ্গীকার নিয়াছেন? তাহার জবাবে বলিব, মানুষের জ্ঞানজগতে আল্লাহ্র একত্ববাদের যে প্রমাণ নিহিত রহিয়াছে, মানুষ তাহা মানিয়া চলিবে, এই অঙ্গীকারই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى 'তাহারা নিজেদের অনুকূলে নিজেরাই সাক্ষী হইয়াছিল। প্রশ্ন করা হইল– আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? সকলেই জবাব দিল– হ্যাঁ।'

অতঃপর তাহাদিগকে যত কিতাব প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহাতেও অঙ্গীকার নেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে ঃ

اَوْفُوْا بِعَهْدِىْ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ 'তোমরা আমাকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ কর, আমিও তোমাদিগকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করিব।'

চতুর্থ দল বলেন– আলোচ্য আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গের ভাষ্য দ্বারা পৃথিবীতে আসার আগে মানুষের রূহসমূহ হইতে যে অঙ্গীকার আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা ভঙ্গের কথা বুঝানো হইয়াছে। বাবা আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে আত্মাসমূহকে বাহির করার সময়ে আল্লাহ্ তাহাদের নিকট হইতে তাঁহার একক প্রভুত্ব মানিয়া লওয়ার অঙ্গীকার নেন। তিনি বলেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى -

'অনন্তর তোমার প্রভু আদমের পৃষ্ঠদেশে তাহার বংশাবলী থাকা অবস্থায় তাহাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার নিয়াছিলেন আর নিজেদের অঙ্গীকারের সাক্ষী তাহারা নিজেরাই ছিল– আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? তাহারা সকলেই জবাব দিল– হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি (তুমিই আমাদের একমাত্র প্রতিপালক প্রভু)।'

সুতরাং অলোচ্য আয়াতে এই অঙ্গীকার ভঙ্গের কথাই বলা হইয়াছে। মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান এই মতকেও সমর্থন করিয়াছেন। ইব্ন জারীর তাঁহার তাফসীরে উপরে বর্ণিত সকল মতই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ -

আয়াত প্রসঙ্গে আবূ জা'ফর রাযী রবী' ইব্ন আনাস ও আবুল আলীয়ার উদ্ধৃতি দিয়া বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্র সহিত কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকদের কাজ আর মুনাফিকীর পরিচয় হইল নিম্নবর্ণিত ছয়টি চরিত্র।

তাহারা বিজিত অবস্থায় থাকিলে ঃ এক. কথা বলিলে মিথ্যা বলে। দুই. ওয়াদা করিলে তাহা ভঙ্গ করে। তিন. আমানত রাখিলে খিয়ানত করে।

তাহারা বিজয়ী অবস্থায় থাকিলে ঃ চার. আল্লাহ্কে প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। পাঁচ. আল্লাহ্র নির্দেশিত সম্পর্ক ছিন্ন করে। ছয়. ভূ-পৃষ্ঠে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে।

আল্লামা সুদ্দী তাঁহার তাফসীরে এই সূত্রে اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ কুরআনের বিধি-নিষেধ পাঠ করা এবং উহাকে সত্য বলিয়া জানার পর উহাকে অস্বীকার ও অমান্য করাই হইতেছে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُوْصَلَ আয়াতাংশের মর্ম হইতেছে রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা, যাহা রক্ষা করার নির্দেশ রহিয়াছে। ইহা কাতাদাহর প্রদত্ত ব্যাখ্যা। এই আয়াতের মর্মের সহিত সামঞ্জস্যশীল অপর আয়াত এই ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اَنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ 'তোমরা যদি ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা ও তোমাদের রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করার আশু সম্ভাবনা নয় কি?'

ইব্ন জারীর এই ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। অবশ্য উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইহাও বলা হয় যে, উহার বক্তব্য বিশেষ ধরনের সম্পর্ক বা অবস্থার সহিত সম্পৃক্ত নহে, বরং উহা সাধারণভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ্ পাক যত কিছুর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়াছেন, উহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ অমান্য করাই এই আয়াতের তাৎপর্য।

هُمُ الْخَاسِرُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলেন ঃ তাহারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যেমন কুরআন পাকের অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

اُوْلٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ 'তাহাদের জন্য রহিয়াছে অভিসম্পাত ও নিকৃষ্ট নিবাস।'

যিহাকের বর্ণনা, ইব্ন আব্বাস বলিয়াছেন– কুরআন পাকে মুসলমান ব্যতীত অন্যান্যদের যেখানেই خَاسِرُوْنَ (ক্ষতিগ্রস্ত) বলিয়াছে, সেখানে কাফেরদিগকেই বুঝানো হইয়াছে। আর যেখানে উহা মুসলমানদের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে পাপী মুসলমানকে বুঝানো হইয়াছে।

اُوْلٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে ইব্ন জারীর বলেন, خاسر শব্দের বহুবচন خَاسِرُوْنَঅর্থ তাহারা নিজেদের ক্ষতিসাধন করিয়াছে। কারণ, তাহারা নশ্বর পৃথিবীর লালসায় নিমজ্জিত ও আল্লাহ্ তা'আলার অনন্তকালীন রহমত হইতে নিজদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে। যেমন কেহ ব্যবসায়ে নামিয়া মূলধন নষ্ট করিলে কিংবা উহাতে ঘাটতি সৃষ্টি করিলে বলা হয় যে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তেমনি পরকালের পুঁজি আল্লাহ্র রহমত হইতে কাফির ও মুশরিকরা নিজদিগকে বঞ্চিত করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই ধরনের ক্ষতিগ্রস্তকে আরবী ভাষায় خسر يخسر - خسرانا - خسارا শব্দমালায় ভূষিত করা হয়। কবি জারীর ইব্ন আতিয়্যার কবিতায় আছে ঃ

ان سليطافى الخسار انه * اولاد قوم خلقوا اقنه

'কর্কশভাষী সর্বদাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, মানব জাতির সন্তান-সন্ততিকে দাসরূপেই সৃষ্টি করা হইয়াছে।'

পুনর্জীবনের প্রমাণ

(٢٨) كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

২৮. তোমরা কিরূপে আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা মৃত ছিলে; তিনিই তোমাদিগকে প্রাণ দান করিয়াছেন। তিনি আবার তোমাদিগকে মৃত করিবেন এবং পুনরায় তোমাদের জীবন দান করিবেন। অবশেষে তোমরা তাঁহার কাছেই প্রত্যাবর্তন করিবে।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অস্তিত্ব, মহাপরাক্রম, অসীম ক্ষমতা এবং সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হওয়ার যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন ঃ তোমরা কিরূপে সেই আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও অপরিসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করিবে কিংবা তাঁহার অংশীদার বানাইয়া উপাসনা করিবে, যিনি তোমাদিগকে অস্তিত্বহীন অবস্থা হইতে অস্তিত্ববান করিয়াছেন এবং আবার অস্তিত্বহীন করিয়া পুনরায় অস্তিত্ববান করিবেন? কুরআন মজীদের অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ - اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ - بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ -

'তাহারা কি কোন বস্তু ছাড়াই সৃষ্টি হইয়াছে, না তাহারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? নভোমণ্ডলী ও পৃথিবী কি তাহারাই সৃষ্টি করিয়াছে? তাহা নহে, বরং তাহারা আস্থা স্থাপন করিতেছে না।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا - 'নিশ্চয় মানুষের সৃজন পরিক্রমায় এমন একটি দিন থাকে যখন তাহারা উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু ছিল না।' কুরআনে এরূপ আরও বহু আয়াত বিদ্যমান। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবুল আহওয়াস, আবূ ইসহাক ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন ঃ হাশরের ময়দানে কাফিরদের বক্তব্য–

قَالُوْا رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا (হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদিগকে দুইবার মৃত করিয়াছ এবং দুইবার জীবিত করিয়াছ। তাই আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করিতেছি) এবং আলোচ্য وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ আয়াতাংশের বক্তব্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ইব্ন জুরায়জ আতা হইতে ও তিনি আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন– তোমরা তোমাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে মৃতবৎ ছিলে,

তখন তোমরা কোন বস্তুই ছিলে না। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। তারপর আবার মৃত করিলেন। পুনরায় পুনরুত্থান দিবসে জীবিত করিবেন। সুতরাং এই আয়াতের বক্তব্যের সহিত أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ আয়াতের বক্তব্য মিলিয়া যাইতেছে।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া যিহাক বর্ণনা করেন ঃ رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ আয়াতে মর্ম হইতেছে এই যে, তোমরা সৃষ্টি করার পূর্বে মাটি ছিলে অর্থাৎ মৃত ছিলে। অতঃপর তোমাদিগকে সপ্রাণ সৃষ্টি করা হইল। ইহা তোমাদের প্রথম জীবন। অতঃপর তোমাদের মৃত করা হইবে এবং তোমরা কবরে যাইবে। ইহা তোমাদের দ্বিতীয় মৃত্যু। অবশেষে পুনরুত্থান দিবসে তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করা হইবে। ইহা হইল তোমাদের দ্বিতীয় জীবন। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে এই দুইবার মৃত্যু ও দুইবার জীবিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লামা সুদ্দী আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রাহ হইতে এবং তাহারা ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে ধারাবাহিক সনদে এবং আবুল আলীয়া, আল্ হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাহ, আবূ সালেহ, যিহাক ও আতা আল খোরাসানী হইতে তাহাদের স্ব-স্ব সনদে আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। সুদ্দী ও আবূ সালেহের উদ্ধৃতি দিয়া সুফিয়ান ছাওরী আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বলেন– কবরে তোমাদিগকে জীবিত করিবেন, আবার মৃত করিবেন।

ইব্ন জারীর ইউনুস হইতে, তিনি ইব্ন ওহাব হইতে ও তিনি অব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম হইতে ধারাবাহিক সনদে বর্ণনা করেন– আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে প্রথম বাবা আদমের পৃষ্ঠদেশে সৃষ্টি করেন। সেখানে তিনি তাহাদের নিকট হইতে আনুগত্যের স্বীকৃতি নেন। অতঃপর তাহাদিগকে মৃত করেন। অতঃপর মাতৃগর্ভে তাহাদিগকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাহাদিগকে মৃত্যু দান করেন। বিচার দিবসে আবার তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন। ইহাই আল-কুরআনের قَالُوْا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য এই হাদীসটি ও পূর্বোক্ত হাদীসটি সনদের বিচারে 'গরীব' শ্রেণীভুক্ত। আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা) ও একদল তাবেঈনের যে সব বর্ণনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে উহাই সঠিক ও বিশুদ্ধ। তাঁহাদের বর্ণনার সহিত নিম্ন আয়াতের মিল রহিয়াছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ

'তুমি বল, আল্লাহ্ই তোমাদিগকে সপ্রাণ করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে নিষ্প্রাণ করিবেন। অতঃপর তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করিবেন– সেই দিনটি সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নাই।'

মুশরিকদের উপাস্য দেব মূর্তিগুলিকেও আল্লাহ্ তা'আলা মৃত বলেন ঃ

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ج وَمَا يَشْعُرُوْنَ 'উহারা সবাই মৃত, কেহই জীবিত নহে। উহাদের বোধশক্তি বলিতেও কিছু নাই।'

আল্লাহ্ পাক ভূমির জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে বলেন ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ج اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ

'আর তাহাদের জন্য মৃত-অনুর্বর ভূমিতেও নিদর্শন রহিয়াছে। উহাকে আমিই জীবিত-উর্বর ভূমি করিয়াছি এবং উহা হইতে বীজ-ফসলাদি উৎপন্ন করিয়াছি। তাহা হইতে সকলে আহার করে।'

মানুষের কল্যাণে আল্লাহ্র সৃষ্টি

(٢٩) هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

২৯. তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন এবং উহা সপ্ত আকাশে বিন্যস্ত করিলেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ পূর্ব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানবের সৃষ্টি রহস্য ও তাহাদের ক্রমবিবর্তন ধারা বর্ণনার মাধ্যমে স্বীয় অসীম সৃজন কৌশল ও গোটা সৃষ্টি বিন্যাস ও নিয়ন্ত্রণের অপরিসীম ক্ষমতার প্রমাণ তুলিয়া ধরেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টিতত্ত্ব ও উহাতে বিরাজমান বস্তুকুলকে স্বীয় অস্তিত্ব ও অসীম ক্ষমতার দ্বিতীয় প্রমাণ হিসাবে তুলিয়া ধরেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তিনি তোমাদের স্বার্থে সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীর সৃষ্টি পূর্ণতায় পৌছাইয়া তিনি নভোমণ্ডলের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং সপ্ত আকাশের বিন্যাস ঘটান। استوى অর্থ ইচ্ছা করিলেন বা মনোনিবেশ করিলেন। উহার صلة হইল الى এবং فسوهن অর্থ বিভক্ত ও বিন্যস্ত করা। আয়াতাংশের অর্থ দাঁড়াইল, তিনি উহাকে সপ্ত আকাশে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করিলেন। এখানে السماء শব্দটি اسم جنس(শ্রেণীবাচক বিশেষ্য)। তাই উহা দ্বারা আকাশমণ্ডলী বা সপ্ত আকাশের কথা বুঝানো হয়। وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ বলিয়া তিনি জানাইয়া দিলেন, তাঁহার জ্ঞান সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং আসমান যমীন সকল কিছু সম্পর্কেই তিনি পুরাপুরি অবহিত রহিয়াছেন। তিনি কুরআন পাকের অন্যত্র বলেন ঃ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ অর্থাৎ যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি কি অনবহিত ও বেখবর থাকেন?

সূরা 'হা-মীম' এ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা রহিয়াছে। যেমন ঃ

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا ط

ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ - وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا

اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ط سَوَاءً لِلسَّائِلِيْنَ - ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا ط قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ - فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ط ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -

'তুমি বল, তোমরা কি সেই মহান সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছ কিংবা তাঁহার অংশীদার দাঁড় করাইতেছ যিনি দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনিই তো নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক। তিনি পাহাড় গাড়িয়া ভূপৃষ্ঠ স্থিতিশীল করিয়াছেন এবং পৃথিবীকে নানাবিধ দানে ধন্য করিয়াছেন। অতঃপর চারিদিনে উহা বিন্যস্ত করিয়া উর্বরা শক্তি দিয়াছেন। জিজ্ঞাসুদের জন্য উহাতে সন্তোষজনক সমাধান রহিয়াছে। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তখন আকাশ ছিল বাষ্পাকার। তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বলিলেন- ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় আমার পরিকল্পিত রূপ পরিগ্রহ কর। তাহারা বলিল- আমরা স্বেচ্ছায় বাস্তব রূপ গ্রহণ করিতেছি। এইভাবে দুই দিনে অকাশকে সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করা হইল এবং প্রত্যেক আকাশের কাজ নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইল। পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইল এবং শয়তানের অনাচার প্রতিরোধের জন্য প্রহরার ব্যবস্থা হইল। এই হইল সেই মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ সত্তার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা।'

এই আয়াতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টি পরিকল্পনার সূচনা করিয়াছেন পৃথিবী সৃষ্টি দ্বারা। অতঃপর সপ্ত আকাশ সৃষ্টির পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করিয়াছেন। যে কোন স্থাপত্য শিল্পের নিয়মই হইল এই যে, সর্বপ্রথম সৌধের নিম্নভাগের ভিত্তি স্থাপন করা। অতঃপর সৌধের উপরিভাগের কাজে হাত দেওয়া। আল্লাহ্‌র এই সৃষ্টি পরিকল্পনাও অনুরূপভাবে বাস্তবায়িত হইয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণ এই আয়াতের তদ্রূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই ব্যাপারে যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ ط بَنَاهَا - رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا - وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا - وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَاهَا - اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا - وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا - مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ -

'তোমাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিন, না আকাশ বানানো কঠিন? আল্লাহ্ পাক উহার ব্যাপ্তিকে সুউচ্চ করিয়া উহাকে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। উহা হইতে দিবা-রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর পৃথিবীকে বিন্যস্ত করিয়াছেন এবং উহা হইতে পানির প্রস্রবণ ও গাছ-পালার উদ্ভব ঘটাইয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করিয়াছেন। ইহা সবই তোমাদের ও তোমাদের পশুকুলের প্রয়োজনের বস্তু।'

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৃজন কার্যের সূচনা আকাশ দ্বারা করিয়াছেন। বাহ্যত এই আয়াত ও আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য বিপরীতমুখী দেখা যায়। মূলত দুই আয়াতে কোন বৈপরীত্য নাই। কারণ, আমাদের আলোচ্য আয়াতের ثم সংযোজন শব্দটি

خبر(সংবাদমূলক বক্তব্য)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট, فعل (ক্রিয়া)-এর সহিত নহে। অর্থাৎ عطف হইয়াছে خبر -এর সহিত, فعل -এর সহিত নহে। সুতরাং এখানে ثم খবর পরিবেশনের সংযোগ রক্ষা করিতেছে, পূর্বাপর নির্ধারক হিসাবে কাজ করে নাই। আরবীতে ثم শব্দের নিছক সংযোগ কাজে ব্যবহৃত হওয়ার প্রচলন রহিয়াছে। যেমন কবি বলেন ঃ

قل لمن ساد ثم ساد ابوه * ثم قد ساد قبل ذالك جده

(যে লোক নেতা হইয়াছে, তাহার পিতাও নেতা ছিল, আর ইহার পূর্বে তাহার পিতামহও নেতা ছিল, তাহাকেই বল।)

উক্ত চরণে ثم শব্দটি পূর্বাপর না বুঝাইয়া নিছক সংযোগ রক্ষা করিয়াছে ও পুরুষানুক্রমিক নেতৃত্বের খবর পরিবেশনের কাজ দিয়াছে।

একদল ব্যাখ্যাকার আয়াতদ্বয়ের আপাত বৈসাদৃশ্য দূরীকরণার্থে বলেন; এই আয়াতে পৃথিবীর সম্প্রসারণ ও বিন্যাস কার্যের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। উহা সৃষ্টির কথা বলা হয় নাই। সুতরাং আমাদের আলোচ্য আয়াতে প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া পরে আকাশ সৃষ্টি এবং এই আয়াতে উহার পর পৃথিবীকে পরিপূর্ণরূপে বিন্যস্ত করা বুঝা যাইতেছে। ফলে কোন বৈপরীত্য ঘটিতেছে না।

কেহ কেহ বলেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পরপরই উহার সংস্থাপন কার্য করা হয়। এই অভিমতটি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন।

আস্ সুদ্দী স্বীয় তাফসীরে ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্রাহ, ইব্ন আব্বাস, আবূ সালেহ ও আবূ মালিক হইতে বর্ণনা করেন– সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার আরশ পানির উপর সংস্থাপিত ছিল। পানির পূর্বে আল্লাহ্ পাক কোন বস্তুই সৃষ্টি করেন নাই। সুতরাং সৃজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রথম তিনি পানি হইতে বাষ্প সৃষ্টি করিলেন। উহা ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্বলোকে উত্থিত হইল এবং উত্থিত বাষ্প ছাদরূপ পরিগ্রহ করিয়া আকাশে পরিণত হইল। এইজন্য উহার নাম হইল سماء (ঊর্ধ্বলোক)। অতঃপর পানি শুকাইয়া একটি ভূখণ্ড দেখা দিল। তখন উহাকে সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করা হইল। রবি-সোম দুই দিনে এই সপ্তখণ্ড সৃষ্টি হইল। অতঃপর পৃথিবীকে সেই মৎসের উপর স্থাপন করা হইল যাহার বর্ণনা সূরা 'নূন ওয়াল কলম'-এ আসিয়াছে। মৎসটি পানির উপর এবং পানির নীচে সকাত জাতীয় পদার্থ বা পরিচ্ছন্ন মৃত্তিকা শিলা বিদ্যমান। মৃত্তিকা শিলার ধারক হইলেন ফেরেশতা। ফেরেশতা দণ্ডায়মান প্রস্তরের আস্তরের উপর এবং প্রস্তরের আস্তরটি বায়ুমণ্ডলের উপর ভাসমান রহিয়াছে। লুকমান হাকীম এই প্রস্তর আস্তরের কথাই বলিয়াছেন। উহা আকাশ কিংবা পৃথিবীর কোথাও স্থাপিত নহে। মৎসটি নড়াচড়া করা মাত্র পৃথিবী কম্পিত হয় এবং ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। তাই পৃথিবীকে পাহাড় চাপা দেওয়া হইল। ফলে পৃথিবী সুস্থির হইল। পর্বত তাই পৃথিবীর কাছে নিজের বড়াই করিয়া থাকে।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِى الاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ 'আর পৃথিবীকে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি।'

পাহাড়-পর্বত, ফল-মূল, প্রাণীকুল, গাছপালা ইত্যাদি যাহা কিছু পৃথিবীর জন্য প্রয়োজন ছিল, সব কিছু তিনি মঙ্গল-বুধ এই দুই দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কথাই আল্লাহ্ তা'আলা হা-মীম সূরা হইতে ইতিপূর্বে উদ্ধৃত-

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا ط ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ - وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا আয়াতে প্রকাশ করিয়াছেন। অতঃপর وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا আয়াতাংশে গাছপালা-তরুলতা ও উহার উপরিভাগস্থ বস্তুসমূহ সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। এই সব সৃষ্টি করিতে যে মোট চারদিন লাগিয়াছে তাহা তিনি ব্যক্ত করিলেন فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ আয়াতাংশের মাধ্যমে। আলোচ্য ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ আয়াতাংশের ধোঁয়া বা বাষ্প হইল পানির নিঃশ্বাস। উহা দ্বারা প্রথমে এক আকাশ ও পরে উহা হইতে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি হইয়াছে। এই কাজ বৃহস্পতি-শুক্র দুই দিনে সম্পন্ন হইয়াছে। যেহেতু আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা শুক্রবারে একত্রিত করিয়াছেন, তাই উহার নাম ইয়াওমুল জুমুআ হইয়াছে।

وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا আয়াতাংশের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক আকাশে ফেরেশ্তা, নদ-নদী, বরফের পাহাড় ও নানাবিধ অজানা বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীর নিকটতর আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া এক দিকে আকাশ ও পৃথিবীর শোভা বর্ধন ও অন্যদিকে শয়তানের অনাচার হইতে উর্ধ্বলোককে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাঁহার পরিকল্পিত বস্তুসমূহ সৃষ্টি শেষে স্বীয় আরশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ "আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কাজ ছয় দিনে সম্পন্ন করিয়া তিনি আরশের উপর মনোনিবেশ করিলেন।"

তিনি আরও বলেন ঃ

كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ "আকাশ ও পৃথিবী উভয়ই বাষ্প ছিল। অতঃপর আমি উভয়কে পৃথকভাবে বিন্যস্ত করিয়াছি। অনন্তর আমি প্রত্যেক বস্তুকে পানি দ্বারা সপ্রাণ করিয়াছি।"

ইব্ন জারীর বলেন- আমাকে মুছান্না, তাঁহাকে আব্দুল্লাহ ইব্ন সালেহ, তাঁহাকে আবূ মা'শার, সাঈদ ইব্ন আবূ সাঈদ হইতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম হইতে এই বর্ণনা শুনান ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রবিবার সৃষ্টি কাজ আরম্ভ করেন এবং রবি-সোম দুইদিনে পৃথিবীর সপ্তখণ্ড সৃষ্টি করেন। পর্বতরাজি ও জীবিকার শক্তি ও উপকরণ সৃষ্টি করেন মঙ্গল-বুধ দুই দিনে। বৃহস্পতি ও শুক্রবারে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেন। শুক্রবার দিন শেষভাগে তিনি অবসর হইলেন। তখনই কালবিলম্ব না করিয়া আদমকে সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টির এই শেষ সময়টিতেই সৃষ্টি ধ্বংসের কিয়ামত সংঘটিত হইবে।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا আয়াত প্রসঙ্গে মুজাহিদ বলেন ঃ আকাশ সৃষ্টির আগে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করেন। পৃথিবী সৃষ্টির পর উহা হইতে ধোঁয়া উত্থিত হয়।

তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ মুজাহিদ বলেন ঃ সপ্ত আকাশ একটির উপর অপরটি এবং সপ্ত পৃথিবী একটির নিচে অপরটির অবস্থান। এই আয়াত প্রমাণ করে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে। সূরা সাজদার আয়াতেও তাহাই বলা হইয়াছে। যেমন ঃ

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا ط ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ - وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ - ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ط قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ - فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا ط وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ق وَحِفْظًا ط ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -

উপরোক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে, পৃথিবী নভোমণ্ডলীর আগে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আলিমদের ভিতর এই ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই। কেবলমাত্র ইব্ন জারীর কাতাদাহর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহাতে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর আগে নভোমণ্ডলী সৃষ্টি করা হইয়াছে। কুরতুবী তাঁহার তাফসীরে এই ব্যাপারে মন্তব্য করা হইতে বিরত রহিয়াছেন। কারণ অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

أَأَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا - وَرَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا - وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا - وَالاَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَاهَا - اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا - وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا -

তাই তাহারা বলেন, এখানে সুস্পষ্টত বলা হইয়াছে, আকাশের পরে পৃথিবীর বিন্যাস সাধন করা হইয়াছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে হুবহু এই প্রশ্ন তোলা হইলে তিনি বলেন- আকাশের আগে পৃথিবী সৃষ্টি করা হইয়াছে। অবশ্য পৃথিবীর বিন্যাস সাধন করা হইয়াছে আকাশ সৃষ্টির পরে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের বহু আলিম এই প্রশ্নের অনুরূপ জবাবই প্রদান করিয়াছেন। আমিও সূরা নাযিআর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বিন্যাসের কথাটি আল্লাহ্ তা'আলার বক্তব্যে সবিস্তারে বলা হইয়াছে। যেমন ঃ

وَالاَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَاهَا - اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا - وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا

এখানে বিন্যাসের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উর্বরা শক্তিকে সক্রিয় করিয়া জীবন ও জীবিকা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথমে পৃথিবীর সৃষ্টিসমূহকে পূর্ণতা দান করা হইয়াছে। অতঃপর পৃথিবীর বুকে পানির প্রস্রবণ ঘটাইয়া উর্বরা শক্তিকে চাঙ্গা করা হইয়াছে এবং জীবিকার জন্য বিবিধ প্রকারের রঙ-বেরঙের গাছ-পালা, ফল-ফসল সৃষ্টি করা হইয়াছে। তেমনি আবার আসমানের বিন্যাস সাধন করা হইয়াছে। উহাকে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন মারদুবিয়্যা স্ব স্ব তাফসীরে এই সব আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুসলিম শরীফ ও নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্ন জুরায়জের সনদে উহা বর্ণিত হইয়াছে।

তিনি বলেন- আমাকে ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া, আইউব ইব্ন খালিদ হইতে, তিনি উম্মে সালামার গোলাম আব্দুল্লাহ্ ইব্ন রাফে' হইতে ও তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা) আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন- আল্লাহ্ তা'আলা শনিবার মাটি সৃষ্টি করিলেন, রবিবারে পাহাড় সৃষ্টি করিলেন, সোমবারে গাছ-পালা সৃষ্টি করিলেন, মঙ্গলবারে অপ্রিয় বস্তু সৃষ্টি করিলেন, বুধবারে আলো সৃষ্টি করিলেন, বৃহস্পতিবারে প্রাণীকুল সৃষ্টি করিলেন এবং আদমকে শুক্রবার আসরের পর সৃষ্টি করিলেন। উহা ছিল শুক্রবার দিবসের শেষ প্রহর অর্থাৎ আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়।"

সহীহ মুসলিমের শর্তে হাদীসটি 'গরীব' শ্রেণীভুক্ত। আলী ইবনুল মাদীনী হাদীসটির নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও কতিপয় হাদীস সংরক্ষকও একই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহারা উহাকে কা'বের বক্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) কা'ব আল-আহবার হইতে উহা শুনিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনার সহিত ইহার কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকার কারণে হাদীসটিকে 'মারফূ' করিয়া ফেলিয়াছেন। ইমাম বায়হাকী এই অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মানুষের মর্যাদা

(٣٠) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

৩০. অনন্তর তোমার প্রভু ফেরেশতাদের সমাবেশে যখন বলিলেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করিতে যাইতেছি, তাহারা বলিল, আপনি কি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা সেখানে ফিতনা-ফাসাদ করিবে ও রক্তপাত ঘটাইবে? অথচ আমরাই তো আপনার গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। তিনি (তোমার প্রভু) বলিলেন, নিশ্চয় আমি তাহাও জানি যাহা তোমরা জান না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমের উপর অজস্র অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানে তিনি তাঁহার প্রিয়তম রাসূলের নিকট অন্যতম অনুগ্রহের সংবাদ পরিবেশন করিতেছেন। তাহা হইল আদম সৃষ্টির প্রাক্কালে তিনি তাঁহার সর্বোচ্চ পরিষদের বিষয়টি যথারীতি উত্থাপন ও পর্যালোচনা করিয়া প্রসঙ্গটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি সেই দিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গটি আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের সামনে উত্থাপন করিলেন এবং তাহা লইয়া

ফেরেশতাদের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হইল। অতঃপর তুমি তোমার জাতির কাছে এইসব ঘটনা বর্ণনা কর।

ইব্ন জারীর বলেন- আরবী ভাষাবিদ আবূ উবায়দা মনে করেন, উক্ত বাক্যে اذ শব্দটি অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয়। আসল বাক্যটি হইবে وَقَالَ رَبُّكَ।

অতঃপর ইব্ন জারীর আবূ উবায়দার উক্ত বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেন। ইমাম কুরতুবী বলেন, সকল তাফসীরকারই আবূ উবায়দার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আয্ যুজাজ বলেন, ইহা আবূ উবায়দার চরম দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা। اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً। অর্থাৎ তাহারা যুগ যুগ ধরিয়া বংশ ও গোত্র পরম্পরায় একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া চলিবে।

যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ 'তিনিই তোমাদিকে (পালানুক্রমে) পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানাইবেন।' তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ "অনন্তর তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীর খলীফা বানাইবেন।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ "যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, অবশ্যই তোমাদের স্থলে ফেরেশতা সৃষ্টি করিতাম যেন তাহারা পৃথিবীতে খিলাফত করে।"

তিনি আরও বলেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ 'তাহাদের পরে অন্যদল খিলাফত করিল।' 'খলীফা' শব্দটিকে 'খুলাইফা' পড়ার ব্যাপারটি খুবই বিরল। আল্লামা যামাখশারী প্রমুখ উহার উল্লেখ করিয়াছেন। যায়দ ইব্ন আলী হইতে ইমাম কুরতুবী অনুরূপ পাঠের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

'খলীফা' পরিভাষাটি শুধুমাত্র হযরত আদম (আ)-এর জন্য নির্দিষ্ট নহে। অবশ্য তাফসীরকারদের একদল এই অভিমত পোষণ করেন। ইমাম কুরতুবী ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন মাসউদ (রা) সহ সকল ব্যাখ্যাকারদের বরাত দিয়া অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন বটে: কিন্তু উহা বিতর্কিত মত। অধিকাংশের মতে পরিভাষাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইমাম রাযী তাঁহার তাফসীরে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। অন্যান্য তাফসীরকারও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

প্রকাশ্যত বুঝা যায়, 'খলীফা' বলিতে শুধুমাত্র আদম (আ)-কে বুঝানো হয় নাই ; বরং আদম জাতিকে বুঝানো হইয়াছে। কারণ, ফেরেশতারা ফিতনা-ফাসাদ ও রক্তারক্তির কথা বলিয়া বনী আদমের কথাই বুঝাইয়াছেন, হযরত আদম (আ)-এর কথা বুঝান নাই।

এখন প্রশ্ন জাগে, তাঁহারা উহা বুঝিলেন কি করিয়া? জবাবে বলা যায়, হয় তাহারা বিশেষ জ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে পারিয়াছেন, অন্যথায় মানব প্রকৃতির সহজাত প্রবৃত্তির আলোকে তাহারা উহা বুঝিয়া লইয়াছেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা মানব সৃষ্টির উপাদান হিসাবে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত মাটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং অনুরূপ মাটির সৃষ্ট মানুষের স্বভাব যাহা হইতে পারে তাহাই ফেরেশতারা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিংবা যেহেতু মানুষকে খলীফা বলা হইয়াছে। খলীফার কাজ হইল ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করা এবং রক্তারক্তি ও অন্যায়-অনাচার

রোধ করা। সুতরাং ফেরেশতারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আদম সন্তানদের ভিতর সেই সব কার্য সংঘটিত হইবে।

ইমাম কুরতুবী বলেন, ইহাও হইতে পরে যে, তাহরা ইহার পূর্বেকার জাতির উপর কিয়াস করিয়া উহা উপলব্ধি করিয়াছেন। আমি একটু পরেই এতদসম্পর্কিত তাফসীরকারদের বিভিন্ন মত সবিস্তারে আলোচনা করিব।

এই প্রসঙ্গে ফেরেশতারা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা প্রতিবাদের জন্য নহে; বনী আদমের প্রতি ঈর্ষার কারণেও নহে। কোন কোন তাফসীরকার সেরূপ ধারণার শিকার হইয়াছেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সৃষ্টিই করিয়াছেন এরূপ স্বভাবের করিয়া যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ছাড়া তাহারা কখনও তাঁহার সামনে মুখ খোলেন না। এখানেও যখন তাহাদিগকে জানানো হইল নতুন সৃষ্টির কথা, তখন সে ব্যাপারে তাহাদের স্বভাবতই সব কিছু জানার কৌতূহল জাগিয়াছিল।

কাতাদাহ বলেন, তাহারা যে বনী আদমের ঝগড়া-ফাসাদ ও রক্তারক্তির আগাম কথা উত্থাপন করিলেন, তাহা উক্ত সৃষ্টির তত্ত্ব ও রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য করিয়াছেন। তাহারা যেন বলিতে চাহিয়াছেন, হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! তাহাদিগকে সৃষ্টির করার পেছনে আপনার কোন্ উদ্দেশ্য রহিয়াছে যে, আপনি তাহাদের ফাসাদ ও রক্তারক্তি সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তাহাদিগকে সৃষ্টি করিবেন? যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় ইবাদত, তাহা হইলে কি আমাদের ইবাদতে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়াছে?

তাই ফেরেশতাদের أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ্ পাক জানাইলেন, إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ অর্থাৎ তোমরা যে সব খারাপ দিক উল্লেখ করিয়াছ, উহা ছাড়া অনেক ভাল দিক রহিয়াছে যাহা শুধু আমিই জানি, তোমরা জান না। আমি অনতিকাল পরেই তাহাদের ভিতর নবী সৃষ্টি করিব, তাহাদের মধ্য হইতে রাসূল মনোনীত করিব, তাহাদের মধ্যে সিদ্দীক, শহীদ, নেককার, আবিদ, যাহিদ, আওলিয়া, আবরার, মুকার্‌রাব, আলিম, আল্লাহ্‌ভীরু, আল্লাহ্ প্রেমিক প্রভৃতি সৃষ্টি হইবে।

সহীহ হাদীসে রহিয়াছে যে, যখন ফেরেশতারা বান্দার আমল লইয়া ঊর্ধ্বজগতে আল্লাহ পাকের দরবারে পৌছেন, তখন আল্লাহ পাক সব কিছু জানা সত্ত্বেও প্রশ্ন করেন– আমার বান্দাদিগকে কোন্ অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছ? তাহারা সমস্বরে জবাবে বলেন- আমরা গিয়া তাহাদিগকে নামাযে পাইয়াছি এবং আসার সময় নামাযে রাখিয়া আসিয়াছি। ইহার কারণ এই যে, তাহারা একদল ফজরে আসে এবং আসরে চলিয়া যায় এবং অন্যদল আসরে আসে এবং ফজরে চলিয়া যায়। যেমন রাসূল (সা) বলেন ঃ

يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দরবারে রাতের আমল দিনের আগেই এবং দিনের আমল রাতের আগেই পৌছিয়া থাকে।

আল্লাহ পাকের জবাব— إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ -এর ইহাই যথাযথ তাফসীর। একদল বলেন, উহার তাফসীর এই যে, আদম জাতিকে সৃষ্টি করার পিছনে আমার ব্যাপক উদ্দেশ্য ও হিকমত রহিয়াছে। তোমরা যাহা বলিয়াছ, উহা ছাড়া আরও যে অজস্র ভাল দিক রহিয়াছে তাহা তোমাদের জানা নাই।

একদল তাফসীরকার বলেন, ফেরেশতাদের وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ বাক্যাংশের জবাবে আল্লাহ পাক إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَتَعْلَمُونَ বলিয়াছেন। অর্থাৎ তোমরা ইবাদতের কথা বলিতেছ, অথচ তোমাদের বড় আবেদ ইবলীসের খবর তোমরা রাখ না।

একদল তাফসীরকার বলেন, ফেরেশতাদের উভয় বক্তব্যের জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ বলিয়াছেন। কেননা উক্ত পূর্ণ বক্তব্যে বনী আদমের স্থলে তাহাদের পৃথিবীতে বসবাসের অভিলাষ ব্যক্ত হইয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, তোমরা আকাশের উপযোগী এবং আকাশে অবস্থানই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। অথচ তোমরা তাহা বুঝিতে পাইতেছ না। ইমাম রাযী প্রদত্ত কতিপয় ব্যাখ্যার ইহা অন্যতম। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

তাফসীরকারদের পর্যালোচনা

ইব্‌ন জারীর বলেন- আমাকে আর হাসান ইব্‌ন আল কাসিম, তাহাকে হাজ্জাজ, জারীর ইব্‌ন হাযেম ও মুবারক হইতে তাহারা হাসান ও আবূ বকর হইতে ও তাহারা কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন ঃ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বলিলেন– আমি ইহা করিতে যাইতেছি। অন্য কথায় তিনি কি করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহাদিগকে তাহা অবহিত করিলেন মাত্র।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন - আস্ সুদ্দী বলেন, আদম সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাদের অভিমত চাওয়া হইয়াছে। কাতাদাহ হইতেও অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়।

উপরোক্ত ব্যাখ্যাদ্বয়ের মধ্যে আমার মতে প্রথমটিই উত্তম। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

فِي الْأَرْضِ -এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন- আমাদিগকে আমার আব্বা, তাঁহাকে আবূ সালামা, তাঁহাকে হাম্মাদ ইব্‌ন আতা ইব্‌ন সায়েব, আবদুর রহমান ইব্‌ন সাবিত হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা) বলিয়াছেন, মক্কা হইতে পৃথিবীর বিস্তার শুরু হইয়াছে। মক্কার ঘরে প্রথম তাওয়াফ করেন ফেরেশতাগণ। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- আমি পৃথিবীতে খলীফা বানাইতে চাই অর্থাৎ মক্কায়।"

হাদীসটি মুরসাল। উহার সূত্রও দুর্বল। উহাতে 'মুদরাজ' বিদ্যমান। অর্থাৎ বর্ণনার ভিতর "অর্থাৎ মক্কায়" কথাটি বর্ণনাকারীর নিজস্ব। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। ইহা সুস্পষ্ট যে, 'আরদ' শব্দটির অর্থ ব্যাপক।

خَلِيفَةً শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীরে আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস হইতে, তিনি মুর্‌রাহ আল হামদানী হইতে এবং তিনি ইব্‌ন মাসউদ ও একদল সাহাবা (রা) হইতে নিম্ন বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বলিলেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করিতে যাইতেছি। তখন ফেরেশতারা বলিলেন- হে আমাদের প্রতিপালক! সেই খলীফা কিরূপ হইবে? তিনি বলিলেন- "তাহার সন্তান-সন্ততি হইবে এবং তাহারা ঝগড়া-ফাসাদ ও হিংসা-বিভেদে লিপ্ত হইয়া একে অপরকে হত্যা করিবে।"

ইব্ন জারীর বলেন, এই প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা হইবে এই যে, 'খলীফা' জ্বিন-ইনসানের ভিতর আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার বিধান মোতাবেক ইনসাফ কায়েম করিবেন। তাই প্রথম খলীফা হইলেন আদম (আ) এবং পরবর্তী খলীফারা হইলেন তাঁহার সেইসব উত্তরাধিকারী যাহারা আল্লাহ্‌র বিধান মতে বনী আদমের ভিতর ইনসাফের অনুশাসন কায়েম করিবেন। পক্ষান্তরে যাহারা হিংসা-বিভেদ ও রক্তারক্তি অনুসরণ করিবে, তাহারা আল্লাহ্‌র খলীফা হওয়ার যোগ্যতা হারাইবে।

ইব্ন জারীর বলেন, এখানে আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবহৃত 'খলীফা' শব্দের অর্থ হইল যুগের পর যুগ ধরিয়া বংশ পরম্পরায় একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া চলা। তিনি বলেন خليفة শব্দটি فعيلة ওযনে সৃষ্ট। অর্থ হইল স্থলাভিষিক্ত বা উত্তরাধিকারী। কেহ যদি কোন ব্যাপারে কাহারও পরে তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে বলা হয়, অমুক অমুকের খলীফা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সম্প্রদায়গত খিলাফত প্রসঙ্গে বলেন ঃ

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِى الاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ "অতঃপর তোমাদিগকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি এই জন্য যে, তোমরা কি কাজ কর তাহা দেখিব।"

এই কারণেই শাসকবর্গের প্রধান ব্যক্তিকে 'খলীফা' বলা হয়। কারণ, তিনি পূর্ববর্তী শাসক প্রধানের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি পূর্ববর্তী শাসকের দায়িত্ব পালন করেন বলিয়া তাহাকে খলীফা বলা হয়।

ইব্ন জারীর বলেন- اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً আয়াত প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলিতেন, 'এখানে আল্লাহ পাক বলেন যে, পৃথিবীতে তাহারা একের পর এক বসবাস করিবে এবং পৃথিবী আবাদ করিবে, অথচ তাহারা তোমাদের কেহ নহে।'

ইব্ন জারীর বলেন, আমাকে আবূ কুরায়েব, তাঁহাকে উসমান ইব্ন সাঈদ, তাঁহাকে বাশার ইব্ন আম্মারা, আবূ রওক হইতে, তিনি যিহাক হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই বর্ণনা শুনান ঃ

'ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, পৃথিবীতে প্রথম বসবাসকারী সম্প্রদায় হইল জ্বিন জাতি। তাহারা অবশেষে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করিল এবং রক্তপাত ঘটাইয়া চলিল। এমনকি পরস্পর ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইল। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তখন ইবলীসের নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠাইলেন তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্যে। ফলে ইবলীস ও তাহার সঙ্গীরা তাহাদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা করিল। অল্প সংখ্যক জ্বিন সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে ও পাহাড়ের নির্জন গুহায় আত্মগোপন করিয়া বাঁচিয়া গেল। অতঃপর আদম জাতিকে সৃষ্টি করিলেন এবং বিশেষভাবে তাহাদিগকে পৃথিবীর বাসিন্দা করিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিলেন ঃ

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

সুফিয়ান আছ ছাওরী আতা ইব্ন সায়েব হইতে ও তিনি ইব্ন ছাবিত হইতে বর্ণনা করেনঃ

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

আয়াত দ্বারা মূলত বনী আদমকেই বুঝানো হইয়াছে।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বলিলেন- আমি পৃথিবীতে নতুন এক মাখলূক সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিয়াছি এবং সেখানে তাহাকে আমার খলীফা বানাইব। তখন শুধু ফেরেশতারাই তাঁহার সামনে মাখলূক হিসাবে ছিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে সেরূপ কোন মাখলূক ছিল না। তাই ফেরেশতারা আরয করিলেন,

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ـ

ইতিপূর্বে আস্ সুদ্দীর বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি ইব্ন আব্বাস, ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদম সন্তানরা কি করিবে না করিবে তাহা জানাইলে তখন তাহারা উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন।

কিছু আগেই যিহাকের এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যেহেতু জ্বিন জাতি পৃথিবীতে ফাসাদ ও রক্তারক্তি সৃষ্টি করিয়াছিল, তাই তাহার উপর কিয়াস করিয়া ফেরেশতারা উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা, তাহাকে আলী ইব্ন মুহাম্মদ আত্তানাফেসী, তাহাকে আবূ মু'আবিয়া, আ'মাশ হইতে, তিনি বুকায়ের ইবনুল আখনাস হইতে, তিনি মুজাহিদ হইতে ও তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন- বনী আদমের আগমনের আগে দুই হাজার বৎসর কাল জ্বিন জাতি পৃথিবীতে বসবাস করে। অতঃপর তাহাদের ভিতর ফিতনা-ফাসাদ ও রক্তারক্তি সৃষ্টি হওয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ফেরেশতা বাহিনী পাঠাইলেন। তাঁহারা তাহাদিগকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করিলেন এবং অবশিষ্টরা সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে গিয়া আত্মগোপন করিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বলিলেন ঃ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً উহার প্রেক্ষিতে ফেরেশতারা প্রশ্ন করিলেন ঃ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً হইতে اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ পর্যন্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবুল আলীয়া বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মঙ্গলবার ফেরেশতা, বুধবারে জ্বিন ও শুক্রবারে আদমকে সৃষ্টি করেন। জ্বিন জাতি যখন বিদ্রোহী হইল, তখন ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিলেন। কারণ পৃথিবীকে তাহারা ফাসাদপূর্ণ করিয়াছিল। তাই তাহারা উহার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলার সমীপে আরয করিলেন– আপনি কি পৃথিবীতে এমন জাতি সৃষ্টি করিবেন যাহারা জ্বিন জাতির মত ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করিবে এবং তাহাদের মতই রক্তপাত ঘটাইবে ?

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমাকে হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুস সাবাহ, তাঁহাকে সাঈদ ইব্ন সুলায়মান, তাঁহাকে মুবারক ইব্ন ফুযালা ও তাঁহাকে আল-হাসান বর্ণনা করেন যে, ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্ তা'আলা اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً বক্তব্য দ্বারা ইহাই বুঝাইয়াছেন যে, 'নিশ্চয় আমি ইহা করিতে যাইতেছি।' ফলে তাহারা তাহাদের প্রভুর কথার উপর ঈমান আনিল। তখন তাহাদিগকে কিছু ইল্ম দান করা হইল এবং কিছু ইল্ম হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখা হইল। তাই তাহারা প্রাপ্ত ইল্মের ভিত্তিতে আরয করিলেন,

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ـ

তখন আল্লাহ্ পাক জবাব দিলেন ঃ إِنِّىْ أَعْلَمُ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ।

আল-হাসান বলেন- জ্বিন জাতি পৃথিবীতে ফাসাদ ও রক্তপাত ঘটাইয়াছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরে এই কথা উদ্রেক করিলেন যে, শীঘ্রই উহা আবার ঘটিবে। সুতরাং তাহারা যাহা জানিত, তাহাই মুখে প্রকাশ করিল।

আবদুর রায্যাক মুআম্মার হইতে ও তিনি কাতাদাহ হইতে أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ। আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন- আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে এই জ্ঞান দান করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বসবাসকারী সৃষ্ট জীবেরা ফাসাদ ও রক্তারক্তি করিবে। এই কারণেই তাহারা উক্ত প্রশ্ন তুলিতে পারিয়াছিলেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, আমাকে আমার পিতা, তাঁহাকে হিশাম আর রাযী, তাঁহাকে ইবনুল মুবারক মারূফ অর্থাৎ ইব্ন খুরবূজ আল মক্কী হইতে এবং তিনি আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী হইতে বর্ণনাকারীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, আবূ জা'ফর বলেন ঃ

"আস সাজল' নামক এক ফেরেশতা আছেন। তাহার দুই সহচর হইলেন হারূত ও মারূত। তাহারা প্রতিদিন তিনবার লাওহে মাহফূজের দিকে তাকাইবার অনুমতি ছিল। একদিন তিনি এমন সময়ে দৃষ্টিপাত করিলেন যখন তাহার জন্য অনুমতি ছিল না। তখন তিনি আদম সৃষ্টি ও সংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহ অবলোকন করিলেন এবং সংগোপনে হারূত-মারূতকে উহা জ্ঞাত করিলেন। অতঃপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের কাছে আদম সৃষ্টির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তখন তাহারা দুইজন উক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করেন। হাদীসটি 'গরীব'।

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আল হুসাইন আল-বাকেরের বর্ণনা হিসাবে যদি ইহাকে শুদ্ধও বলা হয়, তথাপি বলিতে হয়, তিনি আহলে কিতাব হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং উহাতে ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তাই উহা প্রত্যাখ্যান করা অপরিহার্য। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

তাহা ছাড়া এই বর্ণনায় দেখা যায়, প্রশ্নকারী ফেরেশতা ছিলেন মাত্র দুইজন। উহা আয়াতের তাৎপর্যের পরিপন্থী। ফলে উহা অধিকতর অগ্রহণযোগ্য। কারণ, আয়াত হইতে বুঝা যায়, সমবেত সকল ফেরেশতাই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। ইব্ন আবূ হাতিমের এক বর্ণনায়ও ইহাই প্রমাণিত হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, আমাকে আমার পিতা, তাঁহাকে হিশাম ইব্ন আবূ উবায়দাহ্, তাঁহাকে আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর এই বর্ণনা শুনান যে, আমি আমার পিতাকে বলিতে শুনিয়াছি, প্রশ্নকারী ফেরেশতার সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সহসা আল্লাহর তরফ হইতে আগুন আসিয়া তাহাদিগকে জ্বালাইয়া ফেলিল।

এই বর্ণনা ও পূর্ব বর্ণনাটির মত ইসরাঈলী বর্ণনা। তাই উহা গ্রহণের অযোগ্য। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন জুরায়জ বলেন- একদল ব্যাখ্যাকার বলেন যে, আল্লাহ্ ফেরেশতাদের আদম সৃষ্টি হইতে উদ্ভূত সকল পরিস্থিতি বর্ণনার পর তাহাদিগকে আলোচনা করার অনুমতি দিলে তাহারা উক্ত বক্তব্য উত্থাপন করেন। তাহারা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাহাদের সৃষ্টিকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তাহারা কি করিয়া আপনার নাফরমান সাজিবে? এরূপ নাফরমান জাতিকে আপনি কেন সৃষ্টি করিবেন? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে এই জবাব

দিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে, তোমরা তাহাদের বিষয়ে কিছু কথা জানিয়া থাকিলেও অনেক কিছুই তোমরা জান না। আমি তাহাদের বিষয়ে তোমাদের চাইতে অনেক বেশী কিছু জানি। তাহাদের ভিতর অনেক অনুগত বান্দাও সৃষ্টি হইবে।

ইব্ন জারীর বলেন, অপর একদল ব্যাখ্যাকার বলেন যে, ফেরেশতারা এই ব্যাপারে অজানা বিষয় জানার জন্য উক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাহারা যেন বলিলেন– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে সম্যক অবহিত করুন। সুতরাং ইহা অস্বীকারের উদ্দেশ্যে নহে; বরং অবগতির উদ্দেশ্যে। ইব্ন জারীর এই মতটি পছন্দ করিয়াছেন। কাতাদাহ হইতে সাঈদ বর্ণনা করেন. আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً আদম সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাদের মতামত যাচাইয়ের জন্য ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাই তাহারা اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ এই অভিমত ব্যক্ত করিলেন। কারণ, তাহারা জানিতেন, আল্লাহ্ পাকের নিকট ফিতনা-ফাসাদ ও খুন-খারাবীর চাইতে ঘৃণ্য কাজ আর কিছুই নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার প্রিয় কাজ হইল ইবাদত। তাই তাহারা وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ বলিয়া তাহাদের বক্তব্যের উপসংহার টানিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা জবাবে বলিলেন اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ নিশ্চয় আমি তাহাও জানি যাহা তোমরা জান না। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ইলমে রহিয়াছে যে, এই 'খলীফা' হইতে আম্বিয়া, রাসূল, নেককার ইত্যাকার জান্নাতী লোক সৃষ্টি হইবে।

তিনি আরও বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আমাদিগকে নিম্নোক্ত বর্ণনা শুনানো হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন ঃ

'ফেরেশতারা যখন বলিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের চাইতে কোন মর্যাদাশীল ও উত্তম জীব সৃষ্টি করেন নাই এবং আমাদের চাইতে তাঁহার কোন সৃষ্টিই জ্ঞানী নহে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষায় ফেলিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা সকল সৃষ্টিকেই এরূপ পরীক্ষায় ফেলেন— যেমন আসমান ও যমীনকেও তিনি আনুগত্যের পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়াছিলেন। আল্লাহ পাক তাই বলিলেন ঃ

اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ। "(হে আকাশ ও পৃথিবী!) ইচ্ছায় হউক কি অনিচ্ছায়, আনুগত্য কর। তাহারা বলিল, আমরা স্বেচ্ছায় অনুগত হইলাম।"

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ হইতে মুআম্মারের সূত্রে আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেন ঃ তাসবীহ বলিতে তাসবীহ পাঠ এবং তাকদীস বলিতে সালাত বুঝিতে হইবে।

আস্ সুদ্দী আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রা হইতে, তাঁহারা ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ অর্থাৎ ফেরেশতারা বলিতেছেন, আপনার জন্য আমরা সালাত আদায় করিতেছি।

উক্ত আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে মুজাহিদ বলেন ঃ আমরা আপনার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিতেছি।

যিহাক বলেন- তাকদীস অর্থ পবিত্রতা বর্ণনা। وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন, অর্থাৎ আমরা আপনার নাফরমানী করিতেছি না এবং আপনার অপছন্দনীয় কোন কাজ করিতেছি না।

ইব্ন জারীর বলেন, তাকদীস অর্থ মহত্ত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনা করা। উহা হইতেই তাহাদের বক্তব্য 'সুব্বূহুন কুদ্দূসুন' এর উৎপত্তি হইয়াছে। সুব্বূহুন অর্থ তাঁহার নিষ্কলুষতা বর্ণনা এবং কুদ্দূসুন অর্থ তাঁহার পবিত্রতা ও মহত্ত্ব বর্ণনা। এই কারণে পবিত্র ঘরকে 'বায়তুল মুক্কাদাস' বলা হয়। সুতরাং ফেরেশতাদের বক্তব্য وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ অর্থ মুশরিকরা আপনার নামের সহিত যে সব কথাগুলি যুক্ত করিতেছে, উহা হইতে আমরা আপনার নিষ্কলুষতা ও বিমুক্ততা বর্ণনা করিতেছি। আর وَنُقَدِّسُ لَكَ অর্থ কাফিররা আপনার অস্তিত্ব ও গুণাবলীর সহিত যে নীচ ধ্যান-ধারণা ও ইতর আচার-আচরণমূলক কথাবার্তার সংযোজন ঘটাইতেছে, তাহা হইতে আমরা আপনার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিতেছি।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা)-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, উত্তম বাক্য কোন্‌টি? তিনি জবাবে বলিলেন- আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের জন্য যাহা পছন্দ করিয়াছেন তাহাই উত্তম এবং তাহা হইল- 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'।

আবদুর রহমান ইব্ন কারাত হইতে ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন- 'মি'রাজের রাত্রিতে রাসূল (সা) ঊর্ধ্বাকাশে যে তাসবীহ শুনিয়াছেন তাহা হইল- 'সুবহানাল আলিয়্যিল আ'লা, সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।'

قَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لاَتَعْلَمُوْنَ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ বলেন- তাঁহার ইলমে এই কথা বিদ্যমান ছিল যে, এই খলীফার মধ্য হইতে নবী-রাসূল, নেককার বান্দা ও জান্নাতী লোক সৃষ্টি হইবে।

উক্ত আয়াতের রহস্যাবলী সম্পর্কে ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবা (রা) এবং তাবেঈন (র) যাহা কিছু বলিয়াছেন শীঘ্রই তাহা আলোচিত হইবে।

ইমাম কুরতুবী প্রথম এই আয়াতের ভিত্তিতে 'খলীফা' নির্বাচনকে ওয়াজিব বলিয়াছেন। খলীফার কাজ হইবে জনগণের ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করা ও তাহাদের বিরোধ-বিসম্বাদ দূর করা। তাহা ছাড়া মজলুমের সহায়তা করা, দণ্ডবিধি চালু করা, অন্যায়-অনাচার বিলোপ করা ইত্যাকার গুরুত্বপূর্ণ কার্যসমূহ খলীফা ছাড়া কেহ করিতে পারে না। ওয়াজিব কার্য সম্পাদনের জন্য যে ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য শর্ত হইয়া দাঁড়ায় তাহাও ওয়াজিব।

আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাআতের একদল বলেন- ইমামত কুরআন সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত হইতে হইবে। হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইমামত সেইভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া স্বয়ং রাসূল (সা) তাঁহাকে নামাযের ইমামত দিয়া সেই ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। তাই অপরদল বলেন, রাসূলে খোদা (সা)-এর ইঙ্গিতও খিলাফত লাভের জন্য দলীল হইতে পারে। অথবা খলীফায়ে রাসূল যাহাকে মনোনীত করেন, তিনি খলীফা হইতে পারেন। হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমর ফারূক (রা)-কে মনোনীত করেন। অথবা নেককারদের শূরা দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারেন। যেমন উমর ফারূক (রা) ছয়জন প্রধান সাহাবার শূরা মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা হযরত উসমান (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করেন। অথবা জাতির 'আহলুল হল ওয়াল আকদ' অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাইয়াত গ্রহণ কিংবা তাহাদের প্রদত্ত

দায়িত্বের বলে যে কোন একজনের বাইয়াত গ্রহণের দ্বারা খলীফা নির্বাচিত হইতে পারে। যেমন হযরত আলী (ক) সেইভাবে খলীফা নির্বাচিত হইয়াছেন। যখন এইভাবে কেহ খলীফা নির্বাচিত হন, তখন অধিকাংশ ইমামের মতে তাহার আনুগত্য ওয়াজিব হইয়া যায়। ইমামুল হারামাইন বলেন, ইহার উপর উম্মতের ইজমা হইয়া গিয়াছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। যদি কেহ জবরদস্তির মাধ্যমে খিলাফতের মসনদ অলংকৃত করেন, তাহা হইলেও উম্মতের ঐক্য বহাল রাখা ও রক্তারক্তি হইতে উম্মতকে রক্ষার জন্য তিনি বৈধ খলীফা হিসাবে স্বীকৃত হইবেন। ইমাম শাফেঈ এই মতের সপক্ষে দলীল পেশ করিয়াছেন।

খিলাফত বৈধ হবার জন্য কি সাক্ষী প্রয়োজন? এই প্রশ্নে ইমামদের ভিতর মতভেদ দেখা দিয়াছে। একদল বলেন, সাক্ষী শর্ত নহে। অপরদল বলেন, সাক্ষী শর্ত; তবে দুইজন সাক্ষীই যথেষ্ট।

আল জুবাঈ বলেন, চারিজন সাক্ষী এবং প্রস্তাবক ও প্রস্তাবিত লইয়া মোট ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি ওয়াজিব। তাঁহার দলীল হইল হযরত উমর (রা)-এর মনোনীত ছয় সদস্য বিশিষ্ট মজলিসে শূরা। সেখানে চারিজন সাক্ষী ছিলেন, তাহা ছাড়া ছিলেন প্রস্তাবক আবদুর রহমান ইব্ন আওফ ও প্রস্তাবিত হযরত উসমান (রা)। এই মতটি বিতর্কিত। আল্লাহই ভাল জানেন।

খলীফা হওয়ার জন্য ওয়াজিব হইল পুরুষ হওয়া, বয়স্ক হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়া, মুসলমান হওয়া, ইনসাফগার হওয়া, মুজাহিদ হওয়া, দূরদর্শী হওয়া, যুদ্ধোপযোগী স্বাস্থ্যবান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণক্ষম সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া। ইহাই বিশুদ্ধ মত। কেহ কুরায়শ হওয়া শর্ত করিয়াছেন (সম্ভবত উহা সাময়িক শর্ত)। তবে হাশেমী হওয়া এবং নিষ্পাপ ও ত্রুটিমুক্ত হওয়া শর্ত নহে। ইহা শিয়া ও রাফেজীদের প্রদত্ত শর্ত।

ইমাম বা খলীফা যদি কোন পাপ কার্য করেন, তাহা হইলে কি তাহাকে পদচ্যুত করা হইবে? ইহা লইয়াও মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। বিশুদ্ধ মত ইহাই যে, পদচ্যুত করা যাইবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

الا ان تروا كفروا بواحا عندكم من الله فيه برهان -

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের নির্দেশিত প্রমাণের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট কাফির হিসাবে না দেখা পর্যন্ত তোমরা খলীফার আনুগত্য মানিয়া চল।

খলীফা নিজে কি পদত্যাগ করিতে পারেন? এই ব্যাপারেও মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম হাসান (রা) স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়া হযরত মুআবিয়া (রা)-এর নিকট খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা তিনি বিশেষ কারণে করিয়াছিলেন এবং উহা প্রশংসিত ছিল। একই সঙ্গে দুইজন খলীফা হওয়া কিংবা দুইয়েরও অধিক হওয়া বৈধ নহে। কারণ, রাসূল (সা) বলিয়াছেন-

من جاءكم وامركم جميع يريد ان يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমাদের ভিতর আসিয়া ঐক্য বিনষ্টকারী কার্যকলাপের নির্দেশ দেয়, তাহাকে হত্যা কর, সে যেই হউক না কেন।

ইহাই অধিকাংশের মত। ইমামুল হারামাইনকে বাদ দিলে ইহার উপর উম্মতের ইজমা প্রমাণিত হয়।

কারামাতীরা বলেন, একই সঙ্গে দুইজন খলীফা থাকা বৈধ। যেমন একই সঙ্গে হযরত আলী (রা) ও হযরত মুআবিয়া (রা) খলীফা ছিলেন এবং উভয়ের আনুগত্য ওয়াজিব ছিল। একই সঙ্গে যখন একাধিক নবীর অবস্থান বৈধ ছিল, তখন একাধিক খলীফার অবস্থানও বৈধ। কারণ, নবূওত তো সর্বসম্মতভাবেই খিলাফতের চাইতে বেশী মর্যাদা রাখে।

আবূ ইসহাক হইতে ইমামুল হারামাইন বর্ণনা করেন- তিনি দুই খলীফার যুগপৎ খিলাফত বৈধ বলিয়াছেন এই শর্তে যে, রাষ্ট্র খুব বড় হইবে ও অনেক এলাকার সন্নিবেশ ঘটিবে এবং দূরত্বের কারণে এক খলীফার পক্ষে উহা পরিচালনা করা দুরূহ হইয়া পড়িবে।

আমি বলিতেছি, ইহার উদাহরণ হইল সমসাময়িক কালে ইরাকের আব্বাসীয় খিলাফত, মিসরের ফাতেমী খিলাফত ও স্পেনের উমাইয়া খিলাফত। আমি ইনশাআল্লাহ ' কিতাবুল আহকাম'-এর শেষভাগে ইহা সবিস্তারে আলোচনা করিব।

(٣١) وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٣٢) قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

(٣٣) قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ○

৩১. অনন্তর তোমার প্রভু আদমকে সমস্ত কিছুর নাম শিখাইলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের সামনে সেই সব বস্তু পেশ করিলেন এবং বলিলেন, আমাকে এইগুলির নাম বল, যদি তোমরা (পূর্ব বক্তব্যে) সত্যবাদী হইয়া থাক।

৩২. তাহারা বলিল, তুমি পবিত্র, তুমি যতটুকু বিদ্যা দান করিয়াছ তাহা ছাড়া তো আমাদের কোন বিদ্যা নাই, তুমিই সর্বজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠতম কুশলী।

৩৩. তোমার প্রভু বলিলেন, হে আদম! তাহাদিগকে এইগুলির নাম বল; যখন সে তাহাদিগকে উহার নাম বলিয়া দিল, তোমার প্রভু বলিলেন- 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিশ্চয় আমি আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত অদৃশ্য বস্তুর খবর রাখি এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, তাহাও ভালভাবে জানি।'

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের উপর আদমের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তুলিয়া ধরিয়াছেন। বিদ্যায় আদমের কাছে ফেরেশতারা হার মানিয়াছেন। বস্তু নিচয়ের পরিচয় দিতে ফেরেশতারা অপারগ হইলে আদম তাহাদিগকে শিখাইয়া দিয়া শিক্ষাগুরুর মর্যাদায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইলেন।

এই বৈশিষ্ট্য লাভের ঘটনাটি ঘটিয়াছে ফেরেশতাদের আদমকে সসম্ভ্রমে প্রণতি জানাবার পরে। তথাপি পরের ঘটনাটি আল্লাহ্ তা'আলা এই জন্য আগে উল্লেখ করিলেন যে,

ফেরেশতারা যে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণেই আদম সৃষ্টির রহস্য বুঝিতে ব্যর্থ হইয়া প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা জবাবে তাহাদের জ্ঞানের যে সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করিলেন, তাহার যথার্থতা প্রমাণ করা। আল্লাহ্ তা'আলা এই ঘটনার মাধ্যমে ফেরেশতাদের বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার সৃষ্ট খলীফা জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহাদের উপর শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا আয়াতাংশ সম্পর্কে আস্ সুদ্দী হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে জনৈক বর্ণনাকারীর বর্ণনার ভিত্তিতে বলেন- তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে তাহার সন্তান-সন্ততির প্রত্যেকের নাম এবং প্রত্যেকটি জীব-জন্তুর নাম যথা-গাধা, ঘোড়া, উট ইত্যাদি শিক্ষা দিলেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا অর্থাৎ যেই সব নাম দ্বারা মানুষ একে অপরকে ও জীব-জন্তুর বিভিন্ন শ্রেণীকে চিনিতে পারে এবং আসমান, যমীন, ভূ-ভাগ, সমুদ্র, ঘোড়া, গাধা, ইত্যাদির পরিচয় লাভ করে, তাহাই আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে শিক্ষা দিলেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মাসউদ ইব্ন মা'বাদ, তাঁহার নিকট হইতে আসিম ইব্ন কুলাইব এবং তাঁহার নিকট হইতে ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে যাবতীয় আসবাবপত্র ও হাড়ি-পাতিলের নাম শিখাইলেন। এমনকি উদরোৎসারিত মরুৎ পর্যন্ত বাদ যায় নাই।

মুজাহিদ বলেন ঃ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا অর্থাৎ তাহাকে তিনি পশু-পাখী সহ সকল কিছুর নাম শিখাইলেন।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র, কাতাদাহ প্রমুখ পূর্বসূরীরা উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন- যাবতীয় কিছুর নাম শিখাইলেন।

রবী' আশ্ শামী বলেন- নক্ষত্ররাজির নাম শিখাইলেন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ বলেন- তাঁহার সকল সন্তান-সন্ততির নাম শিখাইলেন।

ইব্ন জারীরের অনুসৃত অভিমত হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সকল ফেরেশতার ও তাহার সকল সন্তান-সন্ততির নাম শিখাইয়াছেন। কারণ ثُمَّ عَرَضَهُمْ আয়াতাংশে هم সর্বনামটি বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই তিনি উক্ত অভিমতকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

অবশ্য هم সর্বনাম শুধু জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের জন্য নির্দিষ্ট, তাহা জরুরী নহে। বুদ্ধি-বিবেকহীন প্রাণী বা বস্তুও উহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। আরবী ভাষায় 'তাগলীব' হিসাবে তাহা করা হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى اَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

"আল্লাহ্ তা'আলা সকল প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে। উহাদের এক শ্রেণী পেটে ভর দিয়া চলে, অন্য শ্রেণী চলে দুই পায়ে ভর করিয়া এবং এক শ্রেণী চার পায়ে চলে। আল্লাহ যাহা যেরূপ ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) عرضهم এর স্থলে عرضها পাঠ করিতেন। উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) উহাকে عرضها পাঠ করিতেন অর্থাৎ নাম সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহ।

বিশুদ্ধ মত ইহাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সকল কিছুর নাম, শ্রেণী, গুণাবলী ও কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করিলেন। যেমন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, উদরোৎসারিত মরুৎ পর্যন্ত বাদ পড়ে নাই। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী, বস্তু, শ্রেণী ও তাহাদের ছোট-বড় সর্ববিধ কার্যকলাপ সম্পর্কে তাহাকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে।

এই কারণেই ইমাম বুখারী তাঁহার সহীহ সংকলনের 'তাফসীর' অধ্যায়ে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আমাকে মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম, তাহাকে হিশাম, কাতাদাহ হইতে ও তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'রাসূল (সা) বলিয়াছেন- আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, 'আমার খলীফা।'

আমাকে ইয়াযীদ ইব্‌ন যরী', তাহাকে সাঈদ, কাতাদাহ হইতে এবং তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'রাসূল (সা) বলিয়াছেন- কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ সমবেত হইয়া বলাবলি করিবে, কেহ যদি আমাদের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করিত। এতদুদ্দেশ্যে তাহারা আদম (আ)-এর কাছে গিয়া বলিবে- আপনি মানব জাতির পিতা। আল্লাহ পাক আপনাকে নিজের হাতে গড়িয়াছেন। তাঁহার ফেরেশতারা আপনাকে সিজদা করিয়াছেন। তিনি আপনাকে সকল কিছুর নাম শিখাইয়াছেন। সুতরাং আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করুন; অন্তত এখানে যেন আমরা শান্তিতে থাকিতে পারি। তিনি বলিবেন, এখানে আমি তোমাদের কাজে আসিব না। তখন তিনি নিজের পাপ স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইবেন। অতঃপর বলিবেন, তোমরা নূহ (আ)-এর কাছে যাও। তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম রাসূল করিয়া দুনিয়াবাসীর কাছে পাঠাইয়াছেন। তখন তাহারা তাঁহার কাছে আসিবে। তিনিও বলিবেন, এখানে আমি তোমাদের কোন কাজে আসিব না। তিনি নিজেই না জানিয়া আল্লাহ্‌র কাছে পুত্রের জন্য সুপাারিশের ভুলটি স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইবেন। তাই তিনি বলিবেন- তোমরা খলীলুল্লাহর কাছে যাও। তাহারা তাঁহার কাছে আসিলে তিনিও বলিবেন- এখানে আমি তোমাদের কোন কাজে আসিব না। বরং তোমরা মূসা (আ)-এর কাছে যাও। তাঁহার সহিত আল্লাহ্ পাক সরাসরি কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহাকে তাওরাত দান করিয়াছেন। তখন তাহারা তাঁহার নিকট যাইবে। তিনিও বলিবেন, এখানে তোমাদের জন্য আমি উপযুক্ত নহি এবং তিনি হত্যার অপরাধ ছাড়াই এক ব্যক্তিকে হত্যার জন্য নিজ প্রভুর কাছে লজ্জিত হইবেন। তখন তিনি বলিবেন, তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি একাধারে আবদুল্লাহ, রাসূলুল্লাহ, কলেমাতুল্লাহ ও রূহুল্লাহ। অতঃপর তাহারা তাঁহার কাছে যাইবে। তিনিও বলিবেন, এখানে তোমাদের জন্য আমি নহি। তোমরা আল্লাহর বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে যাও। আল্লাহ তাঁহার পূর্বাপর অপরাধ মাফ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তাহারা আমার কাছে আসিবে। তখন আমি আমার প্রভুর অনুমতি গ্রহণের জন্য

যাইব। তিনি আমাকে শাফাআতের জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন। আমি যখন আমার প্রভুর সন্দর্শন লাভ করিব, সঙ্গে সঙ্গে সিজদারত হইব এবং তাঁহার মর্জী মোতাবেক প্রার্থনা করিব। অতঃপর বলা হইবে- মাথা উঠাও। এবারে দাবী পেশ কর, মঞ্জুর হইবে; বক্তব্য পেশ কর, শোনা হইবে এবং শাফাআত কর, কবূল হইবে। তখন মাথা তুলিব। অতঃপর তাঁহারই প্রদত্ত শিক্ষানুসারে তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিব। তারপর আমি শাফাআত করিব। উহা সীমিত সংখ্যায় মঞ্জুর হইবে। তাহাদিগকে আমি জান্নাতে পৌঁছাইব। আবার প্রভুর দরবারে আসিয়া সিজদাবনত হইব। তিনি অনুমতি দিলে পুনরায় শাফাআত করিব। তখন সীমিত সংখ্যক লোক মুক্তি পাইবে। তাহাদিগকে জান্নাতে পৌঁছাইয়া তৃতীয়বার প্রভুর দরবারে ফিরিয়া আসিব। তখনও অনুরূপ হইবে। চতুর্থবার আসিয়া সকলকেই মুক্ত করিব। অবশেষে কেবল তাহারাই জাহান্নামে থাকিবে যাহাদিগকে কুরআন গতিরোধ করিবে। অর্থাৎ কুরআন অস্বীকার করায় যে সব কাফির-মুশরিকের জন্য জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া ওয়াজিব হইয়াছে।

ইমাম বুখারী পূর্বোক্ত আয়াতাংশ প্রসঙ্গে উপরোক্ত হাদীসদ্বয় পেশ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ হিশাম ইব্ন আবূ আব্দুল্লাহ্ আদ্ দস্তওয়াইর বরাতে কাতাদাহ হইতে উহা বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবার সনদেও কাতাদাহ হইতে উক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

এই দীর্ঘ হাদীসটি এখানে উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য শুধু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বক্তব্যটুকু :

فيأتون ادم فيقولون انت ابو الناس خلق الله بيده واسجدلك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء -

(অতঃপর তাহারা আদম (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আপনি মানব জাতির পিতা। আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার ফেরেশতারা আপনাকে সসম্ভ্রমে প্রণতি জানাইয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সকল কিছুর পরিচয় শিখাইয়াছেন।)

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি জগতের সকল কিছুরই পরিচয় দিয়াছেন। অতএব তিনি বলিলেন : ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ অর্থাৎ নামপদবাচ্য সকল কিছুই। যেমন আবদুর রায্যাক মুআম্মারের সনদে কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন- অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নামপদবাচ্য সকল কিছুই ফেরেশতাদের সামনে পেশ করিলেন। অতঃপর বলিলেন : اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (যদি সত্যবাদী হইয়া থাক, এইগুলির নাম বল।)

আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীরে আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রা হইতে, তাঁহারা ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন :

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সমগ্র সৃষ্টির পরিচয় জানাইয়া পরে উহা ফেরেশতাদের সামনে পেশ করিলেন।

ইব্ন জুরায়জ বলেন- 'অতঃপর নাম নির্দেশিত সৃষ্টিসমূহ ফেরেশতাদের সামনে পেশ করিলেন।'

ইব্ন জারীর বলেন- আমাদিগকে আল কাসিম, তাঁহাকে আল হুসাইন, তাঁহাকে আল হাজ্জাজ, জারীর ইব্ন হাযিম ও মুবারক ইব্ন ফুযালা হইতে, তাঁহারা আবূ বকর আল-হাসান

ও কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন ঃ তাঁহাকে তিনি সকল কিছুর নাম শিখাইয়াছেন এবং প্রত্যেকটি বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া সেইগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে পেশ করা হইয়াছে।

إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ। আয়াতাংশ সম্পর্কে এই সনদেই আল-হাসান ও কাতাদাহ বলেন, আমি এমন কোন কিছু সৃষ্টি করি নাই যাহা সম্পর্কে তোমাদের ভালভাবে জানা নাই। তথাপি যদি তোমরা (তোমাদের প্রকাশিত অভিমতে) সত্য হইয়া থাক, তাহা হইলে সেইগুলির নাম বল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ। অর্থ 'যদি তোমাদের এই জানা সত্য হয় যে, আমি পৃথিবীতে 'খলীফা' সৃষ্টি করিব না।'

ইব্‌ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে ক্রমাগত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুর্‌রা, আবূ সালেহ, আবূ মালিক ও আস্‌ সুদ্দী বর্ণনা করেন ঃ

إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ। অর্থাৎ বনী আদম পৃথিবীতে ঝগড়া-ফাসাদ ও রক্তারক্তি করিবে বলিয়া তোমরা যে ধারণা করিয়াছ, তাহাতে যদি তোমরা সত্য হও।

ইব্‌ন জারীর বলেন– এই ব্যাপারে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বিশ্লেষণই উত্তম। তিনি ইহার তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন ঃ

'হে বক্তব্য পেশকারী ফেরেশতাবৃন্দ! তোমরা যে বলিলে, বনী আদম পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ রক্তারক্তি করিবে এবং বনী আদমের বদলে তোমাদের মধ্য হইতে খলীফা বানাইলে তাহার অনুগত থাকিয়া ইবাদত বন্দেগী করিবে, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তোমাদের সামনে পেশকৃত বস্তুসমূহের নাম-পরিচয় বল। তোমরা এইগুলি সদা সর্বদা দেখা সত্ত্বেও যদি এই জ্ঞাত বস্তুসমূহের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হও, তাহা হইলে যেই ভাবী কার্যাবলী তোমরা জ্ঞাত নহ, তাহা সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কি করিয়া সত্য হইতে পারে?

আল্লাহ্ তা'আলার এই প্রচ্ছন্ন ধমকের সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতারা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন ঃ

سُبْحٰنَكَ لاَعِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا - اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ হে সর্ববিষয়ের জ্ঞানাধার! হে সমগ্র সৃষ্টি ও কার্যাবলীর শ্রেষ্ঠতম কুশলী! তুমি যাহাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান কর ও যাহাকে ইচ্ছা বঞ্চিত রাখ। এই ব্যাপারে তোমার হিকমতই অতুলনীয় ও ন্যায়ানুগ।

ইহা ফেরেশতাদের তরফ হইতে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বর্ণনামূলক বক্তব্য। ইহার তাৎপর্য এই যে, তাঁহার মর্জী ছাড়া তাঁহার সার্বিক জ্ঞানের কিছুমাত্রও কেহ অর্জন করিতে পারে না এবং তিনি যাহা শিখান নাই, তাহা কেহ শিখিতে পারে না। তাই তাহারা সবিনয়ে বলিলেন ঃ

سُبْحٰنَكَ لاَعِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবূ মুলাইকা, হাজ্জাজ, হাফস ইব্‌ন গিয়াস, আবূ সাঈদ আল আশাজ্জ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন- উহা আল্লাহ পাকের সর্ববিধ গর্হিত ব্যাপার হইতে পবিত্রতা বর্ণনামূলক শব্দ। হযরত উমর (রা) একদিন সহচর পরিবেষ্টিত হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন- 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থ তো জানি, কিন্তু 'সুবহানাল্লাহ' অর্থ কি? আলী (ক) উত্তর দিলেন- উহা আল্লাহ্ তা'আলার নিজের জন্য মনোনীত একটি বাক্য। উহা পাঠ করাকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন- আমাকে আমার পিতা, তাঁহাকে ফুযায়ল ইবনু নযর ইব্‌ন আদী বর্ণনা করেন– এক বক্তি মায়মূন ইব্‌ন মিহ্‌রানকে 'সুবহানাল্লাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন- উহা এমন একটি নাম যাহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব ও পবিত্রতা বর্ণিত হয়।

قَالَ يٰٓادَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَاتُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ـ

আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে যায়দ ইব্‌ন আস্‌লাম বলেন- অর্থাৎ তুমি জিবরাঈল, তুমি মিকাঈল, তুমি ইসরাফীল, এইরূপ সমস্ত কিছুর নাম বলিতে গিয়া এমনকি কাকের নাম পর্যন্ত বলিলেন।

قَالَ يٰٓادَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে মুজাহিদ বলেন- কবুতর ও কাক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কিছুর নাম বলিলেন। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আল-হাসান ও কাতাদাহ হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

বস্তুসমূহের নাম পরিচয় শিক্ষা দানের ফলে যখন আদম (আ)-এর মর্যাদা ফেরেশতাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ

اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَاتُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ـ

অর্থাৎ আমি কি তোমাদিগকে আগেই বলি নাই যে, আমি দৃশ্য কি অদৃশ্য, গোপন কি প্রকাশ্য সকল কিছুই সর্বাধিক জানি। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى "আর যদি তুমি প্রকাশ্যে কিছু বল, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি অন্তর্নিহিত গোপন কথাও জানিতে পাইবেন।

তেমনি হুদহুদ পাখি সম্পর্কে সংবাদ প্রদান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা সুলায়মান (আ)-কে বলিলেন ঃ

اَلاَّ يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ـ اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

"তাহারা কি সেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হইবে না যিনি নভোমণ্ডল ও পৃথিবীতে লুক্কায়িত বস্তুর প্রকাশ ঘটাইয়াছেন এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ তাহা যিনি জানেন। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই। তিনি মহান আরশের অধিপতি।"

কেহ কেহ বলেন ঃ وَاَعْلَمُ مَاتُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ অর্থাৎ আমি যাহা উল্লেখ করি নাই (বরং গোপন রাখিয়াছি)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ وَاَعْلَمُ مَاتُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ অর্থাৎ আমি প্রকাশ্য ব্যাপারের মতই গোপনীয় ব্যাপার জানি। ইবলীস তাহার অন্তরে যে দম্ভ ও অহংকার লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহা আমি জানি।

ইব্ন মাসউদ ও একদল সাহাবা (রা) হইতে ক্রমাগত ইব্ন আব্বাস, মুর্রা, আবূ সালেহ, আবূ মালিক ও আস্ সুদ্দী বর্ণনা করেন ঃ

ফেরেশতাদের বক্তব্য أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ হইল তাহাদের প্রকাশ্য কথা এবং ইবলীসের অন্তরে যে অহংকার নিহিত রহিয়াছে তাহাই গোপন কথা।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুজাহিদ, আস্ সুদ্দী, যিহাক ও ছাওরী উক্ত আয়াতের অনুরূপ তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন; ইব্ন জারীর এই অভিমতই পছন্দ করিয়াছেন।

আবুল আলীয়া, রবী' ইব্ন আনাস, আল-হাসান ও কাতাদাহ বলেন ঃ 'আমাদের চাইতে বিজ্ঞ ও মর্যাদাবান আল্লাহ পাকের আর কোন সৃষ্টি নহে'- ফেরেশতাদের এই আলোচনাই হইল উক্ত আয়াতে উল্লেখিত গোপন কথা।

রবী' ইব্ন আনাসের বরাতে আবূ জা'ফর আর-রাযী বলেন- উক্ত আয়াতের প্রকাশ্য কথা হইল, 'আপনি কি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা পৃথিবীতে ঝগড়-ফাসাদ ও রক্তারক্তি করিবে?' পক্ষান্তরে উহার গোপন কথা হইল ফেরেশতাদের এই আলোচনা-আল্লাহ্ তা'আলার এমন কোন সৃষ্টি নাই যাহারা আমাদের চাইতে জ্ঞানী ও মর্যাদাবান।' অবশেষে তাহারা জানিতে পাইলেন যে, আল্লাহ আদম (আ)-কে তাহাদের চাইতে জ্ঞানী ও মর্যাদাবান করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর বলেন- আমাকে ইউনুস ও তাঁহাকে ইব্ন ওহাব, আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম হইতে ফেরেশতা ও আদম (আ) সম্পর্কিত কাহিনী প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বলিলেন, যেভাবে তোমরা বস্তু নিচয়ের নামসমূহ জান না, তেমনি তোমরা বনী আদমের ঝগড়া-ফাসাদের ব্যাপারটি জানিলেও তাহাদের মধ্যে যে বহু অনুগত বান্দা হইবে তাহা তোমরা জান না। কারণ, নাফরমানীর ব্যাপারটি তোমাদিগকে জানিতে দিলেও ফরমাবরদারীর দিকটা তোমাদের কাছে গোপন রহিয়াছে।

যায়দ ইব্ন আসলাম আরও বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা আগেই নাফরমানদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন ঃ

لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ "অবশ্যই আমি (নাফরমান) জ্বিন ও ইনসান দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিব।"

অথচ ফেরেশতারা তাহাও জানিতেন না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে যাহা দান করিয়াছেন তাহা দেখিতে পাইয়া আদমের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইলেন।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ এই ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অভিমতই উত্তম। তিনি বলেন- অর্থাৎ আমি আমার আসমান ও যমীনের সকল গায়বী ব্যাপারে ইলমের সাহায্যে তোমরা যাহা বলিয়াছ আর যাহা গোপন করিয়াছ, সকল কিছুই ভালভাবে জানিয়াছি। বনী আদমের যে নাফরমানীর কথা বল তাহা যেমন জানি, তেমনি জানি তোমাদের মধ্যকার ইবলীসের নাফরমানী ও অহংকারের কথাও। তিনি আরও বলেন ঃ

ইবলীসের গোপন মনোভাবটি সকলকে জড়াইয়া বলার রীতি আরবী ভাষায় বিদ্যমান। তাহারা দলের দু'একজন নিহত কিংবা পরাজিত হইলে বলে। قتل الجيش وهزموا

তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ "নিশ্চয় তোমাকে যাহারা হুজরার পিছন হইতে ডাকে।"

এখানে উদ্দিষ্ট মাত্র একজন। তিনি বনূ তমীমের লোক। সেইভাবে وَأَعْلَمُ مَاتُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ আয়াতটিও শুধু ইবলীসের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

শয়তানের অহংকার ও পতন

(٣٤) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۚ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৩৪. অতঃপর যখন আমি ফেরেশতাগণকে বলিলাম, 'আদমকে সিজদা কর', তখন ইবলীস ভিন্ন সকলেই সিজদা করিল। সে দম্ভভরে অস্বীকার করিল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে যে শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির মর্যাদা দিয়া বনী আদমের উপর বিরাট অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ফেরেশতাগণের প্রতি আদম (আ)-কে সিজদা করার নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমকে এই মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন। বহু হাদীসেও এই ব্যাপারটি বর্ণিত হইয়াছে। উপরে আলোচিত শাফাআতের হাদীসেও এবং ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। হযরত মূসা (আ) সম্পর্কিত নিম্ন হাদীসটিতেও উহা বর্ণিত হইয়াছে ঃ

رب ارنى ادم الذى اخرجنا ونفسه من الجنة فلما اجتمع به قال انت ادم الذى خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته .... الحديث -

(প্রভু হে! আমাকে আদম (আ)-কে দেখান যিনি নিজেকে ও আমাদের সকলকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়াছেন। যখন তাহারা একত্রিত হইলেন তখন মূসা (আ) বলিলেন, আপনি সেই আদম (আ) যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়া তাহাতে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলেন এই তাঁহার ফেরেশতারা তাঁহাকে সিজদা করিয়াছিলেন? .... আল-হাদীস)।

ইনশাআল্লাহ কিছু পরে হাদীসটি সবিস্তারে আলোচিত হইবে। ইব্ন জারীর বলেন ঃ

আমাকে আবূ কুরায়ব, তাঁহাকে উসমান ইব্ন সাঈদ, তাঁহাকে বাশার ইব্ন আম্মারা, আবূ রউফ হইতে, তিনি যিহাক হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন- ইবলীস ফেরেশতাদেরই একটি গোত্রভুক্ত ছিল। তবে তাহারা ছিল আগুনের সৃষ্টি। এই গোত্রটিকে জ্বিন বলা হইত। তাহার নাম ছিল হারিছ। সে জান্নাতের খাজাঞ্চী ছিল। তিনি আরও বলেন, এই গোত্র ছাড়া অন্য সব ফেরেশতারা ছিলেন নূরের সৃষ্টি। কুরআনে বর্ণিত জ্বিনরা অগ্নিশিখা হইতে সৃষ্টি। উহা ঊর্ধ্বগামী হয় এবং প্রজ্বলিত আগুন হইতে উদ্গত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ মাটির সৃষ্টি। পৃথিবীতে প্রথম বাসিন্দা ছিল জ্বিন জাতি। তাহারা পৃথিবীতে যখন চরম ফিতনা-ফাসাদ ও রক্তারক্তি সৃষ্টি করিল এবং মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত হইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ফেরেশতা বাহিনীর সঙ্গে সদলবলে ইবলীসকেও পাঠাইলেন। ইবলীসের দলও জ্বিন ছিল। তাহারা যুদ্ধ করিয়া পৃথিবীর জ্বিন জাতিকে ধ্বংস করিল এবং অবশিষ্টরা সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে ও পাহাড়ের গুহায় পালাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। এই বিজয় ইবলীসের মনে অহংকার সৃষ্টি

করিল। সে মনে মনে বলিল, আমি যাহা করিলাম তাহা আর কেহ কখনও করিতে পারে নাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মনের এই অবস্থা জানিতে পাইলেন। কিন্তু ফেরেশতাগণকে তাহা জানান নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বলিলেন ঃ

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করিতে যাইতেছি।)

ফেরেশতারা জবাবে বলিলেন ঃ

اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ (كما افسد الجن وسفكت الدماء وانما بعثنا عليهم لذالك) -

"আপনি কি পৃথিবীতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা পৃথিবীতে ফাসাদ ও রক্তপাত ঘটাইবে, যেভাবে জ্বিন জাতি ঘটাইয়াছে? অথচ আমরা তো তাহাদিগকে শায়েস্তা করার জন্যই এখানে প্রেরিত হইয়াছি।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যুত্তরে বলিলেন ঃ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ। অর্থাৎ আমি ইবলীসের অন্তরের খবর রাখি যাহা তোমরা জান না। তাহার অন্তর দম্ভ ও অহংকারে পূর্ণ হইয়াছে।

অতঃপর তিনি আদম সৃষ্টির জন্য মাটি আনিতে বলিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে 'লাযিব' মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিলেন। 'লাযিব' বলা হয় পবিত্র ছানা মাটিকে। মাটিকে ছানিয়া খামীরার মত আঁটালো ও শক্ত করাকে 'হামাইম মাসনূন' বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা সেই মাটি দ্বারা নিজ হাতে আদমকে সৃষ্টি করিলেন। মাটির দেহ সৃষ্টি করিয়া চল্লিশ দিন রাখিয়া দিলেন। তখন ইবলীস আসিয়া তাহাকে লাথি মারিয়া ওলট-পালট করিয়া দেখিত যে, কোথাও ফাঁপা রহিয়াছে কিনা। যেহেতু উহা مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ছিল অর্থাৎ দোআঁশ মাটির গড়া পাত্রবৎ ছিল, তাই উহা আঘাত পাইয়া আওয়াজ করিত। তখন ইবলীস উহার মুখ দিয়া ঢুকিয়া মলদ্বার দিয়া বাহির হইত এবং মলদ্বার দিয়া ঢুকিয়া মুখ দিয়া বাহির হইত। অতঃপর বলিত, তুমি কোন বস্তুই নহ। কারণ, তোমাকে নগণ্য এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমি যদি তোমার উপর কর্তৃত্ব পাই, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তোমাকে অমান্য করিব। অতঃপর যখন আল্লাহ তাহার ভিতর প্রাণ প্রবিষ্ট করাইলেন, উহা যেহেতু মাথার দিক হইতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাই পূর্ণ দেহ তখনও সক্রিয় হয় নাই। শুধু সর্বাঙ্গে গোশ্‌ত ও রক্ত সৃষ্টি হইতেছিল। যখন প্রাণ নাভি পর্যন্ত পৌঁছিল, তখন আদম (আ) নিজ দেহের দিকে তাকাইয়া অবাক হইলেন এবং তখনই উঠার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا "মানুষ বড়ই তাড়াহুড়া প্রিয় সৃষ্টি।" (১৭ ঃ ১১) অর্থাৎ ভাল-মন্দ কোন ক্ষেত্রেই তাহার ধৈর্য থাকে না।

অবশেষে যখন সর্বাঙ্গে প্রাণ সঞ্চারিত হইল, তখন তিনি হাঁচি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের ইঙ্গিত 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' বলিলেন। জবাব আল্লাহ পাক বলিলেন, 'য়্যারহামুকাল্লাহু য়্যা আদম।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীস ও তাহার সঙ্গী ফেরেশতাগণকে (আকাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণকে নহে) হুকুম দিলেন- 'আদমকে সিজদা কর।' তখন ইবলীস ছাড়া সকল ফেরেশতাই সিজদা করিলেন, শুধু ইবলীস দম্ভভরে উহা অস্বীকার করিল। যখন তাহার অন্তরে

অহংকার ও বড়াই জাগ্রত হইল, তখন সে বলিল, আমি তাহাকে সিজদা করিব না। আমি তো তাহা হইতে উত্তম। আমি তাহার বয়ঃজ্যেষ্ঠ। সৃষ্টির দিক দিয়াও আমি অধিক শক্তিশালী। তাহাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং আমাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে আগুন দ্বারা। আর আগুন মাটি হইতে শক্তিশালী।

ইবলীস যখন সিজদা দিতে অস্বীকার করিল, আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাহাকে ইবলীস বলিয়া আখ্যা দিলেন অর্থাৎ সমস্ত কল্যাণ হইতে বিদূরিত ও বঞ্চিত করিলেন। অনন্তর তাহার নাফরমানীর শাস্তিস্বরূপ তাহাকে বিতাড়িত শয়তানে পরিণত করিলেন।

অতঃপর এইসব বস্তু ইবলীসের সঙ্গী অগ্নিসৃষ্ট ফেরেশতাদের সামনে পেশ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, 'আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করিব না, তোমাদের এই ধারণা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এইগুলির নাম বল।'

উক্ত ফেরেশতারা যখন জানিতে পাইলেন যে, না জানিয়া শুনিয়া ভবিষ্যতের গায়বী কথা বলায় আল্লাহ্ তা'আলা নারাজ হইয়াছেন, তখন তাহারা সবাই বলিলেন- আল্লাহ ছাড়া কেহ গায়বী কথা জানে এরূপ অপবিত্র ধারণা হইতে আমরা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। মূলত আপনি যাহা শিখাইয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের অন্য কোন জ্ঞান নাই। আপনি তো যাহা শিখাইবার তাহা আদমকে শিখাইয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন- হে আদম, তাহাদিগকে এইগুলির নাম বলিয়া দাও। যখন আদম (আ) সেইগুলির নাম বলিয়া দিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন– হে প্রশ্নকারী ফেরেশতাকুল! আমি কি বলি নাই যে, আমি আসমান যমীনের সকল গায়েবী খবর খুব ভালভাবেই জানি এবং আমি ছাড়া তাহা আর কেহ জানে না। তাই তোমরা যাহা প্রকাশ কর তাহা যেমন জানি, তেমনি জানি তোমরা যাহা প্রকাশ কর না তাহাও। অর্থাৎ ইবলীসের অন্তর্নিহিত দম্ভ ও অহংকারের খবরও রাখি।

উপরোক্ত হাদীসটি গরীব। ইহার ভিতরে এমন কিছু কথা আছে যাহা প্রশ্নাতীত নহে। মশহুর তাফসীরে এই সনদে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীরে আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রা হইতে, তাঁহারা ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁহার পছন্দনীয় সৃষ্টি সম্পন্ন করিয়া আরশে সমাসীন হইলেন, তখন ইবলীসকে আসমান ও যমীনের আধিপত্য প্রদান করিলেন। সে ফেরেশতা ছিল। জান্নাতের খাজাঞ্চীখানার দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত ছিল বলিয়া তাহাকে জ্বিন বলা হইত। এই বিশাল দায়িত্বভার তাহার অন্তরে এই গর্ব সৃষ্টি করিল যে, ফেরেশতাদের উপর তাহার শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে বলিয়াই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে এত বড় দায়িত্ব দিয়াছেন। অন্তর্যামী ইহা জানিতে পাইয়া ফেরেশতাগণকে ডাকিয়া বলিলেন- অবশ্যই আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করিব। তাঁহারা প্রশ্ন করিলেন, প্রভু হে, সেই খলীফা কিরূপ হইবে? তিনি বলিলেন, তাহার সন্তান-সন্ততি হইবে, তাহারা পারস্পরিক হিংসায় লিপ্ত হইয়া একে অপরকে হত্যা করিবে। তাহারা তখন বলিলেন, পরোয়ারদেগার, আপনি কেন এরূপ ফাসাদ ও রক্তারক্তি সৃষ্টিকারী খলীফা পৃথিবীতে পাঠাইবেন? আমরাই তো আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনার জন্য রহিয়াছি। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আমি তাহাও জানি যাহা তোমরা জান না। অর্থাৎ তোমাদের ইবলীসের অবস্থাও জানি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী হইতে মাটি আনার জন্য জিবরাঈল (আ)-কে পাঠাইলেন। পৃথিবী বলিল, তুমি আমাকে মাটি কমাইয়া সংকুচিত করিবে, ইহা হইতে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাই। তখন জিবরাঈল (আ) মাটি না নিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং আরয করিলেন, পরোয়ারদেগার, পৃথিবী তোমার কাছে পানাহ্ চাওয়ায় আমি তাহাকে পানাহ্ দিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মিকাঈল (আ)-কে পাঠাইলেন। তাঁহার কাছেও পৃথিবী অনুরূপ বলায় তিনিও ফিরিয়া আসিলেন এবং জিবরাঈল (আ)-এর মত একই ওজর পেশ করিলেন। অতঃপর মালিকুল মউত আযরাঈল (আ)-কে পাঠানো হইল। তাঁহার কাছেও পৃথিবী পূর্বানুরূপ বলিল। তখন তিনি বলিলেন, 'আমিও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাঁহার হুকুম পালন না করিয়া ফিরিয়া যাওয়া হইতে পানাহ চাহিতেছি। এই বলিয়া তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের লাল, সাদা, কালো ইত্যাদি রঙের মাটি একত্র করিয়া লইয়া গেলেন। এই কারণে আদম সন্তানগণ বিভিন্ন রঙের হইয়াছে।

অতঃপর মাটিক ছানিয়া খামীরা বানানো হইল এবং ফেরেশতাগণকে বলা হইল– আমি মাটি দ্বারা মানুষ গড়িতেছি। যখন সঠিকভাবে গড়া হইবে এবং উহাতে আমি প্রাণ সঞ্চার করিব, তখন তোমরা উহাকে সিজদা করিবে। আয়াত ঃ

اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ـ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ ـ

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতে আদমকে গড়িলেন। উদ্দেশ্য ইবলীস যেন আদম সৃষ্টির ব্যাপার লইয়া কোনরূপ অহংকারের সুযোগ না পায়। আদমের দেহ গড়িয়া চল্লিশ বছর রাখিয়াছিলেন। ফেরেশতারা তাহা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে ইবলীস বেশী অস্থির হইল। সে যখন উহার পাশ দিয়া যাইত, তখন আঘাত করিত। সঙ্গে সঙ্গে উহা পাতিল, হাঁড়ির মত আওয়াজ করিত। তখন সে বলিত, মাটি ছানিয়া ইহা কি বস্তু বানানো হইয়াছে? অতঃপর সে উহার মুখ দিয়া ঢুকিয়া পশ্চাৎদ্বার দিয়া বাহির হইত। অতঃপর ফেরেশতাগণকে বলিত, ইহা হইতে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। তোমাদের প্রভু অভাবমুক্ত এবং ইহা পেট সর্বস্ব। যদি আমি ইহার উপর আধিপত্য লাভ করি, তাহা হইলে ধ্বংস করিয়া ফেলিব।

অতঃপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদমের দেহে প্রাণ সঞ্চারের ইচ্ছা করিলেন, তখন ফেরেশতাগণকে বলিলেন- যখন আমি উহাতে আমার প্রাণ হইতে প্রাণ সঞ্চার করিব, তখন তোমরা উহাকে সিজদা করিবে। যখন উহার রূহ মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইল, তখন আদম হাঁচি দিলেন। তখন ফেরেশতারা তাঁহাকে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলিতে বলিলেন, তিনি আলহামদু লিল্লাহ বলিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন- য়্যারহামুকা রব্বুকা। যখন তাহার চক্ষুদ্বয়ে প্রাণ সঞ্চারিত হইল, তখন তিনি বেহেশতের ফল-মূল দেখিতে পাইলেন। যখন তাঁহার পেটে প্রাণ প্রবিষ্ট হইল, তখন ক্ষুধার্ত হইয়া জান্নাতের ফল-মূল খাইতে উদ্যোগী হইলেন। অথচ তখনও তাঁহার পদদ্বয়ে প্রাণ সঞ্চারিত হয় নাই। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ (মানুষকে তাড়াহুড়া-প্রিয় করিয়া গড়া হইয়াছে।)

তখন একমাত্র ইবলীস ছাড়া সকল ফেরেশতা সিজদা করিলেন। সে দম্ভভরে অস্বীকার করিল এবং কাফির হইল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- আমার নির্দেশ সত্ত্বেও কোন্ বস্তু তোমাকে আমার স্বহস্তে গড়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সিজদা হইতে বিরত রাখিয়াছে? সে জবাব দিল- আমি তাহা হইতে উত্তম। তুমি যাহাকে মাটি দিয়া গড়িয়াছ, তাহাকে আমি সিজদা করিতে পারি না। আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাহাকে বলিলেন ঃ

اُخْرُجْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ (জান্নাত হইতে বাহির হইয়া যাও। উহা তোমার জন্য নহে।)

তারপর বলিলেন ঃ

اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِيْنَ (জান্নাতে থাকিয়া যদি তুমি বড়াই কর, তাহা হইলে বাহির হইয়া যাও এবং লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হও।)

অতঃপর তিনি আদম (আ)-কে সকল কিছুর পরিচয় শিখাইয়া সেইগুলি ফেরেশতাদের নিকট পেশ করিয়া বলিলেন- বনী আদম দুনিয়াতে শুধু ফিতনা-ফাসাদ আর খুন-খারাবী করিবে, তোমাদের এই জানা যদি সত্য হয় তাহা হইলে এইগুলির পরিচয় দাও।

তখন তাহারা বলিলেন- আপনি পবিত্র। আপনি যাহা শিখাইয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের আর কোন বিদ্যা নাই। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠতম কুশলী।

আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলিলেন, হে আদম! তুমি তাহাদিগকে এইগুলির পরিচয় বলিয়া দাও। যখন সে তাহাদিগকে উহা বলিয়া দিল, তখন তিনি ফেরেশতাদিগকে বলিলেন- আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিশ্চয় আমি আসমান যমীনের অদৃশ্য খবর রাখি এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর ও গোপন রাখ, সকল কিছুই আমি ভালভাবে জানি।

বর্ণনাকারী বলেন- তাহাদের প্রকাশ্য কথা হইল, 'আপনি কি পৃথিবীতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা ফাসাদ ও রক্তারক্তি করিবে?' আর তাহাদের অপ্রকাশ্য কথা হইল ইবলীসের অন্তরে লুকানো অহংকার।

আস্ সুদ্দীর তাফসীরে উক্ত সাহাবায়ে কিরামের বরাতে উদ্ধৃত এই হাদীসটি মশহুর বটে; কিন্তু ইহার ভিতর কিছু কিছু ইসরাঈলী বর্ণনা রহিয়াছে। সম্ভবত ইহাতে 'মুদরাজ' অর্থাৎ বর্ণনাকারীর কিছু বক্তব্যও প্রবিষ্ট হইয়াছে যাহা সাহাবাদের বক্তব্য নহে। অথবা উহা পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থ হইতে তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। হাকিম তাঁহার 'মুস্তাদরাক' সংকলনে একই সনদে উহা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন- হাদীসটি বুখারীর শর্ত পূরণ করিয়াছে।

মোটকথা আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদম (আ)-কে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলেন, তখন ইবলীসও সেই নির্দেশের আওতায় ছিল। যদিও সে নূরসৃষ্ট ফেরেশতা ছিল না। তথাপি ফেরেশতাদের এক গোত্রভুক্ত ছিল এবং কার্যত তাহাদের সদৃশ ছিল। সুতরাং উক্ত নির্দেশ তাহার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল এবং এই কারণেই তাঁহার নির্দেশ অমান্যটি নিন্দনীয় হইয়াছে। এই ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ اِلاَّ اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّه আয়াতের তাফসীরে আমি সবিস্তারে আলোচনা করিব।

এই কারণে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক খাল্লাদ হইতে, তিনি আতা হইতে, তিনি তাউস হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'ইবলীস নাফরমান হওয়ার আগে ফেরেশতা

ছিল। তাহার নাম ছিল আযাযীল। তবে সে পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল। ইলম ও ইজ্জতের ফেরেশতাকুল শ্রেষ্ঠ ছিল। ইহাই তাহাকে অহংকারী করিল। ফেরেশতাদের জ্বিন গোত্রে সে জন্ম নিয়াছে।

অন্য এক রিওয়ায়েতেও খাল্লাদ আতা হইতে, তিনি তাউস হইতে, তিনি মুজাহিদ হইতে ও তিনি আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, আমাকে আমার পিতা, তাঁহাকে সাঈদ ইব্ন সুলায়মান, তাঁহাকে উবায়দ অর্থাৎ ইবনূল আওয়াম, সুফিয়ান ইব্ন হুসাইন হইতে, তিনি ইয়ালী ইব্ন মুসলিম হইতে, তিনি সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইবলীসের নাম ছিল আযাযীল। সে ফেরেশতাদের সর্দার ও চারিপাখা বিশিষ্ট ছিল। অতঃপর ইবলীস হইল।

সুনায়দ হাজ্জাজ হইতে ও তিনি ইব্ন জুরায়জ হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ ইবলীস ফেরেশতাদের সর্বমান্য সর্দার ছিল। সে বেহেশতের কোষাধ্যক্ষ ছিল। আসমান-যমীনের উপর তাহার পূর্ণ আধিপত্য ছিল।

যিহাক ও অন্যান্য বর্ণনাকারীও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

আত তাওআমার ভৃত্য সালেহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন- ফেরেশতাদের জ্বিন নামে একটি গোত্র আছে। ইবলীস সেই গোত্রের ফেরেশতা। আসমান ও যমীনে তাহার আধিপত্য ছিল। যখন সে নাফরমান হইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহা লোপ করিয়া তাহাকে বিতাড়িত শয়তানে পরিণত করিলেন।

এই বর্ণনাটি ইব্ন জারীরের। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব হইতে কাতাদাহ বর্ণনা করেন- ইবলীস পয়লা আকাশের ফেরেশতাদের সর্দার ছিল।

ইব্ন জারীর বলেন- আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন বাশার, তাহাকে আলী ইব্ন আবূ আদী, তিনি আওফ হইতে, তিনি আল হাসান হইতে বর্ণনা করেন- ইবলীস কখনও ফেরেশতা ছিল না। মাটির সৃষ্টি আদমের মতই সে হইল অগ্নিসৃষ্ট জ্বিন। অর্থাৎ মানুষ যেরূপ ফেরেশতা নহে, জ্বিনও তেমনি ফেরেশতা নহে।

আল-হাসান হইতে ইহা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ আসলামও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

শহর ইব্ন হাওশাব বলেন- ফেরেশতারা যেই জ্বিন জাতিকে ধ্বংস করিয়াছে, ইবলীস তাহাদেরই একজন। ফেরেশতারা তাহাকে লুকাইয়া আসমানে লইয়া গিয়াছিল। ইব্ন জারীরও ইহা বর্ণনা করেন।

সুনায়দ ইব্ন দাঊদ বলেন- আমাকে হাশিম, তাহাকে আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াহিয়া, মূসা ইব্ন নুসায়র ও উসমান ইব্ন সাঈদ ইব্ন কামিল হইতে, তাহারা সা'দ ইব্ন মাসউদ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

"ফেরেশতারা যখন জ্বিনদের সহিত লড়াই করিতেছিল, ইবলীস তখন শিশু ছিল। তখন ফেরেশতারা তাহাকে সঙ্গে নিয়া গেলেন যেন সে তাহাদের সংশ্রবে ইবাদতগার হয়। কিন্তু আদমকে যখন সিজদা করার হুকুম আসিল, তখন সে অস্বীকার করিয়া বসিল।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ। (ইবলীস ছাড়া (সকলেই সিজদা করিল)। সে ছিল জ্বিন।)

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমাগত ইকরামা, জনৈক ব্যক্তি, শরীক, আবূ আসিম, মুহাম্মদ ইব্ন সিনান ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট এক শ্রেণীকে তিনি নির্দেশ দিলেন, আদমকে সিজদা করার জন্য। তাহারা অস্বীকার করিলে তিনি আগুন পাঠাইয়া তাহাদিগকে ভস্মীভূত করিলেন। অতঃপর আরেকদল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকেও অনুরূপ আদেশ করায় তাহারাও অস্বীকার করিল। তাই তাহাদিগকেও আগুনে ভস্মীভূত করা হইল। অবশেষে তাহাদিগকে আবার সৃষ্টি করিয়া অনুরূপ আদেশ করিলে তাহারা সকলেই সিজদা করিল। শুধু ইবলীস অস্বীকার করিল। মূলত সে অস্বীকারকারী সৃষ্টিরই একজন ছিল।

এই হাদীসটি শুধু 'গরীব'ই নহে, ইহার সূত্র ও ত্রুটিপূর্ণ। এই সনদে একজন অজ্ঞাতনামা বর্ণনাকারী রহিয়াছে। এই ধরনের সূত্র কখনও দলীল হইতে পারে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- আমাকে আবূ সাঈদ আল আশাজ্জ, তাঁহাকে আবূ উসামা, তাঁহাকে সালেহ হাইয়ান ও তাঁহাকে আবদুল্লাহ ইব্ন বুরাইদা বলেন ঃ

وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ। অর্থাৎ যাহারা অস্বীকার করিয়া ভস্মীভূত হইয়াছে।

আবুল আলীয়া হইতে রবী' ও তাহার নিকট হইতে আবূ জামির (রা) বলেন ঃ

وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ। অর্থাৎ নাফরমানদের একজন।

وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ। আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে আস্ সুদ্দী বলেন- সেইদিন যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করেন নাই তাহারা এবং তাহাদের পরবর্তী বংশধরগণ।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল-করযী বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে প্রথমে কুফরীর উপরে সৃষ্টি করেন। অতঃপর ফেরেশতার সাহচর্যে ভাল কাজ করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে মূল অবস্থায় ফিরাইয়া দেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ। অর্থাৎ সে আগেও কাফির ছিল।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ বলেন- আনুগত্য ছিল আল্লাহর জন্য এবং সিজদা ছিল আদমের জন্য। ফেরেশতাগণকে দিয়া সিজদা করাইয়া আল্লাহ্ আদমকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করিলেন। একদল বলেন- উক্ত সিজদা ছিল সম্মানের সিজদা (ইবাদতের সিজদা নহে)। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا 'সে (ইউসুফ) তাহার পিতামাতাকে সিংহাসনে উঠাইল এবং তাহারা সকলেই সিজদাবনত হইল।'

এই সিজদা অতীতের উম্মতদের জন্য শরীয়তসম্মত ছিল। আমাদের এই উম্মতের জন্য উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

মু'আয (রা) বলেন- সিরিয়ায় গিয়া দেখিলাম, সেখানে উলামায়ে কিরাম ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সিজদা দানের প্রচলন রহিয়াছে। তাই বলিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! সিজদা লাভের

বেশী যোগ্য তো আপনি। রাসূল (সা) বলিলেন- না। যদি আমি মানুষের জন্য মানুষকে সিজদা দান বৈধ করিতাম, তাহা হইলে স্ত্রীর জন্য স্বামীকে সিজদা দানের নির্দেশ দিতাম। কারণ, সে অধিকতর হকদার।

ইমাম রাযী উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। একদল বলেন- সিজদা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এবং আদম (আ)-কে কিবলা বানানো হইয়াছিল। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ (সূর্য ঢলিয়া পড়িলে নামায পড়।)

অবশ্য এই উপমাটি প্রশ্নাতীত নহে। মূলত প্রথম মতটিই উত্তম। আদমকে সিজদা দেওয়া হইয়াছে সম্মান প্রদর্শন ও প্রণতি জ্ঞাপনের জন্য এবং উহার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইবাদত সম্পন্ন হইয়াছে। ইমাম রাযী তাঁহার তাফসীরে এই মতটির উপর জোর দিয়াছেন এবং বিপরীত মত দুইটিকে দুর্বল প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কারণ, কিবলা বানানোর মধ্যে মর্যাদা প্রকাশের ব্যাপার অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র বিনয় প্রকাশের জন্য মাটিতে মাথা ঠেকানোর ব্যাপারটিও দুর্বল।

فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে যে মর্যাদা দান করিলেন, আল্লাহ্‌র দুশমন ইবলীসের উহাতে হিংসার উদ্রেক হইল। সে বলিল ঃ আমি অগ্নিসৃষ্ট আর সে হইল মৃত্তিকাসৃষ্ট। আদি পাপ হইল অহংকার। অহংকারের কারণেই সে আদমকে সিজদা করিতে অস্বীকার করিল।

আমি বলি সহীহ্ হাদীসে আছে ঃ

لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر

অর্থাৎ যাহার অন্তরে সরিষা বরাবর অহংকার আছে সে বেহেশ্‌তে যাইবে না।

ইবলীসের অন্তর কুফর, হিংসা ও অহংকারপূর্ণ ছিল। এই কারণেই সে আল্লাহর রহমতের দরবার হইতে বিতাড়িত হইল।

কোন কোন আরবী ভাষাবিদ বলেন ঃ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ وصار من الكافرين (সে কাফির হইল)। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فكان من المغرقين (সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হইল) কিংবা فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (তাহা হইলে তোমরা আত্মপীড়ক হইবে)। কবি বলেন ঃ

بتيهاء قفر والمطى كانها * قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها

এখানেও صارت অর্থে كانت লওয়া হইয়াছে।

ইব্‌ন ফাওরাক বলেন- উহার তাৎপর্য হইল এই যে, তাহার কুফরী আল্লাহ্‌র ইলমে বিদ্যমান ছিল। ইমাম কুরতুবী এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়াছেন এবং এখানে তিনি একটি মাসআলার উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের আলিমগণ বলেন ঃ নবী ছাড়া যাহারা কারামাত ও অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহা তাহাদের ওলী হওয়ার দলীল হয় না। কোন কোন সূফী ও রাফেযী বিপরীত মত পোষণ করেন। তেমনি অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন ঈমানের পরিপূর্ণতারও দলীল নহে। ইবলীস বহু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও কাফির ছিল।

এক্ষেত্রে আমার অভিমত হইল- এই ওলী ছাড়াও অন্য কেহ অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিতে পারে। এমনকি কাফির, ফাসিক দ্বারাও উহা সম্ভব। ইব্ন সাইয়াদ কাফির হইয়াও তাহা করিয়াছিল।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ আয়াতটি নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) উহা প্রকাশ না করিয়া ইব্ন সাইয়াদকে প্রশ্ন করিলেন- বল তো আমার অন্তরে কি লুকানো রহিয়াছে? সে তক্ষুণি জবাব দিল 'আদ্ দুখ্'। তেমনি সে যখন ক্রুদ্ধ হইত তখন তাহার দেহ স্ফীত হইয়া পথ রুদ্ধ করিয়া-ফেলিত। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তাহাকে হত্যা করেন। বহু হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত যে, দজ্জাল অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হইবে। তাহার নির্দেশে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করিবে, পৃথিবী শস্য উৎপন্ন করিবে, খনিগুলি খনিজদ্রব্য উৎক্ষিপ্ত করিবে, এমনকি সে এক যুবককে হত্যা করিয়া পুনর্জীবিত করিবে ইত্যাদি।

ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা আস্ সদফী বলেন, ইমাম শাফেঈ (র)-কে বলিলাম যে, লায়ছ ইব্ন সা'দ বলেন- তুমি যদি কোন ব্যক্তিকে পানির উপর দিয়া হাঁটিতে কিংবা হাওয়ায় উড়িতে দেখ, তাহা হইলেও কুরআন সুন্নাহর সহিত তাহার কার্যকলাপ না মিলাইয়া উহাতে মুগ্ধ হইও না। ইমাম শাফেঈ (র) বলিলেন- লায়ছ ইব্ন সা'দ (র) ঠিকই বলিয়াছেন, তবে কিছু কম বলিয়াছেন।

ইমাম রাযী প্রমুখ সিজদাকারীগণ সম্পর্কে আলিমদের দুইটি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আদম (আ)-কে সিজদা দানের নির্দেশ কি শুধু পৃথিবীর ফেরেশতাগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, না আকাশ ও পৃথিবীর সকল ফেরেশতার জন্য ছিল? যদিও একদল আলিম শুধু পৃথিবীর ফেরেশতাদের জন্য উক্ত নির্দেশ নির্দিষ্ট বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তথাপি উহা দুর্বল অভিমত। পাক কালামের প্রকাশ্য বক্তব্য সকল ফেরেশতাকে উক্ত নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। যেমন ঃ

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلاَّ اِبْلِيْسَ (একমাত্র ইবলীস ছাড়া সকল ফেরেশতাই সমবেতভাবে সিজদা প্রদান করিয়াছে।)

উক্ত নির্দেশটি ব্যাপক হওয়ার পক্ষে চারিটি যুক্তিযুক্ত কারণ রহিয়াছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আদম (আ)-এর পরীক্ষা ও পদস্খলন

(৩৫) وَقُلْنَا يَآدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(৩৬) فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝

৩৫. আমি বলিলাম, 'হে আদম! তুমি সস্ত্রীক জান্নাতে বসবাস কর ও মুক্তভাবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা উহা হইতে ভক্ষণ কর। তবে এই গাছটির কাছেও যাইও না। তাহা হাইলে তোমরা আত্মপীড়কদের দলভুক্ত হইবে।'

৩৬. অতঃপর শয়তান তাহাদের পদস্খলন ঘটাইল। অবশেষে তাহাদিগকে তাহাদের নিবাস হইতে বহিষ্কার করিল। আমি বলিলাম, 'তোমরা সকলেই পরস্পর শত্রুরূপে অবতরণ কর। অনন্তর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে কিছুদিন অবস্থান ও উহার সম্পদ ভোগ নির্ধারিত হইল।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে কিরূপ মর্যাদা দিয়াছিলেন, এখানে সেই সংবাদ প্রদান করেন। আদম (আ)-কে আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইবলীস ছাড়া সকল ফেরেশতাই সিজদা করিলেন। অতঃপর তিনি আদম (আ)-এর সস্ত্রীক অবস্থানের জন্য জান্নাত নির্ধারণ করিলেন এবং জান্নাতের যেখান হইতে যাহা ইচ্ছা মুক্তভাবে খাওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন যেন যত যাহা ইচ্ছা তৃপ্তি মিটাইয়া খাইতে পারে।

হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়্যা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আদ দামেগানী হইতে, তিনি সালামা ইব্‌ন ফযল হইতে, তিনি মিকাঈল হইতে, তিনি লায়ছ হইতে, তিনি ইবরাহীম আততায়মী হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

আবূ যর (রা) বলেন- আমি প্রশ্ন করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আদম (আ) কি নবী ছিলেন? তিনি জবাব দিলেন- হ্যাঁ, তিনি নবী ও রাসূল ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সহিত প্রকাশ্যে সরাসরি কথা বলিতেন। যেমন ঃ اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর।)

আদম (আ) কোন্ জান্নাতে ছিলেন তাহা লইয়া মতভেদ দেখা দিয়াছে। সেই বেহেশত কি আকাশে বিদ্যমান, না পৃথিবীর কোথাও? অধিকাংশের মত উহা আকাশে। ইমাম কুরতুবী মু'তাযিলা ও কাদরিয়াদের মত উদ্ধৃত করিয়া বলেন- উহা পৃথিবীতে। ইনশাআল্লাহ সূরা আ'রাফে শীঘ্রই উহার সবিস্তার আলোচনা আসিতেছে।

আয়াতের বর্ণনাভঙ্গী বলিয়া দিতেছে, আদম (আ)-এর বেহেশতে প্রবেশের আগেই হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক উহার ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে অভিশপ্ত করার পর আদম (আ)-এর দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি তাঁহাকে সকল কিছুর নাম পরিচয় জ্ঞাত করিলেন। অতঃপর বলিলেন- তাহাদিগকে এইগুলির নাম বলিয়া দাও... ইত্যাদি। বর্ণনাকারী বলেন- অতঃপর আদমকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করা হইল এবং তাঁহার বাম পাঁজর হইতে একখানা হাড় নিয়া সেই স্থানটি গোশ্‌তপূর্ণ করা হইল। তখনও আদম নিদ্রিত ছিলেন। ইত্যবসরে উক্ত হাড় দ্বারা তাহার স্ত্রী হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করা হইল এবং তাহাকে যথাযথ রূপ দান করা হইল যেন আদম তাহার সাহচর্যে পরিতৃপ্ত থাকেন। যখন তাঁহার তন্দ্রাচ্ছন্নতা কাটিল এবং নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন, তখন হাওয়া (আ)-কে তাঁহার পাশে উপবিষ্ট দেখিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন আমার গোশত, আমার রক্ত ও আমার স্ত্রী।

এই সব বক্তব্য আহলে কিতাব ও আহলে ইলম যথা ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তাহাকে দেখিয়া তিনি তৃপ্ত হইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। তাই তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন- হে আদম, তুমি সস্ত্রীক জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখান হইতে যাহা খুশী খাও। তবে এই গাছটির কাছেও যাইও না। তাহা হইলে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

একদল বলেন, আদমের জান্নাতে প্রবেশের পর হাওয়াকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। যেমন আস্ সুদ্দী আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস হইতে, তিনি মুর্রাহ্ হইতে, তিনি ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন- ইবলীসকে জান্নাত হইতে বহিষ্কার করা হইল এবং আদমকে জান্নাতে রাখা হইল। তিনি সেখানে নিঃসঙ্গ চলাফেরা করিতেন, সাহচর্য ও তৃপ্তি দানের জন্য কোন স্ত্রী ছিল না। একবার গভীর নিদ্রামগ্ন হইলেন এবং জাগিয়া তাঁহার মাথার পাশেই এক নারীকে বসা দেখিতে পাইলেন। তাহাকে আদমেরই পাঁজরের হাড় হইতে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করিয়াছেন। আদম (আ) তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি কে? হাওয়া (আ) বলিলেন- নারী। আদম (আ) প্রশ্ন করিলেন- কেন তোমাকে সৃষ্টি করা হইল? হাওয়া (আ) বলিলেন– আমার দ্বারা তৃপ্তি লাভের জন্য।

যেসব ফেরেশতারা ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, তাহারা প্রশ্ন করিলেন- হে আদম! উহার নাম কি? তিনি বলিলেন- হাওয়া। তাহারা বলিলেন- হাওয়া কেন হইল? তিনি জবাব দিলেন- উহা (حى) জীবিত কিছু হইতে সৃষ্টি বিধায় এই নাম হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলিলেন ঃ

يٰادَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا -

وَلاَ تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ অর্থাৎ আদমের জন্য আল্লাহ্র তরফ হইতে ইহা ছিল পরীক্ষা। উহা কোন্ বৃক্ষ তাহা লইয়া মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। আস্ সুদ্দী অন্য এক রাবীর বরাতে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীস বর্ণনা করেন যে, আদম (আ)-এর জন্য যে গাছ নিষিদ্ধ হইল, তাহা আঙ্গুর গাছ। সাঈদ ইব্ন জুবায়র আস্ সুদ্দী, আশ শা'বী, জা'দাহ ইব্ন হুবায়রাহ ও মুহাম্মদ ইব্ন কয়সও এই মত পোষণ করেন।

আস্ সুদ্দী আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রাহ হইতে এবং তাঁহারা ইব্ন মাসউদ ও একদল সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন- নিষিদ্ধ বৃক্ষটি হইল আঙ্গুর বৃক্ষ। ইয়াহুদীদের ধারণা- নিষিদ্ধ গাছটি গম গাছ।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমাদিগকে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন সামারা আল আহমাসী, তাঁহাকে আবূ ইয়াহিয়া, তাঁহাকে আবূ নযর আবূ উমর আল খারায- ইকরামা হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নিষিদ্ধ গাছটি হইল সরিষা গাছ।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মিনহাল ইব্ন আমর, আল-হাসান ইব্ন আম্মারা, ইবনুল আয়নিয়া ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন- উহা সরিষা গাছ।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক জনৈক আলিম হইতে, তিনি হাজ্জাজ হইতে, তিনি মুজাহিদ হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- উহা গম গাছ।

ইব্ন জারীর বলেন, আমাকে মুছান্না ইব্ন ইবরাহীম, তাঁহাকে মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম, তাঁহাকে আল কাসিম, তাঁহাকে বনু তমীমের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন ঃ

ইব্ন আব্বাস (রা) আবুল জুলদকে প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইলেন যে, কোন্ গাছ আদমের জন্য নিষিদ্ধ ছিল এবং কোন্ গাছের কাছে গিয়া তিনি তওবা করেন? তিনি জবাবে লিখিয়াছেন- প্রথমটি হইল সরিষা গাছ আর দ্বিতীয়টি হইল যয়তুন গাছ।

হাসান বসরী, ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ, আতিয়া আল আওফী, আবূ মালিক, মুহারিব ইব্ন দিছার ও আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লাও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক কোন এক ইয়ামানবাসী হইতে ও তিনি ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ হইতে বর্ণনা করেন- উহা গম গাছ। তবে উহা জান্নাতের বিশেষ ধরনের গম গাছ।

সুফিয়ান ছাওরী হেসীন হইতে ও তিনি আবূ মালিক হইতে বর্ণনা করেন- উহা খেজুর গাছ।

মুজাহিদের বরাত দিয়া ইব্ন জারীর বলেন, উহা তীন গাছ। কাতাদাহ ও ইব্ন জুরায়জও অনুরূপ বলিয়াছেন।

রবী' ইব্ন আনাসের বরাতে আবুল আলীয়া হইতে আবূ জা'ফর আর-রাযী বলেন- উহা সেই বৃক্ষ যাহার ফল খাইলে অপবিত্রতা সৃষ্টি হয় এবং জান্নাতে অপবিত্রতা নিষিদ্ধ।

আবদুর রায্যাক বলেন– আমাকে উমর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মিহ্রান বলেন ঃ আমি ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সস্ত্রীক বেহেশতে বসবাসের অনুমতি দিয়া যে গাছটির ফল খাইতে নিষেধ করিলেন, উহা শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট গাছ ছিল এবং ফেরেশতারা উহার ফল খাইয়া অমরত্ব লাভ করিত।

উক্ত গাছ সম্পর্কে তাফসীর গ্রন্থসমূহে উপরোক্ত ছয়টি মত দেখা যায়। ইমামুল আল্লামা আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ সঠিক কথা এই আল্লাহ্ তা'আলা আদম-হাওয়া (আ)-কে জান্নাতের নির্দিষ্ট একটি গাছের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাহা খাইয়াছিলেন। সেইটি কোন্ গাছ তাহা আমরা জানি না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে এমন কোন প্রমাণ রাখেন নাই যদ্দারা বান্দারা উহার নাম জানিতে পারে। এমনকি সহীহ হাদীস হইতেও উহার প্রমাণ মিলে না। অবশ্য কেহ বলেন, গম গাছ; কেহ বলেন, আঙ্গুর গাছ; কেহ বলেন তীন গাছ ইত্যাদি। সুতরাং উহার যে কোন একটি হইতে পারে। তবে উহা জানিয়া যেমন কোন উপকার হয় না, তেমনি না জানিলেও কোন ক্ষতি হয় না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। ইমাম রাযী এইভাবে তাঁহার তাফসীরে সংশয়ের সমাধান পেশ করিয়াছেন এবং ইহাই সঠিক কথা।

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا আয়াতাংশের ها সর্বনামটি দ্বারা বেহেশত বুঝানো যাইতে পারে। তখন উহার অর্থ দাঁড়ায় فَاَزَلَّهُمَا অর্থাৎ শয়তান তাহাদিগকে বেহেশতচ্যুত করিল। আসিম অনুরূপ পাঠ করিতেন। অথবা উহা দ্বারা নিকটতম বিশেষ্যটি বুঝানো যাইতে পারে। তাহা হইল شجرة তখন অর্থ দাঁড়ায়, সেই গাছের কারণে তাহারা বেহেশতচ্যুত হইল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ يؤفك عنه من افك এখানেও সর্বনাম কারণের সাথেই সংযুক্ত হইয়াছে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ

فاخرجهما مما كانا فيه অর্থাৎ সুশোভন পরিচ্ছদ, আরামপ্রদ বাসস্থান, সুস্বাদু আহার্য ও সর্বাধিক সুখকর দ্রব্য হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল।

وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ - وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلَى حِيْنٍ অর্থাৎ অবস্থান, জীবিকা ও জীবন সীমিত ও নির্দিষ্ট হইবে। তারপর কিয়ামত সংঘটিত হইবে।

পূর্বসূরী তাফসীরকার আস্ সুদ্দী, আবুল আলীয়া, ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ্ প্রমুখ বিভিন্ন সনদে ইসরাঈলী বর্ণনা হইতে সাপ-ইবলীসের চমকপ্রদ কিস্সা, ইবলীসের কৌশলে বেহেশতে প্রবেশ ও কুমন্ত্রণা প্রদানের কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছেন। ইনশা আল্লাহ আমি উহা সূরা আ'রাফে বর্ণনা করিব। আল্লাহ পাক তওফীক দিবার মালিক।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- আমাকে আলী ইব্ন আল-হাসান ইব্ন আশকাব, তাঁহাকে আলী ইব্ন আসিম, সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা হইতে, তিনি কাতাদাহ হইতে, তিনি আল হাসান হইতে ও তিনি উবাই ইব্ন কা'ব হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"উবাই ইব্ন কা'ব বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে দীর্ঘদেহী ও সতেজ খেজুর বৃক্ষের মত দীর্ঘ ঘন কেশ বিশিষ্ট করিয়া গড়িয়াছেন। যখন তিনি নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁহাদের আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিলেন। সেদিন প্রথম তাঁহার নগ্নতা প্রকাশ পাইল। যখন তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন, তখন লজ্জায় জান্নাতে ছুটাছুটি শুরু করিলেন। ফলে তাঁহার দীর্ঘচুল গাছে জড়াইয়া গেল। তিনি যখন উহা ছাড়াইবার জন্য টানাটানি করিতেছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বলিলেন- হে আদম! তুমি আমার নিকট হইতে পালাইতেছ? তিনি সহজ জবাব দিলেন- হে আমার প্রতিপালক! তাহা নহে, আমি লজ্জায় পালাইয়া ফিরিতেছি।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- আমাকে জা'ফর ইব্ন আহমদ ইব্ন হাকাম আল করশী, তাঁহাকে সুলায়মান ইব্ন মনসূর ইব্ন আম্মার, তাঁহাকে আলী ইব্ন আসিম- সাঈদ হইতে তিনি কাতাদাহ হইতে ও তিনি উবাই ইব্ন কা'ব হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন– 'আদম (আ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়াই ছুটিতে লাগিলেন। তখন জান্নাতের গাছের সহিত তাহার চুল জড়াইয়া গেল। অমনি গায়বী আওয়াজ হইল– হে আদম! আমার নিকট হইতে পালাইতেছ? তিনি বলিলেন- আপনার লজ্জায় পালাইতেছি। তখন আল্লাহ পাক বলিলেন- হে আদম! তুমি আমার প্রতিবেশ হইতে বাহির হইয়া যাও। আমার ইজ্জতের কসম! আমার নাফরমান আমার প্রতিবেশী হইতে পারে না। তোমার মত আদম সৃষ্টি করিয়া যদি আমি পৃথিবী ভরিয়াও ফেলি আর তাহারা সবাই তোমার মত নাফরমান হয়, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে নাফরমানের নিবাসে ঠাঁই দেব।'

হাদীসটি 'গরীব' ও উহার সূত্রে কিছুটা বিচ্ছিন্নতাও রহিয়াছে। এমনকি কাতাদাহ ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর সাক্ষাৎকার অসম্ভব মনে করা হয়।

হাকিম বলেন– আমাকে আবূ বকর ইব্‌ন বাকবিয়া, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন নযর হইতে, তিনি মু'আবিয়া ইব্‌ন আমর হইতে, তিনি আম্মারা ইব্‌ন আবূ মুআবিয়া আল বাজালী হইতে, তিনি যায়েদাহ হইতে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– আদম (আ) আসর হইতে মাগরিব পর্যন্ত যতটুকু সময় ততটুকু জান্নাতে ছিলেন।'

হাকিম বলেন, যদিও বুখারী মুসলিমে হাদীসটি উদ্ধৃত হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের শর্তানুযায়ী উহা বিশুদ্ধ।

আবদুর রহমান ইব্‌ন হুমায়দ তাঁহার তাফসীরে উল্লেখ করেন– আমাকে রওহ, হিশাম হইতে, তিনি আল হাসান হইতে বর্ণনা করেন ঃ আদম (আ) পৃথিবীর দিন হিসাবে একশ ত্রিশ বছর জান্নাতে ছিলেন।

রবী' ইব্‌ন আনাস হইতে আবূ জা'ফর আর রাযী বর্ণনা করেন ঃ আদম (আ) নয় কি দশ ঘটিকায় জান্নাত হইতে বহির্গত হন। তাঁহার হাতে ছিল জান্নাতী বৃক্ষের একটি শাখা ও মাথায় ছিল জান্নাতী পাতায় গড়া তাজ।

اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا। আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আস্ সুদ্দী বলেন ঃ 'তাঁহারা সবাই পৃথিবীতে অবতরণ করিলেন। আদম (আ) 'হাজরে আসওয়াদ' ও জান্নাতের গাছের পাতা নিয়া ভারত উপমহাদেশে অবতরণ করেন। তিনি উক্ত গাছের পাতা ভারতময় ছড়াইয়া দেন। উহা হইতেই সুগন্ধী পাতার গাছ জন্ম নেয়। জান্নাত ত্যাগের সময় দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি সেই পাতাগুলি ছিঁড়িয়াছিলেন।

ইমরান ইব্‌ন আয়নিয়া আতা ইবনুস সায়েব হইতে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'আদম (আ) ভারত উপমহাদেশের 'দহনা' নামক স্থানে অবতরণ করেন।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন– আমাকে আবূ যরআ, তাঁহাকে উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা, তাঁহাকে জারীর, আতা হইতে, তিনি সাঈদ হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'আদম (আ) মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী, 'দহনা' নামক স্থানে অবতরণ করেন।'

হাসান বসরী (র)-এর সনদে ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন ঃ 'আদম (আ) ভারতে, হাওয়া (আ) জিদ্দায় ও ইবলিস বসরার কাছাকাছি দস্তামিসানে ও সাপটি ইস্পাহানে অবতরণ করে।'

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন– আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্মার ইবনুল হারিছ, তাঁহাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সাবিক, তাঁহাকে উমর ইব্‌ন আবূ কয়স– আয্‌যুবায়র ইব্‌ন আদী হইতে ও তিনি ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'আদম (আ) সাফায় ও হাওয়া (আ) মারোয়ায় অবতরণ করেন।'

রিজা ইব্‌ন সালমাহ বলেন ঃ 'আদম (আ) হাঁটু ভর করিয়া নিচু মাথায় নামিলেন এবং ইবলীস আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া আঙ্গুল মটকাইতে মটকাইতে অবতরণ করিল।'

আবদুর রায্‌যাক বলেন যে, মুআম্মার বলিয়াছেন– আমাকে আওফ, কুসামা ইব্‌ন যুহায়র হইতে ও তিনি আবূ মূসা হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদম (আ)-কে জান্নাত হইতে নামাইয়া দিলেন, তখন তাহাকে সকল কারিগরী বিদ্যা শিখাইয়া দিলেন এবং

পথের সম্বল হিসাবে বেহেশতের কিছু ফলমূল দিলেন। উহা দুনিয়ার ফলমূলের মতই ছিল। তবে দুনিয়ার ফল নষ্ট হয়, উহা নষ্ট হয় না।'

ইমাম যুহরী আব্দুর রহমান ইব্‌ন হরমুযুল আ'রাজের সনদে আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, 'সর্বোত্তম দিন শুক্রবার। সেইদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেইদিন তাঁহাকে বেহেশতে রাখা হইয়াছে এবং সেইদিনই তাঁহাকে বেহেশত হইতে বাহির করা হইয়াছে।' মুসলিম ও নাসাঈ হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আর্ রাযী বলেন- এই আয়াতটিতে নাফরমানের জন্য বিভিন্ন কঠোর সতর্কবাণী রহিয়াছে। কারণ, প্রথমত লক্ষ্যণীয় যে, আদম (আ)-এর একটিমাত্র পদস্খলনের জন্য কত বড় শাস্তি প্রদান করা হইল। তাই কবি বলেন ঃ

يـا نـاظـرا يـرنـو بـعـيـنـى راقد * ومـشـاهـدا اللامـرغـيـر مشاهد

تصل الذنوب الى الذنوب وترتجى * درج الجنان ونيل فوز العابد

انسيت ربك حين اخرج ادما * منها الى الدنيا بذنب واحد

অর্থাৎ হে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি! চোখ খুলিয়া সজাগ দৃষ্টিতে ঘটনা প্রবাহ হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। পাপের পর পাপ করিয়া চলিতেছ আর জান্নাতের সাফল্য অর্জনের আশা করিতেছ? তোমার প্রভু এত প্রিয় আদমকে একটি মাত্র পাপের জন্য জান্নাত হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

ইবনুল কাইয়্যেম বলেন ঃ

ولكننا سبى العدو فهل ترى * نعود الى اوطننا ونسلم

অর্থাৎ তুমি কি দেখিতেছ, এখানে আমরা শত্রুর হাতে বন্দী রহিয়াছি? এখন দেখ, কখন আমরা নিরাপদে আমাদের স্বদেশে ফিরিতে পারি।

আর-রাযী বলেন যে, ফতহুল মুসেলী বলিয়াছেন ঃ 'আমরা জান্নাতের বাসিন্দা ছিলাম, শয়তান আমাদিগকে বন্দী করিয়া দুনিয়ায় আনিয়াছে। তাই এখানে আমাদের জন্য দুঃখ-দুশ্চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নাই। যতদিন আমরা যেখান হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি সেখানে ফিরিয়া না যাইব, ততদিন আমাদের শান্তি নাই।'

জমহুর উলামা বলেন যে, আদম (আ)-কে আসমানে অবস্থিত বেহেশতে রাখা হইয়াছিল, তাহা হইলে ইবলীস কি করিয়া আবার সেখানে প্রবেশ করিল? উহার এক জবাব হইল এই- আদম (আ) যে বেহেশতে ছিলেন উহা পৃথিবীতেই ছিল। আকাশে নহে। আমাদের 'আল-বিদায়া-নিহায়া' কিতাবে তাহা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। জমহুর উলামার পক্ষ হইতে উহার কয়েকটি জবাব দেওয়া হইয়াছে। এক, বৈধ ও সম্মানজনকভাবে তাহার জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল বটে, অবৈধ চোরাপথে অবমাননাকরভাবে প্রবেশ সম্ভব ছিল। তাই তাওরাতে দেখিতে পাই, ইবলীস সাপের মুখে লুকাইয়া জান্নাতে ঢুকিয়াছে। একদল বলেন, জান্নাতের দরজার বাহিরে থাকিয়া আদমকে কুমন্ত্রণা দিয়াছে। অন্য দল বলেন- সে পৃথিবীতে থাকিয়াই আদম-হাওয়াকে জান্নাতে কুমন্ত্রণা দিয়াছে। যামাখশারী প্রমুখ এই জবাব দিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী এই প্রসঙ্গে সাপ ও উহা হত্যা সম্পর্কিত বেশ কিছু হাদীস একত্র করিয়াছেন। হাদীসগুলি উত্তম ও কল্যাণপ্রদ।

আদম (আ)-এর তাওবা

(٣٧) فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنۡ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيۡهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ ○

৩৭. 'অতঃপর আদম তাহার প্রভুর নিকট হইতে কয়েকটি কথা শিখিল, তারপর তাহার তওবা কবূল হইল। নিশ্চয় তিনি সর্বাধিক মার্জনাকারী, শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।'

তাফসীর ঃ উক্ত কথা কয়টি সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন, কালাম পাকের নিম্ন আয়াতেই উহার ব্যাখ্যা রহিয়াছে ঃ

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

অর্থাৎ তাহারা দুইজন বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আমাদের উপর জুলুম করিয়াছি। যদি তুমি ক্ষমা না কর ও দয়া না কর, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হইব।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আবুল আলীযা, রবী' ইব্‌ন আনাস, আল-হাসান, কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব আল করযী, খালিদ ইব্‌ন মা'দান, আতা আল-খোরাসানী ও আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম 'কালিমাতিন'-এর অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

বনূ তামীমের এক ব্যক্তির সনদে আবূ ইসহাক আস সাবীঈ বর্ণনা করেন যে, উক্ত ব্যক্তি বলেন ঃ আমার কাছে ইব্‌ন আব্বাস (আ) আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আদম (আ)-কে তাঁহার প্রভু কোন্ কথা শিখাইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন– হজ্জ সম্পর্কিত কথা।

সুফিয়ান ছাওরী বলেন, আব্দুল আযীয ইব্‌ন রযী' বলিয়াছেন, উবায়দ ইব্‌ন উমায়র হইতে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন (অন্য রিওয়ায়েতে মুজাহিদ) যে, তিনি বলেন ঃ

'আদম (আ) বলিলেন– হে আমার প্রতিপালক! আমি যে ভুল করিয়াছি তাহা কি আমার সৃষ্টির পূর্বেই আপনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, না আমি আমার তরফ হইতে নিজেই এই অপরাধের সূত্রপাত করিয়াছি? আল্লাহ্ পাক জবাব দিলেন– উহা তোমার সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ ছিল। আদম (আ) বলিলেন– আপনি যেহেতু উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাই আপনিই আমাকে মার্জনা করুন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ পাক বলিলেন ঃ

فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

আস সুদ্দী এক ব্যক্তির সনদে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন ঃ

আদম (আ) বলিলেন– 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি নিজ হাতে আমাকে গড়েন নাই? উত্তর আসিল– হ্যাঁ। অতঃপর প্রশ্ন করিলেন– আপনার প্রাণ হইতে কি আমার প্রাণ ফুঁকিয়া দেন নাই? উত্তর আসিল– হ্যাঁ। আবার প্রশ্ন করিলেন– আমি হাঁছি দিলে আপনি কি 'য়্যারহামুকুমুল্লাহ' (আল্লাহ্ তোমাকে রহম করিবেন) বলেন নাই এবং আপনার সেই রহম কি আপনার গযব অতিক্রম করে নাই? উত্তর আসিল– হ্যাঁ। প্রশ্ন করিলেন– আমি যে ইহা করিব, তাহা কি আপনি পূর্বে লিখিয়া রাখেন নাই? উত্তর আসিল- হ্যাঁ। তখন আদম প্রশ্ন করিলেন– আমি যদি তওবা করি, তাহা হইলে কি আপনি আবার আমাকে জান্নাতে ঠাঁই দিবেন? উত্তর আসিল– হ্যাঁ।

আল আওফী, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও সাঈদ ইব্ন মা'বাদও হযরত আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাকিমও তাঁহার মুস্তাদরাকে সাঈদ ইব্নে জুবায়রের সনদে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন, যদিও সহীহদ্বয়ে উহা উদ্ধৃত হয় নাই, তথাপি উহার সূত্র সহীহ। আস্ সুদ্দী ও আতিয়্যা আল আওফীও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম এই প্রসঙ্গে তাহার কাছাকাছি একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

আমাকে আলী ইব্ন আল হুসাইন ইব্ন আশকাব, তাহাকে আলী ইব্ন আসিম- সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা হইতে, তিনি কাতাদাহ হইতে, তিনি আল-হাসান হইতে ও তিনি উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন- আদম (আ) বলিলেন, হে প্রভু, আমি যদি তওবা করি, তাহা হইলে কি আপনি আমাকে জান্নাতে ফিরাইয়া নিবেন? প্রভু বলিলেন- হ্যাঁ। এই প্রেক্ষিতেই তিনি বলিলেন- فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

হাদীসটি গরীব। উহাতে ছিন্নসূত্রতা বিদ্যমান।

فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ আয়াত সম্পর্কে আবুল আলীয়া হইতে রবী' ইব্ন আনাসের সনদে আবূ জা'ফর আব্বাসী বর্ণনা করেন ঃ

'আদম (আ) যখন অপরাধ করিয়া ফেলিলেন, তখন বলিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! যদি তওবা করিয়া ঠিক হই, তাহা হইলে কি করিবেন? তিনি বলিলেন- তখন তোমাকে জান্নাতে নিব।' এই সেই কথাগুলি। ইহা ছাড়াও নিম্ন আয়াতটি উহার অন্তর্ভুক্ত ঃ

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

উক্ত আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ হইতে ইব্ন নাজীহ বর্ণনা করেন যে, উক্ত কলেমাগুলি নিম্নরূপ ঃ

اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب انى ظلمت نفسى فاغفرلى انك خير الغافرين - اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب انى ظلمت نفسى وارحمنى انك خير الراحمين - اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب انى ظلمت نفسى فتب على انك انت التواب الرحيم -

(আয় আল্লাহ্! তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নাই। তুমিই পবিত্র। প্রশংসা তোমারই, আমি আমার উপর জুলুম করিয়াছি। অনন্তর তুমি আমাকে মার্জনা কর, নিশ্চয় তুমি সর্বোত্তম মার্জনাকারী। আয় আল্লাহ্! তুমি ছাড়া কোন প্রভু নাই; তোমারই পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করি, আমি আমার উপর অত্যাচার করিয়াছি। অতএব তুমি আমাকে দয়া কর, নিশ্চয় তুমি সর্বোত্তম দয়ালু। আয় আল্লাহ্! তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। পবিত্রতা ও প্রশংসা তোমারই। আমি আত্মপীড়ক হইয়াছি। তুমি আমার তওবা কবূল কর, নিশ্চয় তুমি শ্রেষ্ঠতম তওবা কবূলকারী।)

اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন যে ব্যক্তি তাঁহার কাছে ক্ষমা চায় ও তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসে।

যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه 'তাহারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাগণের তওবা কবূল করেন?'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ 'যে ব্যক্তি পাপ কাজ করিয়াছে কিংবা আত্মপীড়ন করিয়াছে।'

তিনি আরও বলেন ঃ

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا 'যে ব্যক্তি তওবা করিয়াছে এবং ভাল কাজ করিয়াছে।'

উক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা পাপ মার্জনা করেন, তওবাকারীর তওবা কবুল করেন এবং ইহা সৃষ্টির উপর তাঁহার করুণা ও বান্দার উপর তাঁহার অনুগ্রহ। তিনি ছাড়া কোন প্রভু নাই। তিনিই একমাত্র তওবা কবূলকারী ও শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।

(٣٨) قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

(٣٩) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৩৮. আমি বলিলাম, 'তোমরা সকলেই উহা (জান্নাত) হইতে নামিয়া যাও। অতঃপর অবশ্যই তোমাদের নিকট আমার হিদায়েত পৌঁছিবে। অনন্তর যাহারা আমার হিদায়েত অনুসরণ করিল, তাহাদের না পরকালের কোন ভয়ের কারণ আছে, না তাহারা (ইহকালে) দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবে।'

৩৯. পক্ষান্তরে যাহারা কুফরী করিল এবং আমার বাণীসমূহকে মিথ্যা বলিল, তাহারাই নরক সহচর; তথাকার তাহারা চিরবাসিন্দা।

তাফসীর ঃ আদম, হাওয়া ও ইবলীসকে ঊর্ধ্বজগত হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া দেওয়ার সময়ে কি বলিয়া সতর্ক করা হইয়াছিল, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে সেই তথ্য পরিবেশন করিতেছেন। এই সতর্কতার লক্ষ্য হইল তাহাদের সন্তান-সন্ততি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা শীঘ্রই তাহাদের নিকট কিতাব নাযিল করিবেন ও নবী-রাসূল পাঠাইবেন।

আবুল আলীয়া বলেন ঃ الهدى। অর্থাৎ নবী-রাসূল, কালাম ও নিদর্শনাবলী।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলেন ঃ الهدى। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)। আল-হাসান বলেন ঃ الهدى। অর্থাৎ আল-কুরআন। এতদুভয় মতই বিশুদ্ধ এবং আবুল আলীয়ার মতটি ব্যাপক অর্থবোধক।

فمن تبع هدى অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার অবতীর্ণ কিতাবসমূহ ও প্রেরিত নবী-রাসূলগণকে অনুসরণ করিল। فلا خوف عليهم অর্থাৎ আখিরাতের ব্যাপারসমূহে তাহাদের ভয় নাই।

ولاهم يحزنون অর্থাৎ পৃথিবীতে যাহা হারায় তাহার জন্য তাহাদের দুশ্চিন্তা দেখা দেয় না। সূরা 'ত্বা-হা'য় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَامَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَى فَلاَ يَضِلُّ وَلاَيَشْقى -

'তিনি বলিলেন, তোমরা উভয় একত্রে নামিয়া যাও পরস্পর শত্রুরূপে। অতঃপর অবশ্যই তোমাদের কাছে আমার হিদায়েত পৌঁছিবে। যে ব্যক্তি হিদায়েত অনুসরণ করিল, সে পথ হারাইবে না, কষ্টেও পড়িবে না।'

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- উক্ত আয়াতে يضل অর্থ দুনিয়ায় পথভ্রষ্ট হইবে না এবং يشقى অর্থ আখিরাতে কষ্টে পড়িবে না।

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمى -

'যে ব্যক্তি আমার যিকির হইতে বিরত থাকিল, তাহার জন্য জীবিকা সংকীর্ণ হইবে এবং কিয়ামতের দিন তাহারা অন্ধে পরিণত হইবে।'

ঠিক এইভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা এখানেও বলিলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

অর্থাৎ জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হইবে এবং উহা হইতে কখনও মুক্তি পাইবে না, উহাতে স্বস্তিও পাইবে না।

এই প্রসঙ্গে ইব্ন জারীর একটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা দ্বিমুখী সূত্রের। তিনি আবূ সালামা সাঈদ ইব্ন ইয়াযীদ হইতে, তিনি আবূ নাযরাতুল মানজার ইব্ন মালিক ইব্ন কিতআহ হইতে ও তিনি সাঈদ (সা'দ ইব্ন মালিক ইব্ন সিনান আল-খুদরী) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, স্থায়ী জাহান্নামীরা সেখানে জীবন্ত অবস্থায় কাটাইবে। কিন্তু যাহারা পাপের কারণে সাময়িক দোযখে যাইবে, তাহাদের উপর মৃত্যুর যবনিকাপাত ঘটিবে যতক্ষণ না শাফাআতের মাধ্যমে মুক্তিলাভ ঘটে।

দ্বিতীয় اهبطا শব্দের ব্যবহার দ্বারা মূলত প্রথমবার হইতে ব্যতিক্রমধর্মী বক্তব্য পেশ করা হইয়াছে। একদল মনে করেন, উহা তাগাদা ও জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, কাহাকেও জোর দিয়া উঠিতে বলিলে বলা হয়, উঠ। অন্যদল বলেন, প্রথম اهبطا বলা হইয়াছে জান্নাত হইতে পৃথিবীর আকাশে নামার জন্য এবং দ্বিতীয় اهبطا বলা হইয়াছে, পৃথিবীর আকাশ হইতে পৃথিবীতে নামার জন্য। প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ

(٤٠) يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ○

(٤١) وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۡ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ○

৪০. 'হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদিগকে যেসব নিয়ামত প্রদান করিয়াছি তাহা স্মরণ কর। আর আমাকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করিব। তাহা ছাড়া বিশেষভাবে তোমরা আমাকে ভয় কর।

৪১. 'আর তোমরা আমার অবতীর্ণ সেই গ্রন্থের উপর ঈমান আন যাহা তোমাদের গ্রন্থকেও সত্য বলে। তোমরা উহার প্রথম সারির অবিশ্বাসী হইও না। আর আমার আয়াতকে তোমরা নগণ্য মূল্যে বিক্রি করিও মা। তোমরা বিশেষভাবে আমার ব্যাপারে সতর্ক হও।'

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে ইসলাম গ্রহণ ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ দিতেছেন। তিনি ইয়াহুদীগণকে বনী ইসরাঈল বলিয়া সম্বোধন করত তাহাদিগকে পূর্বপুরুষের স্মৃতিচারণার মাধ্যমে সত্যানুসরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তাহাদের পূর্ব পুরুষ ইসরাঈল অর্থাৎ হযরত ইয়াকূব (আ) আল্লাহ্র নবী ছিলেন। তাই বলা হইতেছে, হে আল্লাহ্র অনুগত নেককার বান্দার সন্তানগণ! তোমরাও তোমাদের পিতৃপুরুষের মত সত্যানুসারী হও। যেমন বলা হয়, হে ভদ্রলোকের সন্তান, ভদ্রজনোচিত কাজ কর; অথবা হে বীরের পুত্র! বীরের মত বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই কর; কিংবা হে আলিম তনয়! ইলম হাসিল কর ইত্যাদি।

এই ধরনের বক্তব্যই আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র প্রদান করেন ঃ

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ـ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا 'নূহ তাহার সহিত যাহাদিগকে কিশতীতে বহন করিয়াছিল, ইহারা তাহাদেরই বংশধর। নিশ্চয়ই সে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বান্দা ছিল।'

ইয়াকূব (আ)-এর অপর নাম ইসরাঈল। আবূ দাউদ তায়ালিসীর এক রিওয়ায়েত হইতে তাহা প্রমাণিত হয়।

তিনি বলেন– আমাদিগকে আব্দুল হামিদ ইব্ন বাহরাম, তাঁহাকে শহর ইব্ন হাওশাব, তাঁহাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন যে, 'একদল ইয়াহুদী রাসূল (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন– ইয়াকূব (আ)-ই যে ইসরাঈল

তাহা কি তোমরা জান? তাহারা জবাব দিল– আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তাহা জানি। নবী করীম (সা) বলিলেন– হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন।

আ'মাশও ইসমাঈল ইব্‌ন রিজা' হইতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাসের মুক্ত গোলাম উমায়র হইতে ও তিনি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। اُذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ। আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজাহিদ বলেন– নি'আমাতসমূহ বলিতে এখানে উল্লেখিত ও অনুল্লেখিত সকল নিআমতের কথা বুঝানো হইয়াছে। যেমন, পাথর হইতে ঝরনা নির্গত হওয়া, মান্না-সালওয়া অবতীর্ণ হওয়া, ফিরাউন গোষ্ঠীর দাসত্ব হইতে মুক্তি পাওয়া ইত্যাদি।

আবুল আলীয়া বলেন– নি'আমতসমুহ হইতেছে তাহাদের মধ্য হইতে বহু নবী ও রাসূলের আবির্ভাব ও তাহাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থাবলী।

আমি বলিতেছি, তাহার এই ব্যাখ্যা হযরত মূসা (আ)-এর নিম্ন বক্তব্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ঃ

يَا قَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا وَاٰتَاكُمْ مَالَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ ـ

'হে আমার জাতি! তোমাদিগকে প্রদত্ত আল্লাহ্‌র নি'আমাতসমূহ স্মরণ কর। তিনি তোমাদের ভিতর হইতে নবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনেককে বাদশাহ বানাইয়াছেন। আর তিনি তোমাদিগকে যত কিছু প্রদান করিয়াছেন তাহা সৃষ্টি জগতের আর কাহাকেও প্রদান করা হয় নাই।'

অবশ্য তাহাদের নি'আমাত লাভের এই অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব তাহাদের কালেই সীমিত ছিল।

اُذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইস্‌হাক মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদের বরাতে ইকরামা কিংবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন– অর্থাৎ ফিরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের দাসত্ব ও নিপীড়ন হইতে তোমাদের পূর্বপুরুষ তথা তোমাদিগকে যে মুক্তি দান করা হইয়াছে, আমার সেই নি'আমতের কথা স্মরণ কর।

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের পর তাঁহাকে সত্য জানিয়া তাঁহার অনুসারী হওয়ার জন্য আমি তোমাদের নিকট হইতে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা পালন কর। কারণ, তোমাদের মধ্যকার বাড়াবাড়ি ও পাপাচার বিলুপ্ত করার জন্যই তাঁহাকে পাঠানো হইল। তাঁহাকে অনুসরণের মাধ্যমে তোমরা সকল অভিশাপ হইতে মুক্তি পাইবে।

হাসান বসরী (র) বলেন– আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রদত্ত তাহাদের অঙ্গীকার নিম্ন আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ

وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ -

'আর আল্লাহ্ অবশ্যই বনী ইসরাঈল জাতি হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমি তাহাদের মধ্য হইতে বারজন আহবায়ক প্রেরণ করিয়াছিলাম। অনন্তর আল্লাহ্ বলিলেন ঃ নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর, আমার নবীদের প্রতি ঈমান আন। তাহাদিগকে মানিয়া চল এবং আল্লাহ্র পথে কর্জে হাসানা দাও। তাহা হইলে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করিব আর নিশ্চয়ই তোমাদিগকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাইব যাহার নীচে ঝরনা ধারা প্রবহমান রহিয়াছে।'

অন্যরা বলেন– তাওরাতে তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইয়াছে যে, 'শীঘ্রই ইসমাঈলের বংশ হইতে একজন মহান পয়গম্বর প্রেরিত হইবেন ও তাঁহাকে তোমাদের সকল শাখার লোকদের মানিয়া চলিতে হইবে। তাঁহাকে তোমাদের যাহারা মানিয়া লইবে তাহাদের সকল পাপ মাফ করা হইবে এবং তাহাদিগকে জান্নাত প্রদান করা হইবে। অধিকন্তু তাহারা দ্বিগুণ ফল পাইবে।' উহা দ্বারা মুহাম্মদ (সা)-কে বুঝানো হইয়াছে।

ইমাম রাযী হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কিত বহু নবী রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আবুল আলীয়া বলেন– وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْ অর্থাৎ দীন ইসলাম অনুসরণ করার জন্য বান্দাগণের নিকট হইতে তাঁহার গৃহীত অঙ্গীকার।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বলেন– اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ অর্থাৎ আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইব ও তোমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইব।

সুদ্দী, যিহাক, আবুল আলীয়া ও রবী' ইব্‌ন আনাসও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ অর্থাৎ বিশেষভাবে আমাকে ভয় কর। আবুল আলীয়া, সুদ্দী, রবী' ইব্‌ন আনাস ও কাতাদাহ এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন।

وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ আয়াতাংশে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– তোমাদের পূর্বপুরুষের উপর যেইরূপ বানরে পরিণত করা ইত্যাকার আযাব নাযিল করিয়াছিলাম তদ্রূপ আযাব আমি তোমাদের উপরেও নাযিল করিতে পারি, এই ভয় তোমাদের অবশ্যই থাকা চাই। প্রথমে উৎসাহ দান ও শেষে ভীতি প্রদর্শনের রীতি এখানে লক্ষ্যণীয়।

আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিকে একদিকে উৎসাহ প্রদান ও অন্যদিকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সত্যের দিকে আহবান করিতেছেন যেন তাহারা রাসূল (সা)-এর অনুগত হয় এবং কুরআনের উপদেশ, বিধি-নিষেধ ও উহার খবরাখবরের সত্যতা মানিয়া লয়। আল্লাহ্ তাআলা যাহাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। তাই তিনি বলিলেন ঃ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ অর্থাৎ উম্মী আরবী নবী মুহাম্মদ (সা)-এর উপরে আমার অবতীর্ণ আল-কুরআন মানিয়া লও। কারণ, মুহাম্মদ (সা) সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী ও উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। তিনি আল্লাহ্র তরফ হইতে সত্যবাণী লাভ করিয়াছেন। উহা তখন পর্যন্ত প্রচলিত আসমানীগ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জীলের সত্যতা ঘোষণা করিতেছে।

اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ। আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবুল আলীয়া (র) বলেন– অর্থাৎ হে পূর্ব-গ্রন্থানুসারীবৃন্দ! এখন আমি যাহা নাযিল করিলাম তাহার উপর ঈমান আন। উহা তো তোমাদের ধর্মগ্রন্থকেও সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি এই জন্য অনুরূপ আহবান জানাইলেন যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলে তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর নাম পর্যন্ত লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইয়াছে।

মুজাহিদ, রবী' ইব্ন আনাস ও কাতাদাহ্ হইতেও উক্ত আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَافِرٍ আয়াতাংশ সম্পর্কে একদল আরবী ভাষাবিদ বলেন– অর্থাৎ উহা অস্বীকারকারীদের প্রথম দল তোমরা হইও না।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন– যেহেতু তোমাদের নিকট কুরআন ও মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে যে খবর রহিয়াছে তাহা অন্য কাহারও কাছে নাই, তাই এতদসত্ত্বেও তোমরা উহা অস্বীকার করিয়া প্রথম শ্রেণীর কাফির হইও না।

আবুল আলীয়া বলেন– আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, তোমাদের পূর্ব-গ্রন্থানুসারীদের মধ্য হইতে তোমরা যেহেতু প্রথম মুহাম্মদ (সা)-এর প্রেরিত হবার সংবাদ পাইয়াছ। তাই তোমরা তাঁহাকে প্রথম অস্বীকারকারী দল হইও না।

আল-হাসান, সুদ্দী ও রবী' ইব্ন আনাসও অনুরূপ বলেন। ইব্ন জারীর বলেন– উক্ত আয়াতাংশের শব্দের সর্বনামের ইঙ্গিত কুরআনের দিকে। কারণ পূর্বোল্লেখিত بِمَا اَنْزَلْتُ।বাক্যাংশে কুরআনের কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং এখানে মুহাম্মদ (সা)-কে নয় বরং কুরআনকে অস্বীকার করার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

মূলত উভয় অভিমতই বিশুদ্ধ। কারণ, মুহাম্মদ (সা) ও কুরআন পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। একটিকে অস্বীকার করার অর্থ অপরটিকেও অস্বীকার করা। যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-কে অস্বীকার করিল, সে কুরআনকেই অস্বীকার করিল। তেমনি যে ব্যক্তি কুরআন অস্বীকার করিল, সে মুহাম্মদ (সা)-কেই অস্বীকার করিল।

اَوَّلَ كَافِرًا بِهٖ অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের মধ্যে প্রথম কাফির দল। কারণ, আরবের কুরায়শ ও অন্যান্য গোত্রের কুফরীর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাই এখানে বনী ইসরাঈলের কুফরীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে। বিশেষত মদীনার প্রতিবেশী ইয়াহুদীগণের কথা বলা হইয়াছে। কারণ, কুরআনে তাহাদিগকে সামনে রাখিয়াই আহবান জানান হইয়াছে। তাহারা সেই সত্যের আহবান প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের জাতির ভিতরে তাহারাই প্রথম সত্য প্রত্যাখ্যানকারী দলে পরিণত হইল।

وَلَاتَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا অর্থাৎ নগণ্য পার্থিব লালসা ও আবেগ অনুভূতির বিনিময়ে তোমরা আমার রাসূল ও অবতীর্ণ অমূল্য বাণীর উপর ঈমান আনা হইতে বিরত হইও না। কারণ, পার্থিব স্বার্থ তো ক্ষণস্থায়ী ও লয়শীল। পক্ষান্তরে আমার বাণী অবিনশ্বর ও স্থায়ী সত্য।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন জাবিরের বরাতে হারূন ইব্ন ইয়াযীদ হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র)-কে ثَمَنًا قَلِيْلًا সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন–দুনিয়া ও তার ক্ষণস্থায়ী বস্তুসমূহই হইল 'ছামানান কালীলা' (নগণ্য মূল্য)।

আতা ইব্ন দীনারের সূত্রে সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ইব্ন লাহিআ বলেন- وَلَاتَشْتَرُوْا ثَمَنًا قَلِيْلاً بِـاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلاً আয়াতাংশের ايات। অর্থ তাহাদের নিকট অবতীর্ণ গ্রন্থ ও ثَمَنًا قَلِيْلاً অর্থ দুনিয়া ও তার লোভ-লালসা।

আস সুদ্দী বলেন- উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, তোমরা নগণ্য লালসার শিকার হইয়া আল্লাহ্র বাণী গোপন করিও না। এই লালসাই 'ছামান' (মূল্য)।

রবী' ইব্ন আনাসের বরাতে আবুল আলীয়া হইতে আবূ জা'ফর বর্ণনা করেন- উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ 'তোমরা তোমাদের কাছে রক্ষিত ইলমের বিনিময়ে পার্থিব স্বার্থ গ্রহণ করিও না।' বর্ণনাকারী বলেন, তাহাদের আদি গ্রন্থেও ইলমের বিনিময় গ্রহণ বনী আদমের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

একদল উহার ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বলেন- উহার তাৎপর্য এই যে, বয়ান, দরস, কিংবা মানব কল্যাণের ইলমের বিনিময় গ্রহণ অবৈধ। তেমনি নগণ্য ও অস্থায়ী পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব হাসিলের জন্য ইলম গোপন করাও অবৈধ।

আবূ দাউদে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলেন, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ভিন্ন অন্য কোন পার্থিব স্বার্থে শিক্ষা দান করে, সে কিয়ামতে জান্নাতের গন্ধমাত্রও পাইবে না।

বিনিময় নিয়া শিক্ষা দানের প্রশ্নে ইহা ঠিক যে, বিনিময় নির্ধারণপূর্বক শিক্ষা দান অবৈধ। তবে হ্যাঁ, বায়তুলমাল হইতে যদি শিক্ষাদানে সার্বক্ষণিক প্রয়োজনের খাতিরে কাহাকেও তাহার প্রয়োজনীয় ভাতা প্রদানপূর্বক নিয়োজিত করা হয়, তাহা বৈধ হইবে। যেহেতু উহা প্রত্যেক শিক্ষকের প্রয়োজন ভিত্তিক ভাতা, তাই উহা নির্ধারিত ভাতারূপে গণ্য নহে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ ও অধিকাংশ আলিমের মত ইহাই।

বুখারী শরীফে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীসে সূরা ফাতিহা পড়ে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক করার বিনিময়ে কিছু বকরী লাভের ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেন ঃ

ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله 'তোমরা যত কিছুর বিনিময় গ্রহণ কর, আল্লাহ্র কিতাব তাহার মধ্যে সর্বাধিক হকদার।' তেমনি এক বিবাহের মহরানা নির্ধারণের বেলায় নবী করীম (সা) পাত্রের জ্ঞাত কুরআন মজীদ পাত্রীকে শিক্ষাদানকেই মহরানা সাব্যস্ত করে বলেন ঃ

زوجتكها بما معك من القران এই সব হাদীসও উক্ত মাযহাবের সপক্ষে দলীল।

পক্ষান্তরে উবাদা ইব্ন সামিতের হাদীছে দেখা যায়, তিনি আহলে সুফ্ফার একজনকে কিছু কুরআন শিক্ষাদানের হাদিয়াস্বরূপ একটি তীর গ্রহণ সম্পর্কে নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন ঃ

ان احببت ان تطوق بقوس من النار فاقبله 'যদি তুমি আগুনের তীর গলায় জড়িত হওয়া পছন্দ কর, তাহা হইলে উহা গ্রহণ কর।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি উহা বর্জন করেন। হাদীসটি আবূ দাউদে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে উবায় ইবনে কা'বের অনুরূপ একটি মারফূ' হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। যদি উহার সনদ বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আবূ উমর ইব্ন আব্দুল্লাহসহ বহু আলিম উহার ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যদি কেহ আল্লাহ্র ওয়াস্তে শিক্ষা

দান করে, তাহা হইলে সওয়াবই তাহার কাম্য হইবে এবং নগণ্য পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে অমূল্য সওয়াব নষ্ট করা তাহার জন্য জায়েয হইবে না। পক্ষান্তরে যদি কেহ শুরুতেই পার্থিব স্বার্থের জন্য শিক্ষাদান করে, তাহা হইলে তাহার জন্য উহা গ্রহণ করা বৈধ। উবাদা ইব্‌ন সামিতের হাদীস প্রথম ক্ষেত্রে ও আবূ সাঈদ খুদরী ও সহলের হাদীস দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

وَاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ আয়াতাংশ সম্পর্কে ইব্‌ন আবূ হাতিম উমর আদ্ দাওরী হইতে, তিনি আবূ ইসমাঈল আল মুআদ্দাব হইতে, তিনি আসিমুল আহওয়াল হইতে, তিনি আবুল আলীয়া হইতে ও তিনি তলক ইব্‌ন হাবীব হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'তাকওয়া হইল আল্লাহ্র রহমতের আশায় আল্লাহ্র নূরের আলোকে আল্লাহ্র বিধি-নিষেধের আনুগত্য করা। তেমনি তাঁহার ভয়ে তাঁহার নাফরমানী হইতে তাঁহারই নূরের আলোকে বাঁচিয়া থাকা।'

وَاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে সত্য গোপন করিয়া বিপরীত কথা বলার ও রাসূল (সা)-এর বিরোধিতার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেছেন।

(٤٢) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(٤٣) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

৪২. 'আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিও না এবং যে সত্য তোমরা জান তাহা গোপন করিও না।

৪৩. অনন্তর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং রুকূ প্রদানকারীদের সহিত রুকূ' দাও।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে ইয়াহূদীগণকে সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করার সংকল্প পরিহারের জন্যে নির্দেশ প্রদান করিতেছেন। সত্যকে গোপন করিয়া মিথ্যা প্রচারের যে পথ তাহারা অনুসরণ করিতে চাহিতেছে এই আয়াতে তাহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে সত্য ও মিথ্যা একই সঙ্গে চালাইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং সত্যকে তুলিয়া ধরার জন্য নির্দেশ দিতেছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ অর্থাৎ হকের সহিত বাতিল ও সত্যের সহিত মিথ্যাকে মিশাইও না।

উক্ত আয়াতাংশ সম্পর্কে আবুল আলীয়া বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, 'তোমরা হককে বাতিলের সহিত মিশাইও না এবং মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের কাছে সঠিক উপদেশ উপস্থাপন কর।'

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও রবী' ইব্‌ন আনাস হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

কাতাদাহ বলেন ঃ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারার ধর্মমতকে ইসলামের সহিত মিলাইও না। অথচ তোমরা জান যে, ইসলাম আল্লাহ্র দীন এবং ইয়াহূদী ও নাসারা ধর্মমত তাহাদের মনগড়া ধর্মমত, আল্লাহ্র দীন নহে।

হাসান বসরীও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা কিংবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ

وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ অর্থাৎ তোমাদের কাছে আমার রাসূলের যে পরিচয় রহিয়াছে তাহা লুকাইও না। কারণ, তোমরা তোমাদের কাছে অবতীর্ণ কিতাবে উহা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইতেছ। আবুল আলীয়াও উক্ত আয়াতাংশের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

মুজাহিদ, সুদ্দী, কাতাদাহ ও রবী' ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ تَكْتُمُوا الْحَقَّ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচয়।

আমি বলিতেছি। وتكتموا শব্দটি যেমন জযমযুক্ত হইতে পারে, তেমনি নসবযুক্তও হইতে পারে। অর্থাৎ ইহা ও উহা একত্র করিও না। যেমন বলা হয়, মাছ খাইও না এবং দুধ পান কর।

আল্লামা যামাখশারী বলেন, ইব্‌ন মাসউদের কুরআন পঠনে وتكتمون الحق রহিয়াছে। অর্থ দাঁড়ায়, তোমাদের সত্য গোপন করার অবস্থায়। পরবর্তী অংশ হইবে وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْحَقَّ অর্থাৎ যে অবস্থায় তোমরা সত্য জানিতেছ। তখন উহার অর্থ দুইরূপ হইতে পারে। এই সত্য গোপনের বিরাট ক্ষতি তোমাদের জানা আছে। ইহার ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে। তোমরা উহা প্রকাশ করিলে মানুষ সহজেই পথ প্রাপ্ত হইত। অথচ তোমরা সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা প্রকাশের দ্বারা সত্যানুসারীর বিপরীত কাজ করিতেছ। এইভাবে সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটাইতেছ।

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكِعِينَ আয়াত সম্পর্কে মাকাতিল বলেন– وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ অর্থাৎ আহলে কিতাবগণকে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-এর সহিত নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন। তেমনি وَآتُوا الزَّكٰوةَ অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে যাকাত আদায় করার আদেশ দিলেন। অবশেষে وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكِعِينَ অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে উম্মতে মুহাম্মদীর সহিত রুকূ প্রদান করিতে বলিতেছেন। মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তাহাদের সহিত থাক ও তাহাদের হইয়া যাও।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা বলেন– যাকাতের ভিতর আল্লাহ্র ইবাদত ও ইখলাস দুই জিনিসই আছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, আবূ জানাব ও ওয়াকী' বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– দুইশত বা ততোধিক দিরহামের জন্য যাকাত ওয়াজিব।

আল-হাসান হইতে মুবারক ইব্‌ন ফুযালা বলেন– যাকাত ফরয এবং কোন আমলই কল্যাণকর হয় না যাকাত ও নামায ছাড়া।

আল হারিছুল আকলী হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ হাইয়ান আত তায়মী, জারীর, উসমান ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ যারআ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন– যাকাত অর্থ সাদকাতুল ফিত্র।

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ অর্থাৎ মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাহাদের ভাল ভাল কাজ যথা নামায, যাকাত ইত্যাদি সম্পন্ন কর।

উক্ত আয়াত দ্বারা বহু উলামায়ে কিরাম জামাআতের নামাযকে ওয়াজিব প্রমাণ করিয়াছেন। 'আল আহকামুল কবীর' কিতাবে ইনশাআল্লাহ্ আমি উহা সবিস্তারে আলোচনা করিব। ইমাম কুরতুবী জামাআত ও ইমামত সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন।

(٤٤) اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৪৪. 'তোমরা মানুষকে পুণ্য কাজের নির্দেশ দিতেছ, আর তোমরা নিজেরাই উহা বিস্মৃত হইতেছ। অথচ তোমরা আল-কিতাব তিলাওয়াত করিতেছ। তোমরা কি বুঝিতেছ না?'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন– হে পূর্ব-গ্রন্থানুসারীবৃন্দ! তোমাদের জন্য ইহা কি করিয়া শোভনীয় হইতে পারে যে, অপরকে তোমরা ভাল কাজ করার নির্দেশ দিতেছ, আর তোমরা নিজেরা তাহা বিস্মৃত হইয়া চলিতেছ? অথচ তোমরা অহরহ কিতাব পড়িয়া ভাল করিয়াই জানিতেছ যে, এই ধরনের নাফরমানীর জন্য কত ভয়াবহ পরিণতি রহিয়াছে। তোমরা যে ভুলগুলি করিতেছ তাহা কি তোমরা বুঝিতে পাইতেছ না? তোমাদের দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া আর অন্ধ থাকার মধ্যে তো কোনই তারতম্য নাই।

কাতাদাহ হইতে মুআম্মারের সনদে আবদুর রায্যাক উক্ত আয়াত সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেন– বনী ইসরাঈলগণ অন্যকে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করিতে ও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতে নির্দেশ দিত ও ভাল কাজ করার জন্য উপদেশ দিত। অথচ তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করিতেছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন।

সুদ্দী ও ইব্ন জুরায়জ বলেন– اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ অর্থাৎ বনী ইসরাঈল ও মুনাফিকগণ মানুষকে নামায-রোযা করিতে বলিত এবং মানুষকে মুখে ভাল ভাল কাজ করার জন্য আহবান জানাইত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন– তোমরা যাহা কিছু আদেশ করিতেছ তাহা তো তোমাদের বেশী করিয়া করা উচিত।

وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ আয়াতাংশ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমাগত সাঈদ ইব্ন জুবায়র কিংবা ইকরামা, মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন– অর্থাৎ তোমরা নিজেরা উহা করিতেছ না।

وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের নবীর ব্যাপারে ও তাওরাতের ব্যাপারে মানুষকে কুফরী করিতে নিষেধ করিতেছ। অথচ তাওরাতেই তোমাদের নিকট হইতে

আমার পরবর্তী রাসূল ও কিতাবের উপর ঈমান আনার যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই ব্যাপারে তোমরাই কুফরী করিতেছ। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া তোমরা তোমাদের জ্ঞাত বিষয় লইয়া ঝগড়া করিতেছ।

উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন– অর্থাৎ তোমরাই লোকদিগকে মুহাম্মদ (সা)-এর দীন গ্রহণের ও সালাত কায়েমের জন্য বলিয়া এখন নিজেরা তাহা করিতেছ না।

আবূ কুলাবা হইতে যথাক্রমে আইয়ুব সাখতিয়ানী, মুখাল্লাদ ইবনুল হুসাইন, আসলামুল হরমী, আলী ইবনুল হাসান ও আবূ জা'ফর জারীর বলেন ঃ

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে আবূ দারদা (রা) বলিয়াছেন– যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজ প্রবৃত্তি ও আল্লাহ্র শত্রুর সহিত শত্রুতায় লিপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে যথার্থ বিজ্ঞ হইতে পারে না।

উক্ত আয়াতাংশ সম্পর্কে আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন– উহাতে সেই সকল ইয়াহূদীর নিন্দা করা হইয়াছে যাহাদের কাছে কোন লোক কিছু ঘুষ ছাড়া অন্যায়ভাবে কিছু পাওয়ার জন্য ফতোয়া চাহিলে তখন ন্যায়ভাবে ফতোয়া দান করিত।

মোটকথা, এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই সকল ছল-চাতুরীর নিন্দা করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক হইতে এবং তাহাদের প্রদত্ত উপদেশ প্রথমে নিজেদের আমল করিতে নির্দেশ দিতেছেন। সুতরাং ইহা দ্বারা আমর বিল মা'রূফ বা ন্যায় কাজের নির্দেশ দানকে নিন্দনীয় বলা হয় নাই। বরং ন্যায় কাজের নির্দেশদাতারা নিজেরাও যেন ন্যায় কাজের অনুসরণ করিয়া চলে তাহার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। নিজেরা আমল না করিয়া অপরকে নির্দেশ দানকেই এখানে নিন্দনীয় বলা হইয়াছে।

মূলত ন্যায় কাজের নির্দেশ দান শুধু ভাল কাজই নহে। পরন্তু প্রত্যেক আলিমের জন্যে উহা ফরয। তবে আলিমদের জন্যে উত্তম হইল, যাহা তাহারা নির্দেশ দিবে তাহা অবশ্যই নিজেরা আমল করিবে এবং উহার বিপরীত কাজ তাহারা করিবে না। যেমন শুআয়ব (আ) বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ـ اِنْ اُرِيْدُ اِلاَّ الْاِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ ـ وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلاَّ بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ـ

'আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু করিতে নিষেধ করিয়াছি উহার বিপরীত কোন কাজ করিতে ইচ্ছা আমার নাই। আমি তো আমার সাধ্যানুসারে তোমাদের শুধু সংশোধন চাহিতেছি। আল্লাহ্ তাওফীক না দিলে আমার কিছুই করার সাধ্য নাই। তাহারই উপর আমি নির্ভর করিয়াছি এবং তাহারই সমীপে ফিরিয়া যাইব।'

তাই আমর বিল মা'রূফের প্রত্যেকটি কাজই ওয়াজিব। আমল না করিলে উহা করা যায় না তাহা নহে। পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী আলিমদের সঠিক অভিমত ইহাই। অবশ্য একদল আলিম বলেন– কোন পাপীর পুণ্যের নির্দেশ দান ঠিক নহে। এই মতটি দুর্বল এবং উপরোক্ত আয়াত হইতে তাহাদের দলীল গ্রহণও দুর্বলতামুক্ত নহে। উহাতে তাহাদের মতের সমর্থন নাই। বিশুদ্ধ মত ইহাই যে, আলিম ব্যক্তি ন্যায় কাজ না করিলেও ন্যায়ের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ করিলেও অন্যায় কাজে নিষেধ করিবে। তাহাতে অন্তত একটির জন্য সওয়াব পাইবে।

তাহা বলি না। আমি কাহাকে ইহাও বলি না যে, নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম ব্যক্তি, যদি তিনি আমার আমীরও হন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ 'কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিজ নাড়িভূঁড়ির চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করিতে দেখা গেল। গাভী যেইভাবে উহার খুঁটির চারিপাশে ঘুরিতে থাকে উহাও তদ্রূপ মনে হইতেছিল। তখন অন্যান্য জাহান্নামীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল- আপনার কি হইল? আপনি তো আমাদিগকে ভাল কাজের জন্য উপদেশ দিতেন এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলিতেন। সে উত্তর দিল- আমি তোমাদিগকে ভাল কাজ করিতে বলিয়া নিজে উহা করিতাম না। তেমনি তোমাদিগকে খারাপ কাজ ছাড়িতে বলিলেও নিজে উহা ছাড়িতাম না।'

বুখারী ও মুসলিমেও সুলায়মান ইব্ন মিহরানুল আ'মাশ হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ বলেন- আমাকে সাইয়ার ইব্ন হাতিম, তাঁহাকে জা'ফর ইব্নে সুলায়মান ও তাঁহাকে ছাবিত হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন- 'আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সাধারণ মুসলমানগণকে এমন অনেক ব্যাপারে ক্ষমা করিবেন, যে সব ব্যাপারে আলিমগণকে ক্ষমা করিবেন না।' কোন কোন আছারেও বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আলিমগণ হইতে সত্তর গুণ বেশী ক্ষমা করিবেন জাহিলগণকে। কারণ, আলিম ও জাহিল কখনও এক নহে। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُوْلُوا الْاَلْبَابِ -

'বলিয়া দাও, আলিম ও গায়ের আলিম কি সমান? নিঃসন্দেহে জ্ঞানীরাই উপলব্ধি করে।'

ইব্ন আসাকির ওয়ালিদ ইব্ন উকবার জীবন চরিতে নবী করীম (সা)-এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। নবী করীম (সা) বলেন ঃ একদল জান্নাতী একদল জাহান্নামীকে দেখিয়া বলিবে- তোমরা কেন জাহান্নামী হইয়াছ ? আল্লাহ্র কসম ! তোমাদের শিক্ষা না পাইলে আমরা জান্নাতী হইতে পারিতাম না। তাহারা জবাব দিল- 'আমরা যাহা বলিতাম তাহা করিতাম না।'

ইব্ন জারীর তাবারীও আহমদ ইব্ন ইয়াহিয়া আল খুব্বাস আর রামলী হইতে, তিনি যুহায়র ইব্ন উব্বাদ আর রাওয়াসী হইতে, তিনি আবূ বকর আয যাহির আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হাকীম হইতে, তিনি ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ হইতে, তিনি আশ্শাবী হইতে তিনি ওলীদ ইব্ন উকবা হইতে ও তিনি নবী করীম (সা) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আসিয়া ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলিল ঃ হে ইব্ন আব্বাস! আমি 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার'-এর দায়িত্ব পালন করিতে চাই। তিনি প্রশ্ন করিলেন- তুমি কি সেই স্তরে পৌঁছিয়াছ ? সে বলিল- উহা আমার আকাঙ্খা। তিনি বলিলেন- যদি তুমি কুরআনের তিন আয়াতের মর্মে পাকড়াও হবার ভয় না রাখ, তাহা হইলে করিতে পার। সে প্রশ্ন করিল উহা কোন্ কোন্ আয়াত ? তিনি বলিলেন ঃ

এক. اَتَامُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

দুই. لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে রবীআর সূত্রে মালিক (র) বলেন- যে ব্যক্তি ন্যায় কাজের নির্দেশ দিল ও অন্যায় কাজে বাধা দিল, সে তা আমল না করিলেও উক্ত ওয়াজিবের সওয়াব পাইল। কিন্তু যে ব্যক্তি আমলও করিল না এবং আমলের জন্যে উপদেশও দিল না সে তো কিছুই পাইল না। যে ব্যক্তি কিছুই পাইল না সে কি ঠিক কাজ করিল?

আমি বলিতেছি- আলিমের জন্য আমল না করিয়া উপদেশ দান নিন্দনীয়। কারণ, তাহারা জানিয়া বুঝিয়া উহার বিপরীত করিতেছে। গায়ের আলিম ও আলিম এক নহে। তাই হাদীসেও এই ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে। আবুল কাসিম আত্ তাবারানী তাঁহার 'মু'জামুল কবীর' সংকলনে নিম্ন হাদীসটি উদ্ধৃত করেন ঃ

জুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ তামীমাহ আল হুযায়ফা, আ'মাশ, আলী ইব্ন সুলায়মান আল কালবী, হিশাম ইব্ন আম্মার, আল হাসান ইব্ন আল উমরী ও আহমদ ইবনুল মাতালী আদ্দামেশকী বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে আলিম নিজে নেক কাজ করে না, অথচ অপরকে নেক কাজের সবক দেয়, তাহার উদাহরণ হইল সেই প্রদীপ যাহা অপরকে আলো দেয়, অথচ নিজে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়।

এই হাদীসটি গরীব। কারণ, ইহা একটি মাত্র সূত্রে বর্ণিত। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল তাঁহার মুসনাদ সংকলনে অপর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। তাহা এই ঃ

আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে যথাক্রমে আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন যায়দ (ইব্ন জুদআন), হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ ও ওয়াকী' বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন- মি'রাজের রাত্রে আমি একদল লোকের আগুনের কাঁচি দ্বারা ওষ্ঠ কর্তন করিতে দেখিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কাহারা? উত্তর আসিল, আপনার উম্মতের দুনিয়াদার বক্তাগণ। তাহারা মানুষকে নেক কাজের নির্দেশ দিত। কিন্তু নিজেরা উহা করিত না। অথচ তাহারা কিতাব পড়িত, তাহারা কি উহা বুঝিত না?

আব্দ ইব্ন হুমায়দ তাঁহার মুসনাদ ও তাফসীরে উক্ত হাদীস আল-হাসান ইব্ন মূসা ও হাম্মাদ ইব্ন সালমার সনদে উদ্ধৃত করেন। হাম্মাদ ইব্ন সালমা হইতে ইয়াযীদ ইব্ন হারূনও উহা বর্ণনা করেন। ইব্ন মারদুবিয়্যাও মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন ইবরাহীম হইতে, তিনি মূসা ইব্নে হারূন হইতে, তিনি ইসহাক ইব্নে ইবরাহীম আত তাসতারী হইতে, তিনি মক্কী ইব্ন ইবরাহীম হইতে, তিনি আমর ইব্ন কায়স হইতে, তিনি আলী ইব্ন যায়দ হইতে, তিনি ছুমামা হইতে ও তিনি হযরত আনাস (রা) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। উহাতে শুধু 'হে জিবরাঈল' কথাটি সংযোজিত হয়।

ইব্ন হাব্বান তাঁহার 'সহীহ' সংকলনেও উহা উদ্ধৃত করেন। ইব্ন হাতিম ও ইব্ন মারদুবিয়্যা উহা পুনঃ হিশাম আদ্ দাস্তোয়ায়ী হইতে, তিনি মুগীরা (ইব্ন হাবীব) হইতে, তিনি মালিক ইব্ন দীনার হইতে, তিনি ছুমামা হইতে ও তিনি মালিক ইব্ন আনাস (রা) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ আরও একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। তাঁহাকে ইয়ালী ইব্ন উবায়দ ও তাঁহাকে আ'মাশ উহা আবূ ওয়ায়েল হইতে বর্ণনা করেন। আবূ ওয়ায়েল বলেন- 'উসামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি হযরত উসমান (রা)-কে কিছু বলেন না কেন? আমি তখন তাঁহার পিছনে বসা ছিলাম। তিনি জবাব দিলেন- তোমরা অবশ্যই দেখিতেছ যে, আমি তাহাকে কিছু বলি না, বরং তোমাদের সকলের কথা শুধু শুনিতেছি। তবে তাঁহার ও আমার ভিতরে যাহা আলোচনা হবার তাহা হয়। আমি অবশ্য যাহা জানিতে পাই সঙ্গে সঙ্গেই

Contents

তিন. وَمَا أُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهُ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِ صْلَاحَ

অতঃপর প্রশ্ন করিলেন– 'তুমি কি এইগুলি সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়াছ? সে জবাব দিল না। তখন বলিলেন– তাহা হইলে নিজের ব্যাপারেই সেই দায়িত্ব শুরু কর।' ইব্ন মারদুবিয়্যা তাঁহার তাফসীরে উক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন।

তাবারানী বলেন– তাঁহাকে আব্দান ইব্ন আহমদ, তাঁহাকে যাযদ ইবনুল হারিছ, তাঁহাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন খারাশ, তাঁহাকে আওয়াব ইব্ন হাওশাব, তাঁহাকে মুসাইয়্যেব ইব্ন রাফে' ও তাঁহকে ইব্ন উমর (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ ' যে ব্যক্তি মানুষকে কোন কথা বা কাজে আহ্বান জানায়, অথচ সে নিজে উহা করে না, সে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই কথা বা কাজ নিজে বাস্তবায়িত না করে, ততক্ষণ সে আল্লাহ্র অসন্তোষ বহন করিয়া চলে।' হাদীসটির সনদ দুর্বল।

ইবরাহীম নাখঈ বলেন– আমি উক্ত তিন আয়াতের কিস্সাটি অবশ্যই অপছন্দ করি।

সবর ও সালাতের গুরুত্ব

(٤٥) وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۙ

(٤٦) الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۠

৪৫. আর তোমরা সালাত ও সবরের সাহায্যে আমরা মদদ চাও এবং-নিশ্চয় আল্লাহ্ভীরু ছাড়া উহা অবশ্যই কঠিনতম কাজ।

৪৬. আল্লাহ্ভীরুগণ মনে করে, নিশ্চয় তাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত মিলিত হইবে ও নিশ্চয়ই তাহারা তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইবে।'

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার জন্য নির্দেশ দিতেছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মকাতিল ইব্ন হাব্বান তাঁহার তাফসীরে বলেন ঃ পরকাল প্রাপ্তির জন্য ফরযসমূহে সবর ও সালাতের মাধ্যমে মদদ চাও। সবর কি? বলা হইল, সিয়াম। মুজাহিদ এই ব্যাপারে দলীল পেশ করেন। কুরতুবী প্রমুখ বলেন– তাই রমযান মাস ধৈর্যের মাস বলিয়া খ্যাত। হাদীসেও এইরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়।

সুফিয়ান ছাওরী আবূ ইসহাক হইতে, তিনি জরী' ইব্ন কুলায়ব হইতে, তিনি বনূ সলীমের এক ব্যক্তি হইতে ও তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলেন, 'সাওম সবরের অর্ধেক।'

একদল বলেন– সবর অর্থ পাপ হইতে নিজকে বিরত রাখা। উহার ফলে ইবাদত আদায় ও উহার শ্রেষ্ঠরূপ সালাত সহজতর হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন– আমাকে আমার পিতা তাঁহাকে আব্দুল্লাহ ইব্ন হামযাহ ইব্ন ইসমাঈল তাঁহাকে ইসহাক ইব্ন সুলায়মান আবূ সিনান হইতে, তিনি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ সবর দুই ধরনের। বিপদে সবর। উহা ভাল। তবে উত্তম

হইল হারামে সবর। ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন– অনুরূপ বর্ণনা হাসান বসরী হইতেও পাওয়া গিয়াছে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতে পর্যায়ক্রমে মালিক ইব্‌ন দীনার, ইব্‌ন লাহিআ ও ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেন– সবর অর্থ যাহা কিছু ঘটে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ঘটে বলিয়া বান্দা উহা হৃষ্টচিত্তে মানিয়া লয় এবং উহার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার আশা করে। কারণ যে ব্যক্তি বিপদে অস্থির হইয়া পড়ে তাহারও শেষ পর্যন্ত ধৈর্যধারণ ছাড়া পথ থাকে না। وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ আয়াতাংশ সম্পর্কে আবুল আলীয়া বলেন– সবর হইল আল্লাহ্‌র মর্জীর উপর তাঁহাকে খুশি করার জন্য ধৈর্যধারণ। জানিয়া রাখ, উহাও আল্লাহ্‌র আনুগত্য। তেমনি সালাত হইল আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পালনে দৃঢ়তা অর্জনের শ্রেষ্ঠতম সহায়ক। কারণ, আল্লাহ্ বলেন ঃ

اُتْلُ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ـ

'তোমার নিকট আল-কিতাবের যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তিলাওয়াত কর ও সালাত কায়েম কর। নিশ্চয় সালাত নিষিদ্ধ ও নির্লজ্জ কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে এবং অবশ্যই আল্লাহ্‌র যিকির শ্রেষ্ঠতম।'

ইমাম আহমদ বলেন– আমাকে খলফ ইবনুল ওলীদ, তাঁহাকে ইয়াহিয়া ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যায়দ ইকরামা হইতে, তিনি আম্মার হইতে, তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আদ্ দাওলী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ হুযায়ফার ভাই আবদুল আযীয বলেন যে, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেন– 'রাসূল (সা) কোন কাজে পেরেশান হইলে নামায পড়িতেন।'

আবূ দাউদ মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা হইতে, তিনি যাকারিয়া হইতে, তিনি ইকরামা ইব্‌ন আম্মার হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। শীঘ্রই তাহা সবিস্তারে আলোচিত হইবে।

ইব্‌ন জারীরও ইব্‌ন জুরায়জ হইতে, তিনি ইকরামা হইতে, তিনি আম্মার হইতে, তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ উবায়দ ইব্‌ন আবূ কুদামা হইতে, তিনি আবদুল আযীয ইবনুল ইয়ামান ও তিনি হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন– রাসূল (সা) কোন কারণে কাজে যখন অস্থির হইতেন, তখন নামাযে দাঁড়াইতেন।

একদল বর্ণনাকারী হুযায়ফার ভাই আব্দুল আযীযের বরাতে নবী করীম (সা) হইতে উহা মুরসালরূপে বর্ণনা করেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন নসর আল মারূযী তাঁহার 'কিতাবুস সালাত'-এ বলেন– আমাকে সহল ইব্‌ন উসমান আল-আসকারী ইয়াহিয়া ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যায়দাহ হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। ইয়াহিয়া বলেন ঃ আমাকে ইকরামা ইব্‌ন আম্মার মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আদ দাওলী হইতে, তিনি আবদুল আযীয হইতে ও তিনি হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন– 'আহযাবের রাত্রিতে আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলাম। তিনি চাদর গায়ে জড়ানো অবস্থায় তখন নামাযে নিরত ছিলেন। যখনই কোন কাজে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতেন, নামাযে দাঁড়াইতেন।

তিনি আরও বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয, তাঁহাকে তাঁহার পিতা, তাঁহাকে শু'বা আবূ ইসহাক হইতে, তিনি হারিছা ইব্‌ন মাযরাব হইতে ও তিনি আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, আমি বদরের রাত্রে রাসূল (সা) ছাড়া তোমাদের সকলকেই নিদ্রামগ্ন দেখিলাম। রাসূল (সা) সকাল পর্যন্ত নামাযে নিরত ছিলেন।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ রাসূল (সা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি একবার আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট গিয়া দেখিলেন, তিনি পেট কচলাইতেছেন। রাসূল (সা) প্রশ্ন করিলেন, اشكم درد 'তোমার কি পেট ব্যথা করিতেছে। তিনি বলিলেন– হ্যাঁ। রাসূল (সা) বলিলেন ওঠ, নামায পড়। নিশ্চয় নামায রোগ প্রতিষেধক।

ইব্‌ন জারীর বলেন– আমাকে মুহাম্মদ ইবনুল ফযল ও ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম, তাঁহাদিগকে ইব্‌ন আলীয়া, তাঁহাকে আয়নিয়া ইব্‌ন আব্দুর রহমান তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'ইব্‌ন আব্বাস (রা) এক সফরের সময় তাঁহার ভাই কুছামের মৃত্যুর খবর শুনিতে পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'ইন্নালিল্লাহ' পড়িয়া পথিপার্শ্বে উট থামাইয়া দুই রাকআত নামায আদায় করিলেন। নামাযের বৈঠকে তিনি দীর্ঘক্ষণ কাটাইলেন। নামায শেষে তিনি সওয়ারীর দিকে যাবার পথে পাঠ করিলেন ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ - وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ

সুনায়দ হাজ্জাজের সনদে ইব্‌ন জুরায়জ হইতে বর্ণনা করেন وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ। অর্থাৎ সালাত ও সবর আল্লাহ্‌র রহমতের সহায়ক। আর اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ। বাক্যাংশের 'হা' সর্বনামটি মুজাহিদের মতে 'সালাত' শব্দের দিকে ইঙ্গিত প্রদান করে। ইব্‌ন জারীরও এই মত গ্রহণ করেন।

অবশ্য উহা বাক্যের মর্ম الوصية। শব্দের দিকেও ইঙ্গিত হইতে পারে। যেমন কারূনের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلاَيُلَقَّاهَا اِلاَّ الصَّابِرُوْنَ -

'জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বলিল, তোমাদের জন্য আক্ষেপ। ঈমানদার নেককারদের জন্য আল্লাহ্‌র পুরস্কার উত্তম। ধৈর্যশীলগণ ব্যতীত উহার সাক্ষাৎ পাইবে না।'

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ - وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ -

'ভাল ও মন্দ সমান হইতে পারে না। মন্দের জবাব ভাল দিয়া দাও। তাহা হইলে তোমার ও তাহার ভিতর চরম শত্রুতা থাকিলেও পরম বন্ধুত্ব সৃষ্টি হইবে। ধৈর্যশীল ও ভাগ্যবানগণ ব্যতীত উহার সন্ধান পাইবে না।'

এতদুভয় ক্ষেত্রেই يلقاها শব্দের ها সর্বনামটি الوصية শব্দের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। অর্থাৎ যে 'উপদেশ' দেওয়া হইয়াছে, উহা পালন করা ধৈর্যশীল ও ভাগ্যবান ছাড়া সম্ভবপর নহে।

যাহা হউক, উভয় অবস্থায়ই 'ইন্নাহা লাকাবীরাতুন' অর্থ আল্লাহ্ভীরু ছাড়া অন্যদের জন্য উহা কঠিন ও কষ্টকর কাজ। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন, 'খাশি'ঈন' অর্থ আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিধানের সত্যায়ক দল। মুজাহিদ বলেন– খাশি'ঈন হইল যথার্থ মু'মিনগণ। আবুল আলীয়া বলেন– 'খাশি'ঈন' অর্থ খাইফীন (সন্ত্রস্তগণ)। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলেন– 'খাশি'ঈন' অর্থ বিনয়ীগণ। যিহাক বলেন– 'ইন্নাহা লাকাবীরাতুন' অর্থাৎ অবশ্যই উহা দুর্বহ। তবে যাহারা সত্যানুসারী, বিনয়ী ও আল্লাহ্ভীরু তাহাদের জন্য উহা ভারী কাজ নহে। কারণ, তাহাদের সামনে প্রতিশ্রুতি ও হুঁশিয়ারি বিদ্যমান। এই তাৎপর্যটি হাদীসের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন, রাসূল (সা)-কে উক্ত ভারী কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, 'নিশ্চয় যাহার জন্য আল্লাহ্ উহা সহজ করেন শুধু তাহার জন্যই সহজ।'

ইব্ন জারীর বলেন– আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হইল, 'হে আহলে কিতাবের পাদ্রীবৃন্দ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য গ্রহণ ও অনাচার-ব্যভিচার বিদূরক সালাত কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহ্র মদদ কামনা কর। কারণ, উহাই আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের পথ। তবে উহার জন্য তোমাদিগকে আল্লাহ্ভীরু, বিনয়ী ও নিবেদিত প্রাণ হইতে হইবে।' তিনি আরও বলেন– যদিও আয়াতটি বনী ইসরাঈলগণকে সতর্ক করার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে, তথাপি উহার তাৎপর্য সকলের জন্য সমান প্রযোজ্য। বিশেষ উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইলেও উহা ব্যাপক অর্থ প্রদান করিতেছে।

اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلاَقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ আয়াতটি পূর্ব আয়াতের সম্পূরক। অর্থাৎ সালাত কিংবা অসিয়ত বড়ই কঠিন। শুধু সেই সকল আল্লাহ্ভীরুর জন্য সহজ যাহারা বিশ্বাস করে যে, অবশ্যই তাহারা তাহাদের প্রভুর সম্মুখীন হইবে এবং অবশ্যই তাহার নিকট ফিরিয়া যাইবে। অন্য কথায়, তাহারা জানে যে, কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে আল্লাহ্র সমীপে সমবেত হইতে হইবে এবং তাহাদের কার্যকলাপ তাঁহার নিকট পেশ করা হইবে। অতঃপর তদনুযায়ী তাহাদের বিচারকার্য সম্পাদিত হইবে। যখন তাহারা পরকাল ও ফলাফল সম্পর্কে বিশ্বাসী হইল, তখন স্বভাবতই তাহাদের জন্য ইবাদত করা ও অন্যায় হইতে বিরত থাকা সহজতর হইয়া গেল।

يظنون শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইব্ন জারীর (র) বলেন– আরবরা 'বিশ্বাস' ও 'ধারণা' দু'টোর জন্যই 'জন্নুন' শব্দ ব্যবহার করে। এইরূপ দ্ব্যর্থবোধক শব্দের একটি উদাহরণ হইল صدفة অর্থাৎ আলো ও অন্ধকার। তেমনি صارخ শব্দটি বাদী ও বিচারক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরূপ আরও শব্দ আছে যাহা পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রদান করে। যেমন দুরাইদ ইবনুস সিমাত বলেন ঃ

فقلت لهم ظنوا بالفى مدجج - سراتهم فى الفارسى المسرد

এখানে 'জান্ন' অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস করা। কবি উমায়ের ইব্ন তারিক বলেন ঃ

فان يعبروا قومى واقعد فيكم - واجعل منى الظن غيا مرجما

এখানে 'আজ জান্নো' অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস।

ইব্ন জারীর বলেন– কবিদের কবিতায়ও 'জান্নুন' অর্থ 'একীন' লওয়া হইয়াছে। তাই উহার অর্থ শুধুই 'ধারণা' মাত্র নহে। জ্ঞানীদের জন্যে এতটুকু কথাই যথেষ্ট। আল্লাহ্র কালামেও অনুরূপ অর্থ গ্রহণ করার নজীর আছে। যেমন ঃ

وَرَاَى الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مُوَاقِعُوْهَا 'পাপীগণ যখন জাহান্নাম দেখিল তখন বিশ্বাস করিল যে, তাহারা উহাতে নিপতিত হইবে।'

অতঃপর ইব্ন জারীর বলেন– আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন বিশার, তাঁহাকে আবূ আলিম, তাঁহাকে সুফিয়ান জাবির হইতে, তিনি মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন– কুরআনের প্রত্যেকটি ظن অর্থই 'একীন' বা দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি আরও বলেন– আমাকে মুছান্না, তাঁহাকে ইসহাক, তাঁহাকে আবূ দাউদ আল জবরী সুফিয়ান হইতে, তিনি ইব্ন আবূ নাজীহ হইতে ও তিনি মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ কুরআনের প্রতিটি ظن শব্দই علم অর্থ প্রদান করে। সনদটি সহীহ।

আবূ জা'ফর আররাযী রবী' ইব্ন আনাস হইতে ও তিনি আবুল আলীয়া হইতে বর্ণনা করেন– আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ظن অর্থ একীন। ইব্ন আবূ হাতিম বলেন– মুজাহিদ, আস্সুদ্দী, রবী' ইব্ন আনাস ও কাতাদাহ উক্ত শব্দের অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করেন। উক্ত আয়াত সম্পর্কে সুনায়দ হাজ্জাজের সনদে ইব্ন জুরায়রের এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلاَقُوْا رَبِّهِمْ অর্থাৎ তাহারা জানে যে, নিশ্চয়ই তাহারা তাহাদের প্রভুর সম্মুখীন হইবে। আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, সহীহ সংকলনে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এক বান্দাকে প্রশ্ন করিবেন– আমি কি তোমাকে পরিবার-পরিজন দেই নাই? আমি কি তোমাকে মর্যাদাবান করি নাই? আমি কি তোমার সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করি নাই? সে বলিবে– হ্যাঁ। তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিবেন– 'তোমার কি বিশ্বাস ছিল না যে, তুমি আমার সম্মুখীন হইবে? সে বলিবে– না। তখন আল্লাহ্ বলিবেন– তুমি যেভাবে আমাকে ভুলিয়াছিলে, আজ আমি তেমনি তোমাকে ভুলিব। 'নাসূল্লাহা ফানাসিয়াহুম' আয়াতের ব্যাখ্যায় শীঘ্রই এই প্রসঙ্গটি ইনশাআল্লাহ্ সবিস্তারে আলোচিত হইবে।

বনী ইসরাঈলের নি'আমত প্রাপ্তি

(٤٧) يٰبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ○

৪৭. 'হে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়! তোমাদের উপর অবতীর্ণ নি'আমতরাজীর কথা স্মরণ কর। অনন্তর নিশ্চয় আমি নিখিল সৃষ্টির উপরে তোমাদিগকে মর্যাদা দিয়াছিলাম।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে তাহাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রতি ইতিপূর্বে প্রদত্ত নিআমতের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তিনি যে সকল নি'আমাত প্রদান করিবার মাধ্যমে তৎকালীন জাতিসমূহের উপর তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান

করিয়াছিলেন, সেইগুলির কথাও তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। লোকদের হিদায়েতের জন্য প্রেরণ করা এবং তাহাদের প্রতি বিপুলসংখ্যক আসমানী কিতাব নাযিল করা– উক্ত নি'আমাতসমূহের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ নি'আমাত।

বনী ইসরাঈল জাতিকে যে আল্লাহ্ তা'আলা তৎকালীন অন্যান্য সকল জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন, নিম্নোক্ত আয়াতসমূহেও তাহা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ 'আর আমি নিশ্চয় জ্ঞানের প্রাধান্য দ্বারা তাহাদিগকে (তৎকালীন) অন্য সকল জাতির উপর মনোনীত করিয়াছি।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يَاقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوْكًا وَّاٰتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ -

'আর (সেই সময়ের কথা স্মরণ-যোগ্য) যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিল– হে আমার জাতি! তোমাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্র নি'আমাতকে তোমরা স্মরণ কর। যখন তিনি তোমাদের মধ্য হইতে বিপুল সংখ্যক লোককে নবী বানাইয়াছেন, তোমাদিগকে রাজ্য-পরিচালক বানাইয়াছেন এবং অন্য কোন জাতিকে যাহা প্রদান করেন নাই, তাহা তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন।'

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী' ইব্ন আনাস ও আবূ জা'ফর রাযী وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল আলীয়া বলেন– 'আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে রাজ্য শাসনের ক্ষমতা, যোগ্যতা ও সুযোগ, রাসূলগণ এবং আসমানী কিতাবসমূহ প্রদান করিবার মাধ্যমে তৎকালীন অন্যান্য জাতির উপর তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক যুগেই عالم অর্থাৎ লোক সমাজ, জাতি বা শ্রেণী থাকে। বনী ইসরাঈল জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা তৎকালীন অন্য সকল জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।' মুজাহিদ, রবী' ইব্ন আনাস, কাতাদাহ এবং ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

'বনী ইসরাঈল জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বযুগের অন্য সকল জাতি বা উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলেন' উপরোক্ত আয়াতাংশের এইরূপ অর্থ করা সঠিক নহে। বরং তিনি তাহাদিগকে শুধু তৎকালীন অন্যান্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলেন– উহার এইরূপ অর্থ করাই সঠিক ও নির্ভুল। কারণ, নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা (সা)-এর উম্মাত যে কোন যুগের অন্য উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তাহা সর্বজনবিদিত ও প্রমাণিত সত্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ - وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ -

'তোমরা হইতেছ শ্রেষ্ঠতম উম্মাত যাহাকে মানব জাতির (হিদায়েতের) জন্যে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। তোমরা সৎ কার্যের নির্দেশ দান করিবে এবং অসৎ কার্য হইতে বিরত

রাখিবে। আর তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমানে দৃঢ় ও অবিচল থাকিবে। অন্যান্য আসমানী কিতাব প্রাপ্তগণ যদি ঈমান আনে, তবে উহা তাহাদের জন্যে কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হইবে।'

সাহাবী হযরত মুআবিয়া ইব্ন হায়দাতুল কুশায়রী (রা) হইতে 'মুসনাদ' এবং 'সুনান' শ্রেণীর হাদীস সংকলনসমূহে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'তোমরা হইতেছ সত্তরতম উম্মাত। আল্লাহ্র নিকট তোমরা সকল উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম উম্মাত।'

উপরোক্ত বিষয়ে বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেইগুলি আলোচিত হইবে।

কেহ কেহ বলেন, 'আলোচ্য আয়াতাংশে বনী ইসরাঈল জাতির যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হইয়াছে, উহা শুধু বিশেষ কোন দিক দিয়া সেই যুগের সব জাতির উপর তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব। উহা দ্বারা কোনক্রমে প্রমাণিত হয় না যে, তাহারা সর্বদিক দিয়া সর্বযুগের অন্য সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ছিল।' ইমাম রাযী উপরোক্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উহা গ্রহণযোগ্য নহে।

কেহ কেহ আবার বলেন- বনী ইসরাঈল জাতি সর্বযুগের সর্বজাতির উপরই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মধ্য হইতে বিপুল-সংখ্যক ব্যক্তিকে নবূওতের মহা-সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন।' ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে উপরোক্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, সকল জাতি কথাটি ব্যাপক। অথচ বনী ইস্রাঈল জাতির সৃষ্টির পূর্বে আগত নবী হযরত ইব্রাহীম (আ) ছিলেন তাহাদের সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আবার তাহাদের আগমনের পর আগত নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) ছিলেন সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। তিনি হইতেছেন দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বকালের সর্বদেশের সমগ্র মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। আল্লাহ্ তা'আলার শান্তি ও রহ্মতের ধারা তাঁহার প্রতি বর্ষিত হউক।

(٤٨) وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

৪৮. সেইদিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও জন্য কোন ব্যাপারে যথেষ্ট হইবে না, কাহারও জন্য কোন সুপারিশ কবূল হইবে না; কাহারও কোনরূপ বিনিময় গৃহীত হইবে না; এমনকি তাহারা কোনই সাহায্য পাইবে না।

তাফসীর ঃ পূর্বোক্ত আয়াতে বনী ইসরাঈল জাতিকে প্রদত্ত নি'আমাত বা দানসমূহের কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবার পর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিনের দীর্ঘ ও কঠোর শাস্তির ব্যাপারে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। আয়াতে তিনি বলিতেছেন- কিয়ামতের দিনে কেহ কাহারো সামান্যতম উপকারও করিতে পারিবে না। কেহ কাহারো জন্যে সুপারিশও করিতে পারিবে না। কোনোরূপ মুক্তিপণের বিনিময়ে কাহাকেও দোযখের আযাব হইতে মুক্তি প্রদান করা হইবে না। আর অন্য কোনো উপায়েও কেহ সাহায্য

পাইবে না। অতএব সেই দিন তথা সেই দিনের আযাব সম্বন্ধে তোমরা সতর্ক হও এবং উহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্যে মহাসত্য তথা কুরআন মজীদ ও মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করো।

لَاتَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا অর্থাৎ কেহ কাহারো কোনো উপকার করিতে পারিবে না। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى 'কোনো বোঝাবহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না।'

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

لِكُلِّ امْرِءٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ 'সেই দিন প্রত্যেক মানুষের নিজেরই এইরূপ মহা-গুরুত্বপূর্ণ কার্য থাকিবে যাহা তাহাকে অপরের কথা ভাবিতে অবকাশ দিবে না।'

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّاتَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَلَامَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا۔

'হে লোকসকল! স্বীয় প্রতিপালক প্রভুকে তোমরা ভয় করো এবং যেদিন না পিতা স্বীয় পুত্রকে আর না পুত্র স্বীয় পিতাকে কোনোরূপ উপকার করিতে পারিবে, সেই দিনকে ভয় করো।

শেষোক্ত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, কিয়ামতের দিনে পিতা-পুত্রের কেহ কাহারো কোনোরূপ উপকার করিতে পারিবে না।

وَلَايُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ অর্থাৎ কাফিরের পক্ষে কেহ কোনো সুপারিশ করিলে উহা গৃহীত হইবে না। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ 'অতএব, সুপারিশকারীগণের সুপারিশ তাহাদের কোনো উপকার করিতে পারিবে না।'

দোযখবাসীগণের বক্তব্য সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন ঃ

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ وَلَاصَدِيْقٍ حَمِيْمٍ 'অতএব, আমাদের জন্যে না আছে কোনো সুপারিশকারী আর না আছে কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু।'

وَلَايُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ অর্থাৎ কাহারো নিকট হইতে কোনরূপ মুক্তিপণও গ্রহণ করা হইবে না এবং উহার বিনিময়ে কাহাকেও মুক্তি প্রদান করা হইবে না।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ۔

'যাহারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং সত্যের প্রত্যাখ্যানকারী থাকিয়াই মরিয়াছে, তাহাদের কেহ পৃথিবীর সমপরিমাণ স্বর্ণও যদি মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করিতে চাহে, তথাপি উহা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে না।'

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

'যাহারা কাফির হইয়াছে, তাহারা কিয়ামতের দিনের আযাব হইতে মুক্তি পাইবার বিনিময়ে প্রদান করিবার জন্য যদি পৃথিবীর সমুদয় বস্তু এবং তৎসহ উহার সমপরিমাণ আরো সম্পদ তাহাদের অধিকারে আসিয়া যায়, তথাপি উহা তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত হইবে না। আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَايُؤْخَذْ مِنْهَا 'সে (কাফির) যদি সম্ভাব্য সকল মুক্তিপণ প্রদান করিতে চাহে, তথাপি উহা তাহার নিকট হইতে গৃহীত হইবে না।'

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

فَالْيَوْمَ لَايُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَامِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَأْوَاكُمُ النَّارُ - هِىَ مَوْلٰكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

'অতএব, আজ তোমাদের নিকট হইতে (মুনাফিকদের নিকট হইতে) আর অন্য কাফিরদের নিকট হইতে কোনরূপ মুক্তিপণ গৃহীত হইবে না। তোমাদের বাসস্থান হইতেছে দোযখ। উহাই তোমাদের বন্ধু ও সঙ্গী। আর উহা বড়ই নিকৃষ্ট বাসস্থান!'

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আহ্লে কিতাবগণ যদি আল্লাহ্ তা'আলার রাসূলের প্রতি ঈমান না আনে, তাহাকে যে হিদায়েত দিয়া তিনি পাঠাইয়াছেন, উহার প্রতি যদি তাহারা অনুগত না হয় এবং এই অবস্থায়ই যদি তাহারা কিয়ামতে আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে না কোন আত্মীয়ের আত্মীয়তা আর না কোন প্রতাপশালী ব্যক্তির সুপারিশ তাহাদিগকে কোনরূপ উপকার করিতে পারিবে। অনুরূপভাবে তাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ মুক্তিপণ, হউক না উহা পৃথিবীর সমপরিমাণ স্বর্ণ, তাহাও গৃহীত হইবে না। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيْهِ وَلَاخُلَّةٌ وَّشَفَاعَةٌ - 'সেই দিনের আগমনের পূর্বেই (তোমরা আমার পক্ষ হইতে প্রদত্ত নি'আমাতসমূহের একাংশ অপরের জন্যে আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর।) যেদিন না কোনরূপ ক্রয়-বিক্রয়, না কোনরূপ বন্ধুত্ব আর না কোনরূপ সুপারিশ কার্যকর থাকিবে। তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

لَابَيْعٌ فِيْهِ وَلَاخِلَالٌ ...... 'যেদিন না কোন ক্রয়-বিক্রয় আর না কোন বন্ধুত্ব কার্যকর থাকিবে।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ ইব্ন জুরায়জ, হাজ্জাজ ও সুনায়দ ولايؤخذ منها عدل এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন– عدل অর্থাৎ বিনিময়; মুক্তিপণ। সুদ্দী বলেন– কোনরূপ عدل

(মুক্তিপণ)-ই আল্লাহ্ তা'আলাকে عدل (ন্যায় বিচার) হইতে বিরত রাখিতে পারিবে না। কাফির ব্যক্তি পৃথিবীর সমপরিমাণের স্বর্ণও যদি স্বীয় মুক্তির বিনিময়ে দিতে চাহে, তথাপি উহা গৃহীত হইবে না।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আবুল আলীয়া হইতে ধরাবাহিকভাবে রবী' ইব্ন আনাস ও আবূ জা'ফর রাযী ولايقبل منها عدلএই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবুল আলীয়া বলেন- عدل অর্থ মুক্তিপণ। ইব্নে আবূ হাতিম বলেন- আবূ মালেক, হাসান, সাঈদ ইব্ন জারীর, কাতাদাহ এবং রবী' ইব্ন আনাস হইতেও উক্ত শব্দের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। আবদুর রায্যাক বলেন- হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্রাহীম তায়্মীর পিতা, ইবরাহীম তায়্মী, আ'মাশ ও সুফিয়ান সাওরী আমার নিকট এক দীর্ঘ হাদীসের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আলী (রা) বলেন- الصرف। এবং العدل। শব্দের তাৎপর্য হইতেছে যথাক্রমে নফল ইবাদত ও ফরয ইবাদত। উমায়র ইব্ন হানী হইতেও ধারাবাহিকভাবে উসমান ইব্ন আবুল আতিকাহ্ ও ওলীদ ইব্ন মুসলিম অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই ক্ষেত্রে উক্ত শব্দের ঐরূপ তাৎপর্য গ্রহণযোগ্য নহে। আলোচ্য আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, উহাই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও আলোচ্য আয়াতাংশের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হইয়াছে ঃ উমাইয়া বংশীয় জনৈক সিরীয় বুযুর্গ আমর ইব্ন কায়স মুলাঈ, আবদুর রহমান, হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান, আলী ইব্ন হাকীম, নাজীহ ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসিত হইলেন- হে আল্লাহ্র রাসূল! العدل। কি? তিনি বলিলেন, العدل। হইতেছে الفدية। (মুক্তিপণ)।

ولاهم ينصرون অর্থাৎ কেহই তাহাদের প্রতি সহৃদয় হইয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবে না এবং আল্লাহ্র আযাব হইতে মুক্তি দিবে না। ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিনে কোন আত্মীয় বা প্রতাপান্বিত ব্যক্তি তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া তাহাদিগকে কোনরূপে উপকৃত করিতে পারিবে না। তাহাদের নিকট হইতে কোনোরূপে মুক্তিপণও গৃহীত হইবে না। এই সকল পন্থায় উপকৃত হইবার জন্য তাহাদিগকে সুযোগ প্রদান করা হইতেছে তাহাদিগের প্রতি কৃপা-প্রদর্শন। আর তাহাদের প্রতি কোনোরূপ কৃপা-প্রদর্শনই করা হইবে না। না তাহারা নিজেরা নিজেদের আর না অপরে তাহাদের কোনো উপকার বা সাহায্য করিতে পারিবে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلاَنَاصِرٍ 'অতএব, তাহার জন্যে না কোনো ক্ষমতাবানের ক্ষমতা আর না কোনো সাহায্যকারীর সাহায্য থাকিবে।' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের ব্যাপারে কোনোরূপ মুক্তিপণ বা সুপারিশ গ্রহণ করিবেন না। তাই কোনো মুক্তিদাতা কোনো কাফিরকে তাঁহার আযাব হইতে ছাড়াইয়া আনিতে পারিবে না। ফলে কেহ তাঁহার আযাব হইতে রেহাই পাইবে না। সেদিন কেহ কোনো কাফিরকে আল্লাহ্র আযাব হইতে বাঁচাইয়া নিজের আশ্রয়ে রাখিবে না আর রাখিবার ক্ষমতাও কাহারো থাকিবে না। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَيُجَارُ عَلَيْهِ 'তিনি আশ্রয় দিয়া থাকেন; তাঁহার বিরুদ্ধে কাহাকেও আশ্রয় দেওয়া সম্ভবপর নহে।'

তিনি আরও বলেন ঃ

فَيَوْمَئِذٍ لاَّيُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ وَّلاَيُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٌ 'সেই দিন না আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তির সমতুল্য শাস্তি কেহ প্রদান করিবে আর না তাঁহার বাঁধনের ন্যায় বাঁধন কেহ দিতে পারিবে।' তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

مَا لَكُمْ لاَتَنَاصَرُوْنَ - بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ 'তোমাদের কী হইল যে, (আজ) পরস্পরকে সাহায্য করিতেছ না? বরং আজ তাহারা অনুগত ও আত্মসমর্পণকারী সাজিয়াছে।'

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

فَلَوْ لاَ نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ط بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ -

'তাঁহারা আল্লাহ্কে ত্যাগ করিয়া যাহাদিগকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, (আজ) তাহারা তাহাদিগকে কোনো সাহায্য করিতেছে না? কেন আজ তাহারা তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়াছে?'

مَا لَكُمْ لاَتَنَاصَرُوْنَ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন– 'উহার অর্থ হইতেছে, আজ তোমরা (কাফিরদের কৃত্রিম বন্ধুরা) আমার আযাব হইতে কাফিরদিগকে কেনো বাঁচাইতেছ না? অসম্ভব! অসম্ভব!! উহা তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে।'

ইমাম ইব্ন জারীর ولاينصرون এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন– সেইদিন যেইরূপ তাহাদের জন্যে কোনো সুপারিশকারী থাকিবে না এবং তাহাদের নিকট হইতে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না, সেইরূপে কোনো সাহায্যকারী তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিবে না। সেইদিন পারস্পরিক বন্ধুত্ব, উৎকোচ, সুপারিশ এবং সাহায্যের সকল পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। সেইদিন মহাপরাক্রমশালী ও মহা ন্যায়-বিচারক আল্লাহ্ তা'আলাই একচ্ছত্র বিচারক হইবেন এবং তিনি পাপের পরিবর্তে উহার সমতুল্য শাস্তি আর পুণ্যের পরিবর্তে উহার বহুগুণ পুরস্কার প্রদান করিবেন।

আলোচ্য আয়াতাংশের ন্যায় অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ - مَالَكُمْ لاَتَنَاصَرُوْنَ - بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ -

'থামাও তাহাদিগকে! তাহাদিগকে নিশ্চয় জওয়াবদিহী করিতে হইবে। তোমাদের কী হইল যে, তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করিতেছ না? বরং আজ তাহারা অনুগত ও আত্মসমর্পণকারী।'

(٤٩) وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ط وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

(٥٠) وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

৪৯. (সেদিনের কথা স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদিগকে ফিরাউন গোত্র হইতে মুক্তি দিলাম। তাহারা তোমাদিগকে নৃশংস শাস্তি দিত। তোমাদের পুত্রগণকে হত্যা করিত ও কন্যাগণকে জীবিত রাখিত। ইহার ভিতর তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে বিরাট পরীক্ষা ছিল।

৫০. যখন আমি তোমাদের জন্য নদীকে বিভক্ত করিয়া তোমাদিগকে উদ্ধার করিলাম ও ফিরাউন গোষ্ঠীকে নিমজ্জিত করিলাম, তখন তোমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিলে।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউনের নৃশংসতম লোমহর্ষক অত্যাচার হইতে বনী ইসরাঈল জাতিকে মুক্ত করিবার কথা তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া দিতেছেন। ফিরাউন বনী ইসরাঈল জাতির সদ্যপ্রসূত পুত্র-সন্তানদিগকে হত্যা করিত এবং তাহাদের কন্যা-সন্তানদিগকে জীবিত থাকিতে দিত। ইহা ছিল বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি আপতিত এক মহাবিপদ। হযরত মূসা (আ)-এর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈল জাতিকে নির্বিঘ্নে সমুদ্র অতিক্রম করাইয়া এবং ফিরাউন ও তদীয় লোক-লস্করকে উহাতে ডুবাইয়া মারিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে এই মহাবিপদ হইতে মুক্ত করেন।

বনী ইসরাঈল জাতির উপর ফিরাউনের পক্ষ হইতে উপরোক্ত হিংস্রতম অত্যাচার নামিয়া আসিবার পশ্চাতে একটা স্বপ্ন সক্রিয় ছিল। একদা ফিরাউন স্বপ্নে দেখিল– 'বায়তুল-মুকাদ্দাস হইতে একটা অগ্নিপিণ্ড বহির্গত হইয়া মিসর-দেশীয় ফিরাউন বংশীয় কিব্তি লোকদের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিল। উহা বনী-ইসরাঈল জাতির লোকদের গৃহে প্রবেশ করিল না।' ফিরাউনের স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারীগণ তাহাকে বলিল– 'উক্ত স্বপ্নের অর্থ এই যে, বনী ইসরাঈল গোত্রের একটা লোকের হাতে একদা তাহার রাজত্ব ধ্বংস হইয়া যাইবে।' স্বপ্নদর্শণে এবং ব্যাখ্যা শ্রবণে ফিরাউন অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীগণ কর্তৃক তাহার নিকট উহার ব্যাখ্যা বর্ণিত হইবার পরে লোকদের মধ্যে এই কথা ছড়াইয়া পড়িল যে, 'বনী ইসরাঈল জাতি তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হইবার অপেক্ষায় রহিয়াছে। তাঁহার নেতৃত্বে তাহারা নির্যাতন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বাধীনতা ও সম্মানের অধিকারী হইবে।' ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কিত হাদীছে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে। 'সূরা ত্ব-হা'-এর ব্যাখ্যায় ইনশা আল্লাহ্ উহা বর্ণিত হইবে। যাহা হউক, অতঃপর ফিরাউন বনী ইস্রাঈল গোত্রের নবজাত পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা করিতে এবং কন্যা সন্তানদিগকে জীবিত ছাড়িয়া দিতে আদেশ দিল। সে বনী ইসরাঈল গোত্রের লোকদিগকে চরম অবমাননাকর কঠোর পরিশ্রমের কার্যে নিযুক্ত করিতেও আদেশ দিল।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউনের বনী ইসরাঈল গোত্রের পুত্র-সন্তানদিগকে হত্যা করিবার এবং তাহাদের কন্যা-সন্তানদিগকে জীবিত থাকিতে দিবার ঘটনাকে তাহাদের উপর নিপতিত বিপদের ব্যাখ্যা হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সূরা ইব্রাহীমে উহাকে তাহাদের উপর নিপতিত বিপদ হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র বিপদ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সূরা-ইবরাহীম-এ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَائَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَائَكُمْ -

'তাহারা তোমাদের উপর জঘন্যতম নির্যাতন ও উৎপীড়ন চালাইত, তোমাদের পুত্র-সন্তানদিগকে মারিয়া ফেলিত এবং তোমাদের কন্যা সন্তানদিগকে জীবিত থাকিতে দিত।'

'সূরা-কাসাস'-এ ইনশাআল্লাহ্ এতদসম্পর্কিত ব্যাখ্যা আসিবে। আল্লাহ্ই সাহায়ক ও সাহায্যকারী।

يسومون অর্থাৎ– তাহারা অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাইত। আবূ-উবায়দাহ্ উহার ঐরূপ অর্থই বর্ণনা করিয়াছেন। আরবরা বলে سامه خطة خسف সে তাহার গায়ে অত্যাচারের চিহ্ন লাগাইয়া দিয়াছে, সে তাহার উপর অত্যাচার চালাইয়াছে'। কবি আমর ইব্ন কুল্ছুম বলেন ঃ

اذا ما الملك سام الناس خسفا

ابينا ان نقر الخسف فينا

'বাদশাহ্ যখন প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালায়, আমরা তখন কোনক্রমে অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাইতে দিব না।'

কেহ কেহ বলেন– يسومون অর্থাৎ তাহারা স্থায়ী ভাবে অত্যাচার চালাইত। আরবগণ বলে– سائمة الغنم চারণভূমিতে স্থায়ীভাবে বিচরণশীল ছাগ-পাল। ইমাম কুরতুবী উহার ঐরূপ অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি প্রদত্ত নি'আমাত-বিশেষকে স্মরণ করিবার জন্যে তাহাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন। তাই তিনি আলোচ্য আয়াতে ফিরাউন কর্তৃক বনী ইসরাঈল গোত্রের পুত্র সন্তানদের নিহত হইবার এবং তাহাদের কন্যা সন্তানদের জীবিত পরিত্যক্ত হইবার ঘটনাকে ফিরাউনের নৃশংসতম অত্যাচার ও নিপীড়নের ঘটনার ব্যাখ্যা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, সূরা-ইবরাহীমের আয়াত বিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি প্রদত্ত নি'আমাতসমূহ তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন। তাই, তিনি পরবর্তী আয়াতে বনী ইসরাঈলের পুত্র-সন্তানদিগকে ফিরাউনের হত্যা করিবার এবং তাহাদের কন্যা-সন্তানদিগকে জীবিত রাখিবার ঘটনাকে তাহার নৃশংসতম অত্যাচার ও নিপীড়নের ঘটনা হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাতে তাহাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'আলার একাধিক নিয়ামত বিবৃত হইতে পারে।

فرعون (ফিরাউন) শব্দটি মিশরের প্রত্যেক কাফির সম্রাটের সাধারণ নাম বা উপাধি। সে عملق (অমালীক) বংশীয়। এই বংশীয় লোকগণ আমালীকা নামে পরিচিত। অনুরূপভাবে قيصر (কায়সার) শব্দটি সিরিয়াসহ রোমক সাম্রাজ্যের প্রত্যেক কাফির সম্রাটের সাধারণ নাম বা উপাধি। তেমনি كسرى (কিস্রা) শব্দটি প্রত্যেক পারস্য সম্রাটের সাধারণ নাম বা উপাধি। অনুরূপভাবে تبع (তুব্বা) শব্দটি ইয়ামান দেশের প্রত্যেক কাফির সম্রাটের সাধারণ নাম বা উপাধি। তদ্রূপ نجاشى (নাজাশী) শব্দটি হাবশ (আবিসিনিয়া) দেশের প্রত্যেক সম্রাটের সাধারণ নাম বা উপাধি। অনুরূপভাবে بطليوس (বাতলীয়ূস) শব্দটি ভারতীয় উপ-মহাদেশের প্রত্যেক সম্রাটের সাধারণ নাম বা উপাধি।

যাহা হউক, হযরত মূসা (আ)-এর সমসাময়িক ফিরাউনের নাম ছিল وليد ابن مصعب ابن الريان (ওয়ালীদ ইব্ন মুস্আব ইব্ন রাইয়ান)। কেহ কেহ বলেন– তাহার

নাম ছিল মুস্‌আব ইব্ন রাইয়ান। সে ছিল আমালীক ইব্ন আওদ ইব্ন ইরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ-এর বংশধর। তাহার উপনাম ছিল আবূ মুর্‌রা। মূলত সে ছিল পারস্য দেশীয় ইসতাখার হইতে আগত। সে যাহা হউক, তাহার প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত নিপতিত হউক।

وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ 'ফিরাউনের লোকজনের অমানুষিক নির্যাতন হইতে তোমাদের পিতৃ-পুরুষদিগকে আমার মুক্তি প্রদান করিবার কাজ তোমাদের প্রতি আমার এক মহা নি'আমাত ও উপকার।' উক্ত অংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তাল্‌হা বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- 'এ স্থলে البلاء শব্দটির তাৎপর্য হইতেছে 'নিয়ামত দান ও উপকার।' মুজাহিদ, আবুল আলীয়াহ, আবূ মালিক, সুদ্দী প্রমুখ ব্যক্তিগণও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

البلاء শব্দটির আভিধানিক অর্থ হইতেছে الاختبار (পরীক্ষা করা)। বিপদ-আপদ এবং নি'আমাত ও সুখ শান্তি- ইহাদের যে কোনোটি দিয়া আল্লাহ্ মানুষকে পরীক্ষা করিতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً 'আর আমি তোমাদিগকে বিপদ-আপদ ও সুখ-শান্তি উভয় দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকি। এইগুলি পরীক্ষার মাধ্যম।'

তিনি আরো বলেন ঃ

وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ 'তাহারা অবাধ্যতা হইতে ফিরিয়া আসিবে, এই আশায় আমি তাহাদিগকে ঐশ্বর্য-বৈভব এবং অমঙ্গল-অকল্যাণ উভয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি।'

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন- অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আরবরা কাহাকেও অমঙ্গল ও বিপদ-আপদে পতিত করিবার অর্থে বলিয়া থাকে- بلوته وابلوه بلاء (আমি তাহাকে বিপদে ফেলিয়াছি ও বিপদে ফেলিব।) পক্ষান্তরে, কাহাকেও শান্তি ও কল্যাণ প্রদান করিবার অর্থে তাহারা বলিয়া থাকে- بليته

ابليته وابليه ابلاء وبلاء অর্থাৎ আমি তাহাকে শান্তি ও কল্যাণ দান করিয়াছি, শান্তি ও কল্যাণ দান করিব। (দেখা যাইতেছে- এই অর্থে অসমাপিকা ক্রিয়া হিসাবে ابلاء ও بلاء এই উভয় শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।) আরো দেখা যাইতেছে بلاء শব্দটি কাহাকেও বিপদাপন্ন করা, কাহাকেও শান্তি দান করা, উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কবি যুহায়র ইব্ন আবূ সালমা বলেন ঃ

جزى الله بالاحسان ما فعلا بكم

وابلاهما خير البلاء الذى يبلو

'তাঁহারা দুইজনে তোমাদের প্রতি যে সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, উহার বিনিময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে মঙ্গল দান করুন এবং তিনি যে নি'আমাত ও মঙ্গল দ্বারা বান্দাকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সেই নি'আমাত ও মঙ্গল দান করুন।'

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন- 'এইস্থলে কবি উভয় অর্থেরই সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। কারণ, তিনি বলিতেছেন- আল্লাহ্ তা'আলা যে নি'আমাত দ্বারা বান্দাকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাদের দুইজনকে যেন সেই নি'আমাত দান করেন।'

কেহ কেহ বলেন "وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ" এই আয়াতাংশের بلاء عظيم শব্দ সমষ্টি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউনের পক্ষ হইতে বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি আপতিত সেই মহা বিপদের অর্থাৎ তাহাদের পুত্র-সন্তানদিগকে হত্যা করা ও কন্যা সন্তানদিগকে জীবিত থাকিতে দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিতেছেন। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ بلاء শব্দের শেষোক্ত ব্যাখ্যাই হইতেছে অধিকাংশ তাফসীরকারকৃত ব্যাখ্যা। শেষোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে- 'আর উহাতে তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে আগত মহাবিপদমূলক পরীক্ষা নিহিত ছিল।'

وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ الى اخر الاية অর্থাৎ ফিরাউনের হাত হইতে আমি তোমাদিগকে মুক্ত করিবার পরও মূসা (আ)-এর সহিত তোমাদের দেশ ত্যাগ করিবার কালে আমি সমুদ্রের পানিকে তোমাদের জন্য বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলাম। এই বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য স্থানে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সূরা শুআরা'তে উহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে উহা আল্লাহ চাহেন তো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে।

فَاَنْجَيْنَاكُمْ অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে তাহাদের হাত হইতে মুক্ত করিয়াছিলাম, তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার দুর্লংঘ প্রাচীর স্থাপন করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে সমুদ্রে ডুবাইয়া মারিয়াছিলাম। তোমরা উহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছিলে- যাহাতে উহা তোমাদের অন্তরকে অতিশয় তৃপ্ত ও আনন্দিত এবং তোমাদের শত্রুদিগকে চরমভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আমর ইব্‌ন মায়মূন আওদী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক হামদানী, মুআম্মার ও আবদুর রায্‌যাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমর ইব্‌ন মায়মূন বলেন- 'হযরত মূসা (আ)-এর বনী ইসরাঈল জাতিকে সঙ্গে লইয়া মিশর ত্যাগ করিবার সংবাদ ফিরাউনের কানে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্বীয় লোকজনকে আদেশ দিল—রাত্রিতে মোরগ ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে মূসা ও তাহার লোকজনের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে রওয়ানা হইতে হইবে। সেইদিন রাত্রিতে মোরগ ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার লোকজন জাগিয়া উঠিল। সে একটি ছাগল যবাই করিয়া লোকদিগকে আদেশ করিল, আমি এই ছাগলের কলিজা ভক্ষণ শেষ করিবার পূর্বেই ছয় লক্ষ কিব্‌তীকে আমার পার্শ্বে সমবেত দেখিতে চাই। আদেশ অনুযায়ী তাহার ছাগ-যকৃৎ ভক্ষণ শেষ হইবার পূর্বেই কিব্‌তি বংশীয় ছয় লক্ষ লোক তাহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইল। এদিকে হযরত মূসা (আ) দরিয়ার নিকট পৌঁছিলে য়ূশা' ইব্‌ন নূন নামক তাহার জনৈক সঙ্গী বলিল- আপনার প্রভু আমাদিগকে কোন্ দিকে অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন? তিনি দরিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন- 'তোমার সম্মুখ দিকে।' ইহাতে লোকটি স্বীয় অশ্বকে জোর করিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করাইল। উহা তাহাকে লইয়া সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছিল। অতঃপর উহা তাহাকে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলে সে পুনরায় হযরত মূসা

(আ)-কে বলিল, 'হে মূসা! আপনার প্রভু আমাদিগকে কোন্‌দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়াছেন? আল্লাহ্‌র কসম! আপনি মিথ্যা বলেন নাই; আপনি মিথ্যা বলেন নাই।' এইরূপে সে তিনবার সমুদ্রের তলদেশে অশ্ব নামাইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট ওহী পাঠাইলেন, 'তুমি স্বীয় লাঠি দিয়া সমুদ্রের পানিকে আঘাত করো।' তিনি তাহাই করিলেন। সমুদ্রের পানি বিভক্ত হইয়া গেল। পানির প্রত্যেকটি ভাগ বিরাট পর্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া গেল। হযরত মূসা (আ) সঙ্গীগণসহ সমুদ্র পার হইয়া গেলেন। ফিরাউন সদলবলে হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার সঙ্গীদের পশ্চাতে চলিল। হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার সঙ্গীদের সমুদ্র অতিক্রম করিবার পর সে তাহার দলবল যখন সমুদ্রের মধ্যে আসিয়া গেল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রের পানির উভয় খণ্ডকে পরস্পর মিলিত করিয়া দিলেন। উহাই- وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

এই আয়াতাংশে বিবৃত হইয়াছে।' পূর্বসূরী একাধিক ব্যাখ্যাকারও অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। যথাস্থানে উহা আলোচিত হইবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, বনী ইসরাঈল সহ হযরত মূসা (আ)-এর সমুদ্র পার হইবার উপরোক্ত ঘটনা আশুরার দিনে অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশ তারিখে ঘটিয়াছিল। হযরত ইবন জুবায়র, আইউব, আব্দুল ওয়ারেছ, আফ্‌ফান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন, 'নবী করীম (সা) মদীনায় আগম করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ইয়াহূদীগণ 'আশুরা'র দিনে রোযা রাখে। তিনি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন- কোন্ উপলক্ষে তোমরা এই দিনে রোযা রাখ। তাহারা বলিল- এই দিন একটি শুভ দিন। এইদিনে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে ফিরাউনের হাত হইতে মুক্তি দিয়াছেন। হযরত মূসা (আ) সেই উপলক্ষে এই দিনে রোযা রাখিতেন। নবী করীম (সা) বলিলেন- হযরত মূসা (আ)-এর সহিত যতটুকু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তোমাদের রহিয়াছে, তদপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমার রহিয়াছে। এই বলিয়া নবী করীম (সা) নিজে আশুরার রোযা রাখিলেন এবং সাহাবীদিগকে ঐদিনে রোযা রাখিতে আদেশ দিলেন।'

ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ উক্ত হাদীসকে উপরোক্ত রাবী আইউব সাখ্‌তিয়ানী হইতে অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্নরূপে অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ রক্কাশী, যায়দুল আমীয়্যা, সালাম ইব্‌ন সালীম, আবূ রবী' ও আবূ ইয়া'লা মুসেলী বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- আল্লাহ্ তা'আলা আশুরায় অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশ তারিখে বনী ইসরাঈল জাতির জন্যে সমুদ্রের পানিকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।' উক্ত হাদীস সনদের দিক দিয়া দুর্বল। কারণ, উহার অন্যতম রাবী যায়দুল আমীয়্যা একজন দুর্বল রাবী। তাঁহার উস্তাদ ইয়াযীদ রক্কাশী তদপেক্ষা অধিকতর দুর্বল রাবী।

বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা

(٥١) وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَأَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

(٥٢) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

(٥٣) وَإِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

৫১. আমি যখন মূসাকে চল্লিশ রজনীর প্রতিশ্রুতি দিলাম, অতঃপর তোমরা বাছুর পূজক হইয়াছ: ফলে আত্মপীড়ক ছিলে।

৫২. অতঃপর ইহা সত্ত্বেও আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

৫৩. তারপর আমি মূসাকে হক ও বাতিলে পার্থক্য সৃষ্টিকারী গ্রন্থ প্রদান করিয়াছি যেন তোমরা পথপ্রাপ্ত হও।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি প্রদত্ত কতগুলি নিআমতের কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। হযরত মূসা (আ) যখন আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত চল্লিশ দিন ব্যাপী মুরাকাবা তথা অনন্য সাধনা সম্পাদন করিতে যান, তখন তাহারা বাছুর-পূজায় লিপ্ত হইয়া পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন। তিনি তাহাদিগকে হিদায়েতের জন্যে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করেন। এই সকল দানই ছিল তাহাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'আলার নি'আমাত। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে হযরত মূসা (আ)-এর মুরাকাবা তথা অনন্য সাধনায় রত হইবার ঘটনা এবং তাহার উপর তাওরাত নাযিল হইবার ঘটনার উভয়ই ঘটিয়াছিল বনী ইসরাঈল সহ হযরত মূসা (আ)-এর দরিয়া পার হইবার ঘটনার পর। সূরা আ'রাফ-এর নিম্নোক্ত আয়াতেও চল্লিশ দিনব্যাপী সাধনা সম্পন্ন করিবার জন্যে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّ اَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ "আর আমি মূসার জন্যে ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলাম এবং তৎসহ দশ রাত্রিকে যুক্ত করিয়াছিলাম।"

কেহ কেহ বলেন- উক্ত চল্লিশ রাত্রি ছিল পূর্ণ যিল-কাদা মাস ও যিল-হাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন। তাওরাত নাযিল হইবার ঘটনা যে হযরত মূসা (আ)-এর নদী পার হইবার পর ঘটিয়াছিল, আ'রাফে উল্লেখিত ঘটনা পরম্পরা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও উহা প্রমাণিত হয়।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَاۤئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ -

"আর পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্বংস করিয়া দিবার পর মূসাকে কিতাব প্রদান করিয়াছিলাম। উহা ছিল লোকদের জন্যে জ্ঞানদায়ক বাক্যাবলী, হিদায়েত ও রহ্‌মাত। এই আশায় যে, তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে।'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ অর্থাৎ আমি মূসাকে নিশ্চয় সত্য-মিথ্যার পার্থক্য প্রদর্শনকারী তাওরাত কিতাব প্রদান করিয়াছিলাম। এইস্থলে الكتاب ও الفرقان উভয় শব্দের তাৎপর্য একই অর্থাৎ তাওরাত কিতাব। কেহ কেহ বলেন, الفرقان শব্দের পূর্বে অবস্থিত و বর্ণটি অতিরিক্ত। প্রকৃতপক্ষে القرقان শব্দটি পূর্ববর্তী الكتاب শব্দটির বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।' উক্ত ধারণা অগ্রহণযোগ্য। কেহ কেহ বলেন- উভয় শব্দের পদবাচ্য এক হইলেও দ্বিতীয়টি প্রথমটির সহিত সংযোজক و অব্যয় দ্বারা সংযোজিত معطوف হইয়াছে। একই পদবাচ্যের নির্দেশক একাধিক সমার্থক শব্দের একটিকে অপরটির সহিত সংযোজক অব্যয় حرف العطف দ্বারা সংযোজিত করিবার প্রক্রিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত। কবি বলেন ঃ

وقدمت الاديم لراقشيه

فالفى قولها كذبا ومينا

'আর আমি (লিখিত) পরিপক্ক পশু-চর্মকে উহার লেখকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম। সে তাহার (সেই মহিলাটির) কথাকে মিথ্যা ও অসত্য বলিয়া দেখিতে পাইল।'

كذب এবং مين শব্দদ্বয় সমার্থক শব্দ। কবি এখানে সংযোজক অব্যয় দ্বারা উহাদের একটিকে অপরটির সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। আরেক কবি বলেন ঃ

الا حبذا هند وارض بها هند

وهند اتى من دونها النأى والبعد

'শুনো! হিন্দ নামীয় মহিলাটি এবং সে যে স্থানে অবস্থান করে সেই স্থানটি কতই না ভালো। হিন্দের অনুপস্থিতির কারণে বিরহ ও বিচ্ছেদ নামিয়া আসিয়াছে।'

النأى এবং البعد উভয় সমার্থক শব্দ। কবি এইস্থলে সংযোজক অব্যয় দ্বারা ইহাদের একটিকে অপরটির সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। কবি আন্‌তারা বলেন ঃ

حييت من طلل تقادم عهده

اقوى واقفر بعد ام الهيثم

'আমি তো বসত বাটির পুরাতন ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বাঁচিয়া আছি। উম্মে- হায়ছম নামীয় মহিলার মৃত্যুর পর উহা বিরান ও জনশূন্য হইয়া রহিয়াছে।'

الاقواء এবং الاقفار শব্দদ্বয় সমার্থক শব্দ। কবি এই স্থানে সংযোজক অব্যয় দ্বারা উহার একটিকে অপরটির সহিত সংযোজিত করিয়াছেন।

(٥٤) وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوْا إِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ۚ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

৫৪. অতঃপর যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিল, হে জাতি, নিশ্চয় তোমরা গো-বৎস পূজা করিয়া আত্মপীড়ক হইয়াছে। তাই তোমরা পরস্পরকে হত্যা করার মাধ্যমে নিজ প্রভুর নিকট তওবা কর। তোমাদের প্রভুর নিকট ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণপ্রদ। অতঃপর প্রভু তোমাদের তওবা কবূল করিলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বাধিক ক্ষমাশীল ও বড়ই মেহেরবান।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির গো-বৎস পূজার প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

হযরত হাসান বসরী (র) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ বনী ইসরাঈল জাতির অন্তরে গো-বৎস পূজার প্রবণতা যখন দৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল, তখনই হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে উহা বলিয়াছিলেন।' তিনি আরো বলিয়াছেন- 'বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি হযরত মূসা (আ)-এর উপরোক্ত সতর্ক বাণী উচ্চারিত হইবার পর তাহারা স্বীয় পাপাচারের বিষয় অনুশোচনা করিয়াছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্যে আকুল আবেদন জানাইয়াছিল। নিম্নোক্ত আয়াতে তাহাদের এই তওবা ও ইস্তিগফারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَلَمَّا سُقِطَ فِيْ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْلَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ -

"আর যখন তাহারা অনুশোচিত হইল এবং বুঝিতে পারিল যে, তাহারা বিপথগামী হইয়া গিয়াছে, তখন বলিল- আমাদের প্রভু যদি আমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন না করেন এবং আমাদিগকে ক্ষমা না করেন, তবে আমরা অনিবার্যরূপে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হইব।"

আবুল আলীয়া, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও রবী' ইব্‌ন আনাস বলেন- অর্থাৎ 'তোমরা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা করো।' আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি, তোমরা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা করো- এই কথা দ্বারা বনী ইসরাঈল জাতিকে হযরত মূসা (আ) এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দান করিয়াছিলেন যে, স্বীয় সৃষ্টিকর্তাকে পরিত্যাগ করত তাঁহার সৃষ্টিকে পূজা করিয়া তোমরা জঘন্যতম পাতকে পতিত হইয়াছ। এখন উহার পূজা ত্যাগ করিয়া সেই মহাপ্রভু সৃষ্টিকর্তার দিকে ফিরিয়া আস, তাহার নিকট তওবা কর এবং তাঁহার ইবাদত করো।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জারীর, কাসিম ইব্‌ন আবূ আইউব, আসবাগ ইব্‌ন যায়দ আল আর্‌রাক ও ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন- এই অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন রূপ অধস্তন সনদাংশে ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইব্‌ন জারীর এবং ইমাম

ইব্ন আবূ হাতেম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তাহাদের তওবা এই যে, তাহারা প্রত্যেকেই স্বীয় পিতা বা পুত্র যাহাকেই পাইবে, তাহাকেই কোনরূপ দয়াপ্রদর্শন ব্যতিরেকেই হত্যা করিবে। তাহারা তাহাই করিল। তাহাদের গুনাহের খবর হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর নিকট সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হইয়া থাকিলেও যেহেতু উহা আল্লাহ্ তা'আলা যে নির্দেশ প্রদান করিলেন, তাহা তাহারা পালন করিল। আল্লাহ্ তা'আলা হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয় শ্রেণীর লোকদের গুনাহই মাফ করিয়া দিলেন।' উক্ত হাদীস ফিতনা সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীস বিশেষের একটা অংশ মাত্র। সূরা ত্বাহা-এর ব্যাখ্যায় উহা আল্লাহ্ চাহেন তো সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইবে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আবূ সাঈদ, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না, ইবরাহীম ইব্ন বাশ্শার, আবদুল করীম ইব্ন হায়ছাম ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে স্বীয় লোকদের প্রতি পরস্পরকে হত্যা করিতে নির্দেশ দিলেন। যাহারা গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের নিকট তাঁহার নির্দেশ প্রদানের সংবাদ পৌঁছিলে তাহারা একত্রে বসিয়া উক্ত নির্দেশ কার্যকর করিবার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। যাহারা গো-বৎস পূজা হইতে পবিত্র ছিল, অতঃপর তাহারা তরবারি হস্তে ধারণ করত অপরাধীদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। এই সময়ে ঘন অন্ধকার তাহাদিগকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। অন্ধকার কাটিয়া গেলে তাহারা দেখিতে পাইল, সত্তর হাজার লোক নিহত হইয়াছে। যাহারা নিহত হইল এবং যাহ্যা বাঁচিয়া রহিল তাহাদের উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তওবা মঞ্জুর হইল।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র এবং মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিক ভাবে কাসেম ইব্ন আবূ বোর্‌রা ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র এবং মুজাহিদ বলেন- আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের পর বনী ইসরাঈল জাতির লোকেরা আপন পর নির্বিশেষে তরবারি দ্বারা পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল। এক সময়ে হযরত মূসা (আ) স্বীয় বস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করত হত্যাকার্য বন্ধ করিবার জন্যে তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন। তাহারা অস্ত্র ফেলিয়া দিল। দেখা গেল সত্তর হাজার লোক নিহত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত মূসা (আ)-কে জানাইয়া দিয়াছিলেন- আর নহে, তুমি স্বীয় কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছ। এই সময়েই হযরত মূসা (আ) স্বীয় বস্ত্র দ্বারা ইশারা করত হত্যাকার্য বন্ধ করিবার জন্যে বনী ইসরাঈলদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছিলেন। হযরত আলী (রা) হইতেও অনুরূপ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

কাতাদাহ বলেন- 'বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি কঠোর নির্দেশ প্রদত্ত হইল। নির্দেশ অনুযায়ী তাহারা ছোরা দিয়া পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল। তাহাদের শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্ত আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে গৃহীত হইল। অতঃপর তাহাদের হস্ত হইতে ছোরাসমূহ ভূমিতে পতিত হইল। এইভাবে হত্যা প্রক্রিয়া বন্ধ হইল। জীবিত ব্যক্তিগণের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তওবা এবং নিহত ব্যক্তিদের জন্যে শাহাদত লিখিত হইল।'

হাসান বসরী বলেন- 'এক সূচিভেদ্য অন্ধকার বনী ইসরাঈল জাতিকে ছাইয়া ফেলিল। তাহারা পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল। এক সময়ে অন্ধকার তিরোহিত হইয়া গেল। উক্ত হত্যাক্রিয়া তাহাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তওবা হিসাবে গৃহীত হইল।'

সুদ্দী বলেন- 'আল্লাহ্র তরফ হইতে নির্দেশ আসিবার পর অপরাধী ও নিরপরাধ সকলেই তরবারি দ্বারা পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল। অপরাধী ও নিরপরাধ উভয় শ্রেণীর সকল

নিহত ব্যক্তিই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শহীদ বলিয়া পরিগণিত হইল। ইহাতে বনী ইসরাঈল জাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল। এই সময়ে হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারূন (আ) দোয়া করিলেন - হে প্রভু! বনী ইসরাঈল জাতিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছ। হে প্রভু! অবশিষ্ট লোকদিগকে তুমি বাঁচাও।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে অস্ত্র সংবরণ করিতে আদেশ দিলেন এবং তাহাদের তওবা কবূল করিলেন। অপরাধী ও নিরপরাধী উভয় শ্রেণীর লোকদের মধ্য হইতে যাহারা নিহত হইল, তাহারা শহীদ বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পরিগণিত হইল। আর যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহাদের গুনাহ মাফ হইয়া গেল।

فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ এই আয়াতাংশে তাহাদের তওবা কবূল হইবার ঘটনাই বিবৃত হইয়াছে।

যুহ্রী বলেন- 'বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি যখন পরস্পরকে হত্যা করিবার নির্দেশ আসে, তখন তাহারা হযরত মূসা (আ) সহ ময়দানে সমবেত হইয়া একে অপরকে তরবারি ও ছোরা দ্বারা হত্যা করিতে লাগিল। এই সময়ে হযরত মূসা (আ) হাত উঠাইয়া আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোয়া করিতে ছিলেন। এক সময়ে তাহাদের কেহ কেহ ঝিমাইয়া পড়িলে তাহারা হযরত মূসা (আ)-এর হস্ত ধারণ করত উহাতে ঝুলিয়া পড়িয়া অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে তাঁহাকে বলিল- হে আল্লাহর নবী! আমাদের জন্যে দোয়া করুন! তাহারা এইরূপ করিতে থাকিলে এক সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের তওবা কুবল করিলেন এবংতাহাদের পরস্পরের হাতকে পরস্পর হইতে বিরত ও অক্ষম করিয়া দিলেন। তাহারা স্বীয় হস্ত হইতে অস্ত্র ফেলিয়া দিল। এই গণহত্যা কার্যে বনী ইসরাঈল এবং হযরত মূসা (আ) বিমর্ষ ও মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট ওহী পাঠাইলেন ' হে মূসা! তুমি কেনো চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছ? ইহাদের মধ্য হইতে যাহারা নিহত হইয়াছে, তাহারা আমার নিকট জীবিত আছে। তাহারা এখানে রিযিক পাইয়া আসিতেছে। আর যাহারা জীবিত রহিয়া গিয়াছে, আমি তাহাদের তওবা কবূল করিয়াছি। ইহাতে বনী ইসরাঈল এবং হযরত মূসা (আ) আনন্দিত হইলেন।' ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি যুহরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন- 'হযরত মূসা (আ) (আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্দিষ্ট চল্লিশ দিন ব্যাপী বিশেষ সাধনা ব্রত পালন সমাপ্ত করত) বনী ইসরাঈল জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করিবার এবং বণী ইসরাঈল কর্তৃক পূজিত গো-বৎসটি পোড়াইয়া উহাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিবার পর স্বীয় জাতি হইতে মনোনীত কিছু সংখ্যক লোক সঙ্গে লইয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া পেশ করিবার এবং তাঁহার নিকট হইতে নির্দেশ লাভ করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট স্থানের দিকে রওয়ানা হইলেন। ইত্যবসরে বজ্রপাত (صاعقة) তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিল। আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় তাহাদিগকে জীবিত করিলেন। হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈল জাতির গো-বৎস পূজার কারণে আল্লাহ্র নিকট তাহাদের জন্যে ক্ষমার আবেদন জানাইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন- তাহারা পরস্পরকে হত্যা করিলে তাহাদের তওবা কবূল এবং অপরাধ মার্জনা হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনো পন্থায় তাহাদের তওবা কবূল এবং অপরাধ মার্জনা হইবে না।'

ইব্ন ইস্হাক বলেন- আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহাতে বনী ইসরাঈল জাতি হযরত মূসা (আ)-কে বলিল- 'আমরা ধৈর্য সহকারে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিব।' হযরত

মূসা (আ) আদেশ দিলেন- যাহারা গো-বৎস পূজা করে নাই, তাহারা গো-বৎসপূজকদিগকে হত্যা করিবে।' ইহাতে তাহারা উন্মুক্ত প্রান্তরে সমবেত হইল এবং লোকেরা তাহাদের গর্দানে তলোয়ার চালাইতে লাগিল। বিপুল সংখ্যক লোক নিহত হইবার কারণে হযরত মূসা (আ) বিমর্ষ ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। নারী ও শিশুগণ তাঁহার নিকট আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহারা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিল। আল্লাহ্ বনী ইসরাঈল জাতির তওবা কবূল করিলেন এবং তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিলেন। হযরত মূসা (আ) তলোয়ার চালানো বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। ফলে তলোয়ার চালানো বন্ধ হইল।'

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন- হযরত মূসা (আ) স্বীয় জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করত তাহাদিগকে গো-বৎসপূজায় লিপ্ত দেখিয়া বলিলেন, তোমরা স্বীয় প্রভুর প্রতিশ্রুতির (আযাবের) দিকে অগ্রসর হও। উল্লেখ্য যে, মাত্র সত্তর জন লোক গো-বৎস পূজা হইতে বিরত ও পবিত্র থাকিয়া হযরত হারূন (আ)-এর সঙ্গে রহিয়া গিয়াছিলেন। হযরত মূসা (আ)-এর কথায় অপরাধীগণ বলিল- হে মূসা! তওবার কি কোনো পথ নাই? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ, আছে। তোমরা একে অপরকে হত্যা করিবে। ইহাই তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। ইহাতে তিনি তোমাদের দিকে করুণা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করিবেন। তিনি নিশ্চয় তওবা কবূলকারী, কৃপাপরায়ণ। তাহারা একে অপরের উপর তরবারি ও ছোরা চালাইতে লাগিল। এই সময়ে তাহাদের উপর ঘুটঘুটে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছিল। তাহারা অন্ধকারে হাতড়াইয়া একে অপরকে ধরিয়া হত্যা করিতে লাগিল। লোকেরা অন্ধকারে নিজেদের অজ্ঞাতে স্বীয় পিতা ও স্বীয় ভ্রাতাকেও হত্যা করিতে লাগিল। তাহারা উচ্চৈস্বরে বলিতেছিল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট ধৈর্য ও আনুগত্য গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ এবং আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া যাইবে, তাহার প্রতি আল্লাহ্ কৃপা প্রদর্শন করুন! এইরূপে যাহারা জীবিত রহিল, তাহাদের তওবা কবূল হইল।' অতঃপর আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আস্লাম নিম্নোক্ত আয়াতাংশ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছেন ঃ

فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

(٥٥) وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

(٥٦) ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৫৫. আর যখন তোমরা বলিলে, 'হে মূসা! আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেখিয়া আমরা কিছুতেই ঈমান আনিব না, তখন তোমাদের উপর বজ্রপাত হইল এবং তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিতেছিলে।

৫৬. মৃত্যুর পর পুনরায় তোমাদিগকে জীবন দান করিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি প্রদত্ত তাঁহার আরেক নিআমতের কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ্

তা'আলাকে চর্ম-চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছিল। তাহারা হযরত মূসা (আ)-কে বলিয়াছিল যে, তাহারা চর্ম-চক্ষু দ্বারা আল্লাহকে না দেখিলে হযরত মূসা (আ)-এর কথা বিশ্বাস করিবে না। তাহাদের এই দাবী ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অযৌক্তিক। কারণ, চর্ম চক্ষু দ্বারা আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষ করা কাহারো পক্ষে সম্ভবপর নহে। তাহাদের অবাধ্যতা ও অযৌক্তিক দাবী জ্ঞাপনের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে মৃত্যু দিলেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ)-এর দোয়ায় তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। ইহা ছিল বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট দান।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً এই আয়াতাংশের অন্তর্গত جَهْرَةً শব্দের অর্থ হইতেছে– প্রকাশ্যভাবে, চর্ম চক্ষু দ্বারা।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল ফুআয়রিছ আব্বাস ইব্ন ইসহাক ও ইবরাহীম ইব্ন তিহ্মানও উক্ত শব্দের উপরোক্তরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ এবং রবী' ইব্ন আনাসও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

রবী' ইব্ন আনাস হইতে আবূ জা'ফর বর্ণনা করিয়াছেন যে, রবী' ইব্ন আনাস বলেন- 'হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কালাম করিবার উদ্দেশ্যে গমন করিবার কালে বনী ইসরাঈল জাতির মধ্য হইতে সত্তর জন লোককে নিজের সহিত লইবার জন্যে মনোনীত করিয়াছিলেন। তাহারা যথাসময়ে তাহার সহিত গন্তব্যস্থলে গমন করিল। এক সময়ে তাহারা একটি কালাম শুনিতে পাইল। ইহাতে তাহারা বলিল, আমরা আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষরূপে চর্ম-চক্ষু দ্বারা না দেখিলে তোমার কথা বিশ্বাস করিব না। অমনি একটি বিকট শব্দ তাহাদের কানে আসিল। উহাতেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইল।'

পবিত্র মক্কায় বক্তৃতা প্রদান করিবার কালে মারওয়ান ইব্ন হাকাম একদা বলেন ঃ فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ এই আয়াতাংশের অন্তর্গত الصاعقة শব্দের অর্থ হইতেছে আকাশ হইতে আগত ধ্বনি বা শব্দ। সুদ্দী বলেন- উহার অর্থ হইতেছে অগ্নি।

উর্ওয়া ইব্ন রোয়েম وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন- তাহাদের একাংশ মরিয়া গিয়াছিল এবং আরেকাংশ উহাদের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। অতঃপর মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পুনর্জীবিত হইয়াছিল। তৎপর দ্বিতীয়াংশ মরিয়া গিয়াছিল এবং পুনর্জীবিত প্রথমাংশ উহাদের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। এইরূপে দুই দলেরই প্রত্যেকে পালাক্রমে অপরের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় সুদ্দী বলেন- 'বনী ইসরাঈলের লোকেরা আকাশ হইতে আগত আগুনে মরিয়া যাইবার পর হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন- প্রভু হে! আমি স্বজাতির নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগকে কি বলিব? তুমি তো তাহাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছ। তিনি আরো বলিলেন ঃ

لَوْشِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَاِيَّاىَ - اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا

"তুমি চাহিলে পূর্বেই তো তাহাদিগকে এবং আমাকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারিতে। আমাদের মধ্য হইতে নির্বোধ ব্যক্তিগণ যে পাপ করিয়াছে, উহার কারণে তুমি কি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে?'

ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট এই মর্মে ওহী পাঠাইলেন যে, 'ইহারাও গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল।' অতঃপর তিনি তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। পুনর্জীবিত হইবার পর এই সকল লোক পৃথিবীতে চলাফেরা করিয়াছিল এবং জীবন-যাপন করিয়াছিল। তাহারা কিরূপে জীবিত থাকিয়া পৃথিবীতে চলাফেরা করিতেছে একে অপরকে দেখিয়া তাহা ভাবিয়া তাহারা অবাক হইত।' অতঃপর সুদ্দী ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ الخ। এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া বলেন- উহাতে তাহাদের প্রতি প্রদত্ত উপরোক্ত নিআমতের কথা আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিয়াছেন।

রবী' ইব্ন আনাস বলেন- তাহাদের মৃত্যু ছিল তাহাদের পাপের কারণে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক আরোপিত শাস্তি। উক্ত শাস্তি ভোগ করিবার পর দুনিয়াতে তাহাদের জন্যে নির্ধারিত বয়স পূর্ণ করিবার প্রয়োজনে তাহারা পুনর্জীবিত হইয়াছিল। কাতাদাহও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক হইতে ধারাবাহিকভাবে সালমা ইব্ন ফযল, মুহাম্মদ ইব্ন হামীদ ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন- 'হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈল জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করত তাহাদিগকে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত দেখিয়া, স্বীয় ভ্রাতা হযরত হারূন (আ) ও সামেরী নামীয় গো-বৎস পূজার প্ররোচক ব্যক্তিকে যাহা বলিবার তাহা বলিয়া এবং পূজিত গো-বৎসকে পোড়াইয়া দরিয়ায় নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে শীর্ষস্থানীয় সত্তর ব্যক্তিকে মনোনীত করত তাহাদিগকে বলিলেন- তোমরা আল্লাহর নিকট চল; স্বীয় অপরাধের জন্যে তাঁহার নিকট তওবা কর এবং যাহারা এই স্থানে থাকিয়া যাইতেছে, তাহাদের জন্যেও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাগফিরাত প্রার্থনা কর। তোমরা রোযা রাখ, শরীরকে পাক কর এবং কাপড়কে পবিত্র কর।' তাহারা তাঁহার আদেশ পালন করিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া সিনাই অঞ্চলের তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে এইস্থানে নির্দিষ্ট সময় ধরিয়া (চল্লিশ দিন ধরিয়া) বিশেষ ইবাদাতে লিপ্ত থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন। উক্ত আদেশ পালন করিবার নিমিত্তই তিনি সেই স্থানের দিকে রওয়ানা হইলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে আদেশ না পাইয়া তিনি উক্ত স্থানে উপস্থিত হইতেন না। উক্ত সত্তর ব্যক্তি পথিমধ্যে তাঁহাকে বলিল- হে মূসা! আমরা স্বকর্ণে স্বীয় প্রভুর কালাম শুনিতে চাই। তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমাদের ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্যে দাবী জানাইবে। হযরত মূসা (আ) বলিলেন- আমি ইহা করিব। যখন তিনি পর্বতের নিকটে পৌঁছিলেন, তখন এক খণ্ড মেঘ তাঁহার মাথার উপর আসিল। অতঃপর উহা সমগ্র পর্বতকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হযরত মূসা (আ) পর্বতের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তিনি সঙ্গীদিগকে তাহার নিকটে যাইতে বলিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত মূসা (আ)-এর সহিত কথা বলিতেন, তখন তাঁহার ললাটদেশে একটি প্রশস্ত আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্যোতি বা নূর পতিত হইত। উক্ত জ্যোতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তিনি নিজের সম্মুখে পর্দা টানিয়া দিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহার নিকটে চলিয়া গেল। তাহারা মেঘের ছায়ার তলে পৌঁছিয়া সিজদায় রত হইল। এই অবস্থায় তাহারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে কোন্ কার্য করিতে আদশে করিতেছেন, কোন্ কার্য করিতে নিষেধ করিতেছেন; বলিতেছেন- ইহা কর; উহা করিও না। কালাম শেষ হইবার পর হযরত মূসা (আ)-এর মাথার উপর হইতে মেঘ সরিয়া গেল এবং তিনি সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

তাহারা তাঁহাকে বলিল- আমরা আল্লাহকে চর্ম-চক্ষে না দেখিয়া তোমার কথায় বিশ্বাস করিব না। ইহাতে তাহাদের উপর বজ্র পতিত হইয়া তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিয়া দিল। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করিতে লাগিলেন। তিনি আরয করিলেন- প্রভু হে! আমাদের মধ্য হইতে নির্বোধ ব্যক্তিগণ যে অপরাধ করিয়াছে, তজ্জন্য তুমি কি আমার অনুগামী এই সকল শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারিতে। আমি যাহাদিগকে সংগে লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহাদের কেহই জীবিত নাই। বনী ইসরাঈল জাতির নিকট ফিরিয়া গিয়া আমি তাহাদিগকে কি উত্তর দিব? তাহারা কিসের ভিত্তিতে আমার কথা বিশ্বাস করিবে? তাহারা ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে কি আমাকে বিশ্বাস করিবে? প্রভু হে! আমরা তোমার নিকট তওবা করিতেছি।' তিনি এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি ও কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার দোয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বনী ইসরাঈল জাতির পক্ষে তাহাদের গো-বৎস পূজার অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্যে আবেদন জানাইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন- তাহারা পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিলে একমাত্র সেই অবস্থায় তাহাদের অপরাধের মার্জনা হইতে পারে।

ইসমাঈল ইব্ন আবদুর রহমান আস্ সুদ্দী বলেন- 'বনী ইসরাঈল জাতি পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিবার মাধ্যমে তাহাদের গো-বৎস পূজার মহাপাতক হইতে তওবা করিবার এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সেই তওবা কবূল করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন- তিনি যেন বনী ইসরাঈল জাতির সকল লোককে লাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। তাহারা তথায় গো-বৎস পূজা এবং হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ভীতি প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাহিবে। হযরত মূসা (আ) উক্ত নির্দেশ মুতাবিক তাহাদের মধ্যে হইতে সত্তর জন লোককে বাছিয়া নিজের সম্মুখে আনিলেন। তাহারা স্বীয় অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাহিবে এই উদ্দেশ্যে তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আল্লাহর দরবারে রওয়ানা হইলেন।' অতঃপর সুদ্দী পূর্বোক্ত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

উপরোল্লেখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, وَاِذْ قُلْتُمْ يَامُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ الـخ। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির স্বচক্ষে আল্লাহ দর্শন সম্পর্কিত অযৌক্তিক ও অসম্ভব দাবীর কথা উল্লেখ করিতেছেন। অবশ্য সমগ্র বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ্ তা'আলাকে চর্ম চক্ষে দেখিবার জন্যে দাবী জানাইয়াছিল এবং জিদ ধরিয়াছিল- উক্ত আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যা খুব কম তাফসীরকারই বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকাংশ তাফসীরকার বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতে যাহাদের উপরোক্ত অযৌক্তিক জিদ ও দাবীর কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা ছিল হযরত মূসা (আ) কর্তৃক মনোনীত ও আল্লাহর নিকট উপস্থাপিত সত্তর জন শীর্ষস্থানীয় বনী ইসরাঈল গোত্রীয় লোক।

ইমাম রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এই স্থলে একটি অদ্ভুত কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উপরোক্ত সত্তর ব্যক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'তাহারা পুনর্জীবিত হইবার পর হযরত মূসা (আ)-কে বলিল- ওহে মূসা! তুমি আল্লাহর কাছে যাহা চাও, তিনি তাহাই তো তোমার জন্য মঞ্জুর করিয়া থাকেন। তুমি দোয়া কর যেন তিনি আমাদিগকে নবী বানাইয়া দেন। হযরত মূসা (আ) তাহাই করিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দোয়া কবূল করিলেন।'

ইমাম রাযী কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত বর্ণনা মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, হযরত মূসা (আ)-এর যুগে তাঁহার ভাই হযরত হারূন (আ) এবং অতঃপর হযরত য়ূশা' ইব্ন নূন (আ) ছাড়া অন্য কেহ নবীর পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এইরূপ কথা জানা যায় না।

আহলে কিতাবগণ আরেক অদ্ভুত কথা বলিয়াছে। তাহারা বলিয়াছে- 'উক্ত সত্তর ব্যক্তি স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখিয়াছিল।' তাহাদের উক্ত দাবী একটা চরম ভ্রান্তি বৈ কিছু নহে। কারণ, স্বয়ং হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ঐরূপ আবেদন জানাইয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় সেই সত্তর জন লোক কিরূপে উহা লাভ করিতে পারে?

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যার আর একটা দিক রহিয়াছে। আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলেন- 'হযরত মূসা (আ) তাওরাত কিতাবসহ বনী ইসরাঈল কওমের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগকে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত দেখিয়া নির্দেশ দিলেন যেন তাহারা পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে। তাহারা তাহাই করিল। আল্লাহ তাহাদের তওবা কবূল করিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন- এই হইতেছে আল্লাহর কিতাব তাওরাত। উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা কতগুলি কার্য সম্পাদন করিবার জন্যে তোমাদের প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং কতগুলি কার্য হইতে বিরত থাকিবার জন্যে তোমাদিগকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।' তাহারা বলিল- তোমার কথা কে মানিবে? আমরা যতক্ষণ না স্বচক্ষে আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করিব, ততক্ষণ তোমার কথা মানিব না। তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন- ইহা আমার কিতাব, তোমরা উহাকে আঁকড়াইয়া ধর।' ওহে মূসা! আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপে তোমার সহিত কথা বলিয়া থাকেন, সেইরূপে আমাদের সহিত কথা বলেন না কেন?' উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিবার পর আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً এই আয়াতাংশ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছেন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন, তাহাদের কথায় তাহাদের উপর আল্লাহর গযব নামিয়া আসিল। বজ্রপাতে তাহাদের সকলের মৃত্যু ঘটিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন।' উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিবার পর আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন- 'অতঃপর হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে বলিলেন- তোমরা আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়াইয়া ধর। তাহারা বলিল- না; আমরা উহা মানিব না।' হযরত মূসা (আ) বলিলেন- তোমাদের কি হইল? তাহারা বলিল, আমাদের কি হইবে? আমাদের এই হইয়াছে যে, আমরা মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হইয়াছি। হযরত মূসা (আ) পুনরায় বলিলেন- তোমরা আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়াইয়া ধর। তাহারা উত্তর দিল, না; আমরা উহা মানিতে পারিব না। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা একদল ফেরেশতা পাঠাইলেন। তাহারা তাহাদের উপর পর্বত উঠাইয়া ধরিলেন।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী ইসরাঈল জাতি পুনর্জীবিত হইবার পরও তাহাদের প্রতি শরীআতের আদেশ- নিষেধ প্রযুক্ত হইয়াছিল। ফকীহ মাওয়ার্দী এই বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরস্পর বিরোধী দুইটি অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

(১) যেহেতু তাহাদের সম্মুখে আখিরাতের বিষয়সমূহ তথা অদৃশ্য বিষয় পরিষ্কার হইয়া দেখা দিয়াছে, তাই তাহাদের প্রতি শারীআতের আদেশ-নিষেধ প্রযুক্ত হইবার পক্ষে কোন যুক্তি

ছিল না। অদৃশ্য বিষয়সমূহ তাহাদের সম্মুখে সুপরিস্ফুট হইয়া দেখা দিবার পর উহা তাহাদের বিশ্বাস করার কোন সার্থকতা বা মূল্য ছিল না বিধায় তাহাদের পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থায় দীনের প্রতি অনুগত হইবার জন্যে তাহাদের প্রতি আদেশ প্রদান করা অযৌক্তিক ও অনর্থক ছিল। এইরূপ অযৌক্তিক ও অনর্থক আদেশ প্রদান আল্লাহ্ করেন নাই, করিতে পারেন না।

(২) 'যেহেতু জ্ঞান সম্পন্ন কোন ব্যক্তিই দীন ও শরীঅতের প্রযোজ্যতা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে না, পারা অযৌক্তিক। তাই তাহারাও পুনর্জীবিত হইবার পর দীন ও শারীঅত পালন করিবার জন্যে আদিষ্ট হইয়াছিল- আদিষ্ট হওয়া যুক্তিসঙ্গতও ছিল।' ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ 'উপরোক্ত দুইটি অভিমতের শেষোক্ত অভিমতই সঠিক ও সমর্থনযোগ্য। কারণ, বনী ইসরাঈলের মৃত্যুর পর তাহাদের সম্মুখে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ পরিস্ফুট হইয়া দেখা দেওয়া এইরূপ কোন ঘটনা নহে, যাহার কারণে তাহারা দীন তথা শারীঅতের বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। ইতিপূর্বে তাহারা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অলৌকিক অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তখনও তাহারা দীন ও শরীআতের বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। দীন ও শারীআত তখনও তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য ছিল এবং উহার প্রতি অনুগত হইবার ও উহাকে মানিয়া চলিবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে তখনও তাহারা আদিষ্ট ছিল।' ইমাম কুরতুবীর উপরোক্ত যুক্তির সারবত্তা স্পষ্ট। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

(৫৭) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۖ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

৫৭. 'অনন্তর আমি তোমাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া প্রদান করিয়াছিলাম এবং মান্না-সালওয়া অবতীর্ণ করিয়াছিলাম। তোমাদিগকে আমি যে পবিত্র রিযিক প্রদান করিয়াছি তাহা ভক্ষণ কর। তাহারা আমার উপর অত্যাচার করে নাই; বরং তাহারাই নিজেদের উপর অত্যাচার করিতেছিল।'

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল হইতে স্বীয় শাস্তি প্রত্যাহার করিয়া লইবার বিষয় উল্লেখ করিবার পর আলোচ্য আয়াত ও তৎপরবর্তী আয়াতসমূহে তাহাদের প্রতি প্রদত্ত বিভিন্ন নি'আমাত সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ। অর্থাৎ আমি তোমাদের মাথার উপর মেঘমালা রাখিয়া তোমাদিগকে ছায়া প্রদান করিয়াছিলাম।

غمام শব্দটি غمامة শব্দের বহুবচন। উহার অর্থ মেঘ। যেহেতু মেঘ আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাই মেঘকে غمامة (আচ্ছাদক) বলা হয়।

বনী ইসরাঈল জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা 'তীহ' মরু প্রান্তরে প্রখর রৌদ্র হইতে বাঁচাইবার জন্যে শুভ্র মেঘমালা দ্বারা ছায়া প্রদান করিয়াছিলেন। আলোচ্য আয়াতাংশে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

ইমাম নাসায়ী প্রমুখ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে গোলযোগ ও বিপদ-আপদ সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- 'অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা 'তীহ' নামক মরু প্রান্তরে মেঘমালা দ্বারা তাহাদের মাথার উপর ছায়া প্রদান করিলেন। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা), রবী' ইব্ন আনাস, আবূ মাজলায, যিহাক এবং সুদ্দী হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। হাসান বসরী এবং কাতাদাহ বলেন ঃ বনী ইসরাঈল জাতিকে প্রখর রৌদ্র হইতে বাঁচাইবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা বনভূমিতে তাহাদের মাথার উপর মেঘমালা দিয়া ছায়া প্রদান করিয়াছিলেন।' ইমাম ইব্ন জারীর বলেন, অন্য এক দল ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন- বনী ইসরাঈলের প্রতি ছায়া প্রদানকারী মেঘমালা আকাশে সাধারণত দৃশ্যমান মেঘমালা অপেক্ষা অধিকতর শীতল ও আরামদায়ক ছিল।'

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ নাজীহ্ আবূ হুযায়ফা, আবূ হাতিম, ইব্ন আবূ হাতিম আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুজাহিদ বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লেখিত মেঘমালা আকাশে দৃশ্যমান মেঘমালা ছিল না। বরং উহা ছিল সেই মেঘমালা যাহার মধ্যে থাকিয়া কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা আগমন করিবেন। পৃথিবীতে বনী ইসরাঈল জাতি ছাড়া অন্য কাহারো উপর আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত মেঘমালা দিয়া ছায়া প্রদান করেন নাই।'

আবূ হুযায়ফা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুছান্না ইব্ন ইবরাহীম, ইমাম ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম ইব্ন জারীর অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ নাজীহ, সুফিয়ান ছাওরী প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সম্ভবত বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, উক্ত মেঘমালা সাধারণত দৃশ্যমান মেঘমালা ছিল না; বরং উহা এই সকল মেঘ হইতে অধিকতর সুদৃশ্য, সুন্দর ও আরামদায়ক ছিল।' আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিক সনদে ইব্ন জুরায়জ, হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদ ও সুনায়দ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- আলাচ্য আয়াতে যে মেঘমালার বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, উহা ছিল আকাশে সাধারণত দৃশ্যমান মেঘমালা অপেক্ষা অধিকতর শীতল ও আরামদায়ক। নিম্নোক্ত আয়াতে যে মেঘমালার কথা বিবৃত হইয়াছে, উহা ছিল সেই মেঘমালা ঃ

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ -

'তাহারা কি ইহার জন্যে অপেক্ষা করিতেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এবং ফেরেশতাগণ মেঘমালার ছায়ায় পরিবৃত অবস্থায় তাহাদের নিকট আগমন করিবেন?'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আরও বলেন- উক্ত মেঘমালার মধ্যে থাকিয়াই বদরের যুদ্ধের দিন ফেরেশতাগণ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি আরো বলেন, উক্ত মেঘমালা 'তীহ' মরু প্রান্তরে বনী ইসরাঈলের সহিত ছিল।

وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى অর্থাৎ আর আমি তোমাদের উপর 'মান্না' ও সালওয়া' নাযিল করিয়াছিলাম।

المن । শব্দের ব্যাখ্যা

'মান্না' কি বস্তু? এই সম্বন্ধে তাফসীরকারগণ বিভিন্নরূপ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ المن। (আল-মান্ন) হইতেছে এক প্রকারের বস্তু, যাহা বনী ইসরাঈলের জন্যে রাত্রিতে বৃক্ষপত্রে পতিত হইত। তাহারা সকাল বেলায় উহার কাছে গিয়া যতটুকু ইচ্ছা খাইত। মুজাহিদ বলেন ঃ المن। হইতেছে ভক্ষণোপযোগী আটালো বৃক্ষ নির্যাস। ইক্‌রামা বলেন ঃ المن। হইতেছে আকাশ হইতে পতিত এক প্রকারের শিশির বিন্দুবৎ বস্তু। উহার স্বাদ ফলের গাঢ় রসের স্বাদের ন্যায়।' সুদ্দী বলেন المن। এক প্রকারের খাদ্য বা পানীয়, যাহা বনী ইসরাঈলের জন্যে আকাশ হইতে আদা গাছের পাতায় পতিত হইত। কাতাদাহ বলেন ঃ المن। হইতেছে এক প্রকারের আহার্য, বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের গৃহের ছাদের উপর তুষারের ন্যায় পতিত হইত। উহা দুগ্ধ অপেক্ষা শুভ্রতর এবং মধু অপেক্ষা মিষ্টতর ছিল। উহা ভোর বেলায় সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময় ধরিয়া আকাশ হইতে পতিত হইত। প্রত্যেক ব্যক্তি উহা হইতে মাত্র একদিনের প্রয়োজন পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারিত। তদপেক্ষা বেশী পরিমাণে গ্রহণ করিলে ইহা পঁচিয়া যাইত। তবে সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনে তাহারা দুই দিনের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণে 'মান্না' একত্রে লইতে পারিত। কারণ সপ্তাহের সপ্তম দিন ছিল তাহাদের ঈদের দিন। সেই দিন তাহারা জীবিকা উপার্জন করিবার জন্যে বাহিরে যাইতে পারিত না।

বনী ইসরাঈলের জন্যে উপরোক্ত 'মান্না' নাযিল হইত তীহ প্রান্তরে। রবী' ইব্‌ন আনাস বলেন- 'মান্না' হইতেছে মধুর ন্যায় এক প্রকারের পানীয় যাহা বনী ইসরাঈলের জন্যে তাহাদের উপর নাযিল হইত। তাহারা উহাকে পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিত। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ বলেন, 'মান্না' হইতেছে পাতলা রুটির ন্যায় এক প্রকারের স্বচ্ছ আহার্য। আমের শা'বী হইতে ধারাবাহিকভাবে জাবির, ইসরাঈল, আবূ আহমদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ও ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, শা'বী বলেন- মধু হইতেছে সত্তর প্রকারের; 'মান্না'-এর মধ্য হইতে এক প্রকার। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম বলেন- 'মান্না' হইতেছে মধু। কবি উমাইয়া ইব্‌ন আবুস্ সল্‌ত-এর কবিতায় উহার উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি বলেন ঃ

فرأى اللّه انهم بمضيع
لابذى مزرع ولا مثمورا
فسناها عليهم غاديات
ويرى مزنهم خلايا وخورا
عسلا ناطفا وماء فراتا
وحليبا ذابهجة مزمورا

'আল্লাহ্ তা'আলা দেখিলেন, তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবার মতো একস্থানে অবস্থান করিতেছে। সে স্থানে না আছে খাইবার মতো কোন শস্য আর না আছে কোন ফল। তাই তিনি

উহা (মান্না) নাযিল করিলেন। উহা ভোরবেলায় তাহাদের নিকট আসিত। তাহাদের নিকট আগত মেঘ প্রকৃতপক্ষে মধুর চাক ছিল। উহা ছিল প্রবহমান মধু, সুমিষ্ট পানি এবং মশক ভরিয়া লইবার মতো সদ্য-দুহিত দুগ্ধ।'

মোটকথা এই যে, তাফসীরকারগণ উক্ত শব্দের পরস্পর কাছাকাছি ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কেহ কেহ উহাকে পানীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাহ্যত বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে বিনা পরিশ্রমের দান হিসাবে যে খাদ্য বা পানীয় অথবা অন্য কোন নি'আমাত দান করিয়াছিলেন, উহাই হইতেছে المن। (আল মান্ন)। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী। المن। শব্দের যে ব্যাখ্যা তাফসীরকারগণের নিকট অধিকতম পরিচিত, তদনুযায়ী উহাকে পানির সহিত মিশ্রিত না করিয়া অবিমিশ্র অবস্থায় খাইলে উহাকে সুমিষ্ট খাদ্য বা আহার্য বলা যায়। পক্ষান্তরে, উহাকে পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উহাকে মিষ্ট পানীয় বলা যায়। তবে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা المن। শব্দ দ্বারা শুধু উপরোক্ত বিশেষ শ্রেণীর খাদ্য তথা পানীয়কে বুঝান নাই। উহা দ্বারা বরং المن। এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য ও পানীয়কে বুঝাইয়াছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য ও পানীয় যে المن। -এর অন্তর্ভুক্ত, নিম্নে বর্ণিত হাদীস দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়।

হযরত সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল মালিক ইবনে উমায়র ইব্ন হুয়াইরিছ, সুফিয়ান, আবূ নাঈম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন- নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ব্যাঙের ছাতাও এক প্রকারের মান্না। উহার নির্যাস চক্ষু রোগের পক্ষে হিতকর।'

ইমাম আহ্মদ উপরোক্ত হাদীসকে অন্যতম রাবী আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র হইতে অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং তাঁহার নিকট হইতে সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। একমাত্র ইমাম আবূ দাউদ ভিন্ন সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলক উহাকে উপরোক্ত রাবী আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র হইতে অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহাকে সহীহ্ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম উহাকে 'আমর ইব্ন হুয়াইরিছ হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান উরনী, হাকাম প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিমাহ্, মুহাম্মদ ইব্ন আমর, সাঈদ ইব্ন আমের, আবূ উবাদাহ ইব্ন আবূ সাকার, মাহমুদ ইব্ন গায়লান ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ খেজুর ফল জান্নাতের ফল। উহাতে বিষনাশক ক্ষমতা রহিয়াছে। আর ব্যাঙের ছাতা এক প্রকারের মান্না। উহার নির্যাস চক্ষু রোগে হিতকর।

ইমাম তিরমিযী ভিন্ন অন্য কোন মুহাদ্দিস উপরোক্ত হাদীসকে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন নাই। তিনি উক্ত হাদীস সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন- 'উক্ত হাদীস মাত্র একটি মাধ্যমে বর্ণিত; তবে উহা গ্রহণযোগ্য। উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর হইতে সাঈদ ইব্ন আমেরের মাধ্যমে ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। তবে হযরত সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা), হযরত আবূ সাঈদ (রা), হযরত জাবির (রা) হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব, কাতাদাহ্, তাল্‌হা ইব্‌ন আবদুর রহমান, কাসিম ইব্‌ন ঈসা, আস্‌লাম ইব্‌ন সাহ্‌ল ও আহমদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আহমদ বসরীর উদ্ধৃতি দিয়া হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়্যা স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন— ব্যাঙের ছাতা এক প্রকারের 'মান্না'। উহার রস চোখের রোগের পক্ষে উপকারী।

উপরোক্ত হাদীস একটি মাত্র সনদে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত সনদের অন্যতম রাবী তাল্‌হা ইব্‌ন আবদুর রহমান হইতেছেন তালহা ইব্‌ন আবদুর রহমান সালমী ওয়সেতী। তাঁহার আরেক নাম আবূ মুহাম্মদ। কেহ কেহ বলেন, উক্ত তালহা ইব্‌ন আবদুর রহমান হইতেছেন আবূ সুলায়মান আল মুআদ্দাব। হাফিজ আবূ আহ্‌মদ ইব্‌ন আদী তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন- 'তালহা ইব্‌ন আবদুর রহমান কাতাদাহ হইতে অসমর্থিত অনেক কথা বর্ণনা করিয়াছেন।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্‌ন হাওশাব, ইব্‌ন হিশাম, মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশার ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা কিছু সংখ্যক সাহাবী বলিলেন, ব্যাঙের ছাতা হইতেছে মৃত্তিকার বসন্ত রোগ। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন, 'ব্যাঙের ছাতা এক প্রকারের মান্না। উহার রস চক্ষের পক্ষে হিতকর। আর, খেজুর জান্নাতের ফল। উহা বিষদোষ নাশক।'

ইমাম নাসাঈ উক্ত হাদীসকে উপরোক্ত রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশার হইতে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তিনি উহাকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্‌ন হাওশাব, আবূ বিশ্‌র জা'ফর ইব্‌ন আয়াস, শু'বা, গুনদর, ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশারের সনদেও বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্‌ন হাওশাব, খালিদ হায্‌যা, আবদুল আ'লা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশারের সনদে উহার শুধু ব্যাঙের ছাতা সম্পর্কিত অংশকে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ উহার শুধু খেজুর সম্পর্কিত অংশ এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ উহার ব্যাঙের ছাতা সম্পর্কিত ও খেজুর সম্পর্কিত উভয় অংশই হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্‌ন হাওশাব, মাতার আল ওয়াররাক, আবূ আবদিস সামাদ ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুস সামাদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশার প্রমুখের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে শাহর ইব্‌ন হাওশাব যেহেতু হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে হাদীস শুনিবার সুযোগ পান নাই, তাই তৎকর্তৃক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়েতের সনদ বিচ্ছিন্ন (منقطع)। নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ লাভ ঘটে নাই।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন গানাম, শাহর ইব্‌ন হাওশাব, কাতাদাহ্, সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা, আবদুল আ'লা, আলী ইব্‌ন হুসায়ন দিরহামী ও ইমাম নাসাঈ স্বীয় 'সুনান' সংকলনের ওয়ালীমাহ (বিবাহোত্তর ভোজ) পর্বে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) একদল সাহাবীর নিকট আগমন করিয়া তাহাদের একজনকে এই বলিতে শুনিলেন, ব্যাঙের ছাতা হইতেছে মৃত্তিকার বসন্ত রোগ। ইহাতে তিনি বলিলেন, 'ব্যাঙের ছাতা এক প্রকারের মান্না। উহার রস চোখের পক্ষে উপকারী।'

উক্ত বর্ণনায় দেখা যাইতেছে যে, শাহ্‌র ইব্‌ন হাওশাব উপরোক্ত হাদীস সরাসরি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা না করিয়া রাবী আবদুর রহমান ইব্‌ন গানাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরোক্ত হাদীস হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত জাবির (রা) হইতেও শাহর ইব্ন হাওশাব বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) এবং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্ন হাওশাব, জা'ফর ইব্ন আয়াস, আ'মাশ আস্‌বাত ইব্ন মুহাম্মদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'ছত্রাক উদ্ভিদ হইতেছে এক শ্রেণীর মান্না। উহার নির্যাস চক্ষু রোগের নিরাময়ক। আর খেজুর হইতেছে জান্নাতের ফল। উহা বিষদোষ নাশক।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্ন হাওশাব, আবূ বাশার জা'ফর ইব্ন আয়াস, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর, মুহাম্মদ ইব্ন বিশার ও ইমাম নাসাঈ স্বীয় 'সুনান' সংকলনের ওয়ালীমা পর্বে আরো বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ছত্রাক উদ্ভিদ হইতেছে এক শ্রেণীর মান্না। উহার নির্যাস চোখের রোগ উপশমক।'

ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ আবার উহাকে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর (ইব্ন হাওশাব), আবূ বাশার ও আ'মাশের অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ইমাম নাসাঈ এবং ইব্ন আয়াস ও আ'মাশের অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আ'মাশ হইতে ইমাম নাসাঈ জারীর প্রমুখের মাধ্যমে এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ আ'মাশ হইতে সাঈদ ইব্ন আবূ সালিমা প্রমুখের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ আবার উহাকে হযরত জাবির (রা) হইতে উপরোক্ত মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা উহাকে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নুয্‌রা, জা'ফর ইব্ন আয়াস, আ'মাশ, আম্মার ইব্ন রযীক, লাহিক ইব্ন ছওয়াব, আব্বাস দাওরী ও আহমদ ইব্ন উছমানের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, মিনহাল ইব্ন আমর, আ'মাশ আবুল আওয়াছ, হাসান ইব্ন রবী' আব্বাস দাওরী, আহমদ ইব্ন উসমান ও ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) কয়েকটি ছত্রাক উদ্ভিদ হাতে লইয়া আমাদের নিকট আগমন করত বলিলেন- ব্যাঙের ছাতা হইতেছে এক শ্রেণীর মান্না। উহার নির্যাস চক্ষুর পক্ষে হিতকর।

ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত হাদীসকে উপরোক্ত রাবী হাসান ইব্ন রবী' হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং হাসান ইব্ন রবী' হইতে আমর ইব্ন মানসূরের পরবর্তী অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা উহাকে উপরোক্ত রাবী আ'মাশ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আ'মাশ হইত ধারাবাহিকভাবে শায়বান, উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা, হাসান ইব্ন সালাম ও আবদুল্লাহ ইব্ন ইসহাকের অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। সেইরূপে ইমাম নাসাঈও উহাকে উপরোক্ত রাবী উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা হইতে আহমদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীমের অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরোক্ত হাদীস হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শুআয়ব ইব্ন হাবহাব, হাম্মাদ, জুয়ায়রাহ ইব্ন আশরাস, হামদূন ইব্ন আহমদ, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম ইব্ন

মারদুবিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা সাহাবায়ে কিরাম কুরআন মজীদে উল্লেখিত ছিন্নমূল বৃক্ষ (شَجَرَةٌ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ) সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবী বলিলেন- সম্ভবত কুরআন মজীদে উক্ত ছিন্নমূল গাছটি ছত্রাক গাছ (الكمأة) হইবে। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন— ছত্রাক গাছ হইতেছে এক শ্রেণীর মান্না। উহার নির্যাস চোখের পক্ষে উপকারী। আর খেজুর হইতেছে জান্নাতের ফল। উহা বিষেদোষ নাশক।

উপরোক্ত হাদীসের সবটুকু উপরোক্ত রাবী হাম্মাদ ইব্ন সালামার মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। তবে ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ তাঁহারই মাধ্যমে উহার অংশ বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

উপরোক্ত হাদীস হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ও শাহর ইব্ন হাওশাব বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল জলীল ইব্ন আতিয়্যা, আবূ উবায়দা, হাদ্দাদ, আবদুল্লাহ ইব্ন আওন আল খাররায, আবূ বকর আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন সাঈদ ও ইমাম নাসাঈ স্বীয় সুনান-এর ওয়ালীমা পর্বে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- ব্যাঙের ছাতা হইতেছে এক শ্রেণীর মান্না। উহার রস চোখের পক্ষে উপকারী।

উপরোল্লিখিত কয়েকটি রিওয়ায়েতের সনদ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাবী শাহর ইব্ন হাওশাব সরাসরি কোন কোন সাহাবী হইতে আলোচ্য হাদীসকে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার উহাদের একটি সনদ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শাহ্র ইব্ন হাওশাব সরাসরি সাহাবীর নিকট হইতে নহে, বরং অপর এক রাবীর মাধ্যমে সাহাবী হইতে আলোচ্য হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আমার (ইব্ন কাছীরের) অভিমত এই যে, শাহ্র ইব্ন হাওশাব সম্ভবত একই হাদীসকে কখনো সরাসরি সাহাবীর মুখে শুনিয়া এবং কখনো অপরের মুখে শুনিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাই, তাঁহার উভয়রূপ বর্ণনাই সহীহ ও সঠিক। আমার এইরূপ ব্যাখ্যা দিবার কারণ এই যে, শাহ্র ইব্ন হাওশাব একজন সত্যবাদী রাবী। তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট সনদসমূহ উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যাহা হউক, ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছে যে, মূল হাদীসটি সাহাবী হযরত সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) হইতে তর্কাতীতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

السلوى (আস্‌সাল্‌ওয়া) শব্দের ব্যাখ্যা

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তাল্‌হা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ السَّلْوٰى হইতেছে ভরত পক্ষীর (চড়ুই) ন্যায় এক প্রকারের পক্ষী। বনী ইসরাঈল জাতি উহার গোশ্‌ত ভক্ষণ করিত। আবূ মালিক ও আবূ সালিহ্‌র মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও মুর্‌রার সূত্রে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) এবং একদল সাহাবী হইতে সুদ্দী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'সাল্‌ওয়া' হইতেছে ভরত পক্ষীর ন্যায় এক প্রকারের পক্ষী। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জাহ্‌যাম, কুর্‌রা ইব্ন খালিদ, আবদুস সামাদ ইব্ন আবদুল ওয়ারেছ, হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাবাহ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ السلوى হইতেছে السمانى অর্থাৎ ভরত পক্ষী (Quail)। মুজাহিদ, শা'বী, যিহাক, হাসান বসরী, ইক্‌রামা এবং রবী' ইব্ন আনাসও উহার উপরোক্ত রূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। ইক্‌রামা হইতে বর্ণিত

রহিয়াছে; 'সাল্ওয়া' হইতেছে জান্নাতের এক প্রকারের পাখীর ন্যায় পাখী। আকারে উহা চড়ুই পাখী অপেক্ষা কিঞ্চিত বৃহত্তর অথবা উহার সমতুল্য হইবে। কাতাদাহ্ বলেন- আস্সালওয়া হইতেছে রক্তিমাভ এক প্রকারের পাখী। দক্ষিণা বাতাস উহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া বনী ইসরাঈল জাতির নিকট একত্রিত করিত। তাহাদের প্রত্যেকে মাত্র একদিনের প্রয়োজন মিটাইতে পারে, এইরূপ সংখ্যক পাখী প্রতিদিন যবেহ করিয়া রাখিতে পারিত। অতিরিক্ত রাখিলে উহা নষ্ট লইয়া যাইত। তবে, সপ্তাহের সপ্তম দিন তাহাদের ঈদের দিন তথা ইবাদতের দিন হওয়ায় যেহেতু তাহারা জীবিকা উপার্জন করিবার কাজে কোথাও যাইতে পারিত না, তাই ষষ্ঠ দিনে তাহারা ষষ্ঠ সপ্তম এই দুই দিনের জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাখী ধরিয়া যবেহ করিয়া রাখিত। ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন- সাল্ওয়া হইতেছে কবুতরের ন্যায় হৃষ্ট-পুষ্ট ও মোটাসোটা এক প্রকারের পাখী। উহা তাহাদের নিকট জড়ো হইত। তাহারা প্রতিবার উহা হইতে এক সপ্তাহের জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাখী ধরিয়া রাখিত।' ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ হইতে আরো বর্ণিত রহিয়াছে ঃ

'বনী ইসরাঈল জাতি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট নিজেদের জন্যে গোশ্ত চাহিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন- আমি তাহাদিগকে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম পক্ষীর গোশ্ত ভক্ষণ করাইব। তিনি তাহাদের নিকট বায়ু প্রেরণ করিলেন। ইহা সাল্ওয়া নামক এক প্রকারের পক্ষীকে তাহাদের বাসস্থানের নিকট একত্রিত করিল। السلوى। হইতেছে السمانى। অর্থাৎ ভরত পক্ষী। উক্ত পক্ষী এক বর্গমাইল পরিমিত স্থান জুড়িয়া থাকিত। উহাদের ঘনত্ব ও গভীরতা ছিল মাটি হইতে উপরের দিকে বল্লম নিক্ষেপ করিলে উহা যতদূর যায়, ততদূর পর্যন্ত। তাহারা উহা গোপনে পরবর্তী দিনের জন্যেও ধরিয়া রাখিত। ইহাতে তাহাদের রুটি ও গোশ্ত উভয়ই পঁচিয়া যাইত।'

সুদ্দী বলেন ঃ বনী ইসরাঈল জাতি তীহ মরু প্রান্তরে পৌঁছিয়া হযরত মূসা (আ)-কে বলিল— এই স্থানে খাদ্য কোথায়? এখানে আমরা জীবনধারণ করিব কিরূপে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য মান্না অবতীর্ণ করিলেন। উহা আকাশ হইতে আদা গাছের পাতায় পতিত হইত। তিনি তাহাদের উপর সালওয়াও অবতীর্ণ করিলেন। উহা দেখিতে ভরত পক্ষীর ন্যায় এক প্রকারের পক্ষী। তবে, আকারে ভরত পক্ষী অপেক্ষা কিঞ্চিত বড় হইয়া থাকে। উক্ত পক্ষী বনী ইসরাঈলের বাসস্থানের নিকট একত্রিত হইত। তাহারা উহাদের মধ্য হইতে হৃষ্ট-পুষ্ট ও মোটা-মোটা পক্ষীগুলি যবেহ করিত এবং অপুষ্ট ও গোশ্তবিহীন পক্ষীগুরিকে ছাড়িয়া দিত। উহারা হৃষ্ট-পুষ্ট হইবার পর আবার তাহাদের নিকট আসিত। পুনরায় তাহারা বলিল, ইহাতো হইতেছে খাদ্য। পানীয় কোথায়? ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে স্বীয় লাঠি দ্বারা প্রস্তরে আঘাত করিতে আদেশ করিলেন। তিনি তাহাই করিলেন। ফলে উহা হইতে বারোটি ঝরনা প্রবাহিত হইতে লাগিল। বনী ইসরাঈল জাতির বারোটি শাখার লোকেরা পৃথকভাবে উপরোক্ত বারোটি ঝরনার পানি পান করিতে লাগিল। পুনরায় তাহারা বলিল— এই তো হইল পানীয়। এখন ছায়া কোথায়? ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মাথার উপর মেঘ-পুঞ্জ রাখিয়া তাহাদিগকে ছায়া প্রদান করিলেন। অতঃপর তাহারা বলিল— এই তো হইল ছায়া। এখন পরিধেয় বস্ত্র কোথায়? ইহাতে এমন এক পোষাক পাইল, শিশুরা যেরূপ ক্রমান্বয়ে বাড়িতে থাকে, তাহাদের সেই পোষাক সেইরূপে তাহাদের দেহ-বৃদ্ধির সহিত তাল মিলাইয়া ক্রমান্বয়ে বাড়িতে থাকিত। পক্ষান্তরে তাহাদের কোন পোষাকই পুরাতন হইত না বা ছিঁড়িয়া

যাইত না। নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে বনী ইসরাঈল জাতির সহিত সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে ঃ

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى الخ

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ الخ

ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ এবং আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম হইতেও সুদ্দী কর্তৃক উপরোক্ত বর্ণনার ন্যায় বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ, হাজ্জাজ ও সানীদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ বনী ইসরাঈল জাতির জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা 'তীহ' মরু প্রান্তরে এক প্রকারের বস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উহা না পুরাতন হইত আর না ময়লা হইত। ইব্ন জুরায়জ বলেন- 'তাহাদের কেহ একদিনের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে মান্না ও সালওয়া সংগ্রহ করিলে উহা পঁচিয়া যাইত। তবে জুমআর দিনে তাহার দুই দিনের মান্না ও সালওয়া সংগ্রহ করিতে পারিত। উক্ত দুই দিনের জন্যে একত্রে সংরক্ষিত খাদ্য-সম্ভার বিনষ্ট হইত না।'

ইব্ন আতিয়্যাহ বলেন- 'তাফসীরকারগণের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, সালওয়া এক শ্রেণীর পক্ষী। কবি হাযালী ভুলক্রমে উহাকে মধু মনে করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

وقاسمها بالله جهدا لانتم

الذمن السلوى اذا ما اشورها

'আর সে তাহাকে (সেই স্ত্রীলোকটিকে) দৃঢ়তার সহিত আল্লাহ্র কসম দিয়া বলিল- আমি যখন মৌচাক হইতে সালওয়া (মধু) আহরণ করি, তখন উহা যত সুস্বাদু থাকে, তোমরা নিশ্চয় তদপেক্ষা অধিকতর সুস্বাদু।'

উক্ত চরণদ্বয়ে দেখা যাইতেছে, কবি মধুকে 'সালওয়া' শব্দের সমার্থক মনে করিয়াছেন।'

ইমাম কুরতুবী বলেন- সর্বসম্মতরূপে সালওয়া শব্দের অর্থ হইতেছে পক্ষী, এই কথা ঠিক নহে। কারণ, বিশিষ্ট তাফসীরকার ও ভাষাবিদ মূআর্‌রিজ বলিয়াছেন-'সালওয়া' অর্থ হইতেছে 'মধু'। স্বীয় দাবীর সমর্থনে তিনি কবি হাযালীর উপরোক্ত কবিতার চরণদ্বয় উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন- সালওয়া শব্দটি কেনান অঞ্চলের ভাষায় মধু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ, সালওয়া শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে শান্তিদায়ক বস্তু। মধু যেহেতু একটি শান্তিদায়ক বস্তু, তাই উহাকে সালওয়া বলা হইয়া থাকে। যেমন বলা হইয়া থাকে। عين سلوان তৃপ্তিদায়ক ঝরনা। জাওহারী বলেন- السلوى। শব্দের অর্থ হইতেছে 'মধু'। তিনিও স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে কবি হাযালীর উপরোক্ত চরণদ্বয় উল্লেখ করিয়াছেন। السلوانة। অর্থ মুক্তার দানা। মধুর সহিত বৃষ্টির পানি মিশ্রিত করত প্রেমিক ব্যক্তি উহা পান করিলে আরবগণ বলিত سلا অর্থাৎ সে পানি মিশ্রিত মধু পান করিয়াছে।

কবি বলেন ঃ

شربت على سلوانه ماء مزنة

فلا وجد يد العيش يأمى ما اسلو

'আমি মধুর সহিত বৃষ্টির পানি মিশ্রিত করত উহা পান করিয়াছি। আমি যাহা পান করি, উহার আনন্দ নিশ্চয় যে কোন সুখময় জীবনের আনন্দকে হার মানাইয়া দেয়।'

বৃষ্টির পানি মিশ্রিত মধুকে আরবগণ السلوان নামে অভিহিত করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, السلوان হইতেছে হৃদরোগে ব্যবহার্য পানীয় ঔষধ বিশেষ। হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি উহা সেবন করিয়া আরোগ্য পাইয়া থাকে। চিকিৎসকগণ উহাকে مفرّح অর্থাৎ হৃদরোগের উপশমক নাম দিয়া থাকেন।'

একদল ভাষাবিদ বলেন ঃ السمانى শব্দটি যেরূপে একবচন ও বহুবচন উভয়রূপেই ব্যবহৃত হয় السلوى শব্দটি সেইরূপে একবচন ও বহুবচন উভয়রূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে ويليا শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়রূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ খলীল বলেন السلويا শব্দটির একবচন হইতেছে السلواة। স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে তিনি নিম্নোক্ত চরণদ্বয় উপস্থাপন করিয়াছেন ঃ

وانى لتعرونى لذكراك هزة

كما انتفض السلواة من بلل القطر

'মধুর সহিত বৃষ্টির পানি মিশ্রিত করিলে উহা যেরূপে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তোমার কথা মনে পড়িলে আমার মনে নিশ্চয় সেইরূপে আনন্দের শিহরণ জাগিয়া উঠে।'

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ কাসাঈ বলেন- السلوى শব্দটি হইতে একবচন; উহার বহুবচন হইতেছে السلاوى। উপরোক্ত উক্তিসমূহ ইমাম কুরতুবী কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে।

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ আয়াতাংশে পবিত্র রিযিক খাইবার আদেশ বাধ্যতামূলক আদেশ নহে; বরং উহা অনুমতিসূচক আদেশ। উক্ত আদেশ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে তাহার নি'আমাত্‌সমূহ ভোগ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে আমার দেওয়া নি'আমাতকে ভোগ করিতে এবং আমার ইবাদাত করিতে আদশে করিয়াছিলাম; কিন্তু, তাহারা উহা পালন না করিয়া আমার প্রতি অবাধ্যতা দেখাইয়াছিল। তাহারা আমার ইবাদত ত্যাগ করত কু-প্রবৃত্তি ও শয়তানের ইবাদতে লিপ্ত হইয়াছিল। তাহারা উক্ত অবাধ্যতা দ্বারা আমার উপর কোন অত্যাচার করে নাই; বরং উহা দ্বারা তাহারা নিজেদের উপরই অত্যাচার করিয়াছিল। তাহাদের উক্ত অবাধ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহাদের সম্মুখে আমার অলৌকিক নিদর্শনাবলী সুপরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইবার পর।

বনী ইসরাঈল জাতির পৌনঃপুনিক অবাধ্যতা এবং স্বীয় নবীর নিকট আবদারের পর আবদার তুলিয়া তাহাকে জ্বালাতন ও উত্যক্ত করিবার ঘটনা উপরে বর্ণিত হইল। উক্ত ঘটনার পাশাপাশি সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা (সা)-এর সাহাবীদের ঘটনা ও আচরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বিদেশ ভ্রমণে ও গৃহাবস্থানে সব অবস্থায় কত কষ্টই না ভোগ করিয়াছেন। তাবূকের যুদ্ধে দুর্বিষহ প্রখর রৌদ্রে তাঁহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। শুধু কি তাবূকের যুদ্ধে তাঁহাদের উপর অকথ্য ও অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট নামিয়া

আসিয়াছে? এইরূপ দুঃসহ অবস্থা ইসলামের প্রতিটি যুদ্ধেই দেখা দিয়াছে। কিন্তু, তদবস্থায় সাহাবীগণ কি করিয়াছেন? তাঁহারা নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে কোনরূপ বায়না বা আবদার তুলেন নাই। সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা এবং সকল মুসীবাত তাঁহারা হাসি মুখে নির্দ্বিধায় বরণ করিয়াছেন। অন্য যে কোন নবীর পক্ষে তাঁহার উম্মতের আবদার পূরণ করা যতটুকু সহজ ছিল, নবী করীম (সা)-এর পক্ষে সাহাবীদের আবদার পূরণ করা তদপেক্ষা অধিকতর সহজ ছিল। একবার সাহাবীগণ ক্ষুধায় অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে থাকিবার পর খাদ্য বৃষ্টির জন্যে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে সবিনয়ে আবেদন জানাইলেন। নবী করীম (সা) সকলকে স্ব স্ব খাদ্য আনিয়া একস্থানে একত্রিত করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা তাহাই করিলেন। দেখা গেল, এক ডেগচী বকরীর ঝলসানো গোশত একত্রিত হইয়াছে। নবী করীম (সা) প্রত্যেক সাহাবীকে উহা দ্বারা নিজের পাত্র পূর্ণ করিয়া লইতে আদেশ করিলেন। সাহাবীগণ তাহাই করিলেন। কাহারো পাত্র অপূর্ণ রহিল না। তেমনি আরেকবার পানির অভাবে সাহাবীগণ ভয়াবহ কষ্টে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মিনতি সহকারে পানির জন্যে আবেদন জানাইলেন। তাঁহাদের মাথার উপর একখণ্ড মেঘ আগমন করত বৃষ্টি বর্ষণ করিল। তাঁহারা নিজেরা পান করিলেন, পশুদিগকে পান করাইলেন এবং মশকগুলি পানিতে পূর্ণ করিয়া লইলেন। এই ছিল সাহাবীগণের আনুগত্যের নমুনা। উহার মধ্যে আমরা অন্যান্য সকল উম্মতের উপর উম্মতে মুহাম্মদিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের একটি কারণ খুঁজিয়া পাইতে পারি। উপরোক্ত ঘটনাদ্বয় হইতেছে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্যের জ্বলন্ত নিদর্শন।

(৫৮) وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝

(৫৯) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

৫৮. অনন্তর আমি যখন বলিলাম, 'এই পল্লীতে প্রবেশ কর। অতঃপর উহার যেখান হইতে যাহা ইচ্ছা মুক্তভাবে খাও। আর সিজদাবনত হইয়া উহার দরজা দিয়া প্রবেশ কর ও বল, ক্ষমাই কাম্য। আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব, আর শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞ বান্দাগণকে বাড়াইয়া দিব।'

৫৯. তারপর জালিমগণ আদিষ্ট কথাটি পরিবর্তন করিল। ফলে আমি জালিমদের উপর ঊর্ধ্বলোক হইতে শাস্তি অবতীর্ণ করিলাম। কারণ, তাহারা পাপকার্য করিতেছিল।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে পূর্ব-পুরুষদের নাফরমানীর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ভর্ৎসনা করিতেছেন ঃ

হযরত মূসা (আ)-এর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈলগণ মিশর ত্যাগ করিয়া তাহাদের পৈত্রিক ভূখণ্ডে ফিরিয়া আসার পথে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে আদেশ করিলেন কাফির

আমালিকাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পিতৃভূমি উদ্ধার করার জন্যে। তাহারা উহা অস্বীকার করিল। শত্রুর মোকাবেলা করিতে তাহারা সাহসী হইল না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে 'তীহ' প্রান্তরে কষ্টকর জীবন যাপনের জন্য রাখিয়া দিলেন। উহা ছিল তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। সূরা মায়িদায় উক্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

সুদ্দী, রবী' ইব্‌ন আনাস, কাতাদাহ, আবূ মুসলিম ইস্পাহানী প্রমুখ বিশিষ্ট তাফসীরকারগণ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে যেই জনপদটিতে প্রবেশের নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা ছিল জেরুজালেম। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র হযরত মূসা (আ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন ঃ

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَاتَرْتَدُّوْا ...... الى اخر الايت -

'হে আমার জাতি! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যে পবিত্র জনপদ নির্ধারণ করিয়াছেন উহাতে প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করিও না.. ইত্যাদি।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন- আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত জনপদটি হইতেছে اريحاء। (উরায়হা)। এই ব্যাখ্যা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দের বলিয়া কথিত। সে যাহাই হউক, উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। বনী ইসরাঈলগণ পিতৃভূমি জেরুজালেমে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে মিশর ত্যাগ করেন, উরায়হার উদ্দেশ্যে নহে। এমনকি উহা তাহাদের পথেও পড়ে না।

কেহ কেহ বললেন- উক্ত জনপদ হইতেছে মিশর। ইমাম রাযী তাঁহার তাফসীরে অনুরূপ মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। এই ব্যাপারে প্রথম কথাটিই শুদ্ধ ও সঠিক।

বনী ইসরাঈল জাতি চল্লিশ বৎসর তীহ প্রান্তরে যাযাবর জীবন যাপন করে। অতঃপর হযরত 'য়ূশা' ইব্‌ন নূন (আ)-এর নেতৃত্বে যখন তাহারা পিতৃভূমি জয়ের জন্য অগ্রসর হইল এবং আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে জুমআর দিনে শত্রুর হাত হইতে উহা উদ্ধার করিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যোদয়কে কিছুটা বিলম্বিত করিয়া দিলেন। বিজয় শেষে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, তাহারা যেন তীহ প্রান্তর হইতে মুক্তিলাভ ও পিতৃভূমি উদ্ধারের সৌভাগ্য লাভের জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে সিজদাবনত অবস্থায় শহরের দ্বার অতিক্রম করে।

وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ উহার অর্থ হইতেছে– 'আর তোমরা রুকূ'রত অবস্থায় নগরদ্বার অতিক্রম করিও।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মিনহাল ইব্‌ন আমর, আ'মাশ, সুফিয়ান, আবূ আহমদ জুবায়রী, মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশার ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا আয়াতাংশের অন্তর্গত سُجَّدًا শব্দের অর্থ হইতেছে- আর তোমরা রকূ'রত অবস্থায় অনুচ্চ নগর-দ্বারটি অতিক্রম করিও।'

হাকিমও বর্ণনাটি সুফিয়ান ছাওরী হইতে উর্ধ্বতন অভিন্ন সনদাংশে ও ভিন্ন অধস্তন সনদাংশে স্বীয় মুসনাদে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অনুরূপ সনদে ইব্‌ন আবূ হাতিমও উহা বর্ণনা

করিয়াছেন। তবে তাঁহার বর্ণনাটিতে কিন্তু তাহারা সম্মুখ দিকে পিঠ ফিরাইয়া দ্বার অতিক্রম করিল, এতটুকু সংযোজিত হইয়াছে।

হাসান বসরী বলেন- আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলগণকে মাটিতে মুখমণ্ডল লাগাইয়া সিজদা করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন। ইমাম রাযী এই ব্যাখ্যাটি অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দিয়াছেন।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন- এখানে السجود। অর্থ বিনয়াবনত হওয়া বা বিনয় প্রকাশ করা। কারণ, এখানে উহা আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করা অসম্ভব।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরামা ও খসীফ বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত দ্বারটি হইল কিবলার (বায়তুল মুকাদ্দাস) সম্মুখের দ্বার। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ, কাতাদাহ, যিহাক ও সুদ্দী বর্ণনা করেন যে, উহা হইল বায়তুল মুকাদ্দাসের 'বাবুল হিত্তা' অর্থাৎ বাবে ঈলিয়া।

ইমাম রাযী কোন কোন তাফসীরকার হইতে বর্ণনা করেন- এখানে আল্লাহ্ তা'আলা 'দ্বার' বলিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের এক প্রান্তকে বুঝাইয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা ও খসীফ বর্ণনা করেন- বনী ইসরাঈলগণ শুইয়া পড়িয়া দেহের পার্শ্বদেশ মাটিতে ঘষিতে ঘষিতে নগরদ্বার অতিক্রম করে।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ক্রমাগত আবুল কানুদ, আবূ সাঈদ ইযদী ও সুদ্দী বর্ণনা করেন- বনী ইসরাঈলগণকে আল্লাহ্ তা'আলা সিজদাবনত অবস্থায় দ্বার অতিক্রম করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা উহার বিপরীতে মাথা উঁচু করিয়া দ্বার অতিক্রম করিল।

وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ অর্থাৎ 'আর তোমরা বল- 'হিত্তাতুন'।

ইবন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইবন জুবায়র, মিনহাল [illegible] আব্বাস ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন ঃ

'আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত حطة শব্দের অর্থ হইতেছে মাগফিরাত। অর্থাৎ তোমরা পাপ মোচনের জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন জানাইবে।'

আতা, হাসান বসরী, কাতাদাহ ও রবী' ইব্ন আনাসও উক্ত শব্দের অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ حطة অর্থ ন্যায়সঙ্গত। অর্থাৎ তোমরা বলিবে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে যে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়াছিলেন উহা ন্যায়সঙ্গত ছিল।

ইকরামা বলেন ঃ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ অর্থাৎ 'আর তোমরা বলিবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'

ইমাম আওযাঈ বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ উহার অর্থ হইতেছে- 'এবং তোমরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিও।'

হাসান বসরী এবং কাতাদাহ বলেন- حطة অর্থাৎ আমাদের গুনাহ মাফ কর।

نَغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ তোমরা আমার নির্দেশ পালন করিলে তোমাদের পাপ মার্জনা করিব এবং তোমাদের নেক আমলের সুফল বাড়াইয়া দিব।

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে কথায় ও কাজে তাঁহার নিকট বিনয়ী হইতে, অপরাধ স্বীকার করিতে, ক্ষমাপ্রার্থী হইতে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ও নেক কাজের প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ - وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ - اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا -

'যখন আল্লাহর মদদ ও বিজয় আসে আর দলে দলে লোককে তুমি আল্লাহর দীনে প্রবেশ করিতে দেখ, তখন স্বীয় প্রভুর প্রশস্তি বর্ণনা কর এবং তাঁহার সমীপে ক্ষমাপ্রার্থী হও। নিশ্চয় তিনি সর্বাধিক মার্জনাকারী।'

উপরোক্ত সূরার ব্যাখ্যায় কোন কোন সাহাবী বলেন- উহাতে বিজয়কালে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্র ও ইস্তিগফারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ উক্ত সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে তাঁহার ইন্তিকালের পূর্বাভাস প্রদান করেন। হযরত উমর (রা)-ও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বস্তুত উভয় ব্যাখ্যাই সঠিক ও শুদ্ধ। উক্ত সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা একদিকে বিজয়ের জন্য তাঁহাকে আল্লাহ্ তা'আলার স্তুতি বর্ণনা ও ইস্তিগফারের নির্দেশ দিতেছেন এবং অপরদিকে তাঁহার ইন্তিকালের সময় নিকটবর্তী হইবারও সংবাদ প্রদান করিতেছেন। তাই উভয় ব্যাখ্যার ভিতর কোনরূপ বৈপরীত্য ও পরস্পর বিরোধিতা নাই।

নবী করীম (সা) বিজয়কালে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অত্যধিক বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

'মক্কা বিজয়ের দিন তিনি পবিত্র মক্কার 'ছানিয়াতুল উলিয়া' নামক পথ দিয়া প্রবেশ করেন এবং প্রবেশকালে তিনি স্বীয় প্রভুর উদ্দেশ্যে এরূপ বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার অশ্রু মুবারক উটের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়াছিল। শহরে প্রবেশের পর তিনি আট রাকআত নামায পড়েন। তখন বেলা এক প্রহর। তাই কেহ কেহ বলেন- উহা ছিল সালাতুয যোহা বা চাশতের নামায। অপর একদল ব্যাখ্যাকার বলেন- উহা ছিল সালাতুল ফাতহি বা বিজয়ের নামায। তাই তাঁহারা বলেন মুসলিম বাহিনী কোন জনপদ অধিকার করিলে উহাতে প্রবেশের পর আট রাকআত সালুতশ শোকর বা কৃতজ্ঞতাসূচক নামায পড়া অধিনায়কের জন্য মুস্তাহাব। হযরত সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রা) পারস্য সম্রাটের প্রাসাদে প্রবেশের পর আট রাকআত সালাতুশ শোকর আদায় করেন।'

কেহ কেহ বলেন- আর রাকআত সালাতুশ শোকর একই সালামে আদায় করা উচিত। সঠিক অভিমত এই যে, আট রাকাআত নামায দুই দুই রাকআত করিয়া চারি সালামে আদায় করা উচিত। আল্লাহই ভাল জানেন।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ অর্থাৎ অথচ সেই জালিমরা তাহাদের প্রতি আদিষ্ট কথার বিপরীত কথা উচ্চারণ করিল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইমাম ইব্ন মুনাব্বিহ, মুআম্মার ইব্ন মুবারক, আব্দুর রহমান ইব্ন মাহদী, মুহাম্মদ ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন;

রাসূল (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, তোমরা সিজদারত অবস্থায় নগর-দ্বার অতিক্রম কর আর বল حطة (ক্ষমাই কাম্য)। অথচ তাহারা বলিল ঃ حبة فى شعر (খোসাবৃত দানা কাম্য)।

ইমাম নাসাঈ (র) উক্ত রিওয়ায়েতটি উপরোক্ত রাবী আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীমের বরাতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তিনি হাদীসটির অন্যতম রাবী ইব্ন মুবারক হইতে মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ ইব্ন মুহাম্মদের সূত্রে হাদীসের অংশ বিশেষ বর্ণনা করেন। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ বনী ইসরাঈলগণ حطة -এর স্থলে حنطة (শস্যকণা) বলিয়াছিল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ক্রমাগত ইমাম ইব্ন মুনাব্বিহ, মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে বলিলেন, তোমরা সিজদাবনত অবস্থায় নগর-দ্বার অতিক্রম করিও আর বলিও حطة (ক্ষমাই কাম্য)। কিন্তু তদস্থলে তাহারা বসিয়া পড়িয়া মাটিতে নিতম্ব ঘষিতে ঘষিতে গেইট পার হইল এবং বলিল حبة فى شعيرة (খোসাবৃত শস্যকণাই কাম্য)।

উপরোক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। ইমাম বুখারী (র) উহা ইসহাক নযর হইতে, ইমাম মুসলিম উহা মুহাম্মদ ইব্ন রাফে' হইতে ও ইমাম তিরমিযী উহা আবদুর রহমান ইব্ন হামীদ হইতে বর্ণনা করেন। ইমামত্রয়ের ঊর্ধ্বতন সূত্রধারা পূর্বানুরূপ। ইমাম তিরমিযী উহাকে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন- হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে তাওয়ামার মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম সালেহ ও ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে জনৈক বিশ্বস্ত রাবী এবং এতদুভয় হইতে সালেহ ইব্ন কায়সার আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ

"বনী ইসরাঈলগণকে আল্লাহ্ তা'আলা সিজদারত অবস্থায় সদর দরজা দিয়া শহরে প্রবেশ করিতে বলিলেন। কিন্তু বসা অবস্থায় নিতম্ব ঘষিতে ঘষিতে ও حنطة فى شعيرة (যবের মধ্যের গম কাম্য) বলিতে বলিতে শহরের দরজা পার হইল।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ক্রমাগত আতা ইব্ন ইয়াসার, যায়দ ইব্ন আসলাম, হিশাম ইব্ন সা'দ, আব্দুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাব, সুলাইমান ইব্ন দাউদ, আহমদ ইব্ন সালেহ ও ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ইসরাঈলগণকে বলিলেন, তোমরা সিজদারত অবস্থায় নগর-দ্বার অতিক্রম কর এবং বল حطة (ক্ষমাই কাম্য)।

ইমাম আবূ দাউদ উহা হিশাম হইতে ঊর্ধ্বতন অভিন্ন সূত্রে ও পরবর্তী স্তরে ইব্ন আবূ ফুদায়ক ও আহমদ ইব্ন মুসাফিরের সূত্রে অনুরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ক্রমাগত আতা ইব্ন ইয়াসার, যায়দ ইব্ন আসলাম, হিশাম ইব্ন সা'দ, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আবি ফুদায়ক, আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুনজির আল কায্যায, ইবরাহীম ইব্ন মাহদী, আব্দুল্লাহ ইব্ন জা'ফর ও ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ

'আমরা নবী করীম (সা)-এর সহিত সফরে ছিলাম। পথিমধ্যে রাত্রিতে আমরা 'যাতুল হানযাল' নামক পার্বত্য পথ পার হইলাম। উহা অতিক্রম করার সময় নবী করীম (সা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যে নগর-দ্বার সম্পর্কে বনী ইসরাঈলগণকে সিজদারত অবস্থায় অতিক্রম করার নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং 'হিত্তাতুন' বলিতে আদেশ করিয়াছিলেন, আজিকার রাত্রির পার্বত্য পথ অতিক্রমের ব্যাপারটি উহার সমতুল্য।"

হযরত বারা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ ইসহাক ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করিয়াছেন যে, سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বারা (রা) বলেন ঃ

"সেই নির্বোধরা হইতেছে ইয়াহুদী সম্প্রদায়। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা রুকূ'র অবস্থায় শহরের দরজা অতিক্রম করিবে এবং বলিতে থাকিবে حطة (ক্ষমাই কাম্য)। কিন্তু তাহারা পিছন ফিরিয়া নগর-দ্বার পার হইল এবং বলিতে থাকিল, حنطة حمراء فيه شعيرة (যব মিশ্রিত লাল গমই কাম্য)। হযরত বারা আরও বলেন- তাহাদের উক্ত রদবদলের কথাই فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ আয়াতাংশে বলা হইয়াছে।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবুল কানূদ, আবূ সাঈদ ইযদী, সুদ্দী ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন ঃ

'আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা বলিবে, 'হিত্তাতুন' কিন্তু তাহারা বলিল, 'হিন্তাতুন হাব্বাতুন হামরাও ফীহে শাঈরাতুন।' তাহাদের এই পরিবর্তনের কথাই فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ আয়াতাংশে বলা হইয়াছে।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্রাহ্, সুদ্দী ও ইসবাত বর্ণনা করেন ঃ

'বনী ইসরাঈলগণ তাহাদের ভাষায় বলিয়াছিলেন هطا سمعنا ازبة مزبا এবং উহার আরবীরূপ হইল ঃ

حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعيرة سوداء

অর্থাৎ কালো সূতায় গাঁথা লাল গম চাই। তাহাদের এই রদবদলের কথাই فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ আয়াতাংশে বলা হইয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ, মিনহাল, আ'মাশ ও ছাওরী বলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে অনুচ্চ প্রবেশ দ্বার দিয়া রুকূ'রত অবস্থায় শহরে প্রবেশ করিতে বলিলেন। কিন্তু তাহারা তদস্থলে সম্মুখে নিতম্ব ফিরাইয়া 'হিন্তাতুন' বলিতে বলিতে শহরে প্রবেশ করিল। তাহাদের এই পরিবর্তনের কথাই فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً আয়াতাংশে বলা হইয়াছে।"

আতা, মুজাহিদ ইকরামা, যিহাক, হাসান, কাতাদাহ, রবী' ইব্ন আনাস ও ইয়াহিয়া ইব্ন রাফে' হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়।

তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় যাহা কিছু বলিয়াছেন ও আয়াতদ্বয় হইতে যাহা প্রতিভাত হয় উহার সারকথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে বিনয় ও কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রবেশ করিতে ও অতীতে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতে বলায় তাহারা

উহার বিপরীতে মাথা উঁচু করিয়া সম্মুখে নিতম্ব রাখিয়া দম্ভ সহকারে 'যবের মধ্যস্থিত গম চাই' বলিতে বলিতে শহরে প্রবেশ করিল। তাহাদের এই চরম ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি আযাব নাযিল করিয়াছিলেন। নিম্নোক্ত আয়াতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ঃ

فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ -

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ

"কুরআন মজীদে যে কোন স্থানে উল্লেখিত رجز অর্থ হইতেছে আযাব বা শাস্তি।"

মুজাহিদ, আবূ মালিক, হাসান এবং কাতাদাহ হইতেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

আবুল আলীয়া বলেন ঃ الرجز। শব্দের অর্থ হইতেছে গযব। শা'বী বলেন ঃ الرجز। শব্দের অর্থ হইল মহামারী, শিলাবৃষ্টি। সাঈদ ইব্ন জারীর বলেন ঃ الرجز। শব্দের অর্থ হইতেছে মহামারী। সা'দ ইব্ন মালিক, উসামা ইব্ন যায়দ ও খুযায়মা ইব্ন সাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম ইব্ন সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস, হাবীব ইব্ন সাবিত, সুফিয়ান, ওয়াকী', আবূ সাঈদ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

"মহামারী হইতেছে এক প্রকার الرجز। এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে উহা দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে।"

ইমাম নাসাঈ উহা অন্যতম রাবী সুফিয়ান ছাওরী হইতে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে এবং অনুরূপ অধস্তন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে অন্যতম রাবী হাবীব ইব্ন আবূ সাবিতের মাধ্যমে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- ' কোন জনপদে মহামারীর প্রাদুর্ভাবের কথা শুনিলে তোমরা সেখানে প্রবেশ করিও না।' অতঃপর হাদীসের পূর্বোদ্ধৃত অংশ বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আমের ইব্ন সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস, যুহরী, ইউনুস ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ

"এই রোগ-ব্যাধি হইতেছে رجز (আযাব)। পূর্ববর্তী কোন কোন উম্মতকে উহা দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল।"

উক্ত বর্ণনাটুকু একটি পূর্ণাঙ্গ হাদীসের অংশমাত্র। বুখারী ও মুসলিম শরীফে উপরোক্ত অভিন্ন সনদে আমের ইব্ন সা'দ হইতে যুহরীর মাধ্যমে এবং ভিন্ন সনদে আমের ইব্ন সা'দ হইতে মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির ও সালিম ইব্ন আবূ নযরের মাধ্যমে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

(٦٠) وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۭ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۭ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۭ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

৬০. অনন্তর যখন মূসা তাহার জাতির জন্য পানি প্রার্থনা করিল, তখন আমি বলিলাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। অমনি উহা হইতে বারটি ফোয়ারা নির্গত হইল। প্রত্যেক গোত্রই তাহাদের ফোয়ারা চিনিতে পাইল। (আমি বলিলাম) আল্লাহ্ প্রদত্ত রুযী খাও ও পান কর আর পৃথিবীতে অনাচার সৃষ্টি করিয়া ফিরিও না।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলগণের প্রতি প্রদত্ত তাঁহার নিআমতের কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। মিশর হইতে পিতৃভূমিতে ফিরিয়া তাহারা পানির কষ্টে পড়িলে মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পানির জন্য দোআ করিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে তাঁহার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করিতে বলিলেন। তিনি তাহাই করিলেন। আল্লাহর ইশারায় পাথর হইতে বনী ইসরাঈলের দ্বাদশ গোত্রের জন্য বারটি ফোয়ারা নির্গত হইল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ ফোয়ারা চিনিতে পাইল। উক্ত পাথরটি তাহারা নিজেদের সঙ্গে বহন করিত।

এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বিনাশ্রমে পানাহারের জন্য মান্না-সালওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এইসব নি'আমাত দান করিয়া তিনি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন- তোমরা তৃপ্তি সহকারে এইগুলি খাও এবং পান কর। অতঃপর আর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিয়া ফিরিও না। তাহা হইলে নি'আমাতসমূহ তুলিয়া লওয়া হইবে।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত পাথরটি কোন্ পাথর ছিল এবং উহা হইতে কিরূপে ঝরনা প্রবাহিত হইল, তাফসীরকারগণ তাহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ "বনী ইসরাঈলদের সামনে একখানা চতুষ্কোণ পাথর রাখা হইল। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন তাঁহার লাঠি দ্বারা উহাতে আঘাত হানিতে। তিনি তাহা করা মাত্র উহার প্রত্যেক দিক হইতে তিনটি করিয়া মোট বারটি প্রস্রবণ উৎসারিত হইল। অতঃপর বনী ইসরাঈলের বার শাখার জন্য বারটি প্রস্রবণ নির্দিষ্ট হইল। তাহারা নিজ নিজ ঝরনার পানি ব্যবহার করিত। তাহারা যেখানেই যাইত সেই দ্বাদশ ফোয়ারার পাথরটি নিজেদের সামনে স্থাপিত দেখিতে পাইত।

উক্ত রিওয়ায়েতটুকু একটি সুদীর্ঘ রিওয়ায়েতের অংশমাত্র। পূর্ণ রিওয়ায়েতটি ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইব্ন জারীর ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। মূলত উহা 'ফিতনা' সম্পর্কিত একটি রিওয়ায়েতের অংশ বিশেষ।

আতিয়্যা আওফী বলেন ঃ "বনী ইসরাঈলদের জন্য গরুর মাথার মত একখণ্ড পাথর তৈরী করা হইয়াছিল। উহা একটি গরুর পিঠে বহন করা হইত। তাহারা কোথাও অবতরণ করিলে উহা নামাইয়া রাখিত। তখন মূসা (আ) নিজ লাঠি দ্বারা উহাতে আঘাত করিতেন। অমনি বারটি ঝরনা সৃষ্টি হইত। পুনরায় তাহারা যাত্রা আরম্ভ করিলে উহা আবার গরুর পিঠে তুলিয়া লইত। তখন উহার প্রস্রবণ বন্ধ হইয়া যাইত।

আতা খোরাসানী হইতে তাঁহার পুত্র বর্ণনা করেন ঃ "বনী ইসরাঈলদের নিকট একখণ্ড পাথর ছিল। হযরত হারুন (আ) উহা কোথাও স্থাপন করিতেন। অতঃপর মূসা (আ) স্বীয় লাঠি দ্বারা উহাতে আঘাত করিতেন।"

কাতাদাহ বলেন ঃ "বনী ইসরাঈলদের কাছে রক্ষিত পাথরটি তাহারা তূর পাহাড় হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। তাহারা যেখানেই যাইত উহা সঙ্গে লইয়া যাইত। কোথাও

যাত্রাবিরতি হইলে হযরত মূসা (আ) উহাতে লাঠির আঘাত হানিয়া পানির প্রয়োজন মিটাইতেন।"

প্রসঙ্গত আল্লামা যামাখশারী নিম্ন অভিমতগুলি উদ্ধৃত করেন ঃ "কথিত আছে, উহা একটি মর্মর পাথর ছিল। উহার আয়তন এক বর্গহাত ছিল। একদল বলেন ঃ উহার আকৃতি ছিল মানুষের মাথার মত। অপরদল বলেন ঃ উহা জান্নাত হইতে আগত একখানা পাথর ছিল। উহার উচ্চতা হযরত মূসা (আ)-এর উচ্চতার মতই দশ হাত ছিল। উহাতে দুইটি প্রবৃদ্ধ স্থান ছিল। স্থান দুইটি হইতে আলো নির্গত হইত। উহা একটি গাধার পিঠে বহন করা হইত। কেহ কেহ বলেন- উহা হযরত আদম (আ) জান্নাত হইতে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশধরগণ উত্তরাধিকার সূত্রে উহার মালিক হইয়া আসিতেছিল। এক সময়ে উহা হযরত শুআয়ব (আ)-এর অধিকারে আসে। তিনি লাঠিখানাসহ উহা হযরত মূসা (আ)-কে প্রদান করেন। কেহ আবার বলেন- হযরত মূসা (আ) যে পাথরের উপর কাপড় রাখিয়া গোসল করিয়াছিলেন উহা সেই পাথর। হযরত জিবরাঈল (আ) বলিয়াছিলেন, পাথরখানা আপনি সাথে নিন। উহাতে বিশেষ গুণ নিহিত রহিয়াছে। তাই মূসা (আ) তাঁহার মালপত্রের সহিত উহাও তুলিয়া লইলেন।"

অতঃপর আল্লামা যামাখশারী বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত الحجر শব্দের ال। নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক (عهدى) না হইয়া শ্রেণীবাচক (جنسى) হইলে আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় ঃ তুমি তোমার লাঠি দ্বারা প্রস্তর শ্রেণীতে আঘাত কর।

হাসান বসরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে নির্দিষ্ট কোন পাথরে আঘাত করিতে বলেন নাই। ইহাতে আল্লাহ পাকের কুদরত ও মূসা (আ)-এর মু'জিযা অধিকতর পরিস্ফুট ছিল। মূসা (আ) যখনই স্বীয় লাঠি দ্বারা কোন পাথরে আঘাত করিতেন, তখনই উহা হইতে ঝরনা নির্গত হইত। পুনরায় উহাতে আঘাত করিলে উহা শুষ্ক হইয়া যাইত। বনী ইসরাঈলরা বলিল- এই পাথর হারাইয়া গেলে তো আমরা পিপাসায় মরিব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে লাঠির আঘাত না করিয়া পাথরকে পানি প্রদানের জন্য মৌখিক নির্দেশ দিতে বলিয়া জানাইলেন। তাহাতেও ঝরনা সৃষ্টি হইবে। ফলে বনী ইসরাঈলদেরও আস্থা সৃষ্টি হইবে। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

ইয়াহিয়া ইব্ন নযর বলেন ঃ "একদিন আমি জুওয়াইবিরকে জিজ্ঞাসা করিলাম- বনী ইসরাঈলদের প্রত্যেকটি শাখা নিজ নিজ ফোয়ারা কিরূপে চিনিতে পারিল? তিনি জবাব দিলেন- মূসা (আ) পাথরটি স্থাপন করিয়া আঘাত হানার সময়ে বার শাখার বারজন প্রতিনিধি উহার পাশে দাঁড় করাইতেন। প্রস্রবণ নির্গত হওয়ার সময়ে যাহার গায়ে যেই প্রস্রবণের পানির ছিঁটা পড়িত সে উহাকে নিজেদের প্রস্রবণ বলিয়া জানিতে পাইত। তখন সে নিজ শাখার অন্যদের উহা হইতে পানি ব্যবহারের জন্য আহবান করিত।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ 'বনী ইসরাঈলরা যখন 'তীহ' প্রান্তরে যাযাবর জীবন যাপন করিতেছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য পাথর হইতে ঝরনা প্রবাহিত করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, সাঈদ ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন ঃ

"বনী ইসরাঈলদের জন্য পাথর হইতে ঝরনা প্রবাহিত হইত 'তীহ' প্রান্তরে। মূসা (আ) নিজ লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করিতেন। অমনি বারটি ঝরনার সৃষ্টি হইত। বার গোত্রের প্রত্যেকের জন্য একেকটি ঝরনা নির্ধারিত ছিল। তাহারা উহা হইতে পানি পান করিত।"

Contents

মুজাহিদও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনাটি সূরা আ'রাফে বর্ণিত ঘটনার অনুরূপ। তবে সূরা আ'রাফ মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ায় সেখানে ইয়াহূদী বসতি নাই বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা উহাতে বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে তৃতীয় পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সূরা বাকারা মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ায় উহাতে বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গে দ্বিতীয় পুরুষের সর্বনাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

الانجاس। অর্থ ঝরনা সৃষ্টি হওয়া। উহা ঝরনা প্রবাহিত হবার প্রাথমিক অবস্থা নির্দেশ করে। পক্ষান্তরে الانفجار। অর্থ ঝরনা প্রবাহিত হওয়া। উহা ঝরনা প্রবাহিত হবার চূড়ান্ত পর্যায়কে নির্দেশ করে। সূরা আ'রাফের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমোক্ত শব্দ এবং আলোচ্য আয়াতে শেষোক্ত শব্দ ব্যবহার করেন। অবস্থার বিভিন্নতার কারণে শব্দ ব্যবহারের এই বিভিন্নতা স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে দশটি বর্ণনাগত পার্থক্য বিদ্যমান। উহার কোনটি শব্দগত ও কোনটি অর্থগত। আল্লামা যামাখশারী নিজ তাফসীরে উহা সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। উভয় আয়াতে একই ঘটনা বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক আয়াতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞানের আধার।

(٦١) وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۟

৬১. আর যখন তোমরা বলিলে, 'হে মূসা! আমরা কিছুতেই আর এক ধরনের খাদ্য খাওয়ার ধৈর্য ধরিব না। তাই তোমার প্রভুকে ডাকিয়া বল, আমাদের জন্য তিনি মাটি হইতে বিভিন্ন তরকারী, শসা জাতীয় ফলমূল, গম, ডাল ও পিঁয়াজ উৎপন্ন করুন।' মূসা বলিল, 'তোমরা কি উৎকৃষ্টটির বদলে নিকৃষ্টটি চাহিতেছ। তাহা হইলে শহরে চলিয়া যাও। সেখানে তোমরা যাহা চাহিতেছ নিশ্চয়ই তাহা পাইবে।' 'তাহাদের জন্য লাঞ্ছনার যাযাবর জীবন নির্ধারিত হইল। আল্লাহ্র গযব মাথায় লইয়া ঘুরপাকই খাইয়া ফিরিবে। তাহার কারণ এই যে, তাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করিতেছিল এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করিতেছিল। আর তাহা এই জন্য যে, তাহারা নাফরমানী ও বাড়াবাড়ির পথ অনুসরণ করিতেছিল।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদিগকে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক আল্লাহ্ প্রদত্ত নিআমতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিয়া সতর্ক করিতেছেন।

বনী ইসরাঈল জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা মান্না-সালওয়া নামক সহজলভ্য সুস্বাদু খাদ্য প্রদান করিয়াছিলেন। অথচ অকৃতজ্ঞ বনী ইসরাঈলগণ উহার বদলে নিকৃষ্টমানের খাদ্য যথা সব্জি, ডাল, গম ইত্যাদির জন্যে আবদার জানাইল।

হাসান বসরী (র) বলেন– 'বনী ইসরাঈলরা মূলত কৃষিজীবী সম্প্রদায় ছিল। তাহারা পিঁয়াজ, শসা, ডাল, সব্জি ইত্যাদির চাষ করিত। তাহারা নিজেদের পেশাগত পূর্ব-জীবনের কথা স্মরণ করিয়া উহাতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হইল। তাই 'মান্না-সালওয়া' তাহাদের কাছে অপ্রিয় হইয়া পড়িল এবং অভ্যস্ত খাদ্য প্রদানের জন্য মূসা (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আবদার পেশ করিল।

মান্না ও সালওয়া দুই ধরনের খাদ্য হওয়া সত্ত্বেও বনী ইসরাঈলগণ উহাকে এই কারণে একই খাদ্য বলিয়াছে যে, প্রতিদিন উহাই খাইত এবং উহার বিকল্প কিছুই খাইতে পাইত না।

البقل। অর্থ সব্জি, القثاء। অর্থ শসা ও তজ্জাতীয় ফলমূল; العدس। অর্থ ডাল; البصل। অর্থ পিঁয়াজ ও الفوم। অর্থ গম বা রসুন।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) فوم স্থলে ثوم পড়িতেন। উহার অর্থ রসুন। তাঁহার নিকট হইতে পর্যায়ক্রমে লায়ছ ইব্ন আবূ সালীম ও মুজাহিদ বর্ণনা করেন ঃ الفوم। শব্দের অর্থ হইতেছে রসুন। রবী' ইব্ন আনাস এবং সাঈদ ইব্ন জুবায়রও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমাগত হাসান, ইউনুস, আবূ আম্মারা, ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক বসরী, আমর ইব্ন রাফে' ও আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ الفوم। অর্থ রসুন। তিনি আরও বলেন, প্রাচীন আরবরা উহা রুটি পাকানো অর্থে ব্যবহার করিত এবং বলিত ।فوموا لنا অর্থাৎ আমাদের জন্য রুটি পাকাও।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ فوم স্থলে ثوم পাঠের রিওয়ায়েতটি যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, فا বর্ণটি উচ্চারণগত নৈকট্যের কারণে ثا বর্ণে রূপান্তরিত হইয়াছে। ফলে কিরাআতে বিভিন্নতা সৃষ্টি হইয়াছে। আরবরা وقعوا فى عافور شر (তাহারা বিপদে পড়িয়াছে) স্থলে কখনও وقعوا فى عاثورشر বলিয়া থাকে। অর্থাৎ عافور ও عاثور শব্দদ্বয় একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া থাকে। তেমনি اثافى। স্থলে اثاثى। ও مغافير স্থলে مغاثير ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত।

অপর তাফসীরকারগণ বলেন الفوم। শব্দের অর্থ হইল গম। নাফে' ইব্ন আবূ সাঈদ হইতে ক্রমাগত ইব্ন ওহাব, ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, নাফে' বলেন ঃ

'একদা এক ব্যক্তি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, فوم অর্থ কি? তিনি জবাবে বলিলেন– গম। স্বীয় দাবীর সমর্থনে তিনি কবি আহিহা ইব্ন জালাহ্র নিম্নোক্ত চরণ দুইটি শুনাইলেন ঃ

قد كنت اغنى الناس شخصا واحدا

ورد المدينة عن زراعة فوم

'আমি মানুষকে একটি মাত্র লোকের সাহায্যে সম্পদশালী করিয়া দিতাম। লোকটি গমের চাষ ত্যাগ করিয়া শহরে আসিয়াছিল।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে কুরায়ব, রশীদ ইব্ন কুরায়ব, ঈসা ইব্ন ইউনুস, মুসলিম জুহানী, আলী ইব্ন হাসান ও ইমাম ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন ঃ 'বনূ হাশিমের ভাষায় فوم অর্থ গম।'

আলী ইব্ন তালহা, যিহাক এবং ইকরামাও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ অর্থ উদ্ধৃত করেন। মুজাহিদ ও আতা হইতে ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করেন ঃ فوم অর্থ গমের আটার রুটি।

আবূ মালিক হইতে পর্যায়ক্রমে হুসায়ন, হাসীন, ইউনুস ও হাশিম বর্ণনা করেন ঃ فوم অর্থ গম।

সুদ্দী, হাসান বসরী, কাতাদাহ, আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম প্রমুখও উহার উক্তরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

জাওহারী বলেন ঃ الفوم অর্থ গম।

ইব্ন দুরাইদ বলেন ঃ فوم অর্থ শস্যের ছড়া বা ফল। আতা ও কাতাদাহ হইতে ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন ঃ 'যে সকল শস্য হইতে রুটি হয় তাহাকে فوم বলা হয়।'

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ কেহ কেহ বলিয়াছেন, সিরীয় ভাষায় ছোলা বা চানাবুটকে فوم বলা হয় এবং উহার ব্যবসায়ীকে فامى বলা হয়। فامى হইল فومى শব্দের পরিবর্তিত রূপ।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সকল প্রকারের খাদ্যশস্যকেই فوم বলা হয়।

قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ আয়াতাংশে বনী ইসরাঈলগণকে হযরত মূসা (আ)-এর তিরস্কার ও ভর্ৎসনার ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। কারণ, তাহারা উৎকৃষ্টমানের খাদ্যের বদলে নিম্নমানের খাদ্যের জন্য আব্দার জানাইয়াছিল।

اِهْبِطُوْا مِصْرًا আয়াতাংশে হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সংকলিত মূল কুরআন শরীফে مصر শব্দটি تنوين সহ منصرف রূপে লিখিত রহিয়াছে। অধিকাংশ কারী ও বিশেষজ্ঞ উহাকে সেইভাবেই পড়িয়া থাকেন। ইমাম ইব্ন জারীর বলেন- যেহেতু কুরআন শরীফের সকল উসমানী সংকলনে مصر শব্দটি منصرف রূপে تنوين সহ লিখিত রহিয়াছে, তাই আমি উহার অন্যরূপ পাঠ জায়েয মনে করি না।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- আলোচ্য আয়াতের مصر শব্দ দ্বারা যে কোন শহর বুঝানো হইয়াছে। ইকরামা হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ সাঈদ বাক্কাল, ইব্ন মারযাবান প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। সুদ্দী, কাতাদাহ এবং রবী' ইব্ন আনাসও শব্দটির অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করেন।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ হযরত ইব্ন মাসউদ ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর কিরাআতে مصر শব্দটি غير منصرف হিসাবে তানবীন বিহীন অবস্থায় পঠিত হইয়াছে।

আবুল আলীয়া ও রবী' ইব্ন আনাস বলেন ঃ ইব্ন মাসউদ (রা) ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা) مصر শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন, উহা হইতেছে ফিরাউনের মিসর। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম, আবুল আলীয়া, রবী' এবং আ'মাশ হইতেও শব্দটির অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর বলেন- مصر শব্দটিকে منصرف হিসাবে تنوين যুক্তভাবে পড়িলেও উহার তাৎপর্য ফিরাউনের মিশর হইতে পারে। কারণ, সূরা দাহ্রের অন্তর্গত قوارير। শব্দটি মূলত غير منصرف হওয়া সত্ত্বেও কুরআন মজীদের মূল সংকলনে উহা তানবীনযুক্ত অবস্থায় লেখা আছে বলিয়া আমরা সকলেই তদ্রূপ পাঠ করি। مصر শব্দটিকেও সেই একই কারণে منصرف রূপে পাওয়া যাইতে পারে।

অতঃপর ইব্ন জারীর দ্বিধা প্রকাশ করিয়া বলেন ঃ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত مصر শব্দটির তাৎপর্য কি ফিরাউনের মিশর, না যে কোন শহর? এই ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

ইব্ন জারীরের এই দ্বিধা সমর্থনযোগ্য নহে। বস্তুত এখানে مصر অর্থ যে কোন শহর। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ তাফসীরকার এই তাৎপর্যই ব্যক্ত করিয়াছেন। এই তাৎপর্যের আলোকে আয়াতাংশের ব্যাখ্যা দাঁড়ায় এই ঃ

'বনী ইসরাঈলগণের অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ আব্দারে বিরক্ত হইয়া মূসা (আ) তাহাদিগকে বলিলেন- তোমরা যে সাধারণ খাদ্যের জন্য আব্দার তুলিয়াছ উহা তো যে কোন শহর বা জনপদে গেলেই পাইতে পার। তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে বিশেষভাবে দাবী জানাইবার কোন প্রয়োজন নাই।'

বনী ইসরাঈলগণের এই অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতামূলক খাদ্য পরিবর্তনের দাবী অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক বিধায় আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল মূসা (আ) কর্তৃক উহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতার স্বাভাবিক পরিণতির কথা বিবৃত করিয়াছেন। তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশাবলী অস্বীকার করিয়াছে ও মানব প্রেমিক নিষ্পাপ নবীগণকে হত্যা করিয়াছে। তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হইয়াছে ও আল্লাহ্র নির্দ্ধারিত সীমালজ্ঘন করিয়াছে। ফলে আল্লাহ্ লাঞ্ছনা ও নির্বাসনকে তাহাদের নিত্যসঙ্গী করিয়াছে। তাহারা আল্লাহ্র গযব মাথায় লইয়া ঘুরপাক খাইয়া ফিরিতেছে।

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ অর্থাৎ আল্লাহ্র সরাসরি ফরমান তাদের জন্য অবমাননাকর জীবন অপরিহার্য করিয়াছে। তাহারা অতীতেও অন্যান্য জাতির হাতে লাঞ্ছিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে থাকিবে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ অর্থাৎ তাহারা জিযিয়া কর প্রদানে বাধ্য থাকিবে এবং উহাই তাহাদের লাঞ্ছনা ও অবমাননা।

হাসান ও কাতাদাহ হইতে পর্যায়ক্রমে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন ঃ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ অর্থাৎ তাহারা লাঞ্ছিত ও অবমানিত অবস্থায় জিযিয়া কর প্রদান করিতে থাকিবে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে অভিশপ্ত করার ফলে তাহারা অসহায় জাতিতে পরিণত হইয়াছে। তাহারা মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছে। তাহার পূর্বে তাহারা পারস্যে অগ্নিপূজকদের অধীনে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করিয়াছে। তাহাদিগকে অবমাননাকর জিযিয়া কর দিতে হইয়াছে।

আবুল আলীয়া, রবী' ইব্ন আনাস ও সুদ্দী বলেন ঃ المسكنة অর্থ অর্থাভাবে অনাহার।

আতিয়্যা আওফী বলেন ঃ المسكنة অর্থ খাজনা বা কর। যিহাক বলেন ঃ المسكنة অর্থ জিযিয়া কর।

وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ অর্থাৎ অনন্তর তাহারা আল্লাহ্র গযব মাথায় লইয়া ফিরিতেছে।

যিহাক বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, তাহারা আল্লাহ্র গযব ভোগ করার যোগ্য হইয়াছে।

রবী' ইব্ন আনাস উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাহাদের উপর আল্লাহ্র তরফ হইতে গযব পতিত হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাহারা গযব ভোগ করার যোগ্য হইয়াছে।

ইব্ন জারীর উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আরবীতে باء - يبوء - بوء وبواء بخير او شر অর্থ যে কল্যাণ বা অকল্যাণ লইয়া ফিরিতেছে বা ফিরিবে। অর্থাৎ باء - يبوء ক্রিয়া خير অথবা شر শব্দের সহিত ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহৃত হয় না। কুরআনের অন্যত্রও উহার অনুরূপ ব্যবহারই ঘটেছে। যেমন,

اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْءَ بِاِثْمِىْ وَاِثْمِكَ 'আমি তো ইহাই চাই যে, তুমি আমার ও তোমার উভয়ের পাপ মাথায় লইয়া ফিরিবে।'

এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, তাহারা আল্লাহ্র গযব সঙ্গে লইয়া ফিরিবে। কাজেই উহা তাহাদের নিত্য সহচর হইবে এবং কখনও তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে না।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের চির লাঞ্ছনা ও অবমাননার কারণ বর্ণনা করেন। তাহা এই যে, তাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে এবং সত্য দীনের বাহক নবীগণকে ও তাঁহাদের অনুসারীগণকে লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের শিকার করিয়াছে এবং অহেতুক নিষ্পাপ নবীগণকে হত্যা করিয়াছে। ইহা হইতে বড় পাপ আর নাই।

সর্বসম্মত সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, الكبر (দাম্ভিকতা, অহংকার, ঔদ্ধত্য) হইল সত্যকে তুচ্ছ করা, অমান্য করা ও মানুষকে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করা।

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হুসাইন ইব্‌ন আব্দুর রহমান, আমর ইব্‌ন সাঈদ, ইব্‌ন আওন, ইসমাঈল ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

'আমার জন্য নবী করীম (সা)-এর গোপন আলোচনা শোনার অনুমতি ছিল। একদিন আমি তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার নিকট মালিক ইব্‌ন মুর্‌রাহ আর রাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন নবী করীম (সা)-এর সহিত আলোচনারত ছিলেন। আমি গিয়া তাহার শেষ কথাটি শুনিতে পাইলাম। মালিক ইব্‌ন মুর্‌রাহ বলিতেছিলেন-হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তো জানেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বিপুল সংখ্যক উট প্রদান করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি আমার সম্পদ হইতে দুইটি জুতার ফিতা পরিমাণ নগণ্যতম সম্পদ বেশী পাইবে তাহা আমি পছন্দ করি না। আমার এই মানসিকতা কি البغى। (খোদাদ্রোহীতা) হইবে? নবী করীম (সা) বলিলেন- না, উহা খোদাদ্রোহীতা নহে, البغى। হইল البطر। বা সত্যকে তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে হেয় জ্ঞান করা। বনী ইসরাঈলগণকে এই অপরাধে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান ও নবীগণকে হত্যা করার কারণে দুনিয়ায় লাঞ্ছিত জাতিতে পরিণত করা হইয়াছে এবং পরকালের চরম লাঞ্ছনাও তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ মুআম্মার, ইবরাহীম, আ'মাশ, শু'বা ও ইমাম আবূ দাউদ তায়ালেসী বর্ণনা করেন ঃ

'বনী ইসরাঈলগণ দিনের প্রথমভাগে তিনশত নবী হত্যা করিয়া দিনের শেষভাগে মহানন্দে শাক সব্জীর হাট বসাইত।'

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ ওয়ায়েল, আসিম, আব্বান, আব্দুস সামাদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

'কিয়ামতের দিন চারি শ্রেণীর লোক সর্বাধিক আযাব ভোগ করিবে। (১) যে ব্যক্তি কোন নবীকে হত্যা করিয়াছে। (২) যে ব্যক্তিকে কোন নবী হত্যা করিয়াছে (৩) কোন বিভ্রান্তির প্রবর্তক (৪) ভাস্কর্য শিল্পী বা মূর্তি নির্মাতা।

ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ আয়াতাংশে বনী ইসরাঈলদের অভিশপ্ত হইবার আরেকটি কারণ বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই যে, তাহারা নিষিদ্ধ কার্য করিত ও অনুমোদিত কার্যের সীমালঙ্ঘন করিত।

العصيان। অর্থ নিষিদ্ধ কার্য করা এবং الاعتداء। অর্থ অনুমোদিত কার্যের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ঈমান ও আমলের গুরুত্ব

(٦٢) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৬২. নিশ্চয় যাহারা মু'মিন, ইয়াহুদী, নাসারা ও সাবেঈ তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান আনিয়াছে ও পুণ্য কাজ করিয়াছে, তাহাদের না আছে পার্থিব জীবনে কোন ক্ষতির জন্য দুঃখ বা দুশ্চিন্তা আর না আছে পারলৌকিক জীবনের জন্য কোন উৎকণ্ঠা বা আশংকা।

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা অবাধ্য ও অবিশ্বাসী বান্দাদের শাস্তি ও লাঞ্ছনার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে তিনি অনুগত বিশ্বাসী বান্দাদের পুরস্কারের কথা বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, মু'মিন, ইয়াহুদী, নাসারা, সাবেঈ ইত্যাকার যে উম্মাতের হউক না কেন, যাহারা ঈমান আনিবে ও নেক কাজ করিবে তাহারাই পুরস্কৃত হইবে। তাহারা না দুনিয়ার কোন ক্ষতি দ্বারা দুঃখপ্রাপ্ত হইবে, না আখিরাতে তাহাদের কোন ক্ষতির আশংকা থাকিবে। তাহারা তাহাদের ঈমান ও আমলের পুরস্কারস্বরূপ চিরস্থায়ী শান্তিতে নিমগ্ন থাকিবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَلاَ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ 'জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌র বন্ধুগণের মনে না থাকে ভবিষ্যতের কোন বিপদের আশংকা আর না থাকে অতীতের কোন ক্ষতির জন্য দুঃখ।'

মু'মিনদের মৃত্যুকালীন অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَنْ لاَّ تَخَافُوْا وَلاَتَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ـ

'নিশ্চয় যাহারা বলিল, আল্লাহ্ই আমাদের প্রভু, অতঃপর উহার উপর সুদৃঢ় হইয়া থাকিল, (মৃত্যুকালে) তাহাদের নিকট ফেরেশতারা অবতীর্ণ হইয়া বলিবে– তোমরা ভয় পাইও না ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইও না আর তোমরা তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।'

হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুজাহিদ, ইব্‌ন নাজীহ, সুফিয়ান, উমর ইব্‌ন আবূ উমর আল আদাবী, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, সালমান ফারসী (রা) বলেন ঃ

'আমি আমার পূর্ব ধর্মাবলম্বীদের পরকালীন মুক্তি সম্পর্কে নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করিলে উহার জবাবে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।'

সুদ্দী বলেন– হযরত সালমান ফারসী (রা) তাঁহার পূর্ববর্তী ধর্মের অনুসারীদের পরিণতি জানিবার জন্য নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলেন যে, তাহারা নামায পড়িত, রোযা রাখিত ও আপনার উপর ঈমান রাখিত এবং সাক্ষ্য দিত যে, অদূর ভবিষ্যতে আপনি আগমন করিবেন। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'হে সালমান। তাহারা দোযখবাসী হইবে। ইহাতে সালমান ফারসী (রা) বিষণ্ন হইয়া পড়িলেন। তখন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হইল।

আলোচ্য আয়াত হইতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা (আ)-এর পর হইতে হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল বনী ইসরাঈল তাওরাত কিতাব ও হযরত মূসা (আ)-এর সুন্নাহ মানিয়া চলিয়াছে, তাহারা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং নাজাত পাইবে। অতঃপর যে সকল বনী ইসরাঈল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ইঞ্জীল ও ঈসা

(আ)-এর সুন্নাহ মানিয়া চলিয়াছে, তাহারাও মু'মিন এবং নাজাতপ্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে বনী ইসরাঈলদের যে সকল লোক তাহাদের সমসাময়িক কালে আসমানী কিতাব ও নবীর উপর ঈমান আনে নাই, তাহারা কাফির এবং আযাবপ্রাপ্ত হইবে। অতঃপর সাইয়েদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের পর হইতে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির যাহারা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়া কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাহারাই কেবল মু'মিন ও নাজাতপ্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে যাহারা তাহা অস্বীকার করিবে তাহারা কাফির এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন– ইমাম ইব্ন জারীর হইতেও অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। আমি (ইব্ন কাছীর) উহার সমর্থনে আরেকটি দলীল পেশ করিতেছি। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবি তালহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতের পর নিম্ন আয়াত নাযিল হয়ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ -

'যদি কেহ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা সন্ধান করে, তাহার সেই জীবন ব্যবস্থা কখনই কবূল করা হইবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হইবে।'

আলোচ্য আয়াতের সহিত এই আয়াতের কোন বিরোধ নাই। কারণ, আলোচ্য আয়াতেও বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক যামানার লোকেরা তাহাদের নিজ নিজ যামানার অবতীর্ণ কিতাব ও প্রেরিত পুরুষের উপর ঈমান আনিয়া তদানুসারে পুণ্য কাজ করিলে মুক্তিপ্রাপ্ত মু'মিন হইবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার মহাপুরস্কার লাভ করিবে। তেমনি উপরে উদ্ধৃত আয়াতেও বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন ও কুরআন অবতরণের পর যে ইসলাম আত্মপ্রকাশ করিল, এখন হইতে উহা ছাড়া অন্য কোন দীন কিছুতেই কবূল করা হইবে না।

ইয়াহূদীরা হযরত মুসা (আ) ও তাওরাতের অনুসারী জাতি। اليهود শব্দটি الهوادة (মমত্ববোধ) কিংবা التهود (তওবা বা প্রত্যাবর্তন করা) হইতে সৃষ্ট। হযরত মূসা (আ) বলিয়াছেনঃ انا هدنا اليك (প্রভু হে, নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট তওবা করিতেছি)। ইয়াহূদীরা যেহেতু এইভাবে বারংবার তওবা করিয়াছিল, তাই উক্ত নাম হইয়াছে। অথবা তাহারা পরস্পর মমত্ববোধের স্থায়ী ডোরে আবদ্ধ বিধায় তাহাদের 'ইয়াহূদী' নাম হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াহূদার নামানুসারে তাহার বংশধররা ইয়াহূদী নামপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আবূ আমর ইব্ন আ'লা বলেনঃ التهود অর্থ নড়াচড়া করা। ইয়াহূদীরা যেহেতু হেলিয়া-দুলিয়া তাওরাত তিলাওয়াত করিত তাই তাহারা ইয়াহূদী নামে খ্যাত হইয়াছে।

হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণ নাসারা নামে পরিচিত। التناصر অর্থ একে অপরকে সাহায্য করা। নাসারারা একে অপরকে সাহায্য করিয়া থাকে বলিয়া তাহারা নাসারা নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহাদের অপর নাম 'আনসার' উহার অর্থ সাহায্যকারী। হযরত ঈসা (আ) বলিয়াছেনঃ مَنْ اَنْصَارِى اِلَى اللّٰه (কাহারা আমাকে আল্লাহ্র পথে সাহায্য করিবে?)ঃ হাওয়ারীগণ তখন বলিয়াছিলঃ نَحْنُ اَنْصَارِى اِلَى اللّٰه – আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। এই কারণে ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণ আনসার নামে খ্যাত হয়। কেহ কেহ

বলেন– নাসারা জাতি শুরুতে 'নাসিরা' নামক স্থানে অবস্থান করিত বলিয়া তাহারা 'নাসারা' খ্যাতি পাইয়াছে। কাতাদাহ ও ইব্ন জুরায়জ এই মতের প্রবক্তা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ অভিমত উদ্ধৃত হইয়াছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। النصارى। শব্দটি النصران। শব্দের বহুবচন। আরবী ভাষায় এই ওযনের শব্দের অনুরূপ বহুবচন হইয়া থাকে। যেমন النشوان। হইতে النشاوى। ও السكران। হইতে السكارى। ইত্যাদি। উহা স্ত্রীলিঙ্গে النصرانة। (নাসরানী মহিলা) হয়। যেমন কবি বলেন ঃ نصرانة لم يحنف (তাওহীদ গ্রহণ করে নাই এমন নাসরানী মহিলা)।

নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) তথা কুরআন মজীদের উপর যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা 'মু'মিন' নামে অভিহিত হইয়াছে। কারণ, তাহাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ ও সুদৃঢ় হইয়াছে। তাহারা অতীত নবীদের উপর ও ভাবী অদৃশ্য ঘটনাবলীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। তাই তাহারা স্বভাবতই 'মু'মিন' নামে খ্যাত হইয়াছে। الصابئى। শব্দের বহুবচন হইল الصابئين। ও الصابئون। (ধর্ম পরিবর্তনকারী)। তাহারা কাহারা? এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

মুজাহিদ হইতে পর্যায়ক্রমে লায়ছ ইব্ন আবূ সালীম ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন ঃ 'সাবেঈন সম্প্রদায় ইয়াহুদী, নাসারা, অগ্নিপূজক সম্প্রদায়ের মত কোন ধর্মানুসারী সম্প্রদায় নহে। তাহারা ধর্মহীন সম্প্রদায় বিশেষ।' ইব্ন আবূ নাজীহও কাতাদাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আতা এবং সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে।

আবুল আলীয়া, রবী' ইব্ন আনাস, আবূ শা'ছা, জাবির ইব্ন যায়দ, যিহাক ও ইসহাক ইব্ন্ রাহবিয়াহ বলেন ঃ

'সাবেঈনরাও আহলের কিতাবের একটি শাখা। তাহারা হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ 'যবূর' কিতাব পড়িয়া থাকে।'

এই ব্যাখ্যার আলোকেই ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম ইসহাক বলেন– সাবেঈদের জবাই করা গোশত খাওয়া ও তাহাদের কন্যাগণকে বিবাহ করা হালাল।

মিতরাফের বরাত দিয়া হাশিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, মিতরাফ বলেন ঃ

'একদা আমরা হাকাম ইব্ন উৎবার কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন কূফার এক ব্যক্তি বলিলেন যে, হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন– 'সাবেঈগণ অগ্নিপূজকদের মতই এক সম্প্রদায়।' ইহা শুনিয়া হাকাম বলিলেন– 'আমি কি ইতিপূর্বে তোমাদের নিকট ইহা বর্ণনা করি নাই ?'

হাসান বসরী (র) হইতে পর্যায়ক্রমে মুআবিয়া ইব্ন আবদুল করীম ও আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী বর্ণনা করেন ঃ 'সাবেঈগণ ফেরেশতা উপাসক এক সম্প্রদায়।'

হাসান হইতে পর্যায়ক্রমে সুলায়মান, মু'তামার ইব্ন সুলায়মান, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

'একদা কূফার শাসনকর্তা যিয়াদের নিকট বলা হইল, সাবেঈগণ বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। তাই তাহাদের জিযিয়া কর প্রত্যাহার করা হউক। ইহা শুনিয়া তিনি জিযিয়া প্রত্যাহারের মনস্থ করিলেন। অতঃপর তাহার নিকট খবর আসিল যে, তাহারা ফেরেশতা উপাসক সম্প্রদায়।

আবূ জা'ফর রাযী বলেন ঃ 'আমি জানিতে পাইয়াছি যে, সাবেঈগণ ফেরেশতা পূজা করে, যবূর তিলাওয়াত করে ও কিবলামুখী হইয়া নামায পড়ে। কাতাদাহ হইতে সাঈদ ইব্ন আরূবাহ অনুরূপ বর্ণনা করেন।

আবূ যানাদ হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আবূ যানাদ, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

'সাবেঈগণ ইরাকের নিকটবর্তী 'কাওছা' নামক স্থানের অধিবাসী। তাহারা সকল নবীর উপর ঈমান রাখে, বৎসরে ত্রিশদিন রোযা রাখে ও প্রতিদিন পাঁচবার ইয়ামান দেশের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়ে।'

একদা ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহর নিকট সাবেঈদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন ঃ 'তাহারা একত্ববাদী। তাহাদের নিকট আমল করিবার কোন কিতাব নাই। তথাপি তাহারা কোন কুফরী করে না।'

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাব বর্ণনা করেন ঃ সাবেঈরা মোসেল দ্বীপের অধিবাসী এক ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায়। তাহারা একত্ববাদী। 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রভু নাই'– এইটুকুই তাহারা জানে ও মানে। তাহারা কোন নবী বা আসমানী কিতাবের উপর ঈমান রাখে না। তাহাদের এই একত্ববাদের সহিত মুসলমানদের সাদৃশ্যের কারণে মক্কার মুশরিকরা মুসলমানগণকে সাবেঈ বলিত।

ভাষাবিদ খলীল বলেন– সাবেঈগণ নাসারাদের মতই একটি ধর্ম বিশ্বাসী সম্প্রদায়। তাহারা দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া নামায পড়ে এবং নিজদিগকে নূহ (আ)-এর অনুসারী মনে করে।

মুজাহিদ, হাসান ইব্ন আবূ নাজীহ হইতে ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন ঃ সাবেঈদের ঈমান-আকীদা ইয়াহুদী ও অগ্নিপূজকদের ঈমান-আকীদার সংমিশ্রণে গঠিত। তাহাদের জবাই করা পশু খাওয়া বা তাহাদের নারীগণকে বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য হালাল ও জায়েয নহে।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ জনৈক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সাবেঈ সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামতের আলোকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাহারা তাওহীদপন্থী হলেও নক্ষত্রকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ও মানব জীবনে প্রভাব বিস্তারক বলিয়া মনে করে।

আবূ সাঈদ ইস্তাখরীর নিকট সাবেঈদের সম্পর্কে ফতোয়া চাওয়া হইলে তাহাদের উপরোক্ত আকীদার কারণে তিনি তাহাদিগকে 'কাফির' বলিয়া ফতোয়া দেন।

ইমাম রাযী বলেন– সাবেঈগণ এই বিশ্বাসে নক্ষত্রপূজা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নক্ষত্রমণ্ডলীকে দোয়া ও ইবাদতের কা'বা বা লক্ষ্যস্থল বানাইয়াছেন। অন্য কথায় আল্লাহ্ তা'আলা এই বস্তুজগতের পরিচালনার দায়িত্ব নক্ষত্রমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত করিয়াছেন।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ ইমাম রাযীর উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'কাশরানী' গণকে সাবেঈন বলা যায়। কাশরানীগণ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগের নক্ষত্রপূজারী সম্প্রদায়। তিনি তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট বলিয়া অভিহিত করেন।

একদল আহলে ইলম বলেন ঃ যাহাদের নিকট কোন নবীর দাওয়াত পৌঁছে নাই তাহারাই 'সাবেঈন' নামে খ্যাত। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

সাবেঈগণ সম্পর্কে মুজাহিদ ও তাঁহার অনুগামীবৃন্দ এবং ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহর মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয়। তাঁহারা বলেন ঃ 'সাবেঈগণ ইয়াহূদী, নাসারা, অগ্নিপূজক ও মুশরিকদের মত কোন ধর্ম মানিয়া চলে না। তাহারা সহজাত আকীদা-বিশ্বাস ও তদনুরূপ আমল-আখলাকের একটি সম্প্রদায়। যেহেতু তাহারা প্রচলিত সকল ধর্মমত হইতে মুক্ত থাকে, তাই মক্কার মুশরিকরা মুসলমানগণকে প্রচলিত সকল ধর্মমত অস্বীকার করার কারণে 'সাবেঈ' নাম দিয়াছিল।' আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা ও শাস্তি

(٦٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

(٦٤) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

৬৩. আর যখন আমি তোমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিলাম ও তোমাদের উপর পাহাড় তুলিয়া ধরিয়া (বলিলাম) আমি যাহা প্রদান করিতেছি তাহা শক্ত হাতে ধারণ কর এবং উহাতে যাহা কিছু আছে তাহা হইতে উপদেশ গ্রহণ কর। তাহা হইলে হয়ত তোমরা পরিত্রাণ পাইবে।

৬৪. অতঃপর তোমরা এই অঙ্গীকার হইতে ফিরিয়া গিয়াছ। যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও অনুকম্পা না হইত তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ ও তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের ব্যাপারটি তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের মাথার উপর পাহাড় তুলিয়া ধরিয়া তাহাদের নিকট হইতে তাওহীদে অবিচল থাকা, তাওরাত আঁকড়াইয়া ধরা ও নবীগণকে অনুসরণ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহারা সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন এবং নবীর পর নবী পাঠাইয়া তাহাদিগকে সৎপথে আনার চেষ্টা করেন।

বনী ইসরাঈলদের মাথার উপর পাহাড় তুলিয়া ধরার কথা নিম্ন আয়াতে সবিস্তারে রহিয়াছে ঃ

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهُ ظُلَّةٌ وَّ ظَنُّوْا اَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوْا مَا اٰتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ ـ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

'আর যখন আমি তাহাদের মাথার উপর পাহাড় তুলিয়া ধরিলাম যেন উহা একটি চাঁদোয়া ছিল আর তাহারা ভাবিতেছিল উহা তাহাদের মাথার উপর পতিত হইবে। (আমি বলিলাম) আমি যাহা (তাওরাত) প্রদান করিতেছি তাহা শক্ত হাতে আঁকড়াইয়া রাখ আর উহাতে যাহা কিছু আছে তাহা হইতে উপদেশ গ্রহণ কর। হয়ত তোমরা পরিত্রাণ পাইবে।'

الطور। অর্থ পর্বত বা পাহাড়। সূরা আ'রাফের এতদসংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যায়ও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আতা, ইকরামা, হাসান, যিহাক, রবী' ইব্ন আনাস প্রমুখ তাফসীরকারগণ الطور। শব্দের উক্ত অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এক বর্ণনা মতে الطور। অর্থ উদ্ভিদ উৎপাদনক্ষম পাহাড় বা পর্বত। যে পাহাড় বা পর্বতে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় না উহাকে 'তূর' বলা হয় না।

ফিতনা সম্পর্কিত এক হাদীছে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বনী ইসরাঈলগণ যখন আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য অস্বীকার করিতেছিল, তখন তাহাদের স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মাথার উপর পাহাড় তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

সুদ্দী বলেন- তাহারা সিজদা করিতে অসম্মত হইলে আল্লাহ্ পর্বতকে তাহাদের উপর নিপতিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। পর্বত তাহাদিগকে প্রায় আবৃত করিয়া ফেলিল। তখন তাহারা সিজদায় পড়িয়া গেল। তাহারা দেহের এক পার্শ্ব মাটিতে রাখিয়া সিজদা করিতেছিল ও অন্য পার্শ্ব উপরের দিকে রাখিয়া পতনোন্মুখ পাহাড়ের দিকে তাকাইতেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিলেন। তাহাদের উপর হইতে পর্বত অপসারণ করিলেন। তখন তাহারা বলিল- আল্লাহ্র কসম! যেই সিজদার ফলে গযব ও আযাব অপসৃত হইল, কোন সিজদাই আল্লাহ্র নিকট উহা হইতে প্রিয় হইতে পারে না। তাই এখনও তাহারা সেইরূপে সিজদা করিয়া থাকে। এই ঘটনাই وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ আয়াতাংশে বর্ণিত হইয়াছে।

হাসান বলেন- خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে যে তাওরাত কিতাব দান করিলাম উহা মজবুতভাবে ধারণ কর।

আবুল আলীয়া ও রবী' ইব্ন আনাস বলেন- بقوة অর্থাৎ আনুগত্যের সহিত।

মুজাহিদ বলেন ঃ بقوة অর্থাৎ উহা আমল করিয়া।

কাতাদাহ বলেন ঃ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি উহা শক্ত হাতে ধরিয়া রাখ। নতুবা তোমাদের মাথার উপর পর্বত নিক্ষেপ করিব। তাই তাহারা আল্লাহ্র কালাম শক্তভাবে ধরিয়া রাখার অঙ্গীকার করিল।

আবুল আলীয়া ও রবী' ইব্ন আনাস বলেন ঃ وَاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ অর্থাৎ তাওরাতে যাহারা কিছু লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা তিলাওয়াত কর ও আমল কর। ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ অর্থাৎ সুদৃঢ় অঙ্গীকারের পর তোমরা তাহা ভঙ্গ করিয়াছ।

فَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাদিগকে কৃপার দৃষ্টিতে না দেখিতেন এবং তোমাদের কাছে নবী-রসূলগণকে না পাঠাইতেন তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হইতে।

(٦٥) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ۝

(٦٦) فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

৬৫. আর তোমাদের যাহারা শনিবারে বাড়াবাড়ি করিয়াছিল অবশ্যই তোমরা তাহাদিগকে জান। অনন্তর আমি তাহাদিগকে বলিলাম– 'লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও।'

৬৬. অতঃপর আমি উহাকে সমসাময়িক ও পরবর্তী লোকদের জন্য একটি উদাহরণ ও উপদেশ বানাইলাম।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে ইয়াহুদীদের শনিবার সম্পর্কিত বিধান অমান্য করা, পরিণামে তাহাদের বানর হইয়া যাওয়া ও উহা সকলের জন্য উপদেশ হওয়া, প্রধানত এই তিনটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

ইয়াহুদীদের জন্য শনিবারে মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তাই এই দিনে সমুদ্রোপকূলের জলাভূমিতে প্রচুর মৎস্যের সমাগম হইত। উহার সন্নিহিত জনপদের ইয়াহুদী বাসিন্দারা উক্ত মৎস্য শিকারের এক ফন্দি বাহির করিল। শনিবারে তাহারা মৎস্য সমাগমের জলাভূমি আবদ্ধ করিয়া রাখিত। শনিবারের পরে তাহারা আবদ্ধ মৎস্যগুলি ধরিয়া আনিত। তাহাদের এই বাঁদরামী ফন্দির কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বানর বানাইয়া দিলেন।

মানুষ ও বানরের বাহ্যিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও যেরূপ মানুষ ও বানর এক নহে, তেমনি শনিবারে আবদ্ধ করিয়া রবিবারে মাছ ধরাটা বাহ্যত বৈধ দেখাইলেও মূলত বৈধ ছিল না। বানর-মানুষের সাদৃশ্যরূপ বৈধ-অবৈধের এই সাদৃশ্যটিকে কৌশল হিসাবে ব্যবহারের অপরাধে তাহাদিগকে বানরে রূপান্তরিত করা হয়।

সূরা আ'রাফের নিম্নোক্ত আয়াতে উহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لاَيَسْبِتُوْنَ لاَتَأْتِيْهِمْ ـ كَذَالِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ـ

'আর তাহাদিগকে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, যখন তাহারা শনিবারের বিধানের সীমার লঙ্ঘন করিয়াছিল। মৎসগুলি শনিবারে আসিয়া তাহাদের কাছে ভীড় জমাইত এবং অন্যান্য দিন আসিত না। পাপাসক্তদের আমি এইভাবেই পরীক্ষা করি।'

সুদ্দী বলেন– আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত জনপদটির নাম 'ঈলা'। কাতাদাহও তাহাই বলেন। সূরা আ'রাফে ইনশাআল্লাহ্ সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন তাফসীরকারের মতামত সবিস্তারে আলোচনা করিব। এই ব্যাপারে আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভর করিতেছি।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ অর্থাৎ হে বনী ইসরাঈল! তোমাদের যাহারা শনিবারের বিধানের সীমালজ্ঘন করিয়াছিল তাহাদের আযাবের কথা অবশ্যই তোমরা জান।

فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَسِئِيْنَ পরিণামে তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা ঘৃণ্য বানর হইয়া যাও। মুজাহিদ হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আবূ নাজীহ, শিব্ল, আবূ হুযায়ফা, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

'সেই ইয়াহুদীরা বাহ্যত বানর হয় নাই। তবে তাহাদের অন্তঃকরণ বানরের অন্তঃকরণ হইয়া গিয়াছিল।' উহা আল্লাহ্ তা'আলার উদাহরণ ও সাদৃশ্যমূলক নির্দেশ ছিল। যাহার অর্থ বানরের চরিত্রের অধিকারী হও। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র এইরূপ উদাহরণমূলক বক্তব্য পেশ করেন ঃ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا 'তাহাদের উদাহরণ হইল গর্দভ যাহা শুধু কিতাবের বোঝা বহন করে।'

মুজাহিদ হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আবূ নাজীহ, ঈসা, আবূ হুযায়ফা, মুহাম্মদ ইব্ন উমর বাহিলী আবূ আসিম, মুছান্না ও ইমাম ইব্ন জারীরও অনুরূপ বর্ণনা করেন। উহার সনদ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। তবে আলোচ্য আয়াত ও এতদসম্পর্কিত অন্যান্য আয়াত দ্বারা স্পষ্টত যাহা প্রতীয়মান হয় মুজাহিদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা তাহার পরিপন্থী। তাই অন্যান্য তাফসীরকার তাঁহার ব্যাখ্যা সমর্থন করেন নাই। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَالِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ - مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ -

'তুমি বল, উহা হইতে নিকৃষ্টতম পরিণাম ও প্রতিদানের কথা আমি কি তোমাদিগকে অবহিত করিব? তাহা হইল যাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলা লা'নত বর্ষণ করিয়াছেন ও গযব নাযিল করিয়াছেন এবং যাহাদের একদলকে বানর-শূকর বানাইয়াছেন ও অপর দলকে শয়তানের দাসে পরিণত করিয়াছেন।'

আওফী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে হযরত আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির একদল লোককে বানর ও শূকর বানাইয়াছিলেন। তাহাদের যুবকরা বানর ও বৃদ্ধরা শূকর হইয়াছিল।'

কাতাদাহ হইতে বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ শায়বান আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ বনী ইসরাঈলদের নর ও নারী উভয় শ্রেণীর মধ্য হইতে একদল বানর হইয়া লেজ নাড়াইতে লাগিল।

আতা খুরাসানী বলেন ঃ তাহাদিগকে বলা হইল- 'হে জনপদের বাসিন্দাবৃন্দ! তোমরা ঘৃণ্য বানর হইয়া যাও।' তাহারা তাহাই হইল। তাহাদিগকে যাহারা সীমালজ্ঘন করিতে বারণ করিয়াছিল তাহারা তাহাদের নিকট গিয়া বলিল- হে অমুক অমুক! আমরা কি তোমাদিগকে নিষেধ করি নাই? 'তাহারা মাথা নাড়িয়া 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর দিল।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুজাহিদ, ইব্‌ন আবূ নাজীহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম তায়েফী, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন রবীআ, আলী ইব্‌ন হাসান ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

'যাহারা শনিবারে সীমালঙ্ঘন করিয়াছিল তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা বানর বানাইয়া অত্যল্পকাল জীবিত রাখেন। তাহারা বানর হইয়া বংশবৃদ্ধির পূর্বেই মারা যায়। তাই তাহাদের কোন বংশধর নাই।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা একদল বনী ইসরাঈলকে তাহাদের অবাধ্যতার কারণে বানর বানাইয়াছিলেন। এই ধরনের রূপান্তরিত প্রাণী কখনও তিন দিনের বেশী বাঁচে না। তাহারাও মাত্র তিনদিন বাঁচিয়া ছিল। দুশ্চিন্তায় তাহারা পানাহার ও প্রজনন ক্রিয়ার কোনটিই তখনও করে নাই।' কুরআনের অন্যত্র আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বানর-শূকরসহ সমগ্র সৃষ্টি মাত্র ছয় দিনে সম্পন্ন করেন। তাহাদিগকে বানর-শূকর বানাইয়াছেন মুহূর্তের মধ্যে। এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলা যখন যাহা যেরূপে চাহেন করিতে পারেন।

আবুল আলীয়া হইতে পর্যায়ক্রমে রবী' ও আবূ জা'ফর বর্ণনা করেন ঃ قِرَدَةً خَسِئِيْنَ অর্থাৎ ঘৃণ্য বানর সকল। মুজাহিদ, কাতাদাহ, রবী' ও আবূ মালিক হইতেও উহার অনুরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, দাউদ ইব্‌ন আবুল হাসীন ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ

'আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার জন্য যেভাবে জুম'আর দিনকে (সাপ্তাহিক) উৎসবের দিন বানাইয়াছেন, তেমনি বনী ইসরাঈলদের জন্যও উহাকে (সাপ্তাহিক) উৎসবের দিন বানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাহা অমান্য করিয়া শনিবারকে তাহাদের উৎসবের দিন বানাইল। সেই দিনটিকে তাহারা বিরাট মর্যাদার দিন মনে করিত। তাহাদের এই মনগড়া মর্যাদার দিনটি তাহারা কিছুতেই ছাড়িতে রাযী হইল না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তিস্বরূপ অন্যান্য দিন যাহা তাহাদের জন্য বৈধ শনিবারে তাহা অবৈধ করিলেন। তাহারা ছিল 'ঈলা' ও 'তূর' পাহাড়ের মধ্যবর্তী মাদায়েন এলাকার বাসিন্দা। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য শনিবারে মৎস্য শিকার ও ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেন। অথচ শনিবারেই সমুদ্র উপকূলবর্তী তাহাদের এলাকার জলাশয়ে মৎসকুল বিপুল সংখ্যায় আসিয়া জমায়েত হইত। শনিবার পার হইলেই সেইগুলি অদৃশ্য হইত। আবার শনিবার আসিলে সংগোপনে সমবেত হইত। এইভাবে দীর্ঘদিন দেখিয়া মৎস্যানুরাগীরা ধৈর্য হারাইল। একদিন তাহাদের একজন গোপনে একা শনিবারে একটি মাছ ধরিয়া উহা সুতায় বাঁধিয়া একটি খুঁটির সহিত জুড়িয়া রাখিল। পরদিন উহা তুলিয়া বাড়ী লইয়া গেল। ভাবখানা এই— যেন সে শনিবারে মাছ ধরে নাই। এইরূপে সে পরবর্তী শনিবারেও করিল। ইত্যবসরে তাহার মৎস্য পাক ও ভক্ষণের ঘ্রাণ পাইয়া অন্যরা বলিল– আমরা তোমার চালাকি বুঝিতে পারিয়াছি। অতঃপর তাহারাও সেই পথ অনুসরণ করিল। এইভাবে কিছুদিন গোপন কারবার চলিল। তখনও আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে কোন শাস্তি প্রদান করিলেন না। অতঃপর তাহারা বেপরোয়া হইয়া শনিবারে প্রকাশ্যে মাছ ধরিয়া হাট-বাজারে বেচা-কেনা আরম্ভ করিল। এতদ্দর্শনে তাহাদের পুণ্যবানরা নিষেধ করিতে লাগিল এবং তাহা সত্ত্বেও তাহারা উহা

চালাইতে লাগিল। যাহারা নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়া মাছও ধরিত না, নিষেধও করিত না, তাহারা নিষেধকারীগণকেও ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়িয়া নীরব ভূমিকা গ্রহণের আহবান জানাইল। তাহাদের যুক্তি ছিল এই যে, যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তি দিবেন কিংবা ধ্বংস করিবেন তাহারা কিছুতেই উপদেশ শুনিবে না। কিন্তু বারণকারীরা যুক্তি দেখাইল যে, তাহারা শুনুক বা না শুনুক, আমরা আমাদের দায়িত্বে অবহেলার জন্য আল্লাহ্র দরবারে পাকড়াও হইব না। তাহা ছাড়া উপদেশ শুনিতে শুনিতে হয়ত তাহাদের ভিতরেও শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে।

একদিন বনী ইসরাঈলদের এক জমায়েতে হাজির হইয়া ফরমাঁবরদারগণ নাফরমানদিগকে অনুপস্থিত দেখিতে পাইল। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিয়া তাহাদের খোঁজখবর লইতে গেল। তাহারা ভাবিয়াছিল, হয়ত কোন জরুরী কাজে জড়াইয়া সেই লোকগুলি উপস্থিত হইতে পারে নাই। কিন্তু তাহারা গিয়া দেখিতে পাইল, তাহারা রাত্রিতে যে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া নিদ্রা গিয়াছিল তাহা সবই বন্ধ রহিয়াছে। উহার ফাঁক দিয়া তাহারা দেখিতে পাইল যে, তাহাদের নর-নারী ও শিশু সকলেই বানর হইয়া গিয়াছে।

অবশেষে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যদি আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাকে সুস্পষ্ট না জানাইতেন যে, তাহাদের নিষেধকারীরা মুক্তি পাইয়াছে, তাহা হইলে বলিতাম, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সকলকেই ধ্বংস করিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন ঃ وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ আয়াতাংশে যে জনপদের কথা বলা হইয়াছে তাহারা সেই জনপদের অধিবাসী।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাকও প্রায় অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

সুদ্দী বলেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বনী ইসরাঈলগণ 'ঈলা' নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। উক্ত জনপদটি সমুদ্র তীরবর্তী একটি জনপদ ছিল।' আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদীদের জন্য শনিবারে কোন কাজ করা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। অথচ সেইদিন সমুদ্রের অজস্র মাছ আসিয়া তাহাদের এলাকায় জড়ো হইত। সংখ্যাধিক্যের কারণে সেইগুলির গোঁফ পানিতে ভাসিতে থাকিত। শনিবার পার হইলেই তাহারা গভীর সমুদ্রে চলিয়া যাইত। এই মাছ সম্পর্কিত ঘটনাই আল্লাহ্ তা'আলা وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لاَيَسْبِتُوْنَ لاَتَأْتِيْهِمْ। আয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ উহারা শুধু শনিবারে সমবেত হইত এবং অন্যান্য দিন উধাও হইত।

এতদ্দর্শনে কিছু লোক মাছের প্রতি প্রলুব্ধ হইল। তাহারা সমুদ্রোপকূলে জলাশয় গড়িয়া সমুদ্রের সহিত সংযোগ খাল রাখিল। শনিবারে উহা খোলা রাখিত। সমুদ্রের ঢেউ মাছগুলিকে ঠেলিয়া সংযোগ খাল দিয়া জলাশয়ে পৌঁছাইত। ঢেউ নামিয়া গেলে সংযোগ খালে পানির স্বল্পতার দরুন মাছগুলি আর যাইতে পারিত না। রবিবার দিন আসিয়া তাহারা উহা ধরিয়া নিত। তাহাদের বাড়ীতে যখন মাছ ভাজা হইত, গন্ধ পাইয়া প্রতিবেশীরা জানিয়া ফেলিত, ফলে তাহারাও সেইভাবে মাছ ধরা শুরু করিত। এইভাবে গোটা এলাকায় শনিবারে মাছ ধরার কাজ ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের এই পাপাচারে শংকিত আলিমগণ তাহাদিগকে বলিলেন- হায়, হায়, শনিবারে মাছ ধরা তোমাদের জন্য হারাম হওয়া সত্ত্বেও তোমরা তাহা করিতেছ? তাহারা জবাব দিল- কৈ না তো? আমরা তো রবিবারে মাছ ধরি। আলিমরা বলিলেন-

তোমরা যেহেতু শনিবারে সংযোগ খাল খোলা রাখিয়া মাছ ঢুকিতে দিয়া শনিবারেই উহা বন্ধ করিয়া মাছ আটক কর, তাই শনিবারেই তোমাদের মাছ ধরা হইতেছে। তাহারা আলিমদের এই যুক্তি মানিল না এবং নির্দ্বিধায় পাপ কার্য চালাইতে লাগিল। এই নিষেধকারী আলিমগণকে অন্য একদল আলিম বলিলেন ঃ

لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا نِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا 'কেন অনর্থক সেই জাতিকে উপদেশ দিতে যাও যাহারা উপদেশ শোনে না? তাহাদিগকে আল্লাহ্ই ধ্বংস করিবেন এবং কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন।'

তাহারা জবাবে বলিলেন ঃ

مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ 'তোমাদের প্রভুর কাছে (দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত) কৈফিয়তের জবাব দিতে পারিব এবং তাহারা হয়ত সতর্ক হইয়া যাইবে এই আশায় উহা করিতেছি।'

ফরমাঁবরদার বান্দাগণ যখন নাফরমানদিগকে কোনমতেই নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাহারা বলিলেন, আমরা তোমাদের সহিত এক সঙ্গে বাস করিব না। এই বলিয়া তাহারা দেওয়াল খাড়া করিয়া জনপদটি বিভক্ত করিয়া লইলেন। ফরমাঁবরদার ও নাফরমানদের যাতায়াতের সদর দরজাও পৃথক হইয়া গেল। একদিন অনুগত দল গ্রামে বাহির হইয়া অবাধ্যগণের কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তাহাদের সদর দরজাও বন্ধ দেখিতে পাইল। তখন তাহারা দেওয়াল টপকাইয়া গিয়া দেখিল, তাহারা সকলেই বানর হইয়া গিয়াছে এবং একটি অপরটির উপর লাফাইয়া পড়িতেছে। তখন অনুগত দল অবাধ্যগণের সদর দরজা খুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বানরগুলি বাহির হইয়া জঙ্গলে চলিয়া গেল। আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রসঙ্গে বলেন ঃ

فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ 'তাহারা যখন নিষিদ্ধ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করিল, তখন আমি বলিলাম, তোমরা ঘৃণ্য বানর হইয়া যাও।'

নিম্নোক্ত আয়াতেও তাহাদের অভিশপ্ত হওয়ার কথা রহিয়াছে ঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ

'বনী ইসরাঈলগণের যাহারা কুফরী করিয়াছিল, তাহারা দাউদ ও ঈসা ইব্ন মরিয়ামের মুখে অভিশপ্ত হইয়াছিল।'

সুদ্দী বলেন– উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত কাফিরগণই বানরে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, বিভিন্ন তাফসীরকারের বর্ণিত ব্যাখ্যা ও ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া আমি ইহার প্রমাণ করিতে চাহিতেছি যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ যাহা বলিয়াছেন তাহা সকল তাফসীরকারের ব্যাখ্যার বিরোধী। সুতরাং মুজাহিদ যে বলিয়াছেন, তাহারা দৈহিক দিক দিয়া নহে, মানসিক দিক দিয়া বানর হইয়াছিল, তাহা ঠিক নহে। সঠিক অভিমত ইহাই যে, তাহারা দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়া বানর হইয়া গিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً 'অনন্তর আমি উহাকে দৃষ্টান্তমূলক বস্তু বানাইলাম।'

উপরোক্ত আয়াতাংশের এ সর্বনামটি কোন্ পদটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা লইয়া তাফসীরকারদের ভিতরে মতভেদ দেখা দিয়াছে। একদল বলেন– উহা القردة (বানরগুলি) পদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। অপরদল বলেন– উহা الحيتان (মাছগুলির) শব্দের পরিবর্তে আসিয়াছে। কেহ বলেন– উহা القرية (জনপদটি) পদের বদলে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ আবার বলেন– العقوبة (শাস্তিটি) পদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। ইমাম ইব্ন জারীর তাঁহার তাফসীরে এই মতগুলির সন্নিবেশ ঘটাইয়াছেন। তবে সঠিক অভিমত এই যে, উহা القرية পদের পরিবর্তে আসিয়াছে। তখন উক্ত আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় ঃ পরিণামে আমি উক্ত জনপদকে (উহার বাসিন্দাসহ) সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত বানাইলাম। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন্ ঃ

فَاَخَذَ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى 'পরিণামে আল্লাহ্ তাহাকে (ফিরাউনকে) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক বস্তু বানাইলেন।'

এখানেও তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ... ... 'জনপদটি সেকালের মানুষ ও পরবর্তীকালের মানুষের জন্য উহা দৃষ্টান্ত হইয়া দাঁড়াইল।'

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে তাফসীরকারদের ভিতর মতভেদ রহিয়াছে। একদল তাফসীরকার বলেন ঃ উহার তাৎপর্য হইল সেই জনপদের সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎভাগে অবস্থিত তখনকার জনপদসমূহ। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, দাউদ ইব্ন হাসীন ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। সাঈদ ইব্ন জুবায়রও প্রায় তদ্রূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং বলেন্– তখন যাহারা সেখানে ও আশে-পাশে ছিল। অনুরূপ অর্থে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ 'আর নিশ্চয় আমি তোমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ জনপদসমূহ ধ্বংস করিয়া দিয়াছি এবং বারবার নিদর্শনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়াছি যেন তাহারা ফিরিয়া আসে।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ـ اَفَهُمُ الْغَالِبُوْنَ 'তাহারা কি দেখে না যে, আমি উহার (মক্কার) চতুষ্পার্শ্বের ভূমি (মুশরিকদের জন্য) ক্রমশ সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি। ইহার পরেও কি তাহারা জয়ী হইবে?'

ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ, কাতাদাহ ও আতিয়্যা আওফী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা বলেন– ما بينها অর্থাৎ উহার পূর্ববর্তী লোকগণ। আবুল আলীয়া, রবী' ও আতিয়্যা বলেন– وما خلفها অর্থাৎ অবাধ্যগণের ধ্বংসের পর অবশিষ্ট বনী ইসরাঈলগণ। উক্ত তাফসীরকারদের মতে, فَجَعَلْنٰهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا অর্থ এই দাঁড়ায় ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে উহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় কালের লোকদের জন্যে উপদেশের বস্তু বানাইয়াছেন।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, উহা পরবর্তী কালের লোকদের জন্য উদাহরণ অবশ্যই হইতে পারে, কিন্তু উহার পূর্ববর্তী লোকদের জন্য উপদেশের বিষয় হইতে পারে না। এইরূপ ব্যাখ্যাকে কেহই বাস্তব ও সঠিক ব্যাখ্যা মনে করিতে পারে না। তাই বলা যায় যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও সাঈদ ইব্ন জুবায়রের ব্যাখ্যাই সঠিক ও বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আবুল আলীয়া হইতে পর্যায়ক্রমে রবী' ইব্ন আনাস ও আবূ জা'ফর রাযী বলেন ঃ

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হইতেছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অতীতের পাপসমূহের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করিলেন।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ ইকরামা, মুজাহিদ, সুদ্দী, ফার্রা এবং ইব্ন আতিয়্যা বলিয়াছেন ঃ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই অপরাধ ও পরবর্তীকালের লোকদের অনুরূপ অপরাধের জন্য উক্ত শাস্তি নির্ধারণ করিলেন।

ইমাম রাযী উক্ত আয়াতাংশের বিভিন্ন তাফসীরকার বর্ণিত তিনটি তাৎপর্য উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

(১) আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে উহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয়কালের লোকদের জন্য উপদেশের বস্তু বানাইয়াছেন। পূর্ববর্তীকালের লোকেরা কিরূপে উপদেশ লাভ করিল? তাহারা আসমানী কিতাবের মাধ্যমে পরবর্তীকালের এই ঘটনা জানিতে পাইয়া উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিল।

(২) আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত জনপদকে উহার আশে-পাশের জনপদের জন্য উদাহরণ দাঁড় করাইলেন।

(৩) আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত শাস্তিকে তাহাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল অপরাধের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বানাইলেন।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, ইমাম রাযীর উদ্ধৃত তিনটি তাৎপর্যের ভিতর দ্বিতীয় তাৎপর্যটিই সঠিক ও বাস্তব। অনুরূপ অর্থে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى 'নিশ্চয় আমি তোমাদের আশে-পাশের জনপদ ধ্বংস করিয়াছি।'

তিনি আরও বলেন ঃ

وَلاَ يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ -

'কাফিরগণ যে অপরাধ করিয়াছে তাহার ফলে তাহাদের উপর অথবা তাহাদের আবাসভূমি সংশ্লিষ্ট এলাকার উপর আকস্মিক বিপদপাত ঘটার রীতি অব্যাহত থাকিবে।'

Contents

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَأْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا 'তাহারা কি দেখিতে পায় না যে, আমি (মুশরিকদের) ভূখণ্ড চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি।'

উপরোল্লেখিত বিশুদ্ধ ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, 'আর আমি উহাকে পরবর্তীকালের লোকদের জন্যও উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত বানাইলাম।'

وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ভীরু লোকদের জন্য উপদেশের বিষয়।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, দাউদ, ইব্ন হাসীন ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন– 'কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক আসিবে তাহাদের সকলের জন্য আমি উহাকে উপদেশের বস্তু বানাইয়াছি।' হাসান এবং কাতাদাহও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন।

সুদ্দী ও আতিয়্যা বলেন– এখানে 'মুত্তাকীন' অর্থ উম্মতে মুহাম্মদী। আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি– এখানে موعظة অর্থ সতর্ককারী বস্তু বা বিষয়। তাই আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হইবে, আমি উহাকে মুত্তাকীদের জন্য সতর্ককারী বিষয় বানাইয়াছি যেন উহা দেখিয়া তাহারা সতর্ক হয় এবং কোনরূপ কূট-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পাপকার্যে লিপ্ত না হয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ সালিমা, মুহাম্মদ ইব্ন উমর, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাবাহ জা'ফরানী, আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ও ইমাম আবূ আবদিল্লাহ ইব্ন বাত্তা বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ ইয়াহূদীগণ যেইরূপ কূট-কৌশল ও কপট যুক্তির আশ্রয় লইয়া আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত হারাম কাজকে হালাল করিয়াছে, তোমরা কখনও সেইরূপ করিও না।

উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। উহার অন্যতম রাবী আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিমকে হাফিজ আবূ বকর খতীব বাগদাদী 'বিশ্বস্ত' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। অন্যান্য রাবীরা বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁহারা নির্ভরযোগ্য রাবী হবার শর্তের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(٦٧) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

৬৭. আর যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে একটি গাভী যবেহ করিতে আদেশ করিতেছেন।' তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের সহিত তামাশা করিতেছ?' মূসা বলিল, 'আউযু বিল্লাহ, আমি তো তাহা হইলে জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন– হে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়! আমার সেই অলৌকিক নিআমতের কথা স্মরণ কর যাহার মাধ্যমে তোমরা একটি গাভী যবেহ করিয়া উহার একাংশের আঘাতে তোমাদের নিহতকে জীবিত করিয়া তাহার হত্যাকারীকে চিহ্নিত করিতে সমর্থ হইয়াছ।

বিস্তারিত ঘটনা

উবায়দা সালমানী হইতে যথাক্রমে হাম্মাদ ইব্ন সিরীন, হিসাম ইব্ন হাস্সান, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সারাহ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

'বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের ভিতর একজন নিঃসন্তান ব্যক্তি ছিল। সে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিল। তাহার ভাবী উত্তরাধিকারী ছিল তাহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র। এক রাত্রে সে পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া তাহার লাশ স্বগোত্রের জনৈক ব্যক্তির গৃহের সামনে রাখিয়া দিল। সকালে উঠিয়া সেই ব্যক্তি ও তাহার দলবলের বিরুদ্ধে তাহার পিতৃব্য হত্যার অভিযোগ আনয়ন করিল। ফলে দুই দলের মধ্যে সশস্ত্র লড়াই শুরু হইল। তখন বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বলিলেন– তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেন তোমরা পরস্পরকে হত্যা করিতেছ? ইহা শুনিয়া তাহারা সঙ্গে সঙ্গে সদলবলে মূসা (আ)-এর নিকট গিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। তিনি বলিলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً 'তোমাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই একটি গাভী যবেহ করিতে আদেশ করিতেছেন।' তাহারা ইহা শুনিয়া বলিল ঃ

أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا 'তুমি কি আমাদের সহিত উপহাস করিতেছ?'

তিনি তদুত্তরে বলিলেন ঃ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ 'আউযু বিল্লাহ, তাহা হইলে তো আমি জাহিলদের দলভুক্ত হইব।'

অতঃপর উবাইদা সালমানী বলেন ঃ 'তাহারা কোন প্রশ্ন না তুলিয়া যে কোন একটি গাভী যবেহ করিলে চলিত। কিন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের জন্য কষ্টসাধ্য নির্দেশ ডাকিয়া আনিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে দুঃসাধ্য নির্দেশ প্রদান করিলেন। তাহারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া এমন এক বিশেষত্বপূর্ণ গাভী যবেহের জন্য আদিষ্ট হইল, যাহা সারাদেশে মাত্র একটিই ছিল এবং উহার মালিক সুযোগ বুঝিয়া উহার চামড়ার থলিতে যে পরিমাণ স্বর্ণ ধরানো যায় তাহাই উহার মূল্যস্বরূপ দাবী করিল। সে পরিষ্কার ঘোষণা করিল– আল্লাহ্র কসম! ইহার কমে আমি গাভী বিক্রয় করিব না। অগত্যা তাহারা সেই মূল্যে গাভী খরিদ করিল। তারপর উহা যবেহ করিয়া উহার একটি অংশ মৃত ব্যক্তির দেহে লাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে জীবিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। সকলে জিজ্ঞাসা করিল– তোমার হত্যাকারী কে? সে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখাইয়া বলিল– এই ব্যক্তি। ইহা বলিয়াই সে মরিয়া গেল। ফলে হন্তা ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার সম্পত্তির সামান্যতম অংশও পাইল না। এই ঘটনার পর হইতে আর কোন হত্যাকারী নিহতের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় নাই।'

ইমাম ইব্ন জারীর প্রায় অনুরূপ আরেকটি রিওয়ায়েত উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন হইতে উর্ধ্বাংশে অভিন্ন ও নিম্নাংশে আইউব ও অন্যান্য রাবীর ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আব্দ ইব্ন হামীদ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উহাকে অন্যতম রাবী ইয়াযীদ ইব্ন হারূন হইতে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আদম ইব্ন আবূ ইয়াস নিজ তাফসীরে উহার অপর এক রাবী হিশাম ইব্ন হাস্সান হইতে উর্ধ্বাংশ অভিন্ন সনদে ও নিম্নাংশে আবূ জা'ফর রাবীর সনদে উহা বর্ণনা করেন।

আবুল আলীয়া হইতে যথাক্রমে আবূ জা'ফর রাযী ও আদম ইব্ন আবূ ইয়াস নিজ নিজ তাফসীরে বর্ণনা করেন ঃ 'বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে নিঃসন্তান এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। তাহার এক নিকটাত্মীয় ব্যক্তি তাহার ভাবী উত্তরাধিকারী ছিল। একদিন সে আশু সম্পদ লাভের আশায় তাহাকে হত্যা করিয়া চৌরাস্তার মোড়ে লাশটি রাখিয়া দিল। অতঃপর সে মূসা (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিল– হে আল্লাহ্র নবী! আমার নিকটাত্মীয় ব্যক্তি নিহত হইয়াছে। ফলে আমার উপর এক বড় বিপদ নামিয়া আসিয়াছে। আমার আত্মীয়ের হত্যাকারীকে আপনি ছাড়া কেউ চিহ্নিত করিতে পারিবে না।

মূসা (আ) তখন সকলকে ডাকিয়া বলিলেন– আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়া বলিতেছি, এই ব্যাপারে কাহারও কিছু জানা থাকিলে সে যেন অবশ্যই আমাকে জানায়। তাহাদের কাহারও এই ব্যাপারে কিছু জানা না থাকায় তাহারা কেহই কিছু বলিতে পারিল না। তখন নিহতের নিকটাত্মীয় ব্যক্তিটি আরয করিল– হে আল্লাহ্র নবী! আপনি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমার আত্মীয়ের হন্তার নাম বলিয়া দেন। সে মতে মূসা (আ) আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযিল করিলেন– اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি গাভী যবেহ করিতে বলিতেছেন। বনী ইসরাঈলগণ অবাক হইয়া বলিল– اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا আপনি কি আমাদের সহিত ঠাট্টা করিতেছেন? তিনি বলিলেন– اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ অর্থাৎ 'আউযু বিল্লাহ, আমি তাহা হইলে জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

তখন তাহারা বলিল ঃ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا অর্থাৎ আপনি আপনার প্রভুকে বলুন তিনি যেন আমাদিগকে গাভীর পরিচয় বলিয়া দেন।

মূসা (আ) বলিলেন ঃ

اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ

অর্থাৎ প্রভু বলিতেছেন, গাভীটি না বৃদ্ধা হইবে, না যুবতী? বরং উহা হইবে মাঝামাঝি বয়সের। এখন তোমরা তোমাদের জন্য আদিষ্ট কাজটি কর।

তাহারা আবার বলিল ঃ

اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا অর্থাৎ আপনার প্রভুকে বলুন তিনি যেন আমাদিগকে গাভীর রঙ বলিয়া দেন।

তিনি বলিলেন ঃ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয় প্রভু বলিতেছেন, উহা হলুদ রঙের গাভী। উহার রঙ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হইবে যেন দর্শকদের চোখ তৃপ্ত হয়।

তাহারা তখন বলিল ঃ

ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ -

অর্থাৎ আপনার প্রভুকে বলুন, তিনি যেন আমাদিগকে আদিষ্ট গাভীটির পূর্ণ পরিচয় দান করেন। কারণ, উহার পরিচয় আমাদের কাছে অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। তাহা হইলে ইনশা আল্লাহ্ আমরা অবশ্যই চিনিতে পারিব।

তিনি বলিলেন ঃ

اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الاَرْضَ وَلاَتَسْقِى الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيْهَا -

অর্থাৎ প্রভু বলিতেছেন, উহা এমন নিখুঁত গাভী হইবে যাহা লাঙ্গল টানে না আর জমি সেচের কাজও করে না। উহাতে কোন দাগ থাকিতে পারিবে না এবং উহা হইবে পরিপূর্ণ সুস্থ ও সবল।

তাহারা তখন বলিল ঃ

اَلْئٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ এতক্ষণে আপনি সঠিক পরিচয় প্রদান করিলেন। فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ অতঃপর তাহারা উহা যবেহ করিল। মূলত তাহারা উহা করিতে প্রস্তুত ছিল না।

অতঃপর আবুল আলীয়া বলেন ঃ 'বনী ইসরাঈলরা গাভী যবেহ করিতে আদিষ্ট হইবার পর যদি কোন প্রশ্ন না তুলিয়া যে কোন একটি গাভী যবেহ করিত তাহাতেই অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া সহজ কাজটি কঠোর ও জটিল করিয়া নিয়াছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে কঠোরতা ও জটিলতায় নিপতিত করিলেন। অবশেষে যদি তাহারা 'ইনশা আল্লাহ্ গাভী চিনিতে পারিব' কথাটি না বলিত, তাহা হইলে কোনদিনই উদ্দিষ্ট গাভী পাইত না।

আবুল আলীয়া আরও বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গাভী জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা ছাড়া আর কাহারও নিকট ছিল না। মহিলাটিকে কতকগুলি ইয়াতীম শিশু-কিশোরের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করিতে হইত। যখন সে জানিতে পাইল যে, তাহার গাভীটি ছাড়া তাহাদের অন্য কোন গাভীতে কার্য সিদ্ধি হইবে না, তখন সে উহার জন্য চড়া মূল্য হাঁকিয়া বসিল। তাহারা বিষয়টি হযরত মূসা (আ)-এর গোচরে আনিল। তিনি বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা তো তোমাদিগকে একটি সহজ কাজের নির্দেশ দিয়াছিলেন। তোমরা নিজেরা উহাকে জটিল করিয়া লইয়াছ। এখন মহিলা যে দাম চায় সেই দাম দিয়াই খরিদ কর। তাহারা অগত্যা তাহাই করিল। অতঃপর তাহারা উহা যবেহ করিলে মূসা (আ) উহার একটি অংশ নিয়া নিহত ব্যক্তির দেহে আঘাত করা মাত্র সে জীবিত হইয়া তাহার হত্যাকারীর নাম বলিয়া দিল। তারপর আবার সে মৃত হইল। হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হইল। হযরত মূসা (আ)-এর কাছে যে ব্যক্তি অভিযোগ নিয়া আসিয়াছিল সেই ব্যক্তিই হন্তা ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপে তাহার পাপের শাস্তি প্রদান করিলেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে সাঈদের পিতামহ, সাঈদের পিতৃব্য, সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত মূসা (আ)-এর কালে বনী ইসরাঈলদের ভিতর জনৈক নিঃসন্তান ধনাঢ্য বৃদ্ধ ছিল। তাহার কতিপয় ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। তাহারা ছিল দরিদ্র। তাহারাই তাহার ভাবী উত্তরাধিকারী ছিল। তাহারা বলাবলি করিত– আহা, আমাদের চাচা যদি মারা যাইত তাহা হইলে আমরা এক্ষুণি তাহার সম্পত্তি পাইয়া যাইতাম। কিন্তু এই সব আলোচনার পর যখন দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে মরিল না, তখন তাহারা ধৈর্য হারাইল। এই সুযোগে শয়তান আসিয়া তাহাদিগকে পরামর্শ দিল– তোমরা কি তোমাদের চাচাকে হত্যা করিয়া একদিকে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে ও অন্যদিকে তাহাকে পার্শ্ববর্তী শহরের কাছে ফেলিয়া আসিয়া সেখানকার বাসিন্দাদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের টাকা পাইতে পার না?

উল্লেখ্য যে, তৎকালে বনী ইসরাঈলগণ পাশাপাশি দুইটি শহরে বাস করিত। কোন নিহত ব্যক্তির লাশ দুই শহরের মধ্যবর্তী রাস্তায় পাওয়া গেলে উহা যে শহরের অধিকতর নিকটে পাওয়া যাইত, হত্যাকারীর হদিস না পাওয়া গেলে সেই শহরের বাসিন্দাগণকেই নিহতের আত্মীয়-স্বজনকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইত। যাহা হউক বৃদ্ধের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাহাকে হত্যা করিয়া রাতের আঁধারে তাহার লাশ পার্শ্ববর্তী শহরের প্রবেশদ্বারে রাখিয়া গেল। সকালে গিয়া তাহারা সেই শহরবাসীগণকে বলিল– তোমরা আমাদের পিতৃব্যকে হত্যা করিয়াছ। এখন আমাদিগকে তাহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে। তাহারা বলিল– আল্লাহ্র কসম! আমরা তাহাকে হত্যা করি নাই এবং কে হত্যা করিয়াছে তাহাও আমরা জানি না। এমনকি গত রাতে ফটক বন্ধ করিবার পর আর উহা খুলিও নাই। বৃদ্ধের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাহাতে নিরস্ত না হওয়ায় শহরবাসীগণ গিয়া হযরত মূসা (আ)-কে ঘটনা অবহিত করিলেন। তখন তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিলেন। ইত্যবসরে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ওহীর মাধ্যমে খবর পাঠাইলেন যে, তুমি তাহাদিগকে বল ঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে একটি গাভী যবেহ করিয়া উহার একাংশ দিয়া নিহত ব্যক্তির দেহে আঘাত করিতে বলিতেছেন।'

সুদ্দী বলেন– বনী ইসরাঈল গোত্রে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। তাহার একটি কন্যা ও একটি দরিদ্র ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। একদা ভ্রাতুষ্পুত্রটি তাহার কন্যাকে বিবাহ করার জন্য তাহার নিকট প্রস্তাব পাঠাইল। পিতৃব্য উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখান করিল। যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সিদ্ধান্ত নিল যে, সে তাহার পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া কন্যা ও সম্পদ সবই হস্তগত করিবে। একদিন একদল ব্যবসায়ী বনী ইসরাঈলদের অন্য শাখার নিকট তাহাদের পণ্য সম্ভার বিক্রয়ের জন্য আসিল। তখন যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র বৃদ্ধের নিকট গিয়া বলিল– চাচা, আপনি আমাকে সঙ্গে করিয়া ব্যবসায়ীদের নিকট গিয়া ব্যবসার জন্য আমাকে কিছু পণ্য সম্ভার দিতে বলিলে তাহারা দিবে এবং আমি উহাতে বেশ লাভবান হইব।

পিতৃব্য ভ্রাতুষ্পুত্রের কথায় সম্মত হইয়া রাত্রি বেলায় তাহার সহিত বাড়ী হইতে বাহির হইল। ভাতিজা তাহাদের এলাকায় পৌছিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া সেখানে রাখিয়া আসিল। সকালে তাহাকে তালাশ করিবার নামে সেখানে পৌছিয়া এমন ভাব দেখাইল যে, সে কিছুই জানে না। লাশের পাশে যাহারা ভীড় জমাইয়াছিল সে তাহাদিগকে অভিযুক্ত করিয়া বলিল– 'তোমরাই আমার চাচাকে হত্যা করিয়াছ। অতএব তোমরা আমাকে এখন হত্যার ক্ষতিপূরণ প্রদান কর।' এই বলিয়া সে 'চাচা' 'চাচা' বলিয়া বিলাপ শুরু করিল এবং নিজের মাথায় ধূলি

মাখিতে লাগিল। অতঃপর সে মূসা (আ)-এর নিকট গিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে পিতৃব্য হত্যার অভিযোগ দায়ের করিল। হযরত মূসা (আ) অভিযুক্তদের নির্দেশ দিলেন ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য। তাহারা আরজ করিল– 'হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি লোকটির হত্যাকারীর নাম আমাদিগকে জানাইয়া দেন। তাহা হইলে প্রকৃত হত্যাকারী শাস্তি পাইবে। আল্লাহ্র কসম! নিহত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ দিতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু এই যুবকটির কারণে আমরা অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া ধিকৃত জীবন যাপন করিতে লজ্জাবোধ করিতেছি।'

এই অবস্থাটিই নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ـ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ 'আর যখন তোমরা একটি লোক হত্যা করিয়া পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতেছিলে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গোপন ব্যাপারটি উদ্ঘাটন করিতে যাইতেছিলেন।'

যাহা হউক, তখন হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে বলিলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে একটি গাভী যবেহ করিতে বলিতেছেন। তাহা শুনিয়া তাহারা বলিল– আমরা আপনাকে হত্যা রহস্য উদ্ঘাটন করিতে বলিতেছি আর আপনি আমাদিগকে গাভী যবেহ করিতে বলিতেছেন। তবে কি আপনি আমাদের সহিত মস্করা করিতেছেন? তিনি বলিলেন ঃ নাউজুবিল্লাহ, তাহা হইলে তো আমি জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হইব।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন– তাহারা যে কোন একটি গাভী জবাই করিলেই চলিত। কিন্তু তাহারা হযরত মূসা (আ)-কে নাজেহাল করার জন্য প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিল এবং নিজেরাই নিজেদের জন্য জটিলতা সৃষ্টি করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাই তাহাদিগকে এক দুঃসাধ্য নির্দেশ প্রদান করেন। তাহারা প্রথমে বলিল ঃ আপনার প্রভুকে বলুন, তিনি যেন আমাদিগকে গাভীর পরিচয় বলিয়া দেন।

মূসা (আ) বলিলেন ঃ উহা যুবতীও হইবে না, বৃদ্ধাও হইবে না, মাঝারি বয়সের হইবে। এখন যাহা আদিষ্ট হইয়াছ, তাহা কর। শব্দার্থ ঃ الفارض। অর্থ সন্তান ধারণের বয়স অতিক্রান্তা বৃদ্ধা। البكر। অর্থ মাত্র একটি সন্তান হইয়াছে এইরূপ যুবতী। العوان। অর্থ একাধিক সন্তান হইয়াছে এবং উহার সন্তানেরও সন্তান হইয়াছে এইরূপ প্রৌঢ়া।

তাহারা আবার বলিলেন ঃ আপনার প্রভুকে বলুন তিনি যেন আমাদিগকে গাভীটির রঙ বলিয়া দেন।

মূসা (আ) বলিলেন ঃ তিনি বলিতেছেন, গাভীটি এমন হলুদ বর্ণের যাহা দেখিলে দর্শকের চোখ জুড়াইয়া যায়।

তাহারা পুনরায় বলিল ঃ আপনার প্রভুকে বলুন তিনি যেন আমাদিগকে গাভীটির পরিপূর্ণ পরিচয় দান করেন। কারণ, গাভীর পরিচয় এখনও আমাদের কাছে অস্পষ্ট। তাহা হইলে ইনশা আল্লাহ্ অবশ্যই আমরা উহা ঠিক পাইব।

মূসা (আ) বলিলেন ঃ নিশ্চয় প্রভু বলিতেছেন, উহা দ্বারা চাষ করা হয় নাই আর পানি সেচের কাজ উহা করে নাই। সম্পূর্ণ সুস্থ-সবল এবং কোথাও কোন দাগ-খুঁত নাই।

শব্দার্থ ঃ شية যে কোন ধরনের বা বর্ণের দাগ। তাহারা বলিল ঃ এতক্ষণে আপনি ঠিকমত বলিয়াছেন।

তারপর তাহারা উদ্দিষ্ট বিশেষ গাভীর সন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু কোথাও সেই গাভী পাইতেছিল না। তখন বনী ইসরাঈলদের ভিতর অতিশয় পিতৃভক্ত একটি লোক ছিল। একদিন তাহার পিতার ঘুমন্ত অবস্থায় এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে বলিল, আমার এই মহা মূল্যবান মুক্তাটি বিক্রয় করিব। তুমি কি উহা সত্তর হাজার মুদ্রার বিনিময়ে খরিদ করিবে? সে বলিল, হাঁ, আমি আশি হাজার মুদ্রায়ই খরিদ করিব। তবে তোমাকে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে, আমার নিদ্রিত পিতার শিয়রের নীচে আমাদের চাবি। তিনি ঘুম হইতে উঠিলে আমি তোমাকে মুদ্রা প্রদান করিব। লোকটি বলিল- তোমার পিতাকে ঘুম হইতে এক্ষুণি জাগাইয়া আমাকে মুদ্রা দিতে পারিলে আমি যাট হাজারে বিক্রি করিব। কিন্তু তাহাতেও লোকটি রাজী হইল না। ফলে সে আরও কমাইতে কমাইতে ত্রিশ হাজারে নামিল। তথাপি লোকটি তাহার পিতার ঘুম ভাঙাইতে রাজী হইল না। পরন্তু পিতার ঘুম পূর্ণ করিবার জন্য সে মুক্তার দাম বাড়াইতে বাড়াইতে এক লক্ষ মুদ্রায় পৌঁছিল। উহার পরেও যখন বিক্রেতা তাহার পিতার ঘুম ভাঙানোর জন্য পীড়াপীড়ি চালাইল, তখন সে বলিল– আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার মুক্তাটি কখনও কোন মূল্যেই খরিদ করিব না। লোকটি তাহার পিতৃভক্তির কারণে যখন একটি মহামূল্যবান মুক্তা অল্প দামে খরিদ করার সুযোগ হারাইল, তখন পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে একটি গাভী দান করিলেন। সেই গাভীটির ভিতরেই শুধু বনী ইসরাঈলদের অভিষ্ট গাভীর সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল।

অবশেষে বনী ইসরাঈলগণ এই গাভীর সন্ধান পাইল। তাহারা গাভীর সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে উহা দেখিতে পাইয়া মালিকের নিকট গেল এবং বলিল– তোমার গাভীটি আমাদিগকে দাও। আমরা উহার বিনিময় তোমাকে একটি ভাল গাভী দিব। সে উহাতে রাজী হইল না। তখন তাহারা দুইটি গাভী দিতে চাহিল। তাহাতেও সে সম্মত হইল না। তাহারা বাড়াইতে বাড়াইতে দশটি গাভী পর্যন্ত পৌঁছিল। তথাপি তাহাকে সম্মত করিতে পারিল না। তখন তাহারা সুপারিশের জন্য হযরত মূসা (আ)-কে ধরিল। তিনি লোকটিকে ডাকিয়া বলিলেন– 'তোমার গাভীটি তাহাদিগকে দাও।' লোকটি বলিল– 'হে আল্লাহ্র রসূল!' আমার গাভীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক আমিই। হযরত মূসা (আ) বলিলেন– 'তুমি ঠিকই বলিয়াছ।' তারপর বনী ইসরাঈলের সেই লোকদিগকে বলিলেন– তোমরাই যেভাবে পার তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া গাভীটি ক্রয় কর। তাহারা অগত্যা তাহাকে উক্ত গাভীর সমান ওযনের স্বর্ণ দিতে চাহিল। তাহাতেও যখন সে রাজী হইল না, তখন তাহারা বাড়াইতে বাড়াইতে দশগুণ স্বর্ণ দিয়া উহা খরিদ করিল।

তাহারা যখন গাভীটি আনিয়া জবাই করিল, তখন মূসা (আ) উহার একটি অংশ নিয়া নিহত ব্যক্তির লাশে লাগাইতে বলিলেন। তাহারা গাভীর দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী অংশটি নিয়া লাশের সহিত লাগানো মাত্র নিহত ব্যক্তি পুনর্জীবিত হইল। উপস্থিত লোকজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল– তোমাকে কে হত্যা করিয়াছে? সে বলিল– 'আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমার সম্পদ কুক্ষিগত ও কন্যাকে বিবাহ করার জন্য আমাকে হত্যা করিয়াছে।' ইহা শুনিয়া তাহারা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব করযী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন কয়স হইতে যথাক্রমে আবূ মা'শার, হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদ, সুনায়দ এবং মুজাহিদ হইতে যথাক্রমে ইব্‌ন জুরায়জ, হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদ ও সুনায়দ বর্ণনা করেন ঃ

'বনী ইসরাঈলের একটি গোত্রের সংখ্যালঘু নেককাররা এক সময়ে বিভিন্ন গোত্রের সংখ্যাগুরু বদকারদের সংশ্রবমুক্ত থাকার জন্য পৃথক নগরের পত্তন করেন ও পৃথকভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। সন্ধ্যার পর তাহারা কাহাকেও নগরের বাহিরে থাকিতে দিতেন না। তাহাদের নেতা সকালে শহরের সদর দরজা খোলার সময়ে ভালভাবে দেখিয়া নিতেন উহার সম্মুখে কিছু আছে কিনা? নগরবাসীরা সারাদিন বাহিরের কাজকর্ম সারিয়া সন্ধ্যা হওয়া মাত্র শহরে ফিরিত।

বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে তখন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। তাহার একমাত্র ভ্রাতা ছাড়া অন্য কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। ধনাঢ্য ব্যক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মরিতেছে না দেখিয়া তাহার ভ্রাতা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য তাহাকে হত্যা করিল। অতঃপর লাশটি সংগোপনে উক্ত শহরের ফটকের সম্মুখে রাখিয়া আসিয়া স্বাভাবিক কাজ কর্মে লিপ্ত হইল। সকালে উক্ত শহর প্রধান ফটক খুলিয়া উক্ত লাশ দেখিতে পাইয়া ফটক আবার বন্ধ করিয়া দিলেন। ইত্যবসরে নিহত ব্যক্তির ভ্রাতা লোকজনসহ ফটকের কাছের লাশটি ঘিরিয়া শহরবাসীর উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল– 'হায়, হায়, তোমরা আমার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া এখন সদর দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছ?'

বনী ইসরাঈলদের ভিতর তখন হত্যাকাণ্ড বেশ বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই হযরত মূসা (আ) জানাইয়া দিলেন– নিহতের লাশ যাহাদের এলাকায় পাওয়া যাইবে তাহাদিগকেই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করা হইবে। উপরোক্ত হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া যখন নিহতের ভ্রাতার দলবল ও উক্ত শহরবাসীর মধ্যে সশস্ত্র লড়াইয়ের উপক্রম দেখা দিল, তখন তাহাদের বিজ্ঞজনদের পরামর্শক্রমে নিরস্ত হইয়া তাহারা মূসা (আ)-এর সমীপে হাজির হইল। নিহতের ভ্রাতার দলবল বলিল, হে মূসা! অমুক শহরবাসীরা লোকটিকে হত্যা করিয়া সদর দরজার বাহিরে রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তখন সেই শহরবাসীরা বলিল– হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি জানেন যে, বদকারদের সংশ্রব এড়াবার জন্য আমরা একটি পৃথক নগরী তৈরী করিয়া সেখানে বসবাস করিতেছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা লোকটিকে হত্যা করি নাই এবং কে করিয়াছে তাহাও আমরা জানি না।

এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ আসিল ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً

উবায়দা সালমানী, আবুল আলীয়া, সুদ্দী প্রমুখ বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনাবলীর ভিতর কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য ও আপাত বিরোধ বিদ্যমান। সাধারণত বনী ইসরাঈলদের বিভিন্ন লোকের বর্ণনা হইতে উহা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাদের বর্ণনা উদ্ধৃত করা বৈধ হইলেও আমরা উহাকে সত্যও বলিতে পারি না, মিথ্যাও বলিতে পারি না। তাই উহার মধ্য হইতে আমরা ততটুকুই গ্রহণ করিতে পারি যতটুকু আমাদের সত্য দীনের পরিপন্থী নয়। তাহা ছাড়া সবটুকুই বর্জনীয়। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞানাধার।

(٦٨) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ۖ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ○

(٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ○

(٧٠) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ○

(٧١) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ○

৬৮. তাহারা বলিল, 'আপনার প্রভুকে বলুন, তিনি যেন আমাদিগকে উহার পরিচয় প্রদান করেন।' সে বলিল– 'নিশ্চয় তিনি বলিতেছেন, গাভীটি না বৃদ্ধা, না যুবতী, বরং পৌঢ়া। সুতরাং তোমরা আদিষ্ট কাজ সম্পন্ন কর।'

৬৯. তাহারা বলিল ঃ 'আপনার প্রভুকে বলুন, তিনি যেন আমাদিগকে উহার বর্ণ বলিয়া দেন।' সে বলিল ঃ 'নিশ্চয় তিনি বলিতেছেন, গাভীটি এইরূপ হলুদ বর্ণের যেন দর্শকদের প্রাণ জুড়াইয়া যায়।'

৭০. তাহারা বলিল ঃ 'আপনার প্রভুকে বলুন, তিনি যেন উহার (পরিপূর্ণ) পরিচয় প্রদান করেন। নিশ্চয় গাভীটি আমাদের কাছে অস্পষ্ট (রহিয়াছে)। অতঃপর নিশ্চয় আমরা ইনশা আল্লাহ্ অবশ্যই ঠিক পাইব।'

৭১. সে বলিল ঃ 'নিশ্চয় তিনি বলিতেছেন, গাভীটি অবশ্যই কৃষিকার্যে ব্যবহৃত নহে আর উহা নিশ্চয়ই সেচ কার্য করে নাই। উহা সুস্থ-সবল, সর্ববিধ দাগ-খুঁত মুক্ত।' তাহারা বলিল ঃ 'এতক্ষণে আপনি সঠিক কথা বলিয়াছেন।' অতঃপর তাহারা উহা যবেহ করিল, অথচ তাহারা উহা করার ধারে-কাছেও ছিল না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্র রসূলকে হয়রান ও নাজেহাল করার উদ্দেশ্যে বনী ইসরাঈলগণ কর্তৃক তাঁহার নিকট অহেতুক প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপনের ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি গাভী যবেহ করিতে বলিলেন। তাহারা যে কোন একটি গাভী যবেহ করিলেই নির্দেশ পালিত হইত এবং তাহাদের

উদ্দেশ্যও সাধিত হইত। কিন্তু তাহারা আনুগত্যের সরল পথ ছাড়িয়া অবাধ্যতার বক্র পথ ধরিল। তাহারা অবাধ্য মন লইয়া আল্লাহ্র নবীকে হয়রান করার জন্য গাভী সম্পর্কে তাঁহাকে অহেতুক প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল। যদিও তাহাদের প্রশ্নগুলি নেহাৎ অপ্রয়োজনীয় ছিল, তথাপি তাহাদের অবাধ্য মন উহাই করার জন্য তাহাদিগকে প্ররোচিত করিল। এইরূপে তাহারা নিজেরাই নিজেদের জন্য চরম জটিলতা ডাকিয়া আনিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর দুঃসাধ্য কাজ চাপাইয়া দিলেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উবায়দা প্রমুখ তাফসীরকার বলেন– বনী ইসরাঈলগণ বিনা প্রশ্নে যে কোন একটি গাভী যবেহ করিলেই আল্লাহ্র নির্দেশ পালিত হইত এবং তাহাদের উদ্দেশ্যও সাধিত হইত।

বনী ইসরাঈলগণ হযরত মূসা (আ)-কে বলিল ঃ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ অর্থাৎ আপনি আপনার প্রভুকে বলুন, তিনি যেন আমাদিগকে উহার পরিচয় বলিয়া দেন। অন্য কথায় তাহারা গাভীটির গুণাবলী জানিতে চাহিল।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মিনহাল ইব্ন আমর, আ'মাশ, হিশাম, ইব্ন আলী, আবূ কুরায়ব ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

'বনী ইসরাঈলরা যদি একটি সাধারণ গাভী যবেহ করিত, তাহাতেই তাহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইত। কিন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের জন্য জটিলতা ডাকিয়া আনিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর দুঃসাধ্য বোঝা চাপাইয়া দিলেন।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ। উহা একাধিক বর্ণনাকারী হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবায়দাহ, সুদ্দী, মুজাহিদ, ইকরামা, আবুল আলীয়া প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইব্ন জুরায়জ বলেন যে, 'আতা একদিন আমাকে বলেন ঃ বনী ইসরাঈলগণ বিনা প্রশ্নে একটি সাধারণ গাভী যবেহ করিলেই আল্লাহ্র নির্দেশ পালিত হইত।'

ইব্ন জারীর আরও বলেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'বনী ইসরাঈলগণকে একটি সাধারণ গাভী যবেহ করিতে বলা হইয়াছিল। কিন্তু যখন তাহারা নিজেরাই নিজেদের জন্য কঠোরতা ও জটিলতা চাহিতে লাগিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর কঠোর বোঝা চাপাইয়া দিলেন। আল্লাহ্র কসম! যদি তাহারা 'ইনশা আল্লাহ্' না বলিত তাহা হইলে কোনদিনই তাহারা গাভী চিনিতে পারিত না।'

হযরত মূসা (আ) তাহাদের প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলিলেন ঃ

اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ـ

উক্ত আয়াতের لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ অর্থ হইতেছে, গাভীটি অতি বৃদ্ধা কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা কোনটিই হইবে না। আবুল আলীয়া, সুদ্দী, মুজাহিদ, ইকরামা, আতিয়্যা, আওফী, আতা খোরাসানী, ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ, যিহাক, হাসান, কাতাদাহ ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উক্ত শব্দদ্বয়ের এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (আ) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ অর্থাৎ বৃদ্ধা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কার মধ্যবর্তী। এইরূপ পশুই সুদর্শন ও শক্তিশালী হইয়া থাকে। ইকরামা, মুজাহিদ, আবুল আলীয়া, রবী' ইব্ন আনাস, আতা খোরাসানী ও যিহাক হইতেও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

সুদ্দী বলেন ঃ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ অর্থাৎ অতি বৃদ্ধা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কার মধ্যবর্তী গাভী, যাহার সন্তান ও সন্তানের সন্তান রহিয়াছে।

হাসান হইতে পর্যায়ক্রমে কাছীর ইব্ন যিয়াদ, জুওয়াইবির ও হাশিম বর্ণনা করেন ঃ

'বনী ইসরাঈলগণকে একটি বন্য গাভী যবেহ করিতে বলা হইয়াছিল।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে আতা ও ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি হলুদ রঙের জুতা পরিধান করিবে, সে যতদিন উহা পরিধান করিবে, ততদিন সুখী ও আনন্দিত থাকিবে। تَسُرُّ النَّظِرِيْنَ আয়াতাংশে উক্ত বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে।

মুজাহিদ এবং ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন ঃ صفراء অর্থাৎ গাভীটির গোটা দেহ হলুদ বর্ণের হইবে।

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ صفراء অর্থাৎ গাভীটির শিং ও পায়ের খুর হলুদ রঙ বিশিষ্ট হইবে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র বর্ণনা করেন ঃ صفراء অর্থাৎ গাভীটি শিং ও পায়ের খুর হলুদ রঙ বিশিষ্ট হইবে।

হাসান হইতে যথাক্রমে আবূ রিজাহ, নূহ ইব্ন কয়স, নসর ইব্ন আলী, আবূ হাতিম ও ইব্ন হাতিম বর্ণনা করেন ঃ بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا অর্থাৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গাভী। উক্ত ব্যাখ্যা অসমর্থিত। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই সঠিক।

صفراء অর্থ হলুদ বর্ণের আর فَاقِعٌ لَّوْنُهَا অর্থ উহার রঙ অত্যন্ত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল। صفراء শব্দের উপর জোর দেওয়ার জন্য তাকীদ হিসাবে فَاقِعٌ لَّوْنُهَا ব্যবহৃত হইয়াছে।

আতিয়্যা আওফী বলেন ঃ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا অর্থাৎ উহার বর্ণ গাঢ় হলুদ হওয়ার কারণে প্রায় কৃষ্ণবর্ণ হইবে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا অর্থাৎ উহার রঙ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার। আবুল আলীয়া, রবী' ইব্ন আনাস, সুদ্দী, হাসান এবং কাতাদাহ হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে মুআম্মার ও শারীক বর্ণনা করেন ঃ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا অর্থাৎ যাহার রঙ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার।

আওফী স্বীয় তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا অর্থাৎ গাঢ় হলুদ বর্ণের। গাঢ়তার জন্য যাহা প্রায় শুভ্র বর্ণ হইয়াছে।

সুদ্দী বলেন ঃ تَسُرُّ النَّظِرِيْنَ অর্থাৎ দর্শককে যাহা মুগ্ধ করে। আবুল আলীয়া, কাতাদাহ এবং রবী' ইব্ন আনাসও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন ঃ تَسُرُّ النَّظِرِيْنَ অর্থাৎ যাহার দিকে তাকাইলে মনে হয় যে, উহা হইতে সূর্য রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে।

তাওরাত কিতাবে উল্লেখ করা হয় যে, গাভীটি লোহিতাভ বর্ণের ছিল। সম্ভবত উহা তাওরাতের আরবী অনুবাদকের ভুল। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, গাভীটি গাঢ় হলুদ বর্ণের হওয়ায় দৃশ্যত উহা লোহিতাভ হইয়াছিল। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا অর্থাৎ

গাভীর সংখ্যাধিক্যের কারণে উদ্দিষ্ট গাভীটি চিনিয়া বাহির করা আমাদের জন্য সম্ভবপর হইতেছে না। সুতরাং হে মূসা, আপনি উহার পরিপূর্ণ পরিচয় আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরুন।

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ অর্থাৎ আপনি উহার সমস্ত পরিচয় জ্ঞাপন করিলে আমরা ইনশা আল্লাহ্ উহা চিনিয়া আনিতে পারিব।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ রাফে', হাসান, উব্বাদ ইব্ন মানসুর, মানসূর ইব্ন যাযানের ভ্রাতুষ্পুত্র সরূর ইব্ন মুগীরা ওয়াস্তী, আবূ সাঈদ আহমদ ইব্ন দাউদ হাদ্দাদ, আহমদ ইব্ন ইয়াহিয়া আওফী ও ইমাম ইব্ন হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, বনী ইসরাঈলগণ যদি ইনশা আল্লাহ না বলিত, তাহা হইলে তাহাদের নিকট উহার পরিচয় স্পষ্ট হইত না। কিন্তু তাহারা 'ইনশা আল্লাহ্' বলিয়াছিল ....।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ রাফে', হাসান, উব্বাদ ইব্ন মানসূর, যাযান, সরূর ইব্ন মুগীরা ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ 'নবী করীম (সা) বলেন যে, বনী ইসরাঈলরা যদি ইনশা আল্লাহ্ না বলিত, তাহা হইলে গাভীটির পরিচয় কখনও তাহাদের কাছে সুনির্দিষ্ট হইত না। তাহারা যে কোন একটি গাভী যবেহ করিলে তাহাদের কার্য সিদ্ধি হইত। কিন্তু তাহারা তাহা না করিয়া নিজেরা নিজেদের জন্য কঠোরতা কামনা করিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর কঠোর ব্যবস্থা চাপাইয়া দিলেন।'

উপরোক্ত হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এই একটিমাত্র সনদে বর্ণিত হইয়াছে। তাই উহাকে বড় জোর তাঁহার নিজস্ব উক্তি বলা যায়। সুদ্দী হইতেও অনুরূপ কথা তাঁহার নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ـ

অর্থাৎ গাভীটি কৃষিকার্য অথবা ফসলের ক্ষেতে পানি সেচের কাজে ব্যবহৃত হয় নাই। ফলে উহা সবল, নিখুঁত ও সুদর্শন রহিয়াছে। উহাতে কোন ধরনের বা বর্ণের দাগ নাই।

কাতাদাহ হইতে যথাক্রমে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন ঃ مسلمة অর্থাৎ নিখুঁত ও নির্দোষ। আবুল আলীয়া এবং রবী' ইব্ন আনাসও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

মুজাহিদ বলেন ঃ مسلمة অর্থাৎ সর্বপ্রকারের দাগমুক্ত। আতা খোরাসানী বলেন ঃ مسلمة অর্থাৎ উহার চরণগুলি নিখুঁত এবং সার্বিক গঠন নির্দোষ হইবে।

لَا شِيَةَ فِيْهَا অর্থাৎ উহাতে কোনরূপ দাগ থাকিবে না।

মুজাহিদ বলেন ঃ لَا شِيَةَ فِيْهَا অর্থাৎ উহাতে সাদা বা কালো দাগ থাকিবে না।

আবুল আলীয়া, রবী', হাসান ও কাতাদাহ বলেন ঃ لَا شِيَةَ فِيْهَا অর্থাৎ উহাতে কোন সাদা দাগ থাকিবে না। আতা খোরাসানী বলেন ঃ لَا شِيَةَ فِيْهَا অর্থাৎ উহা অবিমিশ্র রং বিশিষ্ট্য হইবে। উহাতে অন্য কোন রঙ মিশ্রিত হইবে না। আতিয়্যা আওফী, ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ ও ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

সুদ্দী বলেন ঃ لَا شِيَةَ فِيهَا অর্থাৎ উহাতে সাদা, কালো বা লাল কোন রঙেরই দাগ থাকিবে না। উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহ প্রায়ই এক।

কেহ কেহ বলেন ঃ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْاَرْضَ وَلَاتَسْقِى الْحَرْثَ। অর্থাৎ উহা শ্রমের কারণে পরিশ্রান্ত ও দুর্বল হইবে না। উহা চাষাবাদে ব্যবহৃত হইলেও সেচকার্যে ব্যবহৃত হইবে না।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী تُثِيرُ الْاَرْضَ ব্যাক্যাংশটি পূর্ববর্তী ذلول শব্দের বিশেষণ না হইয়া ذلول এর পূর্ববর্তী بقرة শব্দের বিশেষণ হইয়াছে। তবে উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, تُثِيرُ الْاَرْضَ বাক্যাংশটি ذلول শব্দের বিশেষণরূপে উহার তাৎপর্যকে সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক করিয়াছে। তদ্রূপ لَاتَسْقِى الْحَرْثَ ব্যাক্যাংশের অন্তর্ভুক্ত لا শব্দটি উহার পরে উহ্যভাবে অবস্থিত ذلول শব্দের বিশেষণরূপে বাক্যের ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক করিয়াছে। ইমাম কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরকার অনুরূপ স্বাভাবিক ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার পথ অনুসরণ করিয়াছেন এবং উহাকেই সঠিক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন।

قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ তাহারা বলিল, এক্ষণে আপনি সঠিক পরিচয় প্রদান করিলেন।

কাতাদাহ বলেন ঃ اَلْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ এখন আপনি বাঞ্ছিত পরিচয় প্রদান করিলেন।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের আদিষ্ট ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্যরা বলিল– আল্লাহ্র কসম! এখন উহাদের নিকট উদ্দিষ্ট পরিচয় আসিয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মিহ্রুক বর্ণনা করেন ঃ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, তাহারা উপরোক্ত বিভিন্ন কথার উত্তর পাইয়াও যবেহ করিতে ইচ্ছুক ছিল না। তাহারা নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেই আদেশ পালন করিল।

আলোচ্য আয়াতাংশে বনী ইসরাঈলদের নিন্দা রহিয়াছে। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাহাদের ইচ্ছা ছিল না গাভী জবেহের মাধ্যমে আল্লাহ্র আদেশ পালন করার। উপরোক্ত প্রশ্নাবলী দ্বারা আল্লাহ্র নবীকে নিরুত্তর করাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব ও মুহাম্মদ ইব্ন কয়স বলেন ঃ 'গাভীটির মূল্য অত্যধিক হওয়ায় তাহারা উহা যবেহ করিতে ইচ্ছুক ছিল না।'

এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নহে। কারণ, গাভীর অত্যধিক মূল্যের কথা কেবল বনী ইসরাঈলদের বর্ণিত কিস্সায় পাওয়া যায়। তাই উহা দলীল হইতে পারে না। আবুল আলীয়া ও সুদ্দীর বর্ণিত রিওয়ায়েতই উহার প্রমাণ। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীও আবুল আলীয়া এবং সুদ্দীর বর্ণিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়াছেন। এইগুলি সবই ইসরাঈলী বর্ণনা। উবায়দা, মুজাহিদ, ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ, আবুল আলীয়া এবং আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামও বলিয়াছেন যে, তাহারা বিরাট মূল্য দিয়া গাভী খরিদ করিয়াছিল। অথচ তাহাদের

বর্ণনার মধ্যে পারস্পরিক মিল নাই। তাহা ছাড়া গাভীটির মূল্য সম্বন্ধে ভিন্নরূপ বর্ণনাও রহিয়াছে।

ইকরামা হইতে যথাক্রমে মুহাম্মদ ইব্ন মাওকা, ইব্ন আইনিয়া ও আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেন ঃ গাভীটির মূল্য মাত্র তিন দীনার ছিল। রিওয়ায়েতটির সনদ সহীহ। অবশ্য উহা ইকরামার নিজস্ব উক্তি এবং উহাও ইসরাঈলী বর্ণনা হইতে লওয়া হইয়াছে।

ইমাম ইব্ন জারীর বলিয়াছেন যে, অপর একদল তাফসীরকার বলেন– বনী ইসরাঈলরা এই কারণে উহা যবেহ করিতে ইচ্ছুক ছিল না যে, উহার ফলে প্রকৃত হত্যাকারীর নাম উদঘাটিত হইবে এবং তদ্দরুণ তাহারা তিরস্কৃত ও নিন্দিত হইবে।

কে এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, ইব্ন জারীর তাহা বলেন নাই। পরিশেষে ইব্ন জারীর বলেন– 'একদিকে গাভীটির অত্যধিক মূল্য ও অপরদিকে উহার ফলে তাহাদের গোপন রহস্য উদঘাটিত হইলে তাহারা নিন্দিত হইবে, এই দ্বিবিধ কারণেই তাহারা উহা যবেহ করিতে ইচ্ছুক ছিল না।'

ইব্ন জারীরের এই ব্যাখ্যাও সঠিক নহে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক এই ব্যাপারে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন তাহাই সঠিক, পূর্বে উহা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞানী। তাঁহারই কাছে তাওফীক চাই।

মাসআলা ঃ ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ, ইমাম আওযাঈ, ইমাম লায়ছ এক কথায় পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী অধিকাংশ ফিকাহবিদ বলেন– গবাদি পশুতেও 'বায়-এ সালাম' বৈধ। ফকীহগণ তাহাদের অভিমতের সমর্থনে আলোচ্য আয়াতদ্বয় পেশ করেন। তাহারা বলেন ঃ

'আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে যেইরূপ একটি গাভীর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখের মাধ্যমে উহা সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তেমনি অদৃশ্য কোন পশুর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখের মাধ্যমে উহা সুনির্দিষ্ট করা যায়। এইরূপে বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট হওয়ার পর গরু, উট, বকরী ইত্যাদি যে কোন শ্রেণীর পশু 'বায়-এ সালাম'-এর পণ্য হইতে পারে।

উক্ত ফকীহবৃন্দ আরও বলেন– বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'কোন নারী যেন তাহার স্বামীর কাছে অন্য কোন নারীর এরূপ বর্ণনা প্রদান না করে, যাহাতে তাহার স্বামীর মনে হয় যে, সেই নারীটিকে সে স্বচক্ষে দেখিতেছে।' এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন অদেখা প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনা করিয়া উহা শ্রোতার নিকট সুনির্দিষ্ট ও সুপরিচিত করা যায়। এইরূপে নবী করীম (সা) ও কতিপয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়া অনিচ্ছাক্রমে কৃত হত্যা (قتل خطا) ও ভুলক্রমে কৃত হত্যার জন্য (قتل شبه عمد) ক্ষতিপূরণ আদায়ের যোগ্য উট সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রা), সুফিয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী ফকীহবৃন্দ বলেন– পশুর ক্ষেত্রে بيع سلم (আগাম মূল্যে অদেখা বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়) বৈধ নহে। কারণ, বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়া কোন পশুকে এতখানি সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব নহে যাহাতে ঝগড়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা), হযরত হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান, আব্দুর রহমান ইব্ন সামুরাহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় ফকীহবৃন্দ হইতেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হইয়াছে।

(৭২) وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ۭ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝

(৭৩) فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ۭ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

৭২. আর যখন তোমরা একটি লোক হত্যা করিয়া পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতেছিলে এবং তোমরা যাহা গোপন করিতেছিলে আল্লাহ্ তাহা উদ্‌ঘাটন করিতে যাইতেছিলেন।

৭৩. অনন্তর আমি বলিলাম– 'তাহাকে (নিহতকে) উহার (গাভীর) একটি অংশ দ্বারা আঘাত কর। এইভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁহার নিদর্শন প্রদর্শন করেন যেন তোমরা বুঝিতে পার।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের হত্যাকাণ্ড গোপন রাখার প্রয়াস, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক উহার রহস্য উদঘাটন ও মৃতকে জীবিত করার নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে কিয়ামতের পুনর্জীবনের সম্ভাব্যতা ইত্যাকার বিষয় বর্ণনা করেন।

ইমাম বুখারী বলেন– فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا অর্থাৎ অতঃপর তোমরা তাহার ব্যাপারে মতভেদে লিপ্ত হইয়াছিলে।

মুজাহিদ হইতে যথাক্রমে আবূ নাজীহ, শিবল, আবূ হুযায়ফা, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন।

আতা খোরাসানী ও যিহাক বলেন ঃ فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا অতঃপর উহা লইয়া তোমরা ঝগড়ায় লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলে। ইব্‌ন জুরায়জ বলেন ঃ فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا অর্থাৎ অতঃপর তোমরা সেই ব্যাপারে পরস্পরকে দোষারোপ করিতেছিলে। আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলামও উহার অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করেন।

وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজাহিদ বলেন ঃ تَكْتُمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা গোপন রাখিতেছিলে।

মুসাইয়্যেব ইব্‌ন রাফে' হইতে যথাক্রমে সাদাকা ইব্‌ন রুস্তম, মুহাম্মদ ইব্‌ন তুফায়েল আবাদী, আম্মারা ইব্‌ন আসলাম বসরী ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

কোন ব্যক্তি সাত তবক আবরণের মধ্যে থাকিয়াও যদি কোন নেক কাজ করে তাহা আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ করিয়া দেন। তেমনি কেহ যদি সাত তবক আবরণে লুকাইয়া কোন পাপ কাজ করে তাহাও আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ করিয়া দেন। وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ আয়াতাংশটি উহার দলীল।

فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا আয়াতাংশে উল্লেখিত গাভীর একাংশটি যে অংশই হউক না কেন, উহা দ্বারা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নবীর মু'জিযা প্রকাশ পাইয়াছিল। অবশ্য উক্ত অংশটি গাভীটির নির্দিষ্ট একটি অংশ ছিল। তবে তাহা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা যদি আমাদের দীন ও

দুনিয়ার কোন কল্যাণকর ব্যাপার হইত, তাহা হইলে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাহা করিতেন। আর যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা উহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন ভাবেন নাই এবং কোন নির্ভরযোগ্য সনদে সেই সম্পর্কে কোন বর্ণনাও মিলে না, তাই আমরাও উহা অনির্দিষ্ট রাখিয়া দিলাম।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মিনহাল ইব্ন আমর, আ'মাশ, আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন যিয়াদ, আফ্ফান ইব্ন মুসলিম, আহমদ ইব্ন সান্না ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

"বনী ইসরাঈলগণ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া উক্ত গাভী সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। অতঃপর তাহারা এক ব্যক্তির কতিপয় গরুর মাঝে উহা দেখিতে পাইল। স্বভাবতই উহা মালিকের অত্যন্ত প্রিয় গাভী ছিল। তাহারা উহার বিনিময়ে অধিক মূল্য দিতে চাহিলেও সে সম্মত হইল না। ফলে মূল্য বাড়াইতে বাড়াইতে উহার চামড়ায় যত স্বর্ণ মুদ্রা ধরে ততগুলি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া তাহারা উহা খরিদ করিল। তারপর জবাই করিয়া উহার একটি অংশ দিয়া যখন নিহতের লাশে আঘাত করিল, অমনি সে জীবিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। এমনকি তাহার ঘাড়ের শিরাগুলির ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। উপস্থিত লোকজন প্রশ্ন করিল- তোমাকে কে হত্যা করিয়াছে? সে জবাব দিল-আমাকে অমুক ব্যক্তি হত্যা করিয়াছে।"

লক্ষ্যণীয় যে, উপরোক্ত বর্ণনায় গাভীর কোন নির্দিষ্ট অংশের উল্লেখ নাই। হাসান ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামের বর্ণনায়ও গাভীর অংশটি নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। তাহাতেও শুধু 'অংশ বিশেষ' বলা হইয়াছে। অন্য এক বর্ণনায় গাভীটির নরম হাড়সংলগ্ন মাংসপিণ্ডের কথা বলা হইয়াছে মাত্র।

উবায়দা হইতে যথাক্রমে ইব্ন সিরীন, আইয়ুব, মুআম্মার ও আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেন ঃ তাহারা গাভীর 'অংশ বিশেষ' দ্বারা লাশটিকে আঘাত করিল।

কাতাদাহ হইতে মুআম্মার বর্ণনা করেন ঃ তাহারা গাভীটির রানের মাংসপিণ্ড দ্বারা লাশটিকে আঘাত করা মাত্র সে জীবিত হইয়া বলিল- আমাকে অমুকে হত্যা করিয়াছে।

ইমাম আবূ হাতিম বলেন ঃ মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইকরামা হইতেও অনুরূপ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

সুদ্দী বলেন- তাহারা গাভীটির স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী মাংসপিণ্ড দ্বারা নিহত ব্যক্তির লাশে আঘাত করা মাত্র সে জীবিত হইল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল- কে তোমাকে হত্যা করিয়াছে? সে বলিল- আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে হত্যা করিয়াছে।

আবুল আলীয়া বলেন ঃ হযরত মূসা (আ) উহার একখানা হাড় নিয়া তাহাদিগকে লাশে আঘাত করিতে বলিলে তাহারা তাহাই করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহে প্রাণ সঞ্চার হইল। অতঃপর তাহাদের নিকট তাহার হত্যাকারীর নাম বলিয়া সে মারা গেল।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ তাহারা গাভীটির একটি আস্ত অংশ নিয়া লাশে লাগাইয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন ঃ তাহারা উহার জিহ্বা নিয়া লাশে ছোঁয়াইয়াছিল।

আবার কেহ বলেন ঃ তাহারা উহার লেজের গোড়ার অংশ দিয়া লাশ স্পর্শ করিয়াছিল।

كَذَالِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন- যেইরূপ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতে উক্ত মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন, সেইরূপেই কিয়ামতে তিনি স্বীয় কুদরতে মৃতদিগকে পুনর্জীবন দান করিবেন। উক্ত ঘটনাটি উহারই জ্বলন্ত প্রমাণ। তাহা ছাড়া উহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের বিরাট এক কলহের নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বাকারার পাঁচ জায়গায় মৃতকে জীবিত করার কথা বলিয়াছেন।

এক ঃ ইতিপূর্বে বর্ণিত এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ "অনন্তর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিলাম।"

দুই ঃ আলোচ্য আয়াত।

তিন ঃ নিম্নোক্ত আয়াতে তিনি বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ -

"তুমি তাহাদের কথা ভাবিয়াছ, যাহারা সংখ্যায় কয়েক হাজার হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিলেন- 'তোমরা মরিয়া যাও।' অতঃপর তিনি তাহাদিগকে পুনর্জীবন দান করিলেন।"

চার ঃ নিম্নোক্ত আয়াতে তিনি বলেন ঃ

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا - قَالَ كَيْفَ يُحْيِىْ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا - فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ -

"অথবা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি একটি জনপদ অতিক্রম করিতেছিল। উহা ওলট-পালট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছিল। সে বলিল- ইহা এইরূপ ধ্বংসের পর আল্লাহ কিরূপে আবাদ করিবেন? অতঃপর আল্লাহ তাহাকে একশত বৎসর ধরিয়া মৃত রাখিলেন। তারপর তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন।"

পাঁচ ঃ নিম্নোক্ত আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِىْ الْمَوْتٰى - قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ - قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ - ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا -

"আর যখন ইবরাহীম বলিল, প্রভু হে, তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করিবে তাহা আমাকে দেখাও। প্রভু বলিলেন- তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? সে বলিল- হ্যাঁ, তথাপি উহা আমার অন্তরের পূর্ণ প্রশান্তির জন্য। প্রভু বলিলেন- তবে তুমি চারটি পাখী ধরিয়া তোমার প্রতি সেইগুলির আকর্ষণ সৃষ্টি কর। তারপর (টুকরা টুকরা করিয়া) উহাদের এক একটি অংশ ভিন্ন

ভিন্ন পাহাড়ে রাখিয়া আস। অতঃপর উহাদিগকে আহবান কর। উহারা তোমার দিকে দৌড়াইয়া আসিবে।"

উপরোক্ত আয়াতসমূহের ঘটনাবলী দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে প্রমাণ দান করিলেন যে, এইভাবেই তিনি কিয়ামতে তাহাদিগকে নিজ কুদরতে পুনর্জীবন দান করিবেন। উহা হইতে যেন তাহারা উপদেশ নেয় ও পুনরুত্থান দিবসের প্রতি আস্থাবান হয়। অনুরূপ আল্লাহ্ তা'আলা মৃত যমীনকে বৃষ্টির দ্বারা পুনর্জীবিত করার উদাহরণ পেশ করিয়াও মানবমণ্ডলীকে পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাসী হইবার জন্য আহবান জানাইয়াছেন। উহাকে আল্লাহ্ তা'আলা পুনর্জীবন দানের একটি দলীল হিসাবে তুলিয়া ধরেন।

হযরত আবূ রযীন উকায়লী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ওয়াকী' ইব্‌ন আদাস, ইয়ালী ইব্‌ন 'আতা, শু'বা ও ইমাম আবূ হাতিম বলেন ঃ

"একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কিরূপে মৃতদিগকে জীবিত করিবেন? নবী করীম (সা) বলিলেন- তুমি কি কোন উপত্যকা ভূমিকে পূর্বে বিশুষ্ক ও মৃত অবস্থায় দেখিয়া পরে কি উহা সুজলা-সুফলা হইতে দেখিয়াছ? আমি বলিলাম- হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল উহা আমি দেখিয়াছি। নবী করীম (সা) বলিলেন- এইভাবেই মৃতদের পুনর্জীবন ঘটিবে। অথবা তিনি বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা এইভাবেই মৃতদিগকে পুনর্জীবিত করিবেন।

নিম্নোক্ত আয়াতে উপরোক্ত হাদীসের সমর্থন আছে ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ـ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ـ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ـ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ـ

"আর তাহাদের জন্যে আরেকটি নিদর্শন হইতেছে মৃত যমীন। আমি উহাকে পুনর্জীবিত করিয়া উহাতে শস্য উৎপন্ন করি; অতঃপর তাহারা উহা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। আর উহাতে খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করি যাহাতে তাহারা ফল খাইতে পারে। তাহারা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না?'

মাসআলা ঃ ইমাম মালিক (র) বলেন- নিহত ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় কাহারও নাম বলিয়া গেলে তাহার জবানবন্দী গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। তিনি স্বীয় অভিমতের সপক্ষে আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিহত ব্যক্তির জবানবন্দী গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বস্তুত মুমূর্ষু ব্যক্তি কাহারও বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলার মানসিকতা রাখে না। তাঁহার অনুসারী ফিকাহবিদগণ ইমাম মালিকের এই মতের সমর্থনে নিম্ন হাদীস পেশ করেন ঃ

হযরত আনাস (রা) বলেন- একদা জনৈক ইয়াহুদী তাহার কতগুলি রৌপ্যালংকার নিখোঁজ হওয়ায় জনৈকা দাসীকে হত্যা করিল। সে দাসীটির মস্তক দুই পাথরের মাঝে রাখিয়া চূর্ণ করিয়াছিল। মুমূর্ষু অবস্থায় দাসীটিকে তাহার হত্যাকারী সম্পর্কে নাম ধরিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করায় অবশেষে যখন ইয়াহুদীর নাম বলা হইল, তখন সে সম্মতিসূচক মাথা নাড়াইল। সঙ্গে

সঙ্গে সেই ইয়াহুদীকে গ্রেফতার করা হইল এবং শেষ পর্যন্ত সে অপরাধ স্বীকার করিল। তখন নবী করীম (সা) তাহার মাথাও দুই পাথরের মাঝখানে রাখিয়া চূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন।

ইমাম মালিক বলেন- মুমূর্ষু ব্যক্তির জবানবন্দীর গুরুত্ব রহিয়াছে বিধায় তাহার জবানবন্দীর ক্ষেত্রে অভিভাবকগণের নিকট হইতে হলফ লইতে হইবে। অধিকাংশ ফিকাহবিদ ইমাম মালিকের এই মত সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা বলেন- মুমূর্ষু ব্যক্তির জবানবন্দী অতিরিক্ত গুরুত্বের অধিকারী হইবে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

(٧٤) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ۭ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ۭ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاۗءُ ۭ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৭৪. অতঃপর তোমাদের অন্তর পাথরের মত কঠিন হইয়া গেল, এমনকি পাথর হইতেও শক্ত। কারণ, পাথর হইতে তো সুনিশ্চিতভাবে ঝরনাধারা প্রবাহিত হয় আর ইহাও সুনিশ্চিত যে, এমন পাথরও আছে যাহা ফাটিয়া গেলে পানি বাহির হয়। পরন্তু ইহাও নিশ্চিত কথা যে, কোন কোন পাথর এমনও আছে যাহা আল্লাহ্র ভয়ে প্রকম্পিত ও স্খলিত হয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমরা যাহা করিতেছ তাহা হইতে উদাসীন নহেন।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের পাষাণ হৃদয়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। বনী ইসরাঈলদের নিকট আল্লাহ্র বহু নিদর্শন আসিয়াছে। উহার ফলে স্বভাবতই তাহাদের অন্তর কোমল থাকা উচিত। কিন্তু অস্বাভাবিকতাই হইল বনী ইসলাঈলদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী দেখিয়া তাহাদের হৃদয় কোমল না হইয়া কঠোরতর হইল। তাহারা বিনীত হইবার পরিবর্তে উদ্ধত হইয়া গেল। তাহাদের অন্তর আল্লাহ্র ভয়ে প্রকম্পিত না হইয়া বেপরোয়া হইল। তাহাদের হৃদয় সত্যের জন্য উন্মুখ না হইয়া সত্য বিমুখ হইল। তাহারা আল্লাহ্র অনুগত হওয়ার বদলে অবাধ্য হইল। আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈল জাতির উক্ত অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য ও হৃদয়হীনতার দৃষ্টান্ত পেশ করা হইয়াছে।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً অর্থাৎ তোমরা উক্ত নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও পাষাণের মত, এমনকি উহা হইতেও কঠিন ও অনুভূতিহীন হইয়া গেলে। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে বনী ইসরাঈলদের মত উপদেশ বিমুখ অন্তঃকরণের না হওয়ার জন্য সতর্ক করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَايَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ -

"মু'মিনদের জন্য কি এখনও সময় হয় নাই যে, তাহাদের অন্তর আল্লাহ্র উপদেশ ও অবতীর্ণ সত্যের জন্য বিনয়াবনত হইবে। আর তাহারা সেই আহলে কিতাবদের মত হইবে না,

সুদীর্ঘ কালক্রমে যাহাদের অন্তর পাষাণ হইয়া গিয়াছিল এবং অধিকাংশই যাহাদের পাপাচারী ছিল।"

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ "জবাই করা গাভীর একটি অংশ নিয়া লাশে আঘাত করা মাত্র লোকটি অতীত জীবনের চাইতেও অধিকতর প্রাণ চাঞ্চল্য লইয়া পুনর্জীবিত হইল। তাহাকে প্রশ্ন করা হইল- কে তোমাকে হত্যা করিয়াছে? সে জবাবে বলিল- আমার ভাতিজারা আমাকে হত্যা করিয়াছে। অতঃপর সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল। তাহার ভাতিজারা বলিল- আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাহাকে হত্যা করি নাই। এইরূপে তাহারা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াও উহা অস্বীকার করিল। আলোচ্য আয়াতে তাহাদের উক্ত ঔদ্ধত্য ও সত্যবিমুখতার কথা বলা হইয়াছে।"

ثم قست قلوبكم অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার পর হত্যাকারী ভাতিজাদের অন্তঃকরণ ভীত না হইয়া পাষাণবৎ, এমনকি তাহা হইতেও কঠিন হইল। তেমনি তাহারা আল্লাহ্‌র বহু নিদর্শন দেখার পরেও নবীদের অবর্তমানে সুদীর্ঘ কালক্রমে তাহাদের অন্তর পাষাণবৎ, এমনকি তাহা হইতেও কঠিনতর হইল। তাহারা আল্লাহর আযাবের ভয়মুক্ত ও চরম সত্যবিমুখ হইয়া গেল। অনেক প্রস্তর এইরূপ আছে যাহা হইতে সুকোমল ঝরনাধারা উৎসারিত হয়। কিন্তু তাহাদের অন্তর হইতে কোনরূপ কোমলতাই প্রকাশ পায় না। আল্লাহ্‌ভীতিও তাহাদের অন্তর আদ্র করিয়া সত্য গ্রহণের উপযোগী করিতে সমর্থ হয় না। অনেক প্রস্তর এমনও আছে যে, বিদীর্ণ হইলে উহা হইতে সুকোমল পানি নির্গত হয়। কিন্তু তাহাদের অন্তর বিদীর্ণ করিয়াও উহাতে এমনি সুকোমল কিছু পাওয়া যায় না যাহাতে সত্য শিকড় ছড়াইতে পারে। অনেক প্রস্তর এমন আছে যাহা আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হইয়া পাহাড়ের শৃঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া নিম্নে পতিত হয়। কিন্তু তাহাদের পাষাণ অন্তর আল্লাহ্‌র ভয়ে বিন্দুমাত্র প্রকম্পিত হয় না। তাই উহা প্রস্তর হইতে কঠিনতর।

প্রস্তর ও অন্যান্য জড়পদার্থেও আল্লাহ্‌ভীতির অনুভূতি বিদ্যমান। তাহা নিম্নোক্ত আয়াতে জানা যায় ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لاَّتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ - اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا -

"সপ্তাকাশ, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ সমুদয় সৃষ্টি তাঁহার তাসবীহ পাঠ করিতেছে। কিন্তু তোমরা উহাদের তাসবীহ বুঝিতে পার না। নিশ্চয় তিনি ধৈর্যশীল ও ক্ষমাপরায়ণ।"

ইব্‌ন আবূ নাজীহ বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ বলেন ঃ কোন পাথর হইতে ঝরনা প্রবাহিত হওয়া কিংবা পানি নির্গত হওয়া এবং পর্বত শৃঙ্গ হইতে পাথর বিচ্যুত হওয়া ইত্যাকার ঘটনা আল্লাহ্‌ভীতির কারণেই ঘটিয়া থাকে। তিনি স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে দলীল হিসাবে আলোচ্য আয়াত পেশ করেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ "তোমাদের অন্তর এত সত্য বিমুখ, কঠোর ও অনুভূতিশূন্য যে, অনেক পাথর উহা অপেক্ষা অধিকতর নম্র ও অনুভূতিশীল।'

আবূ আলী আল জায়ানী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ

وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা এই ঃ অনেক শিলাখণ্ড আল্লাহ্র ভয়ে মেঘ হইতে যমীনে পতিত হয়।' কাযী বাকিল্লানী মন্তব্য করিয়াছেন- 'আবূ আলী কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা একটি কল্পিত ব্যাখ্যা বৈ কিছু নহে। কারণ, এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হইলে বিনা প্রমাণে শব্দের বাহ্য অর্থ পরিত্যাগ করিতে হয়।' ইমাম রাযীও উহাকে কল্পিত ব্যাখ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ তালিব (অর্থাৎ ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়াকূব) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাকাম ইব্ন হিশাম ছাকাফী, হিশাম ইব্ন আম্মার, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ আয়াতাংশে মানুষের অতিরিক্ত ক্রন্দনের বিষয় এবং

وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ আয়াতাংশে তাহার স্বল্প ক্রন্দনের বিষয় আর।

وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ আয়াতাংশে অশ্রুপাত ব্যতীত শুধু অন্তরে ঘটিত তাহার ক্রন্দনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন- 'এস্থলে পাথরকে الخشوع (বিনয় মিশ্রিত ভয়ে ভীত হওয়া) ক্রিয়ার কর্তা হিসাবে বর্ণনা করা এক শ্রেণীর আলংকারিক বাগধারা বৈ নহে। প্রকৃতপক্ষে পাথরের মধ্যে কোনরূপ অনুভূতি শক্তি নাই। তাই উহার পক্ষে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হওয়াও সম্ভবপর নহে। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আলংকারিক বাগধারায় দেওয়ালকে 'ইচ্ছুক হওয়া' ক্রিয়ার কর্তা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন বলিয়াছেন ঃ يريد ان ينقض 'দেওয়ালটি ধ্বসিয়া পড়িতে ইচ্ছুক ছিল। অর্থাৎ উহা বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে না পাথর আল্লাহ্র ভয়ে ভীতি হইতে পারে, আর না দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িতে ইচ্ছা করিতে পারে। উপরোক্ত প্রয়োগ বাহ্য অবস্থার ভিত্তিতে আলংকারিক প্রয়োগ ভিন্ন অন্য কিছু নহে।'

ইমাম রাযী, ইমাম কুরতুবী প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় তাফসীরকারগণ বলেন- 'উপরোক্ত রূপ ব্যাখ্যা প্রদানের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা জড় পদার্থের মধ্যে অনুভূতি শক্তি সৃষ্টি করত উহা দ্বারা অনুভূতিসম্পন্ন প্রাণীর ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া ঘটাইতে পারেন।' অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا ـ

'নিশ্চয় আমি আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং পর্বতরাজির নিকট বিশেষ আমানত রাখিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা উহাকে বহন করিতে অসম্মতি জানাইল এবং উহাকে (উহা বহন করাকে) ভয় করিল।'

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ـ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّاتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ـ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ـ

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ 'বৃক্ষ ও লতা উভয় শ্রেণীর উদ্ভিদই সিজদা করে।'

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ ـ

"আল্লাহ্ যে বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কি তাহারা চিন্তা করিয়া দেখে না? উহার ছায়া আল্লাহ্কে সিজদা করিতে করিতে ডানে বামে ঘুরে। আর উহারা বিনীত ও অনুগত।"

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ আকাশ ও পৃথিবী বলিল- আমরা স্বেচ্ছায় আল্লাহ্র বিধানের প্রতি অনুগত হইয়া আসিলাম।

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ـ

'যদি আমি এই কুরআনকে পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম, তবে তুমি উহাকে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ও বিদীর্ণ দেখিতে পাইতে।

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ـ قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ـ

"আর তাহারা নিজেদের চামড়াকে বলিবে- তোমরা কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিলে? উহারা বলিবে, যে আল্লাহ্ সকল বস্তুকে বাকশক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনিই আমাদিগকে সাক্ষ্যদানের শক্তি প্রদান করিয়াছেন।"

এতদ্ব্যতীত সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ একদা নবী করীম (সা) উহুদ পাহাড় সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন- 'এই পাহাড় আমাদিগকে মহব্বত করে এবং আমরা উহাকে মহব্বত করি।' বিপুল সংখ্যক সনদে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) খেজুর বৃক্ষের যে কাণ্ডটির সহিত হেলান দিয়া খুতবা প্রদান করিতেন, উহা নবী করীম (সা)-এর বিরহে ক্রন্দন করিত।' মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ একদা নবী করীম (সা) বলিয়াছিলেন- 'আমার নবূওত প্রাপ্তির পূর্বে যে পাথরখানা আমাকে সালাম দিত, আমি উহাকে এখনো চিনি।' হাজরে আসওয়াদ (কৃষ্ণ পাথর)-এর গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ 'যে ব্যক্তি উহাকে আন্তরিকতা সহকারে চুম্বন করিবে, উহা কিয়ামতের দিন তাহার ঈমানের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবে।'

উল্লেখিত আয়াতসমূহ এবং হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জড় পদার্থের মধ্যেও আল্লাহ্ তা'আলা অনুভূতি শক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা উহা দ্বারা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হইতে পারে, তাঁহার আহবানে সাড়া দিতে পারে এবং অনুভূতি সম্পন্ন প্রাণীদের ন্যায় অনুভূতিমূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে। উপরোক্ত রিওয়ায়েত ভিন্ন একাধিক রিওয়ায়েতে উপরোক্ত কথার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত او (অথবা) শব্দটি কোন্ তাৎপর্যের বাহক, তৎসম্বন্ধে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম কুরতুবী এবং ইমাম রাযী একদল তাফসীরকার হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ 'এস্থলে او শব্দটি ব্যবহার করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বুঝাইয়াছেন যে, বনী ইসরাঈল জাতির অন্তরের কঠোরতাকে বুঝিবার জন্যে শ্রোতা আয়াতে উল্লেখিত দুইটি অবস্থার যে কোন অবস্থাকে উপলব্ধি করিতে পারে। উহা দ্বারাই সে তাহাদের অন্তরের কঠোরতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করিতে পারিবে।'

ইমাম রাযী এতদসম্পর্কিত আরেকটি অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা এই যে, বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের অন্তর পাষাণের ন্যায় কঠোর; এমনকি তদপেক্ষা অধিকতর কঠোর–এই দুইয়ের মধ্য হইতে নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীর কঠোর হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অন্তর কোন্ শ্রেণীর হইয়া গিয়ছে, তাহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সুনির্দিষ্ট থাকিলেও তিনি শ্রোতার নিকট উহাকে অনির্দিষ্ট রাখিয়াছেন। যেমন, কোন ব্যক্তি খেজুর ও রুটি –ইহাদের একটি খাইয়া কাহাকেও বলে اكلت خبزا او تمرا –আমি রুটি অথবা খেজুর খাইয়াছি। এই স্থলে বক্তা খেজুর ও রুটি –এই দুইটির কোন্টি খাইয়াছে, তাহা তাহার ভালরূপে জানা থাকা সত্ত্বেও সে শ্রোতার নিকট উহাকে অনির্দিষ্ট রাখিয়া থাকে। সেইরূপ বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের অন্তর কিরূপ কঠোর হইয়া গিয়াছে, তাহা আল্লাহ্ তা'আলার সুনির্দিষ্টরূপে জানা থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য আয়াতে তিনি শ্রোতার নিকট উহাকে অনির্দিষ্ট রাখিয়াছেন।'

কেহ কেহ বলেন–এই স্থলে او শব্দটি সীমাবদ্ধকরণে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের অন্তর হয় পাষাণের ন্যায় কঠিন, না হয় তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের অন্তর উক্ত দুই শ্রেণীর কঠিন ভিন্ন অন্য কোনরূপ কঠিন হয় নাই। যেমন ঃ কেহ কাহাকেও বলিয়া থাকে – كل حلوا او حامضا তুমি হয় মিষ্টি, না হয় চুকা খাও। এই স্থলে বক্তা শ্রোতাকে দুইটি খাদ্যের মধ্য হইতে যে কোন একটিকে খাইতে আদেশ করিয়া থাকে এবং তৃতীয় কোন খাদ্য খাইতে নিষেধ করিয়া থাকে। আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্যও অনুরূপ হইবে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

আরেকদল তাফসীরকার বলেন–আলোচ্য আয়াতাংশে او শব্দটি و (এবং) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের অন্তর পাষাণের ন্যায় কঠিন এবং উহা অপেক্ষা অধিকতর কঠিন হইয়াছে। কুরআন মজীদের অন্যত্রও উহা অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا অর্থাৎ তুমি তাহাদের মধ্য হইতে কোন পাপাসক্ত এবং সত্য-দ্বেষ ব্যক্তিকে অনুসরণ করিও না।'

তিনি আরও বলেন ঃ

فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا اَوْ نُذْرًا অর্থাৎ যেই ফেরেশতারা দায়মুক্ত হইবার এবং অপরকে সতর্ক করিবার জন্যে উপদেশ প্রদান করে, তাহাদের শপথ।'

কবি নাবিগা যুবয়ানী বলেন ঃ

قالت الا ليتها هذا الحمام لنا
الى حمامتنا او نصفه فقد

"মহিলাটি বলিল—আহা! এই গোসলখানাটি যদি আমাদের মালিকানাধীন হইত এবং উহা আমাদের মালিকানাধীন উষ্ণ ফোয়ারাগুলির সহিত মিলিত হইয়া আমাদের অধিকারভুক্ত বস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিত, তবে কতই না ভাল হইত। আর উহার অর্ধাংশ তো নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন—'এই স্থলে কবি او শব্দটিকে و অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।' যেমন কবি জারীর ইব্‌ন আতিয়্যা বলেন ঃ

نال الخلافة او كانت له قدرا
كما اتى ربه موسى على قدر

"তিনি খিলাফত লাভ করিলেন যেইরূপে হযরত মূসা (আ) সম্মানিত হইয়া স্বীয় প্রভুর নিকট আগমন করিয়াছিলেন, উহা সেইরূপে তাহার জন্যে সম্মানজনক হইল।"

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন—'এই স্থলে কবি او শব্দটিকে و অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।'

আরেকদল তাফসীরকার বলেন—আলোচ্য আয়াতাংশে او শব্দটি بل (বরং) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ—তাহাদের অন্তর পাষাণবৎ কঠিন; বরং তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন হইয়া গিয়াছে। কুরআন মজীদের অন্যত্রও او শব্দটি অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِذًا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً 'তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল লোক মানুষকে ভয় করে—যতটুকু ভয় আল্লাহ্‌কে করা সমীচীন, ততটুকু ভয়; বরং তদপেক্ষা অধিকতর ভয় করে।' তিনি আরও বলেন ঃ

وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِأَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ 'আর আমি তাহাকে এক লক্ষ, বরং তদপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক লোকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى 'অতঃপর সে দুই ধনুকের দূরত্বে, বরং তদপেক্ষা স্বল্পতর দূরত্বে অবস্থান করিতে লাগিল।'

আরেকদল তাফসীরকার বলেন—আলোচ্য আয়াতাংশে او শব্দটি 'অথবা' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ—'হে বনী ইসরাঈল! তোমাদের জ্ঞানানুসারে তোমাদের অন্তর পাষাণের ন্যায় অথবা তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন হইয়া গিয়াছে।' ইমাম ইব্‌ন জারীর উপরোক্ত অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আরেকদল তাফসীরকার বলেন–'তাহাদের অন্তর পাষাণের ন্যায় কঠিন এবং তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন–এই দুই রূপের একরূপ কঠিন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অন্তর কোন্ রূপ কঠিন হইয়া গিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাহা সুনির্দিষ্ট থাকিলেও শ্রোতার নিকট তাহাকে অনির্দিষ্ট রাখিবার জন্যে এই স্থলে او শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কবি আবুল আস্ওয়াদ বলেন ঃ

أُحِبُّ مُحَمَّدًا حُبًّا شَدِيْدًا
وَعَبَّاسًا وَحَمْزَةَ وَالْوَصِيَّا
فَاِنْ يَّكُ حُبُّهُمْ رُشْدًا اُصِبْهُ
وَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ اِنْ كَانَ غَيًّا

"আমি মুহাম্মদ (সা)-কে, হযরত আব্বাস (রা)-কে, হযরত হামযা (রা)-কে এবং (আল্লাহ্র নবীর বিশেষ) 'অছী' (হযরত আলী (রা)-কে অতিশয় ভালবাসি। তাহাদিগকে ভালবাসা যদি নেক কাজ হয়, তবে আমি উহার ফল পাইব। আর তাহাদিগকে ভালবাসা যদি বদ কাজ হয়, তবে উহার ফলও আমাকে ভোগ করিতে হইবে।"

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন–'একথা নিশ্চিত যে, কবি আবুল আসওয়াদ এই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত ছিলেন যে, কবিতায় উল্লেখিত ব্যক্তিগণকে ভালবাসা একটি নেক কাজ। এতদসত্ত্বেও তিনি স্বীয় কবিতায় শ্রোতার নিকট উহাকে অনির্দিষ্ট রাখিয়াছেন।' ইমাম ইব্ন জারীর আরও বলেন–কবি আবুল আসওয়াদ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ তিনি উক্ত কবিতা আবৃত্তি করিবার পর তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, তোমার মনে কি সন্দেহ রহিয়াছে ? তিনি বলিলেন–'আল্লাহ্র কসম! আমার মনে সন্দেহ নাই; থাকিতে পারে না।' অতঃপর তিনি স্বীয় বাগধারার সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতাংশ উদ্ধৃত করিলেন ঃ

وَاِنَّا اَوْ وَاِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ "আর নিশ্চয় আমরা ও তোমরা হয় সত্য পথে চলমান, না হয় স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রহিয়াছি।"

অতঃপর কবি আবুল আসওয়াদ বলিলেন–'উপরোক্ত কথা যিনি বলিয়াছেন, তিনি কি কে সত্য পথে আছে, আর কে মিথ্যা পথে আছে, সে সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন ? নিশ্চয় নহে।'

কেহ কেহ বলেন – 'আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য এই ঃ তোমাদের অন্তর হয় পাষাণের ন্যায় কঠিন, আর না হয় তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন হইয়া গিয়াছে; উহাদের অবস্থা উক্ত দুইরূপ ভিন্ন অন্য কোন রূপ নহে।' ইমাম ইব্ন জারীর বলেন– উপরোক্ত তাৎপর্যের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় ঃ 'তোমাদের কতকের অন্তর পাষাণবৎ কঠিন এবং কতকের অন্তর তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন হইয়া গিয়াছে।' ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্যান্য ব্যাখ্যাও বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই অধিকতর সঙ্গত ও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–ইমাম ইব্ন জারীর কর্তৃক বর্ণিত শেষোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিম্নোক্ত আয়াতসমূহকে আলোচ্য আয়াতাংশের সদৃশ আয়াত হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا - فَلَمَّا اَضَائَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمَاتٍ لَّايُبْصِرُوْنَ - صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَايَرْجِعُوْنَ - اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ
السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَّ رَعْدٌ وَّبَرْقٌ - يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ
حَذَرَ الْمَوْتِ - وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ - يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ - كُلَّمَا
اَضَاءَلَهُمْ مَشَوْا فِيْهِ - وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا - وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
وَاَبْصَارِهِمْ - اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

উপরোক্ত আয়াতসমূহে او শব্দের প্রয়োগ সহকারে মুনাফিকদের দুইটি অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকদের অবস্থা উভয়রূপই। তাহাদের অবস্থা আয়াতোক্ত দুই অবস্থা ভিন্ন অন্য কোনরূপ নহে। তাহাদের কতকের অবস্থা একরূপ এবং কতকের অবস্থা অন্যরূপ।

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً - حَتّٰى اِذَا جَاءَهٗ
لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰهُ حِسَابَهٗ - وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ - اَوْ
كَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ - ظُلُمَاتٌ
بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ - اِذَا اَخْرَجَ يَدَاهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا - وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ نُوْرًا فَمَا
لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ -

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে او শব্দের প্রয়োগে কাফিরদের দুইটি অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। উভয় অবস্থাই তাহাদের অবস্থা। তবে, তাহাদের অবস্থা উল্লেখিত অবস্থা হইতে বহির্ভূত কোন অবস্থা নহে। তাহাদের কতকের অবস্থা একরূপ এবং কতকের অবস্থা আরেকরূপ।

সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতাংশের শেষোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী উহাতে বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের অন্তরের দুইটি অবস্থা বর্ণনা করিবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা 'অথবা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। উহার কারণ এই নহে যে, 'তাহাদের অন্তরের অবস্থা উক্ত দুই অবস্থার মধ্য হইতে মাত্র একটি। কিন্তু, কোন্‌টি তাহাদের অন্তরের অবস্থা তাহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অবিদিত ও অনির্দিষ্ট।' তেমনি উহাতে 'অথবা' শব্দটি ব্যবহার করিবার কারণ ইহাও নহে যে, 'তাহাদের অন্তরের অবস্থা উক্ত দুই অবস্থার মধ্য হইতে মাত্র একটি এবং উহা কোন্‌টি তাহা নির্দিষ্টরূপে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বিদিত রহিয়াছে। কিন্তু, তিনি উহা শ্রোতার নিকট অবিদিত ও অনির্দিষ্ট রাখিতে চাহেন।' বরং আলোচ্য আয়াতাংশে বর্ণিত দুইটি অবস্থার উভয় অবস্থাই বনী ইসরাঈলের লোকদের অন্তরের অবস্থা। তাহাদের অন্তরের অবস্থা উভয়রূপের বহির্ভূত কোন অবস্থা নহে। উক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই স্থলে او শব্দটি 'অথবা' ও 'এবং' এই দুই অর্থের কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এই প্রশ্ন অবান্তর হইয়া যায়। কারণ, উক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই স্থলে او শব্দটি 'অথবা' ও 'এবং' এই দুই অর্থের কোন্ অর্থে ব্যবহৃত

হইয়াছে। এই প্রশ্ন অবান্তর হইয়া যায়। কারণ, উক্ত ব্যাখ্যার পরিপেক্ষিতে এই স্থলে أو শব্দটিকে 'অথবা' ও 'এবং' এই উভয় অর্থের যে কোন অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। এতদ্সম্পর্কীয় সর্বশেষ কথা এই যে, তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতাংশের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিলেও أو শব্দটিকে যে কোনরূপ সংশয় প্রকাশ করিবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবহার করেন নাই, তদ্বিষয়ে তাঁহারা একমত। আল্লাহ্ মহান; আল্লাহ্ পবিত্র।

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার, ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাতিব, আলী ইব্ন হাফস, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবুছ ছালজ, মুহাম্মদ ইব্ন আইউব, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইবরাহীম ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'তোমরা আল্লাহ্র যিক্র ভিন্ন অন্যরূপ কোন কথা বেশী পরিমাণে বলিও না। কারণ, আল্লাহ্র যিক্র ভিন্ন অন্য কথা বেশী বলিলে অন্তর শক্ত ও কঠিন হইয়া যায়। আর যাহার অন্তর শক্ত ও কঠিন, আল্লাহ্র নিকট হইতে সে অধিকতর দূরে থাকে।'

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীসকে স্বীয় সংকলনের 'যুহদ' অধ্যায়ে ইমাম আহমদের সহচর অন্যতম রাবী মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবুছ ছালজ হইতে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার, তিনি উহাকে উপরোক্ত রাবী ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ ইব্ন হাতিব হইতে উপরোক্ত সনদেও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 'উক্ত হাদীস ইবরাহীম (ইব্ন আবদুল্লাহ)-এর মাধ্যমে ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।'

ইমাম বায্যার হযরত আনাস (রা) হইত বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'চারটি অবস্থা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। (১) চক্ষু হইতে অশ্রুপাত না ঘটা, (২) অন্তর শক্ত হইয়া যাওয়া, (৩) আকাঙ্ক্ষা অধিক হওয়া, (৪) দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি লোভ হওয়া।'

(৭৫) اَفَتَطۡمَعُوۡنَ اَنۡ يُّؤۡمِنُوۡا لَـكُمۡ وَقَدۡ كَانَ فَرِيۡقٌ مِّنۡهُمۡ يَسۡمَعُوۡنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوۡنَهٗ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا عَقَلُوۡهُ وَهُمۡ يَعۡلَمُوۡنَ ۝

(৭৬) وَاِذَا لَقُوا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قَالُوۡٓا اٰمَنَّا ۖۚ وَاِذَا خَلَا بَعۡضُهُمۡ اِلٰى بَعۡضٍ قَالُوۡٓا اَتُحَدِّثُوۡنَهُمۡ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيۡكُمۡ لِيُحَآجُّوۡكُمۡ بِهٖ عِنۡدَ رَبِّكُمۡ ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ ۝

(৭৭) اَوَلَا يَعۡلَمُوۡنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّوۡنَ وَمَا يُعۡلِنُوۡنَ ۝

৭৫. (হে ঈমানদারগণ!) তোমরা কি আশা করিতেছ যে, তাহারা তোমাদের কথায় ঈমান আনিবে ? অথচ তাহাদের ভিতর তো এমন দলও ছিল যাহারা আল্লাহ্র কালাম জানিয়া-শুনিয়া ওলট-পালট করিত।

৭৬. আর যখন তাহারা ঈমানদারদের সহিত দেখা করে, তখন বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি।' আর যখন তাহারা নিজেরা পরস্পর মেলামেশা করে, তখন বলে, 'আল্লাহ্ তোমাদের নিকট যাহা উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহা তাহাদিগকে জানাইতেছ কেন ?' তাহারা তো তোমাদের প্রভুর সকাশে উহা দলীল হিসাবে পেশ করিবে। তোমরা কি তাহা বুঝিতেছ না?

৭৭. তাহারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহারা যাহা গোপন রাখে ও প্রকাশ করে তাহা সকলই জানেন?

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির সত্যদ্বেষী মানসিকতা বর্ণনা করিয়া তাহাদের ঈমান আনিবার বিষয়ে আশান্বিত হইতে মু'মিনদিগকে নিষেধ করিতেছেন। সাথে সাথে বনী ইসরাঈলের কপটাচারী সত্যদ্বেষী লোকদিগকে জানাইয়া দিতেছেন যে, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের গোপন ও প্রকাশ্য–উভয় শ্রেণীর আমল ও কার্য সম্বন্ধে সমভাবে অবহিত রহিয়াছেন, তাই তাহারা যাহাই ভাবিয়া থাকুন না কেন, বিচারের দিনের শাস্তি হইতে তাহারা কোনক্রমেই রেহাই পাইবে না।

أَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ অর্থাৎ হে মু'মনিগণ! তোমরা কিরূপে আকাঙ্ক্ষা কর যে, এই সকল ইয়াহূদী–যাহাদের পিতৃ-পুরুষ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিবার পর উহাদিগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইয়াছে। আর এইরূপে যাহাদের অন্তর কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া গিয়াছে, তাহারা তোমাদের প্রতি অনুগত হইবে ?

وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلاَمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ ইহাদেরই একটি দল আল্লাহ্র কালামকে শুনিবার এবং উহাকে ভালরূপে বুঝিবার পর উহার ভ্রান্ত ও অপ্রকৃত অর্থ বর্ণনা করিত। অথচ তাহারা জানিত যে, তাহাদের উক্ত কার্য জঘন্য পাপ ও অপরাধ। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِه -

"তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে আমি তাহাদের উপর লা'নত বর্ষণ করিয়াছিলাম। তাহারা বাক্যসমূহকে উহাদের স্থান হইতে বিচ্যুত করিত।"

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ يَسْمَعُوْنَ كَلاَمَ اللّٰهِ অর্থাৎ 'তাহারা আল্লাহ্র কালাম তাওরাতকে শ্রবণ করিতেছিল।' তাঁহাদের উক্ত শ্রবণ তূর পর্বতে ঘটিয়াছিল। আর তূর পর্বতে উহা শ্রবণ করিয়াছিল বনী ইসরাঈল জাতির সকলে নহে;

বরং কিছু সংখ্যক লোক–যাহারা মূসা (আ)-এর নিকট দাবী জানাইয়াছিল যে, তিনি যেন তাহাদের জন্যে আল্লাহ্কে চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করিবার ব্যবস্থা করেন। আর তদ্দরুণ আকাশ হইতে পতিত বজ্র তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিল। অতএব, আলোচ্য আয়াতাংশের অন্তর্গত فريق منهم (তাহাদের একটি দল) শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির উপরোক্ত দলকে বুঝাইয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন যে, 'জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা বনী ইসরাঈল জাতির কিছু সংখ্যক লোক হযরত মূসা (আ)-কে বলিল–হে মূসা! আমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে তো দেখিতে পাই না। আপনার সহিত আল্লাহ্ তা'আলা যখন কথা বলেন, তখন আপনি আমাদিগকে তাঁহার কথা শুনাইবেন।' হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাহাদের ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্যে আবেদন জানাইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–হ্যাঁ, আমি তাহাদিগকে আমার কথা শুনাইব। তুমি তাহাদিগকে বলো–'তাহারা যেন স্বীয় শরীর পবিত্র করে, স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র করে এবং রোযা রাখে।' তাহারা তাহাই করিল। হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তূর পর্বতে গমন করিলেন। তথায় মেঘ তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলে হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে সিজদায় পড়িয়া যাইতে বলিলেন। তাহারা তাহাই করিল। এই সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর সহিত কালাম করিলেন। তাহারা আল্লাহ্র কালাম করা শুনিল। তাহারা শুনিল–আল্লাহ্ তাহাদিগকে কোন্ কোন্ কাজ করিতে আদেশ করিতেছেন এবং কোন্ কোন্ কাজ করিতে নিষেধ করিতেছেন। তাহারা শুনিল ও বুঝিল। অতঃপর হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে লইয়া বনী ইসরাঈল জাতির অপর লোকদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন। হযরত মূসা (আ)-এর সহিত তাহার ফিরিয়া আসিয়া আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পরিবর্তিত করিয়া দিল। হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈল জাতিকে বলিলেন–'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে অমুক অমুক কাজ করিতে আদেশ করিতেছেন এবং অমুক অমুক কাজ করিতে নিষেধ করিতেছেন, তখন তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধকে উল্টাইয়া বলিল–'না, আল্লাহ্ অমুক অমুক কাজ করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং অমুক অমুক কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।' আলোচ্য আয়াতাংশে 'তাহাদের উপরোক্ত 'তাহরীফ' বা আল্লাহ্র কালামের পরিবর্তনের কথা বর্ণিত হইয়াছে।'

সুদ্দী বলেন–'আলোচ্য আয়াতাংশে বনী ইসরাঈল জাতির লোকগণ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে তাওরাত কিতাবে আনীত তাহরীফ বা পরিবর্তনের কথা বর্ণিত হইয়াছে।'

উপরে সুদ্দী কর্তৃক বর্ণিত আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা উল্লেখিত হইল, উহা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। ইমাম ইব্ন জারীর সুদ্দী কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উহাই আয়াতাংশের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা। একথা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াতাংশে বনী ইসরাঈলের লোকদের আল্লাহ্র কালাম শুনিবার উল্লেখ রহিয়াছে; কিন্তু, আল্লাহ্র কালামকে হযরত মূসা (আ) যেরূপে সরাসরি তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন, তাঁহার কালামকে সেরূপে সরাসরি তাঁহার নিকট হইতে না শুনিলে যে উহা শুনা হয় না–তাহা বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র কালাম অর্থাৎ তাঁহার কিতাবকে যে কোনভাবে শুনিলেই উহা 'আল্লাহ্র কালামকে শুনা' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ

"আর কোন মুশরিক যদি তোমার নিকট আশ্রয় চাহে, তবে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করো–যাহাতে সে আল্লাহ্‌র কালাম শুনিতে পারে।"

এই স্থলে মুশরিক ব্যক্তির আল্লাহ্‌র কালামকে শ্রবণ করিবার অর্থ–উহাকে সরাসরি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে শ্রবণ করা নহে; বরং উহার অর্থ উহাকে নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে শ্রবণ করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সুদ্দী কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা উহার শাব্দিক তাৎপর্যের বিরোধী নহে। সুদ্দীর ন্যায় কাতাদাহও বলেন–'আলোচ্য আয়াতাংশে ইয়াহুদী জাতির কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের নিকট তাওরাত কিতাবই সংরক্ষিত ছিল। অতঃপর তাহারা জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে তাওরাত কিতাবে পরিবর্তন আনিত। আর তাহারা উহার বাণীকে গোপন রাখিত।' আবুল আলীয়া বলেন- 'আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাব জাতির কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা তাহাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাবে উল্লেখিত নবী করীম (সা)-এর আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী তথা নবী করীম (সা)-এর গুণাবলী ও পরিচয় উহা হইতে তুলিয়া দিত।'

সুদ্দী বলেন- (وهم يعلمون) অর্থাৎ তাহারা জানিত যে, তাহাদের তাহরীফ বা পরিবর্তনের কাজ জঘন্য পাপ ও অপরাধ। ইব্‌ন যায়দ হইতে ইব্‌ন ওয়াহাব বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ অর্থাৎ তাহারা তাওরাত কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন আনিত। পরিবর্তনের মাধ্যমে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বানাইয়াছিল। আর যে বিষয়কে উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহারা পরিবর্তনের মাধ্যমে উহাকে অসত্য বানাইয়া দিয়াছিল। এইরূপে যে বিষয়কে উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহারা পরিবর্তনের মাধ্যমে উহাকে সত্য বানাইয়া দিয়াছিল। কোন সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি উৎকোচ সহকারে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলে তাহারা আল্লাহ্‌র কিতাব হইতে তাহার পক্ষে যুক্তি ও রায় বাহির করিয়া দিত। আবার, কোন মিথ্যাশ্রয়ী ব্যক্তি উৎকোচ সহকারে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলে তাহারা আল্লাহ্‌র কিতাব হইতে তাহার পক্ষে যুক্তি ও রায় বাহির করিয়া দিত। আবার কোন মিথ্যাশ্রয়ী ব্যক্তি উৎকোচ ছাড়া তাহাদের নিকট আসিলেও তাহারা আল্লাহ্‌র কিতাব হইতে তাহার পক্ষে যুক্তি ও রায় বাহির করিয়া দিত। ইহাদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ - اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ -

"তোমরা অপরকে নেক কাজ করিতে বলিয়া নিজেদের কথা কিরূপে ভুলিয়া যাও? অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত করিয়া থাক। তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখ না?"

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا - وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ الى اخر الاية -

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ মু'মিনদের সহিত

ইয়াহুদীদের সাক্ষাৎ হইলে তাহারা মু'মিনদিগকে বলিত- 'আমরা বিশ্বাস করি যে, তোমাদের সঙ্গী (অর্থাৎ নবী করীম সা) আল্লাহ্‌র রাসূল। তবে কথা এই যে, তিনি শুধু তোমাদের প্রতি প্রেরিত হইয়াছেন। আমাদের প্রতি নহে।' আবার শুধু তাহারা নিজেরা একত্রিত হইলে একদল আরেক দলকে বলিত- 'সাবধান! আরবদের নিকট (মু'মিনদের নিকট) উহাও প্রকাশ করিও না। কারণ, ইতিপূর্বে তোমরা তো এই মুহাম্মদের সাহায্যে তাহাদের উপর জয়ী হইবার কথা বলিতে। এখন সে-ই তো তাহাদের মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়াছে।' অর্থাৎ 'ইয়াহুদীদের উক্ত আচরণ উপলক্ষে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।'

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, মু'মিনদের সহিত ইয়াহুদীদের সাক্ষাৎ হইলে তাহারা তাহাদের নিকট স্বীকার করিত যে, 'হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল।' কিন্তু, শুধু তাহারা নিজেরা একত্রিত হইলে একদল আরেক দলকে বলিত- তোমরা কি মুসলমানদের নিকট স্বীকার করো যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল! সাবধান, তোমরা উহা তাহাদের নিকট স্বীকার করিও না। কারণ, তোমরা তো বেশ ভালরূপে জানো যে, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হইতে মুহাম্মদকে অনুসরণ করিয়া চলিবার ব্যাপার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। আর মুহাম্মদ তাহাদিগকে বলিয়া থাকে যে, সে হইতেছে আমাদের প্রতীক্ষিত রাসূল- আমরা যাহার আগমনের অপেক্ষায় রহিয়াছি। সে তাহাদিগকে আরও বলিয়া থাকে যে, 'তাহার আগমনের সংবাদ আমাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।' এই অবস্থায় যদি তোমরা তাহাকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলিয়া স্বীকার কর, তবে তো মুসলমানগণ তোমাদের স্বীকৃতিকে আল্লাহ্‌র সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করিবে এবং উহার সাহায্যে তাঁহার সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করিবে। অতএব, সাবধান উহা স্বীকার করিতে যাইও না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'ইয়াহুদী মুনাফিকরা সাহাবায়ে কিরামের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইবার কালে বলিত- 'আমরা ঈমান আনিয়াছি।' সুদ্দী উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতে যাহাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা পূর্বে ঈমান আনিয়াছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে মুনাফিক হইয়া গিয়াছিল। রবী' ইব্ন আনাস, কাতাদাহ প্রমুখ একাধিক পূর্বযুগীয় মুফাস্‌সির এবং পরবর্তী যুগীয় মুফাস্‌সিরও অনুরূপ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম হইতে ইব্ন ওয়াহাব বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা নবী করীম (সা) ঘোষণা করিলেন- 'মু'মিন ভিন্ন অন্য কেহ যেন মদীনা শহরে প্রবেশ না করে।' ইহাতে মুনাফিক ও অন্যান্য কাফির নেতৃবৃন্দ তাহাদের লোকদিগকে শিখাইয়া দিল- তোমরা মদীনায় প্রবেশ করিয়া মুসলমানদিগকে বলিবে- 'আমরা ঈমান আনিয়াছি।' আবার মদীনা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যথাপূর্ব কাফির হইয়া যাইবে। অতঃপর তাহারা নবী করীম (সা)-এর গোপন সংবাদ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সকাল বেলায় মদীনায় গিয়া বলিত- 'আমরা ঈমান আনিয়াছি। আবার সন্ধ্যার পূর্বে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া যথাপূর্ব কাফির হইয়া যাইত।' অতঃপর এই ঘটনার সত্যতার সমর্থনে আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন ঃ

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمِنُوْا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْا اٰخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ -

একদল কিতাবধারী বলিয়াছে- মু'মিনদের উপর যাহা নাযিল হইয়াছে, তোমরা সকালের দিকে উহার প্রতি বিশ্বাস দেখাইবে এবং বৈকালের দিকে উহার প্রতি অবিশ্বাস দেখাইবে। এইরূপ করিলে লোকেরা ফিরিয়া আসিবে।

রাবী আব্দুর রহমান বলেন- 'এক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের উক্ত ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে নবী করীম (সা)-কে অবহিত করিলেন। উহার পর তাহাদের মদীনায় প্রবেশ বন্ধ হইয়া গেল। তাহারা যখন মদীনায় আসিত, তখন মু'মিনগণ তাহাদিগকে মু'মিন মনে করিয়া বলিত- আল্লাহ্ তা'আলা কি পূর্ববর্তী কিতাবে তোমাদিগকে অমুক অমুক কথা বলেন নাই? তাহারা বলিত- 'হ্যাঁ, তিনি বলিয়াছেন।' তাহারা স্বজাতির নিকট ফিরিয়া গেলে তাহাদের নেতারা তাহাদিগকে বলিত- আল্লাহ যাহা তোমাদের নিকট বলিয়াছেন, তাহা তোমরা কিরূপে তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দাও? এইরূপ করিলে তো তাহারা তোমাদের প্রভুর নিকট উহার সাহায্যে তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য ও বিতর্ক করিবে। তোমাদের কি বুদ্ধি নাই?'

আবুল আলীয়া বলেন ঃ

أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ 'তোমাদের কিতাবে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদের যে পরিচয় ও গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তোমরা কিরূপে মুসলমানদের নিকট প্রকাশ করিয়া দাও?'

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'কতক আহলে কিতাব বলিত, 'অচিরেই একজন নবী আবির্ভূত হইবেন।' ইহাতে অন্যান্য আহলে কিতাব তাহাদের নিজেদের সমাবেশে তাহাদিগকে বলিত-

أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ আল্লাহ্ যাহা তোমাদিগকে জানাইয়াছেন, তাহা তোমরা কিরূপে তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দাও....?

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম ইব্ন আবূ বুরযাহ ও ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'কুরায়যা গোত্রের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভিযান চালাইবার দিনে নবী করীম (সা) তাহাদের দুর্গের নিম্নে বসিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন- 'ওহে বানর, শূকর ও শয়তান-দাসদের ভ্রাতৃগণ!' ইহাতে তাহারা একে অপরকে বলিতে লাগিল- এই তথ্যটি মুহাম্মদকে কে জানাইল? ইহা তোমাদের মুখ ছাড়া অন্য কাহারো মুখ হইতে প্রকাশিত হয় নাই। তাহারা আরো বলিল ঃ

أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ - الى اخر الاية অর্থাৎ 'আল্লাহ্ যে সব কথা প্রকাশ করিতে তোমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন- তাহা তোমরা কিরূপে তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দাও....?' এই স্থলে (فتح) শব্দের অর্থ হইতেছে- প্রকাশ করিতে আদেশ করিয়াছেন।'

মুজাহিদ হইতে ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ উক্ত ঘটনা নবী করীম (সা) কর্তৃক তাহাদের নিকট হযরত আলী (রা) প্রেরিত হইবার এবং নবী করীম (সা)-কে তাহাদের কষ্ট দিবার কালে ঘটিয়াছিল।'

সুদ্দী বলেন- 'একদা কিছু সংখ্যক ইয়াহূদী ঈমান আনিবার পর মুনাফিক হইয়া গিয়াছিল। তাহারা মু'মিনদের নিকট তাহাদের পিতৃপুরুষদের উপর অবতীর্ণ আযাবের কথা প্রকাশ করিয়া দিত। ইহাতে অপর ইয়াহূদীগণ তাহাদিগকে বলিল-

اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ - الى اخر الاية অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তোমাদের উপর যে আযাব নাযিল করিয়াছেন, উহার কথা তোমরা মুসলমানদের নিকট কেন প্রকাশ করিয়া দাও? এইরূপ করিলে তো তাহারা বলিবে যে, আমরা আল্লাহ্র নিকট তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। আর তাহারা উহার সাহায্যে তোমাদের প্রভুর সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করিবে....?'

আতা খুরাসানী বলেন–

اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যে ফয়সালা বা আদেশ দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে কেন অবগত করিতে যাও?' আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী বলেন– একদল ইয়াহূদী মু'মিনদের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইবার কালে তাহাদিগকে বলিত, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি।' আবার তাহারা তাহাদের নিজস্ব সমাবেশে একে অপরকে বলিত– 'আল্লাহ তোমাদের কিতাবে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা তোমরা মুহাম্মদের সহচরদের নিকট কেন বলিতে যাও? এইরূপ করিলে তো তাহারা তোমাদের কথার সাহায্যে আল্লাহর সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করিবে এবং তোমাদের উপর জয়ী হইবে।'

اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ·

আবুল আলীয়া বলেন– مَا يُسِرُّوْنَ অর্থাৎ 'তাহারা যে কুফরকে গোপন রাখে উহা। তাহাদের কিতাবে মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচয় ও গুণাবলী তথা তাঁহার সত্যবাদী হইবার কথা লিখিত থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনে না। তাহাদের এই ঈমান না আনিবার বিষয়কে তাহারা গোপন রাখে।' কিন্তু তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাহাদের উক্ত গোপন কুফরের সংবাদও রাখেন।' কাতাদাহও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাসান বলেন– مَا يُسِرُّوْنَ অর্থাৎ– তাহারা মু'মিনগণ হইতে গোপনে তাহাদের নিজেদের সমাবেশে থাকিয়া একে অপরকে যাহা বলে। তাহারা তাহাদের নিজেদের সামবেশে এক অপরকে বলে– 'আল্লাহ্ যে সকল বিষয়কে তাঁহার কিতাবে তোমাদিগকে জানাইয়াছেন, তাহা তোমরা মুসলমানদিগকে কেন জানাইতে যাও। তোমরা এইরূপ করিলে তো তোমাদের দ্বারা প্রকাশিত কথার সহায়তায় তাহারা আল্লাহর সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করিবে। সাবধান! তোমরা এইরূপ করিও না।' কিন্তু, তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাহাদের উক্ত গোপন নিষেধাজ্ঞার সংবাদও জানেন। وَمَا يُعْلِنُوْنَ অর্থাৎ তাহারা মু'মিনদের নিকট প্রকাশ্যত যাহা বলে। তাহারা প্রকৃতপক্ষে ঈমান না আনিলেও মু'মিনদের নিকট কপটভাবে প্রকাশ করে যে, 'তাহারা ঈমান আনিয়াছে।' আল্লাহ্ তাহাদের উক্ত প্রকাশ্য কপট দাবীর খবর রাখেন। আবুল আলীয়া, রবী' এবং কাতাদাহও শেষোক্ত অংশের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭৮) وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ۝

(৭৯) فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ۝

৭৮. তাহাদের ভিতরকার অশিক্ষিতরা কিতাবের খবর তো রাখে না, শুধু কিছু মিথ্যা আশাবাদ ও ভ্রান্ত খেয়ালে নিমগ্ন।

৭৯. অনন্তর সর্বনাশ তো তাহাদের জন্য যাহারা নিজেরা কিতাব লিখিয়া বলে, ইহা আল্লাহ্‌র কালাম, এইভাবে উহার বিনিময়ে কিছু উপার্জন করে। তাহারা যাহা স্বহস্তে লিখিল আর উপার্জন করিল তাহা তাহাদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিল।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবধারী সম্প্রদায়ের লোকদের চরিত্রের বর্ণনা প্রদান করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে কতক আছে একেবারেই জ্ঞান-বুদ্ধি বর্জিত নির্বোধ প্রাণী। তাহারা আল্লাহ্‌র কিতাবের জ্ঞানের ধার ধারে না। তাহারা কতগুলি অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা লইয়া বাঁচিয়া আছে। তাহারা যাহা ভাবে ও বিশ্বাস করে, উহার পিছনে কোন যুক্তি নাই। আছে শুধু তাহাদের মনের ঝোঁক ও প্রবণতা। আবার উক্ত সম্প্রদায়ের কতক লোক স্বকপোলকল্পিত কথাকে লোকদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী বলিয়া চালাইয়া দেয়। পার্থিব ধন-সম্পদ বা মান-মর্যাদা লাভ করিবার লোভই তাহাদিগকে এইরূপ জঘন্য মিথ্যা বলিতে প্ররোচিত করিয়া থাকে। তাহাদের উক্ত অপকর্মের শাস্তি কতই না কঠিন আর কতই না ভয়াবহ।

মুজাহিদ বলেন- ومنهم অর্থাৎ 'আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কতক লোক।' اميون। শব্দটি امى। শব্দের বহুবচন। আবুল আলীয়া, রবী', কাতাদাহ, ইবরাহীম নাখ্‌ঈ প্রমুখ একাধিক ব্যাখ্যাকার বলেন- امى। অর্থ ভালরূপে লিখিতে অক্ষম লোক। لايعلمون الكتاب। এই বিশেষণমূলক বাক্যটি দ্বারাও امى। শব্দের উপরোক্তরূপ অর্থ প্রকাশিত হয়। لايعلمون الكتاب। অর্থাৎ তাহারা জানে না কিতাবে কি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। নবী করীম (সা)-এর একটি বিশেষণ হইতেছে امى। কারণ, তিনি ভালরূপে লিখিতে জানিতেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتَابٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ -

'ইতিপূর্বে তুমি না কোন লিপি পাঠ করিতে আর না স্বীয় দক্ষিণ হস্তে উহা লিখিতে। এইরূপ হইলে হয়তো মিথ্যাশ্রয়ী লোকগণ সন্দেহ করিবার পক্ষে একটা বাহানা খুঁজিয়া পাইত।' নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'আমরা হইতেছি উম্মী উম্মাত। আমরা লিখিতেও জানি না আর মাসকে এইরূপে, ঐরূপে ও সেইরূপে হিসাবও করি না।' অর্থাৎ আমাদের ইবাদতের সময় সঠিকরূপে মনে রাখিবার জন্যে আমাদের লিখিত হিসাব রাখিবার প্রয়োজন নাই। উক্ত হাদীস একটি হাদীসের অংশবিশেষ মাত্র।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ 'তিনি হইতেছেন সেই সত্তা– যিনি নিরক্ষর লোকদের নিকট তাহাদের মধ্য হইতেই একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন।'

ইব্‌ন জারীর বলেন– আরবগণ নিরক্ষর ব্যক্তিকে তাহার পিতার সহিত সম্পর্কিত না করিয়া তাহার মাতার সহিত সম্পর্কিত করিয়া থাকে। কারণ, নিরক্ষর ব্যক্তি নিরক্ষতার দিক দিয়া স্বীয় মাতার সহিত সাদৃশ্য রাখে। যেমন– فلان ابن فلانة অমুক মহিলার পুত্র অমুক। امى অর্থ মাতার সহিত সম্পর্কিত। ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন– 'অবশ্য হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে উপরোক্ত কথার বিরোধী কথা বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক, আবু রওক, বিশর ইব্‌ন আম্মারাহ, উসমান ইব্‌ন সাঈদ, আবূ কুরায়ব ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اميون অর্থ হইতেছে একটি জাতি– যাহারা না কোন রাসূলের উপর আর না কোন আসমানী কিতাবের উপর ঈমান রাখে। তাহারা মনগড়া কিতাব রচনা করিয়া জাহিল ও অজ্ঞ লোকদিগকে বলে– ইহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে অবতীর্ণ কিতাব। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরও বলেন– আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা اميون সম্বন্ধে বলিয়াছেন– يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ তাহারা স্বহস্তে কিতাব লিখে। উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'তাহারা লিখিতে জানা সত্ত্বেও اميون। অতএব বলা যায়, তাহারা যেহেতু আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহ এবং তাহার রাসূলগণকে অবিশ্বাস করে, তাই তাহারা اميون নামে অভিহিত হইয়াছে।

ইমাম ইব্‌ন জারীর হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উপরোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করিবার পর মন্তব্য করেন ঃ 'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত اميون শব্দ সম্পর্কিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা আরবী ভাষায় প্রচলিত এতদসম্পর্কিত অর্থের বিরোধী। কারণ, আরবগণ নিরক্ষর ব্যক্তিকেই امى বলিয়া থাকে। আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি– 'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েতের সনদের বিশুদ্ধতাও প্রশ্নাতীত নহে। বরং উহার সনদও অগ্রহণযোগ্য। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।'

لاَ يَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ اِلاَّ اَمَانِىَّ 'যাহারা কতগুলি আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কিতাবের জ্ঞানের ধার ধারে না।'

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বলেন– امانى অর্থাৎ কতগুলি বাজে গল্প।' হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ امانى অর্থাৎ 'কতগুলি মনগড়া মিথ্যা কথা।' মুজাহিদ বলেন ঃ امانى অর্থাৎ কতগুলি মিথ্যা কথা।'

মুজাহিদ হইতে ধরাবাহিকভাবে ইব্‌ন জুরায়জ, হাজ্জাজ ও সুনায়দ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদল ইয়াহূদীর অবস্থা এই ছিল যে, তাহারা আসমানী কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান রাখিত না। কিন্তু, অনুমানের ভিত্তিতে কিতাব বিরোধী কথা প্রচার করিয়া বেড়াইত এবং উহা সম্বন্ধে দাবী করিত যে, উহা কিতাবের কথা। তাহারা কতগুলি অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অন্য কিছুই জানিত না ও বুঝিত না। امانى অর্থাৎ কতগুলি অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা যাহা তাহারা হৃদয়ে পোষণ করিত।' হাসান বসরী হইতেও امانى শব্দের উপরোক্তরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

আবুল আলীয়া, রবী' এবং কাতাদাহ বলেন–' امانى। অর্থাৎ কতগুলি অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা যাহা আল্লাহ্ পূর্ণ করিবেন বলিয়া তাহারা অযৌক্তিকভাবে ধারণা করিয়া থাকে।' আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম বলেন ঃ امانى। অর্থাৎ কতগুলি অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা যাহা তাহারা অন্তরে পোষণ করে। তাহারা বলে– 'আমরা তো কিতাবের ধারক। আমরা তো আল্লাহর নিকট প্রিয়। তিনি তো আমাদিগকে বেহেশতে নিয়া দাখিল করিবেন।' প্রকৃতপক্ষে তাহারা কিতাবের ধারকও নহে আর আল্লাহ তাহাদিগকে বেহেশতে দাখিলও করিবেন না।

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন, 'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক امانى। শব্দের যে তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন, উহাই অধিকতর সঠিক বলিয়া মনে হয়।'

মুজাহিদ বলেন– 'এইস্থলে اميون। শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল লোককে বুঝাইয়াছেন, যাহারা হযরত মুসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ কিতাব তাওরাতের কিছুই বুঝে না, কিন্তু মনগড়া মিথ্যা কথাকে তাওরাতের কথা বলিয়া লোকদের নিকট চালাইয়া দিতে চেষ্টা করে। আর امانى। শব্দটির তাৎপর্য হইতেছে মনগড়া মিথ্যা কথা।' امانى। শব্দের সমধাতুজ শব্দ হইতেছে التمنى। । হযরত উসমান (রা) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়েতে উক্ত التمنى। শব্দটি 'মনগড়া মিথ্যা কথা বলা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। হযরত উসমান (রা) বলেন– ماتغنيت ولاتمنيت 'আমি কোনদিন গানও গাহি নাই আর মিথ্যা কথাও বলি নাই।'

কেহ কেহ বলেন– امانى। শব্দকে তাশদীদ না দিয়াও পড়া যায়। তখন উক্ত শব্দের অর্থ হইতেছে– তিলাওয়াত ও পাঠ। অর্থাৎ 'উম্মীগণ কিতাবের তিলাওয়াত ছাড়া কিছুই বুঝে না।' তাহাদের কথা অনুযায়ী এই স্থলে لا। শব্দ দ্বারা সূচিত استثناء। টি হইতেছে منقطع শ্রেণীর استثناء। । তাহারা নিম্নোক্ত আয়াতকে নিজেদের সমর্থনে পেশ করেন ঃ

إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَٰنُ فِىْ أُمْنِيَّتِهِ ... ... '....কিন্তু যখন সে তিলাওয়াত করে, তখন শয়তান তাহার তিলাওয়াতে (ওহী বহির্ভূত কথা) প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়।'

কবি কা'ব ইব্‌ন মালিক বলেন ঃ

تمنى كتاب الله اول ليلة

واخره لاقى حمام المقادر

'রাত্রির প্রথম ভাগে সে, আল্লাহ্র কিতাবকে তিলাওয়াত করিল। আর উহার শেষ ভাগে নির্ধারিত মৃত্যুবরণ করিল।'

আরেক কবি বলেন ঃ

تمنى كتاب اخر ليلة ـ تمنى داود الكتاب على رسلى

'হযরত দাউদ (আ) যেইরূপে রাসূলগণের সম্মুখে আল্লাহ্র কিতাবকে তিলাওয়াত করিতেন, সে রাত্রির শেষ ভাগে সেইরূপে আল্লাহ্র কিতাবকে তিলাওয়াত করিল।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ لاَ يَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّوْنَ। অর্থাৎ 'কিতাবের মধ্যে কি আছে, তাহা তাহারা জানে না। তাহারা শুধু অনুমানের সাহায্যে তোমার নবূওতের সত্যতাকে উপলব্ধি করিয়া থাকে।'

মুজাহিদ বলেন ঃ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ অর্থাৎ 'তাহারা মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলে না।' কাতাদাহ, আবুল আলীয়া ও রবী' বলেন– وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ অর্থাৎ 'তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে শুধু কতগুলি মিথ্যা ধারণা পোষণ করিয়া থাকে।'

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ - الى اخر الاية -

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী জাতির আরেকটি দলের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা মিথ্যার আশ্রয় লইয়া এবং অন্যায়ভাবে মানুষের নিকট হইতে পয়সা খাইয়া তাহাদিগকে বিপথগামী করিয়া থাকে।

ويل অর্থ ধ্বংস বা বিনাশ। উহা আরবী ভাষায় বহুল প্রচলিত একটি শব্দ। আবু ইয়ায হইতে ধারাবাহিকভাবে যিয়াদ ইব্ন ফাইয়ায ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ويل জাহান্নামের তলদেশে অবস্থিত রক্ত মিশ্রিত পুঁজ।' আতা ইব্ন ইয়াসার বলেন– ويل জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। উহা এতো উত্তপ্ত যে, উহাতে কতগুলি পর্বত নিক্ষেপ করিলে উহা গলিয়া প্রবাহিত হইতে থাকিবে।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল হায়ছাম, দাররাজ, আমর ইব্ন হারিছ, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ويل হইতেছে জাহান্নামের একটি উপত্যকার নিম্ন ভূমি। উহা এতো গভীর যে, কাফির ব্যক্তি উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবার পর উহার তলদেশে তাহার পৌছিতে চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হইবে।'

ইমাম তিরমিযীও উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে উপরোক্ত রাবী দাররাজ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং 'দাররাজ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন লাহীআহ, হাসান ইব্ন মুসা ও আব্দুর রহমান ইব্ন হামীদের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 'উপরোক্ত হাদীস ইব্ন লাহীআহ ভিন্ন অন্য কোন রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, উক্ত রিওয়ায়েত ইব্ন লাহীআহ ভিন্ন অন্য রাবীর মাধ্যমেও বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত সনদ দ্বারাই উহা প্রমাণিত হয়। এতদসত্ত্বেও উহার সনদে গণ্ডগোল রহিয়াছে। উক্ত গণ্ডগোল ইব্ন লাহীআহ্র পরবর্তী রাবীর মধ্যে। উক্ত হাদীস একটি দুর্বল হাদীস। সহীহ সনদে উহার বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত উসমান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কেনানাহ আদাবী, আব্দুল হামীদ ইব্ন জা'ফর, হাম্মাদ ইব্ন সালিমাহ, আলী ইব্ন জারীর, সালেহ কুশায়রী, ইবরাহীম ইব্ন আব্দুস সালাম, মুছান্না ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ ويل হইতেছে জাহান্নামের একটি পর্বতের নাম।' উক্ত হাদীস মাত্র একটি সনদে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'ويل অর্থ কঠোর শাস্তি।' খলীল ইব্ন আহমদ বলেন– 'ويل অর্থ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অবাঞ্ছিত বিষয় বা বস্তু।' সীবওয়াই বলেন– ويل অর্থ ধ্বংসে পতিত হইবার অবস্থা, পক্ষান্তরে ويح ধ্বংসের সম্মুখীন হইবার

অবস্থা।' আসমাঈ বলেন- ويل শব্দটি কাহারো ভীতিকর অবস্থায় পতিত হইবার সংবাদ প্রদান করিবার জন্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে, উহাতে বক্তার মনে বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতির ভাব বর্তমান থাকে না। পক্ষান্তরে, ويح শব্দটি কাহারো ভীতিকর অবস্থায় পতিত হইবার সংবাদ প্রদান করিবার জন্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং উহাতে কথকের মনে বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতির ভাব বর্তমান থাকে।' কেহ কেহ বলেন- ويل অর্থ দুঃশ্চিন্তা বা উদ্বেগ।' প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ বলেন- ويل - ويح - ويه ويك এবং ويب এই শব্দগুলি সমার্থক শব্দ। আবার কেহ কেহ উহাদের অর্থ পার্থক্য নির্দেশ করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন- ويل শব্দটি نكرة (অনির্দিষ্টবাচক) হওয়া সত্ত্বেও এই স্থলে উহা এই কারণে বাক্যের مبتدا। (আরবী বাক্যে ক্রিয়ার পূর্বে স্থাপিত উদ্দেশ্য) হইতে পারিয়াছে যে, বাক্যটি একটি প্রার্থনাসূচক (دعائيه) বাক্য। কেহ কেহ বলেন- 'এই স্থলে ويل শব্দটিকে কর্মকারকের বিভক্তি نصب দিয়া ويلا রূপেও পাঠ করা যায়। এইরূপ অবস্থায় উহার পূর্বে الزم। (আল্লাহ্ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন) ক্রিয়াটিকে উহ্য ধরিতে হইবে। আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি ويل শব্দটিকে এই স্থলে কেহই ويلا রূপে পাঠ করেন নাই।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরামা فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الخ। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতে ইয়াহূদীদের উলামা সমাজের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা মনগড়া মিথ্যা কথাকে তাওরাতের কথা বলিয়া প্রচার করে।' কাতাদাহ হইতে সাঈদ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'এই আয়াতে ইয়াহূদী জাতির লোকদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুর রহমান ইব্ন আলকামাহ ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الخ। আয়াতে মুশরিক ও আহলে কিতাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সুদ্দী উহার ব্যাখ্যায় বলেন- একদল ইয়াহূদী মনগড়া কতগুলি মিথ্যা কথা লিখিয়া আরবের লোকদের নিকট এই বলিয়া বিক্রয় করিত যে, উহা আল্লাহ্র বাণী। এইরূপে মিথ্যার বিনিময়ে তাহারা মানুষের নিকট হইতে পয়সা কামাই করিত।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ও যুহরী বর্ণনা করেন ঃ 'একদিন হযরত ইব্ন অব্বাস (রা) বলিয়াছেন, হে মুসলমানগণ। তোমরা কিরূপে আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট কোন (দীনী) বিষয় জিজ্ঞাসা কর? অথচ আল্লাহ তা'আলার কিতাব তাঁহার বাণী ও কথাকে তোমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছে। উহা সদ্য অবতীর্ণ কিতাব। উহা তোমরা তিলাওয়াত করিয়া থাক। উক্ত কিতাবে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আহলে কিতাব সম্প্রদায় আল্লাহ্র কিতাবে পরিবর্তন আনিয়াছে। তাহারা মনগড়া মিথ্যা কথাকে আল্লাহ্র বাণী নাম দিয়া মানুষের মধ্যে প্রচার করিয়াছে। এই সব তাহারা করিয়াছে তুচ্ছ ধন-দৌলত ও মান-মর্যাদা কামাই করিবার উদ্দেশ্যে। তোমাদের নিকট আল্লাহ্র তরফ হইতে যে বাণী আসিয়াছে, উহা কি তোমাদিগকে তাহার নিকট দীনী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করে নাই? আল্লাহ্র কসম! আমি তাহাদের কাহাকেও তোমাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাব সম্বন্ধে কোন কিছু তোমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে শুনি নাই।' ইমাম বুখারী উক্ত রিওয়ায়েতকে যুহরীর মাধ্যমে একাধিক সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাসান ইব্ন আবুল হাসান বসরী বলেন– পৃথিবী ও উহার সমুদয় ধন-সম্পদই ثَمَنٍ قَلِيلٍ (স্বল্প মূল্য)। فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ অর্থাৎ তাহাদের মনগড়া মিথ্যা কথা লিখিয়া উহাকে আল্লাহ্র কালাম বলিয়া চালাইয়া দিবার এবং তৎপরিবর্তে তাহাদের তুচ্ছ পার্থিব ধন-সম্পদ কামাই করিবার কারণে তাহাদের জন্যে রহিয়াছে মহা শাস্তি।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ

فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ অর্থাৎ তাহাদের মনগড়া মিথ্যা কথা লিখিয়া উহাকে আল্লাহ্র কালাম নাম দিয়া মূর্খ ব্যক্তিদের নিকট উহা প্রচার করিবার এবং তৎপরিবর্তে তাহাদের নিকট হইতে তুচ্ছ পার্থিব ধন-সম্পদ কামাই করিবার কারণে তাহাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক মহাশাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।'

মোটকথা এই যে, ইয়াহুদীরা বাহির হইতে তাহাদের মনঃপুত কথা তাওরাতে আমদানী করিত এবং তাওরাতের অমনঃপুত কথা উহা হইতে ছাঁটিয়া ফেলিত। তাহারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর নাম তথা তাঁহার পরিচয় ও গুণাবলী তাওরাত হইতে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা উহা করিয়াছিল তুচ্ছ পার্থিব ধন-সম্পদ তথা মান-সম্মানের লোভে। তাহাদের এই জঘন্য পাপাচারের কারণে তাহাদের জন্যে আল্লাহ্র নিকট কঠোর শাস্তি নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে।

(৮০) وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

৮০. আর তাহারা বলে, 'নির্দিষ্ট কয়েকদিন ছাড়া অগ্নি কখনও আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না।' তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পাইয়াছ যে, আল্লাহ্ কখনও নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন না? কিংবা, তোমরা আল্লাহ্র ব্যাপারে যাহা জান না তাহাই বলিতেছ?'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী জাতির মিথ্যা দাবী উল্লেখ করত উহার মিথ্যা হওয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইয়াহুদীগণ বলিত– আমাদিগকে মাত্র কয়েক দিন দোযখে থাকিতে হইবে। অতঃপর আমরা দোযখ হইতে মুক্তি পাইব। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন– তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট হইতে এইরূপ কোন ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইয়াছ? এইরূপ হইলে অবশ্য তোমাদের দাবী সত্য হইত। কারণ, তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন– 'না, তোমরা তাঁহার নিকট হইতে এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লও নাই। তোমাদের আকীদা-বিশ্বাস, মন-মানসিকতা ও কার্যকলাপ যেইরূপ জঘন্য, তাহাতে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি তোমরা আদায় করিতে পারও না। বরং তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করিয়া থাক।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, সায়ফ ইব্ন সুলায়মান ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'ইয়াহুদীগণ বলিত– এই দুনিয়া সাত হাজার বৎসর

টিকিবে। আর প্রতি এক হাজার বৎসরের পরিবর্তে আমাদিগকে একদিন দোযখে পুড়িতে হইবে। এই হিসাবে আমাদিগকে মাত্র সাত দিন দোযখে থাকিতে হইবে। ইহা স্বল্প কয়েকটি দিন মাত্র। তাহাদের উক্ত দাবী উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত ও উহার পরবর্তী আয়াত নাযিল করেন। উক্ত রিওয়ায়েতকে আবার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতে ইয়াহূদীদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা বলিত, 'আমাদিগকে মাত্র চল্লিশ রাত দোযখে থাকিতে হইবে।' তাহাদের উক্ত দাবীর অসত্যতা প্রমাণ করিবার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উপরোক্ত ব্যাখ্যার বিশ্লেষণে কথিত হইয়াছে যে, 'উক্ত চল্লিশ রাত হইতেছে তাহাদের গো-বৎস পূজার স্থায়ীত্বের কালের সমান।' ইমাম কুরতুবীও উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'ইয়াহূদীরা দাবী করিত যে, 'তাহারা তাওরাত কিতাবে এই কথা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইয়াছে যে, জাহান্নামের উপরিভাগ হইতে উহার তলদেশ পর্যন্ত (যে স্থানে যাক্কুম (زقوم) বৃক্ষ অবস্থিত) চল্লিশ বৎসরের পথ।' আল্লাহ্র শত্রুরা (ইয়াহূদীরা) বলিত, উক্ত যাক্কুম বৃক্ষ পর্যন্ত পৌঁছিতে যতদিন লাগিবে, আমাদিগকে মাত্র ততদিন দোযখের আযাব ভোগ করিতে হইবে। আমাদের উক্ত বৃক্ষ পর্যন্ত পথ অতিক্রম করিবার পর জাহান্নাম ধ্বংস ও বিলীন হইয়া যাইবে।'

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ايام معدودة অর্থাৎ যতদিন আমরা গো-বৎস পূজা করিয়াছি, ততদিন মাত্র।' ইকরামা বলেন- 'একদা ইয়াহূদীরা নবী করীম (সা)-এর সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইল। তাহারা বলিল- 'আমাদিগকে মাত্র চল্লিশ রাত দোযখে থাকিতে হইবে। অতঃপর, অন্য এক জাতি আমাদের পরিবর্তে উহাতে প্রবেশ করিবে।' 'অন্য এক জাতি' দ্বারা তাহারা নবী করীম (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল। নবী করীম (সা) স্বীয় হস্ত তাহাদের মস্তকে রাখিয়া বলিলেন- 'না; বরং তোমাদিগকে তথায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতে হইবে। তোমাদের পরিবর্তে কেহ তথায় প্রবেশ করিবে না।' এই ঘটনা উপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন আবূ সাঈদ, লায়ছ ইব্ন সা'দ, আবূ আবদির রহমান আল মুকরী, মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সখর, আব্দুর রহমান ইব্ন জা'ফর ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'খায়বার বিজয়ের দিন ইয়াহূদীদের পক্ষ হইতে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে একটি বিষ মিশ্রিত রন্ধনকৃত বকরী হাদিয়া হিসাবে উপস্থাপিত হইল। নবী করীম (সা) নির্দেশ দিলেন 'এখানে উপস্থিত সকল ইয়াহূদীকে আমার সম্মুখে আন।' তাহাদিগকে নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে, তিনি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন- 'তোমাদের পিতা কে? তাহারা বলিল, 'আমাদের পিতা অমুক ব্যক্তি।' তিনি বলিলেন, তোমরা মিথ্যা বলিয়াছ। তোমাদের পিতা বরং অমুক ব্যক্তি।' তাহারা বলিল, 'আপনি ঠিক ও সত্য বলিয়াছেন।' অতঃপর নবী করীম (সা) তাহাদিগকে বলিলেন, 'আমি তোমাদের নিকট একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা কি সত্য ও সঠিক উত্তর দিবে?' তাহারা বলিল, 'হে আবুল কাসিম! হ্যাঁ; আমরা সত্য ও সঠিক উত্তর

দিব। আর যদি আমরা মিথ্যা উত্তর দেই, তবে তো আপনি যেইরূপে আমাদের পিতার নামের ব্যাপারে আমাদের মিথ্যাকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন, সেইরূপে উহাও ধরিয়া ফেলিবেন।' তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, 'কাহারা দোযখে যাইবে?' তাহারা বলিল 'সেখানে সামান্য কয়েকদিন আমাদিগকে থাকিতে হইবে। অতঃপর আমাদের পরিবর্তে আপনারা সেখানে থাকিবেন।' নবী করীম (সা) বলিলেন– 'আল্লাহ্কে ভয় করিয়া কথা বল। আল্লাহ্র কসম! আমরা তোমাদের পরিবর্তে সেখানে কোনদিন প্রবেশ করিব না?' অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন– 'আমি তোমাদের নিকট একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা কি সঠিক ও সত্য উত্তর দিবে?' তাহারা বলিল– 'হে আবুল কাসিম! হ্যাঁ; আমরা সঠিক ও সত্য উত্তর দিব।' তিনি বলিলেন– 'তোমরা এই বকরীতে বিষ মিশাইয়াছ?' তাহারা বলিল– 'হ্যাঁ; আমরা ঐরূপ করিয়াছি।' তিনি বলিলেন– 'তোমরা কেন এইরূপ করিয়াছ?' তাহারা বলিল– 'আমাদের উদ্দেশ্য, আপনি মিথ্যাবাদী হইলে আমরা আপনার হাত হইতে মুক্তি পাইব। আর যদি আপনি সত্যই নবী হন, তবে তো উহা আপনার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।'

ইমাম বুখারী, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম আহমদও উক্ত হাদীসকে উপরোক্ত রাবী লায়ছ ইব্ন সা'দ হইতে উহার অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অধস্তন বিভিন্ন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

শব্দার্থ ঃ আয়াতের অন্তর্গত "ام" শব্দটি এইস্থলে 'বরং' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(٨١) بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(٨٢) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৮১. 'হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ উপার্জন করিয়াছে আর নিজ পাপে যে আবিষ্ট রহিয়াছে, অনন্তর তাহারাই জাহান্নামের বাসিন্দা। সেখানে তাহারা চিরদিন থাকিবে।'

৮২. আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে, তাহারাই জান্নাতের বাসিন্দা। সেখানে তাহারা চিরকাল কাটাইবে।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কাহারো দোযখের শাস্তি ভোগ করিবার এবং জান্নাতের সুখ-শান্তি লাভ করিবার প্রকৃত কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন– যে ব্যক্তি পাপাচার করিয়াছে আর তাহার নিকট কোন নেকী নাই, সে ব্যক্তি এই অবস্থায় কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাকে চিরদিন দোযখে পুড়িতে হইবে। তাহার কোন খোশ-খেয়াল ও আত্মপ্রসাদ তাহাকে দোযখের আযাব হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। ইয়াহুদীরা আল্লাহর নবী ও আল্লাহ্র কিতাবকে অবিশ্বাস করিয়াছে। তাহারা সত্যের ঘৃণ্য শত্রু। তাহাদের নিকট কোন নেক আমল নাই। ঈমান না থাকিলে নেক আমল

বলিয়া ঘোষিত কাজও আল্লাহ্র নিকট নেক আমল বলিয়া পরিগণিত হইবে না। তাহারা এই অবস্থায় আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হইলে 'আল্লাহ্ আমাদিগকে অতিশয় ভালবাসেন; তিনি আমাদিগকে বেশী দিন দোযখে রাখিবেন না' তাহাদের এইরূপ ধারণা, খোশ-খেয়াল ও আত্মপ্রসাদ সত্ত্বেও তাহারা চিরদিন দোযখে থাকিবে। তাহাদের উক্ত খোশ-খেয়াল তাহাদের কোন কাজে আসিবে না। তাহাদের উক্ত ধারণা তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না। তাহাদের উক্ত আত্মপ্রসাদ তাহাদিগকে দোযখের আগুন হইতে বাহিরে আনিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে, সে জান্নাতবাসী হইবে। সেইখানে সে চিরদিন চিরস্থায়ীভাবে বাস করিবে। সে কোনদিন সেইস্থান হইতে বহিষ্কৃত হইবে না। ইয়াহুদী তথা অন্যান্য কাফিরের শক্রতামূলক আকাঙ্ক্ষায় কোন কাজ হইবে না। তাহারা আকাঙ্ক্ষা করে, মু'মিনগণ দোযখে যাক, তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিতে না পারুক, পারিলেও তথায় বেশী দিন থাকিতে না পারুক।' কিন্তু, এইসব শুধু তাহাদের হিংসাপূর্ণ কামনা ও আকাঙ্ক্ষা। উহা কোনদিন পূর্ণ হইবে না– পূর্ণ হইতে পারে না। বরং নেককার মু'মিনগণ দোযখে যাইবে না। তাহারা জান্নাতে যাইবে। জান্নাতে তাহারা চিরদিন বাস করিবে। তাহারা উহা হইতে কোনদিন বহিষ্কৃত হইবে না।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ন্যায় অনত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ - مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَبِهِ وَلاَيَجِدْ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلاَ نَصِيْرًا - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَيُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا -

'না তোমাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহের কারণে, আর না আহলে কিতাবের আকাঙ্ক্ষাসমূহের কারণে কিছু ঘটিবে। বরং কোন ব্যক্তি পাপাচার করিলে সে উহার শাস্তি ভোগ করিবেই। আর সে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে না কোন বন্ধু আর না কোন সাহায্যকারী পাইবে। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি মু'মিন অবস্থায় কোন নেক কাজ করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবেই। আর কোন লোকের প্রতি সামান্যতম অত্যাচারও করা হইবে না।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমাদের (ইয়াহুদীদের) আমলের ন্যায় আমল করিবে, তোমাদের কুফর করিবার ন্যায় কুফর করিবে এবং তদ্দরুণ তাহার নিকট কোন নেক আমল থাকিবে না....। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ سَيِّئَةً অর্থাৎ শিরক। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন– 'আবূ ওয়ায়েল আবুল আলীয়া, মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান, কাতাদাহ এবং রবী' ইব্ন আনাস হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। হাসান ও সুদ্দী বলেন سَيِّئَةً অর্থাৎ কোন কবীরা গুনাহ্। মুজাহিদ হইতে ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ অর্থাৎ তাহার অন্তরের পাপ তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিবে, যদ্দরুণ তাহার নিকট কোন নেক আমল থাকিবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা), আবূ ওয়ায়েল, আতা এবং হাসান বলেন وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ অর্থাৎ তাহার শিরক

তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিবে যদ্দরুণ তাহার নিকট কোন নেক আমল থাকিবে না।' রবী' ইব্ন খায়ছাম হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ রযীন ও আ'মাশ বর্ণনা করিয়াছেন, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ' অর্থাৎ সে ব্যক্তি তওবা না করিয়াই স্বীয় গুনাহ্সমূহ লইয়া মরে। সুদ্দী এবং আবূ রযীন হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে। আবুল আলীয়া, কাতাদাহ, রবী' ইব্ন আনাস এবং এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী মুজাহিদ ও হাসান বলেন ঃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ' অর্থাৎ যে গুনাহ দোযখে প্রবেশ করা ওয়াজিব করিয়া দেয়, সে ব্যক্তি সেই গুনাহ করিয়াছে। উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহ প্রায় পরস্পর একই ব্যাখ্যা। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইয়ায, আব্দু-রাব্বিহী, আমর ইব্ন কাতাদাহ, সুলায়মান ইব্ন দাউদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'সাবধান। তোমরা ছোট ছোট গুনাহকে অবহেলা করিও না, বরং উহা হইতেও দূরে থাকিও। কারণ ছোট ছোট গুনাহ কাহারো মধ্যে একত্রিত হইলে উহা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দেয়। প্রসঙ্গত নবী করীম (সা) একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'একদল লোক একটি প্রান্তরে উপস্থিত হইল। তথায় তাহাদের খাদ্য উপস্থিত হইল। অতঃপর তাহাদের প্রত্যেকে একখানা করিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করত উহাদিগকে একস্থানে জড়ো করিল। তারপর উহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। উক্ত আগুনে তাহারা যাহাই নিক্ষেপ করিল, তাহাই জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ـ اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ। অর্থাৎ হে ইয়াহুদীগণ! তোমরা যাহা অবিশ্বাস করিয়াছ, উহা যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং তোমরা যে নেক আমল কর নাই, উহা যাহারা করিয়াছে, তাহারা জান্নাতের অধিবাসী হইবে এবং উহাতে তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইয়া দিতেছেন যে, কাফিরগণ চিরদিন দোযখে থাকিবে। তাহারা উহা হইতে কোনদিন বাহির হইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে, নেককার মু'মিনগণ চিরদিন বেহেশতে বসবাস করিবে। তাহারা কোনদিন উহা হইতে বহিষ্কৃত হইবে না।

(٨٣) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

৮৩. আর আমি যখন বনী ইসরাঈলদের এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও ইবাদত করিবে না আর তোমরা বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম-মিসকীনদের প্রতি ইহসান করিবে, মানুষকে ভাল কথা বলিবে, সালাত কায়েম করিবে ও যাকাত দিবে। তারপর তোমাদের নগণ্য লোক ব্যতীত সকলেই উহা উপেক্ষা করিল। মূলত তোমরা ঘাড় ফিরাইয়া চলারই লোক।

Contents

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত অঙ্গীকারের এবং তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। বনী ইসরাঈল জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র তাঁহার ইবাদত করিতে, মাতা-পিতার প্রতি, রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের প্রতি, ইয়াতীমের প্রতি এবং দরিদ্রের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে, সকল মানুষের প্রতি প্রিয়ভাষী হইতে, সালাত কায়েম করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে আদেশ করত এই সকল বিষয়ে তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিকে উহা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যাহাতে তাহারা আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে ফিরিয়া আসে।

আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকেই একমাত্র তাঁহাকে ইবাদত করিতে এবং শিরক হইতে পবিত্র থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আর প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহাদিগকে পয়দা করিয়াছেন এই জন্যেই। তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ـ

'আর আমি তোমার পূর্বে যত রাসূল পাঠাইয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট এই ওহী প্রেরণ করিয়াছি যে, আমি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই; অতএব, তোমরা আমার ইবাদত কর।

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

'আর নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির নিকট এই নির্দেশ দিয়া রাসূল পাঠাইয়াছি যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং শয়তান হইতে দূরে থাক।'

আল্লাহ্র ইবাদত হইতেছে মানুষের সর্বপ্রধান কর্তব্য। উহা মানুষের নিকট প্রাপ্য আল্লাহ্র হক। অতঃপর বান্দার হকের স্থান। বান্দার নিকট বান্দার প্রাপ্য যতগুলি হক আছে, তন্মধ্যে মাতা-পিতার হক হইতেছে প্রধানতম। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের হকের অব্যবহিত পর মাতা-পিতার হককে উল্লেখ করিয়া থাকেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

"اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ـ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ـ ......এই যে, তুমি আমার প্রতি এবং তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لاَّتَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ـ اِلٰى قَوْلِهِ تَعَالٰى وَاٰتِ ذَالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ اِلٰى اٰخِرِ الاٰيَةِ ـ

'আর তোমার প্রভু নির্দেশ দিতেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহারও ইবাদত করিও না এবং মাতা-পিতার প্রতি সদাচার করিও। .... আর রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়কে তাহার প্রাপ্য প্রদান করিও। আর দরিদ্রকে এবং পথিককেও...।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয

করিলাম– হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ নেক আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বলিলেন– যথাসময়ে (ওয়াক্ত মত) নামায আদায় করা। আমি আরয করিলাম– অতঃপর কোন্ আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বলিলেন– মাতাপিতার প্রতি সদাচার। আমি আরয করিলাম– অতঃপর কোন্ আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বলিলেন– আল্লাহ্র পথে জিহাদ।

একদা জনৈক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কাহার প্রতি সদাচার করিব? নবী করীম (সা) বলিলেন– তোমার মায়ের প্রতি। সাহাবী আরয করিলেন– অতঃপর কাহার প্রতি? নবী করীম (সা) বলিলেন– তোমার মায়ের প্রতি। সাহাবী আরয করিলেন– অতঃপর কাহার প্রতি? নবী করীম (সা) বলিলেন– তোমার বাপের প্রতি। অতঃপর তোমার রক্ত সম্পর্কের নিকটতম আত্মীয়ের প্রতি। উহা একটি সহীহ হাদীস।

لاَتَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اِيَّاهُ তোমরা তাঁহাকে ছাড়া অন্য কাহারও ইবাদত করিও না।

আল্লামা যামাখশারী বলেন ঃ لاَتَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اِيَّاهُ এই বাক্যটি দৃশ্যত সংবাদসূচক (خبريه) বাক্যের মত হইলেও এইস্থলে উহা অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর এইরূপ অবস্থায় অনুজ্ঞাসূচক অর্থে অধিকতর জোর ও শক্তি সৃষ্টি হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন– 'বাক্যটি মূলত এই ছিল ঃ اَنْ لاَتَعْبُدُوْا اِلاَّ اللّٰهَ ও পূর্ব যুগীয় কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ উহাকে ঐরূপে পড়িয়াছেনও। উহার اَنْ শব্দটিকে তুলিয়া দেওয়ায় আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিশেষ সূত্র অনুযায়ী উহার রূপ لاَتَعْبُدُوْا اِلاَّ اللّٰهَ হইয়াছে। হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) এবং হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা উহাকে এইরূপে পড়িতেন ঃ لا تعبدوا الا الله উপরে لا تعبدون الا الله বাক্যের যে ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ বর্ণিত হইয়াছে, ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে উহাকে প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ সীবওয়াইহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সিবওয়াই উপরোক্ত বিশ্লেষণ প্রদান করিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী আরও বলিয়াছেন যে, ব্যাকরণবিদ কাসাঈ এবং ব্যাকরণবিদ ফার্‌রা, সীবওয়াইহ্ এর উক্ত বিশ্লেষণকে সমর্থন করিয়াছেন।

শব্দার্থ ঃ اليتمى। পিতা বা অন্য কোন উপার্জনক্ষম ভরণ-পোষণকারী অভিভাবকহীন শিশু-কিশোর। المساكين। যাহাদের নিজেদের ও পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পত্তি নাই। 'সূরা নিসা' এর وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَتُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا الخ এই আয়াতে উপরোক্ত শ্রেণীসমূহ সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করা হইবে।

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا অর্থাৎ লোকদের সহিত বিনীতভাবে কথা বলিও; তাহাদিগকে ভালো কথা বলিও এবং তাহাদের সহিত শিষ্টতা সহকারে মিলিত হইও। মানুষকে নেক কাজ করিতে এবং বদ কাজ হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেওয়াও উহার অন্তর্ভুক্ত। হাসান বসরী বলেন– 'মানুষকে নেক কাজ করিতে এবং বদ কাজ হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেওয়া, কেহ অসদ্ব্যবহার করিলে ধৈর্যধারণ করা তথা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া সবই حسن (সদাচার)-এর অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা আল্লাহ যে আচরণকে ভালবাসেন ও পছন্দ করেন, তাহাই حسن (সদাচার)।'

হযরত আবূ যর গিফারী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্লাহ ইব্ন সামিত, আবূ ইমরান জওনী, আবূ আমের খাররায, রওহ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'কোন নেক কাজকেই ছোট নজরে দেখিও না। করিবার মত কোন নেক কাজ খুঁজিয়া না পাইলে স্বীয় ভ্রাতার সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ কর।'

ইমাম মুসলিম এবং ইমাম তিরমিযী উহা উপরোক্ত রাবী আবূ আমের খার্‌রায হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্দ্ধতন সনদাংশে এবং বিভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহাকে সহীহ হাদীস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। রাবী আবূ আমের খার্‌রায-এর আরেক নাম হইতেছে, সালেহ ইব্ন রুস্তম।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে ধন-সম্পত্তির মাধ্যমে মানুষের প্রতি ইহ্সান বা সদাচার করিবার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর মৌখিক ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের প্রতি সদাচার করিবার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে আলোচ্য আয়াতে আর্থিক সদাচার ও লৌকিক সদাচার উভয়েরই উল্লেখ রহিয়াছে।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ্ তা'আলা সামগ্রিকভাবে তাঁহার নিজের হকের বিষয় এবং বান্দার হকের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর আয়াতে উপরোক্ত অংশে তাঁহার নিজের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হক সালাত এবং বান্দার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হক যাকাত এই দুইটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে বলিয়াছেন যে, বনী ইসরাঈল জাতির স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়াছে। এইরূপে তাহারা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে। বস্তুত তাহারা একটি সত্যবিমুখ জাতি।

আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে যেইরূপে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বিষয়সমূহের নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপে 'সূরা নিসা'-এর নিম্নোক্ত আয়াতে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার প্রতি উপরোক্ত বিষয়সমূহের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا ـ

'আর আল্লাহ্র ইবাদত কর ও তাঁহার সহিত কোন কিছু শরীক করিও না; মাতা-পিতার কল্যাণ কর, তেমনি কল্যাণ কর আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, মুসাফির ও তোমাদের অধীনস্থগণের। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক স্বেচ্ছাচারীকে পছন্দ করেন না।'

দেখা গিয়াছে—এই উম্মতের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত নির্দেশকে অন্যান্য উম্মত অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য।

এই স্থলে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম একটি অদ্ভূত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। আসাদ ইব্ন ওয়াদাআহ হইতে ধারাবাহিকভাবে হামিদ ইব্ন উকবাহ, খালিদ ইব্ন সাবীহ, আব্দুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (তানীসী), মুহাম্মদ ইব্ন খল্ফ আস্কালানী, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন ঃ 'আসাদ ইব্ন ওয়াদাআহ পথ চলিবার কালে মুসলিম, ইয়াহুদী, নাসারা প্রত্যেককে সালাম দিতেন। একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি ইয়াহুদী ও নাসারাকে কেন সালাম দেন? তিনি বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا 'অনন্তর তোমরা মানুষের সহিত কথায় শিষ্টাচারী হও।'

তিনি বলিলেন–'এই স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে সালাম দিতে আদেশ করিয়াছেন।' ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন–'আতা খোরাসানী হইতেও উপরোক্ত আয়াতাংশের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।' আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, আহলে কিতাবকে (ইয়াহুদী-নাসারাকে) প্রথমে সালাম দেওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

(٨٤) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○

(٨٥) ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ط اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

(٨٦) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ز فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৮৪. আর যখন আমি তোমাদের পাক্কা ওয়াদা নিলাম যে, তোমরা পরস্পর রক্তপাত ঘটাইবে না ও কাহাকেও কেহ কেহ দেশ ত্যাগী করিবে না। তোমরা তাহা স্বীকার করিয়া নিয়াছ এবং তোমরাই উহার সাক্ষ্য দিতেছ।

৮৫. অথচ সেই তোমরাই পরস্পরকে হত্যা করিতেছ ও একদল অপরদলকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিতেছ। তাহাদের উপর পাপাচার ও বাড়াবাড়ির দৌরাত্ম্য চালাইতেছ। তাহারা বন্দী হইয়া আসিলে পণবন্দী আদায় করিতেছ। অথচ তোমাদের জন্য উহা হারাম

করা হইয়াছে। তোমরা কি কিতাবের কিছু কথা মানিতেছ ও কিছু কথা অস্বীকার করিতেছ? তোমাদের যাহারা তাহা করিতেছে তাহাদের শাস্তি হইল ইহকালের লাঞ্ছিত জীবন ও পরকালে তাহারা কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত হইবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন নহেন।

৮৬. তাহারাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করিল। তাই তাহাদের শাস্তি হ্রাস করা হইবে না এবং কোন সাহায্যই তাহারা পাইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মদীনার তৎকালীন ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। এতদসহ তাহাদের উক্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ তথা পাপাচারের অশুভ পরিণতির কথাও তাহাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাত কিতাবে নর-হত্যাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। নবী করীম (সা) এক যুগে মদীনার ইয়াহুদীগণ সেই নর-হত্যারূপ জঘন্য পাপাচার লিপ্ত ছিল। মদীনাতে জাহেলী যুগে আওস ও খায্‌রাজ নামে দুইটি গোত্র বাস করিত। তাহারা মূর্তিপূজা করিত। নবী করীম (সা)-এর হিজরতের পর ইহারাই মুসলমান হইয়া আনসার (ইসলাম তথা আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্যকারী দল) নামে অভিহিত হন। জাহেলী যুগে আওস ও খায্‌রাজ গোত্রে সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। মদীনাতে তখন তিনটি ইয়াহুদী গোত্র বাস করিত ঃ বনূ কায়নুকা, বনূ নাযীর এবং বনূ কুরায়যাহ্। ইহাদের প্রথমোক্ত গোত্রদ্বয় খায্‌রাজ গোত্রের এবং শেষোক্ত গোত্রটি আওস গোত্রের সন্ধিবদ্ধ সাহায্যকারী ছিল। তাহারা আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহে স্ব-স্ব মিত্র পক্ষকে উহার বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে সাহায্য করিত। তাহারা স্ব স্ব মিত্র পক্ষের সহিত রণাক্ষেত্রে থাকিয়া প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত। এইরূপে একদল ইয়াহুদী ও পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়া স্বজাতীয় ইয়াহুদী এবং বিজাতীয় পৌত্তলিকদিগকে হত্যা করিত ও বন্দী করিত। তাহারা বিপক্ষীয়দিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিত এবং তাহাদের ধন-সম্পত্তি লুট করিয়া লইত। স্বজাতীয় ইয়াহুদীকে হত্যা করা, তাহাকে নির্বাসিত করা ইত্যাদি কাজ তাহাদের কিতাব তাওরাতে স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ ছিল। তথাপি তাহারা উহা করিত। আবার যুদ্ধ বন্ধ হইবার পর তাওরাতের নির্দেশ অনুযায়ী মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দিত। اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ এই আয়াতাংশে উপরোক্তরূপে তাহাদের আল্লাহ্‌র কিতাবের কিয়দংশ মান্য করিবার এবং কিয়দংশ অমান্য করিবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

لاَ تَسْفِكُوْنَ دِمَاءَكُمْ وَلاَتُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ অর্থাৎ-তোমাদের একজন আরেকজনকে হত্যাও করিবে না আর একজন আরেকেজনকে তাহার গৃহ হইতে বহিষ্কৃতও করিবে না। উপরোক্তরূপ বাগধারা অন্যত্রও অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَتُوْبُوْا اِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ "অতএব, তোমরা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা কর; আর একে অপরকে হত্যা কর।"

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ বনী ইসরাঈল জাতির জন্যে তাহাদের একজনকে আরেকজনের হত্যা করা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। উহার কারণ এই যে, তাহারা একই

দীন ও শরীআতের অনুসারীগণ সকলে সম্মিলিতভাবে একটি মাত্র ব্যক্তির সমতুল্য। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, মু'মিনগণ তাহাদের পারস্পরিক মমত্ববোধ, সহানুভূতি ও আত্মীয়তাবোধের দিক দিয়া সকলে সম্মিলিতভাবে একটি মাত্র দেহের সমতুল্য। উহার একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হইলে অন্যান্য অঙ্গ উত্তেজিত ও যন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়া এবং রাত্রি জাগরণ করিয়া উহার রোগযন্ত্রণায় সাড়া দিয়া থাকে।

ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ –অর্থাৎ 'অতঃপর তোমরা উক্ত প্রতিশ্রুতিকে বুঝিবার এবং উহা সঠিক হইবার কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলে। আর তোমরা উহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলে।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জারীর অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ, ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'মদীনার ইয়াহুদীগণ তিনটি গোত্রে বিভক্ত ছিল ঃ বনূ কায়নুকা, বনূ নাযীর এবং বনূ কুরায়যা। পক্ষান্তরে সেখানকার পৌত্তলিকরা দুইটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আওস এবং খায্রাজ। প্রথমোক্ত ইয়াহুদী গোত্রটি শেষোক্ত পৌত্তলিক গোত্রের সন্ধিসূত্রে মিত্র ছিল। পক্ষান্তরে শেষোক্ত ইয়াহুদী গোত্র দুইটি প্রথমোক্ত পৌত্তলিক গোত্রের সন্ধিসূত্রে মিত্র ছিল। আওস ও খায্রাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে বনূ কায়নুকা গোত্রের লোকেরা খায্রাজ গোত্রের এবং বনূ নাযীর ও বনূ কুরায়যা গোত্রের লোকেরা আওস গোত্রের পক্ষ অবলম্বন করিত। যুদ্ধের সময়ে এক পক্ষের ইয়াহুদীরা অন্য পক্ষের ইয়াহুদীদিগকে হত্যা করিত, তাহাদিগকে বন্দী করিত, তাহাদের মালামাল লুট করিত এবং তাহাদিগকে গৃহত্যাগী করিত। পৌত্তলিকরা ছিল মূর্খ। তাহারা হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, আখিরাত, বেহেশত-দোযখ কিছুই বুঝিত না। কিন্তু ইয়াহুদীদের হাতে তাওরাত কিতাব ছিল। উহাতে হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় সব কিছু লিপিবদ্ধ ছিল। উহাতে অহেতুক রক্তপাত, মানুষকে গৃহত্যাগী করা ইত্যাদি কাজ নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। তথাপি তাহারা উক্ত নিষিদ্ধ কাজসমূহ করিত। যুদ্ধ শেষ হইলে একদল ইয়াহুদী অন্য দলের বন্দী ইয়াহুদীদিগকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দিত এবং প্রত্যেক দলের লোকেরা অপর দলের লোকদের নিকট নিজেদের দলের নিহত ব্যক্তিদের জন্যে ক্ষতিপূরণ দাবী করিত। তাওরাত কিতাবে একদিকে অহেতুক রক্তপাত, নির্বাসন ইত্যাদি কার্য নিষিদ্ধ ছিল, অন্যদিকে যুদ্ধবন্দীদিগকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দিবার জন্যে আদেশ ছিল। উপরোক্ত আচরণের মাধ্যমে তাহারা তাওরাতের কোন কোন বিধান মান্য করিত এবং কোন কোন বিধান অমান্য করিত। আমি (হযরত ইব্ন আব্বাস রা) যতদূর জানিতে পারিয়াছি তদনুযায়ী ইয়াহুদীদের উপরোক্ত আচরণ উপলক্ষে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছে।'

সুদ্দী হইতে আসবাত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'মদীনার কুরায়যা নামক ইয়াহুদী গোত্র আওস নামীয় পৌত্তলিক গোত্রের এবং নাযীর নামক ইয়াহুদী গোত্র খায্রাজ নামীয় পৌত্তলিক গোত্রের সন্ধিসূত্রে মিত্র ছিল। কুরায়যা ও নাযীর গোত্রদ্বয়ের প্রত্যেক শাখা আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের পারস্পরিক যুদ্ধে স্ব স্ব মিত্র গোত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া এক ইয়াহুদী গোত্রের লোকেরা অপর ইয়াহুদী গোত্রের লোকদিগকে হত্যা করিত, তাহাদিগকে বন্দী করিত, তাহাদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করিয়া দিত এবং তাহাদিগকে গৃহ হইতে নির্বাসিত করিত। যুদ্ধ শেষ হইলে তাহারা বিপক্ষ দলের বন্দীদিগকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দিত। ইহাতে আরবের অন্যান্য লোক

তাহাদিগকে লজ্জা দিয়া বলিত—তোমরা কিরূপে তোমাদের নিজেদের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং তাহাদের নিকট হইতে মুক্তিপণ আদায় কর ? তাহারা বলিত—'মুক্তিপণ গ্রহণ করিবার জন্যে আমাদের প্রতি তাওরাতে আদেশ রহিয়াছে, তবে যুদ্ধ করা উহাতে নিষিদ্ধ রহিয়াছে।' লোকে বলিত—'তবে কেন যুদ্ধ কর?' আলোচ্য আয়াতগুলি ইয়াহুদীদের উপরোক্ত আচরণ উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে। উহাতে তাহাদের তাওরাত কিতাবের অংশবিশেষ মান্য করিবার এবং অংশবিশেষ অমান্য করিবার বিষয় বর্ণনা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা সেই 'লজ্জাশীল' জাতিকে লজ্জা দিয়াছেন।'

শা'বী হইতে ধারাবাহিকভাবে সুদ্দী ও আসবাত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আলোচ্য আয়াত কয়স ইব্ন হাতিম সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।'

আবুল খায়ের হইতে ধারাবাহিকভাবে সুদ্দী ও আসবাত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আমরা সালমান ইব্ন রবীআহ বাহিলীর সেনাপতিত্বে লানজার নামক স্থানে জিহাদে গমন করিলাম। উহার অধিবাসীদিগকে কিছুদিন অবরুদ্ধ রাখিবার পর আমরা উহা জয় করিলাম। আমাদের বিজয়ের কারণে তাহাদের অনেক লোক আমাদের হাতে বন্দী হইল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) উহাদের মধ্য হইতে একটি ইয়াহুদী দাসীকে সাতশত মুদ্রার বিনিময়ে খরিদ করিয়া লইলেন। তিনি রা'সুল জালূত (رأس الجالوت) নামক জনৈক ইয়াহুদীর কাছ দিয়া যাইবার কালে তাহাকে বলিলেন—হে রা'সুল জালূত! আমার নিকট তোমার স্বধর্মীয় একটি বৃদ্ধ দাসী রহিয়াছে। তুমি কি তাহাকে খরিদ করিবে ? সে বলিল—হ্যাঁ; আমি তাহাকে খরিদ করিতে চাই। তিনি বলিলেন—আমি উহাকে সাতশত দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করিয়াছি। সে বলিল—আমি আপনাকে উহার মূল্য হিসাবে চৌদ্দশত দিরহাম প্রদান করিব। তিনি বলিলেন—আমি হলফ করিয়াছি, চার হাজার দিরহামের কমে উহাকে বিক্রয় করিব না। সে বলিল—তাহাকে আমার খরিদ করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি বলিলেন—আল্লাহ্র কসম! উহাকে তোমার খরিদ না করা তোমার নিজের ধর্মকেই অস্বীকার তথা অমান্য করা ছাড়া কিছুই নহে। তিনি আরও বলিলেন—আমার আরও কাছে আস। সে তাঁহার আরও কাছে আসিলে তিনি তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া তাহাকে তাওরাত কিতাবের এই বাণীটি শুনাইলেন ঃ 'বনী ইসরাঈল জাতির কোন দাস-দাসী তোমার সামনে আসিলে তাহাকে খরিদ করিয়া আযাদ করিয়া দিবে, অন্যথা যেন না হয়।' সে বলিল—আপনি কি আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম ? তিনি বলিলেন—হ্যাঁ; আমি আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম। ইহাতে সে চার হাজার দিরহাম আনিয়া হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালামের হাতে দিল। তিনি উহা হইতে দুই হাজার দিরহাম রাখিয়া অবশিষ্ট দুই হাজার দিরহাম তাহাকে ফেরত দিলেন। এই উপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইয়াছে।

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবহিকভাবে রবী' ইব্ন আনাস, আবূ জা'ফর রাযী ও আদম ইব্ন আবূ ইয়াস স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) কূফা নগরীতে বসবাসকারী রা'সুল জালূত (رأس الجالوت) নামক জনৈক ইয়াহুদীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। ইয়াহুদী লোকটি অনারব ব্যক্তির অধিকারভুক্ত দাসীদিগকে মুক্তিপণ দিয়া মুক্ত করিয়া আনিত; কিন্তু আরব ব্যক্তির অধিকারভুক্ত দাসীদিগকে সে মুক্তিপণ দিয়া মুক্ত করিয়া আনিত না। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) তাহাকে বলিলেন—'তোমার নিকট রক্ষিত তাওরাত কিতাবে কি ইহা লিপিবদ্ধ নাই যে, উভয় শ্রেণীর দাসীদিগকে তুমি মুক্তিপণ দিয়া মুক্ত করিয়া আনিবে?'

যাহা হউক আলোচ্য আয়াতত্রয়ে ইয়াহুদী জাতির নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা যাহাকে তাওরাত বলিয়া দাবী করিত এবং যাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত, তাহাও তাহারা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করিত না। অতএব, তাহাদের কোন কথাই বিশ্বাস করা যায় না। এই সকল অবিশ্বাস্য লোক তাওরাত হইতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর নাম-পরিচয় এবং তাঁহার আবির্ভাব সম্পর্কিত সকল ভবিষ্যদ্বাণী মুছিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাদের এই সকল কার্যের ভয়াবহ অশুভ পরিণতি বর্ণনা করিতে গিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন –

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ اِلٰى قَوْلِه تَعَالٰى وَلاَهُمْ يُنْصَرُوْنَ -

অর্থাৎ ইয়াহুদীদের আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করিবার কারণে পার্থিব জীবনে তাহাদের জন্যে লাঞ্ছনা ও অবমাননা রহিয়াছে আর পরকালীন জীবনে তাহারা কঠোরতম শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে। তাহারা যেহেতু পার্থিব ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ তথা মান-মর্যাদা লাভের জন্য আখিরাত ও উহার স্থায়ী সুখ-শান্তির লোভ ত্যাগ করিয়াছে, তাই মুহূর্তের জন্যেও তাহাদের শাস্তি সামান্য হ্রাস করা হইবে না। আর তাহাদিগকে সেই চিরস্থায়ী শাস্তি হইতে মুক্ত করিবার জন্যে কোন সাহায্যকারীও তাহারা পাইবে না।

(٨٧) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ز وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ○

৮৭. আর নিঃসন্দেহে আমি মূসাকে আল কিতাব দিয়াছি এবং তাহার পর ক্রমাগত রাসূল পাঠাইয়াছি। আর ঈসা ইব্ন মরিয়মকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছি এবং তাহাকে জিবরাঈল দ্বারা সাহায্য করিয়াছি। তারপর যখন তোমাদের অনভিপ্রেত বস্তু নিয়া তোমাদের কাছে রাসূল আসিল, তখন তোমরা দম্ভভরে তাহাদের একদলকে মিথ্যা বলিয়াছ ও অন্য দলকে হত্যা করিয়াছ।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির চিরাচরিত অবাধ্যতা ও সত্য বিদ্বেষের কথা বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে হযরত মূসা (আ) এবং তাঁহার পর বিপুল সংখ্যক রাসূল পাঠাইয়াছেন। সর্বশেষে তাহাদের মধ্য হইতে হযরত ঈসা (আ)-কে তাহাদের হিদায়েতের জন্যে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাহারা সর্বযুগে আল্লাহ্র রাসূলগণকে অমান্য করিয়াছে। ইহা তাহাদের চিরাচরিত স্বভাব। সত্যকে অমান্য করা এবং উহা প্রত্যাখ্যান করা তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপরোক্ত স্বভাবের নিন্দা করিয়াছেন।

وقفينا من بعده بالرسل অর্থাৎ 'মূসার পর আমি বহু রাসূল পাঠাইয়াছি যাহারা তাওরাত কিতাবের শরীআত অনুযায়ী বনী ইসরাঈল জাতিকে পরিচালিত করিত।'

এতদ্সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَّحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ الى اخر الاية ـ

"নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করিয়াছিলাম, উহাতে হিদায়েত ও নূর ছিল। উহার সাহায্যে নবীগণ তাহাদের ফয়সালা করিত যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল–তাহারা ইয়াহূদীদের জন্যে ফয়সালা করিত। আর নেককার এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে কিতাবকে হিফাজত করিবার জন্যে তাহারা আদিষ্ট হইয়াছিল, সেই কিতাবের সাহায্যে ফয়সালা করিত। আর তাহারা উহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিত ... ...।

শব্দার্থ ঃ আবূ মালিক হইতে সুদ্দী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَقَفَّيْنَا –'আর আমি পরবর্তীকালে পাঠাইয়াছি।' অন্যান্য ব্যাখ্যাকারও উহার উপরোক্তরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত মূসা (আ)-এর পর একাধিক নবী প্রেরিত হইবার বিষয়ে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى 'অতঃপর আমি রাসূলগণকে একের পর এক প্রেরণ করিয়াছি।'

وَاٰتَيْنَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ 'আর আমি ঈসা ইব্ন মরিয়মকে নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছিলাম। অতঃপর আমি তাহাকে পবিত্র আত্মা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলাম।'

হযরত ঈসা (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈল জাতির মধ্য হইতে তাহাদের জন্যে প্রেরিত শেষ নবী। তিনি তাওরাতের কোন কোন বিধানের পরিবর্তক বিধান লইয়া আসিয়াছিলেন। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে কতগুলি বিশেষ মু'জিযা প্রদান করিয়াছিলেন।

এই সম্বন্ধে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ "অনন্তর আমি তোমাদের নিকট এই জন্যে প্রেরিত হইয়াছি যে, ইতিপূর্বে তোমাদের জন্যে যাহা যাহা হারাম করা হইয়াছিল, উহাদের কতগুলিকে হালাল বলিয়া ঘোষণা করিব। আর আমি তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে নিদর্শন সহকারে আগমন করিয়াছি।"

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত মু'জিযাসমূহ হইতেছে ঃ মৃত ব্যক্তিদিগকে জীবিত করা; মৃত্তিকা দ্বারা পক্ষী নির্মাণপূর্বক উহাতে ফুঁৎকার দিবার পর আল্লাহ্র আদেশে উহার জীবন্ত পক্ষী হইয়া যাওয়া; রুগ্ন ব্যক্তিদিগকে রোগমুক্ত করা; অদৃশ্য বিষয়াবলী সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান করা এবং রূহুল কুদুস অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)-এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাঁহার সাহায্যপুষ্ট হওয়া।' এই সকল মু'জিযা হযরত ঈসা (আ)-এর সত্যবাদী হইবার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল। কিন্তু ইয়াহূদী জাতি ছিল সত্যদ্বেষী ঈর্ষাপরায়ণ জাতি। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে তাঁহার তাওরাত

বিরোধী হইবার মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া তাহাকে মানিতে অস্বীকার করিল। তাহাদের কুফর ও অবাধ্যতার প্রকৃত কারণ এই যে, আল্লাহ্র নবী কর্তৃক আনীত ব্যবস্থা ছিল তাহাদের প্রবৃত্তির বিরোধী। তাহারা তাওরাতে যে পরিবর্তন আনিয়াছিল, উহা বাদ দিয়া তাওরাতকে অনুসরণ করিবার জন্য আল্লাহর নবী তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের মানসিক প্রবৃত্তিও ছিল তথৈবচ। এই সকল সত্যদ্বেষী লোকগণ আল্লাহ্র রাসূলগণের কতককে শুধু অমান্য এবং কতককে অমান্য ও হত্যা করিয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলিতেছেন ঃ

اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَاتَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ -

রূহুল কুদুসের তাৎপর্য

রূহুল কুদুস (روح القدس) কি ? এই সম্বন্ধে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন-'রূহুল কুদুস' হইতেছে হযরত জিবরাঈল (আ)।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, ইসমাঈল ইব্ন খালিদ, সুদ্দী, রবী' ইব্ন আনাস, আতিয়্যা আওফী এবং কাতাদাহও অনুরূপ বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, তাফসীরকারগণ বলেন-

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ (বিশ্বস্ত রূহ উহাকে তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করিয়াছে-যাহাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্যতম হইতে পার।)-এই আয়াতের অন্তর্গত 'বিশ্বস্ত রূহ' (الروح الامين) হইতেছে হযরত জিবরাঈল (আ)।

নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রূহুল কুদুস হইতেছেন হযরত জিবরাঈল (আ)। ইমাম বুখারী (র) বলেন -হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা), আবুয্ যানাদ ও ইব্ন আবুয্ যানাদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) হযরত হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা)-এর জন্যে মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি উহাতে দাঁড়াইয়া নবী করীম (সা)-এর পক্ষে কাফিরদের বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করিতেন। নবী করীম (সা) বলিয়াছিলেন-'আয় আল্লাহ্! হাস্সান যেইরূপে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) তোমার নবীর পক্ষে (কবিতার মাধ্যমে) প্রতিরোধ কার্য সম্পাদন করিয়াছে, তৎপরিবর্তে তুমি তাহাকে 'রূহুল কুদুস'-এর মাধ্যমে সাহায্য করিও।'

ইমাম বুখারী উপরোক্ত হাদীসকে বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ উহাকে হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, আবুয যানাদ এবং হিশাম ইব্ন উরওয়া, আবূ আব্দির রহমান ইব্ন আবুয্ যানাদ ও ইব্ন সীরীনের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ইমাম তিরমিযী উহাকে উপরোক্ত রাবী আবূ আবদির রহমান হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ আবদির রহমান হইতে আলী ইব্ন হাজার এবং ইসমাঈল ইব্ন মূসা আল ফায্যারীর অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে সহীহ্ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস নামে অভিহিত করিয়াছেন।

'হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব, যুহরী, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না প্রমুখ রাবীর সনদে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ একদা হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা) মসজিদে নববীতে বসিয়া কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন। এই সময়ে হযরত উমর (রা) মসজিদে নববীর কাছ দিয়া যাইতেছিলেন। হযরত হাস্‌সান (রা)-এর প্রতি তিনি কটাক্ষপাত করিলে হযরত হাস্‌সান (রা) বলিলেন-'আমি এই মসজিদে দাঁড়াইয়া কবিতা আবৃত্তি করিতাম। তখন আপনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি ইহাতে উপস্থিত থাকিতেন।' অতঃপর তিনি (হযরত হাস্‌সান (রা) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর প্রতি তাকাইয়া তাঁহাকে বলিলেন-আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়া বলিতেছি-আপনি কি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, '(হে হাসসান!) তুমি আমার পক্ষ হইতে কাফিরদের নিন্দাসূচক কবিতার উত্তর প্রদান কর। হে আল্লাহ্! তুমি তাহাকে রূহুল কুদুস-এর মাধ্যমে সাহায্য কর।' হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন-'আল্লাহ্‌র কসম, হ্যাঁ।' কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) হযরত হাস্‌সান (রা)-কে বলিলেন-'তুমি তাহাদের নিন্দা বর্ণনা কর। হযরত জিব্‌রাঈল (আ) তোমার সঙ্গে রহিয়াছেন।'

হযরত হাস্‌সান (রা)-এর কবিতার দুইটি চরণ হইতেছে এই ঃ

جبريل رسول الله فينا

وروح القدس ليس به خفاء

'আল্লাহ্‌র প্রেরিত ব্যক্তি হযরত জিবরাঈল (আ) আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন। আর রূহুল কুদুসের বিষয়ে কোনরূপ অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা নাই।'

হযরত শাহর ইব্‌ন হাওশাব আশআরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ হুসায়ন মক্কী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা একদল ইয়াহুদী নবী করীম (সা)-কে বলিল الروح। কে তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিন। নবী করীম (সা) বলিলেন-'আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র দোহাই এবং বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের দোহাই দিয়া বলিতেছি-তোমরা কি জান না যে, الروح। হইতেছে হযরত জিবরাঈল (আ) আর তিনি হইতেছেন সেই ফেরেশতা-যিনি আমার নিকট আসিয়া থাকেন ?' তাহারা বলিল - হ্যাঁ।

হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে ইব্‌ন হিব্বান স্বীয় হাদীস সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'নিশ্চয় 'রূহুল কুদুস' আমার অন্তরে এই কথা নাযিল করিয়াছেন যে, 'কোন প্রাণীই তাহার রিযিক ও হায়াত পূর্ণ না করিয়া মরে না।' অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং উহার তালাশের ব্যাপারে সুন্দর ও সুষম পন্থা গ্রহণ করিও।'

কেহ কেহ বলেন-রূহুল কুদুস হইতেছে ইসমে আজম (শ্রেষ্ঠতম নাম)।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক, আবূ রওক, বিশর, মিনজাব ইব্‌ন হারিছ, আবূ যুরআহ ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ অর্থাৎ 'আমরা তাহাকে ইসমে আজম দিয়া সাহায্য করিয়াছি।' হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরও বলেন-'হযরত ঈসা (আ) উক্ত ইসমে আজমের সাহায্যে মৃত ব্যক্তিদিগকে জীবিত করিতেন।' ইমাম ইব্‌ন জারীরও উপরোক্ত রাবী মিনজাবের নিকট হইতে

উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতেও উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম কুরতুবী বলিয়াছেন ঃ উবায়দ ইব্ন উমায়র বলেন- 'রূহুল কুদুস হইতেছে ইসমে আজম।'

ইব্ন আবূ নাজীহ বলেন ঃ 'আররূহ হইতেছে ফেরেশতাদের একজন নেতার নাম।'

রবী' ইব্ন আনাস হইতে আবূ জা'ফর রাযী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আল-কুদুস হইতেছে মহান আল্লাহ্।' হযরত কা'ব (রা)-ও অনুরূপ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। মুজাহিদ এবং হাসান হইতে ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আল-কুদুস হইতেছে মহান আল্লাহ্; আর, রূহুল কুদুস হইতেছেন হযরত জিবরাঈল (আ)।' সুদ্দী বলেন-'আল কুদুস (القدس) -বরকত, প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল-কুদুস অর্থ পবিত্রতা।

ইব্ন যায়দ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রূহুল কুদুস হইতেছে ইঞ্জীল কিতাব।

وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ অর্থাৎ 'আমি তাহাকে কিতাব দিয়া সাহায্য করিয়াছিলাম।' এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদকে রূহ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَكَذَالِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا 'আর এইরূপেই আমি তোমার নিকট আমার নির্দেশ সহকারে রূহকে (আল কুরআনকে) নাযিল করিয়াছি।"

ইব্ন যায়দ বলেন-'এইরূপে কুরআন মজীদ ও ইঞ্জীল কিতাব উভয়ই রূহ।'

অতঃপর ইমাম ইব্ন জারীর মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতাংশে রূহুল কুদুস-এর তাৎপর্য হযরত জিবরাঈল (আ) হওয়াই অধিকতম সহীহ্ ও সঠিক।' ইমাম ইব্ন জারীর বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَيْكَ - اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ - تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلاً - وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ - الى اخر الاية -

"সেই সময়টি স্মরণযোগ্য যখন আল্লাহ্ বলিয়াছিলেন-হে ঈসা ইব্ন মরিয়াম! তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি প্রদত্ত আমার নি'আমাতকে তুমি স্মরণ কর, তখন আমি তোমাকে রূহুল কুদুস দিয়া সাহায্য করিয়াছিলাম। তুমি দোলনায় থাকিয়া এবং প্রৌঢ় বয়সে উভয় অবস্থায় মানুষের সহিত কথা বলিতে। আর যখন আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল শিখাইয়াছিলাম।"

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ রূহুল কুদুস-এর তাৎপর্য যদি ইঞ্জীল কিতাব হয়, তবে মানিতে হয় যে, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিষয়কে অহেতুকভাবে দুইবার উল্লেখ করিয়াছেন। একবার বলিয়াছেন اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ (যখন আমি তোমাকে ইঞ্জীল কিতাব দিয়া সাহায্য করিয়াছি।

আবার বলিয়াছেন ঃ

وَ اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ (আর যখন আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল শিখাইয়াছি।)

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ 'মহান আল্লাহ্ উপরোক্তরূপ অহেতুক পুনরাবৃত্তি করা হইতে পবিত্র। অতএব, রূহুল কুদুস-এর তাৎপর্য ইঞ্জীল কিতাব হইতে পারে না। উহার তাৎপর্য হযরত জিবরাঈল (আ)।'

আমি (ইব্‌ন কাছির) বলিতেছি- উপরোক্ত আলোচনার প্রথমাংশে যে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রূহুল কুদুস হইতেছেন হযরত জিবরাঈল (আ)। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তে নিবেদিত।

আল্লামা যামাখশারী বলেন ঃ روح القدس –পবিত্র রূহ। যেমন حاتم الجود দানবীর হাতিম তাঈ; رجل صدق –সৎ লোক। উপরোক্ত তিনটি শব্দ বাহ্যত مركب اضافى (সম্বন্ধ পদ ও মুখ্য পদের সমন্বয়ে গঠিত পদ সমষ্টি) হইলেও অর্থের দিক দিয়া উহারা مركب توصيفى (বিশেষ্য ও বিশেষণের সমন্বয়ে গঠিত পদ সমষ্টি।) আবার অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে روح منه (তাঁহার তরফ হইতে আগত বিশেষ রূহ) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। সেই স্থলে আল্লাহ্‌র সহিত রূহকে সম্পর্কিত কবিরার কারণ হইল, সংশ্লিষ্ট রূহটি যে আল্লাহ্‌র নিকট বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এবং উহার যে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারী তাহা প্রকাশ করা। অবশ্য কেহ কেহ বলেন–যেহেতু হযরত ঈসা (আ)-এর রূহের সহিত পুরুষের শুক্র এবং ঋতুবতী নারীর অপবিত্র ঋতুস্রাব মিশ্রিত হয় নাই, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে روح منه নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।' আল্লামা যামাখশারীর কথার তাৎপর্য এই যে, 'আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং ঈসা (আ)-কে روح القدس (পবিত্র আত্মা) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।'

অতঃপর আল্লামা যামাখশারী বলেন ঃ 'কেহ কেহ বলেন, রূহুল কুদুস অর্থ জিবরাঈল (আ)। আবার কেহ কেহ বলেন–রূহুল কুদুস অর্থ ইঞ্জীল কিতাব। এইরূপে কুরআন মজীদকে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা 'রূহ' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।' আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন ঃ

وَكَذَالِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا 'আর এইরূপেই তোমার নিকট আমার ব্যবস্থাসহ রূহকে (কুরআন মজীদকে) নাযিল করিয়াছি।' আবার কেহ কেহ বলেন–রূহুল কুদুস অর্থ 'ইসমে আজম' যাহা উচ্চারণ করিয়া হযরত ঈসা (আ) মৃত ব্যক্তিদিগকে জীবিত করিতেন। فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ

উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী বলেন – 'আল্লাহ্ তা'আলা وَفَرِيْقًا قَتَلْتُمْ (আর আরেক দলকে তোমরা হত্যা করিয়াছ) না বলিয়া বলিয়াছেন وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ (আর আরেক দলকে তোমরা হত্যা করিতেছ)। উহার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বুঝাইতে চাহেন–তাহারা এখন আল্লাহ্‌র রাসূলকে হত্যা করিবার কাজ চালাইতেছে। কারণ, তাহারা বিষ প্রয়োগ করিয়া এবং যাদু খাটাইয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে হত্যা করিবার চেষ্টা চালাইয়াছিল। নবী করীম (সা) মৃত্যু শয্যায় বলিয়াছিলেন–'খায়বারে যে বিষ

মিশ্রিত গোশতের টুকরাটি আমি খাইয়াছিলাম, আমার মধ্যে উহার প্রতিক্রিয়া ক্রমশ তীব্রতর হইয়া আসিতেছে। এখন আমার মৃত্যুর সময় সমুপস্থিত।'

আমি (ইব্ন কাছির) বলিতেছি ঃ উক্ত হাদীস বুখারী শরীফ সহ একাধিক হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে।

বনী ইসরাঈলের দুর্গতি ও শাস্তিভোগ

(৮৮) وَ قَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

৮৮. আর তাহারা বলিল, 'আমাদের অন্তরসমূহ সুরক্ষিত রহিয়াছে।' বরং আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছেন তাহাদের কুফরীর জন্য। তাই তাহাদের নগণ্য সংখ্যকই ঈমান আনিবে।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী জাতির জ্ঞান-বিদ্বেষী মানসিকতাকে উল্লেখ করিয়া উহার পরিণতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াহুদীরা নবী করীম (সা)-কে বলিত–'তোমার কথায় সারবত্তা নাই। অতএব, তোমর কথা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে না। আমরা তোমার কথা শুনিতে ও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।'

প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অন্তর হইতেছে সত্য-দ্বেষী ও সত্য-বিমুখ। যে কথায় সারবত্তা রহিয়াছে, উহার প্রতি তাহাদের অন্তরে রহিয়াছে ঘৃণা ও শত্রুতা। যেহেতু আল্লাহ্র রাসূল (সা) ও তাঁহার কিতাব হইতেছে শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ সত্য তাই উহাদের প্রতি তাহাদের সত্য-দ্বেষী অন্তরে রহিয়াছে জঘন্যতম ঘৃণা ও শত্রুতা। সত্যের প্রতি তাহাদের উপরোক্ত ঘৃণা ও শত্রুতাই আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব তাহাদের না মানিবার প্রকৃত কারণ। তাহাদের অন্তরের উপরোক্ত সত্য-বিমুখ তাই নবী করীম (সা)-এর কথা উহাতে প্রবেশ না করিবার প্রকৃত কারণ। তাহারা গর্ব করিয়া বলে–'তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর কথা শুনিতে প্রস্তুত নহে। উহা তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে না।' আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন–না, তাহাদের গর্ব করিবার মত কিছু নাই। হতভাগারা আল্লাহ্র রহমত হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহাদের অন্তরের কুফর তথা সত্য-বিমুখতার কারণে আল্লাহ্ তাহাদিগকে রহমত হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। অতএব, তাহারা ঈমান আনিবে না।

قُلُوْبُنَا غُلْفٌ আয়াতাংশের তাফসীরকারগণ দুইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রথম ব্যাখ্যা

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ 'আমাদের অন্তর সংরক্ষিত রহিয়াছে'। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ 'আমাদের অন্তর বুঝিতে সক্ষম নহে।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তর আবদ্ধ।

মুজাহিদ বলেন- قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত।

ইকরামা বলেন- قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তর আবদ্ধ।

আবুল আলীয়া বলেন- قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তর বুঝিতে সক্ষম নহে।

সুদ্দী বলেন - قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত।

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রায্‌যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ ও আচ্ছাদিত। অতএব, উহাতে আর কিছু ধরেও না এবং উহা আর কিছু বুঝেও না।' মুজাহিদ এবং কাতাদাহ বলেন-'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) غلف শব্দটির দ্বিতীয় বর্ণকে পেশ দিয়া পড়িতেন। উহা غلاف (আচ্ছাদক বা পাত্র) শব্দের বহুবচন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন-قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তর সকল জ্ঞানের আধার। উহা জ্ঞানে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অতএব, হে মুহাম্মদ! তোমার জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নাই।' আতা খুরাসানীও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ বলেন- قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তর সংরক্ষিত রহিয়াছে। তিনি বলেন-আলোচ্য আয়াতাংশটি নিম্নোক্ত আয়াতাংশের ন্যায় ঃ قُلُوْبُنَا فِىْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَا اِلَيْهِ। (তোমরা আমাদিগকে যে বিষয়ের দিকে আহ্বান জানাও, আমাদের অন্তর উহা হইতে সংরক্ষিত।)

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম বলেন-قُلُوْبُنَا فِىْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَا اِلَيْهِ। অর্থাৎ 'আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত অতএব, হে মুহাম্মদ! তুমি যাহা বল, উহার কিছুই উহাতে প্রবেশ করে না।' তিনি আলোচ্য আয়াতাংশকে قُلُوْبُنَا غُلْفٌ আয়াতাংশের ন্যায় মনে করিতেন।

ইমাম ইব্‌ন জারীর আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোল্লিখিত তাৎপর্যকেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহার সমর্থনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীসকে উপস্থাপিত করিয়াছেন ঃ

হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল বুখতারী ও আমর ইব্‌ন মুররাহ জামালী প্রমুখ রাবী থেকে ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন - মানুষের অন্তর চারি প্রকারের হইতে পারে। অতঃপর তিনি চারি প্রকারের অন্তরের মধ্যে এক প্রকারের অন্তরের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন ঃ 'উহা আচ্ছাদিত ও আবদ্ধ হইয়া থাকে ও উহা আল্লাহ্‌র গযবপ্রাপ্ত অন্তর। উহাই কাফিরের অন্তর।'

হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান আরযামীর পিতামহ (নাম উহ্য), মুহাম্মদ (সা)-এর পিতা আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান আরযামী ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান বলেন ঃ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তর চর্মাবৃত।

আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোল্লিখিত অর্থের তাৎপর্য এই যে, ইয়াহুদীরা বলিত-'হে মুহাম্মদ! তোমার কথা অন্তঃসারশূন্য। আমাদের অন্তর সংরক্ষিত। অতএব, উহাতে তোমার কথা প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাই তুমি আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না।'

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ 'আমাদের অন্তর জ্ঞানে পরিপূর্ণ। মুহাম্মদ বা তাহার ন্যায় লোকদের পক্ষ হইতে আগতব্য জ্ঞানের কোন প্রয়োজন উহার নাই।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আতিয়্যা আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ 'আমাদের অন্তরে জ্ঞানের অবস্থান গ্রহণ করিবার জন্যে কোন স্থান নাই।' উপরোক্ত অর্থের ভিত্তিতে কোন কোন আনসারী সাহাবী غلف শব্দটির দ্বিতীয় বর্ণকে ضمة পেশ দিয়া পড়িতেন। ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত কিরাআতের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা যামাখশারী ইমাম ইব্ন জারীরের উক্ত বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছেন। غلف শব্দটি غلاف শব্দের বহুবচন ও غلاف শব্দের অর্থ হইতেছে পরিপূর্ণ পাত্র।

আলোচ্য আয়াতাংশের শেষোক্ত অর্থের তাৎপর্য এই যে, ইয়াহূদীগণ বলিত–'হে মুহাম্মদ! আমাদের অন্তর জ্ঞানে পরিপূর্ণ। উহাতে আর কোন জ্ঞান রাখিবার স্থান নাই। অতএব, তোমার কথা আমরা আমাদের অন্তরে স্থান দিতে পারিতেছি না। তাই উহা মানিতেও পারিতেছি না।' بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ অর্থাৎ না, বরং তাহাদের কুফরের কারণে আল্লাহ্ তাহাদিগকে যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গল হইতে বঞ্চিত ও বিতাড়িত করিয়াছেন।

فَقَلِيْلاً مَّا يُؤْمِنُوْنَ আয়াতাংশের তাফসীরকারগণ বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

প্রথম ব্যাখ্যা

فَقَلِيْلاً مَّا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের স্বল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত তাহারা ঈমান আনিবে না। কাতাদাহ উহার উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা

فَقَلِيْلاً مَّا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের ঈমানের পরিমাণ স্বল্প। কারণ, তাহারা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিলেও মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনে না। ফলে তাহাদের ঈমানের পরিমাণ স্বল্প হইবার দরুণ উহা আল্লাহ্র নিকট মূল্যহীন। উহা তাহাদিগকে নাজাত দিবে না।

তৃতীয় ব্যাখ্যা

فَقَلِيْلاً مَّا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ তাহারা আদৌ ঈমান আনিবে না। যাহাদের অন্তর সত্য-দ্বেষী ও সত্য-বিমুখ, আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরের জঘন্য অবস্থার কারণে তাহাদিগকে রহমত হইতে বঞ্চিত ও বিতাড়িত করিয়াছেন। অতএব, তাহাদের কেহই ঈমান আনিবে না।

আরবগণ বলিয়া থাকে ঃ قلما رأيت مثل هذا قط অর্থাৎ 'আমি এইরূপ কখনও দেখি নাই।' 'আমি এইরূপ দেখিয়াছি, তবে কম' –আরবগণ উহাকে এইরূপ অর্থে ব্যবহার করে না।

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ কাসাঈ বলেন–কোন ব্যক্তি কোন স্থানে ব্যভিচার বা যিনা করিলে আরবগণ সেই স্থান সম্বন্ধে বলিয়া থাকে قلما تنبت অর্থাৎ 'এই স্থানটিতে কোন উদ্ভিদ

জন্মিবে না।' 'এই স্থানটিতে উদ্ভিদ জন্মিবে; তবে কম'–তাহারা উক্ত বাক্যকে এইরূপ অর্থে ব্যবহার করে না।

ইমাম ইব্ন জারীর ভাষাবিদ কাসাঈর উপরোক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ন্যায় সূরা নিসাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

قَوْلُهُمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ - بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ - فَلاَ يُؤْمِنُوْنَ الاَّ قَلِيْلاً

"আর তাহাদের কথা–'আমাদের অন্তর সংরক্ষিত।' বরং তাহাদের কুফরের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরের পথটি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অতএব, তাহারা ঈমান কমই আনিবে।' আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

(٨٩) وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۫ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝

৮৯. "আর যখন আল্লাহ্র নিকট হইতে তাহাদের সামনে সেই কিতাব আসিল যাহা তাহাদের কিতাবকেও সত্য বলে, আর আগে যেই কিতাবের উসিলায় কাফিরদের উপর জয়ী হইবার প্রার্থনা করিত, তাহা যখন আসিয়া গেল যাহা তাহাদের জানা-শোনাও ; তাহারা তাহা অস্বীকার করিল। কাফিরদের উপর আল্লাহ্র লা'নত।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী জাতির সত্য বিমুখতা বর্ণনা করিতেছেন। ইয়াহূদীরা নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মুশরিকদিগকে বলিত, অদূর ভবিষ্যতে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটিবে। তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার সাহায্যে আমরা তোমাদের উপর জয়লাভ করিব। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবের পর দেখা গেল, তাহারা তাঁহাকে মানিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা নবী করীম (সা)-এর সত্যবাদী হইবার বিষয় জানিত। তথাপি তাহারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। বস্তুত তাহাদের অন্তর সত্য-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। তাই তাহারা নবী করীম (সা)-কে অমান্য করিয়াছে, তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে এবং তাহার বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধনে লিপ্ত হইয়াছে। তাহাদের অন্তরের এই সত্য বিমুখতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে স্বীয় রহমত হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ফলে তাহাদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে রহিয়াছে লাঞ্ছনা, অপমান ও শাস্তি। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ অর্থাৎ ইয়াহূদীদের নিকট রক্ষিত তাওরাত কিতাবের সত্যতার স্বীকৃতি প্রদানকারী কুরআন মজীদ যখন তাহাদের নিকট আগমন করিল।

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا অর্থাৎ অথচ কুরআন মজীদ সহকারে মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের পূর্বে তাহারা

ভবিষ্যতে মুশরিকদের উপর বিজয়ী হইবার বিষয়ে তাঁহারই সাহায্য কামনা করিত। মুশরিকদের বিরুদ্ধে তাহাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিবার কালে তাহারা মুশরিকদিগকে বলিত-'অদূর ভবিষ্যতে আখেরী যামানায় একজন নবী আগমন করিতেছেন। আমরা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তোমাদিগকে পূর্ব যুগীয় 'আদ জাতি' এবং 'ইরাম জাতির' ন্যায় হত্যা করিব।'

কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ আনসার সাহাবা হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদাহ, আসিম ইব্‌ন আমর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আনসার সাহাবীগণ বলেন-আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের এবং ইয়াহুদীদের মধ্যকার ঘটনা উপলক্ষে وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ الى اخر الاية এই আয়াত নাযিল হইয়াছে। জাহেলী যুগে দীর্ঘদিন ধরিয়া আমরা ইয়াহুদীদের উপর বিজয়ী ছিলাম। আমরা ছিলাম মুশরিক আর তাহারা ছিল আহলে কিতাব। তাহারা আমাদিগকে বলিত-'অদূর ভবিষ্যতে একজন নবী প্রেরিত হইতেছেন। তাঁহার আবির্ভাবের সময় সমুপস্থিত। তাঁহার আবির্ভাবের পর আমরা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সাহায্যে তোমাদিগকে আদ জাতি ও ইরাম জাতির ন্যায় হত্যা করিব।' অতঃপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরায়শ বংশ হইতে তাঁহার নবীকে প্রেরণ করিলেন এবং আমরা তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলাম, তখন তাহারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। তাহাদের উক্ত আচরণ এবং উহার শাস্তি সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِه فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ ইতিপূর্বে তাহারা কাফিরদের বিরুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত। তাহারা বলিত, আমরা ইহাদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদকে সাহায্য করিব। অথচ আজ তাহারা করিয়াছে উহার উল্টা। তাহারা তাঁহার আগমনের পর তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা)-এর আগমনের পূর্বে ইয়াহুদীগণ তাঁহার সাহায্যে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের উপর বিজয়ী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁহার নবীকে তাহাদের গোত্রের বহির্ভূত গোত্র হইতে প্রেরণ করিলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল এবং ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাহাদের উক্ত ইচ্ছার বিষয় তাহারা অস্বীকার করিল। ইহাতে হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল, বিশর ইব্‌ন বারা ইব্‌ন মা'রূর এবং দাউদ ইব্‌ন সালিমাহ তাহাদিগকে বলিলেন-'হে ইয়াহুদীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর ইসলাম গ্রহণ কর। তোমরা তো ইতিপূর্বে মুহাম্মদ (সা)-এর সাহায্যে আমাদের উপর বিজয়ী হইবার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে। আমরা তখন মুশরিক ছিলাম। তোমরা আমাদিগকে সংবাদ দিতে যে, 'অদূর ভবিষ্যতে মুহাম্মদ (সা) আবির্ভূত হইবেন। তোমরা তাঁহার পরিচয় এবং গুণাবলীও বলিয়া দিতে।' ইহার উত্তরে বনূ নাযীর গোত্রের সাল্লাম ইব্‌ন মিশকম নামক জনৈক ইয়াহুদী বলিল-'মুহাম্মদ তো এইরূপ কোন পরিচয় ও নিদর্শন লইয়া আসে নাই, যাহা আমাদের নিকট পরিচিত ও বিদিত। আর আমরা ইতিপূর্বে তোমাদের নিকট তাহার আগমনের বিষয় উল্লেখ করি নাই।'

ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ الى اخر الاية ـ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ ইতিপূর্বে কিতাবধারীগণ মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের সাহায্যে আরবের মুশরিকদের উপর বিজয়ী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, তাহাদের গোত্র ভিন্ন অন্য গোত্র হইতে আল্লাহ্ নবী পাঠাইয়াছেন, তখন তাহারা হিংসায় তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল।'

আবুল আলীয়া বলেন ঃ নবী করীম (সা)-এর আগমনের পূর্বে ইয়াহুদীরা তাঁহার সাহায্যে আরবের অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হইবার জন্যে প্রার্থনা করিত। তাহারা বলিত-'হে আল্লাহ্! যে নবীর পরিচয় ও গুণাবলী এবং যাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী আমরা আমাদের কিতাবে লিখিত দেখি, তুমি তাহাকে প্রেরণ কর। তিনি প্রেরিত হইলে তাঁহার সহায়তায় আমরা মুশরিকদেরকে শাস্তি দিব এবং তাহাদিগকে হত্যা করিব।' কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে প্রেরণ করিলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে চিনিয়াও মুশরিকদের গোত্র হইতে আবির্ভূত হইবার কারণে তাহাদের প্রতি হিংসাপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। এই উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ الى اخر الاية ـ

কাতাদাহ বলেন ঃ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ ইতিপূর্বে তাহারা তাঁহার সাহায্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হইতে চাহিত। তাহারা আরও বলিত যে, অচিরেই একজন নবী আবির্ভূত হইবেন।' মুজাহিদ বলেন -'আলোচ্য আয়াতে ইয়াহুদীদের আচরণের কথা বর্ণিত হইয়াছে।'

(٩٠) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

৯০. যে বস্তুর বিনিময়ে তাহারা তাহাদিগকে বিক্রয় করিল তাহা কতই খারাপ। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাহার যেই বান্দার উপর যাহা খুশী নাযিল করিয়াছেন। তাহাতে রুষ্ট হইয়া তাহারা ঈমানের বদলে কুফরী ক্রয় করিল। তাহারা গযবের উপর গযব লইয়া ফিরিল। কাফিরদের জন্য রহিয়াছে অবমাননাকর শাস্তি।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী জাতির হিংসাপরায়ণতা এবং সত্য প্রত্যাখ্যানের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াহুদীরা জানিত যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল। কিন্তু, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ইয়াহুদীদের গোত্র ভিন্ন অন্য গোত্র হইতে প্রেরণ

করিয়াছেন, তাই তাঁহার প্রতি তাহারা হিংসান্বিত ছিল। তাহাদের উক্ত হিংসাই তাহাদিগকে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিতে দেয় নাই। তাহাদের এই হিংসাপরায়ণ ও তজ্জনিত সত্য প্রত্যাখ্যান বড়ই নিন্দনীয়। উহার ফলে তাহারা পৃথিবীতে লাঞ্ছনার পর লাঞ্ছনা আর আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিবে। আলোচ্য আয়াতে উহাই বর্ণিত হইয়াছে।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ অর্থাৎ তাহারা যাহার বিনিময়ে নিজদিগকে বিক্রয় করিয়াছে, তাহা কতই না নিন্দনীয়।

মুজাহিদ বলেন ঃ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ –'ইয়াহূদীগণের বাতিলের বিনিময়ে সত্যকে বিক্রয় করা অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক আনীত সত্যকে গ্রহণ না করিয়া উহাকে প্রত্যাখ্যান করা কতই না নিন্দনীয়।'

সুদ্দী বলেন – بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ অর্থাৎ তাহারা নিজেদের জন্যে যাহা ক্রয় করিয়াছে, তাহা বড়ই নিন্দনীয়। তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান না আনিয়া তৎপরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের এই গ্রহণ বড়ই নিন্দনীয়। بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ অর্থাৎ তাহাদের কুফরের কারণ এই যে, আল্লাহ্ তাঁহার মনোনীত বান্দার প্রতি ওহী নাযিল করিয়াছেন–ইহাতে তাহারা হিংসাপরায়ণ। কোন হিংসাই উহা অপেক্ষা জঘন্যতর হইতে পারে না।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ, মুহাম্মদ ও ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীগণ নবী করীম (সা)-এর প্রতি এই কারণে হিংসুক ছিল যে, তিনি তাহাদের গোত্র ভিন্ন অন্য গোত্র হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ অর্থাৎ এই হিংসার কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মনোনীত কোন বান্দার প্রতি ওহী নাযিল করিবেন।

فَبَاءُوْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ –ফলত তাহারা গযবের উপর গযব লইয়া ফিরিয়াছে। এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন–'তাহারা তাওরাত কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন আনিয়াছে। সেই কারণে তাহাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হইয়াছে। আবার তাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে অমান্য করিয়াছে। সেই কারণে তাহাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হইয়াছে। এইরূপ তাহাদের উপর গযবের উপর গযব নাযিল হইয়াছে।'

আবুল আলীয়া উহার ব্যাখ্যায় বলেন–'তাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলায় তাহাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হইয়াছে। আবার তাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে মিথ্যাবাদী বলায় তাহাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হইয়াছে। এইরূপে তাহাদের উপর গযবের উপর গযব নাযিল হইয়াছে।' ইকরামা এবং কাতাদাহ্ হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

সুদ্দী বলেন–'তাহাদের গো-বৎস পূজা করিবার কারণে তাহাদের উপর গযব নাযিল হইয়াছে। আবার মুহাম্মদ (সা)-কে মিথ্যাবাদী বলিবার কারণে তাহাদের উপর গযব নাযিল হইয়াছে। এইরূপে তাহাদের উপর গযবের উপর গযব নাযিল হইয়াছে।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (আর কাফিরদের জন্যে রহিয়াছে লাঞ্ছনাকার শাস্তি।)

ইয়াহুদীদের উপরোক্ত কুফরের কারণ হইতেছে তাহাদের হিংসা। তাহাদের এই হিংসার মূলে রহিয়াছে তাহাদের অহংকার তথা সত্য-বিদ্বেষ। আর অহংকার ও সত্য বিদ্বেষের যোগ্য শাস্তি হইতেছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। উপরোক্ত আয়াতাংশে তাহাদের জন্যে সেই যোগ্য লাঞ্ছনাকর শাস্তির সংবাদই প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ "যাহারা অহংকার করিয়া আমার ইবাদত হইতে বিরত রহিয়াছে, তাহারা নিশ্চয় অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।"

আমর ইব্ন শুআয়বের পিতামহ (নাম উহ্য) হইতে ধারাবাহিকভাবে শুআয়ব, আমর ইব্ন শুআয়ব, ইব্ন আজলান, ইয়াহইয়া ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– অহংকারী লোকদিগকে কিয়ামতের দিনে মানুষের আকৃতিতেই পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্রাবয়ব করিয়া জীবিত করা হইবে। সকল ক্ষুদ্র বস্তুই তাহাদের অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে। তাহারা জাহান্নামের বুলুস (بولس) নামক একটি কয়েদখানায় প্রবেশ করিবে। উত্তপ্ততম অগ্নি তাহাদের মস্তকের উপর লেলিহান শিখা বিস্তার করিবে। তাহাদিগকে জাহান্নামীদের চেয়ে বিষাক্ত ও গাঢ় পুঁজ-রক্ত পান করানো হইবে।'

শব্দার্থ ঃ باء - يبوء - بوء –প্রত্যাবর্তন করা, যোগ্য হওয়া। এইস্থলে শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত।

(৯১) وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ أَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(৯২) وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَأَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

৯১: আর যখন তাহাদিগকে বলা হইল, আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহার উপর ঈমান আন। তাহারা বলিল, আমাদের উপর যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিব এবং তাহার পরে যাহা আসিল তাহা তাহারা অস্বীকার করে। অথচ উহা সত্য ও তাহাদের কিতাবকেও সত্যায়িত করে। বল, যদি তোমরা ঈমানদারই হও তাহা হইলে পূর্বেকার আল্লাহ্র নবীগণকে হত্যা করিতে কেন ?

৯২. আর অবশ্যই তোমাদের নিকট মূসা সুস্পষ্ট দলীলাদি লইয়া আসিয়াছিল। তারপরও তোমরা বাছুর পূজায় লিপ্ত হইলে এবং তোমরা পরিণামে আত্মপীড়ক হইয়াছ।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ নাসারা ও ইয়াহুদীদের ঈমান সম্পর্কিত দাবী, উক্ত দাবীর মিথ্যা হওয়া এবং উহার মিথ্যা হইবার প্রমাণ বর্ণনা করিতেছেন। আহলে কিতাব

সম্প্রদায়ের নিকট ঈমানের দাওয়াত পেশ করা হইলে তাহারা বলিত–'আমাদের নিকট যে তাওরাত ও ইঞ্জীল নাযিল হইয়াছে, আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিবার প্রশ্নই উঠে না।' আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন–তাহাদের ঈমানের দাবী মিথ্যা দাবী বৈ কিছু নহে। যাহারা মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক প্রাপ্ত কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে না, তাহারা প্রকৃতপক্ষে তাওরাত বা ইঞ্জীল–ইহাদের কোনটির উপরও ঈমান রাখে না। কারণ, ইহারাই অর্থাৎ ইহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরাই ইতিপূর্বে আল্লাহ্র নবীগণকে হত্যা করিয়াছে। বস্তুত, যে ব্যক্তি ঈমান আনিবার, সে আল্লাহ্র সকল কিতাবের প্রতিই ঈমান আনে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঈমান আনিবার নহে, সে তাঁহার কোন কিতাবের প্রতিই ঈমান আনে না। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র একটি কিতাবকে অবিশ্বাস করিয়া অপর কিতাবকে বিশ্বাস করিবার দাবী করে, তাহার দাবী মিথ্যা। সে আদৌ মু'মিন নহে। অতএব মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবিশ্বাসী এই সকল আহলে কিতাব মিথ্যাবাদী। তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্র কোন কিতাবের প্রতিই ঈমান নাই।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَاءَهٗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ـ

"আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়–আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন, উহার প্রতি তোমরা ঈমান আন, তখন তাহারা বলিল–আমাদের প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে, আমরা উহার প্রতি ঈমান রাখি। পক্ষান্তরে তাহারা যাহা উহার পরে রহিয়াছে, তাহার প্রতি কুফরী করে। অথচ উহা সত্য এই কারণেও যে, উহা তাহাদের নিকট যাহা আছে, তাহাকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করে।"

اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তোমরা উহার প্রতি ঈমান আন।

قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا অর্থাৎ তখন তাহারা বলিল–আমাদের উপর যে তাওরাত ও ইঞ্জীল নাযিল হইয়াছে উহার উপর ঈমান আনাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। উহা ব্যতীত অন্য কিছুকে সত্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন নাই।

وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَاءَهٗ অর্থাৎ আর যাহা উহার পর নাযিল হইয়াছে, তাহারা উহাকে অবিশ্বাস করে।

وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ অর্থাৎ অথচ তাহারা জানে যে, উহা সত্য। এই কারণে যে, উহা তাহাদের নিকট যাহা রহিয়াছে তাহাকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করে।

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ বাক্যাংশটি এই স্থলে حال (অবস্থা নির্দেশক) হিসাবে منصوب (কর্মকারকের বিভক্তি সম্বলিত পদ) হইয়াছে।

কুরআন মজীদ ইয়াহূদী-নাসারাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ইঞ্জীলের প্রকৃত অংশকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করে। এতদসত্ত্বেও তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা কুরআন মজীদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে নাই, কিয়ামতের দিন উক্ত বিষয়টি তাহাদের বিরুদ্ধে একটি মহাশক্তিশালী প্রমাণ ও যুক্তি হিসাবে উপস্থাপিত হইবে। তাহাদিগকে যখন বলা হইবে–তোমাদের নিকট আল্লাহ্র যে

বাণী রক্ষিত ছিল, কুরআন মজীদ উহাকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও তোমরা কেন কুরআন মজীদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ কর নাই, তখন তাহারা নিরুত্তর হইয়া থাকিবে। তাহাদের নিকট উহার কোন উত্তর থাকিবে না। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ "আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি, তাহারা তাহাকে (মুহাম্মদকে) এইরূপে চিনে, যেইরূপে চিনে তাহারা নিজ পুত্রদিগকে।"

فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ যদি তোমরা সত্যই তাওরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হইয়া থাক, তবে ইতিপূর্বে যে সকল নবী তাওরাতের অনুসারী হইয়া, উহাকে রহিত না করিয়া বরং উহার নির্দেশ অনুযায়ী ফয়সালা প্রদানকারী হইয়া তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছিল, তোমরা কেন তাহাদিগকে হত্যা করিতে ? তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিতে নিজেদের হিংসাপরায়ণ, সত্যবিমুখ ও অহংকারী স্বভাবের দরুণ। বস্তুত তোমরা তাওরাতের প্রতিও বিশ্বাসী নহ। তোমরা শুধু জান তোমাদের কুপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিতে। সত্যের প্রতি তোমাদের প্রবৃত্তির রহিয়াছে চিরাচরিত বিদ্বেষ ও শত্রুতা।' এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَاتَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ -

"যখনই তোমাদের নিকট কোন রাসূল এইরূপ বিষয় সহকারে আগমন করিয়াছে যাহা তোমাদের কুপ্রবৃত্তিতে চাহে না, তখনই তোমরা অহংকারের সহিত উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছ। ফলত তোমরা একদলকে শুধু প্রত্যাখ্যান করিতে এবং একদলকে হত্যা করিতে।"

সুদ্দী বলেন–'আল্লাহ্ তা'আলা قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ এই আয়াতাংশ দ্বারা তাহাদিগকে লজ্জা ও ধিক্কার দিতেছেন।'

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন–অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি ইয়াহুদীদিগকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান আনিতে বলিলে তাহারা যখন বলে, 'আমরা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখি', তবে যে সকল নবীকে অনুসরণ করিবার পক্ষে তাওরাতে তোমাদের প্রতি নির্দেশ রহিয়াছে, তোমরা কেন সেই সকল নবীকে হত্যা করিতে ? আলোচ্য আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদীদের তাওরাতের প্রতি ঈমান রাখিবার দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত তাহাদিগকে লজ্জা দিতেছেন।'

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنَاتِ অর্থাৎ ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহকারে তোমাদের নিকট মূসা আগমন করিয়াছিলেন। উক্ত নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিত যে, মূসা আল্লাহ্র প্রকৃত নবী এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই।' উক্ত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী হইতেছে–তুফান, পঙ্গপাল, ছারপোকা, ব্যাঙ, রক্ত, লাঠি, সমুজ্জ্বল হাত, সাগরের পানি বিভক্ত হওয়া, মেঘ দ্বারা ছায়া দেওয়া, মান্না-সালওয়া, ঝরনা সৃষ্টিকারী পাথর ইত্যাদি।"

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِه অর্থাৎ 'এতদসত্ত্বেও তোমরা মূসার যামানায় তোমাদের নিকট হইতে তাহার তূর পর্বতে যাইবার পর আল্লাহ্কে ছাড়িয়া গো-বৎসকে মা'বূদ বানাইয়াছ।' مِنْ بَعْدِه অর্থাৎ আল্লাহ্র সহিত কথা বলিবার উদ্দেশ্যে তাহার তূর পর্বতে যাইবার পর।' এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْ بَعْدِه مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ "মূসার জাতি তাহার (তূর পর্বতে গমনের) পর নিজেদের অলংকার হইতে একটি গো-বৎসের দেহ বানাইয়া লইল—যাহাতে হাম্বা হাম্বা রব ছিল।"

وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত যে কোন মা'বূদ নাই, তাহা তোমাদের জানা থাকা সত্ত্বেও তোমরা যে গো-বৎকে মা'বূদ বানাইয়াছিলে—এই কার্য দ্বারা নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছিলে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلَمَّا سُقِطَ فِىْ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْلَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ -

"আর যখন উহা (গো-বৎস) তাহাদের হাতে অপমানিত হইল এবং তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহারা নিশ্চয় পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা বলিল—আমাদের প্রভু যদি আমাদিগকে কৃপা না করেন এবং ক্ষমা না করেন, তবে আমরা নিশ্চয় মহাক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দলভুক্ত হইব।"

(٩٣) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৯৩. আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিলাম এবং তোমাদের উপর পাহাড় তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম—'আমি যাহা তোমাদিগকে দিলাম তাহা শক্ত হাতে ধর ও আমার কথা শোন।' তোমরা বলিলে, 'আমরা শুনিলাম ও অমান্য করিলাম।' আর তাহাদের অন্তরসমূহে কুফরীর কারণে বাছুরের মোহ বিদ্যমান। বল, 'যদি তোমরা ঈমানদারই হও, তবে তোমাদের ঈমান কতই না খারাপ কাজের নির্দেশ করিতেছে।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির বারংবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবার কথা বর্ণনা করিতেছেন। বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ্র অবাধ্যতার মাধ্যমে একবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মাথার উপর পর্বত তুলিয়া ধরিলে তাহারা তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিল। কিন্তু, তাহারা পুনরায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া তাঁহার প্রতি অবাধ্য হইয়া গেল। এইরূপে বারংবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং আল্লাহ্র প্রতি অবাধ্য হওয়া তাহাদের চিরাচরিত অভ্যাস।

আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাই এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (আমরা শুনলাম ও অমান্য করিলাম।) ইতিপূর্বে উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ হইতে আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'তাহাদের অন্তরে গো-বৎস প্রেম দৃঢ়রূপে শিকড়বদ্ধ হইয়াছিল।' আবুল আলীয়া এবং রবী' ইব্ন আনাসও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বিলাল ইব্ন আবূ দারদা, খালিদ ইব্ন মুহাম্মদ ছাকাফী, আবূ বকর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মরিয়াম গাস্সানী, ইছাম ইব্ন খালিদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'কোন বস্তুকে তুমি প্রকৃতই ভালবাসিলে উহার ভালবাসা তোমাকে অন্ধ ও বধির করিয়া দিবে।'

ইমাম আবূ দাউদও উপরোক্ত হাদীসকে উপরোক্ত রাবী আবূ বকর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মরিয়াম গাস্সানী হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং উক্ত আবূ বকর হইতে ধারাবাহিকভাবে বাকিয়্যাহ ও হায়াত ইব্ন শোরায়েহর অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

সুদ্দী বলেন- বনী ইসরাঈল জাতি যে (স্বর্ণ নির্মিত) বাছুরটিকে পূজা করিয়াছিল, হযরত মূসা (আ) উহাকে করাত দিয়া কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দরিয়ায় ছড়াইয়া দিলেন। ফলে, তৎকালে প্রবহমান সকল দরিয়াতেই উহার কিছু না কিছু অংশ পতিত হইল। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন-তোমরা দরিয়ার পানি পান কর। তাহারা তাহাই করিল। ইহাতে যাহাদের অন্তরে গো-বৎস পূজা-প্রীতি রহিয়া গিয়াছিল, তাহাদের গোঁফ সোনালী রং ধারণ করিল। নিম্নোক্ত আয়াতাংশে তাহাদের উক্ত গো-বৎস প্রীতির বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আম্মারাহ ইব্ন উমায়র এবং আবূ আব্দির রহমান সালমী, আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন রজা, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'বনী ইসরাঈল জাতির লোকেরা যে (স্বর্ণ নির্মিত) গো-বৎসটিকে পূজা করিয়াছিল, হযরত মূসা (আ) দরিয়ার কিনারায় বসিয়া উহাকে করাত দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দরিয়ায় ফেলিলেন। অতঃপর উহার পূজারীদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তিই সেই দরিয়ার পানি পান করিল, তাহারই চেহারা স্বর্ণ বর্ণের ন্যায় হইয়া গেল।'

সাঈদ ইব্ন জুবায়র আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন-'বনী ইসরাঈল জাতির লোকেরা যে (স্বর্ণ নির্মিত) গো-বৎসটিকে পূজা করিয়াছিল, হযরত মূসা (আ) উহাকে পোড়াইয়া করাত দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দরিয়ায় নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর তাহারা দরিয়ার পানি স্পর্শ করিলে তাহাদের মুখমণ্ডল যাফরানী রং বিশিষ্ট হইয়া গেল।'

ইমাম কুরতুবী 'কুশায়রী'র কিতাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'যাহারা গো-বৎস পূজা করিয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তিই উক্ত পানি পান করিয়াছিল, সে-ই পাগল হইয়া গিয়াছিল।' অতঃপর ইমাম কুরতুবী মন্তব্য করিয়াছিলেন ঃ"এই সকল বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আলোচ্য আয়াতাংশের সহিত সম্পর্কিত নহে। সুতরাং এই স্থলে উহাদের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক। কারণ, আলোচ্য আয়াতাংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের গো-বৎস পূজার

সময়ে গো-বৎস প্রীতি ও গো-বৎস পূজা তাহাদের অন্তরে ছড়াইয়া গিয়াছিল এবং উহা তাহাদের হৃদয়ের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া গিয়াছিল।' অথচ উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'গো-বৎস চূর্ণ মিশ্রিত পানি পান করিবার ফলে বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের ওষ্ঠ ও মুখমণ্ডলে গো-বৎস পূজা প্রেমের চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।' অতঃপর ইমাম কুরতুবী, কবি নাবিগা কর্তৃক স্বীয় স্ত্রী উছামার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত রচিত নিম্নোক্ত কবিতাচরণ কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

تغلغل حب عثمة فى فؤادى

فباديه مع الخافى يسير

تغلغل حيث لم يبلغ شراب

ولا حزن ولم يبلغ سرور

اكاد اذا ذكرت العهد منها

اطيرلوان انسانا يطير

"আমার হৃদয়ে উছামার প্রেম সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিয়াছে। এখন হৃদয়ের ভালবাসার তুলনায় বাহ্য ভালবাসা তুচ্ছ। উক্ত ভালবাসা এইরূপ স্থানে প্রবেশ করিয়াছে, যেখানে মদাসক্তি, দুঃখ-তাপ, আনন্দ-আহলাদ কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার সহিত জীবন যাপন করিবার স্মৃতি যখন মনে আসে, তখন তাহার নিকট উড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। আহা! মানুষ যদি উড়িতে পারিত!

উক্ত কবিতায় যেইরূপে প্রেয়সীর ভালবাসা কবির হৃদয়ের গভীরতম স্থানে প্রবেশ করিবার কথা ব্যক্ত হইয়াছে, আলোচ্য আয়াতাংশে সেইরূপে বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের অন্তরের সহিত গো-বৎস পূজা সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ 'অতীত ও বর্তমানে তোমরা যাহার উপর নির্ভর করিতেছ, উহা বড়ই জঘন্য ও বড়ই নিন্দনীয়। অতীতে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অবিশ্বাস করিবার, আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করিয়া গো-বৎস পূজা করিবার এবং নবীদের বিরোধিতা করিবার উপর তোমরা নির্ভর করিয়াছ। আর বর্তমানে মুহাম্মদ (সা)-এর বিরোধীতা করিবার উপর নির্ভর করিতেছ। তোমরা দাবী করিতেছ 'আমরা মু'মিন।' তোমাদের দাবীকৃত ঈমান তোমাদিগকে কুফরী করিতে আদেশ করে। তোমাদের ঈমান অতীতে তোমাদিগকে নবীদের বিরোধিতা করিতে আদেশ করিয়াছে এবং বর্তমানে সাইয়েদুল মুরসালীন ও খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে অমান্য করিতে তথা তাঁহার বিরোধিতা করিতে আদেশ করিতেছে। তোমাদের ঈমান কত জঘন্য! তোমাদের ঈমান কত ঘৃণ্য!! প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে কোন ঈমান নাই। কুফরের প্রতি তোমাদের সত্য-দ্বেষী অন্তরের অবিচ্ছেদ্য ভালবাসাকেই তোমরা ঈমান নাম দিয়াছ।'

(٩٤) قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ○

(٩٥) وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظّٰلِمِينَ ○

(٩٦) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُّعَمَّرَ ۗ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ○

৯৪. বল, 'পরকালের শান্তিধাম যদি আল্লাহ্ শুধু তোমাদের জন্যই নির্ধারিত রাখিয়া থাকেন, অন্য মানুষের জন্য না হয়, তাহা হইলে তোমরা মৃত্যু কামনা করিয়া উহার সত্যতা প্রমাণ কর।'

৯৫. অথচ তোমাদের কৃতকর্মের ভয়ে তোমরা কখনও তাহা করিবে না। আল্লাহ্ জালিমদের ভালভাবেই জানেন।

৯৬. মানুষের ভিতরে তাহাদিগকেই তুমি দীর্ঘজীবী হওয়ার অধিক লালসাগ্রস্ত পাইবে। এমনকি মুশরিকদের হইতেও অধিক। তাহারা চায়, যদি হাজার বছর বাঁচিত। যতদিনই বাঁচুক শাস্তি হইতে তাহাদের নিস্তার নাই। তাহারা যাহা করিতেছে আল্লাহ্ তাহা দেখিতেছেন।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী জাতির নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী, উক্ত দাবীর অসারবত্তার প্রমাণ এবং তাহাদের পরকালীন প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। ইয়াহুদীরা বলিত– 'আমরা আল্লাহ্র পুত্র। তিনি তাহাদিগকে অতিশয় ভালবাসেন। আখিরাতের নি'আমাত ও সুখ-শান্তি কেবল আমাদের জন্যেই নির্ধারিত রহিয়াছে। আমরা ভিন্ন অন্য কেহ উহা ভোগ করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ আমাদিগকে ছাড়া অন্য কাহাকেও উহা ভোগ করিতে দিবেন না।' আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন–তাহাদের উক্ত দাবী যে মিথ্যা, তাহা তাহারা নিজেরাও জানে। উক্ত দাবী তাহাদের নিছক মৌখিক মিথ্যা দাবী। তাহাদের অন্তর ভালরূপে জানে যে, তাহারা জ্ঞান পাপী। তাহারা আল্লাহ্র নিকট জঘন্য শ্রেণীর অপরাধী। তাহাদের অন্তরের উক্ত অবস্থা প্রমাণ করিবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে বলিতেছেন–'তুমি তাহাদিগকে বল, তোমাদের মৌখিক দাবীই যদি তোমাদের অন্তরের কথা হইয়া থাকে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন–তাহারা কখনও মৃত্যু কামনা করিবে না। কারণ, তাহারা জানে, তাহাদের মহাপাতকের ফলে মৃত্যুর পর তাহাদের ভোগ করিবার জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।'

অতঃপর তিনি বলিতেছেন–তাহারা অধিক বয়সের জন্যে অন্য যে কোন মানুষ অপেক্ষা এমনকি মুশরিকদের অপেক্ষাও অধিকতর লালায়িত। এককেজনের আকাঙ্ক্ষা–'সে যদি হাজার

বৎসর হায়াত পাইত। এইরূপ হইলে অধিকতর পরিমাণে দুনিয়ার মজা লুটিয়া লওয়া যাইত।' ইহাদের মনে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে দুনিয়ার মজা লুটিবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। কিন্তু, আখিরাত ও উহার কঠোর শাস্তি সম্বন্ধে ইহারা সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন-ইহারা অধিক হায়াত পাইলে কি আখিরাতের শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবে ? না, তাহা কোনক্রমেই হইবে না। অধিক হায়াত তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য শাস্তি হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না। সুতরাং শাস্তি হইতে বাঁচিতে চাহিলে তাহারা যেন আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং তাঁহার কিতাবের প্রতি বিনীত হৃদয়ে অনুগত হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন পথ কাহাকেও আখিরাতের আযাব হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না।

تمنى الموت (মৃত্যু কামনা)-এর ব্যাখ্যা

আলোচ্য তিনটি আয়াতের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে বলিতেছেন ঃ 'তুমি তাহাদিগকে বল, আখিরাতের সুখ-শান্তি যদি শুধু তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, যাহা তোমরা দাবী করিয়া থাক, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' উক্ত' মৃত্যু কামনা'-এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

প্রথম ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য 'মৃত্যু কামনার' তাৎপর্য এই যে, ইয়াহুদী ও মুসলমান এই দুই দলের মধ্যে যে দল গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট, ইয়াহুদীরা অনির্দিষ্টরূপে তাহাদের জন্যে মৃত্যু কামনা করিবে। তাহারা বলিবে-'হে আল্লাহ্! আমরা ও মুসলমানগণ এই দুই দলের মধ্যে যে দল গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট, তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও। যদি আমরা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হইয়া থাকি, তবে তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও। আর যদি আমরা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হইয়া থাকি, তবে তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও। 'এইরূপ দোয়ার ফলে যাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইবে। পক্ষান্তরে, এইরূপ দোয়া সত্ত্বেও যাহারা ধ্বংস হইবে না, তাহারা সত্যপথে অবস্থানকারী বলিয়া প্রমাণিত হইবে। তাহাদের দাবী অনুসারে বলা যায়-'তাহারা উপরোক্ত পন্থায় মৃত্যু কামনা করিলে তাহারা মরিবে না। কারণ, তাহারা তো সত্য পথের অনুসারী ও আল্লাহ্র অতি প্রিয় পাত্র এবং কেবল তাহারাই আখিরাতের সুখ-শান্তি ভোগ করিতে পারিবে। উহাতে মরিবে শুধু মুসলমানগণ। কারণ, তাহারা যে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট এবং আখিরাতের সুখ-শান্তি তো তাহাদের কপালে নাই। এইরূপে লোকদের নিকট প্রমাণিত হইয়া যাইবে যে, ইয়াহুদীরা সত্যবাদী এবং মুসলমানগণ মিথ্যাবাদী।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যার প্রবক্তাগণ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত মুবাহালাকে مباهلة تمنى الموت (মৃত্যু কামনা সম্পর্কিত মুবাহালা) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), কাতাদাহ, আবুল আলীয়া এবং রবী' ইব্ন আনাস 'মৃত্যু কামনা'র উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য 'মৃত্যু কামনা'র তাৎপর্য এই যে, ইয়াহুদীরা নির্দিষ্টরূপে নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা করিবে। ইয়াহুদীরা দাবী করিয়া থাকে যে, তাহারা আল্লাহ্র নিকট অতি প্রিয় আর আখিরাতের সুখ-শান্তি কেবল তাহারাই ভোগ করিবে। তাহারা মুখে

যাহা দাবী করে, উহাই যদি তাহাদের অন্তরের বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে বেশ তো, তাহারা নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা করুক। তাহারা যত তাড়াতড়ি মরিবে তত তাড়াতাড়িই তো তাহাদের জন্যে রিজার্ভ করিয়া রাখা আখিরাতের মহা সুখ ও মহা শান্তি ভোগ করা আরম্ভ করিতে পারিবে।

ইমাম ইব্‌ন জারীর এবং যুক্তি শাস্ত্রবাদী (متكلمين) বিশেষজ্ঞসহ একদল তাফসীরকার 'মৃত্যু কামনা'র উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ (তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ অর্থাৎ 'তবে তোমরা অনির্দিষ্টরূপে দুই দলের মধ্য হইতে মিথ্যাবাদী দলের জন্যে মৃত্যু প্রার্থনা কর।' নবী করীম (সা) ইয়াহুদীদিগকে উহা করিতে বলিলে তাহারা উহা করিতে অসম্মতি জানাইয়াছিল।

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ - وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ 'তাহারা যে পাপ করিয়াছে, উহার কারণে তাহারা কখনও মৃত্যুর জন্যে দোয়া করিবে না। আর আল্লাহ্ সেই সকল মিথ্যাশ্রয়ী লোক সম্পর্কিত সকল বিষয় জানেন। তাহারা যে সেইরূপ দোয়া করিবে না তাহাও তিনি জানেন।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরও বলেন–নবী করীম (সা)-এর কথায় যদি তাহারা ঐরূপে মৃত্যুর জন্যে দোয়া করিত, তবে পৃথিবীতে কোন ইয়াহুদী জীবিত থাকিত না।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ অর্থাৎ তবে তোমরা মৃত্যুর জন্যে দোয়া কর।

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আব্দুল করীম জাযারী, মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'ইয়াহুদীরা যদি মৃত্যুর জন্যে দোয়া করিত, তবে তাহারা নিশ্চয় মরিয়া যাইত।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মিনহাল, আ'মাশ, ইমাম আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ তানাফিসী, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইয়াহুদীরা যদি মৃত্যুর জন্যে দোয়া করিত, তবে তাহাদের প্রত্যেকে মাত্র একটি হাঁচি দিত। (অর্থাৎ উহাতেই তাহার মৃত্যু হইত।)

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উপরোল্লিখিত রিওয়ায়েতসমূহের সনদ সহীহ।

হযরত আব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আব্দুল করীম, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর, যাকারিয়া ইব্‌ন আদী, আবূ কুরায়ব ও ইমাম ইব্‌ন জারীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'ইয়াহুদীরা যদি মৃত্যুর জন্যে দোয়া করিত' তবে তাহারা নিশ্চয় মরিয়া যাইত এবং নিজেদের অবস্থিতি জাহান্নামে দেখিতে পাইত। আর যাহাদিগকে আল্লাহ্র রাসূল মোবাহালা (পরস্পর মিলিতভাবে মিথ্যানুসারীর লা'নতের জন্যে বদ দোয়া করা) করিতে বলিয়াছিলেন, তাহারা গৃহে প্রত্যবর্তন করিয়া নিজেদের পরিবার-পরিজন এবং মাল-দৌলত কিছুই দেখিতে পাইত না।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আব্দুল করীম, ফুরাত, ইসমাঈল ইব্ন ইয়াযীদ রাক্কী ও ইমাম আহমদ উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হাসান বসরী হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্বাদ ইব্ন মানসূর, সুরূর ইব্ন মুগীরাহ, ইবরাহীম ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন বিশার, হাসান ইব্ন আবূ আহমদ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ উব্বাদ ইব্ন মানসূর বলেন–একদা আমি হাসান বসরীর নিকট وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ এই আয়াতাংশের উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–ইয়াহূদীদিগকে যখন বলা হইয়াছিল যে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, তখন যদি তাহারা মৃত্যু কামনা করিত, তবে কি তাহারা মরিয়া যাইত ? ইহাতে হাসান বসরী বলিলেন–তাহারা মৃত্যু কামনা করিলেও তাহারা মরিত না। বস্তুত তাহারা আদৌ মৃত্যু কামনাই করিত না। আল্লাহ্ তা'আলা কি বলিয়াছেন, তাহা তো জানই। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ـ

উক্ত রিওয়ায়েত একটি মাত্র মাধ্যমে হাসান বসরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। (তাই উহার বিশুদ্ধতা সংশয়পূর্ণ)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ এই আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, উহাই উক্ত আয়াতাংশের সঠিক ব্যাখ্যা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ 'তাহা হইলে তোমরা ইয়াহূদী ও মুসলমানের মধ্যে যে দল মিথ্যাবাদী, অনির্দিষ্টরূপে সেই দলের বিরুদ্ধে মৃত্যুর জন্যে বদ দোয়া কর।' ইমাম ইব্ন জারীর কাতাদাহ, আবুল আলীয়া এবং রবী' ইব্ন আনাস হইতেও উক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ـ وَلاَ يَتَمَنَّوْنَهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ـ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ ـ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلاَقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ –

"তুমি বল, 'হে ইয়াহূদীগণ! যদি তোমরা মনে করিয়া থাক যে, কেবল তোমরাই আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র, অন্যলোক তাঁহার প্রিয় নহে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করিয়া দেখাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। তাহাদের হস্ত যাহা অর্জন করিয়াছে, তাহাতে তাহারা কখনও উহা কামনা করিবে না। আর আল্লাহ্ সেই পাপাচারীদের বিষয় সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছেন। তুমি বল, যে মৃত্যু হইতে তোমরা পালাইয়া বেড়াইতেছ, উহা নিশ্চয় তোমাদের সহিত অচিরেই সাক্ষাৎ করিবে। অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্য উভয় শ্রেণীর বিষয় সম্বন্ধে অবগত সত্তার (আল্লাহ্র) নিকট প্রত্যাবৃত হইবে। তখন তিনি তোমাদিগকে তোমাদের আমলসমূহ সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান করিবেন।"

ইয়াহূদী ও নাসারারা যখন দাবী করিল যে, তাহারা আল্লাহ্র পুত্র ও প্রিয়পাত্র এবং ইয়াহূদী বা নাসারা ভিন্ন অন্য কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, তখন তাহাদিগকে আহ্বান

জানানো হইল–তাহারা যেন এই দোয়া করে যে, ইয়াহুদী-নাসারা ও মুসলমান এই দুই দলের যে দল মিথ্যাবাদী, তাহাদিগকে যেন আল্লাহ্ ধ্বংস করিয়া দেন। কিন্তু, ইয়াহুদী-নাসরারা উহাতে সম্মত হইল না। উহাতে সকলের নিকট প্রমাণিত হইয়া গেল যে, তাহারা মিথ্যাবাদী ও অসত্যাশ্রয়ী। এইরূপেই নবী করীম (সা) 'নাজরান' হইতে আগত নাসারা প্রতিনিধি দলের সহিত সামান্য আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে সত্য বুঝাইয়া দিবার পর তাহাদিগকে দোয়া করিতে আহ্বান জানাইলেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ - ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ -

"তোমার নিকট যে জ্ঞান আগমন করিয়াছে, উহার উপস্থিতি সত্ত্বেও যাহারা তোমার সহিত তর্ক করে, তুমি তাহাদিগকে বল–আইস; আমরা আমাদের পুত্রদিগকে এবং তোমাদের পুত্রদিগকে, আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে এবং তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে আর আমাদের নিজদিগকে এবং তোমাদের নিজদিগকে ডাকিয়া একত্রিত করি। অতঃপর কাকুতি-মিনতি সহকারে মিথ্যাবদীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র লা'নতের জন্যে বদ দোয়া করি।"

ইহা শুনিয়া তাহাদের একদল অপর দলকে বলিল–আল্লাহ্র কসম! যদি তোমরা এই নবীর সহিত বদ দোয়া করিতে লিপ্ত হও, তবে তোমাদের একটি লোকও জীবিত থাকিবে না। তাহারা নবী করীম (সা)-এর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল এবং অধীন হইয়া জিযিয়া দিতে সম্মত হইল। নবী করীম (সা) তাহাদের উপর জিযিয়া ধার্য করিলেন এবং হযরত আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ্র উপর উহা আদায় করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাহাদের সহিত প্রেরণ করিলেন।

নিম্ন আয়াতে উপরোক্ত বর্ণিত বিষয়ের প্রায় সদৃশ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا অর্থাৎ 'আমাদের ও তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা গোমরাহীতে আছে, রহমান (আল্লাহ্) যেন তাহাকে আরও সুযোগ দিয়া তাহার বদ আমলকে বৃদ্ধি করিয়া দেন।' উক্ত আয়াত মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ্ উহার ব্যাখ্যা বর্ণিত হইবে।

আরেকদল তাফসীরকার বলেন–فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ আয়াতাংশে বর্ণিত 'মৃত্যু কামানা'র তাৎপর্য হইতেছে, ইয়াহুদীদের নির্দিষ্টরূপে নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা করা। অর্থাৎ 'হে ইয়াহুদীগণ! তোমরা দাবী করিতেছ, তোমরা আল্লাহ্র অতি প্রিয় পাত্র। আখিরাতের সুখ-শান্তি কেবল তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে। তোমরা ভিন্ন অন্য কেহ উহা ভোগ করিতে পারিবে না। তোমাদের মুখের দাবী যদি তোমাদের অন্তরের বিশ্বাস হয়, তবে তোমরা নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা কর। এইরূপ করিলে যদি তোমরা মরিয়া যাও, তবে দুনিয়ার দুঃখ ও অশান্তি হইতে শীঘ্রই মুক্তি পাইয়া কিছু পূর্বেই আখিরাতের রিজার্ভ সুখ–শান্তি ভোগ করা আরম্ভ করিতে পারিবে। আর যদি না মর, তবে মানুষের নিকট তোমাদের মিথ্যাবাদী এবং বাতিলপন্থী হওয়া প্রমাণিত হইয়া যাইবে।'

ব্যাখ্যাকারগণ আরও বলেন—ইয়াহুদীগণ নাসারা জাতির লোকদের ন্যায় উক্ত মৃত্যু কামনা হইতে বিরত রহিল। কারণ, তাহারা জানিত তাহারা যে আকীদা ও আমলের অধিকারী, তাহাতে মৃত্যুর পর আখিরাতের আযাব তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে।

মৃত্যু কামনার উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইয়াহুদীদিগকে 'মৃত্যু কামনা' করিতে বলিয়া নিরুত্তর করা যায় না। কেননা তাহাদের পক্ষে বলা যায়, ইয়াহুদীগণ তাহাদের দাবীর ব্যাপারে সত্যাবাদী হইলে যে তাহাদিগকে মৃত্যু কামনা করিতে হইবে এমন কথা বলা যায় না। কোন ব্যক্তি নেককার হইলে তাহার জন্যে নিজের মৃত্যু কামনা করা জরুরী নহে; বরং নেককার ব্যক্তির মৃত্যু যত দেরীতে আসে, সে তত বেশী উপকৃত ও লাভবান হয়। কারণ, উহাতে সে অধিকতর নেকী অর্জন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার অধিকতর সন্তুষ্টি লাভ করত বেহেশতে অধিকতর উচ্চ মর্যাদা পাইতে পারে। হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ যাহার বয়স দীর্ঘ এবং আমল নেক, সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তাহাদের পক্ষে এতদ্ব্যতীত ইহাও বলা যায় যে, 'ওহে মুসলমানগণ! তোমরাও তো ধারণা পোষণ করিয়া থাক যে, মরিবার পর তোমরা জান্নাতের সুখ-শান্তি ভোগ করিবে। অথচ তোমরা তো নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা কর না। তোমরা নিজেরা যে অবস্থায় নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা কর না, সেই অবস্থায় আমাদিগকে নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা করিতে বলিতেছ কেন ?'

আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিলে উপরোল্লিখিত প্রশ্নগুলি দেখা যায়। পক্ষান্তরে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উহার যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ব্যাখ্যা হইতেছে এই যে, 'ইয়াহুদী ও মুসলমান উভয় দল কোন দলকে নির্দিষ্ট না করিয়া অনির্দিষ্টরূপে মিথ্যাবাদী দলের বিরুদ্ধে মৃত্যুর জন্যে বদ দোয়া করিবে। প্রত্যেক দলই নির্দিষ্ট না করিয়া অনির্দিষ্টরূপে মিথ্যাবাদী দলের বিরুদ্ধে মৃত্যুর জন্যে বদ দোয়া করিবে। প্রত্যেক দলই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিবে—'হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে যে দল গোমরাহ ও মিথ্যাবাদী, তুমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও।' ইহাতে ইয়াহুদীগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রশ্ন তুলিতে পারে না। কারণ, উভয় দলকে একই বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানানো হইয়াছে।

সে যাহা হউক, ইয়াহুদীগণ নাসারা জাতির লোকদের ন্যায় আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লিখিত 'মৃত্যু কামনা' হইতে দূরে রহিল। তাহারা জানিত, তাহারা মিথ্যাবাদী। তাহারা জানিত, তাহাদের আমল জঘন্যতর। তাহারা মৃত্যু কামনা করিলে তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে। পরন্তু তাহারা মৃত্যু কামনা করিলে দোযখের আগুন যে সময়ে তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিত, তাহার পূর্বেই উহা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ অর্থাৎ 'তুমি তাহাদিগকে অধিক বয়স পাইবার জন্যে সকল লোকের মধ্যে অধিকতর লালায়িত দেখিতে পাইবে।' অধিক বয়সের জন্যে তাহাদের লালায়িত হইবার কারণ এই যে, তাহারা জানে, তাহাদের আমলের কারণে এক মহা শাস্তি তাহাদের জন্যে অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের মৃত্যুর পর উহা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে। আর দুনিয়া হইতেছে মু'মিনের কয়েদখানা এবং কাফিরের জান্নাত। তাহারা ভাবে, আখিরাতের সেই মহা শাস্তি এড়াইয়া দুনিয়ারূপ জান্নাতের আরাম-আয়েশ যতবেশী ভোগ করা যায়, ততবেশী লাভ। অবশ্য, তাহারা যাহা এড়াইয়া থাকিতে চায়, উহা নিশ্চিতরূপেই একদিন

তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে। আর অধিক বয়সের জন্যে তাহারা এত লালায়িত হইল বলিয়াই আল্লাহ্ তা'আলা মোবাহালার বিষয় হিসাবে 'মৃত্যু কামনা'-কে বাছিয়া নিয়াছিলেন।

وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا –তাহারা অধিক বয়সের জন্যে এমনকি মুশরিকদের অপেক্ষাও অধিকতর লালায়িত।

পূর্ববর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদিগকে অধিক বয়সের প্রতি সকল মানুষের মধ্যে অধিকতর লালায়িত বলিয়া আখ্যায়িত করিবার পর আলোচ্য আয়াতাংশে তাহাদিগকে অধিক বয়সের প্রতি মুশরিকদের অপেক্ষাও অধিকতর লালায়িত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। এই স্থলে সামগ্রিকভাবে সকল বিষয়কে সাধারণ নামে উল্লেখ করিবার পর সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমে উহাদের মধ্য হইতে একটি বিষয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার ভাষাগত বিধান প্রযুক্ত হইয়াছে। আরবী অলংকার শাস্ত্রে উক্ত বিধান عطف الخاص على العام নামে পরিচিত।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুসলিম ইব্ন বাতীন, আ'মাশ, সুফিয়ান (ছাওরী), আব্দুর রহমান ইব্ন মাহদী, আহমদ ইব্ন সিনান ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন : وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا অর্থাৎ তাহারা অধিক বয়সের জন্যে এমনকি 'অনারবগণ' অপেক্ষাও অধিকতর লালায়িত।'

উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি 'হাকিম' স্বীয় 'মুসতাদরাক' নামক হাদীস গ্রন্থে উহার অন্যতম রাবী সুফিয়ান ছাওরী হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, উহা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত না হইলেও উহার সনদ তাহাদের উভয়ের নীতি অনুসারে সহীহ।' তিনি আরও বলিয়াছেন–'ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এই বিষয়ে একমত যে, সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত তাফসীর নির্ভরযোগ্য।'

হাসান বসরী বলেন–'মুনাফিকগণ অধিক বয়সের জন্যে অন্য সকল মানুষ অপেক্ষা, এমনকি মুশরিক অপেক্ষাও অধিকতর লালায়িত।'

يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ প্রত্যেক ইয়াহুদী কামনা করে–আহা! সে যদি হাজার বৎসর বয়স পাইত!' এইস্থলে 'احدهم' এর অন্তর্গত 'هم' শব্দের পদবাচ্য যে ইয়াহুদী, তাহা আয়াতের বক্তব্য বিষয় দ্বারা সহজেই বুঝা যায়।

আবুল আলীয়া বলেন– يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ প্রত্যেক অগ্নি উপাসক কামনা করে–আহা! সে যদি হাজার বৎসর হায়াত পাইত! আবুল আলীয়া কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় : 'ইয়াহুদীরা অধিক বয়সের জন্যে মুশরিকদের অর্থাৎ অগ্নি উপাসকদের অপেক্ষাও অধিকতর লালায়িত। আর অগ্নি উপাসকদের প্রত্যেকে কামনা করে–আহা! সে যদি হাজার বৎসর আয়ু পাইত!'

يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুসলিম ইব্ন বাতীন ও আ'মাশ বর্ণনা করিয়াছেন : 'এই আয়াতাংশে পারসিক অগ্নি উপাসকদের অধিক বয়স কামনা করিবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এমনকি তাহাদের কেহ কেহ দশ হাজার বৎসর বয়স পাইবার জন্যে ও অভিলাষী হইয়া থাকে।' স্বয়ং সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, আ'মাশ, আবূ হামযা, আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন শাকীক, মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন শাকীক ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ আয়াতাংশে অনারব (পারসিক) অগ্নি-উপাসকদের অধিক বয়স কামনা করিবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা বলিয়া থাকে–আহা! যদি প্রতিটি দিন উৎসবের দিনে ন্যায় আনন্দমুখর হইত এবং এইরূপ আনন্দমুখর দিনের সমন্বয়ে গঠিত হাজার বৎসর আয়ু পাইতাম।'

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন–'তাহাদের পাপ অধিক বয়সকে তাহাদের নিকট প্রিয় ও আকাঙ্ক্ষিত করিয়াছে।'

وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুজাহিদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ অর্থাৎ 'তাহার অধিক বয়স পাওয়া তাহাকে আযাব হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মুশরিকরা পরকালে বিশ্বাসী না হইবার কারণে অধিক বয়স কামনা করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইয়াহুদীরা তাহাদের বদ আকীদা ও বদ আমলের দরুণ যে ভয়াবহ আযাব ভোগ করিবে, তৎসম্বন্ধে তাহারা অবগত থাকিবার কারণে অধিক বয়স কামনা করে।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ। আয়াতাংশে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণকারী লোকদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আবুল আলীয়া ও ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ

وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ অর্থাৎ তাহাদের অধিক বয়স পাওয়া তাহাদিগকে আযাব হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না।'

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ আয়াতাংশে যাহাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা হাজার বৎসর বয়স পাইবার জন্যে লালায়িত থাকিত। আর ইয়াহুদীরা অধিক বয়স পাইবার জন্যে ঐ সকল লোক অপেক্ষাও অধিকতর লালায়িত থাকিত। আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, সে যেহেতু কাফির, তাই তাহাকে অনিবার্যরূপে আযাব ভোগ করিতে হইবে। তাহার অধিক বয়স পাওয়া তাহাকে আযাব হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না, যেমন পারিবে না ইবলীসকে আযাব হইতে মুক্তি দিতে তাহার অধিক বয়স পাওয়া।

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্র বান্দাগণ নেকী বদী যাহাই করে, আল্লাহ্ উহাদের সকল বিষয়েই অবগত, অবহিত ও প্রত্যক্ষকারী। তিনি প্রত্যেককে তাহার আমল অনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করিবেন।

জিবরাঈলের মর্যাদা

(٩٧) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

(٩٨) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَٰلَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِيْنَ ○

৯৭. জিবরাঈলের শত্রুদেরকে বল, 'সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র অনুমোদনক্রমে তোমার অন্তরে উহা (কুরআন) অবতীর্ণ করিয়াছে। উহা তো উহার সম্মুখস্থ বস্তুর সত্যায়ক। আর মু'মনিদের পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা।'

৯৮. 'যাহারা আল্লাহ্, তাঁহার ফেরেশতা ও রাসূল, বিশেষত জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু, অনন্তর নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই কাফিরদের শত্রু।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী জাতির ফেরেশতা বিদ্বেষকে উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে উহার পরিণতির বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। সত্য বিদ্বেষের আরেক নাম কুফর। আল্লাহ্ বিদ্বেষ, রাসূল বিদ্বেষ, কুরআন বিদ্বেষ, ফেরেশতা বিদ্বেষ ইত্যাদি সবই একই কুফরের বিভিন্ন শাখা। যে ব্যক্তি অন্তরে আল্লাহ্, রাসূল, কিতাব, ফেরেশতা ইহাদের যে কোন একটির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে ব্যক্তি জঘন্য সত্যদ্বেষী কাফির। বস্তুত, কোন ব্যক্তি ফেরেশতার প্রতি বিদ্বেষী হইয়া আল্লাহ্ বা তাঁহার রাসূল বা তাঁহার কিতাবের প্রতি অনুগত হইতে পারে না। ইয়াহুদীরা তাই যেমন ফেরেশতা বিদ্বেষী, তেমনি আল্লাহ্ বিদ্বেষী, রাসূল বিদ্বেষী এবং কিতাব বিদ্বেষী ছিল। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে সেই কারণে আল্লাহ্ তাহাদিগকে আল্লাহ্, রাসূল, ফেরেশতা প্রমুখ মহা সত্যের শত্রু নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপ কাফিরের শত্রু। আর আল্লাহ্ তা'আলা যাহার শত্রু, অর্থাৎ তিনি যাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, তাহাদের পরিণতি যে কত ভয়াবহ হইতে পারে, চিন্তাশীল হৃদয়ের নিকট তাহা অননুভূত থাকিতে পারে না। আয়াতে এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদিগকে তাহাদের কুফর তথা সত্য বিদ্বেষের ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র) বলেন ঃ 'তাফসীরকারগণ সকলে এই বিষয়ে একমত যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয় হযরত জিবরাঈল (আ)-এর প্রতি ইয়াহুদীদের শত্রুতা প্রকাশ করিবার ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে। একদা ইয়াহুদীগণ বলিয়াছিল—'জিবরাঈল ফেরেশতা আমাদের শত্রু। পক্ষান্তরে, মিকাঈল ফেরেশতা আমাদের বন্ধু।' তাহাদের উপরোক্ত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতদ্বয় নাযিল হইয়াছে। তবে ইয়াহুদীদের কোন ঘটনা উপলক্ষে উপরোক্ত উক্তি প্রকাশ করিয়াছিল, সেই বিষয়ে তাফসীরকারগণ একমত নহেন।

একদল তাফসীরকার বলেন–'একদা নবী করীম (সা)-এর নবূওতের বিষয়ে ইয়াহুদীগণ ও নবী করীম (সা)-এর মধ্যে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত বিতর্কের এক পর্যায়ে ইয়াহুদীগণ উপরোক্ত উক্তি প্রকাশ করিয়াছিল।' নিম্নে এতদসম্পর্কিত রিওয়ায়েতসমূহ বর্ণিত হইতেছে ঃ

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহ্র ইব্ন হাওশাব, আবদুল হামীদ ইব্ন বাহ্রাম, ইউনুস ইব্ন বুকায়র, আবূ কুরায়ব ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা একদল ইয়াহুদী নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল–'হে আবুল কাসিম! আপনি আমাদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিবেন। আল্লাহ্র নবী ভিন্ন অন্য কেহ উক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে পারিবে না। নবী করীম (সা) বলিলেন–'তোমরা আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিতে চাও, জিজ্ঞাসা করিতে পার। তবে হযরত ইয়াকূব (আ) যেইরূপে স্বীয় পুত্রদের নিকট হইতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ তোমাদের নিকট হইতে একটি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিব। আমি তোমাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারিলে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিবে তো?' তাহারা বলিল–'হ্যাঁ! আপনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করিব।' নবী করীম (সা) বলিলেন–'এখন তোমরা তোমাদের প্রশ্নসমূহ উপস্থাপন করিতে পার।' তাহারা বলিল– আমরা আপনার নিকট চারটি প্রশ্ন উপস্থাপন করিব।

প্রথম প্রশ্ন ঃ তাওরাত কিতাব নাযিল হইবার পূর্বে হযরত ইসরাঈল (আ) (হযরত ইয়াকূব আ) নিজের জন্য কোন্ কোন্ খাদ্য নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ নারীর বীর্য ও পুরুষের বীর্য কোন্‌টির বৈশিষ্ট্য কি আর সন্তান কোন্ কারণে পুরুষ এবং কোন কারণে নারী হয়? তৃতীয় প্রশ্নঃ তাওরাত কিতাবে উল্লেখিত নিরক্ষর নবীর [নবী করীম (সা)-এর] বৈশিষ্ট্য কি? চতুর্থ প্রশ্ন ঃ কোন্ ফেরেশতা সেই নবীর [নবী করীম (সা)-এর] নিকট ওহী লইয়া আসেন? নবী করীম (সা) বলিলেনঃ তোমাদিগকে আল্লাহ্র কসম দিয়া বলিতেছি, আমি তোমাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে পারিলে তোমরা আমার প্রতি ঈমান আনিবে তো? তাহারা দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিল যে, নবী করীম (সা) তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলে তাহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে। নবী করীম (সা) বলিলেন–যে সত্তা হযরত মুসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে সেই সত্তার কসম দিয়া বলিতেছি–ইহা কি সত্য নহে যে, 'একদা হযরত ইয়াকূব (আ) (ইস্রাইল আ) কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রোগ দীর্ঘস্থায়ী হইলে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মানত করিলেন যে, যদি তিনি রোগমুক্ত হন, তবে যে খাদ্য ও যে পানীয় তাঁহার নিকট অধিকতর প্রিয়, তাহা তিনি বর্জন করিবেন? তাঁহার সেই প্রিয়তম খাদ্য ও পানীয় কি ছিল না যথাক্রমে উটের গোশত ও উটের দুধ?' ইয়াহুদীগণ বলিল–হ্যাঁ! ইহা সত্য। নবী করীম (সা) বলিলেন– হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদের কথার সাক্ষী থাকিও। অতঃপর তাহাদিগকে বলিলেন, যে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং যিনি হযরত মূসা (অ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে সেই আল্লাহ্র কসম দিয়া বলিতেছি–ইহা কি সত্য নহে যে, পুরুষের বীর্য গাঢ় ও সাদা হইয়া থাকে এবং নারীর বীর্য পাতলা ও হলদে হইয়া থাকে আর পুরুষ ও নারী এই উভয়ের মধ্য হইতে যাহার বীর্য অপরজনের বীর্যের উপর জয়ী হয়, আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে সন্তান তাহারই সমলিঙ্গ ও সমআকৃতির হয়? পিতার বীর্য মাতার বীর্য অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইলে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে সন্তান পুরুষ ও পিতার সম-আকৃতি হইয়া থাকে

পক্ষান্তরে মাতার বীর্য পিতার বীর্য অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইলে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে সন্তান নারী ও মাতার সম-আকৃতি হইয়া থাকে। তাহার বলিল-হ্যাঁ! ইহা সত্য। নবী করীম (সা) বলিলেন- হে আল্লাহ্। তুমি সাক্ষী থাকিও। অতঃপর তাহাদিগকে সেই আল্লাহ্র কসম দিয়া বলিতেছি-'ইহা কি সত্য নহে যে, সেই নিরক্ষর নবীর চক্ষুদ্বয় ঘুমাইলেও তাঁহার অন্তর ঘুমায় না?' তাহারা বলিল-হ্যাঁ! ইহা সত্য। নবী করীম (সা) বলিলেন-'হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাকিও। তাহারা বলিল-এবার আপনি কোন্ ফেরেশতা আপনার নিকট ওহী লইয়া আসেন তাহা বলুন। আপনি এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পর আমরা হয় ইসলাম গ্রহণ করিয়া আপনার সহিত মিলিত হইব, আর না হয় যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থায় থাকিব। নবী করীম (সা) বলিলেন-আমার নিকট ওহী লইয়া আসেন হযরত জিবরাঈল (আ)। তিনি সকল নবীর নিকটই ওহী লইয়া আসিতেন।

ইয়াহুদীগণ বলিল-আমরা ইসলাম গ্রহণ করিব না। জিবরাঈল ভিন্ন অন্য কোন ফেরেশতা যদি আপনার নিকট ওহী লইয়া আসিতেন, তবে আমরা ইসলাম গ্রহণ করিতাম। নবী করীম (সা) বলিলেন-তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া জানিতে তোমাদের আপত্তি কেন? তাহারা বলিল-সে যে আমাদের শত্রু। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى قوله تعالى لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

এইরূপে ইয়াহুদীগণ গযবের উপর গযব লইয়া ফিরিয়া গেল।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহ্র ইব্ন হাওশাব, আবদুল হামীদ ইব্ন বাহরাম, আবূ নযর হাশিম ইব্ন কাসিম এবং ইব্ন আহমদও উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্ন হাওশাব, আবদুল হামীদ ইব্ন বাহরাম, আহমদ ইব্ন ইউনুস এবং আবদুর রহমান ইব্ন হামীদও স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্ন হাওশাব, আবদুল হামীদ ইব্ন রাহরাম, হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ মারূযী এবং ইমাম আহমদও প্রায় অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

আবার শাহর ইব্ন হাওশাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হুসাইন এবং মুহম্মদ ইব্ন ইসহাক ইয়াসারও উহাকে 'বিচ্ছিন্ন সনদ (سند مرسل)' -এর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার বর্ণনা অনুযায়ী ইয়াহুদীগণ ও নবী করীম (সা)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনার শেষাংশ নিম্নরূপ ঃ

'ইয়াহুদীগণ বলিল-এবার আপনি রূহ (الروح) কি তাহা বলুন। নবী করীম (সা) বলিলেন-আমি তোমাদিগকে আল্লাহর দোহাই দিয়া এবং বনী ইসলাঈল জাতির প্রতি অবতীর্ণ তাঁহার নি'আমাতসমূহের দোহাই দিয়া বলিতেছি-'ইহা কি সত্য নহে যে, 'রূহ' হইতেছে জিবরাঈল আর জিবরাঈল হইতেছে সেই ফেরেশতা, যিনি আমার নিকট ওহী লইয়া আসিয়া থাকেন?' ইয়াহুদীগণ বলিল-'হ্যাঁ! ইহা সত্য; কিন্তু তিনি আমাদের শত্রু। তিনি বালা-মুসীবত এবং রক্তারক্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আপনার নিকট ওহী আনয়নকারী ফেরেশতা জিবরাঈল না হইয়া অন্য কেহ হইলে আমরা ঈমান আনিতাম।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى قوله تعالى لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, বুকায়র ইব্ন শিহাব, আবদুল্লাহ ইব্ন ওলীদ, আজালী, আবূ আহমদ এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'একদা ইয়াহুদীগণ নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল–'হে আবুল কাসিম ! আমরা আপনার নিকট পাঁচটি প্রশ্ন উপস্থাপন করিব। যদি আপনি আমাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে পারেন, তবে বুঝিব যে, আপনি প্রকৃতই একজন নবী। এমতাবস্থায় আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব।' তখন হযরত ইসরাঈল (আ) স্বীয় পুত্রদের নিকট হইতে যেইরূপে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সূরা ইউসুফে যাহার বর্ণনা রহিয়াছে, ইয়াহুদীদের কথায় নবী করীম (সা) তাহাদের নিকট হইতে সেইরূপ দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমাদের প্রশ্নগুলি উপস্থাপন কর। তাহারা বলিল– নবীর আলামত ও বৈশিষ্ট্য কি? তিনি বলিলেন– নবীর চক্ষুদ্বয় ঘুমাইলেও তাঁহার অন্তর ঘুমায় না। তাহারা বলিল–সন্তান কোন্ কারণে পুরুষ এবং কোন্ কারণে নারী হয়? তিনি বলিলেন– নারী ও পুরুষ উভয়ের বীর্য পরস্পর মিলিত হইবার পর পুরুষের বীর্য নারীর বীর্যের উপর জয়ী হইলে সন্তান পুরুষ হয়। পক্ষান্তরে উভয়ের বীর্য পরস্পর মিলিত হইবার পর নারীর বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর জয়ী হইলে সন্তান নারী হয়। তাহারা বলিল–হযরত ইসরাঈল (আ) নিজের জন্য কোন্ কোন্ খাদ্য হারাম করিয়া লইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন–একদা হযরত ইসরাঈল (আ) দুরারোগ্য বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বিশেষ পশুর দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কিছুতেই তিনি উক্ত রোগে উপশম পাইতেন না। (ইমাম আহমদ বলেন–'জনৈক রাবী বলিয়াছেন, উটের দুধ ছাড়া অন্য কিছুতেই তিনি উক্ত রোগে উপশম বোধ করিতেন না।)' ইহাতে তিনি নিজের জন্যে উহার গোশত হারাম করিয়াছিলেন।[১] তাহারা বলিল–আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। এবার বলুন–রাদ (الرعد) কি? তিনি বলিলেন–রা'দ একজন ফেরেশতা। তিনি মেঘ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। তাঁহার হাতে একখানা অগ্নিদণ্ড আছে। যা দ্বারা মেঘে আঘাত করিয়া উহা আল্লাহ্ যেখানে লইয়া যাইতে নির্দেশ দেন, সেখানে লইয়া যান। তাহারা বলিল– আমরা যে আওয়াজ শুনিতে পাই, উহা কিসের আওয়াজ? তিনি বলিলেন–উহা তাহার আওয়াজ। তাহারা বলিল–আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। আর মাত্র একটি প্রশ্ন অবশিষ্ট রহিয়াছে। আপনি উহার উত্তর দিতে পারিলেই আমরা আপনাকে নবী বলিয়া মানিয়া লইব। প্রত্যেক নবীর নিকট একজন ফেরেশতা ওহী লইয়া আসিতেন। আপনার নিকট কোন্ ফেরেশতা ওহী লইয়া আসেন? তিনি বলিলেন–আমার নিকট ওহী লইয়া আসেন হযরত জিবরাঈল (আ)। তাহারা বলিল–জিবরাঈল? সে তো আমাদের শত্রু। সে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আযাব লইয়া আসে। আপনার নিকট যদি মিকাঈল ফেরেশতা ওহী লইয়া আসিতেন, তবে আমরা ঈমান আনিতাম। মিকাঈল ফেরেশতা রহমত, বৃষ্টি ও ফসলাদি লইয়া আসেন।'

---

১. এইস্থানে মুল রিওয়ায়েত হইতেছে এই ঃ

(كان يشتكى عرق النساء - فلم يجد شيئا يلائمه الا البان كذا) قال احمد قال بعضهم يعنى الابل - (فحرم لحومها)

দেখা যাইতেছে, মূল রিওয়ায়েতেই অস্পষ্টতা রহিয়াছে। সম্ভবত উহার তাৎপর্য এই ঃ 'হযরত ইসরাঈল (আ) শুধু উটের দুধে উপশম বোধ করিতেন। উহার গোশতে রোগ বৃদ্ধি হইত। তাই তিনি উটের গোশত নিজের জন্য হারাম করিয়া লইয়াছিলেন।' তবে উক্ত তাৎপর্য ইতিপূর্বে বর্ণিত রিওয়ায়েতের বিরোধী। উক্ত রিওয়ায়েতাংশের ভিন্নরূপ তাৎপর্যও বর্ণনা করা যাইতে পারে।

ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى الخر الاية

ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত রিওয়ায়েত উহার অন্যতম রাবী আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ওলীদ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহাকে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

কাসিম ইব্ন আবী বায্যাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ, হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদ ও সুনায়দ তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা ইয়াহুদীগণ নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল–কোন্ ফেরেশতা আপনার নিকট ওহী লইয়া আসেন? তিনি বলিলেন–জিবরাঈল ফেরেশতা আমার নিকট ওহী লইয়া আসেন। তাহারা বলিল–সে তো আমাদের শত্রু। সে শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ, বালা-মুসীবত ইত্যাদি অনভিপ্রেত বিষয় লইয়া আসে। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى الخر الاية

মুজাহিদ হইতে ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা ইয়াহুদীগণ নবী করীম (সা)-কে বলিল–হে মুহাম্মদ। জিবরাঈল ফেরেশতা যখনই নাযিল হয়, তখনই যুদ্ধ-বিগ্রহ, বালা-মুসীবত ইত্যাদি অবাঞ্ছিত বিষয় সঙ্গে লইয়া আসে। সেইহেতু সে আমাদের শত্রু। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى الخر الاية

ইমাম বুখারী বলেন ঃ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ প্রসঙ্গে ইকরামা বলিয়াছেন, ميك، جبر ও اسراف শব্দত্রয়ের প্রত্যেকটির অর্থ عبد (দাস, গোলাম, বান্দা)। ايل অর্থ الله। আল্লাহ্।' অতঃপর ইমাম বুখারী বলেন ঃ হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিক সূত্রে হামীদ, আব্দুল্লাহ ইব্ন বিকর ও আবদুল্লাহ ইব্ন মুনীর আমার (ইমাম বুখারীর) নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম ফলের বাগানে ফল পাড়িতেছিলেন। সেখানে তিনি মদীনায় নবী করীম (সা)-এর আগমনের সংবাদ শুনিতে পাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিলেন–আমি আপনার নিকট তিনটি প্রশ্ন করিব। আল্লাহর নবী ভিন্ন অন্য কেহ উহাদের উত্তর দিতে পারিবে না।

প্রথম প্রশ্ন ঃ কিয়ামতের প্রথম আলামত কি?

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ জান্নাতবাসীদের প্রথম খাদ্য কি?

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ সন্তান কোন্ কারণে পুরুষ এবং কোন কারণে নারী হয়?

নবী করীম (সা) বলিলেন–কিছুক্ষণ পূর্বে হযরত জিবরাঈল (আ) আমাকে এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানাইয়া গিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম প্রশ্ন করিলেন–জিবরাঈল? নবী করীম (সা) বলিলেন– হ্যাঁ, জিবরাঈল। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম বলিলেন–ইয়াহুদীগণ তাঁহার শত্রু। ইয়াহুদীগণ ফেরেশতাদের মধ্য হইতে একমাত্র তাঁহারই শত্রু। ইহাতে নবী করীম (সা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى الخر الاية

অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন—এক, কিয়ামতের প্রথম আলামত হইতেছে একটি আগুন, যাহা পূর্বদিক হইতে লোকদিগকে তাড়াইয়া লইয়া পশ্চিম দিকে একত্রিত করিবে। দুই, জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য হইতেছে মাছের কলিজার বর্ধিত অংশ। তিন, পুরুষের বীর্য নারীর বীর্যের উপর জয়ী হইলে সন্তান পুরুষ হয় এবং নারীর বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর জয়ী হইলে সন্তান নারী হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম বলিলেন ঃ

اشهد ان لا اله الاّ اللّه وانك رسول اللّه (আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই এবং আপনি আল্লাহ্র রাসূল।) অতঃপর তিনি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলেন—হে আল্লাহ্র রাসূল। ইয়াহুদী জাতি অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনাকারী একটি জাতি। তাহারা আমার ইসলাম গ্রহণ করিবার সংবাদ জানিতে পারিলে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করিবে। অতএব আমার ইসলাম গ্রহণ করিবার সংবাদ তাহাদের কানে পৌঁছিবার পূর্বে আপনি তাহাদের নিকট আমার সম্বন্ধে তথ্য জিজ্ঞাসা করিবেন। অতঃপর ইয়াহুদীগণ নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন ব্যক্তি? তাহারা বলিল, সে আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। তাঁহার পিতাও আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। সে আমাদের নেতা। তাঁহার পিতাও আমাদের নেতা। নবী করীম (সা) বলিলেন—সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে কেমন হইবে? তাহারা বলিল, আল্লাহ তাঁহাকে ইহা হইতে বাঁচাক! হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম সেইখানে একস্থানে লুকাইয়া ছিলেন। তাহাদের কথার পর তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন— আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল। ইহা শুনিয়া তাহারা বলিল—'এই লোকটি আমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। তাহার পিতাও আমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি।' তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে আরও নিন্দাসূচক কথা বলিল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম বলিলেন— 'হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহারা আমার বিরুদ্ধে এইরূপ নিন্দাসূচক মিথ্যা কথা বলিবে বলিয়া আমি পূর্বেই আশংকা করিয়াছিলাম।'

উপরোক্ত হাদীস হযরত আনাস (রা) হইতে উপরোক্ত মাধ্যমে শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হযরত আনাস (রা)-এর নিকট হইতে ভিন্ন মাধ্যমে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ই অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আবার, মুসলিম শরীফে নবী করীম (সা)-এর গোলাম ছাওবান (রা) হইতে প্রায় অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ চাহেন তো যথাস্থনে উহা উল্লেখ করিব।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে ইমাম বুখারী বলেন যে, ইকরামা বলিয়াছেন ঃ ايل শব্দের অর্থ আল্লাহ্।' উক্ত রিওয়ায়েত একটি বিখ্যাত রিওয়ায়েত। ইকরামা হইতে ধারাবাহিকসূত্রে খসীফ এবং সুফিয়ান ছাওরীও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে হাকাম, ইবরাহীম ইব্‌ন হাকাম এবং আবদ ইব্‌ন হামীদও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে কায়স ইব্‌ন আসিম, ইসহাক ইব্‌ন মানসূর, হুসাইন ইব্‌ন ইয়াযীদ তাহ্হান ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ جبرايل ও ميكائيل এই উভয় শব্দের প্রত্যেকটির অর্থ عبد اللّه আল্লাহ্র বান্দা। ايل শব্দের অর্থ আল্লাহ্।' হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা এবং ইয়াযীদ নাহভীও অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্বযুগীয় আরও একাধিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। যথাস্থানে উহা আলোচিত হইবে।

অবশ্য কেহ কেহ বলেন- ايل শব্দের অর্থ عبد (বান্দা, দাস, গোলাম) এবং উহার পূর্বে অবস্থিত শব্দ جبر - ميك - عزر - اسراف ইহাদের প্রত্যেকটির অর্থ আল্লাহ্। কারণ, ايل শব্দটি অপরিবর্তিত থাকে। পক্ষান্তরে উহার পূর্ববর্তী শব্দ পরিবর্তিত হইয়া থাকে। যেমন ঃ عزرائيل - اسرافيل - ميكائيل - جبرائيل আরবী ভাষায় উহাদের অনুরূপ নাম হইতেছে عبد الجليل، عبد الملك، عبد الرحمن، عبد الله، عبد الكافى، عبد السلام، عبد القدوس, (আল্লাহ্র বান্দা) ইত্যাদি। উক্ত নামাসমূহের প্রত্যেকটিতে عبد শব্দটি অপরিবর্তিত রহিয়াছে। পরিবর্তিত হইয়াছে শুধু আল্লাহর নাম مضاف اليه (সম্বন্ধ পদটি)। এইরূপেই عزرائيل ও اسرافيل، مكائيل، جبرائيل শব্দগুলিতে ايل শব্দটি অপরিবর্তিত রহিয়াছে। পরিবর্তিত হইয়াছে আল্লাহ্র নাম مضاف اليه (সম্বন্ধ পদটি)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আরবী ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় مضاف اليه (সম্বন্ধ পদ) مضاف (যে মুখ্যপদের সহিত সম্বন্ধ পদ সম্পর্কিত হয়) এর পূর্বে স্থাপিত হইয়া থাকে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন-'আরেক দল তাফসীরকার বলেন-একদা নবী করীম (সা) সম্বন্ধে একদল ইয়াহুদী ও হযরত উমর (রা)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনার এক পর্যায়ে ইয়াহুদীগণ হযরত জিবরাঈল (আ) সম্বন্ধে পূর্বোল্লেখিত উক্তি ব্যক্ত করিয়াছিল।' নিম্নে এদতসম্পর্কিত রিওয়ায়েতসমূহ বর্ণিত হইতেছে।

শা'বী হইতে ধারাবাহিকবাবে দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ, রবঈ ইব্‌ন আলীয়াহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'একদা হযরত উমর (রা) 'রওহা' নামক স্থানে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, লোকেরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া একটি প্রস্তররাশির পার্শ্বে অবস্থিত এক জায়গায় গিয়া নামায আদায় করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-এই সকল লোক এইরূপ দৌড়াদৌড়ি করিয়া ঐ স্থানে নামায আদায় করিতে যাইতেছে কেন? লোকেরা বলিল, মানুষে বলে যে, নবী করীম (সা) ঐ স্থানে নামায আদায় করিয়াছিলেন। হযরত উমর (রা) বলিলেন-'ইহা তো কুফরী। নবী করীম (সা) উপত্যকায় অবস্থান করিবার সময়ে যখন যেইখানে নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইত, তিনি তখন সেইখানে নামায আদায় করিয়া সেইস্থানকে সেইরূপে রাখিয়া যাইতেন।' অতঃপর হযরত উমর (রা) লোকদের সহিত অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন-ইয়াহুদীগণ যখন তাওরাত কিতাব পড়িত, তখন আমি তাহাদের নিকট উপস্থিত থাকিতাম। দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতাম যে, কুরআন মজীদ এবং তাওরাত কিতাব কি সুন্দররূপেই না পরস্পরকে সমর্থন করিতেছে। একদা তাহাদের তাওরাত পড়িবার কালে আমি তাহাদের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাহারা আমাকে বলিল-হে খাত্তাব পুত্র উমর! তুমি আমাদের নিকট তোমার যে কোন সঙ্গী অপেক্ষা অধিকতর পছন্দনীয় ব্যক্তি। আমি বলিলাম-উহার কারণ কি? তাহার বলিল, তুমি আমাদের নিকট মাঝে মাঝে আস। তখন আমি বলিলাম-'আমি তোমাদের নিকট আসিয়া এই দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হই যে, কুরআন মজীদ ও তাওরাত কিতাব কি সুন্দররূপেই না পরস্পরকে সমর্থন করে।' এই সময়ে নবী করীম (সা) আমাদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা বলিল-ওই তোমাদের বন্ধু যাইতেছেন। তুমি গিয়া তাঁহার সহিত

মিলিত হও। আমি তাহাদিগকে বলিলাম–'যে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই, আমি তোমাদিগকে তাঁহার কসম দিয়া এবং তিনি যে কর্তব্যসমূহ তোমাদের উপর ওয়াজিব করিয়াছেন ও যে তাওরাত কিতাব তোমাদের নিকট নাযিল করিয়াছেন, সেই কর্তব্যসমূহ ও তাওরাত কিতাবের দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি– তোমরা কি জান না যে, মুহাম্মদ (সা) প্রকৃতই আল্লাহ্র রাসূল,' আমরা কথা শুনিয়া তাহার চুপ করিয়া রহিল। ইহাতে তাহাদের বিজ্ঞতম ও প্রবীণতম ব্যক্তি অন্য লোকদিগকে বলিল–এই ব্যক্তি বড় শক্ত কসম ও দোহাই দিয়াছে। তোমরা তাহার কথার উত্তর দাও। তাহারা বলিল–'আপনি আমাদের মধ্যে বিজ্ঞতম ও প্রবীণতম ব্যক্তি। আপনিই তাহার কথার উত্তর দিন।' তখন প্রবীণতম লোকটি বলিল–তুমি যখন এত বড় কসম ও দোহাই দিয়াছ, তখন আমাকে সত্য কথা বলিতে হইতেছে। শুন, আমরা জানি যে, তিনি (নবী করীম (সা)) প্রকৃতই আল্লাহ্র রাসূল। আমি বলিলাম–তবে তো তোমাদের সর্বনাশ হইয়াছে। তাহার বলিল–না, আমাদের সর্বনাশ হইবে না। আমি বলিলাম–তিনি প্রকৃতই আল্লাহ্র রাসূল এই কথা জানিয়াও তোমরা তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া গ্রহণ করিতেছ না ও মানিতেছ না। এমতাবস্থায় তোমাদের সর্বনাশ হইবে না কেন? তাহারা বলিল–ফেরেশতাদের মধ্য হইতে একজন ফেরেশতা আমাদের শত্রু এবং একজন ফেরেশতা আমাদের বন্ধু আছেন। এই লোকটির নিকট আমাদের সেই শত্রুটি ওহী লইয়া আসে। আমি বলিলাম–কোন্ ফেরেশতা তোমাদের শত্রু এবং কোন্ ফেরেশ্তা তোমাদের বন্ধু? তাহারা বলিল–আমাদের শত্রু হইতেছে জিবরাঈল আর আমাদের বন্ধু হইতেছেন মিকাঈল। জিবরাঈল আযাব, শাস্তি, বালা-মুসীবত, বিপদাপদ ইত্যাদির ফেরেশতা। পক্ষান্তরে মিকাঈল রহমত, নি'আমাত, দয়া, শান্তি, ইত্যাদির ফেরেশতা। আমি বলিলাম–তাহাদের প্রভুর নিকট তাহাদের কাহার কি মর্যাদা রহিয়াছে? তাহারা বলিল–তাহাদের একজন তাঁহার ডানে এবং অন্যজন বামে রহিয়াছেন। আমি বলিলাম–যে সত্তা ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই, তাঁহার কসম! জিবরাঈল ও মিকাঈল এবং যিনি তাঁহাদের মাঝখানে আছেন তাঁহাদের সকলেই সেইসব লোকের শত্রু যাহারা জিবরাঈল ও মিকাঈলের সঙ্গে শত্রুতা রাখে। আবার তাঁহাদের সকলেই সেইসব লোকের বন্ধু যাহারা জিবরাঈল ও মিকাঈলের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে। আর যে ব্যক্তি মিকাঈলের সহিত শত্রুতা রাখে, তাহার সহিত জিবরাঈল কোনক্রমেই বন্ধুত্ব রাখেন না, রাখিতে পারেন না। আবার যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সহিত শত্রুতা রাখে, তাহার সহিত মিকাঈল কোনক্রমে বন্ধুত্ব রাখেন না, রাখিতে পারেন না।

হযরত উমর (রা) বলিলেন–ইয়াহূদীদিগকে এই কথা বলিয়া আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট চলিয়া আসিলাম। তিনি তখন একটি গৃহের বাহিরে অবস্থান করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন–হে ইব্ন খাত্তাব! কিছুক্ষণ পূর্বে আমার প্রতি এই আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى الخر الاية

আমি আরয করিলাম–'হে আল্লাহ্র রাসূল। আমার মা-বাপ আপনার জন্যে কুরবান হউক! যে সত্তা আপনাকে সত্যসহ পাঠাইয়াছেন, তাঁহার কসম! আপনাকে কিছুক্ষণ পূর্বে সংঘটিত একটি ঘটনা জানাইতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম, সর্বজ্ঞ সূক্ষ্মজ্ঞানী মহান আল্লাহ্ উহা আপনাকে পূর্বেই জানাইয়া দিয়াছেন।'

আমের (শা'বী) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, আবূ উসামাহ, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম, বর্ণনা করিয়াছেনঃ একদা হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) ইয়াহুদীদের নিকট গিয়া বলিলেন–যে সত্তা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে সেই সত্তার কসম দিয়া বলিতেছি--তোমরা কি তোমাদের কিতাবসমূহে মুহাম্মদ (সা)-এর নাম ও তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী দেখিতে পাও? তাহারা বলিল–হ্যাঁ! আমরা আমাদের কিতাবসমূহে তাঁহার নাম ও তাঁহার আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী দেখিতে পাই। তিনি বলিলেন–তবে কেন তোমরা তাঁহাকে মান না ও তাঁহার প্রতি ঈমান আন না? তাহারা বলিল–প্রত্যেক নবীর জন্যে আল্লাহ্ একজন সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। মুহাম্মদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হইতেছে জিবরাঈল। সে তাঁহার নিকট ওহী লইয়া আগমন করিয়া থাকে। ফেরেশতাদের মধ্যে সে আমাদের শত্রু। পক্ষান্তরে মিকাঈল ফেরেশতা আমাদের মিত্র। মিকাঈল যদি তাহার নিকট ওহী লইয়া আসিত, তবে আমরা মুহাম্মদের প্রতি ঈমান আনিতাম।

হযরত উমর (রা) বলিলেন–যে আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে সেই আল্লাহর কসম দিয়া প্রশ্ন করিতেছি, আল্লাহ্র নিকট উভয় ফেরেশতার কাহার কিরূপ মর্যাদা রহিয়াছে? তাহারা বলিল–জিবরাঈল আল্লাহর ডানে এবং মিকাঈল তাঁহার বামে অবস্থান করেন। তিনি বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তাহাদের কেহই আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যাতিরেকে অবতীর্ণ হন না, হইতে পারেন না। আর যাহারা জিবরাঈলের সহিত শত্রুতা রাখে, মিকাঈল কোনক্রমেই তাহাদের সহিত মিত্রতা রাখেন না, রাখিতে পারেন না। অনুরূপভাবে, যাহারা মিকাঈলের সহিত শত্রুতা রাখে, জিবরাঈলও কোনক্রমেই তাহাদের সহিত মিত্রতা রাখেন না, রাখিতে পারেন না। হযরত উমর (রা)-এর ইয়াহুদীদের নিকট থাকা অবস্থায় নবী করীম (সা) তাহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা নবী করিম (সা)-কে দেখিয়া হযরত উমর (রা)-কে বলিল– হে খাত্তাব-পুত্র! তোমার বন্ধু যাইতেছে। তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া নবী করীম (সা)-এর সহিত মিলিত হইলেন। ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর উপর নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল করনে ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى قوله تعالى فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِيْنَ

উপরোক্ত রিওয়ায়েতদ্বয়ের সনদ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শা'বী উহা হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, । প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত রিওয়ায়েতদ্বয়ের সনদ বিচ্ছিন্ন। কারণ, শা'বী হযরত উমর (রা)-এর সমসাময়িক ছিলেন না বিধায় সরাসরি তাঁহার নিকট হইতে কোন হাদীস বর্ণনা করেন নাই। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ, ইয়াযীদ ইব্ন যারী; বশীর ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদাহ বলেন ঃ

আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা হযরত উমর (রা) ইয়াহুদীদের নিকট গেলেন। তাহারা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন–আল্লাহর কসম! তোমাদের নিকট আমার আসিবার কারণ এই নহে যে, আমি তোমাদিগকে ভালবাসি বা তোমাদের প্রতি আমার মনে কোন টান বা আকর্ষণ আছে। বরং তোমদের নিকট আমার

আসিবার কারণ এই যে, আমি তোমাদের নিকট হইতে কিছু তথ্য জানিব। অতঃপর তিনি তাহাদের নিকট প্রশ্ন করিলেন এবং তাহারা তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিল। এক পর্যায়ে তাহারা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের বন্ধুর (নবী করীম (সা)) বন্ধু কে? তিনি বলিলেন–'জিবরাঈল।' তাহারা বলিল–ফেরেশতাদের মধ্যে একমাত্র সে-ই আমাদের শত্রু। সে মুহাম্মদকে আমাদের গোপন কথা জানাইয়া দেয়। আর যখন পৃথিবীতে আসে, তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আকাল-দুর্ভিক্ষ সঙ্গে লইয়া আসে। পক্ষান্তরে আমাদের বন্ধুর (হযরত মূসা আ) বন্ধু ছিলেন মিকাঈল। তিনি যখন পৃথিবীতে আসিতেন, তখন শান্তি ও ফসলাদির প্রাচুর্য সঙ্গে লইয়া আসিতেন। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন–আচ্ছা! তোমরা জিবরাঈলকে চিন; কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-কে চিন না! এই বলিয়া তিনি নবী করীম (সা)-কে ঘটনাটি জানাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ইতিমধ্যেই তাঁহার উপর নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছে ঃ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى الخر الاية

তেমনি কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ জা'ফর, আদম, মুসান্না ও ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। উহা আদম কর্তৃক লিখিত তাফসীর গ্রন্থেও উল্লেখিত হইয়াছে। তবে উহার সনদও বিচ্ছিন্ন। তেমনি হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুদ্দী এবং আসবাতও অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। উহার সনদও বিচ্ছিন্ন।

আব্দুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা হইতে ধারাবাহিকভাবে হেসীন ইব্ন আব্দুর রহমান, আবূ জা'ফর, আব্দুর রহমান (দসতিলী) মুহাম্মদ ইব্ন আম্মার ও ইমাম ইব্ন আবী হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা হযরত উমর (রা)-এর সহিত জনৈক ইয়াহুদীর সাক্ষাৎ হইলে সে তাঁহাকে বলিলঃ তোমাদের বন্ধু (নবী করীম (সা)) যে জিবরাঈল ফেরেশতার কথা আলোচনা করিয়া থাকেন, সে তো আমাদের শত্রু। ইহাতে হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ -

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ঠিক হযরত উমর (রা)-এর কথাকেই কুরআন মজীদের আয়াত হিসাবে নাযিল করিলেন।

আবূ জা'ফর রাযী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নযর, হাশিম ইব্ন কাসিম এবং আবদ ইব্ন হামীদও উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবী-লায়লা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আব্দুর রহমান, হাশিম, ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা ইয়াহুদীগণ মুসলমানদিগকে বলিল–'যদি মিকাঈল ফেরেশতা ওহী লইয়া তোমাদের নিকট অবতীর্ণ হইত, তবে আমরা তোমাদিগকে অনুসরণ করিতাম। কারণ, সে রহমত ও মেঘ লইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, জিবরাঈল ফেরেশতা আযাব ও শাস্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকে। এই কারণে সে আমাদের শত্রু।' ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ - الى اخر الاية

তেমনি আতা হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল মালিক, হাশিম, ইয়াকূব ও ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্তরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে

মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা ইয়াহুদীগণ বলিল-'জিবরাঈল আমাদের শত্রু। কারণ, সে আযাব ও আকাল লইয়া আসে। পক্ষান্তরে মিকাঈল শান্তি, প্রাচুর্য এবং শস্যাদির অধিক ফলন লইয়া আসে। অতএব, সে আমাদের মিত্র।' ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ قُلْ مَنْ كَانَ عدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى الخر الاية

আয়াতদ্বয়ের তাফসীর ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَانَّهُ نَزَّ لَه عَلى قَلْبِكَ بِاذْنِ اللّه - অর্থাৎ যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সহিত শত্রুতা রাখে, সে যেন জানিয়া রাখে যে, সে আল্লাহ তা'আলার বিশ্বস্ত ফেরেশতা। সে আল্লাহর নির্দেশে ওহী লইয়া মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া থাকে। অতএব, সেও আল্লাহ তা'আলার একজন রাসূল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার একজন রাসূলের সহিত শত্রুতা রাখে, সে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সকল রাসূলের সহিত শত্রুতা রাখে। কারণ, সকল রাসূলই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে মহাসত্য লইয়া আগমন করেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

انَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلاً - اُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا - وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا -

'যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণের প্রতি কুফর করে এবং (ঈমান আনিবার ব্যাপারে) আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করিতে চাহে আর বলে-আমরা (উহাদের) একজনের প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং অন্যজনের প্রতি অবিশ্বাস রাখি আর উভয়ের মধ্যবর্তী একটি পথ গ্রহণ করিতে চাহে, তাহারা নিশ্চিতরূপে কাফির। আর আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।"

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা যাহারা সকল রাসূলের প্রতি ঈমান না আনিয়া কোন রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং কোন রাসূলের প্রতি কুফর করে, তাহাদিগকে নিশ্চিত কাফির নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। উপরে বলা হইয়াছে, 'হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহ্র একজন রাসূল।' অতএব যে ব্যক্তি হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সহিত শত্রুতা রাখে, সে প্রকৃতপক্ষে সকল রাসূলের সহিত শত্রুতা রাখে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সহিত শত্রুতা রাখে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র সহিত শত্রুতা রাখে। কারণ, জিবরাঈল নিজের ইচ্ছায় কোন কিছু লইয়া কাহারও নিকট নাযিল হন না। তিনি স্বীয় প্রভুর নির্দেশেই ওহী লইয়া নাযিল হইয়া থাকেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَا نَتَنَزَّلُ الاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ 'আর, আমি (জিবরাঈল) তোমার প্রভুর নির্দেশ ব্যতীত অবতীর্ণ হই না।

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَانَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ -

'আর উহা (আল-কুরআন) নিশ্চয় জগতসমূহের প্রতিপালক কর্তৃক অবতীর্ণ গ্রন্থ। বিশ্বস্ত রূহ (জিবরাঈল) উহাকে তোমার অন্তরে নাযিল করিয়াছে। উহা এই উদ্দেশ্যে নাযিল করা হইয়াছে যে, তুমি একজন সতর্ককারী হইবে।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয় পাত্রের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়, সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।' তাই আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলের সহিত শত্রুতা পোষণকারীদের উপর গযব নাযিল করিয়াছেন।

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ অর্থাৎ কুরআন মজীদ উহার পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করে।

وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ উহা মু'মিনদের অন্তরের জন্যে হিদায়েত এবং তাহাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদদাতা। কুরআনের এই বৈশিষ্ট্য শুধু মু'মিনদের জন্যে।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ 'তুমি বল উহা (কুরআন মজীদ) যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য হিদায়েত ও আরোগ্য বিধান।'

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ "আর আমি মু'মিনদের জন্যে আরোগ্য বিধান ও রহমত স্বরূপ কুরআন নাযিল করিয়া থাকি।"

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ -

"যাহারা আল্লাহ্, তাঁহার ফেরেশতাগণ, তাঁহার রাসূলগণ, জিবরাঈল এবং মীকাঈলের সহিত শত্রুতা রাখে, আল্লাহ্ সেই সকল কাফিরদের শত্রু।"

মানুষের মধ্য হইতে মনোনীত রাসূলগণ এবং ফেরেশতাদের মধ্য হইতে মনোনীত রাসূলগণ-উভয় শ্রেণীর রাসূলগণই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত رسل (রাসূলগণ) শব্দের পদবাচ্য। আল্লাহ্ তা'আলা যে মানুষ ও ফেরেশতা উভয় শ্রেণী হইতে মনোনীত করিয়া থাকেন নিম্নোক্ত আয়াতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ 'আল্লাহ্ ফেরেশতা ও মানুষ-উভয় শ্রেণী হইতে রাসূল মনোনীত করিয়া থাকেন।'

জিবরাঈল ও মিকাঈল উভয়েই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ملئكة (ফেরেশতাগণ) ও رسل (রাসূলগণ) এই উভয় শব্দের প্রত্যেকটির অন্তর্ভুক্ত। তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে জিবরাঈল ও মিকাঈল উভয়কে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। জিবরাঈলকে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, হযরত জিবরাঈলের প্রতি ইয়াহূদীদের শত্রুতার নিন্দা ও পরিণতি বর্ণনা করিবার জন্যেই আলোচ্য আয়াতদ্বয় নাযিল হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার নাম স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উল্লেখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মিকাঈলকে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদিগকে জানাইয়া দিতেছেন যে, তাহারা 'মিকাঈল

তাহাদের বন্ধু' এইরূপ দাবী করিলেও প্রকৃতপক্ষে জিবরাঈলের ন্যায় মিকাঈলের সঙ্গেও তাহাদের শত্রুতা রহিয়াছে। কারণ, যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সহিত শত্রুতা রাখে, সে মিকাঈলের সহিত বন্ধুত্ব রাখিতে পারে না। উল্লেখ্য, কতগুলি বিষয়কে সমষ্টিগতভাবে উল্লেখ করিবার পর বিশেষ উদ্দেশ্যে উহাদেরই মধ্য হইতে কোন বিষয়কে সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমে পূর্বোক্ত শব্দ সমষ্টির সহিত সংযোজিত করিয়া উল্লেখ করিবার কার্যটি আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে عطف الخاص على العام নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আলোচ্য আয়াতে হযরত জিবরাঈলের নামের সহিত হযরত মিকাঈলের নাম উল্লেখিত হইবার পশ্চাতে আরেকটি কারণ রহিয়াছে। উহা এই যে, হযরত মিকাঈলও মাঝে মাঝে নবীগণের নিকট ওহী লইয়া আসিতেন। যেমন, তিনি নবী করীম (সা)-এর নবূওতের প্রথম দিকে তাঁহার নিকট আসিতেন। অবশ্য হযরত জিবরাঈলই অধিকাংশ সময়ে নবীগণের নিকট ওহী লইয়া আসিতেন। হযরত মিকাঈলের প্রধান কার্য হইতেছে বৃষ্টি বর্ষণ করা ও ফসলাদি উৎপন্ন করা। একজনের দায়িত্ব মানবজাতির হিদায়েতের সহিত সম্পর্কিত এবং অন্যজনের দায়িত্ব সৃষ্টির রিয্‌কের সহিত সম্পর্কিত। তেমনি, হযরত ইসরাফীল (আ) কিয়ামতে শিঙ্গায় ফুঁৎকার দিবার দায়িত্বে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) তাহাজ্জুদের নামায আদায় করিবার কালে (উপরোক্ত তিন ফেরেশতার নাম উল্লেখ করিয়া) বলিতেন–'হে আল্লাহ্! জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তুমি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় বিষয়ে অবগত। তোমার বান্দাগণ যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছে, সে বিষয়ে তুমিই তাহাদের মধ্যে ফয়সালা প্রদান করিবে। যে সত্যের বিষয়ে মতভেদ করা হয়, তুমি স্বীয় আদেশে আমাকে সেই সত্য দেখাও। তুমি যাহাকে সত্যপথ দেখাইতে চাও, নিশ্চয় তাহাকে উহা দেখাইতে পার।'

শব্দার্থঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম ইব্‌ন জারীর ইকরামা হইতে এবং অন্যান্য রাবী ইকরামা ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ جبر ، ميك ও اسراف এই সকল শব্দের প্রত্যেকটির অর্থ হইতেছে বান্দা, দাস, গোলাম এবং ايل অর্থ আল্লাহ্।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাঁহার গোলাম উমায়র, ইসমাঈল ইব্‌ন আবী রজা, আ'মাশ, সুফিয়ান, আব্দুর রহমান ইব্‌ন মাহদী, আহমদ ইব্‌ন সিনান ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ جبرائيل শব্দটি অর্থের দিক দিয়া عبد الله ও عبد الرحمن -এর অনুরূপ।' বর্ণনাকারী বলেন جبر অর্থ বান্দা ও ايل অর্থ আল্লাহ্।'

আলী ইব্‌ন হুসাইন হইতে ধারাবাহিকভাবে যুহরী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'যুহরী বলেন–একদা আলী ইব্‌ন হুসাইন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান, جبرائيل নামটি তোমাদের ভাষার কোন্ নামের সমার্থক শব্দ? আমরা বলিলাম–না, আমাদের উহা জানা নাই। তিনি বলিলেন–উহার সমার্থক শব্দ হইতেছে عبد الله (আল্লাহ্‌র বান্দা)। যে নামের শেষে ايل শব্দটি রহিয়াছে, উহার অর্থ হইতেছে আল্লাহ্‌র বান্দা।'

Contents

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, 'ইকরামা, মুজাহিদ, যিহাক এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াসার হইতেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।' আব্দুল আযীয ইব্ন উমায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারী, আবূ হাতিম ও ইমাম ইবন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ جبرائيل শব্দের অর্থ হইতেছে خادم الله (আল্লাহ্‌র সেবক)।' রাবী বলেন–'উক্ত রিওয়ায়েতটি আমি আবূ সুলাইমান দারানীর নিকট বর্ণনা করিলে তিনি আনন্দিত হইয়া বলিলেন, আমার নিকট এই রিওয়ায়েতটি আমার সম্মুখে উপস্থিত এই বৃহৎ পাণ্ডুলিপিটির অন্তর্গত যে কোন রিওয়ায়েত অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়।'

جبرائيل ও ميكال শব্দদ্বয় বিভিন্নরূপে লিখিত ও উচ্চারিত হইয়া থাকে। অভিধান পুস্তক ও কিরাআত সম্পর্কিত পুস্তকে এতদ্‌সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এইরূপ বিষয়সমূহের যতটুকু সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যার সহিত সম্পর্কিত, শুধু ততটুকু এই কিতাবে আমি আলোচনা করিয়া থাকি। কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি এড়াইবার উদ্দেশ্যে বিস্তারিত আলোচনা এড়াইয়া চলিয়া থাকি। আল্লাহই ভরসাস্থল। তাঁহারই নিকট সাহায্য চাই।

فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَفِرِينَ আয়াতাংশকে আল্লাহ তা'আলা فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَفِرِينَ এইরূপে না বলিয়া فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَفِرِينَ এইরূপে বলিয়াছেন। এই স্থলে সর্বনাম পদ ব্যবহার না করিয়া বিশেষ্যপদ ব্যবহার করিয়াছেন। 'যাহারা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দার সহিত শত্রুতা রাখে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের শত্রু এবং আল্লাহ্ যাহার শত্রু, তাহার পরিণাম ভয়াবহ, এই বিষয়টি কাফিরদের নিকট অধিকতর সুস্পষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই এই স্থলে আল্লাহ তা'আলা সর্বনাম পদ ব্যবহার না করিয়া বিশেষ্য পদ ব্যবহার করিয়াছেন। বিশেষ্য পদের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহার না করিয়া বিশেষ্য পদকেই পুনরুল্লেখ করিবার রীতি সাহিত্যে বহুল প্রচলিত।

কবি বলেন ঃ

لا ارى الموت سبق الموت شيئ

سبق الموت ذا الغنى والفقير

'আমি মৃত্যুর সহিত দৌড় প্রতিযোগিতায় কাহাকেও জয়ী হইতে দেখি না। মৃত্যু ধনী-নির্ধন সকলের নিকটই দ্রুত পৌঁছিয়া যায়।'

এই স্থলে কবি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার الموت শব্দের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহার না করিয়া الموت শব্দটিকেই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। আরেক কবি বলেন ঃ

ليت الغراب غداة ينعب دائبا

كان الغراب مقطع الا وداج

'আহা! কাক যদি ভোর বেলায় অবিরতভাবে কা-কা রব করিতে থাকিত, তবে কাক (বিরক্তিকর কা-কা শব্দে) শ্রোতার গর্দানের রগসমূহ কাটিয়া দিত।

এই স্থলে কবি দ্বিতীয়বার الغراب শব্দের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহার না করিয়া الغراب শব্দটিকেই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন।

যাহা হইক, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দার সহিত শত্রুতা রাখে, তাহার সর্বনাশ অনিবার্য। ইতিপূর্বে উল্লেখিত একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয় বান্দার বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়, আমি তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।' অন্য এ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–সিংহ যেইরূপ যুদ্ধে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া থাকে, আমি সেইরূপ আমার প্রিয় বান্দাদের পক্ষে থাকিয়া প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া থাকি।' আরেক সহীহ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–আমি যাহার বিরুদ্ধে থাকি, তাহার উপর বিজয়ী হইয়াই থাকি।'

(৯৯) وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ○

(১০০) اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

(১০১) وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(১০২) وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَؕ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِؕ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍۜ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

(১০৩) وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

৯৯. আর আমি নিঃসন্দেহে তোমাকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছি। পাপীরা ব্যতীত কেহই উহা অস্বীকার করিবে না।

১০০. তাহারা যখন কোন ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তাহাদের একদল উহা প্রত্যাখ্যান করে; বরং তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

১০১. আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যখন তাহাদের কাছে তাহাদের কিতাবেরও সমর্থক রাসূল আসিল, তখন সেই কিতাবধারীদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাব এমনভাবে পিছনে সরাইয়া দিল যেন তাহারা কিছু জানেই না।

১০২. আর সুলায়মানের রাজত্বে তাহারা শয়তানের পঠিত বস্তু অনুসরণ করিল। সুলায়মান কুফরী করে নাই, শয়তানরাই কুফরী করিয়াছিল। তাহার মানুষকে যাদু আর ব্যাবিলনে হারূত ও মারূতের কাছে অবতীর্ণ বস্তু শিখাইত। তাহারা উহা শিখাইবার আগে প্রত্যেককে বলিত, 'আমরা কিন্তু পরীক্ষাস্বরূপ আসিয়াছি, তাই তোমরা কুফরী করিও না।' তারপর তাহারা তাহাদের নিকট স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ সৃষ্টির বিদ্যা শিখিত। আর তাহারা আল্লাহ্‌র মর্জী ছাড়া উহা দ্বারা কাহারও ক্ষতি করিতে পারিত না। আর তাহারা তাহাই শিখিতেছিল যাহা তাহাদের ক্ষতি ছাড়া কল্যাণ করিতেছিল না। তাহারা অবশ্যই জানিত যাহা তাহারা ক্রয় করিল তাহা তাহাদেরকে পরকালে কোনই হিস্সা দেবে না। যদি তাহারা জানিত তাহা হইলে বুঝিত নিজেদের বিনিময়ে তাহারা যাহা ক্রয় করিল তাহা কতই জঘন্য।

১০৩. পক্ষান্তরে যদি তাহারা ঈমান আনিত ও মুত্তাকী হইত, অবশ্যই আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার পাইত, যদি তাহারা জানিত।

তাফসীর ঃ ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর বলেন- وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ। আমি তোমাদের প্রতি এইরূপ সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছি যাহা তোমার নবূওতের সত্যতাকে সমর্থন করে। উক্ত সুস্পষ্ট আয়াতসমূহে ইয়াহূদীদের গোপন কথা, তাওরাতের তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য, যাহার অন্তরে ন্যায়পরায়ণতার গুণ রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি উক্ত আয়াতসমূহের আলোকে মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক আনীত সত্যকে সহজেই গ্রহণ করিবে। কারণ, মানবীয় কোন শিক্ষকের নিকট হইতে আসমানী কিতাব সম্পর্কিত কোনরূপ শিক্ষালাভ ছাড়াই মুহাম্মদ (সা) উক্ত আয়াতসমূহ ও উহাতে বর্ণিত তথ্যাবলী মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রেরিত নবী।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছি। তুমি উহা তিলাওয়াত করিয়া তাহাদিগকে শুনাইয়া থাক। উহাতে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাবে উল্লেখিত তথ্যাবলী সঠিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ওহীর সাহায্য ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন উম্মী ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ তথ্যাবলী সঠিকরূপে বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। তুমি উম্মী হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু উহা সঠিকরূপে বর্ণনা করিয়া থাক, অতএব ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, তুমি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরিত নবী। তাহাদের অন্তরে বিবেক থাকিলে এইরূপ আয়াতসমূহ তাহাদের চক্ষুঃ খুলিয়া দিতে পারে।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মাহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা ইব্‌ন সাওরিয়া

কুত্বীনী (ابن صوريا قطوينى) নামক জনৈক কাফির ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে বলিল-'হে মুহাম্মদ! তুমি এমন কোন বিষয় লইয়া আস নাই যাহা আমাদের নিকট পরিচিত। আর আল্লাহ্ কোন স্পষ্ট আয়াতও তোমার প্রতি নাযিল করেন নাই। এইরূপ হইলে হয়ত আমরা তোমাকে মানিতে পারিতাম।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ الى اخر الاية

অনুরূপভাবে একদা নবী করীম (সা) তাঁহার সম্বন্ধে কিতাবধারী জাতিসমূহের নিকট হইতে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক গৃহীত প্রতিশ্রুতির কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলে, তাহাদের মধ্য হইতে মালিক ইব্ন সয়ফ নামক জনৈক ব্যক্তি বলিল-'আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ সম্বন্ধে আমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন নাই।' ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

اَوَ كُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَه فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ - بَل اَكْثَرُهُمْ لاَيُؤْمِنُوْنَ -

হাসান বসরী بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَيُؤْمِنُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন-'পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। তাহারা আজ প্রতিশ্রুতি দিয়া কালই উহা ভঙ্গ করিয়া থাকে।' সুদ্দী উহার ব্যাখ্যায় বলেন-'অধিকাংশ লোক মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক আনীত মহা সত্যকে গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইয়াছে।'

কাতাদাহ বলেন ঃ نبذه فريق منهم অর্থাৎ তাহাদের একদল উহাকে (প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে) ভঙ্গ করিয়াছে।' ইমাম ইব্ন জারীর বলেন-نبذ অর্থ নিক্ষেপ করা; ফেলিয়া দেওয়া। منبذ অর্থ নিক্ষিপ্ত নবজাতক। النبيذ। পানীয় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত পানিতে নিক্ষিপ্ত শুষ্ক খেজুর বা শুষ্ক আঙ্গুর। আবুল আসওয়াদ দুয়েলী বলেন ঃ

نظرت الى عنوانه فبذته

كنبذك نعلا اخلقت من نعالك

'আমি উহার ভূমিকার উপর চোখ বুলাইয়া উহাকে ছুঁড়িয়া মারিলাম যেইরূপে তুমি তোমার পুরাতন জীর্ণ জুতাকে ছুঁড়িয়া মারিয়া থাক।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, আলোচ্য আয়াত কয়টিতে আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবধারী জাতিসমূহকে তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে নিন্দা করিতেছেন। তাহাদের নিকট অবতীর্ণ পূর্ববর্তী তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর আগমন সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁহার গুণাবলী ও পরিচয় বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত কিতাবসমূহে নবী করীম (সা)-এর উপর ঈমান আনিবার পক্ষে তাহাদের প্রতি নির্দেশ রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও তাহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনে নাই। এই স্থলে তাহাদের এই সত্য বিদ্বেষের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে নিন্দা করিতেছেন। কুরআন মজীদের অন্যত্র বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে নবী করীম (সা)-এর পরিচয় এবং গুণাবলী বর্ণিত থাকিবার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِى يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ ـ

"যাহারা উম্মী নবী ও রাসূলকে অনুসরণ করিয়া চলে, যে নবীর পরিচয় ও গুণাবলী তাহারা নিজেদের নিকট তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত দেখিয়া থাকে।"

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ الى اخر الاية অর্থাৎ কিতাবধারী জাতিসমূহের নিকট যে তাওরাত ও ইঞ্জীল বিদ্যমান রহিয়াছে, উহাদের সত্যতার সমর্থক হইয়া মুহাম্মদ (সা) যখন তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছে, তখন তাহারা তাওরাত ও ইঞ্জীল তথা উহাতে লিপিবদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণীকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। তাওরাত ও ইঞ্জীলে মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচয় ও গুণাবলীসহ তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবার জন্যে নির্দেশ রহিয়াছে। অতএব, মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি তাহাদের ঈমান না আনা তাওরাত ও ইঞ্জীলকে পরিত্যাগ করিবারই শামিল। তাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে প্রত্যাখ্যান করিবার মাধ্যমে তাওরাত ও ইঞ্জীলকে এইরূপে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, যেন তাহারা উহাতে কি লিখিত রহিয়াছে, তাহা জানে না। তাহারা নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান তো আনেই নাই; বরং যাদু শিখিয়া এবং উহাকে তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করিয়া তাঁহার ক্ষতিসাধনে লিপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার بئر اروان (আরওয়ান কূপ) নামক একটি কূপের পাথরের নীচে চিরুণী, বস্ত্র পরিষ্কারক ব্রাসের পরিত্যক্ত অংশ পুরুষ খেজুর গাছের কাঁধির খোলসে রাখিয়া দিয়া নবী করীম (সা)-এর প্রতি যাদু প্রয়োগ করিয়াছে। উক্ত কার্যে তাহাদিগকে নেতৃত্ব দিয়াছিল লাবীদ ইব্‌ন আ'সম নামক জনৈক পাপিষ্ঠ। তাহার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হউক। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে এতদসম্বন্ধে অবহিত করত তাঁহাকে উহা হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনা বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বিশদভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। এই কিতাবে উহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী বলেন– নবী করীম (সা)-এর আগমনের পর ইয়াহূদীগণ তাওরাতের আলোকে নবী করীম (সা) এবং কুরআন মজীদকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইল, নবী করীম (সা) তাওরাতে বর্ণিত পরিচয় ও গুণাবলীর অধিকারী এবং তাওরাত ও কুরআন মজীদ একে অপরের সমর্থক। এতদসত্ত্বেও তাহারা নবী করীম (সা) এবং কুরআন মজীদের প্রতি ঈমান আনিল না। এইরূপেই তাহারা তাওরাতের শিক্ষাকে দূরে নিক্ষেপ করিল যেন তাহারা তাওরাতে কি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা আদৌ জানে না। তাহারা তাওরাতের পরিবর্তে 'আসিফের পুস্তক' নামে পরিচিত যাদু গ্রন্থ এবং হারূত ও মারূতের যাদুকে গ্রহণ করিল। (আসিফ হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রধানমন্ত্রীর নাম)। كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ্ বলেন– 'ইয়াহূদীগণ জানিত যে, তাওরাতে যাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তদনুযায়ী মুহাম্মদ (সা) প্রকৃত নবী। এতদসত্ত্বেও তাহারা নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিল না। এইরূপেই তাহারা তাওরাত তথা উহার শিক্ষা ও নির্দেশকে ভূলুণ্ঠিত করিল।

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ الى اخر الاية হযর ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত সুলায়মান (আ) সিংহাসনচ্যুত হইবার পর একদল জ্বিন ও মানুষ ইসলাম ত্যাগ করত কুপ্রবৃত্তির বশংবদ ভৃত্য হইয়া পড়িল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবার পর লোকেরা যখন ইসলামের আওতায় প্রত্যাবর্তন করিল, তখন তিনি তাহাদের (যাদুর) পুস্তকসমূহ আবিষ্কার ও উদ্ধার করত স্বীয় সিংহাসনের নীচে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দুরাচারী মানুষ ও জ্বিনগণ উক্ত পুস্তকসমূহ উদ্ধার করত লোকদের নিকট এইরূপ প্রচারণা চালাইতে লাগিল যে, এই কিতাবকে আল্লাহ্ হযরত সুলায়মানের উপর নাযিল করিয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি উহাকে আমাদের নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছিলেন। ইহাতে লোকেরা উহাকে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক অবতীর্ণ কিতাব হিসাবে গ্রহণ করত উহাকেই নিজেদের দীন বানাইয়া লইল। উক্ত পুস্তকে আল্লাহ্র স্মরণ হইতে মানুষের মনকে ফিরাইয়া রাখিবার ব্যবস্থাসমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। তাহাদের উপরোক্তরূপ আচরণের বর্ণনায় আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الى اخر الاية

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মিনহাল, আ'মাশ, আবূ উসামাহ, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আসিফ (اصف) ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রধান সচিব। তিনি ইসমে আ'জম জানিতেন। তিনি হযরত সুলায়মান (আ)-এর নির্দেশে প্রতিটি বিষয় লিখিয়া তাঁহার সিংহাসনের নীচে প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। হযরত সুলায়মান (আ)-এর ইন্তিকালের পর শয়তানরা উহা বাহির করত উহার দুই ছত্রের ফাঁকে যাদু ও কুফরী কালাম লিখিয়া লোকদিগকে বলিতে লাগিল– এই সকল বিষয়ের উপর হযরত সুলায়মান (আ) আমল করিতেন। ইহাতে জাহিল লোকেরা হযরত সুলায়মান (আ)-কে কাফির বলিতে এবং গালি দিতে লাগিল আর আলিমগণ তাঁহার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলা হইতে বিরত রহিলেন। এই অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর প্রতি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ - الى قوله تعالى لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মিনহাল, আ'মাশ আবূ মুআবিয়াহ, আবূ সায়েব সালিমাহ ইব্ন জুনাদাহ সাওয়াঈ ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত সুলায়মান (আ) মলত্যাগ করিতে যাইবার এবং কোন স্ত্রীর নিকট গমন করিবার পূর্বে স্বীয় আংটিটি জারাদাহ جرادة নাম্নী জনৈকা মহিলার নিকট রাখিয়া যাইতেন। এক সময় তাঁহার সম্মুখে আল্লাহ্ তা'আলার পরীক্ষা উপস্থিত হইল। একদা স্বীয় আংটিটি জারাদাহর নিকট রাখিয়া যাইবার পর শয়তান তাঁহার রূপ ধরিয়া আসিয়া জারাদাহর নিকট হইতে আংটিটি লইয়া গেল। সে উহা পরিধান করিবার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান, জ্বিন ও মানুষ তাহার প্রতি অনুগত হইয়া গেল। এদিকে হযরত সুলায়মান (আ) আসিয়া জারাদাহর নিকট স্বীয় আংটিটি চাহিলে সে বলিল–'তুমি মিথ্যা বলিতেছ, তুমি সুলায়মান নহ।' তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার সম্মুখে আল্লাহ্র তরফ হইতে এক পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে

শয়তানরা যাদু ও কুফর সম্বলিত কতগুলি পুস্তক রচনা করত সেইগুলি হযরত সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসনের নীচে প্রোথিত করিয়া রাখিল। এক সময়ে তাহারা উক্ত পুস্তকগুলি বাহির করিয়া জনগণের সম্মুখে পাঠ করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল– এই সকল কিতাবের সাহায্যেই সুলায়মান লোকদের উপর বিজয়ী হইয়াছে এবং শাসন চালাইয়াছে। জনগণ তাহাদের কথা বিশ্বাস করিল এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কাফির বলিতে লাগিল। তাহাদের উক্ত ধারণার অপনোদনে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ - الى قوله تعالى لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

ইমরান (তাঁহার আরেক নাম হারিছ) হইতে ধারাবাহিকভাবে, সিরীন ইব্ন আব্দুর রহমান, জারীর ইব্ন হামীদ ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইমরান বলেন, একদা আমরা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এই সময়ে একটি লোক তাঁহার নিকট আগমন করিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? লোকটি বলিল, আমি ইরাক হইতে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, ইরাকের কোন্ অঞ্চল হইতে? সে বলিল– কূফা শহর হইতে। তিনি বলিলেন– কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন? সে বলিল– কূফার লোক বলিতেছে, হযরত আলী (রা) মরেন নাই; তিনি অদূর ভবিষ্যতে আবির্ভূত হইবেন। ইহাতে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আতংকিত হইয়া বলিলেন– কি বলিতেছে? হযরত আলী (রা) না মরিলে আমরা না তাঁহার স্ত্রীদিগকে অন্যত্র বিবাহ দিতাম আর না তাহার সম্পত্তি তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতাম। শুনুন! এই বিষয়ে আপনাকে একটি তথ্য প্রদান করিতেছি। হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগে শয়তানগণ (দুরাচারী জ্বিনেরা) আকাশে গোপনে কান পাতিয়া কখনও কখনও দুই একটি সত্য তথ্য সংগ্রহ করিত। অতপর তাহারা একটি সত্যের সহিত সত্তরটি মিথ্যা যুক্ত করিয়া লোকদের নিকট প্রচার করিত। লোকেরা সেইগুলি বিশ্বাস করিয়া অন্তরের অন্তস্থলে স্থান দিত। এক সময় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ)-কে এই সকল মিথ্যা কথা সম্বন্ধে অবহিত করিলেন। তিনি সেইগুলি স্বীয় সিংহাসনের নীচে পুঁতিয়া রাখিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শয়তান রাস্তায় দাঁড়াইয়া লোকদিগকে বলিল– হে লোকসকল! তোমরা শুন। সুলায়মানের অতুলনীয় সম্পদ তাহার সিংহাসনের নিম্নে সংরক্ষিত রহিয়াছে। তাহার কথায় লোকেরা সেইস্থান হইতে সেইগুলি বাহির করিলে শয়তান বলিল– ইহা হইতেছে যাদু। অতঃপর লোকেরা পুরুষাণুক্রমে সেইগুলি সংরক্ষণ ও বর্ণনা করিয়া আসিতেছে। উহারই একাংশকে ইরাকের লোকেরা বর্ণনা করিয়া বেড়ায়। উপরোক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ - الى قوله تعالى لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

হাকিম তাঁহার মুসতাদরাক সংকলনে উক্ত রিওয়ায়েত উপরোক্ত রাবী জারীর হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং জারীর হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুস সালাম ও আবূ যাকারিয়া আম্বারীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

সুদ্দী বলেন ঃ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ অর্থাৎ সুলায়মানের যুগে। তিনি বলেন– হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগে শয়তানরা (দুরাচারী জ্বিনেরা) আকাশে ফেরেশতাদের পারস্পরিক কথোপকথনে গোপনে কান লাগাইয়া মৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কিত দুই একটি সত্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া উহা গণৎকারদের নিকট পৌঁছাইয়া দিত। তাহারা লোকদের নিকট উহা প্রচার করিয়া যখন দেখিতে পাইত যে, উহা বাস্তব ঘটনা দ্বারা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং লোকেরা তাহাদের প্রতি আস্থাবান হইয়া পড়িয়াছে, তখন উহার সহিত সত্তরটি মিথ্যা কথা জুড়িয়া দিয়া তাহাদের নিকট প্রচার করিত। লোকেরা সেই সকল মিথ্যা কথা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করত জনগণের মধ্যে প্রচার করিত। এইরূপে বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের মধ্যে এই ধারণা বিস্তার লাভ করিল যে, 'জ্বিনেরা গায়েবী খবর বলিতে পারে। তাহারা গায়েব জানে।' ইহাতে হযরত সুলায়মান (আ) উক্ত কিতাবসমূহ সংগ্রহ করিয়া সিন্দুকে পুরিয়া স্বীয় সিংহাসনের নীচে পুতিয়া রাখিলেন। কোন শয়তান তাঁহার সিংহাসনের নিকটবর্তী হইলেই পুড়িয়া মরিয়া যাইত। তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা করিলেন– যদি কাহাকেও বলিতে শুনি যে, শয়তানরা (অর্থাৎ দুরাচারী জ্বিনেরা) গায়েব জানে, তবে তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব।' তাঁহার মৃত্যুর পর এবং প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল তাহার সমসাময়িক আলিমগণের মৃত্যুর পর একদা শয়তান মানুষের রূপ ধরিয়া বনী ইসরাঈল জাতির একদল লোকের নিকট আসিয়া বলিল– আমি কি তোমাদিগকে এইরূপ একটি সম্পদ ভাণ্ডারের সন্ধান দিব যাহা খাইয়া তোমরা শেষ করিতে পারিবে না? তাহারা বলিল– বেশ। সেতো ভালো কথা। আপনি আমাদিগকে এইরূপ সম্পদ ভাণ্ডারের সন্ধান দিন। সে বলিল– তোমরা সুলায়মানের সিংহাসনের নীচের মাটি খনন কর। এই বলিয়া সে তাহাদিগকে নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া গেল এবং তাহাদিগকে উহা দেখাইয়া দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা বলিল– আপনি কাছে আসুন। সে বলিল– না, আমি কাছে আসিব না। তবে, এখানে তোমাদের নাগালের মধ্যেই রহিলাম। আমার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হইলে তোমরা আমাকে হত্যা করিও। তাহারা খনন করিয়া উহা উপরে তুলিলে শয়তান বলিল– সুলায়মান এই যাদুর সাহায্যেই মানুষ, জ্বিন এবং পক্ষীকুলের উপর আধিপত্য চালাইত। এই বলিয়া সে উড়িয়া গেল। লোকদের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল যে– 'সুলায়মান একজন যাদুকর ছিলেন।' আর বনী ইসলাঈল জাতির লোকেরা উক্ত কিতাবসমূহকে প্রিয় সম্পদ হিসাবে ধরিয়া রাখিল। নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবের পর তাহারা এই সকল কিতাবের সাহায্যে নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে তর্কে লিপ্ত হইল। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ - الى قوله تعالى لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

রবী' ইব্‌ন আনাস বলেন– এক সময় কিছুদিন ধরিয়া এইরূপ ঘটিতে দেখা গেল যে, ইয়াহুদীগণ তাওরাত কিতাব সম্বন্ধে নবী করীম (সা)-এর নিকট যে প্রশ্নই করিত, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁহাকে উহার উত্তর জানাইয়া দিতেন। এইরূপে নবী করীম (সা) বিতর্কে তাহাদের উপর বিজয়ী হইতে লাগিলেন। ইহাতে তাহারা বলিল– এই ব্যক্তি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান রাখে। এক পর্যায়ে তাহারা যাদু সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল।

ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ - الى قوله تعالى لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

রবী' ইব্ন আনাস বলেন– 'হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগে দুরাচারী জ্বিনেরা যাদু, অদৃশ্য গণনা ইত্যাদি বিষয়ে একখানা পুস্তক রচনা করিয়া তাঁহার সিংহাসনের নীচে পুঁতিয়া রাখিল। বস্তুত তিনি কোনরূপ গায়েব জানিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারা উহা বাহির করিয়া লোকদের নিকট বলিতে লাগিল– এই বিদ্যাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান হওয়ায় সুলায়মান উহাদের বিষয়ে অবহিত লোকদের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তাই তাহাদের নিকট হইতে উহা গোপন রাখিয়া ছিলেন।' রবী' ইব্ন আনাস বলেন– নবী করীম (সা) তাহাদিগকে উপরোক্ত প্রকৃত তথ্যটি জানাইলেন। ইহাতে তাহারা নির্বাক হইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে ফিরিয়া গেল। এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের যুক্তি মিথ্যা ও বাতিল প্রমাণ করিলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন– হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগে শয়তানরা গোপনে আকাশে কান লাগাইয়া ওহী সংগ্রহ করিত। তাহারা একটি সত্যের সহিত দুইশত মিথ্যা মিলাইয়া লোকদের নিকট প্রচার করিত। এক সময়ে তিনি তাহাদের নিকট হইতে উক্ত মিথ্যা বাক্যাবলী লিখিত আকারে সংগ্রহ করিয়া (এক স্থানে) আবদ্ধ রাখিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শয়তানরা উহা উদ্ধার করত লোকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিল। বস্তুত উহা ছিল যাদু।'

সাঈদ ইব্ন জারীর বলেন– হযরত সুলায়মান (আ) অনুসন্ধান চালাইয়া শয়তানদের হাতে রক্ষিত যাদুসমূহ সংগ্রহ করত স্বীয় সিংহাসনের নিম্নে অবস্থিত সম্পদশালায় প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। শয়তানরা উহার নিকটবর্তী হইতে পারিত না। একদা তাহারা মানুষের নিকট আসিয়া বলিল– ওহে লোকসকল! যে বিদ্যার সাহায্যে সুলায়মান জ্বিন, বাতাস ইত্যাদিকে বশীভূত করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা আয়ত্ত করিতে চাও? তাহারা বলিল– হ্যাঁ! আমরা উহা আয়ত্ত করিতে চাই। শয়তানরা বলিল– উহা তাহার সিংহাসনের নিম্নে অবস্থিত সম্পদশালায় রক্ষিত রহিয়াছে।' ইহাতে লোকেরা উক্ত স্থান খনন করিয়া উহা বাহির করত প্রয়োগ করিতে লাগিল। হিজাযের লোকেরা বলিত, ইহা যাদু আর সুলায়মান ইহা প্রয়োগ করিতেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ)-এর নির্দোষীতার বর্ণনায় নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ - الى قوله تعالى لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার বলেন– শয়তানরা (দুরাচারী জ্বিনেরা) হযরত সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর কথা জানিতে পারিয়া নানারূপ যাদু সম্বলিত একখানা পুস্তক রচনা করিয়া উহার শেষে হযরত সুলায়মান (আ)-এর নামে নকল মোহর লাগাইল এবং পরিচিত স্থানে 'ইহা বাদশাহ সুলায়মান ইব্ন দাঊদ-এর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আসাফ ইব্ন বারখায়া কর্তৃক প্রণীত 'একটি জ্ঞান-ভাণ্ডার' এই কথাটি লিখিয়া দিয়া উহা তাঁহার সিংহাসনের নীচে পুঁতিয়া

রাখিল। উক্ত যাদু পুস্তকে লিখিত ছিল- কেহ অমুক উদ্দেশ্য লাভ করিতে চাহিলে সে যেন এই করে-....; কেহ অমুক উদ্দেশ্য লাভ করিতে চাইলে সে যেন এই করে... ইত্যাদি। অতঃপর এক সময়ে বনী ইসরাঈল জাতির লোকেরা উহা তুলিয়া উহার সহিত নূতন নূতন যাদু সংযোজিত করিয়া লোকদের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিল। এইরূপে ইয়াহূদীদের সমাজে যাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটিল এবং এই বিদ্যায় তাহারা অন্য সকল জাতিকে ছাড়াইয়া গেল। নবী করীম (সা) যখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে ওহী পাইয়া হযরত সুলায়মান (আ)-কে একজন নবী হিসাবে বর্ণনা করিলেন, তখন মদীনার ইয়াহূদীরা বলিতে লাগিল- ওহে! তোমরা শুনেছ? মুহাম্মদ বলিতেছে- সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ একজন নবী ছিলেন। কত বড় আশ্চর্যকর কথা! আল্লাহ্‌র কসম? সে একজন যাদুকর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাহাদের উক্ত কথায় আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ـ الى قوله تعالى لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ

শাহর ইব্‌ন হাওশাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বকর, হোসাইন ইব্‌ন হাজ্জাজ, কাসিম ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসনচ্যুত থাকিবার অবস্থায় তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে শয়তানরা (দূরাচারী জ্বিনেরা) একখানা যাদুর পুস্তক রচনা করিল। তাহারা উহাতে লিখিল, যে ব্যক্তি অমুক উদ্দেশ্য হাসিল করিতে চাহে, সে যেন সূর্যের দিকে মুখ করিয়া...; যে ব্যক্তি অমুক উদ্দেশ্য হাসিল করিতে চাহে, সে যেন সূর্যের দিকে পিঠ দিয়া এই কথাগুলি উচ্চারণ করে....ইত্যাদি।' তাহারা উক্ত পুস্তকের পরিচিতি স্থানে লিখিল- এই পুস্তকখানা সুলায়মান ইব্‌ন দাউদের নির্দেশে আসাফ ইব্‌ন বারাখয়া (اصف ابن برخيا) কর্তৃক লিখিত একটি জ্ঞান-ভাণ্ডার। তাহার উহা তাঁহার সিংহাসনের নিচে পুঁতিয়া রাখিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ইবলীস জনগণকে বলিল- ওহে লোক সকল! সুলায়মান কোন নবী ছিল না, সে ছিল একজন যাদুকর। তোমরা তাহার ঘরে রক্ষিত তাহার সম্পদরাজির মধ্যে তাহার যাদুকে সন্ধান কর। অতঃপর সে তাহাদিগকে উক্ত নির্দিষ্ট স্থানটি দেখাইয়া দিল। তাহারা তথা হইতে উহা বাহির করিয়া আনিয়া দেখিল- উহাতে যাদু লিখিত রহিয়াছে। ইহাতে তাহারা বলিল- আল্লাহ্‌র কসম! সুলায়মান একজন যাদুকর ছিল। এই হইতেছে তাহার যাদু। আমরা ইহাকেই শক্ত করিয়া ধরিব আর ইহাকেই আঁকড়াইয়া থাকিব। মু'মিনগণ বলিল- না। তিনি যাদুকর ছিলেন না, বরং নবী ছিলেন। অতঃপর নবী করীম আবির্ভূত হইয়া যখন হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ)-কে নবী হিসাবে উল্লেখ করিলেন, তখন ইয়াহূদীরা বলিতে লাগিল- দেখ, মুহাম্মদ কি বলে! সে সত্যের সহিত মিথ্যাকে মিলাইয়া দেয়। সে সুলায়মানকে নবী বলিয়া আখ্যায়িত করে। সুলায়মান তো কোন নবী ছিল না; সে ছিল একজন যাদুকর। যাদুর সাহায্যে হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইত। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ـ الى قوله تعالى لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ

আবূ মাজলায হইতে ধারাবাহিকভাবে ইমরান ইব্ন জারীর, মু'তামির ইব্ন সুলায়মান, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা ছানআনী ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত সুলায়মান (আ) প্রতিটি জন্তু হইতে (কাহাকেও যন্ত্রণা না দিবার পক্ষে) প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর কোন লোক কোন প্রাণী কর্তৃক আক্রান্ত হইলে সে আক্রমণকারী জন্তুটিকে উক্ত প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিত। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর লোকেরা ব্যাপক আকারে ছন্দোবদ্ধ কথা ও যাদুর প্রচলন ঘটাইল। তাহারা বলিতে লাগিল, সুলায়মান ইব্ন দাউদ এই সকল যাদু প্রয়োগ করিয়া কার্যসিদ্ধ করিতেন। তাহাদের মিথ্যা দাবীর অপনোদনে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছেন।

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন মুসআব-এর গোলাম যিয়াদ, মাসউদী, আদম, ইমাম ইব্ন রাওয়াদ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ শয়তানরা যাহা যাহা শুনাইত, উহার এক তৃতীয়াংশ ছিল ভবিষ্যৎ গণনা ও অদৃশ্য গণনা।' উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী হইতে ধারাবাহিকভাবে উব্বাদ ইব্ন মানসূর, সুরুর ইব্ন মুগীরাহ, ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগের পূর্বেও পৃথিবীতে যাদুর প্রচলন ছিল। তবে ইয়াহূদীরা যাদুকে হযরত সুলায়মান (আ)-এর সুশাসনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিল। আলোচ্য আয়াতাংশে তাঁহার সুশাসনের বিরুদ্ধে ইয়াহূদীদের যাদু প্রযোগ করিবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

উপরে পূর্বযুগীয় বিভিন্ন ইমাম কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য আয়াতাংশ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও ঘটনা উল্লেখিত হইল। উক্ত বর্ণনাসমূহের মধ্যে যে কোনরূপ পরস্পর বিরোধিতা নাই, তাহা সূক্ষ্মজ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। আল্লাহই হিদায়েতের মালিক।

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ অর্থাৎ ইয়াহূদীরা তাহাদের নিকট রক্ষিত তাওরাতের নির্দেশ অমান্য করিয়া মুহাম্মদ (সা)-কে প্রত্যাখ্যান পূর্বক সুলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে শয়তানগণ কর্তৃক প্রচারিত ও বর্ণিত বিষয়কে (অর্থাৎ যাদুকে) মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন করিবার ক্ষেত্রে অণুসরণ করিয়াছে।'

مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ -এর তাৎপর্য হইতেছে– শয়তানরা সুলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে তাহাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে যে যাদু লোকদিগকে পড়িয়া শুনাইত। এই স্থলে على শব্দটি 'বিরুদ্ধে' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেহেতু تتلوا শব্দের তাৎপর্য হইতেছে তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে লোকদিগকে যাদু বাক্য পড়িয়া শুনাইত। তাই على শব্দকে 'বিরুদ্ধে' অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া গ্রহণ করা অসঙ্গত নহে। ইমাম ইব্ন জারীর বলেন–

এই স্থলে على শব্দটি 'তে' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তদনুসারে مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ -এর তাৎপর্য হইতেছে শয়তানরা সুলায়মানের রাজত্বকালে লোকদিগকে যাহা পড়িয়া শুনাইত। ইব্ন জুরায়জ এবং ইব্ন ইসহাক হইতেও ইমাম ইব্ন জারীর এইস্থলে على শব্দটি 'তে' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমি (ইব্ন কাছীর)

বলিতেছি, এইস্থলে على শব্দকে 'বিরুদ্ধে' অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগের পূর্বে পৃথিবীতে যাদু প্রচলিত ছিল। হযরত হাসান বসরীর এই উক্তি নিশ্চিতরূপে সত্য ও সঠিক। কারণ, হযরত মূসা (আ)-এর যুগে যে লোকদের মধ্যে যাদু প্রচলিত ছিল, তাহা কুরআন মজীদে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত রহিয়াছে। আর সুলায়মান (আ) এবং তাঁহার পিতা দাঊদ (আ) ছিলেন হযরত মূসা (আ)-এর পরে আগত নবী। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى .... তুমি কি মূসার পর আগত বনী ইসরাঈল জাতির একদল লোকের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছ?.....।

উক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'একদল লোক'-এর ঘটনা উক্ত আয়াত ও উহার পরবর্তী আয়াতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ঘটনা বর্ণনার এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ 'আর দাঊদ জালূতকে হত্যা করিল, উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর পিতা হযরত দাঊদ (আ) হযরত মূসা (আ) (যাঁহার যুগে যাদু প্রচলিত ছিল)-এর পরে আগত নবী ছিলেন। অতএব প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগের পূর্বেও যাদু প্রচলিত ছিল।

এতদ্ব্যতীত আরও প্রমাণ রহিয়াছে। হযরত সুলায়মান (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈল গোত্রের লোক। আর বনী ইসরাঈল গোত্র হইতেছে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পৌত্র হযরত ইয়া'কূব (আ)-এর বংশধর। হযরত সালেহ (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বে আগত নবী। তাঁহার সম্বন্ধে তাহার কওম বা জাতি উক্তি করিয়াছিল ঃ

اِنَّمَا اَنْتَ الْمُسَحَّرِيْنَ তুমি একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নহ।

উক্ত আয়াতাংশ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগের পূর্বেও যাদু প্রচলিত ছিল।

وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ তাফসীরকারগণ উপরোক্ত আয়াতাংশের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

একদল তাফসীরকার বলেন– এইস্থলে انزل শব্দের পূর্বে অবস্থিত ما শব্দটি একটি 'না' বোধক অব্যয় পদ। উহার অর্থ 'না'। এমতাবস্থায় ما انزل এর অর্থ হইতেছে 'নাযিল করা হয় নাই।' ইমাম কুরতুবী বলেন– 'এইস্থলে ما শব্দটি 'না' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ما انزل ক্রিয়াটি সংযোজক অব্যয় দ্বারা পূর্ববর্তী ماكفر ক্রিয়ার সহিত সংযোজিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়ায় 'না সুলায়মান কুফরী করিয়াছে, আর না ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি যাদু নাযিল করা হইয়াছে; বরং শয়তানরা কুফরী করিয়াছে। তাহারা লোকদিগকে যাদু শিক্ষা দিত। ইয়াহুদীরা বলিত জিবরাঈল ও মিকাঈল এই দুই ফেরেশতা যাদুসহ লোকদের নিকট নাযিল হইয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের দাবীকে বাতিল ও মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন– ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি কোনরূপ যাদু নাযিল করা হয় নাই। এমতাবস্থায়

هاروت ও ماروت এই শব্দদ্বয় উহাদের পূর্বে অবস্থিত الشياطين। শব্দের بدل (বাক্যের অন্তর্গত কোন পদের পরিচয়ের উদ্দেশ্যে উহার পর উল্লেখিত পদ) হইয়াছে। এইস্থলে কেহ প্রশ্ন করিতে পারে ঃ الشياطين। শব্দটি হইতেছে একটি বহুবচন শব্দ; আর هاروت ও ماروت হইতেছে– দুইটি শয়তানের নাম। যেখানে দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে দ্বিবচন শব্দ প্রযুক্ত হওয়া বিধেয়, সেখানে কিরূপে বহুবচন শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে? উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, আরবী সাহিত্যেও কখনও কখনও দুই বস্তুকে বহুবচন ধরিয়া উহার প্রতি বহুবচন শব্দ প্রযুক্ত হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فان كان له اخوة (আর যদি তাহার (মৃত ব্যক্তির) দুই বা ততোধিক ভাই থাকে)। هاروت ও ماروت এর থেকে বহুবচন শব্দ প্রযুক্ত হইবার কারণ ইহাও হইতে পারে যে, هاروت ও ماروت ছাড়া অন্যান্য শয়তানও কুফরে লিপ্ত ছিল। কিন্তু যেহেতু তাহারা দুইজনে কুফরে অন্য সকলকে টেক্কা মারিয়াছিল, তাই এইস্থলে শুধু তাহাদের দুইজনের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। সকল শয়তান মিলিয়া যেহেতু দুইয়ের অধিক ছিল, তাই তাহাদের প্রতি বহুবচন শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক انزل। শব্দের পূর্বে অবস্থিত ما পদটিকে 'না' অর্থে ব্যবহৃত অব্যয় ধরিলে এবং هاروت ও وماروت কে الشياطين। শব্দের بدل ধরিলে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই ঃ সুলায়মান কুফরী করেন নাই; বরং হারূত ও মারূত এবং তাহাদের ন্যায় শয়তানগণ কুফরী করিয়াছে। তাহারা ব্যবিলন শহরে লোকদিগকে যাদু শিক্ষা দিত। আর জিবরাঈল ও মিকাঈল এই দুই ফেরেশতার প্রতিও যাদু নাযিল করা হয় নাই। আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোক্ত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্যই শুদ্ধ ও সঠিক। অন্য সকল ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য অগ্রহণীয় ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (আ) হইতে আওফীর মাধ্যমে ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ। অর্থাৎ ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে যাদু অবতীর্ণ হয় নাই। রবী' ইব্ন আনাস হইতে ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি যাদু অবতীর্ণ করেন নাই। ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ উহার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই ঃ 'শয়তানগণ সুলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে (মতান্তরে তাহার রাজত্বের কালে) লোকদিগকে যে যাদু-বাক্য শুনাইত, ইহারা তাহা অনুসরণ করিয়াছে। আর সুলায়মানও কুফরী করে নাই এবং আল্লাহ্ ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতিও যাদু নাযিল করেন নাই; কিন্তু হারূত ও মারূত প্রমুখ শয়তানগণ কুফরী করিয়াছে। তাহারা বাবিল (ব্যাবিলন) শহরে লোকদিগকে যাদু শিক্ষা দিত।'

ইয়াহুদীগণ দাবী করিত, আল্লাহ্ জিবরাঈল ও মিকাঈল এই দুই ফেরেশতার মাধ্যমে সুলায়মান ইব্ন দাউদ-এর প্রতি যাদু নাযিল করিয়াছিলেন। আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উক্ত দাবীকে মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। উপরোক্ত তাৎপর্য অনুযায়ী আয়াতে উল্লেখিত ফেরেশতাদ্বয় হইতেছেন হযরত জিবরাঈল (আ) ও হযরত মিকাঈল (আ) এবং হারূত ও মারূত হইতেছে যাদু শিক্ষাদাতা দুইজন দুরাচারী মানুষ।'

আতিয়্যা হইতে ধারাবাহিকভাবে ফুযায়ল ইব্ন মারযুক, উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুসা ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈল ও মিকাঈল ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি যাদু নাযিল করেন নাই।

হুসাইন ইব্ন আবূ জা'ফর হইতে ধারাবাহিকভাবে বিকর (ইব্ন মুসআব), ইয়া'লী (ইব্ন আসাদ) মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা, ফযল ইব্ন শাযান ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাবী হুসাইন ইব্ন আবূ জা'ফর বলেন- 'আব্দুর রহমান ইব্ন আবযী وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ। স্থলে وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ পড়িতেন।'

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ। এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবুল আলীয়া হইতে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তাহাদের দুইজনের (দাঊদ ও সুলায়মানের) প্রতি যাদু অবতীর্ণ করা হয় নাই; বরং তাহাদিগকে 'ঈমান ও কুফর' এই দুইটি বিষয়ের পরিচয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। বস্তুত কুফর হইতেছে যাদু। তাহারা মানুষকে কুফরের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সতর্ক করিয়া দিতেন।'

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন- 'আলোচ্য আয়াতাংশের অন্তর্গত انزل। শব্দের পূর্বে অবস্থিত ما শব্দটি اسم موصول। আয়াতে উল্লেখিত হারূত ও মারূত দুইজন ফেরেশতার নাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তিনি একদিকে যাদু শিখিতে ইচ্ছুক মানুষকে যাদু শিক্ষা দিবার জন্যে ফেরেশতাদ্বয়কে আদেশ দিয়াছিলেন এবং অন্যদিকে উহা শিক্ষা করিতে নবীগণের মাধ্যমে মানুষকে নিষেধ করিয়াছিলেন। বস্তুত উহা ছিল মানুষের জন্যে একটি পরীক্ষা। আর হারূত ও মারূত ছিলেন উক্ত পরীক্ষার নিছক মাধ্যম। তাঁহারা যাহা করিতেন, তাহা আল্লাহ্র নির্দেশেই করিতেন।' উহার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই ঃ

'শয়তানগণ যাহা (যে যাদুবাক্য) সুলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে (মতান্তরে তাহার রাজত্বের কালে) পাঠ করিয়া শুনাইত আর বাবিল শহরে হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি যাহা (যে যাদু বাক্য) নাযিল করা হইয়াছিল, তাহাই তাহারা (ইয়াহুদীগণ) অনুসরণ করিয়াছে।' ইমাম ইব্ন জারীর কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা যুক্তি হইতে দূরে অবস্থিত। ইব্ন হাযম প্রমুখ একদল ব্যাখ্যাকার বলেন, 'হারূত ও মারূত হইতেছে জ্বিন জাতির দুইটি গোত্রের নাম।' এই ব্যাখ্যাও যুক্তি হইতে অধিকতর দূরে অবস্থিত।

যিহাক ইব্ন মুযাহিম হইতে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ যিহাক وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ। আয়াতাংশের অন্তর্গত الملكين। শব্দের লাম বর্ণটিকে كسرة (যের) দিয়া পড়িতেন এবং তিনি বলিতেন, 'হারূত ও মারূত বাবিল শহরের দুইজন কাফির বাদশাহের নাম।' প্রশ্ন দেখা দেয়, হারূত ও মারূত কাফির হইলে তাহাদের প্রতি ওহী নাযিল হইয়াছিল কিরূপে? যিহাক ও তাহার অনুসারী ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, এইস্থলে انزل। ক্রিয়াটি 'ওহী নাযিল করা' অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, বরং উহা الخلق। (সৃষ্টি করা) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত শব্দ উপরোক্ত অর্থে অন্যত্রও ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ 'আর তিনি তোমাদের জন্য আট শ্রেণীর চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করিয়াছেন।' আরও বলিতেছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ 'আর আমি লোহাকে সৃষ্টি করিয়াছি। উহাতে অত্যধিক শক্তি রহিয়াছে।'

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا 'আর তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ হইতে রিয্ক অবতীর্ণ করেন।'

নবী করীম (সা) বলেন ঃ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلاَّ اَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً 'আল্লাহ্ প্রতিটি রোগের জন্যেই ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন।'

এতদ্ব্যতীত আরবী ভাষায় কথিত হইয়া থাকে ঃ

اَنْزَلَ اللّٰهُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ 'আল্লাহ্ মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন।'

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই ঃ 'আর শয়তানরা সুলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে যে যাদু পাঠ করিয়া শুনাইত এবং বাবিল শহরে হারূত ও মারূত নামক কাফির বাদশাহদ্বয়ের অন্তরে যে যাদু সৃষ্টি করা হইয়াছিল, উহাই ইয়াহুদীরা অনুসরণ করিয়াছে।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), ইব্ন আবযী এবং হাসান বসরী হইতে ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'তাহারা وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ -এর অন্তর্গত الملكين -এর লাম বর্ণকে كسرة (যের) দিয়া পড়িতেন।' ইব্ন আবযী বলেন, উক্ত বাদশাহদ্বয় হইতেছেন– হযরত দাউদ (আ) এবং হযরত সুলায়মান (আ)। ইমাম কুরতুবী বলেন, এই পরিপ্রেক্ষিতে انزل শব্দের পূর্বে অবস্থিত ما পদটিকে 'না' অর্থে ব্যবহৃত অব্যয় পদ হিসাবে ধরিতে হইবে।' এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই ঃ আর হারূত ও মারূতসহ শয়তানরা বাবিল শহরে যে যাদু পাঠ করিয়া শুনাইত, উহাকে ইয়াহুদীগণ অনুসরণ করিয়াছে। আর দাউদ ও সুলায়মান এই বাদশাহদ্বয়ের প্রতি কোন যাদু নাযিল করা হয় নাই।' ইমাম কুরতুবী আরও বলেন, একদল তাফসীরকার বলেন, يعلمون الناس السحر -এর অন্তর্গত السحر শব্দের পর ওয়াকফ বা বিরতি হইবে। উহার পর وما انزل হইতে পৃথক কথা আরম্ভ হইয়াছে। এমতাবস্থায় انزل শব্দের পূর্বে অবস্থিত ما শব্দটিকে 'না' অর্থে ব্যবহৃত অব্যয় পদ বলিয়া ধরিতে হইবে।

ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ হইতে ধারাবাহিকভাবে লায়ছ, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা কাসিম ইব্ন মুহাম্মদের নিকট জনৈক ব্যক্তি وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ - وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلاَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল– তাহারা দুইজনে আল্লাহ্র তরফ হইতে অবতীর্ণ বিষয় এবং আল্লাহ্র তরফ হইতে অবতীর্ণ নহে এইরূপ বিষয়– এই দুইটির কোন্টি মানুষকে শিক্ষা দিত? তিনি বলিলেন– উহাদের যেইটিই হউক, আমার তাহাতে কিছু আসে যায় না। (অর্থাৎ আমি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র বাণীর প্রতি ঈমান রাখি।)

আনাস ইব্ন ইয়ায-এর জনৈক সহচর হইতে ধারাবাহিকভাবে আনাস ইব্ন ইয়ায, ইউনুস ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা কাসিম (ইব্ন মুহাম্মদ)-এর নিকট পূর্বোক্ত বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, যাহাই ঘটিয়া থাকুক না কেন, আমি উহার প্রতি বিশ্বাস রাখি।'

পূর্বযুগীয় অনেক ব্যাখ্যাকার বলেন, হারূত ও মারূত আকাশ হইতে অবতীর্ণ দুইজন ফেরেশতা ছিলেন। তাহারা যাহা ঘটাইয়া ছিলেন তাহা তো ঘটাইয়া ছিলেনই। পরন্তু তাহারা ফেরেশতা ছিলেন ইহার সমর্থনে স্বয়ং নবী করীম (সা) হইতে একটি হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদ সংকলনে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই আমি (ইব্ন কাছীর) উহা উল্লেখ করিব। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কুরআন মজীদের একাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র নিষ্পাপ বান্দা; তাঁহারা পাপ করেন না, করিতে পারেন না। এমতাবস্থায় হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয় কিরূপে পাপ করিলেন? উহার উত্তর এই যে, ফেরেশতাগণ পাপ করেন না, করিতে পারেন না, ইহা সাধারণ নিয়ম। নির্দিষ্ট কয়েকজন ফেরেশতা উক্ত নিয়মের আওতা হইতে বাহিরে অবস্থিত। হারূত ও মারূত হইতেছেন উক্ত নিয়মের আওতা হইতে বাহিরে অবস্থিত ফেরেশতা। যেইরূপে ইবলীসও উক্ত নিয়মের আওতা হইতে বাহিরে অবস্থিত। ইবলীস যে একজন ফেরেশতা ছিল, একাধিক আয়াত দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ আর (সেই সময়টা স্মরণযোগ্য) যখন আমি ফেরেশতাদিগকে আদেশ করিলাম যে, তোমরা আদমকে সিজদা কর। ইহাতে ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করিল।'

বলাবাহুল্য হারূত ও মারূতের পাপ ইবলীসের পাপ অপেক্ষা কম জঘন্য ছিল।

ইমাম কুরতুবী হযরত আলী (রা), হযরত ইব্ন মাসউদ (রা), হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত ইব্ন উমর (রা), কা'ব আহবার, সুদ্দী এবং কালবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা বলিয়াছেন– 'হারূত ও মারূত দুইজন ফেরেশতা ছিলেন।'

হারূত-মারূত সম্পর্কিত হাদীস ও তৎসম্পর্কিত পর্যালোচনা

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে', মূসা ইব্ন জুবায়র, যুহায়র ইব্ন মুহাম্মদ, ইয়াহিয়া ইব্ন বুকায়র ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত আদম (আ)-কে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেন, তখন ফেরেশতাগণ বলিল– প্রভু হে! তুমি কি তথায় এইরূপ একটি জাতিকে সৃষ্টি করিবে যে জাতি উহাতে ফাসাদ সৃষ্টি করিবে এবং রক্তপাত ঘটাইবে? আমরাই তোমার প্রশংসা বর্ণনা করিব এবং তোমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিব।' আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন– 'নিশ্চয় আমি এইরূপ বিষয়ে অবগত রহিয়াছি, যে বিষয়ে তোমরা অবহত নহ।' তাহারা বলিল– 'আমরা বনী আদম অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে তোমার প্রতি অনুগত।' আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন– 'তোমরা দুইজন ফেরেশতা উপস্থিত কর। আমি তাহাদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেখিব তাহারা কিরূপ কার্য করে।' তাহারা বলিল– 'প্রভু হে! হারূত ও মারূতকে আমরা উক্ত উদ্দেশ্যে উপস্থিত করিতেছি।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত ফেরেশতাদ্বয়কে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিয়া যুহরা নক্ষত্রকে অদ্বিতীয়া সুন্দরী নারীরূপে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। সে তাহাদের নিকট আসিলে তাহারা তাহার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইবার জন্যে তাহার নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সে বলিল– 'তোমরা এই কথাটি' উচ্চারণ করিলে আমি তোমাদের কথা

শুনিব। আল্লাহ্র কসম! তোমরা আমার কথা না শুনিলেন আমি তোমাদের কথা শুনিব না।' সে 'এই কথাটি' এর স্থলে একটি শিরকমূলক বাক্য উচ্চারণ করিল। হারূত ও মারূত বলিল– না, আল্লাহ্র কসম! আমরা কখনও আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করিব না।' ইহাতে সুন্দরী নারীটি চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর সে একটি শিশুকে কোলে করিয়া তাহাদের নিকট পুনরায় উপস্থিত হইল। তাহারা তাহার নিকট পূর্বোল্লেখিত ইচ্ছা ব্যক্ত করিল। সে বলিল– আল্লাহ্র কসম! তোমরা এই শিশুটিকে হত্যা না করিলে আমি তোমাদের কথা শুনিব না। তাহারা বলিল– আল্লাহ্র কসম! আমরা উহাকে কোনক্রমেই হত্যা করিব না। ইহাতে সে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর সে এক পেয়ালা শরাব লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা তাহার নিকট পূর্বোক্ত ইচ্ছা ব্যক্ত করিল। সে বলিল– আল্লাহ্র কসম! তোমরা এই শরাব পান না করিলে আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব না। তাহারা শরাব পান করিল। অতঃপর মাতাল অবস্থায় তাহার সহিত ব্যভিচার করিল এবং শিশুটিকে হত্যা করিল। তাহাদের মধ্যে হুঁশ আসিবার পর সে তাহাদিগকে বলিল– আল্লাহ্র কসম! তোমরা যে সকল পাপ করিতে পূর্বে অসম্মতি জানাইয়াছিলে, মাতাল অবস্থায় উহাদের প্রত্যেকটিই করিয়াছ।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে দুনিয়ার শাস্তি ও আখিরাতের শাস্তি ইহাদের যে কোন একটিতে বাছিয়া লইতে বলিলেন। তাহারা দুনিয়ার শাস্তিকে বাছিয়া লইল।

ইমাম আবূ হাতিম ইব্ন হাব্বান স্বীয় 'সহীহ' সংকলনে উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি উপরোক্ত রাবী ইয়াহিয়া ইব্ন বুকায়র হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ইয়াহিয়া ইব্ন বুকায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ শায়বাহ, সুফিয়ান ও হাসান এই অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েত হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে একমাত্র নাফে' বর্ণনা করিয়াছেন। মূসা ইব্ন জুবায়র ছাড়া উহার সনদের সকল রাবীই বিশ্বস্ত। উহাদের মাধ্যমে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। উক্ত মূসা ইব্ন জুবায়র হইতেছে– মূসা ইব্ন জুবায়র আনসারী সালমী। তাহার মালিক হইতেছে মাদীনী আল হায্যা। সে (মূসা ইব্ন জুবায়র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), আবূ উমাহ ইব্ন সাহল ইব্ন হানীফ, নাফে' এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক, এই সকল ব্যক্তির নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার (মূসা ইব্ন জুবায়রের) নিকট হইতে তাঁহার পুত্র আব্দুস সালাম, বিকর ইব্ন মুযার, যুহায়র ইব্ন মুহাম্মদ, সাঈদ ইব্ন সালিমাহ, আবদুল্লাহ ইব্ন লাহীআ, আমর ইব্ন হারিছ এবং ইয়াহিয়া ইব্ন আইয়ুব এই সকল ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ তাঁহার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম كتاب الجرح والتعديل (রাবীদের সমালোচনা সম্পর্কিত পুস্তক) নামক গ্রন্থে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি উহাতে তাহার পক্ষে বা বিপক্ষে কাহারো কোন মন্তব্য উদ্ধৃত করেন নাই। উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে একজন অজ্ঞাত পরিচয় রাবী।[১]

উক্ত রিওয়ায়েত স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী حديث مرفوع হিসাবে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে তাঁহার গোলাম নাফে'র মাধ্যম ভিন্ন অন্য কাহারো মাধ্যমে

---

১. ইব্ন হাব্বান তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন–'সে হাদীস বর্ণনায় ভুল করিত এবং অন্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হাদীস বর্ণনা করিত।' ইব্ন কাত্তান তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাহার পরিচয় জানা যায় না।' تهذيب التهذيب হইতে গৃহীত।

বর্ণিত হয় নাই। তবে উহাকে নাফে' হইতে মূসা ইব্ন জারীর ব্যতীত অন্য এক রাবীও বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে উহা বর্ণিত হইতেছে ঃ

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে' মূসা ইব্ন সারজাস, সাঈদ ইব্ন সালিমাহ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন রজা, হিশাম ইব্ন আলী ইব্ন হিশাম, দা'লাজ ইব্ন আহমদ ও ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন (এই স্থলে রাবী উপরে বর্ণিত রিওয়ায়েতটির অনুরূপ বিশদভাবে উল্লেখ করিয়াছেন)।

নাফে' হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআবিয়াহ ইব্ন সালেহ, ফারজ ইব্ন ফুযালাহ, হুসাইন (সুনায়দ ইব্ন দাঊদ), কাসিম ও ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নাফে' বলেন, একদা আমি হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর সহিত সফর করিতেছিলাম। একদিন রাত্রির শেষভাগে তিনি আমাকে বলিলেন, 'ওহে নাফে'! দেখতো লাল নক্ষত্রটি (ভোর বেলায় পূর্বদিকে উদিত নক্ষত্র) উদিত হইয়াছে কিনা। আমি বলিলাম, 'উহা এখনও উদিত হয় নাই।' এইরূপে তিনি দুইবার বা তিনবার আমাকে উহা উদিত হইয়াছে কিনা, তাহা দেখিতে বলিলেন এবং আমি তাঁহাকে উহার উদিত না হইবার সংবাদ দিলাম। অতঃপর এক সময়ে তাহাকে বলিলাম, উহা উদিত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, উহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি না।' আমি বলিলাম, সুবহানাল্লাহ! উহা তো আমাদের সেবায় নিয়োজিত আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অনুগত একটি নক্ষত্র। তিনি বলিলেন- শুন। আমি নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, শুধু তাহাই তোমাকে বলিতেছি। 'একদা ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরয করিল ঃ হে প্রভু! তুমি বনী আদমের পাপ ও গুনাহকে কিরূপে সহিয়া যাও? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ 'আমি তাহাদিগকে পাপ ও গুনাহ করিবার সুযোগ ও প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছি। পক্ষান্তরে, তোমাদিগকে উহার সুযোগ ও প্রবৃত্তি প্রদান করি নাই।' তাহারা বলিল, আমরা তাহাদের স্থানে থাকিলে তোমার নাফরমানী করিতাম না। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে দুইজন ফেরেশতাকে মনোনীত কর। তাহারা অনেক যাচাই বাছাই করিয়া হারূত ও মারূত নামক দুইজন ফেরেশতাকে মনোনীত করিল।

উপরোক্ত রিওয়ায়েত দুইটিও উপরোক্ত রাবী নাফে' ভিন্ন অন্য কাহারো মাধ্যমে বর্ণিত হয় নাই। উক্ত রিওয়ায়েতটির হযরত ইব্ন উমর (রা) কর্তৃক নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত হইবার পরিবর্তে কা'ব আহ্বার হইতে হযরত ইব্ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হইবার সম্ভাবনাই সমধিক। তাফসীরকার আবদুর রায্যাক স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উহাকে কা'ব আহ্বার হইতে হযরত ইব্ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত হিসাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে আব্দুর রায্যাক কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতটি উদ্ধৃত হইতেছে ঃ

কা'ব আহ্বার হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত ইব্ন উমর (রা), সালিম, মূসা ইব্ন উক্বা, সুফিয়ান ছাওরী ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

একদা ফেরেশতাগণ বনী আদমের পাপ ও গুনাহের বিষয় উল্লেখ করিলে তাহাদিগকে আদেশ দেওয়া হইল- তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ফেরেশতা মনোনীত কর। তাহারা হারূত ও মারূতকে মনোনীত করিল। আল্লাহ্ তাহাদিগকে (হারূত ও মারূতকে) বলিলেন- 'আমি বনী আদমের নিকট রাসূল পাঠাইয়া থাকি; কিন্তু আমার ও তোমাদের মধ্যে কোন রাসূল থাকিবে না। তোমরা পৃথিবীতে যাও। আমার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না;

যিনা করিও না; আর শরাব পান করিও না।' কা'ব বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যেইদিন তাহারা পৃথিবীতে অবতরণ করিল, সেই দিনেই নিষিদ্ধ সকল কাজ করিয়া ছাড়িল।

ইমাম ইব্‌ন জারীর উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে দুইটি মাধ্যমে আব্দুর রাযযাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম উহা উপরোক্ত রাবী সুফিয়ান ছাওরী হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং সুফিয়ান ছাওরী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আহমদ ইব্‌ন ইসামের অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর আবার উহাকে নিম্নোক্ত সনদেও বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কা'ব আহ্‌বার হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত ইব্‌ন উমর (রা), সালিম, মূসা ইব্‌ন উকবা, আব্দুল আযীয ইব্‌ন মুখতার, মুআল্লা (ইব্‌ন আসাদ), মুছান্না ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ (এই স্থলে রাবী পূর্বোক্ত রিওয়ায়েতটি উল্লেখ করিয়াছেন।)

শেষোক্ত রিওয়ায়েতগুলির সনদে দেখা যাইতেছে যে, উহা কা'ব আহ্‌বার হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) ও তৎপুত্র সালিমের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। সালিমের মাধ্যমে বর্ণিত শেষোক্ত রিওয়ায়েতগুলি নাফে'র মাধ্যমে বর্ণিত পূর্বোক্ত রিওয়ায়েতসমূহ অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ ও সহীহ। সালিম হইতেছেন হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-এর পুত্র আর নাফে' হইতেছে তাঁহার গোলাম। সালিম নাফে' অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এর দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, উপরোক্ত রিওয়ায়েত কা'ব আহ্‌বার কর্তৃক বনী ইসরাঈল জাতির গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত ও বর্ণিত রিওয়ায়েত ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আল্লাহ্‌ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

সাহাবী ও তাবেঈগণ কর্তৃক বিবৃত বিবরণ

হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উমর ইব্‌ন সাঈদ, খালিদ হিযমা, হাম্মাদ, হাজ্জাজ, মুছান্না ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'যুহরা ছিল পারস্য দেশীয় এক সুন্দরী রমণী। সে একদা হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট কোন এক বিষয়ে বিচার প্রার্থিনী হইয়াছিল। তাহারা তাহার সহিত ব্যভিচার করিতে চাহিলে সে এই শর্তে সম্মত হইল যে, তাহারা তাহাকে আকাশে উঠিবার দোয়া বা মন্ত্র শিক্ষা দিবে। ফেরেশতাদ্বয় তাহার শর্ত মানিয়া লইল। যুহরা মন্ত্র পড়িয়া আকাশে উঠিয়া গেল। সেখানে সে তারকায় রূপান্তরিত হইয়া গেল।'

উক্ত রিওয়ায়েতের রাবীগণ বিশ্বস্ত। তবে উহা হযরত আলী (রা) হইতে উমর ইব্‌ন সাঈদ ছাড়া অন্য কেহ বর্ণনা করে নাই।

হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উমর ইব্‌ন সাঈদ, আবূ খালিদ, মুআবিয়াহ, ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা, ফযল ইব্‌ন শাযান ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ এই আয়াতাংশে উল্লেখিত দুইজন ملك হইতেছেন আকাশের ফেরেশতা।' হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদের পিতামহ (নাম উহ্য রহিয়াছে), জা'ফরের পিতা মুহাম্মদ, মুগীছের মুনীব জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ, মুগীছ ও হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা)

বলিয়াছেন ঃ (এই স্থলে রাবী পূর্বোক্ত রিওয়ায়েতটি উল্লেখ করিয়াছেন।) উক্ত মাধ্যমে বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েত সহীহ্ বলিয়া প্রমাণিত নহে।

'হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ তুফায়েল ও জাবির প্রমুখ রাবীর সনদে দুইটি সূত্রে হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্ যুহরা তারকার প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন! কারণ, সে হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয়কে গুনাহে লিপ্ত করিয়াছে।' উক্ত রিওয়ায়েতটিও সহীহ্ নহে। উহা সহীহ্ রিওয়ায়েতের বিরোধীও বটে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উসমান নাহ্‌দী, আলী ইব্‌ন যায়দ, হাম্মাদ, হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল, মুছান্না ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইমাম ইন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যখন অধিক হইয়া গেল এবং তাহারা যখন গুনাহ্ করিতে লাগিল, তখন ফেরেশতাগণ তাহাদের বিরুদ্ধে, পৃথিবীর বিরুদ্ধে এবং পর্বতসমূহের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল 'হে প্রভু! তুমি তাহাদিগকে অবকাশ দিও না।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের প্রতি এই ওহী পাঠাইলেন যে, 'আমি তোমাদের অন্তর হইতে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানকে দূরে রাখিয়াছি। পক্ষান্তরে বনী আদমের অন্তরে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানকে অবতীর্ণ করিয়াছি। তোমরাও পৃথিবীতে অবতরণ করিলে তাহাদের ন্যায় পাপ করিতে।' ইহাতে ফেরেশতাগণ বলাবলি করিতে লাগিল, 'আমরা পরীক্ষায় পতিত হইলে পাপমুক্ত থাকিতাম।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের নিকট এই ওহী পাঠাইলেন ঃ বেশ! তবে তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে দুইজন অতি উত্তম ফেরেশতাকে মনোনীত কর। তাহারা হারূত ও মারূতকে মনোনীত করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পৃথিবীতে নামাইয়া দিয়া যুহরা তারকাকে পারস্য দেশীয় নারীরূপে তাহাদের নিকট পাঠাইলেন। লোকদের নিকট সে বায়দাখত নামে পরিচিত ছিল। উক্ত ফেরেশতাদ্বয় তাহার সহিত ব্যভিচার করিল। ইতিপূর্বে ফেরেশতাগণ শুধু মু'মিনদের জন্যে দোয়া করিতেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا 'আর তাহারা (ফেরেশতাগণ) মু'মিনদের জন্যে দোয়া করিয়া থাকে।' তাহারা হারূত ও মারূতের পাপ কার্যে লিপ্ত হইবার পর পৃথিবীবাসী সকল লোকদের জন্যে দোয়া করিতে লাগিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الاَرْضِ 'আর তাহারা (ফেরেশতাগণ) পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য দোয়া করিয়া থাকে।'[১]

আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদ্বয়কে দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এই দুইটির যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে বলিলেন। তাহারা দুনিয়ার আযাব বাছিয়া লইল।

---

১. কুরআন মজীদের একাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন কাফিরের জন্যে কোন মু'মিন ইসতিগফার করিতে পারে না; এইরূপ করা নিষিদ্ধ। বলাবাহুল্য, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র অনুগত বান্দা। তাহারা নিষিদ্ধ কাজ করেন না। উপরোক্ত রিওয়ায়েতে ফেরেশতাগণ উপরোক্ত নিষিদ্ধ কাজ করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, উহা কুরআন মজীদ বিরোধী রিওয়ায়েত। তাই উহা গ্রহণযোগ্য নহে। রিওয়ায়েতে যে আয়াতটি উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা দ্বারা কাফিরদের জন্যে ফেরেশতাদের ইস্‌তিগফার করা প্রমাণিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে আয়াতে উল্লেখিত 'পৃথিবীবাসীগণ'-এর তাৎপর্য হইতেছে 'পৃথিবীবাসী মু'মিনগণ'।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মিনহাল ইব্ন আমর এবং ইউনুস ইব্ন খাব্বাব, যায়দ ইব্ন আবূ আনীসা, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর রাকী, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুজাহিদ বলেন ঃ

'একদা আমি হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর ভ্রমণসঙ্গী ছিলাম। একদিন রাত্রিতে তিনি স্বীয় গোলামকে বলিলেন- দেখতো الحمراء। (প্রভাতী তারা) উদিত হইয়াছে কিনা। উহার প্রতি কোন অভিনন্দন নাই। উহা নিপাত যাক! উহা ফেরেশতাদ্বয়ের (হারূত ও মারূতের) ব্যভিচারের সঙ্গিনী ছিল। একদা ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরয করিল- আদম জাতির পাপীদিগকে আপনি কিরূপে অবকাশ প্রদান করেন? তাহারা অন্যায়ভাবে মানুষ খুন করে, আপনি যে সকল কাজ নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তাহা করে এবং দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন- 'আমি তাহাদিগকে পরীক্ষায় পতিত করিয়াছি। তোমাদিগকেও তাহাদের ন্যায় পরীক্ষায় পতিত করিলে ঐরূপ করিতাম না।' আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন- বেশ! তবে তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে অতি উত্তম দুইজন ফেরেশতাকে মনোনীত কর।' তাহারা হারূত ও মারূতকে মনোনীত করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বলিলেন, 'আমি তোমাদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইব। তোমাদিগকে আদেশ দিতেছি, তোমরা শিরক করিবে না; যিনা করিবে না এবং খিয়ানত করিবে না। অতঃপর, তিনি অন্তরে কু-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া দিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিলেন এবং যুহরা তারকাকে একজন বিদুষী সুন্দরী নারীর রূপ দিয়া তাহাদের নিকট অবতীর্ণ করিলেন। সে তাহাদিগকে ব্যভিচারে লিপ্ত করিতে সচেষ্ট রহিল। একদা তাহারা তাহার সহিত ব্যভিচার করিবার জন্যে তাহার নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সে বলিল- আমি যে ধর্মের অনুসারিণী, উহার নির্দেশ এই যে, ভিন্ন ধর্মের অনুসারী কাহাকেও আমি দেহদান করিতে পারিব না। তাহারা বলিল-তুমি কোন্ ধর্মের অনুসারী? সে বলিল-আমি অগ্নি উপাসনার ধর্মের অনুসারিণী। তাহারা বলিল-'শিরক? আমরা উহার কাছেও যাইব না।' ইহাতে রমণীটি কিছুদিন তাহাদের নিকট হইতে দূরে রহিল। অতঃপর পুনরায় তাহাদের পিছনে লাগিল। তাহারা পুনরায় তাহার নিকট পূর্বোক্ত বাসনা প্রকাশ করিল। সে বলিল-'বেশ! তাহাই হইবে। তবে কথা এই যে, আমার স্বামী রহিয়াছে। তাহার কানে সংবাদটি পৌঁছিলে আমি অপমানিতা হইব। তোমরা আমার ধর্মকে গ্রহণ করিলে এবং আমাকে আকাশে লইয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি দিলে আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব।' তাহারা তাহার কথা মানিয়া তাহার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইল। অতঃপর তাহাকে লইয়া আকাশে উঠিতে লাগিল। পথিমধ্যে তাহাকে তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল। তাহাদের ডানাগুলি কাটিয়া দেওয়া হইল। তাহার ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পৃথিবীতে পড়িয়া গেল এবং তাহারা কাঁদিতে লাগিল।

সে সময় পৃথিবীতে একজন নবী ছিলেন। তিনি দুই জুমআর মধ্যবর্তী দিনগুলিতে দোআ করতেন। ইহা পরবর্তী জুমআয় কবূল হইত। পাপী ফেরেশতাদ্বয় হারূত ও মারূত ভাবিল- আমরা অমুক নবীর নিকট গিয়া যদি তাঁহাকে আমাদের জন্যে আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার করিতে বলি আর তিনি যদি তাঁহারা নিকট আমাদের জন্য ইস্তিগফার করেন, তবে হয়ত আমাদের গুনাহ মাফ হইতে পারে। তাহারা উক্ত নবীর নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন- আল্লাহ্ তোমাদিগকে রহম করুন! পৃথিবীবাসী কিরূপে আকাশবাসীর জন্যে ইস্তিগফার করিবে ? তিনি তাহাদিগকে বলিলেন- আমরা গুনাহ করিয়াছি। আল্লাহর

নবী বলিলেন—আচ্ছা! তোমরা আগামী জুমআর দিন আমার নিকট আসিও। তাহারা তাহাই করিল। তিনি বলিলেন—'তোমাদের বিষয়ে আমার দোয়া কবূল হয় নাই। আগামী জুমআয় আসিও! তাহারা তাহাই করিল। আল্লাহর নবী বলিলেন—তোমরা দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব—এই দুইটির যে কোন একটিকে বাছিয়া লইবার জন্য অনুমতি পাইয়াছ। তবে, তোমরা দুনিয়ার আযাব বাছিয়া লইলে আখিরাতের আযাব মাফ হইয়া যাইবে এইরূপ নিশ্চয়তা নাই। উহা আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।' ইহাতে তাহাদের একজন বলিল—দুনিয়ার বয়সের সামান্য অংশ অতিবাহিত হইয়াছে। উহা দীর্ঘদিন টিকিয়া থাকিবে। আমি দুনিয়ার আযাবকে বাছিয়া লইব না।' অন্যজন বলিল—ইতিপূর্বে আমি তোমার কথা মানিয়াছি। এইবার তুমি আমার কথা মান। অস্থায়ী আযাব স্থায়ী আযাবের সমতুল্য নহে।' প্রথমজন বলিল—'আমরা দুনিয়ার আযাব বাছিয়া লইলেও তো আখিরাতের আযাবের আশংকা থাকিয়া যাইতেছে।' দ্বিতীয়জন বলিল—'আশা করি, আল্লাহ্ যখন দেখিবেন যে, আমরা আখিরাতের আযাবের ভয়েই দুনিয়ার আযাবকে বাছিয়া লইয়াছি, তখন তিনি আমাদিগকে আখিরাতের আযাব দিবেন না।' অতঃপর, তাহারা দুনিয়ার আযাবকে বাছিয়া লইল। ইহাতে তাহাদের মস্তক নীচের দিকে এবং পা উপরের দিকে রাখিয়া অগ্নিপূর্ণ একটি কূপের মধ্যে শিকলের সাহায্যে তাহাদিগকে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে।'

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ। মনে রাখিতে হইবে, উহা স্বয়ং নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত হয় নাই; বরং হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। এই স্থলে ইতিপূর্বে উল্লেখিত একটি কথা পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। ইতিপূর্বে হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে নাফে'র সূত্রে ইমাম ইব্ন জারীর কর্তৃক বর্ণিত অনুরূপ একটি মারফূ' হাদীস স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে উল্লেখ করিবার পর পাঠকদের নিকট প্রকাশ করিয়াছে যে, উক্ত মারফূ' হাদীস অপেক্ষা কা'ব আহ্বার হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত ইব্ন উমর (রা) ও তৎপুত্র সালিম কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতটি সনদের দিক দিয়া অধিকতর সহীহ ও প্রামাণ্য। এই স্থলে বর্ণিত রিওয়ায়েতটিও হযরত ইব্ন উমর (রা) কা'ব আহবার হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। 'যুহরা তারকাটি একটি সুন্দরী রমণীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিল—'হযরত আলী (রা) হইতে এবং হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়েতদ্বয়ে উল্লেখিত এই উক্তি যুক্তি হইতে বহুদূরে অবস্থিত।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কায়স ইব্ন উব্বাদ, রবী' ইব্ন আনাস, আবূ জা'ফর, আদম, ইসাম ইব্ন রউওয়াদ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত আদম (আ)-এর পর মানুষ যখন কুফর ও আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হইল, তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করিল--হে প্রভু! যে মানব জাতিকে তুমি শুধু তোমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছ, তাহারা তো কুফর, নরহত্যা, হারাম মাল ভক্ষণ, যিনা, চুরি ও শরাবখুরীতে লিপ্ত হইয়াছে।' অতঃপর, ফেরেশতাগণ তাহাদের প্রতি বদ দোআ করিতে লাগিল। তাহাদের অন্তরে পাপী মানুষের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি রহিল না। আল্লাহ্ তা'আলা অহাদিগকে বলিলেন—মানুষ তো আমাকে দেখে না; (তাই, তাহারা পাপ করিতে সাহস পায়)। ইহাতেও ফেরেশতাদের অন্তরে তাহাদের প্রতি দরদ বা সহানুভূতি আসিল না। (তাহারা তাহাদগিকে ক্ষমার অযোগ্য মনে করিতে লাগিল।) ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন—'তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে দুইজন অতি উত্তম ফেরেশতাকে মনোনীত কর। আমি তাহাদিগকে

আমার আদেশ-নিষেধসহ দুনিয়াতে পাঠাইব। তাহারা হারূত ও মারূত নামক দুইজন ফেরেশতাকে মনোনীত করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরে মানুষের অন্তরের কু-প্রবৃত্তির ন্যায় কু-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে দুনিয়াতে পাঠাইলেন। আর তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন- 'তোমরা আমার ইবাদত করিবে, আমার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিবে না, হারাম মাল ভক্ষণ করিবে না এবং শরাব পান করিবে না।'

তাহারা পৃথিবীতে আসিয়া কিছুকাল লোকদের মধ্যে ন্যায়ানুগ ফয়সালা জারী করিল। তখন ছিল হযরত ইদরীস (আ)-এর যুগ। সেই সময় একটি রমণী ছিল। যুহরা তারকা যেমন সৌন্দর্যে সকল তারকার মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া, উক্ত রমণীটি ছিল সেইরূপ সৌন্দর্যে সকল রমণীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। একদা তাহারা উক্ত রমণীর নিকট আসিয়া তাহার সহিত যিনা করিবার বাসনা প্রকাশ করিল। তাহারা তাহাদের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্যে তাহার নিকট কাকুতি-মিনতি সহকারে আবেদন জানাইল। সে বলিল-তোমরা আমার ধর্ম গ্রহণ করিলে আমি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারি। তাহার বলিল-তোমার ধর্ম কি? সে তাহাদিগকে একটি মূর্তি দেখাইয়া বলিল, আমি ইহাকে পূজা করিয়া থাকি। ইহাই আমার ধর্ম। তাহারা বলিল, 'উহার পূজা করিবার কোন প্রয়োজন আমাদের নাই।'

এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। কিছুদিন এইরূপেই কাটিল। অতঃপর তাহারা পুনরায় রমণীটির নিকট আসিয়া পূর্বোক্ত বাসনা পুনর্ব্যক্ত করিল। সে তাহাদিগকে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিল। তাহারা পূর্বের ন্যায় ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল। অতঃপর পুনরায় তাহারা তাহার নিকট আসিয়া পূর্বোক্ত বাসনা পুনর্ব্যক্ত করিল। রমণীটি যখন দেখিল যে, তাহারা তাহার শর্তকে মানিয়া লইতেছে না, তখন সে তাহাদিগকে বলিল-'তোমরা তিনটি কার্যের মধ্যে হইতে যে কোন একটি কার্য করিলেই আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব। হয় তোমরা এই মূর্তিটিকে পূজা করিবে; নতুবা এই মানুষটিকে হত্যা করিবে; অথবা এই শরাবটুকু পান করিবে।' তাহারা বলিল-'ইহাদের কোনটিই হালাল নহে; তবে শরাব পান করাই ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম জঘন্য হারাম কাজ।' এই বলিয়া তাহারা শরাব পান করিল। অতঃপর রমণীটির সহিত যিনা করিল। যিনা করিবার পর তাহাদের ভয় হইল, তাহাদের নিকট উপস্থিত লোকটি মানুষকে তাহাদের পাপের কথা জানাইয়া দিবে। তাই তাহারা তাহাকে হত্যা করিল। হুঁশ আসিবার পর তাহারা আকাশে ফিরিয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু ফিরিতে পারিল না। তাহাদেরও আকাশের ফেরেশতাদের মধ্যকার পর্দা তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। আকাশের ফেরেশতাগণ তাহাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল। তাহারা বুঝিতে পারিল, যাহারা আল্লাহ্কে দেখে না, তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় কম থাকা স্বাভাবিক। এই ঘটনার পর হইতে ফেরেশতাগণ পৃথিবীর সকল লোকের জন্য ইস্তিগফার করিতে লাগিল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالْمَلٰئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ "আর ফেরেশতাগণ স্বীয় প্রভুর প্রশংসা বর্ণনা করিয়া থাকে এবং পৃথিবীবাসী লোকদের জন্য ইস্তিগফার করিয়া থাকে।"

অতঃপর অপরাধী হারূত ও মারূতকে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন-'তোমরা দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এই দুইটির যে কোন একটিকে বাছিয়া লও।' তাহারা বলিল-'দুনিয়ার

আযাব অস্থায়ী: পক্ষান্তরে আখিরাতের আযাব স্থায়ী।' তাহারা দুনিয়ার আযাবকেই বাছিয়া লইল। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ব্যবিলন শহরে রাখিয়া দিলেন। সেইখানেই তাহারা আযাব ভোগ করিয়া আসিতেছে।

উক্ত রিওয়ায়েতটি হাকিম স্বীয় মুসতাদরাক গ্রন্থে উপরোক্ত রাবী আবূ জা'ফর রাযী হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ জা'ফর রাযী হইতে ধারাবাহিকভাবে হাকাম ইব্ন সালিম রাযী, (হাকাম একজন বিশ্বস্ত রাবী)[১] ইসহাক ইব্ন রাহবিয়াহ, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুস সালাম ও আবূ যাকারিয়া আম্বারীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর হাকিম মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 'উহার সনদ সহীহ; তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই।'

উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি যুহরা সম্বন্ধে বর্ণিত রিওয়ায়েতসমূহের মধ্যে যুক্তির অধিকতর নিকটবর্তী। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ (ফারেসী), কাসিম ইব্ন ফযল হায্যাঈ, মুসলিম, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'একদা নিকটতম আকাশের অধিবাসী ফেরেশতাগণ পৃথিবীবাসী মানুষের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইল তাহারা পাপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে। ইহাতে তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরয করিল—হে প্রভু! পৃথিবীবাসী মানুষ পাপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন—তোমরা তো আমাকে দেখিতেছ; কিন্তু, তাহারা তো আমাকে দেখে না।' অতঃপর তাহাদিগকে বলিলেন—'তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে তিনজন ফেরেশতাকে মনোনীত কর।' তাহারা তাহাই করিল। মনোনীত ফেরেশতাদের নিকট হইতে এই বিষয়ে সম্মতি লওয়া হইল যে, তাহারা পৃথিবীতে অবতরণ করিবে এবং তথায় মানুষের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরে কু-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া দিয়া বলিলেন—'তোমরা পৃথিবীতে গিয়া শরাব পান করিবে না, মানুষ খুন করিবে না, যিনা করিবে না এবং মূর্তিপূজা করিবে না।' ইহাতে একজন ফেরেশতা পৃথিবীতে অবতরণ করা হইতে অব্যাহতি চাহিলে তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল। অপর দুইজন ফেরেশতা পৃথিবীতে অবতরণ করিল। একদা তাহাদের নিকট মুনাহিয়াহ (مناهية) নাম্নী একজন বিদুষী সুন্দরী আগমন করিল। তাহার প্রতি উভয় ফেরেশতার মনে লোভ জন্মিল। তাহারা তাহার গৃহে আসিয়া তাহাদের যৌন বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাহার নিকট আবেদন জানাইল। সে বলিল—'তোমরা শরাব পান করিলে, আমার প্রতিবেশীর পুত্রকে হত্যা করিলে এবং মূর্তিপূজা করিলে আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিতে পারি।' তাহারা বলিল—'আমরা মূর্তিপূজা করিব না।' তাহারা শুধু শরাব পান করিল। তৎপর মানুষ খুন করিল এবং মূর্তিপূজাও করিল। আকাশের ফেরেশতাগণ তাহাদের দিকে তাকাইয়া তাহাদের অবস্থা দেখিল। রমণীটি তাহাদিগকে বলিল—'তোমরা যে বচনটি উচ্চারণ করিয়া আকাশে উড়িয়া যাও, আমাকে উহা শিখাও।' তাহারা তাহাকে উহা শিখাইল। সে উহার সাহায্যে আকাশে উঠিয়া গেল। সেখানে সে একটি অগ্নিপিণ্ডে রূপান্তরিত হইয়া গেল। সেই অগ্নিপিণ্ডটিই যুহরা তারা নামে পরিচিত। আর সেই ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট আল্লাহ্ তা'আলা

১. কিন্তু 'তাকরীব' নামক সমালোচনা গ্রন্থে তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করিতেন। আবার তাহযীবুত্তাহযীব নামক সমালোচনা গ্রন্থে আহমদ হইতে তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, 'তিনি আম্বাসা হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করিতেন।'

হযরত সুলায়মান (আ)-কে পাঠাইলেন। তিনি তাহাদিহকে দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এই দুইটির যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে বলিলেন। তাহারা দুনিয়ার আযাবকে বাছিয়া লইল। তাহারা এখন আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত রহিয়াছে।'

উক্ত রিওয়ায়েতে অনেক অতিরিক্ত কথা, উদ্ভট উক্তি এবং সহীহ বর্ণনার বচন উল্লেখিত হইয়াছে। আল্লাহ্ই সঠিক ঘটনা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদাহ, যুহরী, মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হারূত ও মারূত ছিল দুইজন ফেরেশতা। একদা ফেরেশতাগণ বনী আদম জাতির বিচারকমণ্ডলীকে লইয়া উপহাস করিবার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত ফেরেশতাদ্বয়কে বিচারক হিসাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। একদা জনৈকা মহিলা কোন এক বিষয়ে বিচার প্রার্থিনী হইয়া তাহাদের নিকট আসিলে তাহার তাহার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অতঃপর তাহারা আকাশে উঠিতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদিগকে তথায় উঠিতে দেওয়া হয় নাই। তৎপর তাহাদিগকে দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এই দুইটির যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে বলা হয়। তাহারা দুনিয়ার আযাবকেই বাছিয়া লয়।'

কাতাদাহ হইতে মুআম্মার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয় মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই তাহাদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তাহারা যাহাকেই যাদু শিক্ষা দিবে, তাহাকেই পূর্বে বলিয়া লইবে যে, আমরা কিন্তু পরীক্ষার মাধ্যম মাত্র। তোমরা কুফরী করিও না।'

সুদ্দী হইতে ইসবাত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয় পৃথিবীবাসী মানুষের বিচার কার্যকে লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিল। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন—আমি বনী আদমের অন্তরে দশ প্রকারের কুপ্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি। তাহারা সেই কারণেই পাপ করে। হারূত ও মারূত বলিল—হে প্রভু! তুমি আমাদের অন্তরে সেই সকল কু-প্রবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলে আমরা নিশ্চয় ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচারকার্য সম্পাদন করিব।' আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন—'বেশ। আমি তোমাদের অন্তরে সেই সকল কু-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া দিলাম। তোমরা পৃথিবীতে অবতরণ কর। তথায় তোমরা ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচারকার্য সম্পাদন করিবে।' তাহারা দীনাওয়ান্দ (دیناوند) রাজ্যের অন্তর্গত বাবিল শহরে অবতরণ করিল। তাহারা সারাদিন বিচারকার্য সম্পাদন করিয়া সন্ধ্যার দিকে আকাশে ফিরিয়া যাইত। একদা জনৈক মহিলা স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ লইয়া তাহাদের আদালতে আগমন করিল। তাহার অপরূপ সৌন্দর্য তাহাদিগকে বিমোহিত করিল। তাহার নাম আরবী ভাষায় যুহরা لزهرة। নাবাতী ভাষায় বায়দাখত بيدخت এবং ফারসী ভাষায় আনাহীদ (اناهيد) ছিল। তাহাদের মধ্য হইতে একজন অন্যজনকে বলিল—'মহিলাটির সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হইয়াছি।' অন্যজন বলিল—'আমার অবস্থাও তাহাই। আমি তোমার নিকট উহা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু লজ্জার কারণে পারি নাই।' প্রথমজন বলিল— তবে কি তাহার নিকট আমাদের বাসনাটি প্রকাশ করিব? দ্বিতীয়জন বলিল—হ্যাঁ। তাহাই কর। কিন্তু ইহাতে যে আমাদিগকে আল্লাহ্র আযাব ভোগ করিতে হইবে। প্রথমজন বলিল—'আশা করি, তিনি স্বীয় রহমতে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।' পরের দিন মহিলাটি যখন স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ লইয়া তাহাদের আদালতে উপস্থিত হইল, তখন তাহারা নিজেদের যৌন বাসনাটির কথা তাহার নিকট ব্যক্ত করিল।

মহিলাটি বলিল—'তোমরা যদি বিচারাধীন মামলায় আমার স্বামীর বিরুদ্ধে আমার পক্ষে রায় প্রদান কর, তবে আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব।' তাহারা তাহাই করিল। সে তাহাদিগকে একটি নির্দিষ্ট নির্জন স্থানে যাইতে বলিল। তাহারা তথায় যাইবার পর তাহাদের মধ্য হইতে একজন ব্যভিচারে লিপ্ত হইবার প্রস্তুতি নিলে মহিলাটি বলিল—'তোমরা যে কালাম পাঠ করিয়া আকাশে উঠিয়া থাক এবং যে কালাম পাঠ করিয়া আকাশ হইতে নামিয়া থাক, যতক্ষণ উহা আমাকে না শিখাইবে, ততক্ষণ আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব না।' তাহারা তাহাকে উহা শিখাইল। সে কালাম পড়িয়া আকাশে উঠিয়া গেল; কিন্তু নামিবার কালাম আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ভুলাইয়া দিলেন। অতএব সে সেইখানেই রহিয়া গেল। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে নক্ষত্রে রূপান্তরিত করিয়া দিলেন।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) যখনই উক্ত নক্ষত্রটি দেখিতেন, তখনই উহার প্রতি লা'নতের বদ দোয়া করিতেন এবং বলিতেন—এই নক্ষত্রটিই হারূত ও মারূতকে পাপে লিপ্ত করিয়াছিল।

'অতঃপর ফেরেশতাদ্বয় রাত্রিতে যখন আকাশে উঠিতে চাহিল তখন আর উঠিতে পারিল না। তাহারা বুঝিতে পরিল তাহাদের সর্বনাশ ঘটিয়াছে।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এই দুইটির যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে বলিলেন। তাহারা দুনিয়ার আযাবকেই বাছিয়া লইল। ইহাতে তাহাদিগকে বাবিল শহরে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হইল এবং এই অবস্থায় তাহারা লোকদিগকে যাদু শিক্ষা দিতে লাগিল।

মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা ফেরেশতাগণ, আদম জাতির নিকট রাসূল, কিতাব এবং স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আসা সত্ত্বেও তাহাদিগকে জুলুম-অত্যাচার এবং অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন—তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে দুইজন ফেরেশতাকে বাছিয়া লও। আমি তাহাদিগকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিব। তাহারা তথায় গিয়া লোকদের মধ্যে ন্যায় বিচার করিবে।' তাহারা অনেক অনুসন্ধান চালাইয়া হারূত ও মারূতকে মনোনীত করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইলেন। পাঠাইবার কালে তাহাদিগকে বলিলেন—বনী আদম জাতি আমাকে দেখে না। এই অবস্থায় তাহাদের নিকট রাসূল ও কিতাব যাওয়া সত্ত্বেও তাহারা পাপ করে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছ। শুন, আমি তোমাদের নিকট কোন রাসূল পাঠাইব না। তোমাদিগকে সরাসরি বলিয়া দিতেছি, 'তোমরা অমুক অমুক কাজ করিবে এবং অমুক অমুক কাজ হইতে দূরে থাকিবে।' তাহারা পৃথিবীতে আসিয়া কিছুকাল অত্যন্ত নেককার হিসেবে জীবন যাপন করিল। সেই সময়ে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর নেককার কোন লোক পৃথিবীতে ছিল না। তাহারা ন্যায়পরায়ণতার সহিত মানুষের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করিত। তাহারা সারাদিন ধরিয়া বিচার সম্পাদন করিবার পর সন্ধ্যাকালে আকাশে উঠিয়া যাইত। রাত্রিতে সেইখানে তাহারা ফেরেশতাদের সহিত রাত্রি যাপন করিত।

একদা আল্লাহ্ তা'আলা যুহরা তারকাকে অতিশয় সুন্দরী নারীর বেশে তাহাদের নিকট অবতীর্ণ করিলেন। সে তাহাদের নিকট কোন এক বিষয়ে বিচার-প্রার্থিনী হইয়া আগমন করিল। তাহারা তাহার বিরুদ্ধে রায় দিল। তাহার প্রস্থানের সময়ে উভয়ের অন্তরেই তাহার প্রতি লোভ জন্মিল। তাহারা একে অপরের নিকট অন্তরের লোভের কথা ব্যক্ত করিল। অতঃপর তাহারা

তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইল–'তুমি পুনরায় আমাদের আদালতে হাজির হও। আমরা তোমার পক্ষে রায় দিব।' সে পুনরায় তাহাদের আদালতে হাজির হইলে তাহারা তাহাকে নিজেদের অন্তরের লোভের কথাটি জানাইয়া দিয়া তাহার পক্ষে রায় দিল। অতঃপর উভয়ে তাহার সহিত যিনা করিল।

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, তাহাদের যৌন বাসনা পূর্ণ করিবার প্রক্রিয়া মানুষের যৌন বাসনা পূর্ণ করিবার প্রক্রিয়ার ন্যায় ছিল না। তাহাদের যৌনাঙ্গ তাহাদের দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল। যাহা হউক, অতঃপর যুহরা সেতারা আকাশে উড়িয়া গেল। সে আকাশে পূর্বে যেই স্থানে অবস্থান করিতেছিল, সেইখানেই অবস্থান গ্রহণ করিল। এইদিকে সন্ধ্যাবেলায় হারূত ও মারূত আকাশে চড়িতে গেলে পথিমধ্যে তাহারা বাধাপ্রাপ্ত হইল। তাহারা ধমক খাইল ও উপরে উঠিতে অনুমতি পাইল না। তাহাদের ডানাগুলি আর তাহাদিগকে উপরে লইয়া গেল না। তাহারা আদম জাতির একটি লোকের সাহায্যপ্রার্থী হইল। তাহারা তাহাকে বলিল–'আপনি স্বীয় প্রভুর নিকট আমাদের জন্যে দোয়া করুন। তিনি বলিলেন–পৃথিবীর অধিবাসী (মানুষ) কিরূপে আকাশের অধিবাসীর (ফেরেশতার) জন্যে সুপারিশ করিবে? তাহারা বলিল–'আমরা আকাশে আপনার প্রভুকে আপনার প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি।' ইহাতে তিনি তাহাদিগকে নির্দিষ্ট একটি দিনে তাঁহার নিকট আসিতে বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাহাদের জন্যে দোআ করিতে লাগিলেন। এক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দোয়া কবূল করিলেন। তাহাদিগকে দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব–এই দুইটির যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে বলা হইল। তাহাদের একজন অন্যজনের মতামত জানিতে চাহিলে সে বলিল–'আখিরাতের আযাব চিরস্থায়ী। আর সেখানকার আযাব বিভিন্ন শ্রেণীর। পক্ষান্তরে দুনিয়ার আযাব অস্থায়ী। উহার আযাব আখিরাতের আযাবের নয় ভাগের এক ভাগ মাত্র।' (তাহারা দুনিয়ার আযাবকেই বাছিয়া লইল।) তাহাদিগকে বাবিল শহরে নামিতে বলা হইল। সেইখানে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইল। তাহাদের শাস্তি শেষ হইয়াছে।' কেহ কেহ বলেন–'তাহাদিগকে লোহার সহিত জড়াইয়া ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হইয়াছে। তাহারা এখনও সেখানে ডানা ঝাপটাইতেছে।'

বিপুল সংখ্যক তাবেঈ হইতে হারূত ও মারূত সম্পর্কিত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুজাহিদ, সুদ্দী, হাসান বসরী, কাতাদাহ, আবুল আলীয়া, যুহরী, রবী' ইব্ন আনাস এবং মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বযুগীয় ও পরবর্তী যুগীয় বিপুল সংখ্যক তাফসীরকারও স্ব-স্ব তাফসীর গ্রন্থে তাহাদের কিস্সা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই সকল বিস্তারিত বিবরণ ও কাহিনীর উৎস হইতেছে বনী ইসরাঈল জাতি কর্তৃক বর্ণিত কিস্সা কাহিনী। এই সকল কিস্সা কাহিনী স্বয়ং নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত কোন সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত নহে। আর কুরআন মজীদে হারূত ও মারূতের ঘটনা উল্লেখিত রহিয়াছে সংক্ষিপ্তরূপে। উহাতে তাহাদের ঘটনা বিস্তারিতরূপে উল্লেখিত হয় নাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্বন্ধে কুরআন মজীদে যাহা বলিয়াছেন, আমরা উহার প্রতি ঈমান রাখি। আল্লাহ্ই প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হারূত ও মারূত সম্বন্ধে অদ্ভুত ও আজব একটা কাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে। নিম্নে উহা উল্লেখ করিতেছি ঃ

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়াহ, হিশাম ইব্ন উরওয়াহ, ইব্ন আবূয যানাদ, ইব্ন ওয়াহাব, রবী' ইব্ন সুলায়মান ও ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর বর্ণনা

করিয়াছেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন 'নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের অল্প কিছুদিন পর একদা দাওমাতুল জানদাল (دومة الجندل) নামক স্থান হইতে একটি স্ত্রীলোক আমার নিকট আগমন করিল। স্ত্রীলোকটি যাদু শিখিয়াছিল। কিন্তু উহা কোথাও প্রয়োগ করে নাই। যাদু শিখিবার কারণে তাহার উপর কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল। সে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া উহার সমাধান লইবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যে আগমন করিয়াছিল। যখন সে শুনিল, নবী করীম (সা) ইন্তিকাল করিয়াছেন, তখন সে অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্নায় আমার মনে তাহার প্রতি করুণার উদ্রেক হইল। সে বলিল-আমার ভয় হইতেছে, আমার সর্বনাশ ঘটিয়াছে। একদা আমার স্বামী আমাকে রাখিয়া উধাও হইয়া গেল। এই অবস্থায় একটি বৃদ্ধ মেয়েলোক আমার নিকট আসিল। আমি তাহাকে আমার বিপদের কথা জানাইলে সে বলিল-'আমি তোমাকে যাহা করিতে বলিব, তুমি তাহা করিলে তোমার স্বামী তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে।' (আমি তাহার কথা মানিতে সম্মত হইলাম)।

রাত্রিতে বৃদ্ধাটি দুইটি কালো কুকুর লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। উহাদের একটিতে সে এবং অন্যটিতে আমি আরোহণ করিলাম। মুহূর্তে আমরা বাবিল শহরে পৌঁছিলাম। সেখানে দেখি দুইটি লোক মস্তক নীচের দিকে এবং পা উপরের দিকে থাকা অবস্থায় ঝুলন্ত রহিয়াছে। তাহারা আমাকে বলিল, তুমি কোন উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম, যাদু শিখিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। তাহারা বলিল, 'আমরা পরীক্ষার মাধ্যম ছাড়া কিছু নহি। অতএব, তুমি কুফরী করিও না। যে অবস্থায় আসিয়াছ, সেই অবস্থায় ফিরিয়া যাও।' আমি তাহাদের পরামর্শ মানিতে অসম্মতি জানাইলাম। তাহারা বলিল, 'তবে ঐ উনানটির কাছে গিয়া উহাতে পেশাব কর।' আমি উহার কাছে গিয়া ভয়ে পেশাব না করিয়াই ফিরিয়া আসিলাম। তাহারা বলিল, পেশাব করিয়াছ তো? আমি বলিলাম, হ্যাঁ; করিয়াছি।' তাহারা বলিল, কিছু দেখিয়াছ কি? আমি বলিলাম, না, কিছু দেখি নাই। তাহারা বলিল, 'তুমি পেশাব কর নাই। যাও দেশে ফিরিয়া যাও। কুফরী করিও না।' আমি তাহাদের পরামর্শ মানিতে অসম্মতি জানাইলাম। তাহারা বলিল, 'তবে এই উনানটির কাছে গিয়া উহাতে পেশাব কর।' আমি উহার কাছে গেলে ভয়ে আমার লোম শিহরিয়া উঠিল। আমি পেশাব না করিয়া তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। বলিলাম, পেশাব করিয়াছি। তাহারা বলিল, কি দেখিলে? আমি বলিলাম, কিছুই না। তাহারা বলিল, 'তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ। তুমি পেশাব কর নাই। যাও দেশে ফিরিয়া যাও। কুফরী করিও না। তুমি কিন্তু শেষ প্রান্তে আসিয়া গিয়াছ। অর্থাৎ তোমার ঈমান চলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আমি তাহাদের পরামর্শ মানিতে অসম্মতি জানাইলাম।

তাহারা বলিল-বেশ, তবে এই উনানটির কাছে গিয়া উহাতে পেশাব কর। আমি উহার কাছে গিয়া উহাতে পেশাব করিলাম। দেখিলাম, এক মস্তকাবৃত অশ্বারোহী ব্যক্তি আমার দেহের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আকাশে উধাও হইয়া গেল। অতঃপর তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম 'আমি পেশাব করিয়াছি।' তাহারা বলিল, কিছু দেখিলে? আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা বলিলাম। তাহারা বলিল, 'এইবার সত্য বলিয়াছ। মস্তকাবৃত অশ্বারোহী ব্যক্তিটি হইতেছে তোমার ঈমান। উহা তোমার মধ্য হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। এখন দেশে

ফিরিয়া যাও।' আমি আমার সঙ্গী স্ত্রীলোকটিকে বলিলাম, 'আল্লাহ্র কসম! আমি কিছুই শিখি নাই এবং কিছুই জানি না। তাহারা আমাকে কিছুই শিখায় নাই।'

সে বলিল–'না; না; তোমার শেখা হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে তুমি যাহা ঘটাইতে চাহিবে, তাহাই ঘটিবে। লও এই গমের দানাটি লও। উহাকে লইয়া বপন কর।' আমি উহা তাহার নিকট হইতে লইয়া বপন করিলাম। অতঃপর বলিলাম, 'মাটি হইতে ফুঁড়িয়া বাহির হও।' উহা তাহাই করিল। আমি বলিলাম, 'পাতা ছাড়াও।' উহা তাহাই করিল। আমি বলিলাম, 'পাকিয়া যাও।' উহা তাহাই করিল। আমি বলিলাম, 'শুকাইয়া যাও।' উহা তাহাই করিল। আমি বলিলাম, 'পিষিয়া আটা হইয়া যাও।' উহা তাহাই হইয়া গেল। আমি বলিলাম, 'রুটি হইয়া যাও।' উহা তাহাই হইয়া গেল। আমি যখন দেখিলাম যে, আমি যাহা ঘটাইতে চাই তাহাই ঘটিয়া যায়, তখন আমি লজ্জিত ও চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলাম। হে উম্মুল মু'মিনীন! আল্লাহ্র কসম! আমি উক্ত যাদু আর প্রয়োগ করি নাই এবং করিবও না।'

উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম ইব্ন আবূ হাতিমও উপরোক্ত রাবী রবী' ইব্ন সুলায়মান হইতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহার রিওয়ায়েতে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত কথাগুলি উল্লেখিত রহিয়াছে ঃ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন–অতঃপর উক্ত স্ত্রীলোকটি সাহাবীদের নিকট তাহার সমস্যার সমাধান প্রার্থনা করিল। নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর তখন বেশী দিন অতিবাহিত হয় নাই। বিপুল সংখ্যক সাহাবী তখন মদীনায় উপস্থিত। কিন্তু, তাঁহারা তাহাকে কি সমাধান দিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। তাঁহারা সকলে এই ভয়ে ভীত ছিল যে, তাহারা কোন ফতোয়া দিলে উহা ভ্রান্তও হইতে পারে। তবে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) অথবা তাহার কোন এক সহচর স্ত্রীলোকটিকে বলিয়াছিল–'আহা। তোমার মাতা-পিতা অথবা উভয়ের একজন যদি জীবিত থাকিত!'

উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী হিশাম বলেন–'আমাদের অবস্থা এই যে, স্ত্রীলোকটি আমাদের নিকট আসিয়া ফতোয়া প্রার্থনা করিলে আমরা যামীন হইয়া তাহাকে ফতোয়া দিতাম।' রাবী ইব্ন আবূয-যানাদ বলেন, হিশাম বলিতেন–'সাহাবীগণ ছিলেন আল্লাহর ভয়ে ভীত। তাঁহাদের মধ্যে ছিল তাকওয়া ও পরহেযগারী। আমাদের নিকট অনুরূপ কোন মহিলা আসিয়া ফতোয়া প্রার্থনা করিলে আমরা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ না জানিয়া না বুঝিয়া অনুমানের ভিত্তিতে ফতোয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতাম।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ্।

যাদুর প্রভাব

যাদুর ক্ষমতা কতটুকু? এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, যাদু প্রকৃতই এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে পরিবর্তিত করিয়া দিতে পারে। তাহারা হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েতটিকে নিজেদের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন। উক্ত রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, যাদুকর মহিলাটি একটি গমের কণাকে বপন করিয়া যাদুর সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে গাছ ও ফল উৎপন্ন করিয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, বস্তুকে প্রকৃতই পরিবর্তিত করিয়া দিবার ক্ষমতা যাদুর মধ্যে রহিয়াছে।

আরেকদল বিশেষজ্ঞ বলেন–'এক বস্তুকে প্রকৃতই অন্য বস্তুতে পরিবর্তিত করিয়া দিবার ক্ষমতা যাদুর মধ্যে নাই। যাদু শুধু দৃষ্টি বিভ্রম, শ্রুতি বিভ্রম ইত্যাদি ঘটাইয়া দর্শক, শ্রোতা ইত্যাদির মনে এক বস্তুকে অন্য বস্তু হিসাবে প্রতীয়মান করিতে পারে। ইহাতে দর্শক, শ্রোতা ইত্যাদি ব্যক্তি শুধু এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে কল্পনা করে, যাদুর কারণে তাহারা ভ্রান্ত ধারণায় এক বস্তু অন্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয়। বস্তুত, যাদুর কারণে বস্তুর ধর্ম ও প্রকৃতিতে কোনরূপ পরিবর্তন আসে না, আসিতে পারে না।' তাহারা কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়কে নিজেদের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতিপক্ষ যাদুকরদের যাদুর বর্ণনা প্রদান প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ

سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ তাহারা (যাদুকররা) লোকদের চক্ষুকে বিভ্রান্ত করিয়া দিল এবং তাহাদিগকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া দিল। আর তাহারা মহা এক যাদু উপস্থাপিত করিল।

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى অর্থাৎ তাহাদের যাদুর কারণে তাহারা (মূসার) নিকট প্রতীয়মান হইতেছিল যে, উহা (যাদুকরদের নিক্ষিপ্ত সর্প সদৃশ বস্তু) দৌড়াইতেছে।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বস্তুর ধর্ম ও প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন আনিবার কোন ক্ষমাত যাদুর মধ্যে নাই। উহা শুধু মানুষের খেয়াল ও ধারণার মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া তাহার নিকট এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান করিবার ক্ষমতা রাখে।

একদল তাফসীরকার বলেন–কুরআন মজীদে উল্লিখিত বাবিল শহরটি দীনাওয়ান্দ (دیناوند)'রাজ্যে অবস্থিত বাবিল নহে, বরং উহা ইরাকে অবস্থিত বাবিল। সুদ্দী প্রমুখ তাফসীরকার উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহারা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি পেশ করেন। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়েত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, উক্ত বাবিল শহরটি ইরাকে অবস্থিত বাবিল। আবূ সালেহ গিফারী হইতে ধারাবাহিকভাবে আম্মার ইব্ন সা'দ মুরাদী, ইব্ন লাহীআ ও ইয়াহিয়া ইব্ন আযহার, ইব্ন ওয়াহাব, আহমদ ইব্ন সালেহ, আলী ইব্ন হুসাইন ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ সালেহ গিফারী বলেন ঃ

'একদা হযরত আলী (রা) সফরের অবস্থায় বাবিল শহরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। এই সময়ে মুয়ায্যিন আসিয়া তাঁহাকে আসরের নামাযের ওয়াক্ত হইবার কথা জানাইল। তিনি তথায় নামায আদায় না করিয়া শহর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর মুয়ায্যিনকে নামাযের ইকামত দিতে নির্দেশ দিলেন এবং শহরের বাহিরে নামায আদায় করিলেন। নামায শেষ করিয়া বলিলেন–আমার হাবীব নবী করীম (সা) আমাকে কবরস্থানে ও বাবিল শহরে নামায আদায় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বাবিল শহরে নামায আদায় করিতে নিষেধ করিবার কারণ এই যে, উহা একটি অভিশপ্ত শহর।'

আবূ সালেহ গিফারী হইতে ধারাবাহিকভাবে আম্মার ইব্ন সা'দ মুরাদী, ইব্ন ওয়াহাব, ইয়াহিয়া ইব্ন আযহার, সুলায়মান ইব্ন দাঊদ ও ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'একদা সফরের অবস্থায় হযরত আলী (রা) বাবিল শহরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। এক সময়ে মুয়ায্যিন আসিয়া তাঁহাকে আসরের নামাযের ওয়াক্ত হইবার কথা জানাইল। তিনি

তথায় নামায আদায় না করিয়া শহর অতিক্রম করিয়া গেলেন। অতঃপর মুয়ায্যিনকে নামাযের ইকামত দিতে বলিলেন এবং শহরের বাহিরে নামায আদায় করিলেন। নামায শেষ করিয়া বলিলেন—আমার হাবীব নবী করীম (সা) আমাকে কবরস্থানে এবং বাবিল শহরে নামায আদায় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বাবিল শহরে নামায আদায় করিতে নিষেধ করিবার কারণ এই যে, উহা একটি লা'নতপ্রাপ্ত শহর।'

আবূ সালেহ গিফারী হইতে ধারাবাহিকভাবে হাজ্জাজ ইব্ন শাদ্দাদ, ইয়াহিয়া ইব্ন আযহার ও ইব্ন লাহীআ, ইব্ন ওয়াহাব, আহমদ ইব্ন সালেহ ও ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন দাউদ হইতে বর্ণিত পূর্বোক্ত রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম আবূ দাউদের নিকট গ্রহণযোগ্য। কারণ, তিনি উহা বর্ণনা করিবার পর উহার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনরূপ মন্তব্য করেন নাই। উক্ত রিওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাবিল শহরে নামায আদায় করা মাকরূহ; যেমন মাকরূহ ছামূদ জাতির আবাস ভূমিতে নামায আদায় করা। উল্লেখ্য যে, নবী করীম (সা) ছামূদ জাতির আবাস ভূমিতে প্রবেশ করিতে হইলে ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবেশ করিতে আদেশ দিয়াছেন।

ভূগোল শাস্ত্রবিদগণ বলেন ঃ আটলান্টিক মহাসাগর হইতে ইরাকে অবস্থিত ব্যাবিলন শহরের দূরত্ব হইতেছে সত্তর ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ। পক্ষান্তরে বিষুব রেখা হইতে উহার দূরত্ব হইতেছে, বত্রিশ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ "আর তাহারা দুইজনে এই কথা না বলিয়া কাহাকেও শিক্ষা দিত না যে, 'আমরা পরীক্ষা করার জন্য আসিয়াছি। অতএব, তুমি কুফর করিও না।"

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কায়স ইব্ন উব্বাদ, রবী ইব্ন আনাস ও আবূ জা'ফর রাযী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'আল্লাহ্ তা'আলা যাদুর সহিত দুইজন ফেরেশতাকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি মানুষকে তাহাদের নিকট হইতে যাদু শিখিবার সুযোগ দিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিবার পূর্বে তিনি তাহাদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তাহারা এই কথা না বলিয়া কাহাকেও যাদু শিক্ষা দিবে না যে, আমরা পরীক্ষার মাধ্যম বৈ কিছু নহি; অতএব তুমি কুফরী করিও না (অর্থাৎ যাদু শিখিও না)। উক্ত রিওয়ায়েতটি হাসান বসরী হইতে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তাহারা এই কথা না বলিয়া কাহাকেও যাদু শিক্ষা দিবে না যে, 'আমরা পরীক্ষার মাধ্যম বৈ কিছু নহি; অতএব তুমি কুফরী করিও না।'

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সুদ্দী বলেন—'তাহাদের নিকট কেহ যাদু শিখিতে আসিলে তাহারা তাহাকে এই উপদেশ দিতেন—'তুমি কুফরী করিও না। আমরা পরীক্ষার মাধ্যম বৈ কিছু নহি।' সে তাহাদের উক্ত উপদেশ মানিতে অসম্মতি জানাইলে তাহারা তাহাকে একটি ছাই-এর গাদা দেখাইয়া বলিতেন—'এই ছাইয়ের গাদায় পেশাব কর।' সে উহাতে পেশাব করিলে তাহারা মধ্য হইতে একটি নূর বা জ্যোতি বাহির হইয়া আকাশে উধাও হইয়া যাইত। উক্ত নূর বা জ্যোতি হইতেছে তাহার ঈমান। অতঃপর ধোঁয়ার ন্যায় কালো একটি পদার্থ তাহার

Contents

কান ও অন্যান্য ছিদ্র দিয়া তাহার দেহে প্রবেশ করিত। উক্ত পদার্থটি হইতেছে আল্লাহর গযব। সে পেশাব করিয়া আসিয়া তাহাদিগকে উহা জানাইলে তাহারা তাহাকে যাদু শিক্ষা দিত।'

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জুরায়জ হইতে ধারাবাহিকভাবে হাজ্জাজ ও সুনায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাফির ছাড়া অন্য কেহ যাদু শিখিবার সাহস করিতে পারে না।

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلاَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লেখিত فتنة শব্দের অর্থ হইতেছে পরীক্ষা।

কবি বলেন ঃ

وقد فتن الناس فى دينهم

وخلى ابن عفان شرا طويلا

'আর লোকেরা নিজেদের দীনের বিষয়ে পরীক্ষায় পতিত হইল। তাহারা হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে কঠিন বিপদে একাকী ছাড়িয়া দিল।'

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর কথাকে উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন ঃ

اِنْ هِىَ اِلاَّ فِتْنَتُكَ "উহা তোমার পরীক্ষা ভিন্ন অন্য কিছু নহে।"

উপরোক্ত দুইটি দৃষ্টান্তের একটিতে فتنة শব্দটি এবং অন্যটিতে উহার সমধাতুজ ক্রিয়াটি যথাক্রমে 'পরীক্ষা' ও 'পরীক্ষা করা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা কেহ কেহ প্রমাণিত করেন যে, 'যাদু শিক্ষা করা কুফর।' যে ব্যক্তি যাদু শিখে সে কাফির। তাহারা নিম্নোক্ত হাদীসকেও নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে পেশ করেন ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাম, ইবরাহীম, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও হাফিজ আবূ বকর আল বায্‌যার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ (রা) বলেন—'যে ব্যক্তি গণকের কাছে অথবা যাদুকরের কাছে যায় এবং গণক বা যাদুকর যাহা বলে তাহা বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার প্রতি কুফরী করে।' উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। উহার সমার্থক একাধিক হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে।

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ অর্থাৎ, 'লোকেরা হারূত ও মারূতের নিকট হইতে এইরূপ যাদু শিখিত যাহা দ্বারা তাহারা অসৎ ও অন্যায় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে পারে। তাহারা যে যাদু শিখিত, উহা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট করিয়া দিয়া উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিত।' বলাবাহুল্য, ইহা শয়তানের কাজ। হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তালহা ইব্‌ন নাফে', আবূ সুফিয়ান ও আ'মাশ প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ শয়তান পানির উপর সিংহাসন স্থাপন করিয়া স্বীয় অনুচরদিগকে লোকদের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকে। তাহার যে অনুচরটি লোকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার কার্যে অধিকতর সাফল্য অর্জন করিতে পারে, সে তাহার নিকট অধিকতর প্রিয় ও স্নেহভাজন হইয়া থাকে। একজন অনুচর আসিয়া তাহাকে জানায়, 'আমি অমুক লোকটির পিছনে লাগিয়া তাহাকে দিয়া

এই (অশ্লীল) কথা বলাইয়া ছাড়িয়াছি।' শয়তান তাহাকে বলে, 'তুমি কিছুই কর নাই।' আরেকজন অনুচর আসিয়া তাহাকে জানায়, আমি অমুক লোকটির পিছনে লাগিয়া তাহার ও তাহার আপনজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছি। ইহা শুনিয়া শয়তান তাহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট হয়। সে তাহাকে বলে, হ্যাঁ, তুমি একটি কাজের মত কাজ করিয়াছ।'

যাদুর সাহায্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবনিবনা ও বিচ্ছেদ ঘটানো হয় কিরূপে? যাদুর সাহায্যে স্বামী বা স্ত্রীর নজরে স্ত্রী বা স্বামীকে কুৎসিত প্রতীয়মান করা হয়। অথবা একজনের মনে অন্যজনের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হয়। ফলে তাহাদের মধ্যে অবনিবনা ও বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়।

শব্দার্থ ঃ اَلْمَرْءُ। অর্থাৎ পুরুষ লোক। উহার বিপরীত লিঙ্গের শব্দ হইতেছে اِمْرَأَةٌ। অর্থাৎ স্ত্রীলোক। উহাদের প্রত্যেকটি হইতে দ্বিবচন শব্দ (تَثْنِيَةٌ) গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু, উহাদের কোনটি হইতে বহুবচন শব্দ গঠিত হয় না। আল্লাহ্‌ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ 'আর তাহারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনক্রমে কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিত না।'

সুফিয়ান ছাওরী বলেন ঃ بِاِذْنِ اللّٰهِ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীর অনুসারে।'

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন– بِاِذْنِ اللّٰهِ। অর্থাৎ যাদুকর ও তাহার উদ্দেশ্যের মাঝে অবস্থিত প্রতিবন্ধকতাকে আল্লাহ্ তা'আলা দূর করিয়া দিবার কারণে।'

হাসান বসরী উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে চাহিতেন, তাহাকে যাদুর সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্যে যাদুকরকে ক্ষমতা দিতেন এবং যাহাকে চাহিতেন না, তাহাকে উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্যে যাদুকরকে ক্ষমতা দিতেন না। যাদুকররা যাহা করিত, তাহা আল্লাহ্‌র ক্ষমতা প্রদানের কারণেই করিত। আল্লাহ্‌র ক্ষমতা প্রদান ব্যতিরেকে তাহারা কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিত না।' অন্য এক বর্ণনা অনুসারে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী বলেন ঃ 'যাহারা যাদু শিখিত, উহা তাহাদিগকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিত না।'

وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ অর্থাৎ যাহারা যাদু শিখিত, উহা তাহাদের দীনকে ধ্বংস করিয়া দিয়া তাহাদিগকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিত। উহা তাহাদের যে উপকারে আসিত ক্ষতির তুলনায় তাহা কিছুই নহে।

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ অর্থাৎ যে সকল ইয়াহুদী নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান না আনিয়া তৎপরিবর্তে তাঁহার বিরুদ্ধে যাদু প্রয়োগ করিয়াছে, তাহাদের জন্যে যে আখিরাতের নিআমতের কোন অংশ নির্ধারিত নাই, তাহা তাহারা বেশ ভালরূপেই জানে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ এবং সুদ্দী বলেন–خَلاَقٍ অর্থাৎ, অংশ, হিস্‌সা।' কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ। অর্থাৎ তাহার জন্যে আখিরাতে আল্লাহ্‌র নিকট (বাঁচিবার) কোন পথ নাই।'

আব্দুর রায্যাক এবং হাসান বসরী বলেন– مَا لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ অর্থাৎ 'তাহার জন্যে আখিরাতে কোন দীন নাই।' কাতাদাহ হইতে সা'দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ مَا لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ অর্থাৎ 'ইয়াহূদীদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা যে আদেশ, উপদেশ ও সতর্কীকরণ বাণী প্রদান করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহার জন্য আখিরাতে কোন দীন নাই।' কাতাদাহ হইতে সা'দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَا لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ অর্থাৎ ইয়াহূদীদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা যে আদেশ, উপদেশ ও সতর্কীকরণ বাণী প্রদান করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহারা জানে যে, যাদুকরের জন্যে আখিরাতের নিআমতের কোন অংশ বা হিস্সা নাই।'

وَلَبِئْسَ مَاشَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ط لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তাহারা ঈমান না আনিয়া তৎপরিবর্তে যে যাদুকে গ্রহণ করিয়াছে, উহা নিশ্চয় বড় নিকৃষ্ট জিনিস। আহা! তাহারা যদি বুঝিত।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ط لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তাহারা যাদুর পথ গ্রহণ না করিয়া যদি ঈমান আনিত এবং অন্যায় ও পাপ হইতে দূরে থাকিত, তবে উহা যাদুর পথ অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলময় হইত। আহা! তাহারা যদি বুঝিত।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ـ وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ الصّٰبِرُوْنَ ـ

'আর যাহারা জ্ঞানের অধিকারী তাহারা বলিল, ধ্বংসের দিকে যাইও না। যে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তাহার জন্যে আল্লাহ্ যে পুরস্কার রাখিয়া দিয়াছেন, উহা উত্তম। শুধু ধৈর্যশীল ব্যক্তিগণকেই ইহা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।'

যাদু শেখা কি কুফর? যাদুবিদ্যার শিক্ষা গ্রহণ করা কুফর কিনা এই বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। পূর্বযুগীয় একদল ফকীহ বলেন, 'যাদুকর ব্যক্তি কাফির।' ইমাম আহমদ হইতেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْ الى اخر الاية এই আয়াতকে নিজেদের অভিমতের পক্ষে পেশ করেন। উক্ত আয়াতে যাদুকরদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 'যদি তাহারা ঈমান আনিত।' উহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, যাদুকর ব্যক্তি মু'মিন নহে।

আরেকদল ফকীহ বলেন, যাদুকর ব্যক্তি কাফির নহে; তবে তাহার অপরাধ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য। যাদুকর ব্যক্তির শাস্তি হইতেছে মৃত্যুদণ্ড। তাহারা ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়েতকে নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে পেশ করেন ঃ

বাজালা ইব্ন আবাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার, সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনিয়া, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ বাজালা ইব্ন আবাদা বলেন, 'একদা হযরত উমর (রা) লিখিয়া পাঠাইলেন, 'তোমরা প্রতিটি পুরুষ যাদুকর ও নারী যাদুকরকে হত্যা করিও।' ইহাতে আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করিলাম।' ইমাম বুখারীও উক্ত রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহাও বর্ণিত রহিয়াছে যে, 'একদা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর একটি দাসী তাঁহার প্রতি যাদু প্রয়োগ করিল। তিনি তাহাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিলে তাহাকে হত্যা করা হইল।'

ইমাম আহমদ বলেন ঃ 'তিনজন সাহাবী হইতে সহীহ সনদে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তাহারা যাদুকরকে মৃত্যুদণ্ড দিবার পক্ষে ফতোয়া দিয়াছেন।'

'হযরত জুনদুব ইযদী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ও ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'যাদুকরের শাস্তি হইতেছে তরবারী, দ্বারা তাহার গর্দান কাটিয়া দেওয়া।'

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, উক্ত রিওয়ায়েতে উপরোক্ত মাধ্যম ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। উহার অন্যতম রাবী ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম একজন দুর্বল রাবী। উক্ত রিওয়ায়েতটি প্রকৃতপক্ষে হযরত জুনদুব ইযদী (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে তাঁহার নিকট হইতে হাসান কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, ইমাম তাবারানী উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে হযরত জুনদুব ইযদী (রা) হইতে হাসান ও ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম ভিন্ন অন্য রাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

একাধিক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত রহিয়াছে যে, ওলীদ ইব্ন উকবার নিকট একজন যাদুকর ছিল। সে তাহাকে যাদুর খেলা দেখাইত। সে একটি লোকের মস্তককে কাটিয়া ধড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত। অতঃপর লোকটির নাম ধরিয়া ডাক দিত। তাহাতে তাহার মস্তক পুনরায় ধড়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া যাইত। দর্শকগণ সবিস্ময়ে বলিত, 'সুবহানাল্লাহ! এই লোকটি মৃতকে জীবিত করিতে পারে।'

একদা জনৈক নেককার মুহাজির তাহাকে (অর্থাৎ তাহার ভেল্কিবাজীকে) দেখিল। পরের দিন সে গোপনে একখানা তরবারী সঙ্গে লইয়া তাহার ভেল্কিবাজী দেখিতে আসিল। যাদুকর যাদু প্রদর্শন আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সে আকস্মিক হামলা চালাইয়া তাহাকে খতম করিয়া দিল। সে বলিল, সে যদি সত্যই মৃতকে জীবিত করিতে পারে, তবে নিজেকে জীবিত করুক। অতঃপর সে নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া শুনাইল ঃ

اَتَأْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ "তোমরা কি জানিয়া বুঝিয়া যাদুর কাছে আসিবে?"

মুহাজির লোকটি যেহেতু ওলীদ ইব্ন উকবার নিকট হইতে অনুমতি না লইয়া লোকটিকে হত্যা করিয়াছিল, তাই তিনি তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। অবশ্য, ওলীদ পরে তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হারিছা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ ইব্ন হাম্বল ও ইমাম আবূ বকর খুল্লাল বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'জনৈক আমীরের নিকট একজন খেলোয়াড় ছিল। সে তাহাকে খেলা দেখাইত। একদা হযরত জুনদুব (রা) তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল।' রাবী বলেন–'আমার মনে হয়, খেলোয়াড় লোকটি যাদুকর ছিল।'

উপরে যাদু ও যাদুকরের প্রতি হযরত উমর (রা) এবং হযরত হাফসা (রা)-এর যে আচরণ ও মনোভাব উল্লেখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ইমাম শাফেঈ (র) বলেন–'যে যাদু শিরক, তাহারা সেই যাদুর বিরুদ্ধে উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।' আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম আবূ আব্দিল্লাহ রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা যাদুর অস্তিত্বই স্বীকার করে না। তাহাদের কেহ কেহ যাদুর অস্তিত্ব স্বীকারকারী ব্যক্তিকে কাফির বলেন। কিন্তু আহলে সুন্নাত সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন, যাদুকর ব্যক্তি যাদুর সাহায্যে আকাশে উড়িতে পারে এবং মানুষকে গাধায় ও গাধাকে মানুষে রূপান্তরিত করিতে পারে।' তাহারা বলেন–'যাদুকর যখন তাহারা যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করিয়া দেন। উহা আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা সৃষ্টিতে নক্ষত্র বা আকাশের কোন হাত নাই। তাহাদের সৃষ্টির কোন ক্ষমতা নাই।' পক্ষান্তরে দার্শনিকগণ, জ্যোতিষীগণ এবং নাস্তিকগণ বলেন–'নক্ষত্র ও আকাশের সৃষ্টি ক্ষমতা রহিয়াছে। তাহারা বস্তুকে সৃষ্টি করিয়া থাকে।'

আহলে সুন্নাত সম্প্রদায় স্বীয় দাবীর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতাংশকে পেশ করেন ঃ

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ 'আর তাহারা (যাদুকরেরা) উহার (যাদুর) সাহায্যে আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে না।'

উক্ত আয়াতাংশে একাধারে যাদুর অস্তিত্ব এবং উহার দ্বারা একমাত্র আল্লাহ্ কর্তৃক বস্তুর মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এইরূপ রিওয়ায়েতও বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা নবী করীম (সা)-এর প্রতি যাদু প্রয়োগ করা হইয়াছিল। উহা তাঁহার দেহে প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করিয়াছিল।

তাহা ছাড়া হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত ব্যবিলন শহর হইতে আগত যাদুবিদ্যা গ্রহণকারিণী স্ত্রীলোকটির ঘটনাও এই স্থলে স্মরণযোগ্য।

এতভিন্ন যাদুর অস্তিত্বের প্রমাণ বাহক যে বিপুল সংখ্যক ঘটনা বিবৃত হইয়া থাকে, তাহাও এই স্থলে স্মরণযোগ্য।

অতঃপর ইমাম রাযী বলেন–'যাদু শিক্ষা করা অন্যায় বা অসঙ্গত নহে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে একমত যে, যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা অন্যায় বা অসঙ্গত নহে। কারণ, বিদ্যা সে যে বিদ্যাই হউক না কেন, মূলত একটি সম্মানীয় ও গৌরবময় জিনিস।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ "তুমি বল, যাহারা জ্ঞানের অধিকারী, তাহারা আর যাহারা জ্ঞান হইতে বঞ্চিত, তাহারা এই উভয় শ্রেণী কি পরস্পর সমকক্ষ হইতে পারে?"

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইলম, জ্ঞান ও বিদ্যার উচ্চ মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানের মাহাত্ম্যের বর্ণনায় তিনি নির্দিষ্ট কোন জ্ঞানকে উল্লেখ করেন নাই, বরং সকল জ্ঞানের মাহাত্ম্যকে বর্ণনা করিয়াছেন।

যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা শুধু জায়েযই নহে; বরং ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ্র নবীর মু'জিযাকে সঠিকভাবে চেনা প্রত্যেক মানুষের জন্যে ওয়াজিব ও জরুরী! আল্লাহ্র নবীর মু'জিযাকে সঠিকভাবে চিনিতে হইলে মু'জিযা ও যাদু এই উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যকে ভালরূপে জানিতে

হইবে। উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যকে ভালরূপে জানিতে হইলে উভয়ের প্রত্যেকটিকে ভালরূপে জানিতে হইবে। এইরূপে যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক মানুষের জন্যে ওয়াজিব ও জরুরী।'

ইমাম রাযীর উপরোক্ত অভিমতের বিরুদ্ধে বলিবার মত কয়েকটি কথা রহিয়াছে। যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা অন্যায় বা অসঙ্গত নহে, এই কথা দ্বারা ইমাম রাযী যদি বুঝাইতে চাহিয়া থাকেন যে, 'যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা যুক্তির দিক দিয়া অন্যায় বা অসঙ্গত নহে, তবে মু'তাযিলা সম্প্রদায়কে তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করা যথেষ্ট। কারণ, যুক্তিবাদী মু'তাযিলা সম্প্রদায় যাদুর অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা শিক্ষা করিবার প্রশ্নই আসে না। অতএব, ইমাম রাযীর উপরোক্ত অভিমত যুক্তির ধোপে টিকে না।

ইমাম রাযী যদি স্বীয় বাক্য দ্বারা এই কথা বুঝাইতে চাহিয়া থাকেন যে, যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা শরীআতে নিষিদ্ধ ও অবৈধ নহে, তবে তাহার সম্মুখে নিম্নোক্ত আয়াত উপস্থাপন করা যায় :

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ - وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ الى اخر الاية -

উক্ত আয়াতে যাদুর নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : 'যে ব্যক্তি গণক বা জ্যোতিষীর নিকট গমন করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি কুফরী করে।'

'সুনান' শ্রেণীর হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে : যে ব্যক্তি সূতায় গিরা দিয়া উহাতে ফুঁক দেয়, সে ব্যক্তি যাদু করে।

ইমাম রাযী দাবী করিয়াছেন : 'বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ (المحققون) এই বিষয়ে একমত যে, যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা অন্যায় বা অসঙ্গত নহে।' অথচ কোন বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সকলে অথবা তাহাদের অধিকাংশ ঐকমত্য প্রকাশ করিলে বলা যায়, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অমুক বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন, অনথায় নহে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অথবা তাহাদের অধিকাংশ কোথায় ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছেন?

ইমাম রাযী যাদুবিদ্যাকে মহতী বিদ্যা বলিবার পক্ষে যে আয়াতটি পেশ করিয়াছেন, উহাতে যাবতীয় ইলম ও বিদ্যার প্রশংসা বর্ণিত হয় নাই; বরং উহাতে শুধু দীন ইসলামের প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম রাযী বলিয়াছেন, 'যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা ছাড়া মু'জিযা ও যাদুর মধ্যকার পার্থক্যকে জানা সম্ভবপর নহে।' তাঁহার উক্ত উক্তিটি ভ্রান্ত। নবী করীম (সা)-এর প্রধান মু'জিষা হইতেছে কুরআন মজীদ। সকলেই জানেন যে, যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা ছাড়াই কুরআন মজীদ ও যাদুর মধ্যকার পার্থক্য বুঝা সম্পূর্ণ সম্ভবপর। কুরআন মজীদ যে একটি মু'জিষা, ইহা বুঝিবার জন্যে যাদুবিদ্যা শিখিবার কোন প্রয়োজন হয় না। সাহাবীগণ, তাবেঈগণ এবং অন্যান্য কোটি কোটি মুসলমান যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা ছাড়াই বুঝিতে সক্ষম ছিলেন এবং আছেন যে, কুরআন মজীদ একটি মহা মু'জিযা। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

অতঃপর ইমাম রাযী বলিয়াছেন–যাদুকে আট প্রকারে বিভক্ত করা যায় ঃ

প্রথম প্রকার ঃ প্রথম প্রকারের যাদু হইতেছে নক্ষত্র পূজারীদের যাদু। নক্ষত্র পূজারীরা সূর্যের চতুষ্পার্শে ঘূর্ণায়মান সাতটি নক্ষত্রকে পূজা করিত। তাহারা বিশ্বাস করিত–'উক্ত নক্ষত্রগুলি মহাবিশ্বের নিয়ন্তা; উহারাই মঙ্গল-অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকে।' হযরত ইবরাহীম (আ) যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা এই নক্ষত্রপূজারী জাতি ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাহাদের হিদায়েতের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের যুক্তি খণ্ডণ করত তাহাদিগকে নিরুত্তর করিয়া দিয়াছিলেন।

السر المكتوم فى مخاطبة الشمس والنجوم। (সূর্য ও নক্ষত্ররাজির প্রতি সম্বোধন সম্পর্কিত গূঢ় রহস্য) নামক একটি পুস্তকে অতি সূক্ষ্মভাবে উপরোক্ত নক্ষত্র পূজারীদের পরিচয় বর্ণনা করা হইয়াছে। পুস্তকটি ইমাম রাযীই প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। নক্ষত্রপূজারীরা কিরূপে, কোন পথে, কোন্ প্রক্রিয়ায় কোন্ নক্ষত্রকে সম্বোধন করিয়া স্বীয় আবেদন-নিবেদন জানায়, তাহা উক্ত পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে তাহাদের আকীদা–বিশ্বাস, কার্যকলাপ, লেবাস-পোশাক ইত্যাদিও বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন–'ইমাম রাযী পরবর্তীকালে ঐ সকল বিষয় হইতে তওবা করিয়াছিলেন।' আবার কেহ কেহ বলেন–'ইমাম রাযী তওবা করিবেন কেন? তিনি কি উহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন? তিনি শুধু নক্ষত্রপূজারীদের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া তাহাদের আকীদা বিশ্বাস, কার্যকলাপ ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত আকীদা বিশ্বাস, কার্যকলাপ ইত্যাদিকে তিনি গ্রহণ করেন নাই।'

দ্বিতীয় প্রকার ঃ দ্বিতীয় প্রকারের যাদু হইতেছে–যাহারা স্বীয় আত্মার দৃঢ়তার সাহায্যে অপরের অন্তরকে প্রভাবান্বিত করে, তাহাদের যাদু। ইমাম রাযী বলেন–'মানুষের মনের বিশ্বাস ও ধারণা তাহার দেহ ও দৈহিক আবস্থাকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। একটি লোক বিস্তৃত ভূমির উপর শায়িত একটি কাষ্ঠ দণ্ডের উপর দিয়া সহজেই হাঁটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু, সেই কাষ্ঠ দণ্ডটি নদীর উপর সাঁকো হিসাবে স্থাপিত হইলে সেই ব্যক্তিই উহার উপর দিয়া নদী পার হইতে অপারগ হয়। এইরূপ কেন হয়? এইরূপ হইবার কারণ এই যে, কাষ্ঠ দণ্ডের উপর দিয়া পথ অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির মনে দুই অবস্থায় দুই রূপ ধারণা বর্তমান থাকে। প্রত্যেকটি ধারণা তাহার দেহ ও দৈহিক কার্যের উপর স্বতন্ত্র প্রভাব বিস্তার করে। ইমাম রাযী আরও বলেন– ' শরীর বিজ্ঞানীগণ এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, নাসিকা হইতে রক্ত ঝরা রোগের রোগীর পক্ষে লোহিত বস্তুর দিকে তাকানো ক্ষতিকর। তেমনি মৃগী রোগাক্রান্তের জন্য অতিশয় উজ্জ্বল অথবা ঘূর্ণায়মান বস্তুর প্রতি তাকানো ক্ষতিকর। উহার কারণ ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে যে, মানুষের অন্তরের ধারণা তাহার শরীর ও শারীরিক অবস্থার উপর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকে।'

ইমাম রাযী আরও বলেন–'বিজ্ঞানীগণ এই বিষয়ে একমত যে, নজর লাগা (অর্থাৎ কোন বস্তুর প্রতি কাহারো কুদৃষ্টি পড়িবার কারণে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া) একটি বাস্তব ও প্রকৃত বিষয়।' ইমাম রাযীর উক্ত অভিমতের সমর্থনে নিম্নোক্ত সহীহ হাদীসটি পেশ করা যায় ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'নজর লাগা বাস্তব ও সত্য বিষয়। তকদীর যদি পরিবর্তিত হইত, তবে নজর লাগিবার কারণেই পরিবর্তিত হইত।'

অতঃপর ইমাম রাযী বলেন–'উপরোক্ত কথাগুলির প্রেক্ষিতে বলা যায়, মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবার কার্যে কোন কোন যাদুকরের আত্মা জড় উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। আবার কোন কোন যাদুকরের আত্মা উহার সাহায্য গ্রহণ করা ব্যতিরেকেই তাহার মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে। যে সকল যাদুকরের আত্মা অতিশয় শক্তিশালী, তাহারা জড় উপকরণের সাহায্য ছাড়াই স্বীয় কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে সকল যাদুকরের আত্মা অতিশয় শক্তিশালী নহে, তাহারা স্বীয় কার্য সম্পাদন করিতে জড় উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। আত্মা কখন শক্তিশালী এবং কখন দুর্বল হইয়া থাকে? আত্মা যখন দেহের উপর প্রভুত্ব ও আধিপত্য করিবার ক্ষমতা অর্জন করে এবং উক্ত ক্ষমতাকে উহার উপর প্রয়োগ করে, তখন উহা শক্তিশালী হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আত্মা যতক্ষণ উপরোক্ত ক্ষমতা অর্জন করিতে সমর্থ না হয়, ততক্ষণ উহা দুর্বল থাকে। মনে রাখিতে হইবে, দুর্বল আত্মার নিজের দেহের বাহিরে কোনরূপ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকে না। আত্মা কিসে উপরোক্ত ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে? আত্মা কম খাদ্য খাইয়া এবং মানুষের সহিত কম মেলামেশা করিয়া উপরোক্ত ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, শক্তিশালী আত্মা দেহ ও অন্যান্য জড় পদার্থের সহিত যতটুকু সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রাখে, তদপেক্ষা অধিকতর সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রাখে আত্মিক জগতের আত্মাসমূহের সহিত। শক্তিশালী আত্মা যেন আত্মিক জগতের অধিবাসী আত্মা। তাহা উহা জড় জগতের উপর অধিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে থাকে।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–'ইমাম রাযী এই স্থলে যে যাদুকে বুঝাইতে চাহিতেছেন, উহা হইতেছে আত্মার এক 'বিশেষ অবস্থা' দ্বারা অপরের উপর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা। উক্ত বিশেষ অবস্থার দুইটি শ্রেণী রহিয়াছে।

প্রথম শ্রেণী ঃ এই অবস্থাটি শরীআত সম্মত অবস্থা। উহা আল্লাহ্র ওলীর আত্মার মধ্যে সৃষ্টি হইয়া থাকে। উহা দ্বারা সে অপরের মনে বদ কাজ হইতে বিরত থাকিবার এবং নেক কাজ করিবার অনুকূল প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ইহা উম্মতে-মুহাম্মদিয়ার ওলী আল্লাহ্গণের কারামাত। উহা আল্লাহ্র নি'আমাত।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ এই অবস্থাটি শরীআত বিরোধী অবস্থা। উহা আল্লাহ্র শত্রুর মধ্যে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

কোন ব্যক্তির শেষোক্ত অবস্থার অধিকারী হওয়া আল্লাহর নিকট তাহার প্রিয় হইবার লক্ষণ বা প্রমাণ নহে। বিপুল সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দাজ্জাল অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হইবে; তথাপি সে আল্লাহ্র শত্রু। তাহার উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হউক। মোটকথা এই যে, আল্লাহ্র নাফরমানী করিয়া কেহ তাঁহার ওলী হইতে পারে না। সে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হইলেও না।

ইমাম রাযী যদিও উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর অবস্থাকে যাদুর অন্তর্গত করিয়াছেন, তথাপি শরীআতের পরিভাষায় উহাদের প্রথম অবস্থাকে যাদু বলা হয় না। শরীআতের পরিভাষায় উহা 'কারামাত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় প্রকার ঃ তৃতীয় প্রকারের যাদু হইতেছে পৃথিবীতে বসবাসকারী আত্মার সাহায্যে সম্পাদিত কার্যাবলী। উক্ত আত্মা হইতেছে জ্বিন। জ্বিন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত রহিয়াছে ঃ মু'মিন

জ্বিন ও কাফির জ্বিন। কাফির জ্বিনই শয়তান নামে পরিচিত। আকাশের অধিবাসী আত্মার (আল্লাহ্, ফেরেশতা ও দেহত্যাগী মানবাত্মার) সহিত সংযোগ স্থাপন করা মানুষের পক্ষে যত সহজ, পৃথিবীর অধিবাসী আত্মার (জ্বিনের) সহিত সংযোগ স্থাপন করা তাহার পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর সহজ। কারণ, পৃথিবীর অধিবাসী আত্মার সহিত তাহার সাদৃশ্য ও নৈকট্য অধিকতর।

মু'তাযিলা সম্প্রদায় এবং দার্শনিক সম্প্রদায় অবশ্য পৃথিবীবাসী আত্মার (জ্বিনের) অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

পৃথিবীবাসী আত্মার সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে হইলে মানুষকে কোন না কোন আমল করিতে হয়? অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন–'মন্ত্র-তন্ত্র, ধুয়া, বিলাস-ব্যসন পরিত্যাগ, নির্জনতা ইত্যাদি কতগুলি সহজ প্রক্রিয়ায় মানুষ পৃথিবীবাসী আত্মার সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারে।' এই প্রকারের যাদু عمل التسخير (বশীকরণ প্রক্রিয়া) ও العزائم (হিপনোটিজম) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

চতুর্থ প্রকার ঃ চতুর্থ প্রকারের যাদু হইতেছে দৃষ্টি বিভ্রমমূলক যাদু! এই প্রকারের যাদুতে যাদুকর ব্যক্তি দর্শকের চক্ষুকে ফাঁকি দিয়া তাহার দৃষ্টির সম্মুখে একটি ঘটনাকে আরেকটি ঘটনারূপে প্রতীয়মান করে। এই প্রকারের যাদুতে যাদুকর দর্শকের দৃষ্টিকে বিশেষ একটি দৃশ্যের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া রাখে। এই বিশেষ দৃশ্যটি যাদুকর নিজের কার্য দ্বারাই সৃষ্টি করে। বলা অনাবশ্যক যে, তাহার এই কার্যটি দর্শকের অনুভূতিতে চমক লাগাইবার মত না হইলে উহা তাহার দৃষ্টিতে নিজের প্রতি নিবদ্ধ রাখিতে পারে না। এইরূপে যাদুকর যখন দেখে যে, তাহার দর্শকের দৃষ্টি ও মনোযোগ অন্য সকল বিষয় হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন সে তাহার দৃষ্টির আড়ালে ত্বরিত গতিতে অন্য একটি ঘটনা ঘটাইয়া শুধু উহার পরিণতিটুকু তাহার সম্মুখে উপস্থাপন করে। কার্যটি যেহেতু দর্শকের দৃষ্টির আড়ালে ঘটিয়া যায়, তাই সে উহার পরিণতি দেখিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া যায়। কারণ না দেখিয়া শুধু কার্যটি দেখিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে এবং ঘটা স্বাভাবিকও। আবার যাদুকর কখনও কখনও দর্শকের সম্মুখে দৃশ্যমান কোন ঘটনাকেই তাহার কার্যের কারণ হিসাবে দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করে। ইহাতে সে অধিক বিস্মিত হয়। বস্তুত যাহা দেখিয়া দর্শক বিস্ময়াভিভূত হইয়া গিয়াছে, সে উহার কারণ স্বরূপ পূর্ববর্তী ঘটনাটি দেখিতে পাইলে মোটেই বিস্মিত হইত না। প্রকৃতপক্ষে উহা যাদুকরের হাত সাফাই ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যাদুকর অপরূপ কৌশলে দর্শকের চক্ষুকে প্রতারিত করিয়া কোন দৃশ্যমান কার্যের পূর্ববর্তী কারণকে অদৃশ্যে ত্বরিত গতিতে সম্পন্ন করিয়া ফেলে বলিয়া উহা দর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদন এবং যাদু বলিয়া পরিচিত হয়। অধিক উজ্জ্বল স্থানে অথবা স্বল্প আলোকিত অন্ধকারময় স্থানে যাদুকরের অবস্থান দর্শকের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করিবার কার্যে যাদুকরকে সাহায্য করিয়া থাকে। অধিক আলো দর্শকের দৃষ্টিকে ঝাপসা করিয়া দেয়। আবার আলোর স্বল্পতা তাহাকে প্রকৃত ঘটনা ধরিয়া ফেলিতে বাধা দেয়।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি–একদল তাফসীরকার বলেন, 'ফিরাউনের সম্মুখে হযরত মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে প্রদর্শিত যাদু উপরোক্ত শ্রেণীর যাদু ছিল। যাদুকরদের যাদুর সাপ প্রকৃতপক্ষে দৌড়াইতেছিল না; কিন্তু তাহারা কৌশলে দর্শকের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করিয়া উহাকে ধাবমান বলিয়া তাহার সম্মুখে প্রতীয়মান করিয়াছিল।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ

'যখন তাহারা (যাদুর সর্পকে) নিক্ষেপ করিল, তখন তাহারা লোকদের চক্ষুকে যাদুগ্রস্ত করিল এবং তাহাদিগকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া দিল। আরা তাহারা এক যাদুই উপস্থাপন করিল।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলিতেছেন ঃ

يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى "তাহাদের যাদুর কারণে তাহার (মূসার) নিকট প্রতীয়মান হইল যে, উহা (সাপ) দৌড়াইতেছে।"

পঞ্চম প্রকার ঃ পঞ্চম প্রকারের যাদু হইতেছে জ্যামিতিক নিয়মে বিন্যস্ত একাধিক বস্তুর মাধ্যমে প্রকাশিত বিস্ময়কর ঘটনা। যেমন ঃ কতগুলি জড় বস্তুর সমন্বয়ে একটি অশ্বারোহী মূর্তি নির্মাণ করা হইল। মূর্তিটির হাতে একটি শিঙ্গা রহিয়াছে। তাহাকে কাহারও স্পর্শ করা ছাড়াই সে এক ঘন্টা পর পর উহাকে বাজায়। রূমীয় মূর্তিসমূহ এবং ভারতীয় মূর্তিসমূহ এই শ্রেণীর যাদুর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সকল মূর্তির কোন কোনটি এত নিখুঁতভাবে নির্মিত ছিল যে, দর্শক উহাকে মানব মূর্তি বলিয়া ধরিতে না পারিয়া রক্তগোশ্তে গড়া প্রকৃত মানব মনে করিয়া বসিত। (মানব মূর্তি ছাড়া অন্যান্য মূর্তির বেলায়ও অনুরূপ কথা প্রযোজ্য।) ইহা বিস্ময়কর নয় কি? নিশ্চয়ই বিস্ময়কর এবং অত্যন্ত বিস্ময়কর। আর সেই করণেই উহা এক প্রকারের যাদু। ফিরাউনের সম্মুখে যাদুকরগণ কর্তৃক প্রদর্শিত যাদু এই পর্যায়ের যাদু ছিল।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–ইমাম রাযী উপরোল্লেখিত বাক্যে ফিরাউনের যাদুকরদের যাদুর বিষয়ে তাফসীরকারদের ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কোন কোন তাফসীরকার বলেন–'ফিরাউনের যাদুকররা তাহাদের রশি ও লাঠির মধ্যে পারদ ভরিয়া দিয়াছিল। পারদের কারণে উহারা সর্পিল গতিতে আঁকা-বাঁকা হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিল। ইহাতে দর্শকের নিকট এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছিল যে, উহারা প্রকৃত সাপ। আর প্রকৃত সাপ বলিয়া উহাদের মধ্যে স্বভাবতই প্রাণশক্তি রহিয়াছে। সেই প্রাণশক্তির জোরেই উহারা দৌড়াইতেছে।'

ইমাম রাযী বলেন–'বিভিন্ন শ্রেণীর ঘড়ি ও সেইগুলির বিস্ময়কর নির্মাণ প্রক্রিয়া এই প্রকারের যাদুর অন্তর্ভুক্ত। হালকা যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারী ভারী বস্তুকে টানিয়া লইয়া যাইবার বিদ্যাও এই প্রকারের যাদুর অন্তর্ভুক্ত।' তিনি আরও বলেন–'প্রকৃতপক্ষে সেইগুলিকে যাদু বলা যায় না। কারণ, উহাদের কারণসমূহ জানা রহিয়াছে। যে কেহ সেই কারণসমূহ জানিয়া লইয়া সেইগুলিকে নির্মাণ করিতে পারে।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–খ্রীস্টানরা জনগণকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের ধর্মযাজকগণ কর্তৃক প্রযুক্ত বিভিন্ন প্রতারাণমূলক কৌশল এবং ব্যবস্থাও উপরোক্ত প্রকারের যাদুর অন্তর্ভুক্ত। যেমন ঃ খ্রীস্টান পাদ্রীগণ জেরুজালেম শহরে অবস্থিত তাহাদের গীর্জার ঝাড় বাতিতে গোপন প্রক্রিয়ায় আগুন জ্বালায় এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে, উহা ধর্মীয় মু'জিযা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইহাতে তাহারা মনে করে, ঝাড় বাতিগুলি গীর্জার বাতি বলিয়া কোন মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ধর্মীয় অলৌকিক কারণে উহা সময়মত আপনিই জ্বলিয়া উঠে। পাদ্রীগণ অবশ্য স্বীকার করেন যে, তাহারা জনসাধারণকে তাহাদের ধর্মে অধিকতর শ্রদ্ধাশীল করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মুসলমানদের মধ্যে কারামিয়া (الكرامية) নামক একটি সম্প্রদায় আছে। একটি বিষয়ে উপরোক্ত পাদ্রীদের সহিত এই কারামিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের মিল রহিয়াছে। তাহারা মানুষের মনে জান্নাতের নিআমতের লোভ এবং দোযখের শাস্তির ভয় আনিবার জন্যে এবং নেক কাজের প্রতি আগ্রহ ও বদ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করিবার জন্য মিথ্যা হাদীস বানাইয়া প্রচার করাকে জায়েয ও হালাল মনে করে। অথচ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'যে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া আমার নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করে, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা ঠিক করিয়া রাখে।' নবী করীম (সা) আরও বলিয়াছেন–'তোমরা আমার নিকট হইতে হাদীস শুনিয়া (লোকদের নিকট) উহা বর্ণনা কর; কিন্তু, আমার নামে মিথ্যা হাদীস বানাইও না। যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা হাদীস বানায়, সে দোযখে প্রবেশ করিবে।'

ইমাম রাযী এইস্থলে জনৈক খ্রীস্টান সন্ন্যাসীর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন–'একদা জনৈক খ্রীস্টান সন্ন্যাসী একটি দুর্বল, অসহায়, অভুক্ত পাখীর বাচ্চাকে উহার বাসায় থাকিয়া কাতর স্বরে অস্ফুট আওয়াজ করিতে শুনিল। অতঃপর সে দেখিল, উহারা অসহায় কাতর আওয়াজ শুনিয়া অন্যান্য পাখী উহার প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা উহার বাসায় যয়তুন ফল নিক্ষেপ করিতে লাগিল যাহাতে উহা ভক্ষণ করিয়া বাচ্চাটি ক্ষুধা মিটাইতে পারে। এতদ্দর্শনে সন্ন্যাসী একটি ফন্দি বাহির করিল। সে একটি পাখির মূর্তি বানাইল। উহার অভ্যন্তরভাগ শুন্য রাখিল। যাহাতে উহার মধ্যে বাতাস ঢুকিতে পারে। সে উহাকে এইরূপে নির্মাণ করিল যে, ইহার পেটের মধ্যে বাতাস ঢুকিলে উহা হইতে ক্ষীণ আওয়াজ বাহির হয়। অতঃপর সে একটি কুঠরির মধ্যে পাখির মূর্তিটিকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া কুঠরির মধ্যে বসিয়া গেল এবং লোকদের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিল যে, কুঠরিটি জনৈক নেককার পুরোহিতের কবরের উপর নির্মিত। যয়তুন ফল পাকিবার মৌসুমে সে উক্ত মূর্তিটির দিকে একটি জানালা খুলিয়া দিল। ফলে উহার ফাঁপা পেটের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিয়া ক্ষীণ আওয়াজ উৎপন্ন করিতে লাগিল। অন্যান্য সমগোত্রীয় পাখী উক্ত ক্ষীণ ও করুণ আওয়াজ শুনিয়া ভাবিল, পাখীটি বড় ক্ষুধার্ত; তাই এইরূপ করুণ স্বরে আওয়াজ করিতেছে।' তাহারা উহার প্রতি সদয় হইয়া বিপুল পরিমাণে পাকা যয়তূন ফল উক্ত কুঠরির উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। জনসাধারণ শুধু সেখানে বিপুল পরিমাণ যয়তুন ফল দেখিত, কিন্তু উহা কোথা হইতে কিভাবে আসিয়াছে, তাহা তাহারা ~~জানিত না। সন্ন্যাসী তাহাদিগকে বলিতে লাগিল~~, 'ইহা এই কবরের বাসিন্দা নেককার পুরোহিতের কারামাতের কারণে এখানে আসিয়া থাকে।' ইহাতে জনসাধারণ ভক্তিতে গদ গদ হইয়া তথায় হাদীয়া তোহফা দিতে লগিল। আর সন্ন্যাসী উহা দ্বারা উদরপূর্তি করিতে লাগিল। কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হইতে থাকুক।

ষষ্ঠ প্রকার ঃ একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন রূপ, বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ চুম্বক লোহার কথা উল্লেখ করা যায়। উহা অন্য লোহাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া লয়। যাহা হউক, যাদুকর বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতার অধিকারী বিভিন্ন দ্রব্যের কৌশলপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে দর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–কোন কোন লোক বিভিন্ন দ্রব্য (যেমন ঃ বিশেষ প্রকারের তেল, গাছ-গাছড়া ইত্যাদি) দেহে প্রয়োগ করিয়া আগুনের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যায় অথবা সর্প

বিষ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। কিন্তু, উহা তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। লোকে ইহা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া যায়। তাহারা দাবী করে, 'আমরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী। নিজেদের আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যেই এই সব বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাইয়া থাকি।' ইহাতে লোকদের মন তাহাদের প্রতি আধ্যাত্মিক ভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। উক্ত কার্যাবলী এবং অনুরূপ অন্যান্য কার্য যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

সপ্তম প্রকার ঃ সপ্তম প্রকারের যাদুর ভিত্তি হইতেছে মিথ্যা। যাদুকর দাবী করে-'সে ইসমে আ'জম জানে। উহার সাহায্যে সে জ্বিনকে নিজের অধীন ও আজ্ঞাবহ করিয়া লইয়াছে। বশীকৃত জ্বিনকে সে যাহা করিতে বলে, সে তাহাই করে।' দুর্বলচেতা ব্যক্তিগণ তাহার দাবীকে সত্য মনে করিয়া তাহাকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী ভাবে। তাহাদের মন তাহার ভয়ে ভীত থাকে। এইরূপ ভয়ের সুযোগে যাদুকর তাহাদের দ্বারা যাহা চাহে তাহাই করায়। এই প্রকারের যাদু تعليق القلب। (মানুষের অন্তরকে মিথ্যা দাবীর সহিত সম্পৃক্ত করিয়া দেওয়া) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি-যাহারা মনস্তত্ত্ব বিশারদ, তাহারা স্বীয় মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাহায্যে সহজেই দুর্বলচেতা মানুষকে চিনিয়া লইতে পারে। এই শ্রেণীর যাদুর আরেক নাম التنبلة। (মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবগত কৌশল)।

অষ্টম প্রকার ঃ অষ্টম প্রকারের যাদু হইতেছে সূক্ষ্ম পন্থায় চোগলখোরী করিয়া একের বিরুদ্ধে অপরকে উত্তেজিত করিয়া দিবার প্রক্রিয়া। এই প্রকারের যাদু লোকদের মধ্যে বহুল প্রচলিত।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি-চোগলখোরী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

এক, অসৎ উদ্দেশ্যে চোগলখোরী করা। এই প্রকারের চোগলখোরীতে ব্যক্তি নিছক অপরের ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে একের বিরুদ্ধে অপরের কানে সত্য-মিথ্যা কথা লাগাইয়া তাহাদের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দেয়। সকল ফকীহদের মতে ইহা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

দুই, লোকদের মধ্যে বিশেষত মু'মিনদের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত বা বনিবনা আনিবার উদ্দেশ্যে চোগলখোরী করা। এইরূপ চোগলখোরী জায়েয ও হালাল। হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ

'যে ব্যক্তি সৎ উদ্দেশ্য লইয়া চোগলখোরী করে, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নহে।' অথবা কাফিরদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করিয়া মুসলমানদের আত্মরক্ষাকে সহজ করিবার উদ্দেশ্যে চোগলখোরী করা। এইরূপ চোগলখোরী কাম্য ও অভিপ্রেত। হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ 'যুদ্ধ হইতেছে প্রতারণা।' হযরত নাঈম ইব্‌ন মাসউদ (রা) বিখ্যাত আহযাবের যুদ্ধে (খন্দকের যুদ্ধে) এইরূপ চোগলখোরীই করিয়াছিলেন। তিনি বনূ কুরায়যা গোত্রের বিরুদ্ধে বহিরাগত কাফির বাহিনীগুলির কানে এবং বহিরাগত কাফির বহিনীগুলির বিরুদ্ধে বনু কুরায়যা গোত্রের কানে অসত্য কথা লাগাইয়াছিলেন। ইহাতে কাজও হইয়াছিল। তাঁহার চোগলখোরীর কারণে মানবাধিকারের শত্রু কাফির বাহিনীগুলির মধ্যে পারস্পারিক অনাস্থা ও অবিশ্বাস জন্ম নিয়াছিল। পরিণতিতে তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। ইহা আক্রান্ত নিরপরাধ মুসলমানদের আত্মরক্ষাকে সহজ করিয়া দিয়াছিল। বলা অনাবশ্যক যে, চোগলখোরী একটি বুদ্ধিনির্ভর বিদ্যা বটে। চোগলখোরী করা যে কোন লোকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। একমাত্র সূক্ষ্মবুদ্ধির মানুষই চোগলখোরী করিতে পারে এবং করিয়া কৃতকার্য হইতে পারে।

ইমাম রাযী উপরে যে সকল বিষয়কে– سحر (যাদু)-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, সিহ্‌র শব্দের পরিভাষিক অর্থে উহাদের সবগুলি অন্তর্ভুক্ত না হইলেও উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে উহাদের সবগুলিকেই সিহ্‌র বলা যায়। তিনি সিহ্‌র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে উল্লেখিত বিষয়সমূহকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। السحر। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে এইরূপ বিষয়, যাহার কারণ সূক্ষ্ম, গোপন ও রহস্যাবৃত হইয়া থাকে। হাদীস শরীফে আসিয়াছে–

ان من البيان لسحرا। "নিশ্চয় কোন কোন বক্তৃতা অবশ্যই সিহ্‌র।"

السحرى। অর্থ সেহরী। যেহেতু সেহরী রাত্রির শেষভাগে অন্ধকারে খাওয়া হয়, তাই উহা السحور। নামে অভিহিত হইয়া থাকে। السحر। ফুসফুস। যেহেতু ফুসফুস অদৃশ্য থাকে এবং উহার সহিত সম্পৃক্ত নাড়িগুলি অতিশয় সূক্ষ্ম, তাই উহা, السحر। নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বদরের যুদ্ধের দিনে আবূ জাহিল উতবাহ্ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, انتفخ سحره। অর্থাৎ ভয়ে তাহার ফুসফুস ফুলিয়া উঠিয়াছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحرى ونحرى অর্থাৎ নবী করীম (সা) আমার ফুসফুস ও বুকে ঠেস লাগাইয়া ইন্তিকাল করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ তাহারা লোকদের চক্ষুকে প্রতারিত করিল। অর্থাৎ তাহারা লোকদের চক্ষু হইতে ঘটনার প্রকৃত কারণকে লুক্কায়িত ও রহস্যাবৃত রাখিল। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম আবূ 'আব্দিল্লাহ কুরতুবী বলেন–'আমরা বিশ্বাস করি, যাদু একটি বাস্তব বিষয়। উহার অস্তিত্ব রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা যাদুর সাহায্যে যাহা চাহেন তাহা ঘটান বা সৃষ্টি করেন।' পক্ষান্তরে, মু'তাযিলা সম্প্রদায় এবং শাফেঈ মাযহাবের আবূ ইসহাক ইসফিরায়েনী বলেন–'যাদু অবাস্তব বিষয়, উহার কোন অস্তিত্ব নাই। উহা মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু নহে।' ইমাম কুরতুবী আরও বলেন–হাত সাফাইর সাহায্যে ত্বরিত গতিতে কোন ঘটনা ঘটাইয়া তন্ত্র-মন্ত্রকে উহার কারণ হিসাবে বর্ণনা করিয়া দর্শকের মধ্যে বিস্ময় উৎপন্ন করা এক প্রকারের যাদু। ইব্ন ফারিস বলেন–'ইমাম কুরতুবীর উক্ত মন্তব্য সাধারণ লোকের মন্তব্য নহে।' ইমাম কুরতুবী আরও বলেন–'মন্ত্র-তন্ত্রও এক প্রকারের যাদু। আবার, আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহের সমন্বয়ে গঠিত দোয়াও এক প্রকার যাদু। আবার, দুষ্ট জ্বিন কর্তৃক সংঘটিত ঘটনাও যাদু। আবার, বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী বিভিন্ন ঔষধ এবং তেলও যাদু। এতদ্ব্যতীত যাদুর অন্যান্য প্রকারও রহিয়াছে।' ইমাম কুরতুবী আরও বলেন ঃ 'কোন কোন বক্তৃতাও যাদু'–নবী করীম (সা)-এর এই বাণী সম্বন্ধে একদল ব্যাখ্যাকার বলেন, উহা প্রশংসামূলক। আরেকদল ব্যাখ্যাকার বলেন, উহা নিন্দামূলক। উহাতে বাকচাতুর্যের নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন–'উক্ত হাদীসের শেষোক্ত ব্যাখ্যাই শুদ্ধ ও সঠিক। কারণ, বক্তার বাকচাতুর্য মিথ্যাকে শ্রোতার নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করিয়া থাকে। নবী করীম (সা) বলেন ঃ

'এইরূপ ঘটা বিচিত্র নহে যে, তোমাদের কেহ স্বীয় অসততামূলক বাকচাতুর্যের জোরে বিপক্ষের যুক্তির উপর নিজের যুক্তিকে জয়ী করিয়া দিবার ফলে আমি তাহার পক্ষে রায় দিব।'

ওযীর আবুল মুজাফ্ফার ইয়াহিয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হুরায়রা স্বীয় الاشراف على مذاهب الاشراف (জ্ঞানীগণের মাযহাবসমূহের পর্যালোচনা) নামক পুস্তকে বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) ভিন্ন অন্য ইমামগণ এই বিষয়ে একমত যে, যাদু একটি বাস্তব বিষয়। উহার অস্তিত্ব রহিয়াছে।' ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, 'যাদুর কোন অস্তিত্ব নাই। ইহা প্রতারণা মাত্র। যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা এবং উহা প্রয়োগ করা সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ

'যে ব্যক্তি যাদু শিখে ও উহা প্রয়োগ করে, সে কাফির।' ইমাম আবূ হানীফার জনৈক শিষ্য বলেন, যাদুর ক্ষতি হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে উহা শিক্ষা করা কুফর নহে; কিন্তু, উহাকে জায়েয বা উপকারী মনে করিয়া শিক্ষা করা কুফর। এইরূপে যদি কেহ বিশ্বাস করে যে, 'জ্বিনেরা তাহার যে উপকার করিতে চাহে, তাহাই করিতে পারে, তবে সে ব্যক্তি কাফির হইয়া যাইবে।'

ইমাম শাফেঈ বলেন–'কেহ যাদু শিখিলে আমরা তাহাকে শেখা যাদুর বর্ণনা দিতে বলিব। তাহার বর্ণনায় যদি জানিতে পারি যে, সে কুফরী আকীদা পোষণ করে, তবে আমরা তাহাকে কাফির মনে করিব। যেমন কেহ যদি ব্যবিলন শহরের অধিবাসীদের ন্যায় বিশ্বাস করে যে, সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান সাতটি তারকা মানুষের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারে এবং উহাদিগকে পূজা করিলে উহাদের সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তাহা হইলে সে কাফির হইয়া যাইবে। অথবা যদি তাহার বর্ণানায় জানিতে পারি যে, সে কোন কুফরী আকীদা পোষণ করে না। কিন্তু, যাদু শিক্ষা করাকে সে জায়েয মনে করে, তবুও আমরা তাহাকে কাফির মনে করিব।'

ওযীর ইয়াহিয়া ইব্ন মুহাম্মদ বলেন–অতঃপর প্রশ্ন দেখা দেয়, যাদুকর ব্যক্তিকে কি শুধু তাহার যাদু শিখিবার এবং উহাকে প্রয়োগ করিবার কারণেই হত্যা করা যাইবে? ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র) বলেন–'হ্যাঁ; যাদুকর ব্যক্তিকে শুধু তাহার যাদু শিখিবার এবং উহাকে প্রয়োগ করিবার কারণেই হত্যা করা যাইবে এবং হত্যা করিতে হইবে।' ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, যাদুকর ব্যক্তি স্বীয় যাদুর সাহায্যে কোন মানুষকে হত্যা করিলে শুধু তখনই তাহাকে হত্যা করা যাইবে এবং হত্যা করিতে হইবে। এইরূপ না হইলে শুধু তাহার যাদু শিখিবার এবং উহাকে প্রয়োগ করিবার কারণে তাহাকে হত্যা করা যাইবে না। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন–যাদুকর ব্যক্তি স্বীয় যাদুর সাহায্যে কোন মানুষকে হত্যা করিয়াছে, ইহা প্রামাণিত হইবার জন্যে স্বয়ং তাহার স্বীকারোক্তির প্রয়োজন থাকিবে না।

যাদুকর ব্যক্তিকে হত্যা করা হইলে তাহার হত্যাকে কোন্ শ্রেণীর হত্যা বলিয়া ধরিতে হইবে? ইমাম শাফেঈ (র) ভিন্ন অন্য ইমামগণ বলেন–তাহার হত্যাকে حد (শাস্তিমূলক হত্যা) বলিয়া ধরিতে হইবে। ইমাম শাফেঈ (র) বলেন–'তাহার হত্যাকে قصاص (হত্যার পরিবর্তে সম্পাদিত হত্যা) বলিয়া ধরিতে হইবে।'

যাদুকরের তওবা কি (সরকারের নিকট) গৃহীত হইবে? ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র)-এর অভিমত এই যে, 'যাদুকরের তওবা গৃহীত হইবে না।' ইমাম শাফেঈ (র) এবং এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহমদ (র) বলেন–'যাদুকরের তওবা গৃহীত হইবে।'

আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের যাদুকরের প্রতি কি উপরোল্লেখিত হত্যার বিধান প্রযুক্ত হইবে? ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন–'মুসলিম যাদুকরের ন্যায় তাহার প্রতিও উপরোল্লিখিত হত্যার শাস্তি প্রযুক্ত হইবে।' ইমাম শাফেঈ ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ (র) বলেন–'আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের যাদুকরের প্রতি উপরোল্লিখিত হত্যার শাস্তি প্রযুক্ত হইবে না।' তাহারা লাবীদ ইব্‌ন আ'ছামের ঘটনাকে নিজেদের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন। (সে নবী করীম (সা)-এর প্রতি যাদু প্রয়োগ করিয়াছিল; কিন্তু, নবী করীম (সা) তাহাকে হত্যা করেন নাই।)

মুসলিম মহিলা যাদুকরের বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হইবে? ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন–'তাহাকে হত্যা করা হইবে না; তবে তাহাকে কারারুদ্ধ করিতে হইবে।' অন্য তিন ইমাম বলেন–'পুরুষ যাদুকরের প্রতি প্রযোজ্য আইনই তাহার প্রতি প্রযুক্ত হইবে।' আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

যুহরী হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউনুস, উমর ইব্‌ন হারূন, আবূ আব্দুল্লাহ (ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল), আবূ বকর মারূযী ও আবূ বকর খলীল বর্ণনা করিয়াছেন যে, যুহরী বলেন–'মুসলমান যাদুকরকে হত্যা করিতে হইবে; কিন্তু মুশরিক যাদুকরকে হত্যা করা যাইবে না। কারণ, একদা জনৈকা ইয়াহুদী মহিলা নবী করীম (সা)-এর প্রতি যাদু প্রয়োগ করিয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহাকে হত্যা করেন নাই।'

ইমাম কুরতুবী ইমাম মালিক (র) সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন–'জিম্মী (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) যাদুকর স্বীয় যাদু দ্বারা কোন লোককে মারিয়া ফেলিলে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে।' জিম্মী যাদুকর যদি কাহারও প্রতি যাদু প্রয়োগ করে এবং উহাতে যদি লোকটি মারা না যায়, তবে তাহার বিষয়ে কি ব্যবস্থা গৃহীত হইবে–সে সম্বন্ধে ইমাম মালিক (র) হইতে ইব্‌ন খুআয়েয মিনদাদ দুইরূপ ফতোয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একরূপ ফতোয়া ঃ 'তাহাকে তওবা করিতে বলা হইবে। তওবা করিলে ভাল ; নতুবা হত্যা করা হইবে। অন্যরূপ ফতোয়া ঃ 'সে ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় তাহাকে হত্যা করা হইবে।'

মুসলমান যাদুকরের যাদুর মধ্যে যদি কুফরী কালাম বর্তমান থাকে, তবে ইমাম চতুষ্টয় এবং অন্যান্য ফকীহ্‌র মতে সে কাফির হইয়া যাইবে। তাহার নিজেদের অভিমতের সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতাংশকে পেশ করেন ঃ

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلاَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ উক্ত আয়াতাংশে যাদু শিক্ষা করিবার কার্যকে 'কুফর' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ইমাম মালিক (র) বলেন–'মুসলিম যাদুকরের কার্যকলাপে কুফরী প্রকাশিত হইলে তাহার তওবা গৃহীত হইবে না।' কারণ সে যিনদীক–বেদীন। পক্ষান্তরে, তাহার কার্যকলাপে কুফরী প্রকাশিত হইবার পূর্বে সে তওবা করিলে আমরা তাহাকে গ্রহণ করিব। তবে স্বীয় যাদু দ্বারা সে কাহাকেও হত্যা করিলে তৎপরিবর্তে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে।

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, সে যদি বলে–'আমি নিহত ব্যক্তির প্রতি যাদু প্রয়োগ করিলেও উহা দ্বারা তাহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্য আমার অন্তরে ছিল না' তবে তাহাকে অনিচ্ছাকৃত হত্যার সংঘটক ধরিতে হইবে এবং তজ্জন্য তাহার নিকট হইতে দিয়াত (হত্যার আর্থিক ক্ষতিপূরণ) আদায় করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যাদুকর যাদু করিবার পর তাহাকে কি তাহার যাদু তুলিয়া লইতে (নষ্ট করিয়া দিতে) বলা যাইবে? ইমাম বুখারী সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'যাদুকরকে তাহার যাদু তুলিয়া লইতে বলায় কোন দোষ নাই।' আমের শা'বীও অনুরূপ ফতোয়া প্রদান করিয়াছেন। হাসান বসরী (র) উহা মাকরূহ বলিয়াছেন। বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলেন—হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি (যাদুকরের সাহায্যে) যাদুকে নষ্ট করিয়া দিলেন না কেন? নবী করীম (সা) বলিলেন—শুন! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে শিফা দিয়াছেন। আমার ভয় হইল আমি উহা করিলে লোকদের সম্মুখে একটি অন্যায়ের পথ খুলিয়া যাইবে।'

ওহাব হইতে ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, ওহাব বলেন—'সাতটি বরই পাতা ভালরূপে বাটিয়া উহা পানির সহিত মিশ্রিত করত আয়াতুল কুরসী পড়িয়া উহাতে ফুঁক দিয়া যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে উহা হইতে তিন ঢোক পান করাইয়া অবশিষ্টটুকু দিয়া তাহাকে গোসল করাইলে যাদুর প্রতিক্রিয়া দূর হইয়া যায়। যাদুর সাহায্যে যে স্বামীকে তাহার স্ত্রীর প্রতি বীতরাগ, বীতস্পৃহ ও অসন্তুষ্ট করা হয়, তাহার জন্যে উপরোক্ত ব্যবস্থাটি বিশেষ উপকারী।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি—যাদুর প্রভাব দূর করিবার সর্বোত্তম ব্যবস্থা হইতেছে উক্ত উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক অবতীর্ণ সূরাদ্বয়—সূরা ফালাক ও সূরা নাস যাহা المعوذتان নামে পরিচিত। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিলাওয়াত করিবার মাধ্যমে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় লয়, সে ব্যক্তি সর্বোত্তম আশ্রয় গ্রহণকারী।' আয়াতুল কুরসীর তিলাওয়াতও অনুরূপ উপকারী। কারণ, উহা শয়তান ও উহার ক্ষতিকর প্রভাব দূর করিয়া দেয়।

মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ

(١٠٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَ قُوْلُوا انْظُرْنَا وَ اسْمَعُوْا ۖ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(١٠٥) مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۖ وَ اللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

১০৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা 'রাইনা' বলিও না এবং তোমারা 'উনযুরনা' বলিও। আর তোমরা মনোযোগ দিয়া শুন। অনন্তর কাফিরদের জন্য রহিয়াছে কষ্টদায়ক শাস্তি।

১০৫. আহলে কিতাব ও মুশরিকদের যাহারা কাফির তাহারা তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে তোমাদের উপর ভাল কিছু অবতীর্ণ হউক তাহা পছন্দ করে না। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার অনুগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট করেন। আর আল্লাহ্ মহান বখশিশ দাতা।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে কথায় ও কাজে কাফিরদের অনুকরণ হইতে দূরে থাকিতে বলিতেছেন এবং দ্বিতীয়টিতে তাহাদের বিরুদ্ধে কাফিরদের চরম শত্রুতা সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক ও সাবধান করিয়া দিতেছেন।

ইয়াহুদীগণ নবী করীম (সা)-এর সহিত কথা বলিবার সময়ে কখনো কখনো দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করিত। এইরূপ দ্ব্যর্থবোধক শব্দের দুইটি অর্থের একটি হইত ব্যঙ্গাত্মক ও উপহাসসূচক এবং অন্যটি হইত অব্যাঙ্গাত্মক ও উপহাসবিহীন। এইরূপ শব্দকে তাহারা যুগপৎ উভয় অর্থে ব্যবহার করিত। তাহারা বাহ্য হাবভাবে প্রকাশ করিত যে,. উক্ত শব্দকে তাহারা অব্যাঙ্গাত্মক ও উপহাসবিহীন অর্থে ব্যবহার করিত। কিন্তু তাহাদের অন্তরে উহার ব্যঙ্গাত্মক ও উপহাস সূচক অর্থটিও লুক্কায়িত থাকিত। এইরূপ একটি শব্দ হইতেছে راعنا, উহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথম অর্থ 'আপনি আমাদের কথার প্রতি কান দিন।' দ্বিতীয় অর্থ - 'হে নির্বোধ'! ইয়াহুদীগণ নবী করীম (সা)-এর প্রতি উক্ত শব্দটি ব্যবহার করিত। তাহারা বাহ্যত উহা দ্বারা উহার প্রথমোক্ত অর্থ বুঝাইলেও তাহাদের অপবিত্র অন্তরে উহার শেষোক্ত অর্থটিও লুক্কায়িত থাকিত। মু'মিনগণ তাহাদের (ইয়াহুদীদের) অন্তরে লুক্কায়িত ব্যঙ্গাত্মক অর্থটি সম্বন্ধে অভিহিত ছিলেন না। তাহারা উহাকে উহার প্রথমোক্ত অর্থে নবী করীম (সা)-এর প্রতি ব্যবহার করিতেন। সত্যদ্বেষী ইয়াহুদীরা যে শব্দকে ব্যঙ্গাত্মক অর্থে নবী করীম (সা)-এর প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকে, উহা মু'মিনগণ নবী করীম (সা)-এর প্রতি ব্যবহার করিবে-যদিও তাহারা উহাকে অব্যঙ্গাত্মক অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় ছিল না। তাই তাহাদিগকে উক্ত শব্দের পরিবর্তে انظرنا (অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কথা শুনুন) শব্দ ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

ইয়াহুদীদের উপরোক্ত কুৎসিত মানসিকতার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ - وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ - وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَايُؤْمِنُوْنَ اِلاَّ قَلِيْلاً -

"একদল ইয়াহুদী (তাওরাতের) বাক্যাবলীকে বিকৃত করিয়া দেয়। আর তাহারা বলে, 'আমরা শুনিলাম' কিন্তু মানিলাম না। আর তুমি শুন, অপমানিত না হইয়া শুন। আর আমাদের কথার প্রতি কর্ণপাত কর (অন্তরে লুক্কায়িত অর্থ-ওহে নির্বোধ)।' তাহারা দীনের প্রতি ব্যঙ্গ ও উপহাস করিয়া উহা বলিয়া থাকে। যদি তাহারা বলিত, 'আমরা শুনিলাম ও মানিলাম। আর (যদি তাহারা বলিত) আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কথা শুনুন এবং অনুগ্রহ করিয়া আমাদের আবেদন শ্রবণ করুন, তবে উহা তাহাদের জন্যে অধিকতর মঙ্গলজনক ও সঠিক হইত। কিন্তু

আল্লাহ্ তাহাদের কুফরের কারণে তাহাদের প্রতি লা'নত পাঠাইয়াছেন। অতএব, তাহাদের মধ্যে অল্প কয়জন ছাড়া অন্যদের কেহই ঈমান আনিবে না।"

কাফিরদের বাহ্য অনুকরণকেও আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল মু'মিনদের জন্যে পছন্দ করেন না। নিম্নোক্ত হাদীসে অনুকরণের ফল ও পরিণতি বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মুনীর জারশী, হাস্সান ইব্ন আতিয়্যাহ, ছাবিত, আব্দুর রহমান, আবূ নযর ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'আমি তলোয়ারসহ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে প্রেরিত হইয়াছি। যতক্ষণ এক আল্লাহ্র ইবাদত পৃথিবীতে কায়েম না হয়, ততক্ষণ আমি যুদ্ধ চালাইয়া যাইব। আমার বর্শার ছায়ার নীচে আমার রিয্ক রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে ব্যক্তি আমার নির্দেশকে অমান্য করিবে, তাহার জন্যে অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত রহিয়াছে। আর যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করে, সে ব্যক্তি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

ইমাম আবূ দাউদ উপরোক্ত রাবী আবূ নযর হাশিম হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ নযর হাশিম হইতে উসমান ইব্ন আবূ শায়বার এই ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করে, সে ব্যক্তি সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত হইবে।'

উপরোক্ত হাদীসে কাফির জাতির কথাবার্তা, কার্যকলাপ, লেবাস-পোশাক, উৎসব-আনন্দ, ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদি যাহা আমাদের জন্যে হালাল নহে, সেই সব বিষয়ে তাহাদের অনুকরণ করিতে আমাদিগকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে।

ইব্ন মাআন এবং আওন এই উভয় রাবী হইতে অথবা উহাদেরই একজন ধারাবাহিকভাবে মুসইর, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক, নাঈম ইব্ন হাম্মাদ, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা একটি লোক হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন, 'যখন তুমি আল্লাহ্কে বলিতে শুনিবে يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে মুমিনগণ!) তখন তাঁহার কথা কান লাগাইয়া শুনিবে। কারণ, আল্লাহ্ যেইখানে ঐরূপ সম্বোধনের শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেইখানে হয় কোন নেক কাজ করিতে আদেশ করিয়াছেন, না হয় কোন বদ কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন।'

খায়ছামা হইতে আ'মাশ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ খায়ছামা বলেন, কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন–يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে মু'মিনগণ!)। পক্ষান্তরে তাওরাতে তিনি বনী ইসরাঈল জাতির মু'মিনদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন–ياايها المساكين (হে মিসকীনগণ!')

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন–ارعنا, অর্থাৎ আমাদের কথা শুনুন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইয়াহুদীরা নবী করীম (সা)-কে বলিত ارعنا, অর্থাৎ আমাদের কথা শুনুন। ارعنا শব্দটি عاطنا শব্দের ন্যায়।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন –'আবুল আলীয়া, আবূ মালিক, রবী' ইব্ন আনাস, আতিয়্যাহ আওফী এবং কাতাদাহ হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।'

মুজাহিদ বলেন, لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا অর্থাৎ তোমরা (আল্লাহ্র রাসূলের কথার) বিরোধী কথা বলিও না। অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, মুজাহিদ বলেন– لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا অর্থাৎ তোমরা বলিও না যে, আপনি আমাদের কথা শুনুন, আমরা আপনার কথা শুনিব।'

আতা বলেন–'আনসার সাহাবীগণ নবী করীম (সা)-এর প্রতি راعنا শব্দ ব্যবহার করিত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে উহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।'

হাসান বসরী–'الراعن 'হইতেছে একটি উপহাসসূচক শব্দ। আল্লাহ্ তা'আলা উহা নবী করীম (সা)-এর প্রতি ব্যবহার করিতে সাহাবীদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।' ইব্ন জারীর হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ সখর বলেন –নবী করীম (সা) যখন পথ চলিতেন, তখন প্রয়োজনবোধে সাহাবীগণ পিছন দিক হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেন–'আমাদের কথা শুনুন।' আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলের প্রতি এইরূপ শব্দের প্রয়োগ পছন্দ করিলেন না। তিনি তাহাদিগকে উহা প্রয়োগ করিতে নিষেধ করিয়া প্রয়োজনবোধে তৎপরিবর্তে 'আমাদের দিকে তাকান' ইহা বলিতে নির্দেশ দিলেন।'

সুদ্দী বলেন–'বনূ কায়নুক গোত্রের রিফাআহ ইব্ন যায়দ নামক জনৈক ইয়াহূদী মাঝে মাঝে নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিত। সে নবী করীম (সা)-এর সহিত কথা বলিবার সময় তাঁহাকে বলিত–

ارعنى سمعك واسمع غير مسمع। 'আপনি আমার কথা শুনুন; আর অপমানিত না হইয়া (কথা) শুনুন।' মু'মিনগণ মনে করিতে লাগিল–'এইরূপ কথায় নবীগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।' তাই তাহাদের কেহ কেহ নবী করীম (সা)-এর সহিত কথা বলিবার সময়ে বলিতে লাগিলেন– اسمع غير مسمع 'আপনি অপমানিত না হইয়া শুনুন।' উক্ত ব্যাখ্যাটি সূরা নিসায় উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে راعنا (আমাদের কথা শুনুন) বলিতে নিষেধ করিলেন।' আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামও প্রায় অনুরূপ কথা বলিয়াছেন।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন–আলোচ্য আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর প্রতি راعنا শব্দ ব্যবহার করিতে মু'মিনদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি উক্ত শব্দ ব্যবহার করা তাঁহার নিকট পছন্দনীয় নহে। উক্ত নিষেধ নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত নিষেধের অনুরূপ ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, তোমরা আঙ্গুরকে الكرم। (আঙ্গুর-লতা) বলিও না; বরং উহাকে الحبلة। (আঙ্গুল-লতা) বলিও। তোমরা বলিও না عبدى (আমার গোলাম); বরং বলিও فتاى (আমার গোলাম)।'

এইরূপে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগের বিষয়ে এতদ্ব্যতীত অন্যরূপ নিষেধও হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الى اخر الاية উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি আহলে কিতাব ও মুশরিকদের চরম শত্রুতার কথা বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে উহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে নিষেধ করিতেছেন। উক্ত আহলে কিতাব ও মুশরিকদিগকে অনুকরণ করিতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। উক্ত আয়াতে তিনি মু'মিনদিগকে প্রদত্ত তাঁহার শরীআতের কথাও তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, যাহা তাহাদিগকে প্রদত্ত তাহার নি'আমাত বটে।

রহিতকরণ প্রসঙ্গ

(١٠٦) مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ۭ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ○

(١٠٧) اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

১০৬. আল্লাহ্ তাঁহার বাণী হইতে যাহা চাহেন রহিত করেন অথবা বিস্মৃত করেন। উহার পরিবর্তে উহার মত অথবা উহা হইতেও ভাল (বাণী) উপস্থিত করেন। তুমি কি জান না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান?

১০৭. তুমি কি জান না, নিশ্চয় আসমান ও যমীনের মালিকানা আল্লাহ্র? আর তোমাদের জন্যে আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও মদদগার নাই।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ অর্থাৎ যদি আমরা কোন আয়াতকে পরিবর্তিত করি।'

মুজাহিদ হইতে ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ অর্থাৎ 'যদি আমি কোন আয়াতকে তুলিয়া দেই।' মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ অর্থাৎ যদি আমি কোন আয়াতের লিখন ঠিক রাখিয়া উহার অন্তর্নিহিত আদেশ-নিষেধ বা বিধি-বিধান পরিবর্তিত করি।' মুজাহিদ উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর শিষ্যদের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন-'আবুল আলীয়া এবং মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব করযী হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।' যিহাক বলেন- مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ অর্থাৎ 'যদি আমি তোমাকে কোন আয়াত ভুলাইয়া দেই।'

আতা বলেন- مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ অর্থাৎ 'যদি আমি কোন আয়াতকে বাদ দেই।' ইব্ন আবূ হাতিম আতার উপরোক্ত ব্যাখ্যার এইরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'যদি আমি বিশেষ

কোন আয়াতকে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি নাযিল করা বাদ দেই অর্থাৎ উহা তাহার উপর আদৌ নাযিলই না করি।'

সুদ্দী বলেন- مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ অর্থাৎ 'যদি আমি কোন আয়াতকে উঠাইয়া লই।' ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম সুদ্দীর উপরোক্ত ব্যাখ্যার ব্যাখ্যায় বলেন-'যেমন নিম্নোক্ত আয়তদ্বয়কে আল্লাহ্ তা'আলা উঠাইয়া লইয়াছেন ঃ

الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموها البتة - (বৃদ্ধ পুরুষ ও বৃদ্ধা নারী যখন যিনা করে, তখন তোমরা তাহাদিগকে অবশ্যই পাথর মারিয়া হত্যা করিবে।) এবং لو كان لابن ادم واديان من ذهب لايتغى لهما ثالثا (আদম সন্তান যদি দুইটি স্বর্ণ উপত্যকার মালিক হয়, তবে সে নিশ্চয় উহার সহিত তৃতীয় আরেকটি পাইতে চাহিবে।)

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন- مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ অর্থাৎ 'যদি আমি কোন আয়াতে বর্ণিত বিধানকে পরিবর্তিত করিয়া তদস্থলে অন্যরূপ বিধান প্রবর্তিত করি। যেমন, যদি আমি কোন হালালকে হারাম, হারামকে হালাল, মুবাহকে নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধকে মুবাহ করি।' ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন-'এইরূপ পরিবর্তন আদেশ-নিষেধ বিষয়ে হইতে পারে। তবে ইতিহাস বা ঘটনার বিষয়ে কোনরূপ পরিবর্তন نسخ ঘটিতে পারে না।'

نسخ শব্দটির মূল অর্থ হইতেছে স্থানান্তরিত করা; অন্যত্র লইয়া যাওয়া। نسخ الكتاب অর্থাৎ সে কিতাবকে অন্য কাগজ ইত্যাদিতে লিখিয়া লইয়াছে। এইরূপে نسخ الحكم অর্থ হইতেছে কোন বিধানকে তুলিয়া দেওয়া। বিধানকে তুলিয়া লওয়া দুইরূপ হইতে পারে। প্রথমরূপ, বিধানের শব্দসহ উহা তুলিয়া লওয়া। দ্বিতীয়রূপ, শব্দ রাখিয়া দিয়া শুধু বিধানকে তুলিয়া লওয়া।

মূলনীতি শাস্ত্রবিদগণ (যাহারা ফিকাহশাস্ত্র সম্পর্কিত মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন) النسخ (রহিতকরণ)-এর বিভিন্নরূপ সংজ্ঞা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উক্ত বিভিন্নরূপ সংজ্ঞা প্রায় একরূপ। উহাদের মধ্যকার পার্থক্যের পরিমাণ একেবারেই সামান্য। কারণ, শরীআতের পরিভাষায় النسخ কাহাকে বলা হয়, তাহা বিশেষজ্ঞদের নিকট অবিদিত নহে। কেহ কেহ বলেন- النسخ হইতেছে পূর্ববর্তী কোন বিধানকে পরবর্তী কোন বিধানের সাহায্যে রহিত করিয়া দেওয়া বা তুলিয়া লওয়া।' উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে সহজ বিধানকে তুলিয়া লইয়া তদস্থলে কঠোর বিধান প্রবর্তন করা, কঠোর বিধানকে তুলিয়া লইয়া তদস্থলে সহজ বিধান প্রবর্তন করা, কোন বিধানের পরিবর্তে নতুন কোন বিধান প্রবর্তন না করিয়া শুধু বিধানটিকে তুলিয়া লওয়া ইত্যকার সবই النسخ-এর অন্তর্ভুক্ত। যাহা হউক النسخ সম্পর্কিত বিধি-বিধান ও নিয়মাবলী, উহার শর্তসমূহ ও প্রকারসমূহ ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহশাস্ত্র সম্পর্কিত মূল-নীতিশাস্ত্রের পুস্তকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

সালিমের পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম, যুহরী, সুলায়মান ইব্‌ন আরকাম, আব্বাস ইব্‌ন ফযল, আবদুর রহমান ইব্‌ন ওয়াকিদ, তৎপুত্র আবূ সুমবুল উবায়দুল্লাহ ও ইমাম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ দুইটি লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে একটি সূরা শিখিয়া উহা নামাযে আদায় করিত। একদা তাহারা রাত্রিতে নামাযে দাঁড়াইয়া উক্ত সূরা পড়িতে চেষ্টা করিল। কিন্তু, তাহারা উহার একটি হরফও স্মরণ করিতে

পারিল না। পরদিন সকাল বেলা তাহারা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া উক্ত ঘটনা জানাইল। নবী করীম (সা) বলিলেন-'উক্ত সূরা রহিত منسوخ হইয়া গিয়াছে এবং উহাকে বিস্মৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।' রাবী বলেন-'যুহরী এই আয়াতের অন্তর্গত ننسها শব্দের প্রথম নূন ن -কে পেশ দিয়া পড়িতেন।' উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী সুলায়মান ইব্‌ন আরকাম একজন দুর্বল রাবী।

আবূ উমামাহ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন হানীফ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন শিহাব, ইউনুস ও উকায়ল, লায়ছ, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালেহ, আবূ উবায়দিল্লাহ নাসার ইব্‌ন দাউদ, আমাবারী ও তৎপুত্র ইমাম আবূ বকরও উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী حديث مرفوع হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী উহা উল্লেখ করিয়াছেন।

ننسخ ক্রিয়ার পরবর্তী ক্রিয়া দুইরূপে পঠিত হইয়াছে। কেহ কেহ উহাকে ننسأها রূপে এবং কেহ কেহ উহাকে ننسها রূপে পড়িয়াছেন। او ننسأها অর্থাৎ 'অথবা যদি আমি উহা স্থগিত রাখি; অথবা যদি আমি উহার কার্যকরকরণের সময় পিছাইয়া দেই।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا অর্থাৎ 'যদি কোন আয়াতকে পরিবর্তিত করিয়া দেই অথবা কোন আয়াতকে অপরিবর্তিত রাখিয়া দেই।'

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর শিষ্যদের নিকট হইতে মুজাহিদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اَوْ نَنْسَأْهَا অর্থাৎ যদি আমি কোন আয়াতের লিপি বহাল রাখিয়া শুধু উহার বিধানকে পরিবর্তিত করিয়া দেই।'

আবদ ইব্‌ন উমায়র, মুজাহিদ এবং আতা বলেন, اَوْ نَنْسَأْهَا অর্থাৎ 'অথবা যদি আমি কোন আয়াতেকে স্থগিত রাখি।'

আতিয়্যাহ আওফী বলেন-اَوْ نَنْسَأْهَا অর্থাৎ অথবা যদি আমি কোন আয়াতকে তুলিয়া না লইয়া শুধু উহার কার্যকরকরণকে স্থগিত করিয়া রাখি।' সুদ্দী এবং রবী' ইব্‌ন আনাসও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহ্‌হাক বলেন- مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কোন আয়াত রহিত করিয়া তদস্থলে অন্য এক আয়াত আনিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

আবুল আলীয়া বলেন ঃ اَوْ نُنْسِهَا অর্থাৎ 'যদি আমি কোন আয়াত নাযিল করিতে বিলম্ব করি।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত, ইসমাঈল (ইব্‌ন আসলাম), খাফ্‌ফাফ, খালফ, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইসমাঈল বাগদাদী ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন-'একদা হযরত উমর (রা) আমাদের সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছিলেন। বক্তৃতার মধ্যে তিনি বলিলেন-اَوْ نُنْسِهَا অর্থাৎ 'যদি আমি কোন আয়াত স্থগিত করিয়া রাখি।'

اَوْ نُنْسِهَا এর তাৎপর্য সম্পর্কে কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اَوْ نُنْسِهَا অর্থাৎ 'যদি আমি কোন আয়াত বিস্মৃত করিয়া দেই।'

কাতাদাহ বলেন–'আল্লাহ্ তা'আলা যে আয়াত চাহিতেন, উহা নবী করীম (সা)-কে ভুলাইয়া দিতেন এবং তিনি যে আয়াত চাহিতেন, উহা রহিত করিয়া দিতেন।'

হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে আওফ, খালিদ ইব্ন হারিছ, সাওয়াদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ও ইমাম ইব্ন জারীর أَوْ نُنْسِهَا এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন : 'এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যে, নবী করীম (সা) কোন কিরাআত পড়িবার পর উহা ভুলিয়া গিয়াছেন।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাজ্জাজ (হাজ্জাজ জাযরী), মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়র হাররানী, ইব্ন নুফায়ল, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন : 'এইরূপ ঘটনা ঘটিত যে, নবী করীম (সা)-এর উপর রাত্রিতে ওহী নাযিল হইয়াছে আর দিনে তিনি উহা ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন :

مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا ـ الى اخر الاية

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন–'উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী আমার উস্তাদ আবূ জা'ফর ইব্ন নুফায়ল আমাকে বলিয়াছেন, হাজ্জাজ অবশ্য হাজ্জাজ ইব্ন আরাতাত নহেন; বরং তিনি হাজ্জাজ জাযরী।'

উবায়দ ইব্ন উমর বলেন–أَوْ نُنْسِهَا অর্থাৎ যদি আমি কোন আয়াত তোমার নিকট হইতে তুলিয়া লই।'

কাসিম ইব্ন রবীআ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়ালা ইব্ন আতা, হাশীম, ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন : কাসিম ইব্ন রবীয়া বলেন–'একদা আমি হযরত সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রা)-কে مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا এইরূপ পড়িতে শুনিয়া তাঁহাকে বলিলাম–'সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا এইরূপ পড়িয়া থাকেন।'[১] তিনি বলিলেন–কুরআন মজীদ মুসাইয়্যেবের উপরও নাযিল হয় নাই আর তাহার বংশধরদের উপরও নাযিল হয় নাই। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন–سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى তিনি আরও বলিতেছেন وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ

উক্ত রিওয়ায়েতটি হাশিমের মাধ্যমে আব্দুর রায্যাকও বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম স্বীয় 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে উহা কাসিম ইব্ন রবীআহ্ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়া'লা ইব্ন আতা, শু'বা, আদম ও ইমাম আবূ হাতিম রাযী প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন–'উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের শর্তাবলীতে টিকে। তবে তাহারা উহা স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নাই।'

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন–'মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, কাতাদাহ এবং ইকরামা হইতেও সাঈদের (ইবনুল মুসাইয়্যেব) উক্তির অনুরূপ উক্তি বর্ণিত হইয়াছে।'

---

১. তাফসীরে ইব্ন কাছীরের বিভিন্ন সংস্করণে রাবীর বর্ণনা উপরোক্তরূপেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু ইমাম ইব্ন জারীরের গ্রন্থে রাবীর বর্ণনা নিম্নোক্ত রূপে বর্ণিত রহিয়াছে। কাসিম ইব্ন রবীআহ বলেন, একদা আমি হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نَنْسَأْهَا এইরূপে পড়িতে শুনিয়া বলিলাম– সাইদ ইব্ন মুসাইয়োব উহাকে مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا এইরূপে পড়িয়া থাকেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত, সুফিয়ান ছাওরী, ইয়াহইয়া ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন– হযরত উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ 'আলী আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক এবং উবাই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কারী। এতদসত্ত্বেও আমরা নিশ্চয় উবাই-এর কিরাআত সম্পর্কিত কোন কোন কথা বর্জন করিব।' উবাই বলেন–'আমি যাহা নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে শুনিয়াছি, তাহা কোনক্রমে পরিত্যাগ করিব না।' অথচ, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাবীব, সুফিয়ান (ছাওরী), ইয়াহইয়া ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত উমর (রা) বলেন, উবাই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কারী এবং আলী আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক। এতদসত্ত্বেও আমরা উবাই-এর কিরাআত সম্পর্কিত কোন কোন কথা বর্জন করিব।' উবাই বলেন–'নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে আমি যাহা শুনিয়াছি, উহা কোনক্রমে পরিত্যাগ করিব না।' অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا

نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا অর্থাৎ আমি মানুষের জন্যে রহিত আয়াত অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর বিধান অথবা উহার সমান কল্যাণকর বিধান প্রবর্তন করি।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্ন আবূ তালহা উপরোক্ত আয়াতাংশের উক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবুল আলীয়া বলেন ঃ

مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا অর্থাৎ যদি আমি কোন আয়াত নাযিল করিবার পর রহিত করিয়া দেই অথবা কোন আয়াত নাযিল করা স্থগিত রাখি, তবে উহার পরিবর্তে উহা অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর অথবা উহার সমান কল্যাণকর কোন আয়াত নাযিল করি।'

সুদ্দী বলেন– نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا অর্থাৎ 'যে আয়াত আমি তুলিয়া লই উহা অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর আয়াত অথবা যে আয়াত নাযিল করা আমি স্থগিত রাখি, উহার সমতুল্য কল্যাণকর আয়াত নাযিল করি।'

কাতাদাহ বলেন ঃ

نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا এই আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা আসানী, অনুমতি, আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَالَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَانَصِيْرٍ -

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের উপরোক্ত অংশে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদিগকে জানাইতেছেন যে, তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতা রাখেন। সকল সৃষ্টির মালিক এবং বিধানদাতা তিনিই। তাঁহার সৃষ্টিতে এবং বিধান প্রদানে কেহ বাধা দিতে পারে না। তিনি যেইরূপে কাহাকেও নেকবখত এবং কাহাকেও বদবখত করেন, কাহাকেও সুস্থ রাখেন এবং কাহাকেও অসুস্থ করেন, কাহাকেও ক্ষমতাবান এবং কাহাকেও ক্ষমতাহীন করেন, উহাতে কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারে না, সেইরূপে তিনি স্বীয় বান্দাদিগকে যেইরূপ নির্দেশ দিতে চাহেন, সেইরূপ নির্দেশ দেন। তিনি যাহা হালাল করিতে চাহেন, হালাল করেন এবং যাহা হারাম করিতে চাহেন, হারাম করেন। উহাতে তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। তিনি যাহা করেন, তদ্বিষয়ে তাহাকে কাহারও নিকট জওয়াবদিহী করিতে হয় না। কিন্তু বান্দাগণ যাহা করে, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে (তাঁহার নিকট) জওয়াবদিহী করিতে হয়। তিনি নসখ النسخ। বা রহিতকরণের মাধ্যমে বান্দাকে তথা বান্দার আনুগত্যকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি কোন কার্যের মধ্যে বান্দার মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত দেখিয়া বান্দাকে উহা করিতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে উক্ত কার্য তাহার জন্যে অমঙ্গলজনক হইলে তিনি উহা করিতে তাহাকে নিষেধ করেন। কাজটি বান্দার জন্যে কখন মঙ্গলজনক এবং কখন অমঙ্গলজনক, সে বিষয়ে তিনিই বেশ ভালরূপে অবগত রহিয়াছেন। বান্দার নিকট আল্লাহ্র প্রাপ্য হইতেছে–তিনি তাহাকে যখন যেইরূপ কাজ করিতে নির্দেশ প্রদান করেন, তখন সেইরূপ কাজ করা।

ইয়াহূদীরা বলিত–আল্লাহ্ কোন আদেশ দিয়া উহা পরিবর্তন করিতে পারেন না, পরিবর্তন করা যুক্তিসঙ্গতও নহে আর বিধান সঙ্গতও নহে। একদল ইয়াহূদী বলিত–'আল্লাহ্র কোন আদেশ পরিবর্তিত হওয়া যুক্তিবিরোধী।' তাহারা নিজেদের দাবীর পক্ষে মিথ্যা ও ভ্রান্ত যুক্তিও উপস্থাপন করিত। আরেক-দল ইয়াহূদী বলিত–তাওরাতে লিখিত রহিয়াছে, আল্লাহ্ তাঁহার আদেশ কখনও পরিবর্তন করেন না।' তাহারা নিজেদের দাবীর পক্ষে মনগড়া কথা 'তাওরাতের কথা নাম দিয়া প্রচার করিত। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের উপরোক্ত অংশ আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের উপরোক্ত দাবীকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর বলেন–

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ -

এর ব্যাখ্যা হইতেছে ঃ 'হে মুহাম্মদ! তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতি একমাত্র আমি আল্লাহ্! আকাশ, পৃথিবী এবং উহাতে অবস্থিত সৃষ্টির প্রতি যখন যে হুকুম, আদেশ, নিষেধ ও বিধান দিতে চাহি, তখন সেই হুকুম, আদেশ, নিষেধ ও বিধান দেই এবং যখন যে হুকুম, আদেশ, নিষেধ ও বিধান উহাদের উপর হইতে তুলিয়া লইতে চাহি, তখন সেই হুকুম, আদেশ, নিষেধ ও বিধান উহাদের উপর হইতে তুলিয়া লই। আমার কার্যে কেহ বাধা দিতে পারে না। আমাকে কাহারও নিকট জওয়াবদিহী করিতে হয় না।'

অতঃপর ইমাম ইব্ন জারীর বলেন–আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যদিও নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করিয়া কথা বলিয়াছেন, তথাপি তিনি উহা দ্বারা ইয়াহূদী জাতির একটি দাবীকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইয়াহূদীরা বলিত, 'তাওরাতের কোন আদেশ, নিষেধ বা বিধি-বিধান রহিত منسوخ হইবে না, হইতে পারে না।' তাহারা উক্ত দাবীর

ভিত্তিতে হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে অমান্য করিয়াছে। তাহারা উক্ত দাবীর ভিত্তিতে পবিত্র ইন্‌জীল ও কুরআন মজীদকে অমান্য করিয়াছে। তাহারা উক্ত দাবীর ভিত্তিতে উক্ত নবীদ্বয় এবং কিতাবদ্বয়ের প্রতি কুফর করিয়াছে। উক্ত নবীদ্বয় এবং কিতাবদ্বয় তাওরাতের কোন কোন আদেশ-নিষেধ এবং বিধি-বিধানকে রহিত করিয়া দিয়া তদস্থলে নতুন আদেশ-নিষেধ এবং বিধি-বিধান লইয়া আসিয়াছিলেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদীদের উপরোক্ত দাবীকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া বলিয়াছেন—'আল্লাহ্ তা'আলা তাহার যে কোন বিধানকে যে কোন সময় রহিত করিয়া দিতে পারেন। কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। এজন্যে তাঁহাকে কাহারও নিকট জওয়াবদিহী করিতে হয় না। কারণ, একমাত্র তিনিই সৃষ্টিকর্তা এবং একমাত্র তিনিই বিধানদাতা।'

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি—ইয়াহুদীদের অন্তরের সত্য-বিদ্বেষই তাহাদিগকে আসমানী বিধানের রহিত হইবার যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। তাহারা জানিত, পূর্ববর্তী যুগে বিভিন্ন নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানকে রহিত منسوخ করিয়া দিয়াছেন। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর শরীআতে তাঁহার পুত্রদের সহিত তাঁহার কন্যাদিগকে বিবাহ দেওয়া হালাল করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি উক্ত বিধান রহিত করিয়া ভগ্নীকে বিবাহ করা ভাই-এর জন্যে হারাম করিয়া দিয়াছেন। বিখ্যাত মহাপ্লাবনের ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর শরীআতে সকল প্রাণীকেই হালাল করিয়াছেন। পরবর্তীকালে তিনি কোন কোন প্রাণীকে হারাম করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইয়াকূব (আ)-এর শরীআতে এক সাথে দুই বোনকে বিবাহ বন্ধনে রাখা হালাল করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তাওরাত ও কুরআন মজীদে উহা হারাম করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে স্বীয় পুত্র যবেহ করিবার জন্যে নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার উক্ত কার্য সম্পাদন করিবার পূর্বে তিনি উক্ত নির্দেশ প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির জনসাধারণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাহারা গো-বৎস পূজা করিয়াছিল তাহাদিগকে হত্যা করিতে। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে প্রায় নির্বংশ হইয়া যাইবার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্যে উক্ত নির্দেশ প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ আরও ঘটনা রহিয়াছে যদ্দারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানকে রহিত করিয়া থাকেন। ইয়াহুদীরা যে উহা জানিত না, তাহা নহে। উহা তাহারা জানিত। তথাপি তাহারা উহার জবাবে যাহা বলিত তাহা নিছক ঝগড়ার খাতিরে মুখেই বলিত। আসল সত্য তাহাদের ভালভাবেই জানা আছে। আর উদ্দেশ্য তো সত্যই। কারণ, তাহাদের কিতাবে মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ এবং তাঁহাকে অনুসরণের নির্দেশ সুবিদিত সত্য। তাহারা ইহাও জানে যে, মুহাম্মদের শরীআতই তাহাদিগকে মানিয়া চলিতে হইবে এবং তাহা ছাড়া আল্লাহ্‌র দরবারে কাহারও কোন আমল কবূল হইবে না। এই সব ভালভাবে জানা সত্ত্বেও শুধুমাত্র বিদ্বেষান্ধতাই তাহাদিগকে সত্য অনুসরণ হইতে বিমুখ রাখিতেছে।

কেহ কেহ বলেন—পূর্ববর্তী শরীআতসমূহ নবী করীম (সা)-এর নবূওতের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের জন্যে প্রদত্ত হইয়াছিল। নবী করীম (সা)-এর আগমনের পর সেইগুলো বহালই ছিল না। অতএব তাঁহার আগমনের পর সেই সকল শরীআত রহিত হইবার প্রশ্নও থাকে না।

তাহারা বলেন ঃ যেমন ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে 'রাত্রি পর্যন্ত সময়ে' রোযা রাখিতে নির্দেশ দিয়াছেন। রাত্রির কোন অংশ রাত্রি পর্যন্ত সময়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। সেইরূপ পূর্ববর্তী শরীআতসমূহকে আল্লাহ্ তা'আলা 'নবী করীম (সা)-এর নবূওত পর্যন্ত সময়ের জন্যে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। নবী করীম (সা)-এর নবূওতের সময়ের কোন্ অংশ 'তাহার নবূওত পর্যন্ত সময়ের' অন্তর্ভুক্ত নহে। তাই পূর্ববর্তী শরীআতসমূহ তাঁহার নবূওতের সময়ের কোন অংশ বহালই ছিল না। অতএব তাঁহার আগমনে উহা রহিত منسوخ হইবার প্রশ্নই উঠে না।'

কেহ কেহ বলেন–'পূর্ববর্তী শরীআতসমূহের জন্যে কোন সময় সীমা নির্ধারিত ছিল না। সুতরাং উহা নবী করীম (সা)-এর নবূওতের পরও বহাল ছিল। তাঁহার নবূওতের পর আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী শরীআতসমূহের বিধানসমূহ রহিত করিয়া দিয়াছেন।'

উপরোক্ত দ্বিবিধ বক্তব্যের যে বক্তব্যটিই সঠিক ও শুদ্ধ হউক না কেন, নবী করীম (সা)-এর আগমনের পর তাঁহাকে মানা এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনা সকল মানুষের প্রতি ফরয। এতদ্ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন পথ নাই। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মতদিগকে নবী করীম (সা)-কে মানিবার জন্যে নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছেন। তদনুসারেও ইয়াহূদীরা নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিতে আদিষ্ট হইয়াছে।

এখন আবার النسخ (রহিতকরণ) সম্পর্কিত আলোচনায় ফিরিয়া আসিতেছি। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের দাবীকে মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাহারা বলিত–আল্লাহ্র বিধানে কোনরূপ পরিবর্তন আসে না, আসিতে পারে না।' আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন–সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্। তিনি পরিবর্তন আনিতে পারেন এবং আনিয়া থাকেনও। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন– اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ (জানিয়া রাখ, সৃষ্টি ও তাহার বিধান প্রদানের অধিকার এবং ক্ষমতা তাঁহারই)। এতদ্ব্যতীত 'সূরা আল ইমরান' এর প্রথমদিকে আল্লাহ তা'আলা কিতাবধারী জাতিসমূহকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اِلاَّ مَا حَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ـ الى اخر الاية

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির শরীআতে বিধান পরিবর্তন النسخ -এর ঘটনা ঘটিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে উহার ব্যাখ্যা বর্ণিত হইবে। মুসলমানগণ এই বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানে পরিবর্তন النسخ আনিতে পারেন এবং আনিয়াছেনও।

মুফাস্সির আবূ মুসলিম ইসপাহানী অবশ্য বলেন–'কুরআন মজীদে কোনরূপ রহিতকরণ النسخ ঘটে নাই।' তাহার উক্ত উক্তি দুর্বল, প্রত্যাখ্যানযোগ্য এবং অগ্রহণীয়। কুরআন মজীদের যে সকল হুকুম-আহকামে রহিতকরণ (النسخ) ঘটিয়াছে, তিনি সেই সকল হুকুম-আহকাম ও তদ্বিষয়ে সংঘটিত রহিতকরণের (النسخ) বিষয়ে নিজের পক্ষে উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, তাহার উত্তর প্রদান কষ্টকল্পিত ও ব্যর্থ। উক্ত বিষয়সমূহের কয়েকটি হইতেছে এই ঃ প্রথম বিষয়–স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে পূর্বে এক বৎসর ইদ্দত পালন করিতে হইত। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বিধান পরিবর্তন করিয়া চার মাস দশ দিনকে নারীর

পালনীয় ইদ্দত হিসাবে নির্ধারিত করিয়া দেন। উক্ত বিষয়ে আবূ মুসলিম যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা কোন গ্রহণযোগ্য উত্তর নহে। দ্বিতীয় বিষয়–পূর্বে আল বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের কিবলা ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বিধান পরিবর্তন করিয়া পবিত্র মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহ শরীফকে তাহাদের কিবলা হিসাবে নির্ধারিত করিয়া দেন। উক্ত বিষয়ে আবূ মুসলিম যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। তৃতীয় বিষয়–পূর্বে আল্লাহ তা'আলা দশজন কাফিরের বিরুদ্ধে একজন মু'মিনকে দৃঢ়তার সহিত লড়িতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে উক্ত নির্দেশ পরিবর্তন করিয়া তিনি একজন মু'মিনকে দুইজন কাফিরের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত লড়িতে নির্দেশ দেন। চতুর্থ বিষয়– পূর্বে নবী করীম (সা)-এর সহিত কোন বিষয়ে গোপন পরামর্শ করিবার পূর্বে গরীব মিসকীনকে কিছু সাদকা দিবার বিধান ছিল। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বিধান তুলিয়া দেন।

এতদ্ব্যতীত অনুরূপ আরও দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

মুসলমানদের কর্তব্য

(١٠٨) اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

১০৮. তোমরা কি তোমাদের রসূলকে প্রশ্ন করিতে চাও, যেইভাবে ইতিপূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হইত? যে ব্যক্তি ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করে, অনন্তর সে অবশ্যই সঠিক পথ হারাইয়াছে।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্বে তৎসম্বন্ধে নবী করীম (সা)-এর নিকট অহেতুক অতিরিক্ত প্রশ্ন করিতে মু'মিনদিগকে নিষেধ করিতেছেন।

এইরূপ অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ - وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ -

"হে মু'মিনগণ। তোমরা এইরূপ বিষয়সমূহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না–যে সব বিষয় প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইলে উহা তোমাদিগকে বিব্রত, উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিবে। আর কুরআন মজীদ নাযিল হইবার কালে যদি তোমরা উহাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন কর, তবে উহাদিগকে তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে।"

অর্থাৎ বিধি-নিষেধের আয়াতসমূহ নাযিল হইবার পর যদি তোমরা উহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাও, তবে তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। তাই কোন বিষয় ঘটিবার পূর্বে তোমরা উহা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না। কারণ, এইরূপ করিলে তোমাদের প্রশ্নের দরুনই উহা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ বা হারাম করিয়া দেওয়া হইতে পারে।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'অধিকতর অপরাধী হইতেছে সেই মুসলমান, যে মুসলমান এইরূপ একটি বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল যে বিষয়টি হারাম ছিল না, কিন্তু তাহার প্রশ্নের দরুন উহা হারাম হইয়া গেল।'

একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করিল–'কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় স্ত্রীর সহিত কোন পর পুরুষকে দেখিতে পায়, তবে সে কি করিবে? এইরূপ ব্যক্তি উভয় সংকটে পতিত হয়। সে যদি মুখ খুলে, তবে তো বিরাট একটি কথা তাহাকে উচ্চারণ করিতে হয়। আবার যদি সে চুপ থাকে; তবে তো এইরূপ ঘৃণ্য ঘটনা তাহাকে হজম করিয়া যাইতে হয়।' নবী করীম (সা) উক্ত প্রশ্ন পছন্দ করিলেন না। তিনি উহা অপছন্দ করিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা 'লিআন "لعان" এর বিধান[১] নাযিল করিলেন।

হযরত মুগীরাহ ইব্ন শু'বা (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) অহেতুক তর্ক-বিতর্ক, সম্পত্তির অপচয় এবং অহেতুক অধিক প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিতেন।' মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছি ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'আমি যাহা তোমাদের নিকট উল্লেখ করিতে বিরত রহিয়াছে, তোমরা আমাকে তাহা উল্লেখ করা হইতে বিরত থাকিতে দাও। অহেতুক অতিরিক্ত প্রশ্ন করিবার দরুন এবং ইচ্ছা মতে নবীর পথ হইতে ভিন্ন পথ গ্রহণ করিবার দরুন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আমি তোমাদিগকে কোন আদেশ দিলে তোমরা যথাসাধ্য উহা পালন করিবে। আর আমি তোমাদিগকে কোন কাজ করিতে নিষেধ করিলে তোমরা উহা হইতে বিরত থাকিবে।'

উক্ত কথাগুলি নবী করীম (সা) কখন বলিয়াছিলেন? একদা নবী করীম (সা) সাহাবাদিগকে বলিলেন–'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করিয়াছেন। ইহাতে জনৈক সাহাবী প্রশ্ন করিলেন–'হে আল্লাহ্র রসূল! প্রতি বৎসর?' নবী করীম (সা) তাহার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। সাহাবী এইরূপে তিনবার প্রশ্ন করিলেন এবং নবী করীম (সা) তিনবারই নিরুত্তর রহিলেন। সাহাবী চতুর্থবার প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন–না; প্রতি বৎসর না।' তিনি আরও বলিলেন–'যদি আমি 'হ্যাঁ' বলিতাম, তবে প্রতি বৎসর হজ্জ করা তোমাদের উপর ফরয হইত। আর প্রতি বৎসর হজ্জ করা তোমাদের উপর ফরয হইলে উহা আঁদায় করিতে পারিতে না।' অতঃপর নবী করীম (সা) উপরোক্ত কথাগুলি বলিলেন।

হযরত আনাস (রা) বলেন–'নবী করীম (সা) আমাদিগকে তাঁহার নিকট কোন প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। (অতঃপর আমরা আর কোন প্রশ্ন করিতাম না)। তখন গ্রাম হইতে কেহ আসিয়া প্রশ্ন করিলে আমরা নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে উহার উত্তর শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতাম।'

হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, আবূ সিনান, ইসহাক ইব্ন সুলায়মান, আবূ কুরায়ব ও হাফিজ আবূ ইয়ালা মুসেলী স্বীয় 'মুসনাদ' নামক হাদীস সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন–'আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট একটি বিষয়ে প্রশ্ন করিব বলিয়া মনে আশা পোষণ করিতাম। এই অবস্থায় পূর্ণ একটি বৎসর কাটিয়া যাইত। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও তাঁহার নিকট প্রশ্নটি প্রকাশ করিতে

১. স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করিলে এবং সে স্বীয় অভিযোগের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষী উপস্থাপিত করিতে না পারিলে যে ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাহাকে 'লিআন' বলা হয়। সূরা নূরের প্রথম রুকূতে উক্ত ব্যবস্থা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

আমার মনে সাহস হইত না। আর আমরা কামনা করিতাম গ্রাম হইতে লোকেরা আসিয়া তাঁহার নিকট প্রশ্ন করুক যাহাতে আমরা তাহাদের প্রশ্নের কারণে অজানা কথা জানিতে পারি।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আতা ইব্ন সায়িব, ইব্ন ফুযায়ল, মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ইমাম আল বায্যার বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন–'আমি নবী করীম (সা)-এর সাহাবীগণ অপেক্ষা অধিকতর উত্তম কোন জনগোষ্ঠি দেখি নাই। তাঁহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট মাত্র বারোটি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর কুরআন মজীদে বর্ণিত রহিয়াছে। যেমন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ... ...

তাহারা তোমার নিকট শরাব এবং জুয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। ... ...

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ... ...

আর তাহারা অতিশয় সম্মানিত (নিষিদ্ধ) মাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। ... ...

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ... ...

আর তাহারা ইয়াতীমদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। ... ...

এবং অনুরূপ অন্য কয়েকটি প্রশ্ন যাহার উত্তর কুরআন মজীদে বর্ণিত রহিয়াছে।'

শব্দার্থ ঃ আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত أَمْ। শব্দটির এই স্থলে দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথম অর্থ ঃ 'বরং।' দ্বিতীয় অর্থ ঃ 'কি?' অর্থাৎ নিষেধাত্মক প্রশ্নবোধক অব্যয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন এবং কাফির উভয় শ্রেণীর বান্দাকে সম্বোধন করিয়াছেন। কারণ, নবী করীম (সা) ও মু'মিন ও কাফির উভয় শ্রেণীর লোকের নিকট প্রেরিত হইয়াছেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَئَلُوْا مُوْسٰى اَكْبَرَ مِنْ ذَالِكَ فَقَالُوْا اَرِنَا جَهْرَةً - فَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ -

'আহলে কিতাব জাতি তোমার নিকট দাবী জানায় যে, তুমি আকাশ হইতে একটি কিতাব তাহাদের নিকট নাযিল করাইবে। ইতিপূর্বে তাহারা মূসার নিকট তদপেক্ষা অধিকতর অসম্ভব দাবী জানাইয়াছিল। তাহারা বলিয়াছেন–'আমাদিগকে প্রকাশ্যরূপে আল্লাহ্কে দেখাও।' তাহাদের উক্ত অত্যাচারের পরিণতিতে বজ্র তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিল।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা রাফে' ইব্ন হুরায়মালাহ এবং ওয়াহাব ইব্ন যায়দ নবী করীম (সা)-কে বলিল–হে মুহাম্মদ! তুমি আকাশ হইতে আমাদের জন্যে একটি কিতাব লইয়া আস, যে কিতাব আমরা পড়িয়া দেখিব। আর তুমি আমাদের জন্য কতগুলি ঝরনাধারা উৎসারিত করিয়া দাও। তুমি আমাদের উক্ত দাবী পূরণ করিলে আমরা তোমাদের প্রতি ঈমান আনিব এবং তোমাকে মানিয়া চলিব।

ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ـ

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী' ইব্ন আনাস ও ইমাম আবূ জা'ফর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক সাহাবী নবী করীম (সা)-কে বলিলেন-'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের গুনাহের কাফ্ফারা যদি বনী ইসরাঈল জাতির গুনাহের কাফ্ফারার ন্যায় হইত তবে কত ভাল হইত!' ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন-'হে আল্লাহ্! আমরা উহা চাই না!' তিনি উহা তিনবার বলিলেন। অতঃপর বলিলেন-আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, উহা বনী ইসরাঈল জতিকে তিনি যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বনী ইসরাঈল জাতির কেহ কোন গুনাহ করিলে সে নিজে গৃহের দরজায় উহা এবং উহার কাফ্ফারার বিবরণ লিখিত দেখিত। সে যদি কাফ্ফারা প্রদান করিত, তবে উক্ত গুনাহ হইত তাহার জন্য ইহলৌকিক শাস্তির কারণ। আর যদি উহা প্রদান না করিত, তবে উক্ত গুনাহ হইত তাহার জন্যে পারলৌকিক শাস্তির কারণ। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, উহা বনী ইসরাঈল জাতিকে যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেয়তর। 'যদি কেহ গুনাহ করে অথবা নিজের উপর অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল ও কৃপাময় পাইবে।' (আল কুরআন)। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন-'দুই জুমআর নামায ও প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামায উহাদের মধ্যবর্তী দিন ও সময়সমূহের গুনাহের কাফ্ফারা।' তিনি আরও বলিলেন-'যদি কেহ কোন গুনাহ করিতে ইচ্ছা করে, অতঃপর উহা না করে, তবে তাহার আমলনামায় কোন গুনাহ লিখিত হইবে না। আর যদি গুনাহ করিবার ইচ্ছা করিবার পর গুনাহটি করে, তবে তাহার আমলনামায় মাত্র একটি গুনাহ লিখিত হইবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ কোন নেক কাজ করিতে ইচ্ছা করে অতঃপর উহা না করে, তবে তাহার আমলনামায় একটি নেকী লিখিত হইবে। আর যদি সে নেক কাজ করিবার ইচ্ছা করিবার পর নেক কাজটিও করে, তবে তাহার আমলনামায় অনুরূপ দশটি নেকী লিখিত হইবে। আর যে ব্যক্তি গুনাহ লইয়া আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হইবে, সে মহা ধ্বংসে পতিত হইবে।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ الى الاية

মুজাহিদ বলেন-'كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ ইতিপূর্বে যেমন আল্লাহ্কে প্রকাশ্যরূপে দেখাইবার জন্যে মূসার নিকট দাবী জানানো হইয়াছিল।' মুজাহিদ আরও বলেন-একদা কুরায়শ গোত্রের মুশরিকরা নবী করীম (সা)-কে বলিল-'হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদের জন্যে সাফা পর্বতটিকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দাও। (তুমি এইরূপ করিলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনিব।)' নবী করীম (সা) বলিলেন-'বেশ! তাহাই হইবে। উহা তোমাদের জন্যে বনী ইসরাঈল জাতির উদ্দেশ্যে আকাশ হইতে অবতীর্ণ খাদ্যের সমতুল্য হইবে।' ইহাতে মুশরিকরা ঈমান আনিতে অসম্মতি জানাইয়া ফিরিয়া গেল। সুদ্দী এবং কাতাদাহ হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

সারকথা এই যে, বনী ইসরাঈল জাতি যেইরূপে সত্য বিদ্বেষের কারণে হযরত মূসা (আ)-এর নিকট অযৌক্তিক দাবী জানাইয়াছিল, সেইরূপে সত্য বিদ্বেষে পরিচালিত হইয়া নিরুত্তর করিবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা)-এর নিকট অযৌক্তিক দাবী জানানোকে নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিন্দা করিয়াছেন।

وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ 'যে ব্যক্তি ঈমানের বিনিময়ে কুফরকে খরিদ করে, সে ব্যক্তি সত্য পথ হইতে সরিয়া গিয়া মূর্খতা, গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।'

এইরূপে যাহারা সত্য বিদ্বেষে পরিচালিত হইয়া আল্লাহ্র নবীকে নিরুত্তর করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট অহেতুক ও অযৌক্তিক দাবী জানায়, তাহারাও ঈমানের বিনিময়ে কুফর ও গোমারাহী খরীদ করিয়া থাকে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ط وَبِئْسَ الْقَرَارُ ـ

"তুমি কি সেই সকল লোকের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছ, যাহারা আল্লাহ্র নিআমতের বিনিময়ে কুফরকে গ্রহণ করিয়াছে এবং স্বীয় দলবলকে ধ্বংস নিবাস জাহান্নামে নিপতিত করিয়াছে। তাহারা উহাতে প্রবেশ করিবে। আর উহা বড়ই নিকৃষ্ট নিবাস।"

আবুল আলীয়া বলেন—'কাফির ব্যক্তি শান্তির বিনিময়ে শাস্তিকে গ্রহণ করে।'

(١٠٩) وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(١١٠) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

১০৯. আহলে কিতাবের অনেকেই চায়, তোমরা ঈমান আনার পর যদি কুফরীতে ফিরিয়া যাইতে। ইহা তো তাহাদের ভিতরে সত্য প্রকাশের ফলে সৃষ্ট বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ। তাই তাহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

১১০. আর সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। আর যাহা কিছু তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠাইবে তাহা আল্লাহ্র কাছে পাইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের সকল কাজ দেখেন।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে কিতাবধারী কাফিরদের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছেন ও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে বিজয় ও সাহায্য না আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করিবার জন্যে তাহাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন এবং তাহাদিগকে নামায কায়েম রাখিতে ও যাকাত প্রদান অব্যাহত রাখিতে বলিতেছেন। কিতাবধারী কাফিররা জানে যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রসূল। এতদ্সত্ত্বেও তাহারা ঈমান আনিতেছে না। তাহাদের ঈমান না আনিবার কারণ তাহাদের অন্তরের হিংসা ও বিদ্বেষ। আল্লাহ তা'আলা এই অবস্থায় মু'মিনদিগকে ধৈর্যধারণ করিতে বলিতেছেন। তিনি মু'মিনদিগকে বলিতেছেন—একদিন তোমাদের নিকট আল্লাহ্র সাহায্য আগমন করিবে। সেই দিন এইসব সত্যদ্বেষী হিংসাপরায়ণ কাফিরের ষড়যন্ত্রমূলক অত্যাচারের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। যতদিন আল্লাহ্র সেই প্রত্যাশিত সাহায্য না আসে, ততদিন তোমরা ধৈর্যধারণ করিতে থাক।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হুয়াই ইব্ন আখতাব এবং আবূ ইয়াসির ইব্ন আখতাব নামক দুইজন ইয়াহূদী আরবের মুশরিকদের প্রতি অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ ছিল। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে ইয়াহূদীদের ঘরে পয়দা না করিয়া মুশরিকদের ঘরে পয়দা করিয়াছিলেন। তাহারা মানুষকে ইসলাম হইতে ফিরাইয়া লইবার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করিত। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ ـ الى اخر الاية

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় যুহরী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ' এই আয়াতে কা'ব ইব্ন আশরাফ নামক ইয়াহূদীর ইসলাম বিদ্বেষের কথা বর্ণিত হইয়াছে।'

আব্দুল্লাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র আব্দুর রহমান, যুহরী, শুআয়ব, আবুল ইয়ামান, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'কা'ব ইব্ন আশরাফ একজন ইয়াহূদী কবি ছিল। সে কবিতায় নবী করীম (সা)-কে নিন্দা করিত। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ ـ الى اخر الاية

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একজন উম্মী নবী আহলে কিতাব জাতিকে তাহাদের কিতাব ও নবী সম্বন্ধে সংবাদ দিতেন এবং তাহাদের নিকট রক্ষিত সকল সত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেন। অথচ তাহারা কি করিত? তাহারা সেই নবীকে এবং তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ সত্যসমূহকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিত না এবং উহাদের প্রতি ঈমান আনিত না। তাহাদের এই কুফর ও অবাধ্যতার কারণ হিংসা ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না। তাহারা জানিত এবং বুঝিত যে, মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ ওহী সত্য। এতদসত্ত্বেও তাহারা আল্লাহ্র নবী ও তাঁহার কিতাবের প্রতি ঈমান আনিত না। উহার একমাত্র কারণ তাহাদের অন্তরের হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা। وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ ـ الى اخر الايتين। এই আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা একদিকে আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের উপরোক্ত হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে ধিক্কার ও

লজ্জা দিয়াছেন; অন্যদিকে বিনয়ের সহিত সত্যকে মু'মিনদের গ্রহণ করিবার কারণে তাহাদিগকে বিপুল পুরস্কারে পুরস্কৃত করিবার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

রবী' ইব্ন আনাস বলেন- مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ 'তাহাদের পক্ষ হইতে।' আবুল আলীয়া বলেন, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ অর্থাৎ 'মুহাম্মদ (সা) যে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল এই সত্যটি তাহাদের নিকট স্পষ্ট হইবার পর। আহ্লে কিতাবের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে তাহারা নবী করীম (সা)-এর পরিচয় ও গুণাবলী এবং তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী লিখিত দেখিত। এতদসত্ত্বেও তাহারা এই হিংসায় তাঁহার প্রতি ঈমান আনিতে অসম্মতি জানাইত যে, তিনি তাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ না করিয়া অন্য সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।' কাতাদাহ এবং রবী' ইব্ন আনাসও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتَّى يَاتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ অর্থাৎ যতদিন আল্লাহ্র সাহায্য না আসে এবং ইসলামের বিজয় সূচিত না হয়, ততদিন কাফিরদের অত্যাচার চলিতে থাকিবে। তোমরা তাহাদিগকে ক্ষমা করিও এবং মার্জনা করিও।

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَتُبْلَوُنَّ فِى اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ - وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا ط وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ -

'তোমাদের জান-মালের উপর বিপদ আসিবার মাধ্যমে তোমরা পরীক্ষিত হইবে। ... এমতাবস্থায় যদি তোমরা দৃঢ় ও অবিচল থাক এবং সংযম অবলম্বন কর, (তবে উহা তোমাদিগকে মহা কল্যাণ আনিয়া দিবে)। কারণ, উহা মহৎ গুণাবলীর অন্যতম গুণ।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا আয়াতাংশ পরবর্তীকালে নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা রহিত منسوخ হইয়া গিয়াছে ঃ

فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ "মুশরিকদিগকে যেখানে পাও, সেখানে তাহাদিগকে হত্যা কর।"

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَايُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَلَايَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ -

"যে সকল কিতাবধারী লোক না আল্লাহ্র প্রতি আর না আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহ্ ও রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা হারাম করে না আর কোন ন্যায়-নীতি

মানিয়া চলে না, তাহারা যতদিন বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান না করে, ততদিন তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করিয়া যাও।"

আবুল আলীয়া, রবী' ইব্ন আনাস, কাতাদাহ এবং সুদ্দীও অনুরূপ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতাংশে কাফিরদের অত্যাচারের বিষয়ে ধৈর্যধারণ করিবার জন্যে মু'মিনদের প্রতি যে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, জিহাদের আয়াত দ্বারা তাহা রহিত করা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতাংশের অব্যবহিত পরবর্তী অংশ দ্বারাও উক্ত রহিত হইবার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। উহার অব্যবহিত পরবর্তী অংশ হইতেছে حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ যতদিন আল্লাহ্ তাঁহার নির্দেশ (জিহাদের নির্দেশ) প্রদান না করেন।

হযরত উসামা ইব্ন যায়দ হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া ইব্ন জুবায়র, যুহরী, শুআয়ব, আবুল ইয়ামান, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) এবং তাঁহার সাহাবীগণ মুশরিক ও আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের জুলুম অত্যাচার সহিয়া যাইতেন। কাফিরদের জুলুম অত্যাচারের বিষয়ে তাহারা নিম্নোক্ত আয়াতাংশে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মানিয়া চলিতেন ঃ

فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ কিন্তু, আল্লাহ্ তা'আলা যখন জিহাদ ফরয করিলেন, তখন তিনি নবী করীম (সা)-এর দ্বারা কুরায়শের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে হত্যা করাইলেন।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ। আমি (ইব্ন কাছীর) উহা সিহাহ সিত্তার কোন কিতাবে দেখি নাই। তবে হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে প্রায় উহার অনুরূপ একটি কথা বর্ণিত রহিয়াছে।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ -"

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে সালাত কায়েম করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। সালাত ও যাকাতের উসীলায় আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সাহায্য করিবেন। যেই দিন কাফিরদের ক্ষমা প্রার্থনা তাহাদিগকে উপকৃত করিতে পারিবে না এবং তাহারা আল্লাহ্র লা'নতপ্রাপ্ত হইয়া জঘন্য বাসস্থানে থাকিতে বাধ্য হইবে, সেই ভয়াবহ দিনে সালাত ও যাকাত মু'মিনদিগকে সাহায্য করিবে।

"اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ" অর্থাৎ হে লোক সকল! আল্লাহ্ তোমাদের আমল ও কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তোমরা নেক আমল ও বদ আমল যাহাই কর না কেন, তিনি তোমাদিগকে উহার পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করিবেন।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর বলেন—'উপরোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নেক ও বদ সকল আমল প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তিনি তোমাদের আমল অনুযায়ী তোমাদিগকে পুরস্কার বা শাস্তি

প্রদান করিবেন ; অতএব, তোমরা বদ আমলের নিকটবর্তী হইও না।' উক্ত অংশটি সংবাদসূচক বাক্য (جملہ خبریہ) হইলেও আল্লাহ্ তা'আলা উহা দ্বারা মু'মিনদিগকে নেক আমল করিতে এবং বদ আমল হইতে দূরে থাকিতে নির্দেশ দিতেছেন। তাহারা নেক আমল করিলে তিনি তাহাদিগকে আখিরাতে পুরস্কার প্রদান করিবেন। যেমন অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ

ইমাম ইব্ন জারীর আরও বলেন ঃ 'بصير শব্দটি مبصر শব্দের পরিবর্তিত রূপ। অনুরূপ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত হইতেছে নিম্নোক্ত শব্দসমূহ ঃ بديع শব্দটি مبدع শব্দের পরিবর্তিত রূপ। اليم শব্দটি مؤلم শব্দটির পরিবর্তিত রূপ।' আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত উকবা ইব্ন আমের (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল খায়ের, ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব, ইব্ন লাহীআ, ইব্ন বুকায়র, আবূ যুরআ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উকবা ইব্ন আমের (রা) বলেন ঃ 'আমি নবী করীম (সা)-কে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। তিনি উহার শেষাংশ এইরূপে পড়িতেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ উহার তিলাওয়াত শেষ করিয়া তিনি বলিতেন– بِكُلِّ شَيْئٍ بَصِيْرٌ '(তিনি) সর্ববিষয়ের দ্রষ্টা।'

ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের অযৌক্তিক দাবী

(١١١) وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(١١٢) بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

(١١٣) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۪ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

১১১. আর তাহারা বলে, 'ইয়াহুদী ও নাসারা ছাড়া কখনও কেহ জান্নাতে যাইবে না।' ইহা তাহাদের কল্পনা বিলাস। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, দলীল দেখাও।'

১১২. হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করিয়াছে এবং সদাশয় হইয়াছে, অনন্তর তাহার প্রভুর সকাশে তাহার পুরস্কার রহিয়াছে। আর তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হয় না।

১১৩. নাসারারা বলে, 'ইয়াহুদীদের কোন ভিত্তি নাই।' তেমনি ইয়াহুদীরা বলে, 'নাসারাদের কোন ভিত্তি নাই।' অথচ উভয় দল কিতাব পাঠ করিতেছে। যাহারা কিছুই জানে না তাহারাও অনুরূপ কথা বলিতেছে। অতঃপর আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাহাদের মধ্যকার মতভেদের মীমাংসা প্রদান করিবেন।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশরিকদের হিদায়েত সম্পর্কিত দাবীকে মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়া এতদ্সম্বন্ধীয় প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াহুদী, নাসারা এবং মুশরিকদের প্রত্যেক সম্প্রদায় দাবী করে যে, একমাত্র তাহারাই হিদায়েতপ্রাপ্ত এবং তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহাদের দাবীর সমর্থনে তাহাদের নিকট কোন যুক্তি নাই। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কাহারও দাবী সত্য নহে। যাহারা হৃদয়ে সত্যের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে, সত্য আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের সহিত উহা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করতে নেক আমল করে, তাহারাই হিদায়েতপ্রাপ্ত এবং তাহারাই কেবল জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশরিক এই তিন সম্প্রদায়ের কোন সম্প্রদায়ই হিদায়েতপ্রাপ্ত নহে এবং তাহাদের কেহই জান্নাতে যাইতে পারে না। কারণ, তাহারা নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনে নাই এবং তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ সত্যকে বিনয়ের সহিত মানিয়া লয় নাই। এইরূপে তাহারা আল্লাহর নিকট বিনয়ের সহিত আত্মসমর্পণ করিতে অসম্মতি জানাইয়াছে। আলোচ্য আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত প্রাপ্তির জন্যে প্রয়োজনীয় উপরোক্ত মৌলিক গুণাবলীর অপরিহার্যতা বর্ণনা করত ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশরিকদের গোমরাহী প্রমাণিত করিয়াছেন। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُهٗ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ -

'ইয়াহুদী ও নাসারারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও স্নেহভাজন। তুমি বল, 'তবে কেন তিনি তোমাদের গুনাহের কারণে তোমাদিগকে শাস্তি দেন? বরং আল্লাহ্ যে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমরা তাহার অন্তর্গত একদল মানুষ। তিনি যাহাকে চাহিবেন, তাহাকে ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে চাহিবেন তাহাকে শাস্তি দিবেন।"

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلاَّ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ -

"আর তাহারা (ইয়াহুদীরা) বলে–'আমাদিগকে মাত্র কয়েকদিন আগুনে পুড়িতে হইবে; অবশ্যই বেশী দিন আগুন আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না।' তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট হইতে কোন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছ? অবশ্য তিনি তো কোনক্রমেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন না। অথচ তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে এইরূপ কথা বল, যাহা তোমাদের জানা নাই।

আবুল আলীয়া বলেন—تلك امانيهم অর্থাৎ সেইগুলি তাহাদের অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা যাহা আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণ করিবেন বলিয়া তাহারা ভিত্তিহীনভাবে আশা করে।' কাতাদাহ এবং রবী' ইব্ন আনাসও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ "তুমি বল, যদি তোমাদের দাবী সত্য হয়, তবে তোমরা নিজেদের দলীল উপস্থাপন কর।"

আবুল আলীয়া, মুজাহিদ, সুদ্দী, রবী' ইব্ন আনাস এবং কাতাদাহ বলেন—برهان অর্থাৎ 'দলীল প্রমাণ।'

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ অর্থাৎ বরং যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে আমল করে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ "যদি তাহারা তোমার সঙ্গে বাজে তর্ক করে, তবে বল, আমি আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।"

আবুল আলীয়া এবং রবী' ইব্ন আনাস (রা) বলেন— بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ অর্থাৎ বরং যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ অর্থাৎ 'বরং যে ব্যক্তি স্বীয় 'দীন'কে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যে নির্দিষ্ট করে।'

وَهُوَ مُحْسِنٌ অর্থাৎ 'আর সে স্বীয় কাজকর্মে মুহাম্মদ (সা)-কে অনুসরণ করে।' মানুষের আমল আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গৃহীত হইবার জন্যে দুইটি শর্ত রহিয়াছে। প্রথম শর্ত এই যে, উহা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইবে। দ্বিতীয় শর্ত এই যে, উহা মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক আনীত শরীআত মুতাবিক হইবে। কোন ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমল করিলেও যদি উহা সঠিক অর্থাৎ নবী করীম (সা) কর্তৃক আনীত শরীআত অনুসারে না হয়, তবে উহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গৃহীত হইবে না। হযরত আয়েশা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'কোন ব্যক্তি যদি আমার অনুমোদনের বাহিরে গিয়া কোন কাজ করে, তবে উহা প্রত্যাখ্যাত হইবে।'

অতএব, সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসব্রত আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হইবে না। কারণ, সে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আমল করে ইচ্ছা ধরিয়া লইলেও তাহার আমল মুহাম্মদ (সা)-এর শরীআত কর্তৃক অনুমোদিত নহে। বলা অনাবশ্যক যে, নবী করীম (সা) সমগ্র মানব জাতির জন্যে পথ প্রদর্শকরূপে প্রেরিত হইয়াছেন। সন্ন্যাসী এবং তাহাদের ন্যায় বিপথগামী লোকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা অন্যায় বলিতেছেন ঃ

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا "আর আমি তাহাদের আমলের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে গিয়া উহাকে নগণ্য বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করিয়াছি।"

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً ـ حَتّٰى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ـ

'আর যাহারা কুফর করিয়াছে, তাহাদের আমল মরু প্রান্তরে অবস্থিত মরীচিকার ন্যায়। যাহাকে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি দূর হইতে পানি মনে করে। অতঃপর সে যখন উহার নিকটে উপস্থিত হয়, তখন উহাকে কোন বস্তু হিসাবে দেখিতে পায় না।'

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً - تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ -

"সেইদিন কতগুলি মুখমণ্ডল ভীত-বিহ্বল, বিমর্ষ ও বিষণ্ন থাকিবে। তাহারা অতি উত্তপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। তাহাদিগকে ফুটন্ত পানি পান করান হইবে।"

হযরত উমর (রা) সম্বন্ধে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ তিনি بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ - الى اخر الاية এই আয়াতকে সন্ন্যাসীদের আমলের বিফলতা বর্ণনাকারী আয়াত মনে করিতেন।' উক্ত রিওয়ায়েত এই গ্রন্থে পরবর্তীতে বর্ণিত হইবে।

তেমনি আবার কাহারও আমল যদি বাহ্যত শরীআতসম্মত হয়; কিন্তু উহা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত না হয়, তবে উহাও প্রত্যাখ্যাত হইবে। মুনাফিক এবং রিয়াকার মু'মিন বাহ্যত যে সকল শরীআত সম্মত কাজ করিয়া থাকে, তাহা এই শ্রেণীর আমল। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ - وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى - يُرَائُوْنَ النَّاسَ وَلَايَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا -

"মুনাফিকরা নিশ্চয় নিজেদের ধারণায় আল্লাহ্কে প্রতারিত করে। মূলত তিনি তাহাদিগকে (অবকাশ দিয়া) প্রতারণার শিকার করেন। আর তাহারা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়। তাহারা মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে নামায আদায় করে। বস্তুত তাহারা আল্লাহ্কে কমই স্মরণ করিয়া থাকে।"

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ - اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَائُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ -

"সেই সকল নামাযীর জন্যে ধ্বংস নির্ধারিত রহিয়াছে-যাহারা স্বীয় নামাযে উদাসীন থাকে। যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্যে ইবাদত করে আর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া মানুষকে সাহায্য করে না।"

আখিরাতে আল্লাহ্র নিকট পুরস্কার পাইতে হইলে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই যে শরীআতসম্মত আমল করিতে হইবে, তাহা নিম্নোক্ত আয়াতেও বর্ণিত হইয়াছে ঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا -

"যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর দর্শন লাভ করিতে চায়, সে যেন নেক আমল করে এবং স্বীয় প্রভুর ইবাদতে অন্য কাহাকেও শরীক না করে।"

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

অর্থাৎ– বরং যাহারা একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নেক আমল করে, তাহাদের জন্যে তাহাদের প্রভুর নিকট উহার পুরস্কার নির্ধারিত রহিয়াছে। আর তাহাদের উপর ভবিষ্যতে কোন বিপদাশংকাও থাকিবে না এবং তাহারা অতীত কোন ক্ষতির জন্যেও দুঃখ করিবে না।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ 'আখিরাতে বিপদাশংকা থাকিবে না আর দুনিয়াতেও তাহারা মৃত্যু ভয়ে ভীত হইবে না।'

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ـ

উপরোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারা জাতির পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আবী মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইস্হাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'নাজরান হইতে এক নাসারা প্রতিনিধিদল যখন নবী করীম (সা)-এর নিকট গমন করিল, তখন একদল ইয়াহুদী আলিম আসিয়া নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে তাহাদের সহিত তর্ক জুড়িয়া দিল। তাহাদের মধ্য হইতে রাফে' ইব্ন হার্মালা (رافع ابن حرملة) নামক জনৈক আলিম নাসারা দলকে বলিল–'তোমরা যাহা লইয়া আছ, তাহা কিছুই না।' (অর্থাৎ তোমরা যে ধর্ম লইয়া আছ, তাহা কোন ধর্মই না)। সে হযরত ঈসা (আ) এবং ইন্জীলের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করিল। ইহাতে জনৈক নাসারা ইয়াহুদীদিগকে বলিল–'তোমরা যাহা লইয়া আছ, তাহা কিছুই না।' (অর্থাৎ তোমাদের ধর্ম একেবারেই বাজে ও মিথ্যা ধর্ম।)' সে হযরত মূসা (আ)-এর নবূওত এবং তাওরাতের সত্যতাকে অস্বীকার করিল। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ـ

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন–'ইয়াহুদী ও নাসারা উভয় জাতির প্রত্যেকেই নিজ নিজ আসমানী কিতাবে অপর জাতির ও কিতাবের সত্যতার কথা পাঠ করিয়া থাকে। এতদসত্ত্বেও তাহারা একে অপরের নবী এবং কিতাবকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করে।'

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন–'পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যক্ত তাহাদের দাবী সত্য নহে; বরং প্রথম যুগের ইয়াহুদী ও নাসারা সত্য ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।' এইরূপ কাতাদাহও উহার ব্যাখ্যায় বলেন–'ইয়াহুদী ও নাসারা উভয় জাতিই তাহাদের নিজ নিজ জন্মের প্রথমদিকে হক ও ন্যায়ের পথে ছিল। পরবর্তীকালে তাহারা দীন বিরোধী মিথ্যা কথা নিজেদের দীনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইরূপে তাহারা দীন হইতে দূরে সরিয়া যায়।'

আবুল আলীয়া, রবী' ইব্‌ন আনাস এবং এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী কাতাদাহও উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতে যে সকল ইয়াহূদী ও নাসারার কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা ছিল নবী করীম (সা)-এর যুগের ইয়াহূদী ও নাসারা।' আবুল আলীয়া প্রমুখ ব্যাখ্যাকারের উপরোক্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই যে, 'ইয়াহূদী ও নাসারাদের একদল আরেকদলের বিরুদ্ধে যে উক্তি করিয়াছিল, তাহা সত্য ছিল। কিন্তু وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ (অথচ তাহারা কিতাব তিলাওয়াত করিয়া থাকে) আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায়, 'তাহাদের একদল আরেকদলের বিরুদ্ধে যে উক্তি করিয়াছিল, উহা সত্য ছিল না এবং সেই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাহাদিগকে নিন্দা করিতেছেন।' উপরোদ্ধৃত আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, 'ইয়াহূদী ও নাসারা উভয় জাতিই আস্‌মানী কিতাব তিলাওয়াত করিয়া থাকে। তাওরাতে ইন্‌জীল কিতাব ও হযরত ঈসা (আ)-এর সত্যতা এবং ইন্‌জীলে তাওরাত কিতাব ও হযরত মূসা (আ)-এর সত্যতা বর্ণিত রহিয়াছে। উক্ত কিতাবসমূহের শরীআত এক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রবর্তিত শারীআত ছিল। এমতাবস্থায় তাহারা কিতাব পড়া সত্ত্বেও কিরূপে একদল আরেকদলকে ভ্রান্ত ও গোমরাহ বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারে? উহার কারণ তাহাদের অন্তরের সত্য বিদ্বেষ ছাড়া অন্য কিছু নহে।' উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ এবং এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী কাতাদাহও আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন যে, ইয়াহূদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের উপরোক্ত দাবী অজ্ঞ লোকদের ন্যায় মূর্খতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত।

আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লেখিত اَلَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ (অজ্ঞ লোকেরা) কাহারা এই বিষয়ে তাফসীরকারণগণ একমত নহেন। রবী' ইবনে আনাস এবং কাতাদাহ বলেন ঃ 'উক্ত অজ্ঞ লোকেরা হইতেছে নাসারা বা খ্রিস্টান জাতি।' ইবনে জুরায়জ বলেন ঃ 'একদা আমি আতা'র নিকট উক্ত অজ্ঞ লোকেরা কাহারা তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, উহারা ইয়াহূদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের পূর্বে অতিক্রান্ত কতগুলো জাতি।'

সুদ্দী বলেন ঃ তাহারা হইতেছে আরবের মুশরিক জাতি। তাহার বলিত, মুহাম্মদ যে ধর্ম পালন ও প্রচার করে, উহা কোন ধর্ম নহে।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ 'উক্ত অজ্ঞ লোকেরা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের লোক নহে, বরং যাহারা সত্য বিদ্বেষের কারণে আত্মপ্রতারিত হইয়া অযৌক্তিকভাবে নিজদিগকে সত্যের অনুসারী এবং অন্যদিগকে অসত্যের অনুসারী মনে করে, তাহারা যে সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন, উক্ত অজ্ঞ লোকেরা তাহারাই।' ইমাম ইবনে জারীরের ব্যাখ্যাই সঠিক। কারণ উক্ত 'অজ্ঞ লোকেরা' বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের লোক এইরূপ বলিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। আল্লাহ্‌ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিনে তাহাদের বিরোধ মীমাংসা করিবেন।'

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّابِئِيْنَ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ شَهِيْدٌ ـ

'মুমিন, ইয়াহুদী, সাবিঈন, নাসারা, অগ্নি উপাসক এবং মুশরিকগণের পারস্পরিক বিরোধ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিনে নিশ্চয় মীমাংসা করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করেন।'

অনুরূপভাবে তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ـ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ـ

"তুমি বল, আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদিগকে একত্রিত করিবেন। অতঃপর তিনি আমাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন। তিনি মহান বিচারক, সূক্ষ্মজ্ঞানী।"

মসজিদ ধ্বংস প্রচেষ্টার শোচনীয় পরিণাম

(١١٤) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

১১৪. আর তাহার চাইতে জালিম কে হইতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র মসজিদে গিয়া আল্লাহ্র নাম লইতে নিষেধ করিল ও উহা ধ্বংসের চেষ্টা চালাইল। তাহারাই উহাতে সন্ত্রস্ত না হইয়া ঢুকিতে পারিবে না। তাহাদের জন্য পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্র মসজিদে আল্লাহ্র যিকর করিতে মু'মিনদিগকে কাহারা বাধা দিয়াছিল এবং কাহারা উহাকে আল্লাহ্র ইবাদত হইতে বিরাণ ও অনাবাদ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল তাফসীরকার বলেন–'উহারা ছিল নাসারা।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ الٰى اٰخر الاية 'এই আয়াতে যাহাদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা হইতেছে নাসারা।'

মুজাহিদ বলেন ঃ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ الٰى اٰخر الاية 'এই আয়াতে নাসারাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যে কষ্টদায়ক বস্তু নিক্ষেপ করিত এবং লোকদিগকে উহাতে নামায আদায় করিতে বাধা দিত।'

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا এই আয়াতাংশে বখতে নাসার بخت نصر বাদশাহ ও তাহার অনুচরবর্গের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সে বায়তুল মুকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। আর নাসারা জাতি উক্ত কার্যে তাহাকে সহায়তা করিয়াছিল।'

কাতাদাহ হইতে সাঈদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'যাহারা আল্লাহ্র মসজিদকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, তাহারা হইতেছে আল্লাহ্র শত্রু খ্রীস্টান জাতি। ইয়াহুদী জাতির প্রতি তাহাদের অন্তরে যে শত্রুতা বিদ্যমান ছিল, উহার কারণে তাহারা ব্যবিলনের অধিপতি অগ্নি উপাসক বখতে নাসারকে বায়তুল মুকাদ্দাস বিধ্বস্ত করিবার কার্যে সহায়তা করিয়াছিল। সে উহাকে বিধ্বস্ত করিয়া উহাতে পঁচা লাশ নিক্ষেপ করিয়াছিল। উক্ত কার্যে তাহাকে রোমক খ্রীস্টানদের সহায়তা করিবার কারণ এই যে, ইয়াহুদীরা হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ)-কে হত্যা করিয়াছিল।' হাসান বসরী হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে।

আরেকদল তাফসীরকার বলেন–যাহারা মু'মিনদিগকে আল্লাহ্র মসজিদে তাঁহার যিকর করিতে বাধা দিয়াছিল এবং উহাকে আল্লাহ্র ইবাদত হইতে বিরাণ ও অনাবাদ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, তাহারা হইতেছে মক্কার মুশরিকরা। নবী করীম (সা) বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় রওয়ানা হইলে ইহারা পথিমধ্যে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন যায়দ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন যায়দ বলেন ঃ 'তাহারা হইতেছে মক্কার মুশরিকরা। নবী করীম (সা) উমরাহ্ পালন করিবার উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হইলে পথিমধ্যে তাহারা হুদায়বিয়ায় তাঁহার পথরোধ করিয়াছিল। তাহাদের বাধা দিবার কারণে তিনি বায়তুল্লাহ শরীফে যাইতে পারেন নাই এবং পথিমধ্যেই যু-তওয়া (ذو طوى) নামক স্থানে কুরবানীর পশু যবেহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহাদের বাধার কারণেই নবী করীম (সা) তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন– ইতিপূর্বে কেহ কাহাকেও এই ঘর তাওয়াফের উদ্দেশ্যে আগত দেখিয়াও তাহাকে বাধা দেয় নাই।' তাহাতে তাহারা বলিয়াছিল–'যতদিন আমাদের একটি লোক জীবিত থাকিবে, ততদিন আমরা বদরের যুদ্ধে যাহারা আমাদের পিতৃদিগকে হত্যা করিয়াছে, তাহাদিগকে মক্কার ঘরে আসিতে দিব না।'

ইব্ন যায়দ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا (আর যাহারা উহাকে বিরাণ ও অনাবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছে।) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন–'মুশরিকরা মু'মিনদিগকে হজ্জ এবং উমরাহ্র উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র ঘরে আসিতে এবং উহা আল্লাহ্র যিকর দ্বারা আবাদ করিতে বাধা দিয়াছিল। তাহাদের উক্ত কার্যই হইতেছে আল্লাহ্র ঘরকে বিরাণ ও অনাবাদ করিতে চেষ্টা করা।'

ইমাম ইবনে আবী হাতিম বলেন–সালিমাহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইবনে জুবায়র, মুহাম্মদ ইবনে আবী মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কুরায়শ গোত্রের মুশরিকরা নবী করীম (সা)-কে আল্লাহ্র ঘরের কাছে পৌছার পরে মসজিদুল হারামে নামায আদায় করিতে বাধা দিয়াছিল। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ الى اخر الاية

ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত অভিমতদ্বয়ের প্রথমটিকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। স্বীয় অভিমতের সমর্থনে তিনি বলিয়াছেন–'কুরায়শ গোত্রের মুশরিকরা কখনও পবিত্র কা'বাকে অনাবাদ বা বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করে নাই। তবে রোমীয় খ্রিস্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাসকে অনাবাদ ও বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–তাফসীরকারগণ কর্তৃক ব্যক্ত অভিমতদ্বয়ের দ্বিতীয়টিই সঠিক বলিয়া মনে হয়। উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্ন যায়দ এবং হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) শেষোক্ত অভিমতটি ব্যক্ত করিয়াছেন। শেষোক্ত অভিমতটি এই কারণে সঠিক বলিয়া মনে হয় যে, খ্রীস্টানরা যখন ইয়াহুদীদিগকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায আদায় করিতে বাধা দিয়াছিল, তখন ইয়াহুদীদের ইবাদত ছিল আল্লাহ্র নিকট অগ্রহণীয়। কারণ, তাহাদের উপর হযরত দাঊদ (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)-এর মুখ হইতে লা'নত-এর বদদোয়া পড়িয়াছিল। উহার কারণ এই যে, তাহারা ছিল অবাধ্য ও সীমা লঙ্ঘনকারী। এই সময়ে খ্রীস্টানরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইয়াহুদীদের অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ছিল। উপরোক্ত কারণে বলা যায়, ইয়াহুদীদিগকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায আদায় করিতে খ্রীস্টানদের বাধা দেওয়া অন্যায় ছিল না।

তাফসীরকারগণের দুইটি অভিমতের শেষোক্ত অভিমতটি সঠিক মনে হইবার আরেকটি কারণ আছে। উহা এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের নিন্দা বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে তিনি মুশরিকদের নিন্দা বর্ণনা করিতেছেন। কোন্ মুশরিকদের নিন্দা? যাহারা আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁহার সাহাবীগণকে তাহাদের গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে মসজিদুল হারামে নামায আদায় করিতে বাধা দিয়াছিল, সেই মুশরিকদের নিন্দা।

ইমাম ইব্ন জারীর তাফসীরকারগণের প্রথম অভিমতের সমর্থনে যে যুক্তি পেশ করিয়াছেন এইবার উহা পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাক। তিনি বলিয়াছেন–মক্কার মুশরিকরা কখনও বায়তুল্লাহ্ শরীফকে অনাবাদ বা বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করে নাই। মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ্র ঘরকে অনাবাদ বা বিধ্বস্ত করিতে ত্রুটি করিয়াছে কোথায়? তাহারা আল্লাহ্র ঘরের বিরুদ্ধে যাহা করিয়াছে, অনাবাদকরণ ও বিধ্বস্তকরণ উহা অপেক্ষা কি জঘন্যতর হইতে পারে? তাহারা নবী করীম (সা) এবং তাঁহার সাহাবীগণকে আল্লাহ্র ঘর হইতে বহিষ্কার করিয়াছিল এবং উহাতে দেব-দেবীর মূর্তিসমূহ স্থাপন করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْا اَوْلِيَاءَهُ ـ اِنْ اَوْلِيَاءُهُ اِلاَّ الْمُتَّقُوْنَ ـ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ ـ

"এই বিষয়ে তাহাদের পক্ষে কি যুক্তি রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না? অথচ তাহারা মস্‌জিদুল হারামে যাইতে (মু'মিনদিগকে) বাধা দেয়। তাহারা তো তাঁহার (আল্লাহ্র) স্নেহভাজন নহে। তাঁহার স্নেহভাজন হইতেছে একমাত্র মুত্তাকীগণ; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই (ইহা) জানে না।"

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ـ اُوْلٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِى النَّارِ هُمْ خَالِدُوْنَ ـ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ

اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلاَّ اللّٰهَ - فَعَسٰى اُولٰئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ -

"মুশ্রিকরা কুফরের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবার অবস্থায় আল্লাহ্র মসজিদসমূহকে আবাদ করিতে পারে না। তাহাদের আমলসমূহ বাতিল হইয়া গিয়াছে আর তাহারা চিরদিন দোযখে থাকিবে। আল্লাহ্র মসজিদসমূহকে আবাদ করে একমাত্র তাহারা-যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকেও ভয় করে না। তাই আশা করা যায়, তাহারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হইবে।"

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهُ - وَلَوْ لاَرِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ - لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا -

"তাহারা তো সেইসব লোক-যাহারা কুফর করিয়াছে, তোমাদিগকে মসজিদুল হারামে যাইতে বাধা দিয়াছে এবং কুরবানীর পশুকে উহার নির্ধারিত স্থানে যাইতে বাধা দিয়াছে। যদি এইরূপ আশংকা না থাকিত যে, যে সকল মু'মিন নারী-পুরুষকে তোমরা চিন না, তাহাদিগকে তোমরা পদদলিত করিয়া যাইবে; ফলে তোমাদের অজ্ঞাত অবস্থায় তাহাদের কারণে তোমাদিগকে ভ্রান্তি স্পর্শ করিবে; যদ্দরুন আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন, তাহাকে স্বীয় রহমতে প্রবিষ্ট করাইবেন। তাহারা স্বীয় আচরণ হইতে ফিরিয়া না আসিলে আমি তাহাদের মধ্যকার কাফিরদিগকে নিশ্চয় কঠোর শাস্তি প্রদান করিব।"

তিনি আরও বলেন ঃ

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلاَّ اللّٰهَ -

"মূলত তাহারাই মসজিদ আবাদ করে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও ভয় করে না।"

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহারা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকেও ভয় করে না, একমাত্র তাহারাই আল্লাহ্র মসজিদসমূহকে আবাদ করে।' যাহারা আল্লাহ্র ঘরকে আবাদ করে, মুশরিকরা সেই মু'মিনদিগকে উহা হইতে বিতাড়িত ও বঞ্চিত করিয়াছিল। তাহাদের উক্ত কার্য আল্লাহ্র ঘরকে অনাবাদ করা নয় কি? শুধু তাহাই নহে। তাহারা যাহা করিয়াছিল, কোন্ অনাবাদকরণ ও বিধ্বস্তকরণ উহা অপেক্ষা অধিকতর জঘন্য হইতে পারে? এই স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ্র ঘরকে আবাদ করিবার তাৎপর্য উহাকে বাহ্যিকভাবে কায়েম করা

এবং চাকচিক্যময় করা নহে; বরং উহার তাৎপর্য হইতেছে-উহাতে আল্লাহ্র যিক্র করা, তাঁহার শরীআত উহাতে কায়েম করা এবং শির্ক ও অন্যান্য কুফর হইতে উহাকে পবিত্র করা।

أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ বাক্যটি গঠনগত দিক দিয়া সংবাদসূচক বাক্য হইলেও তাৎপর্যগত দিক দিয়া উহা একটি আদেশসূচক বাক্য। উহার তাৎপর্য এই-'হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন শক্তি সঞ্চয় করিবে, তখন ইহাদিগকে নিজেদের পদানত না করিয়া এবং উহাদের নিকট হইতে জিযিয়া গ্রহণ না করিয়া উহাতে প্রবেশ করিতে দিও না।' এই কারণেই মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম (সা) ঘোষক দ্বারা মিনার প্রকাশ্য স্থানে ঘোষণা করাইয়া দিয়াছিলেন ঃ 'শুন! আগামী বৎসর (নবম হিজরী সন) হইতে কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না এবং উলঙ্গ অবস্থায় কেহ আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না। অবশ্য যাহাদের সহিত চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের চুক্তি উহার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।' নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর উহাতে বর্ণিত নির্দেশকে বাস্তবায়িত করিবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা) উপরোক্ত ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার সমর্থনে আল্লাহ্ পাকের এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ـ

"হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা অপবিত্র ছাড়া কিছু নহে। অতএব এই বৎসর পর তাহারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটে না আসে।"

কোন কোন তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতাংশ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ -এর নিম্নোক্ত তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'মু'মিনদের উপর মুশরিকদের অত্যাচার ও নির্যাতন চালাইবার সুযোগ না থাকিলে তাহারা যাহা করিতেছে উহার উল্টাটি ঘটিত। তাহারা মু'মিনদিগকে আল্লাহ্র ঘর হইতে নির্বাসিত করিয়াছে। তাহাদের নির্যাতন চালাইবার ক্ষমতা না থাকিলে মু'মিনদের ভয়ে তাহারা কম্পমান থাকিত এবং তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় আল্লাহ্র ঘরে প্রবেশ করিতে পারিত না।'

কেহ কেহ বলেন-'আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে এই সুসংবাদ দিতেছেন যে, তাহারা অদূর ভবিষ্যতে মসজিদুল হারামসহ সকল মসজিদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এবং আল্লাহ্র ফযলে তাহারা মুশরিকদিগকে পদানত করিতে পারিবে। ফলে মুশরিকগণ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহাদের অন্তরে ভয় থাকিবে যে, তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করিলে মুসলমানগণ তাহাদিগকে ধরিয়া হত্যা করিবে অথবা অন্য কোন শাস্তি দিবে।' যথাসময়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছিলেন। উপরে আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশ বর্ণিত হইয়াছে যে, মুশরিকগণ যেন এই বৎসরের পর আর মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিতে না পারে। এতদ্ব্যতীত নবী করীম (সা) ওসিয়ত করিয়া গিয়াছেন যে, আরব উপদ্বীপে যেন ইসলামের পাশাপাশি অন্য কোন ধর্ম অবস্থান করিতে না পারে এবং ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিকে যেন উহা হইতে নির্বাসিত করা হয়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র প্রাপ্য। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নির্দেশ পালিত হইয়াছে।

উপরোক্ত নির্দেশ কেন প্রদত্ত হইয়াছে? আরব উপদ্বীপ হইতেছে মসজিদুল হারামের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত স্থান। উহা সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা (সা)-এর পবিত্র জন্মভূমি। মসজিদুল হারাম এবং মহানবী (সা) এই উভয়কে সম্মানিত করিবার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কাফিরদের এইরূপ বহিষ্কৃত হওয়া তাহাদের জন্য ইহলৌকিক লাঞ্ছনা এবং শাস্তি। বলা অনাবশ্যক যে, অপরাধ যে ধরনের হইয়া থাকে, উহার শাস্তিও সেই ধরনের হইয়া থাকে। কাফিররা নবী করীম (সা) এবং সাহাবীগণকে যেইরূপে মসজিদুল হারাম এবং পবিত্র মক্কা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছে, তাহাদিগকে সেইরূপে উক্ত স্থান এবং উহার পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে।

وَلَهُمْ فِى الْأٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ তাহারা যে পাপ করিয়াছে, উহার দরুন তাহাদিগকে আখিরাতে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তাহারা আল্লাহ্র ঘর হইতে তাঁহার রাসূলকে বহিষ্কার করিয়াছে, তথায় মূর্তি স্থাপন করিয়াছে, তথায় আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যকে পূজা করিয়াছে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের অমনোপুত অন্যান্য কার্য সংঘটিত করিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় যাহারা বলেন–উক্ত আয়াতে খ্রিস্টান জাতির নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কা'ব আহবার উল্লেখ করেন যে, খ্রিস্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাসকে অধিকার করিয়া উহাকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। আলোচ্য আয়াতে তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এখন কোন খ্রিস্টান ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

সুদ্দী বলেন–'যে কোন খ্রিস্টান নহে; বরং কোন রুমীয় খ্রিস্টান ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় সেইখানে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাদের মনে ভয় রহিয়াছে যে, তাহাদিগকে ধরিয়া হত্যা করা হইতে পারে। অথবা তাহাদের উপর জিযিয়া কর আরোপিত হইবার ফলে তাহাদের মন ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।'

কাতাদাহ বলেন–খ্রিস্টানরা গোপনে ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় কোন মসজিদেই প্রবেশ করিতে পারে না। আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–আলোচ্য আয়াতকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন। তদনুযায়ী উহাতে ইয়াহুদী, নাসারা এবং মুশরিক–ইহাদের সকলের নিন্দা এবং শাস্তি বর্ণিত হইয়াছে। খ্রিস্টান জাতি বায়তুল মুকাদ্দাস অধিকার করিয়া ইয়াহুদীরা যে পাথরটির দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিত, উহাকে অবমাননা করিয়াছিল। এইজন্যে আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছেন। অবশ্য, এই বায়তুল মুকাদ্দাস তাহাদিগকে অনেক সময়ে নিজের মধ্যে স্থান দিয়াছে। আবার, ইয়াহুদীরা উহাকে অধিকতর পরিমাণে অবমাননা করিয়াছে। আল্লাহ্ তাহাদিগকে সেইরূপে অধিকতর কঠিন শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

সুদ্দী এবং ওয়ায়েল ইব্ন দাউদ বলেন–আলোচ্য আয়াতে কাফিরদের জন্য যে ইহলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ছনার কথা বর্ণিত হইয়াছে, উহা ইমাম মাহদী (আ)-এর আগমনের পর তাঁহার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক কাফিরদের প্রতি প্রদত্ত হইবে। কাতাদাহ বলেন–'উহা হইল তাহাদের প্রতি জিযিয়া কর আরোপিত হওয়া এবং লাঞ্ছিত অবস্থা উহা তাহাদের প্রদান করা।' তবে সঠিক কথা এই যে, ইহলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ছনা তাফসীরকারগণ কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত শাস্তি ও লাঞ্ছনা অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক।

হাদীস শরীফে ইহলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ছনা এবং পারলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ছনা উভয় হইতে আল্লাহ্র নিকট নবী করীম (সা)-এর আশ্রয় চাওয়া বর্ণিত হইয়াছে। নবী করীম (সা) উভয় প্রকারের শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাহিয়াছেন।

হযরত বিশ্র ইব্ন আরতাত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আইউব ইব্ন মাইসারাহ ইব্ন হালস, তৎপুত্র মুহাম্মদ, হায়ছাম ইব্ন খারিজা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) দোআ করিতেন-'হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সকল কার্যের পরিণতিতে আমাদিগকে মঙ্গল ও কল্যাণ দান কর। আর তুমি আমাদিগকে দুনিয়ার আযাব ও লাঞ্ছনা এবং আখিরাতের আযাব ও লাঞ্ছনা হইতে বাঁচাও।'

উক্ত হাদীসটি একটি গ্রহণযোগ্য হাদীস। তবে উহা 'সিহাহ সিত্তার' কোন গ্রন্থে উল্লেখিত হয় নাই। উক্ত হাদীসের রাবী সাহাবী হযরত বিশ্র ইব্ন আরতাত (যিনি ইব্ন আরাতাত নামেও পরিচিত) হইতে উপরোক্ত হাদীসটি ভিন্ন অন্য আর একটি মাত্র হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন , 'যুদ্ধক্ষেত্রে হাত কাটিবার শাস্তি প্রযুক্ত হইবে না।'

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ

(١١٥) وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

১১৫. আর আল্লাহ্র জন্য পূর্ব ও পশ্চিম (সবই)। তাই যেদিকেই তোমরা ফির, আল্লাহ্র কিবলা পাইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাব্যাপক, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা) এবং তাঁহার সাহাবীগণকে কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে সান্ত্বনা দিতেছেন। পবিত্র মক্কায় অবস্থান করিবার কালে নবী করীম (সা) বায়তুল্লাহ্ শরীফকে সম্মুখে রাখিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিতেন। প্রিয় মসজিদ মসজিদুল হারামকে ত্যাগ করিয়া মদীনায় আসিয়া তিনি ষোল বা সতের মাস ধরিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিয়াছিলেন। অবশ্য উক্ত সময় অতিবাহিত হইবার পর আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে বায়তুল্লাহ্ শরীফকে কিবলা হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছিলেন। উপরোক্ত কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন জুরায়জ, উসমান ইব্ন আতা এবং হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদের সনদে আবূ উবায়দ কাসিম ইব্ন সাল্লাম স্বীয় 'কিতাবুন নাসিখ ওয়াল মানসূখ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) লিয়াছেন ঃ 'আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। আমাদের নিকট যাহা উল্লেখিত হইয়াছে, তদনুসারে বলিতেছি-কুরআন মজীদের যে আয়াতটি সর্বপ্রথম রহিত হইয়াছে, উহা হইতেছে কিবলা সম্পর্কিত আয়াত।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম সকল দিকের মালিক আল্লাহ্। অতএব, তোমরা (নামাযে) যে দিকেই মুখ কর, সে দিকেই আল্লাহ্কে পাইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাব্যাপক ও মহাজ্ঞানী।

উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) নামাযে বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে মুখ করা ত্যাগ করিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিতে লাগিলেন। অতঃপর, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত মানসূখ করিয়া দিয়া নিম্নোক্ত আয়াতাংশ নাযিল করিলেন ঃ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ـ

"যেই স্থান হইতে তুমি বাহির হইয়াছ, সেই মসজিদুল হারামের দিকে (নামাযে) মুখ করিও। আর তোমরা যেইখানেই থাক না কেন, সেইখানেই (নামাযে) উহার দিকে মুখ করিও।"

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবী তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কুরআন মজীদের যে আয়াতটি সর্বপ্রথম রহিত হইয়াছিল, উহা হইতেছে কিবলা সম্পর্কিত আয়াত। রহিতকরণ সম্পর্কিত ঘটনা এই যে, নবী করীম (সা)-এর হিজরতের পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে (নামাযে) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিতে আদেশ দিলেন। মদীনার অধিবাসীগণ ছিল ইয়াহুদী। তাহারা ইহাতে খুশী হইল। নবী করীম (সা) দশ মাসের অধিক (অনধিক বিশ মাস) সময় ধরিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে থাকিলেন। নবী করীম (সা) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কিবলাকে (বায়তুল্লাহ্ শরীফকে) অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি উহাকে কিবলা হিসাবে পাইবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিতেন এবং (উহা কবূলের আশায়) আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। এক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতাংশ নাযিল করিলেন ঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ ـ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ـ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ـ

"নিশ্চয় আমি তোমার মুখমণ্ডলকে বারংবার আকাশের দিকে ফিরিতে দেখি। নিশ্চয় তোমাকে সেই কিবলার দিকে মুখ করাইব যাহাকে তুমি পছন্দ কর। তুমি স্বীয় মুখমণ্ডলকে মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও। আর তোমরা যেখানেই (নামাযে) থাক না কেন উহার দিকে মুখ করিও।"

উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর ইয়াহুদীরা বিদ্রূপের সহিত বলিতে লাগিল—"তাহারা যে কিবলাতে ছিল, কোন্ বিষয়টা উহা হইতে তাহাদিগকে ফিরাইল।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতংশ নাযিল করিলেন ঃ قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইকরামা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ অর্থাৎ 'তোমরা যেই দিকেই (নামাযে) মুখ কর, সেই দিকেই আল্লাহ্র কিবলা রহিয়াছে।'

মুজাহিদ বলেন– فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ অর্থাৎ 'তোমরা যেইখানেই থাক না কেন, তোমাদের জন্য কিবলা নির্ধারিত হইল বায়তুল্লাহ।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আতা কর্তৃক বর্ণিত ইতিপূর্বে উল্লেখিত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইবনে আবী হাতিম স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিবার পর বলিয়াছেন–'আবুল আলীয়া, হাসান আতা খুরাসানী, ইকরামা, কাতাদাহ, সুদ্দী এবং যায়দ ইব্ন আসলাম হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে।'

ইমাম ইব্ন জারীর বলিয়াছেন ঃ 'আরেক দল তাফসীরকার বলেন–আলোচ্য আয়াতটি কা'বা শরীফের দিকে মুখ করা ফরয হইবার পূর্বে নাযিল হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা) এবং সাহাবীদিগকে এই কথা জানাইবার জন্যে উহা নাযিল করিয়াছেন যে, তাহাদের জন্যে মাশরিক, মাগরিব যে কোন দিকেই (নামাযে) মুখ করিবার অনুমতি রহিয়াছে। কারণ, তাহারা যেই দিকেই মুখ করিবে, সেই দিকেই আল্লাহ্ আছেন। কেননা, মাশরিক, মাগরিব সবদিকেরই মালিক আল্লাহ্ এবং এইরূপ কোন স্থান নাই, যেইখানে আল্লাহ্ নাই।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَمَا كَانُوْا "আর তাহারা ইহা অপেক্ষা কম বা বেশী হইলেও তাহারা যেইখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে নিশ্চয় থাকেন।"

তাঁহারা বলেন–'অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত রহিত করিয়া দিয়া মসজিদুল হারামকে কিবলা হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছেন।'

আমি (ইবনে কাছীর) বলিতেছি–প্রতিটি স্থানেই আল্লাহ্ আছেন, উপরোক্ত তাফসীরকারগণের এই উক্তির তাৎপর্য যদি এই হয় যে, প্রতিটি স্থানই আল্লাহ্র ইলম ও জ্ঞানের আওতায় রহিয়াছে, তবে তাহাদের উক্তি সঠিক। পক্ষান্তরে, তাহাদের উক্ত উক্তির তাৎপর্য যদি এই হয় যে, সর্বস্থানেই আল্লাহ্র সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে, তবে তাহাদের উক্তি ভ্রান্ত। কারণ, আল্লাহ্র সত্তা কোন সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করে না। আল্লাহ্ মহান। আল্লাহ্ ইহা হইতে পবিত্র।

ইমাম ইব্ন জারীর বলিয়াছেন ঃ একদল তাফসীরকার বলেন–'আলোচ্য আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'আলা সফরের অবস্থায়, যুদ্ধের অবস্থায় এবং ভয়ের অবস্থায় যানবাহনে আরোহী থাকাকালে যে কোন দিকে মুখ করিয়া নফল নামায আদায় করিবার অনুমতির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।'

সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল মালিক (ইব্ন আবী সুলায়মান), ইদরীস, আবূ কুরয়ব ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত ইব্ন উমর (রা) উটের পিঠে আরোহী থাকা অবস্থায় উট যেইদিকে চলিত সেই দিকেই মুখ করিয়া নামায আদায় করিতেন। তিনি বলিতেন–নবী করীম (সা) এইরূপে নামায আদায় করিতেন। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিতেছেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ
এই আয়াতে অনুরূপ অনুমতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইব্ন আবী হাতিম এবং ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যাহ উপরোক্ত রিওয়ায়েত 'সাঈদ ইবনে জুবায়র হইতে আব্দুল মালিক ইব্ন আবী সুলায়মান' এই অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েতটি বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে হযরত ইব্ন উমর (রা) এবং হযরত আমের ইব্ন রবীআহ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে। তবে উহাতে আলোচ্য আয়াতটির উল্লেখ নাই। তেমনি বুখারী শরীফে নাফে' হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'হযরত ইব্ন উমর (রা) কখনও صلوة الخوف। (ভীতির অবস্থার নামায) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি উহার অবস্থা বর্ণনা করিতেন। অতঃপর বলিতেন–'ভীতি যদি ইহা অপেক্ষা প্রবলতর হয়, তবে লোকে যমীনে অথবা যানবাহনে যে কোন অবস্থায় যে কোন দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিবে।' নাফে' বলেন–আমি মনে করি, হযরত ইব্ন উমর (রা) উহা নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে শুনিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন।

মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং বিখ্যাত রিওয়ায়েত অনুসারে ইমাম শাফেঈ (র) বলেন–'শান্তির সফর এবং যুদ্ধ বা ভয়ের সফর সকল প্রকারের সফরে যানবাহনে আরোহী থাকা অবস্থায় যে কোন দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করা জায়েয।' ইমাম মালিক এবং তাঁহার অনুসারীগণ উহা নাজায়েয বলেন। ইমাম আবূ ইউসুফ এবং আবূ সাঈদ ইসতাখারী বলেন–সফরে থাকা অবস্থায় এমনকি সর্বাবস্থায় যানবাহনে যে কোন দিকে মুখ করিয়া নফল নামায আদায় করা জায়েয। ইমাম আবূ ইউসুফ হযরত আনাস (রা) হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন–আরোহী অবস্থায় তো বটেই, এমনকি মাটিতে দাঁড়াইয়াও সফরের অবস্থায় এবং গৃহে অবস্থানের অবস্থায় সর্বাবস্থায় যে কোন দিকে মুখ করিয়া নফল নামায আদায় করা জায়েয।

ইমাম ইব্ন জারীর বলিয়াছেন যে, অন্য এক দল তাফসীরকার বলেন–'একদা একদল সাহাবী কিবলা ঠিক করিতে না পারিয়া অনুমানের ভিত্তিতে বিভিন্নজন বিভিন্ন দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিলেন। উক্ত ঘটনা উপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইয়াছে। উহাতে কিবলা ঠিক করিতে না পারা অবস্থায় অনুমানের ভিত্তিতে যে কোন দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিবার অনুমতি বর্ণিত হইয়াছে।'

হযরত আমের ইব্ন রবীআহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র আব্দুল্লাহ্, আসিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ্, আবূ রবী' সামান, আবূ আহমদ যুবায়রী, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক আহওয়াযী ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন–'হযরত আমের ইব্ন রবীআহ (রা) বলেন ঃ একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর সহিত সফরে থাকিবার অবস্থায় অন্ধকারময় রাত্রিতে পাথর সরাইয়া একটি স্থানকে পরিষ্কার করত উহাতে নামায আদায় করিলাম। সকাল হইবার পর বুঝিতে পারিলাম–আমরা কিবলার দিক ভিন্ন অন্য দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিয়াছি। উক্ত ঘটনা আমরা নবী করীম (সা)-কে জানাইলে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করিলেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ -

ইমাম ইব্ন জারীর উহা উপরোক্ত রাবী আবূ রবী' সামান হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ রবী' সামান হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াকী' ও সুফিয়ান ইব্ন ওয়াকী'র

অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহা উপরোক্ত রাবী ওয়াকী' হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ওয়াকী' হইতে মাহমুদ ইব্ন গীলানীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মাজাহ উহা উপরোক্ত রাবী আবূ রবী' সামান হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ দাঊদ ও ইয়াহিয়া ইব্ন হাকিমের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন আবী হাতিম উহা উপরোক্ত রাবী আবূ রবী' সামান হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ রবী' হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন সুলায়মান ও হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাবাহর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী আবূ রবী' সামান-এর নাম আশআছ ইব্ন সাঈদ বসরী। সে একজন দুর্বল রাবী। ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 'উক্ত হাদীস সহীহ অপেক্ষা নিম্নতর পর্যায়ের অর্থাৎ 'হাসান' (حسن) শ্রেণীর হাদীস। উহার সনদ গ্রহণযোগ্য নহে। উক্ত হাদীস আশ্আছ সামান (আবূ রবী' সামান) ভিন্ন অন্য কোন রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। আশ্আছ একজন দুর্বল রাবী।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-'তাহার উস্তাদ আসিমও একজন দুর্বল রাবী।' ইমাম বুখারী (র) বলেন-'উক্ত রাবী (অর্থাৎ আশ্আছ সামান) একজন দুর্বল রাবী। সে সহীহ হাদীসের বিরোধী হাদীস বর্ণনা করিয়াছে।' (ইয়াহিয়া) ইব্ন মুঈন বলেন-'সে (অর্থাৎ আশ্আছ সামান) একজন দুর্বল রাবী। তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীস বিশ্বস্ত নহে। উহা দ্বারা কোন কিছু প্রমাণ করা যায় না।' ইমাম ইব্ন হাব্বান-'তাহার (অর্থাৎ আশআছ সামান-এর) মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যেয়। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। উক্ত হাদীস হযরত জাবির (রা) হইতে উপরোক্ত দুর্বল রাবী আশআছ সামান ভিন্ন অন্যান্য রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে উহা উল্লেখিত হইতেছে ঃ

হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, আব্দুল মালিক আযরামী, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হাসান, তৎপুত্র আহমদ (পিতার কিতাব হইতে পুত্র কর্তৃক গৃহীত), হাসান ইব্ন আলী ইব্ন শাবীব, ইসমাঈল ইব্ন আলী ইব্ন ইসমাঈল ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ 'একদা নবী করীম (সা) একদল সাহাবীকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। আমি উক্ত দলের একজন ছিলাম। আমাদের সফরে একদিন রাত্রিতে ভীষণ অন্ধকার পড়িল। ইহাতে আমরা কিবলা ঠিক করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলাম। আমাদের মধ্য হইতে কয়েকজন বলিল-আমরা কিবলা ঠিক করিতে পারিয়াছি। ইহার উত্তর দিকে কিবলা অবস্থিত। সকলেই সেই দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিল এবং সেই দিকে মাটিতে রেখা টানিয়া রাখিল। সকাল বেলা দেখা গেল আমরা কিবলার দিক ভিন্ন অন্য দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিয়াছি। সফর হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা উক্ত ঘটনা নবী করীম (সা)-এর নিকট বিবৃত করিলে তিনি কিছু বলিলেন না। এই অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ -

হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা আবার উক্ত হাদীস 'হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ও মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ আযরামী প্রমুখ রাবীর' সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিম, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়যীদ ওয়াসতী, দাউদ ইব্‌ন আমর, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুল আযীয ও ইমাম দারা কুতনী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ 'একদা সফরে ছিলাম। এই অবস্থায় একদিন রাত্রিতে মেঘের কারণে আমরা কিবলা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলাম। কিবলা কোন্ দিকে অবস্থিত এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। ইহাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ অনুমানের ভিত্তিতে একেক দিকে মুখ করিয়া পৃথক পৃথকভাবে নামায আদায় করিল এবং কিবলামুখী হইয়া নামায আদায় করা হইয়াছে কিনা তাহা জানিবার জন্যে মাটিতে রেখা টানিয়া রাখিল। সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমরা নবী করীম (সা)-কে ঘটনাটি জানাইলে তিনি আমাদিগকে নামায দুহরাইতে আদেশ দিলেন না। বরং বলিলেন–তোমাদের নামায শুদ্ধ হইয়াছে।'

ইমাম দারা কুতনী বলেন–'আমার নিকট যে সনদে উপরোক্ত হাদীস পৌঁছিয়াছে, উহাতে রাবী 'আতা'-এর শিষ্য হিসাবে 'মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিম' এই নাম উল্লেখিত হইয়াছে। তবে অন্য রিওয়ায়েতের সনদে তদস্থলে 'মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ আযরামী' এই নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সে যাহাই হউক, উভয় রাবীই দুর্বল।'

'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালেহ ও কালবী প্রমুখ রাবীর সনদেও ইমাম ইবনে মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা নবী করীম (সা) একটি বাহিনীকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। একদিন রাত্রিতে ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার পড়িলে তাঁহারা দিক ভুলিয়া গিয়া কিবলা ঠিক করিতে অপারগ হইয়া পড়িলেন। তাহারা না জানিয়া কিবলার দিক ভিন্ন অন্যদিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিলেন। সূর্যোদয়ের পর জানিতে পারিলেন–তাহারা কিবলার দিক ভিন্ন অন্য দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিয়াছেন। সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহারা ঘটনাটি নবী করীম (সা)-কে জানাইলে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ -

উপরোক্ত সনদসমূহ দুর্বল। তবে হয়ত উহাদের একটি অপরটির শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে।

ভুলে কেহ কিবলার দিক ভিন্ন অন্যদিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিলে ভুল ধরা পড়িবার পর তাহাকে নামায দুহরাইতে হইবে কিনা এই বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল ফকীহ বলেন– উক্ত অবস্থায় নামায দুহরাইতে হইবে। পক্ষান্তরে অন্য একদল ফকীহ বলেন–উক্ত অবস্থায় নামায দুহরাইতে হইবে না।

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলিয়াছেন ঃ অন্য একদল তাফসীরকার বলেন–আলোচ্য আয়াতটি হাব্‌শ-এর বাদশাহ নাজাশীর কিবলার দিক ভিন্ন অন্য দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিবার প্রসঙ্গে নাযিল হইয়াছে।

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম, তৎপুত্র মু'আয, মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশার ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নাজাশীর মৃত্যুর পর নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন–'তোমাদের এক ভাই ইন্তিকাল করিয়াছেন। তোমরা তাঁহার জন্যে জানাযার নামায আদায় কর।' সাহাবীগণ বলিলেন–আমরা কি একজন অমুসলিম ব্যক্তির জন্যে জানাযার নামায আদায় করিব? ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল।

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ ـ خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ ـ لَايَشْتَرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً ـ

ইহাতে সাহাবীগণ বলিলেন–সে তো কিবলার দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিত না। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ـ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ـ

উক্ত রিওয়ায়েত উপরোক্ত সনদ ভিন্ন কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

কেহ কেহ বলেন–'যে আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে বায়তুল্লাহ্ শরীফকে কিবলারূপে নির্ধারিত করিয়াছিলেন, উহা নাজাশীর নিকট যতদিন না পৌঁছিয়াছিল, ততদিন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিয়াছিলেন।' ইমাম কুরতুবী কাতাদাহ হইতে অনুরূপ একটি উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম কুরতুবী উল্লেখ করিয়াছেন–যাহারা গায়েবানা জানাযা নামাযকে জায়েয বলেন, তাহারা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে উপরোক্ত ঘটনা উপস্থাপিত করেন। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন–আমাদের মাযহাবের ফকীহগণ (অর্থাৎ যাহারা গায়েবানা জানাযা নামাযকে নাজায়েয বলেন) উপরোক্ত ঘটনায় বর্ণিত গায়েবানা জানাযা নামাযকে নাজাশীর জন্য নির্দিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাহারা উপরোক্ত ঘটনায় তিনটি ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। প্রথম ব্যাখ্যা ঃ 'নাজাশী'র কবরস্থ হইবার পর যমীনকে চাপিয়া আনিয়া তাহার লাশকে নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। তিনি উহা প্রত্যক্ষ করিবার অবস্থায় নাজাশীর জন্যে নামাযে জানাযা আদায় করিয়াছিলেন। অতএব উহা গায়েবানা নামাযে জানাযা ছিল না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ঃ যেহেতু নাজাশীর দেশে তাঁহার জন্যে নামাযে জানায আদায়ের কোন লোক ছিল না, তাই নবী করীম (সা) তাঁহার জন্যে গায়েবানা নামাযে জানাযা আদায় করিয়াছিলেন। মুহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে সঠিক ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে ইমাম কুরতুবী বলেন–'একজন রাজার কোন প্রজা তাহার ধর্মের অনুসারী হইবে না এই কথা মানিয়া লওয়া কষ্টকর।' ইবনুল আরাবী উহার এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন যে, নাজাশীর প্রজাদের মধ্যে মু'মিন লোক কিছু ছিল। তবে নামাযে জানাযা যে শরীআত কর্তৃক প্রদত্ত একটি বিধান, ইহা সম্ভবত তাহাদের জানা ছিল না। আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি–ইবনুল আরাবীর উত্তর বেশ শক্তিশালী। তৃতীয় ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সা) অন্যান্য বাদশাহর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নাজাশীর জন্যে গায়েবানা নামাযে জানাযা আদায় করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিমাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আলকামাহ ও আবূ মা'শার প্রমুখ রাবীর সূত্রে হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়্যা আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–মদীনা, সিরিয়া এবং ইরাকের লোকদের জন্যে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই দিকের মধ্যবর্তী দিকে কিবলা রহিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের সহিত উপরোক্ত হাদীসের সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ উপরোক্ত রাবী আবূ মা'শার হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই দিকের মধ্যবর্তী দিকে কিবলা রহিয়াছে।'

উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী আবূ মা'শার-এর নাম নাজীহ ইব্ন আব্দুর রহমান আস্‌সুদ্দী আল মাদানী। ইমাম তিরমিযী বলিয়াছেন-'উক্ত হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে একাধিক মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ উপরোক্ত রাবী আবূ মা'শার-এর বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহার স্মৃতি শক্তিকে দুর্বল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাঈদ মাকবারী, উসমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুগীরাহ আখনাস, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর মাখযুমী, মুআল্লাহ ইব্ন মানসূর, হাসান ইব্ন বিকর মারূযী ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই দিকের মধ্যবর্তী দিকে কিবলা রহিয়াছে।'

ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন-উক্ত হাদীস সহীহ ও গ্রহণযোগ্য। তিনি ইমাম বুখারী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলোচ্য হাদীসের শেষোক্ত সনদটি প্রথমোক্ত সনদ অপেক্ষা অধিকতর সহীহ ও শক্তিশালী। ইমাম তিরমিযী বলিয়াছেন-পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই দিকের মধ্যবর্তী দিকে কিবলা রহিয়াছে। এই হাদীসটি একাধিক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে হযরত উমর (রা) হযরত আলী (রা)-এবং হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) রহিয়াছেন।

হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন-'তুমি পশ্চিম দিককে নিজের ডানে এবং পূর্ব দিককে নিজের বামে রাখিলে তোমার সম্মুখের দিকে কিবলা থাকিবে।'

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে', আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর, ইব্ন নুমায়র, শুআয়ব ইব্ন আইউব, বনী হাশিমের গোলাম ইয়াকূব ইব্ন ইউসুফ, আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন আব্দুর রহমান ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই দিকের মধ্যবর্তী দিকে কিবলা অবস্থিত।'

ইমাম দারা কুতনী এবং ইমাম বায়হাকীও উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মারদুবিয়্যা মন্তব্য করিয়াছেন-উক্ত রিওয়ায়েতটি হযরত উমর (রা) হইতে ইব্ন উমর কর্তৃক বর্ণিত হযরত উমর (রা)-এর নিজস্ব উক্তি বলিয়া সমধিক খ্যাত।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন-'আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এইরূপও হইতে পারে ঃ তোমরা আমার নিকট দোয়া করিবার কালে যে দিকেই মুখ করিয়া দোয়া কর, সেই দিকেই আমার মুখ রহিয়াছে। আমি তোমাদের দোয়া কবূল করিব।'

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ, হাজ্জাজ, হুসাইন, কাসিম ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ "তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।"

এই আয়াত নাযিল হইবার পর সাহাবীরা বলিলেন-'আমরা কোনদিকে মুখ করিয়া আল্লাহ্কে ডাকিব?'

ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা ও দয়া এবং তাঁহার ফযল ও মেহেরবানী সকল সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত। মানুষের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় আমল ও কার্য সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন। কোন বিষয়ই তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে নাই।

আল্লাহ্‌ই পৃথিবী ও আসমানের স্রষ্টা

(١١٦) وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ۝

(١١٧) بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

১১৬. আর তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি উহা হইতে পবিত্র। বরং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার সব কিছুই তাঁহার, সকল কিছুই তাঁহার অনুগত।

১১৭. তিনিই আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের উদ্‌গাতা। আর যখন তিনি কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি শুধু বলেন–হও; অনন্তর তাহা হইয়া যায়।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা খ্রিস্টান, ইয়াহুদী ও আরবের মুশরিকদের আকীদাকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাহারা বলিয়া থাকে, আল্লাহ্ সন্তান জন্মদান করিয়াছেন। একদল বলিয়া থাকে–ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র। অন্য একদল বলিয়া থাকে–ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তাহাদের সকলের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ـ بَلْ لَّهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ ـ

অর্থাৎ তাহারা বলে–'আল্লাহ তা'আলা সন্তান জন্মদান করিয়াছেন। তিনি মহান; তিনি উহা হইতে পবিত্র। তাহারা যাহা বলে, প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে; বরং আকাশ, পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহা রহিয়াছে, তাহা সমুদয়ই আল্লাহ্‌র অধীন বস্তু। তিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্তা, রিযিকদাতা, নিয়োগকর্তা এবং যথেচ্ছ প্রয়োগকর্তা। সমুদয় বস্তুই তাঁহার অনুগত দাসানুদাস। অতএব তাহাদের কেহ কি করিয়া তাঁহার সন্তান হইতে পারে? দুইটি সমশ্রেণীর বস্তু হইতে সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইক্ষেত্রে 'আল্লাহ্ হইতে কোন সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে'–এই কথা

সত্য মানিলে মানিতে হইবে যে, মহাবিশ্বে আল্লাহ্র সমশ্রেণীর কাহারো অস্তিত্ব রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সমশ্রেণীর কোন বস্তুর অস্তিত্ব মহাবিশ্বে নাই। অতএব তাঁহার কোন স্ত্রী নাই। তাঁহার কোন সন্তান থাকিতে পারে না এবং তাঁহার কোন সন্তান নাই।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ - اَنّٰى يَكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ - وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ - وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ - وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٍ -

'তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। কিরূপে তাঁহার সন্তান থাকিবে? তাঁহার কোন স্ত্রীও নাই। তিনি সকল বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তিনি সকল বিষয়ে অবগত রহিয়াছেন।'

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا - لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا - تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا - اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا - وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا - اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلاَّ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا - لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا - وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا -

"আর তাহারা বলিয়াছে–'আর-রহমান সন্তান জন্মদান করিয়াছেন।' তোমরা নিশ্চয় একটি ভয়ংকর কথা উচ্চারণ করিয়াছ। উহাতে আকাশসমূহ ফাটিয়া যাইবার, যমীন বিদীর্ণ হইয়া যাইবার এবং পর্বতসমূহ ধড়াম করিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করে। এই কারণে যে, তাহারা আর-রহমানের জন্যে সন্তান নির্দিষ্ট করে। আর-রহমানের জন্য ইহা মানায় না যে,তিনি সন্তান জন্মদান করিবেন। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যাহারা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের সকলেই তাঁহার সম্মুখে শুধু দাস হিসাবেই আগমন করিবে। তিনি নিশ্চয় তাহাদিগকে গণিয়া রাখিয়াছেন এবং ভালভাবে গণিয়া রাখিয়াছেন। আর তাহাদের প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিনে তাঁহার নিকট একাকী অবস্থায় আসিবে।"

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ

"তুমি বল–তিনি এক আল্লাহ্। আল্লাহ্ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। তিনি কাহারও প্রজনক নহেন এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই। অনন্তর কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহে।"

উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা প্রমাণ করিয়াছেন–'তিনি সুমহান এবং তাঁহার কোন সমকক্ষ বা শরীক নাই। সকল বস্তু তাঁহারই সৃষ্টি। তিনিই সকলকে পালন করেন। অতএব তাঁহার কোন সন্তান থাকিতে পারে না এবং তাঁহার কোন সন্তান নাই।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে', ইব্ন জুবায়র (ইব্ন মুতইম), আব্দুল্লাহ ইব্ন আবুল হুসাইন, শুআয়ব, আবুল ইয়ামান ও ইমাম বুখারী আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা

বলেন-মানুষ আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে। অথচ সে এইরূপ কাজ করিতে পারে না। আর সে আমাকে গালি দিয়াছে, অথচ সে এইরূপ কাজ করিতে পারে না। সে বলে যে, 'আমি তাহাকে পুনরুত্থিত করিতে পারিব না।' ইহাই আমাকে তাহার অবিশ্বাস করা। সে বলে যে, 'আমার সন্তান রহিয়াছে' ইহাই আমাকে তাহার গালি দেওয়া। আমি এই বিষয় হইতে পবিত্র যে, আমার কোন স্ত্রী অথবা সন্তান থাকিবে।

উক্ত হাদীসে উপরোক্ত মাধ্যমে শুধু ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'রাজ, আবূ যানাদ, মালিক, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মদ করবী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল তিরমিযী, আহমদ ইব্‌ন কামিল ও ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-মানুষ আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, অথচ সে আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারে না। আর সে আমাকে গালি দিয়াছে, অথচ সে আমাকে গালি দিতে পারে না। 'আল্লাহ্ আমাকে পুনর্জীবিত করিতে পারিবে না' তাহার এই কথাই আমাকে তাহার অবিশ্বাস করা। প্রকৃতপক্ষে প্রথমবার তাহাকে আমার সৃষ্টি করা, দ্বিতীয়বার তাহাকে সৃষ্টি করা অপেক্ষা সহজতর ছিল না। 'আল্লাহ্র সন্তান রহিয়াছে' তাহার এই কথাই আমাকে তাহার গালি দেওয়া। প্রকৃত পক্ষে, আল্লাহ্ একক ও অমুখাপেক্ষী। তিনি না কাহাকেও জন্ম দিয়াছেন আর না কাহারও কারণে জন্মলাভ করিয়াছেন। আর কেহ তাঁহার সমকক্ষ নহে।'

বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'কষ্টদায়ক কথা শুনিয়া আল্লাহ্ যতটুকু ধৈর্যধারণ করেন, তদপেক্ষা অধিকতর ধৈর্যধারণ অন্য কেহ করিতে পারে না। লোকে আল্লাহ্র সন্তান আছে ভাবে; অথচ তিনি সকলকে রিযিক দিয়া থাকেন এবং রোগমুক্ত করিয়া থাকেন।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতিয়্যা, মুতরাফ, ইসবাত, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ অর্থাৎ সকলেই তাঁহার নিকট দোয়া করে।'

ইকরামা এবং আবূ মালিক বলেন ঃ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ অর্থাৎ সকলেই তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন ঃ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ অর্থাৎ সকলেই একমাত্র তাঁহাকেই ইবাদত করে।

রবী' ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে সকলেই বিনীতভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে।

সুদ্দী বলেন ঃ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ অর্থাৎ সকলেই কিয়ামতের দিন অনুগত হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

মুজাহিদ হইতে খসীফ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ অর্থাৎ সকলেই তাঁহার নির্দেশের প্রতি অনুগত। তিনি বলিলেন-তোমরা মানুষরূপে পয়দা হও। আর তাহারা সেইরূপেই পয়দা হইল। তিনি বলিলেন-তোমরা গাধারূপে পয়দা হও। আর তাহারা সেইরূপেই পয়দা হইল।

মুজাহিদ হইতে ইব্ন নাজীহ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ كُلٌّ لَّه قَانِتُوْنَ অর্থাৎ 'সকলেই তাঁহার প্রতি অনুগত।' আল্লাহ্র প্রতি কাফিরের আনুগত্য রহিয়াছে তাহার ছায়ার সিজদার মধ্যে। সে আল্লাহ্কে সিজদা করিতে না চাহিলেও তাহার ছায়া আল্লাহ্কে সিজদা করিয়া থাকে।

ইমাম ইব্ন জারীর মুজাহিদের উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত ব্যাখ্যা আলোচ্য আয়াতাংশের সকল ব্যাখ্যাকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। কারণ, আনুগত্যের দুইটি প্রকার রহিয়াছে। প্রথম প্রকার ঃ শরীআতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আনুগত্য (طاعت شرعی) দ্বিতীয় প্রকার ঃ প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আনুগত্য। (এই আনুগত্য কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না।) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ـ

'আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যাহারা রহিয়াছে, তাহারা সকলেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহ্কেই সিজদা করিয়া থাকে। আর তাহাদের ছায়াও সকাল-সন্ধ্যায় তাঁহাকেই সিজদা করিয়া থাকে।'

কুরআন মাজীদে উল্লেখিত القنوت। (আনুগত্য) শব্দটির ব্যাখ্যায় একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে উহা উল্লেখ করিতেছি ঃ

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূল হায়ছাম, আবূ সামহ দাররাজ, আমর ইব্ন হারিছ, ইব্ন ওয়াহাব, ইউসুফ ইব্ন আব্দুল আ'লা ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'কুরআন মজীদের যে কোন স্থানে القنوت। শব্দটি উল্লেখিত হউক না কেন, উহার অর্থ হইবে الطاعة। (আনুগত্য)।'

ইমাম আহমদ উক্ত রিওয়ায়েত উপরোক্ত রাবী আবূ সামহ দাররাজ হইতে পূর্বোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ সামহ দাররাজ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন লাহীআ ও হাসান ইব্ন মূসার ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উহার সনদ দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য। উক্ত রিওয়ায়েতকে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী বলিয়া অভিহিত করা গ্রহণযোগ্য নহে। উহা সম্ভবত কোন সাহাবী তন্নিম্নস্থ ব্যক্তির নিজস্ব উক্তি। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

অনেকে আবার উপরোক্ত সনদে অগ্রহণযোগ্য তাফসীরসমূহ বর্ণনা করিয়া থাকে। উক্ত সনদে বর্ণিত তাফসীরসমূহ দ্বারা প্রতারিত হওয়া উচিত নহে। কারণ, উক্ত সনদ দুর্বল। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন নমুনা সম্মুখে না রাখিয়াই স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তি দিয়া আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

মুজাহিদ এবং সুদ্দী বলেন بَدِيْعُ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে–উদ্ভাবক।' بدعة নব-উদ্ভাবিত বিষয়।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ فان كل محدثة بدعة

অর্থাৎ প্রতিটি নব-উদ্ভাবিত বিষয় (যে বিষয়ের প্রতি শরীআতের কোন সমর্থন নাই) হইতেছে– بدعة (বিদআত)। বিদআত দুই প্রকারে বিভক্ত। প্রথম প্রকারের বিদআত

হইতেছে-শরীআত বিরোধী নব-উদ্ভাবিত বিষয়। এইরূপ বিদআত সম্বন্ধে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'নিশ্চয় প্রতিটি নব-উদ্ভাবিত বিষয়ই হইতেছে-بدعة (বিদআত)।' দ্বিতীয় প্রকারের বিদআত হইতেছে শরীআতসম্মত নব-উদ্ভাবিত বিষয়। এইরূপ বিদআতের একটি উদাহরণ হইতেছে-হযরত উমর (রা) কর্তৃক প্রবর্তিত জামাআতবদ্ধভাবে তারাবীহ্র নামায আদায় করিবার ব্যবস্থা ও প্রথা। হযরত উমর (রা) সাহাবীদের জন্যে জামাআতবদ্ধভাবে তারাবীহ্র নামায আদায় করিবার ব্যবস্থা করিয়া এবং উহাকে প্রথা হিসাবে প্রবর্তিত করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ 'এই বিদআতটি কতই না উত্তম।'

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্) আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর উদ্ভাবক—স্রষ্টা।' তিনি বলেন ঃ بديع শব্দটি مبدع শব্দের পরিবর্তিত রূপ। যেমন ঃ اليم। শব্দটি مؤلم শব্দের এবং سميع শব্দটি مسمع শব্দের পরিবর্তিত রূপ। المبدع। নব-উদ্ভাবক। المبتدع। নতুন ধর্মীয় ব্যবস্থার উদ্ভাবক ও প্রবর্তক; যে কোন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবক।

কবি আ'শা ইব্ন সালাবা, হাওযা ইব্ন আলী হানাফীর প্রশংসায় বলিতেছেন ঃ

يدعى الى قول سادات الرجال اذا
ابد واله الحزم او ماشاءه ابتدعا

"তিনি যখন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কথার মধ্যে যুক্তি দেখিতে পান, তখন উহাকেই গ্রহণ করেন। অথবা যাহা চাহেন, নিজেই তাহা উদ্ভাবন করিয়া লন।"

এই স্থলে কবি الابتداع। ক্রিয়াটির 'নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

অতঃপর ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এই আয়াতাংশের তাৎপর্য এই ঃ 'আল্লাহ্ মহান। তিনি পবিত্র। তাঁহার সন্তান থাকিতে পারে না। তাঁহার সন্তান থাকে কিরূপে? তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যাহা আছে, তৎসমুদয়ের মালিক। সকলেই তাঁহার একত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সকলেই তাঁহার প্রতি অনুগত। তিনি সকলের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক। তাহাদিগকে সৃষ্টি করিবার জন্যে তাঁহার কোন নমুনার প্রয়োজন হয় নাই। কোনরূপ নমুনা সামনে না রাখিয়াই তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।' ইমাম ইব্ন জারীর আরও বলেন-'আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদিগকে জানাইতেছেন-যে ঈসাকে খ্রিস্টানরা আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে, সেই ঈসাই সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সকলের স্রষ্টা ও মালিক। যে আল্লাহ্ কোনরূপ নমুনা ছাড়া আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই স্বীয় কুদরতে বিনা বাপে ঈসাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।' ইমাম ইব্ন জারীর কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা সহীহ ও গ্রহণযোগ্য।

وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতের পরিপূর্ণতাকে বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন-আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিতে চাহেন, তখন উহাকে শুধু একবার বলেন-'হও।' তৎক্ষণাৎ উহা তাঁহার ইচ্ছার অনুরূপ সৃষ্টি হইয়া যায়।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ 'তিনি যখন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিতে চাহেন, তখন তাঁহার কার্য শুধু এই হয় যে, তিনি উহাকে বলেন–'হও।' তৎক্ষণাৎ উহা হইয়া যায়।

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ "আমি যখন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিতে চাহি, তখন উহাকে শুধু বলি–'হও।' তৎক্ষণাৎ উহা হইয়া যায়।'

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَمَا اَمْرُنَا اِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ "আমার সৃষ্টিকার্য একটিমাত্র নির্দেশের ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছু নহে। যেন চোখের পলকের ব্যাপার।"

কবি বলেন ঃ

اذا اراد اللّه امرا فانما

يقول له كن قوله فيكون

"আল্লাহ্ যখন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিতে চাহেন, তখন উহাকে একবার মাত্র বলেন–'হও।' তৎক্ষণাৎ উহা হইয়া যায়।"

আলোচ্য আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদিগকে ইহাও জানাইয়াছেন যে, ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা শুধু 'হও' এই আদেশসূচক শব্দটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন।

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ - خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ -

"আল্লাহ্র নিকট ঈসার (সৃষ্টির) বিষয়টি আদমের (সৃষ্টির) বিষয়ের ন্যায়। তিনি তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তাহাকে বলিয়াছেন–'হও' তৎক্ষণাৎ সে হইয়া গিয়াছে।"

(١١٨) وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ۭ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۭ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۭ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

১১৮. আর অজ্ঞরা বলে, 'আল্লাহ্ যদি আমাদের সহিত কথা বলিতেন কিংবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আসিত।' তাহাদের পূর্ববর্তীরাও তাহাদের মত বলিত। তাহাদের সকলের অন্তরে সাদৃশ্য বিদ্যমান। আস্থাবান জাতির জন্য অবশ্যই আমি দলীল উপস্থাপন করিয়াছি।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা

রাফে' ইব্ন হুরায়মালা নবী করীম (সা)-কে বলিল–'হে মুহাম্মদ! তুমি যদি সত্যই আল্লাহ্র রাসূল হইয়া থাক, তবে তাঁহাকে বল–তিনি যেন আমাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং আমরা যেন তাঁহার কথা শুনিতে পাই। ইহাতে আল্লাহ্-তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْتَأْتِيْنَا اٰيَةٌ ط كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ط تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ط قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ -

মুজাহিদ বলেন–আলোচ্য আয়াতটি খ্রিস্টানদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছিল– لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْتَاتِيْنَا اٰيَةٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সহিত কথা বলেন না কেন অথবা আমাদের নিকট পছন্দনীয় কোন নিদর্শন আসে না কেন?

ইমাম ইব্ন জারীর মুজাহিদ কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত শানে নুযূলকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, উক্ত শানে নুযূলই সঠিক। কারণ, পূর্ববর্তী আয়াতে খ্রিস্টানদের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতেও তাহাদের বিষয়ে উল্লিখিত হওয়াই স্বাভাবিক।

ইমাম ইব্ন জারীরের উপরোক্ত অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, উহা দুর্বল। কুরতুবী বলেন ঃ

لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْتَأْتِيْنَا اٰيَةٌ অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ, তোমার নবূওতের ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাদিগকে বলেন না কেন?' আমার মতে আয়াতের ইহাই স্পষ্ট অর্থ। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

আবুল আলীয়া, রবী' ইব্ন আনাস, কাতাদাহ এবং সুদ্দীও বলেন–'আলোচ্য আয়াতটি মক্কার মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারাই বলিয়াছিল, আল্লাহ্ সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন এবং আমাদের নিকট আমাদের পছন্দমত নিদর্শন আসে না কেন?'

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ আয়াতে বর্ণিত পূর্ববর্তী লোকগণ কাহারা? কুরতুবী বলেন–'তাহারা হইতেছে ইয়াহূদী ও নাসারা জাতিদ্বয়।'

নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْتَأْتِيْنَا اٰيَةٌ এই দাবীটি মক্কার মুশরিকরা উত্থাপন করিয়াছিল। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা ইহাও পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ এই আয়াতাংশে উল্লিখিত 'তাহাদের পূর্ববর্তী লোকগণ' হইতেছে ইয়াহূদী ও নাসারা জাতি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاِذَا جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَا اُوْتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ -

"আর যখন তাহাদের নিকট কোন আয়াত আসে, তখন তাহারা বলে, আল্লাহ্র পূর্ববর্তী রাসূলগণকে যাহা (যে সকল নিদর্শন) প্রদান করা হইয়াছিল, আমাদিগকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা প্রদান করা না হইবে, ততক্ষণ আমরা কোনক্রমেই ঈমান আনিব না।

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا - اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِيْرًا - اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا - اَوْتَأْتِىَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ قَبِيْلاً - اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِى السَّمَاءِ - وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَأُهُ - قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلاَّ بَشَرًا رَّسُوْلاً -

"আর তাহারা বলে–আমরা কোনক্রমে তোমার প্রতি ততক্ষণ ঈমান আনিব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্যে মৃত্তিকার মধ্য হইতে একটি প্রস্রবণ উৎসারিত করিবে অথবা তোমার জন্যে খেজুর অথবা আঙ্গুরের একটি উদ্যান সৃষ্টি হইবে এবং তুমি উহার মধ্য দিয়া (অলৌকিক পন্থায়) সুষ্ঠুরূপে পানির নালাসমূহ প্রবাহিত করিবে। অথবা তুমি যেইরূপে বলিয়া থাক, সেইরূপে আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া আমাদের মাথার উপর পতিত করিবে অথবা আল্লাহ্‌কে এবং ফেরেশতাগণকে সামনা-সামনিভাবে উপস্থিত করিবে। অথবা তোমার জন্যে স্বর্ণের একটি বাড়ি নির্মিত হইবে অথবা তুমি আকাশে চড়িবে। তেমনি তুমি যতক্ষণ না আমাদের নিকট একটি কিতাব নাযিল করাইবে যাহা আমরা পাঠ করিব, ততক্ষণ আমরা তোমার মন্ত্রকে বিশ্বাস করিব না। তুমি বল–আমার প্রভু মহান ও পবিত্র! আমি কি একজন বাণীবাহক মানব ভিন্ন অন্য কিছু?"

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ لاَيَرْجُوْنَ لِقَائَنَا لَوْ لاَ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا -

"যাহারা আমার দর্শন কামনা করে না, তাহারা বলে, আমাদের নিকট ফেরেশতাগণকে অবতীর্ণ করা হয় না কেন অথবা আমরা আমাদের প্রভুকে দেখি না কেন?

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِأٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً "বরং তাহাদের প্রত্যেকে চায় যে, প্রত্যেককে কতগুলি বিস্তৃত পুস্তিকা প্রদান করা হউক।"

উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহ এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে আরবের মুশরিকদের সত্য-বিদ্বেষ এবং সত্য বিমুখতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

আরবের মুশরিকদের ন্যায় তাহাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহও আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট সত্য বিদ্বেষমূলক অযৌক্তিক দাবী ও আবদার জানাইয়াছিল। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوْا مُوْسٰى اَكْبَرَ مِنْ ذَالِكَ فَقَالُوْا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً -

"কিতাবধারীগণ তোমার নিকট দাবী জানায়–'তুমি তাহাদের নিকট আকাশ হইতে একটি পুস্তক নাযিল করাও।' ইতিপূর্বে তাহারা মূসার নিকট উহা অপেক্ষা অধিকতর অযৌক্তিক ও অসম্ভব দাবী জানাইয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, আমাদিগকে প্রকাশ্যরূপে আল্লাহ্‌কে দেখাও।"

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

وَاِذْ قُلْتُمْ يَامُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً "আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন তোমরা মূসাকে বলিয়াছিলে–হে মূসা! আমরা যতক্ষণ না প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্কে দেখিব, ততক্ষণ কোনক্রমে তোমার প্রতি ঈমান আনিব না।"

تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ কুফর ও সত্য বিদ্বেষের দিক দিয়া আরবের মুশরিকদের অন্তর তাহাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের লোকদের অন্তরের সমতুল্য।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

كَذَالِكَ مَا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ـ

"এইরূপে যখনই তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের নিকট কোন রাসূল আগমন করিয়াছে, তখনই তাহারা বলিয়াছে–'(এই লোকটি) যাদুকর অথবা পাগল।"

قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ অর্থাৎ আমি রাসূলগণের রিসালাতের দাবীর সমর্থনে বিপুল সংখ্যক সুস্পষ্ট আয়াত ও নিদর্শন বর্ণনা করিয়াছি। যাহাদের অন্তরে সত্যের প্রতি ভালবাসা রহিয়াছে এবং যাহারা সত্যকে বিশ্বাস করিতে ও উহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক রহিয়াছে, তাহাদের ঈমান আনিবার জন্যে উক্ত সুস্পষ্ট আয়াত ও নিদর্শনসমূহই যথেষ্ট। অবশ্য যাহাদের অন্তর সত্যবিদ্বেষে পরিপূর্ণ এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদের অন্তরে ও কানে মোহর মারিয়া দিয়াছেন আর চোখের উপর পর্দা রাখিয়া দিয়াছেন, তাহারা কোন অবস্থায়ই ঈমান আনিবে না। উক্ত সত্যদ্বেষী লোকদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ ـ وَلَوْجَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ـ

"যাহাদের বিষয়ে তোমার প্রভুর বাক্য সত্য হইয়াছে, তাহারা যতদিন (দোযখের) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখিবে ততদিন ঈমান আনিবে না; তাহাদের নিকট সকল নিদর্শন আসিলেও না।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালত

(١١٩) اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ۝

১১৯. "নিশ্চয় আমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। আর জহান্নামীদের জন্যে তুমি জবাবদিহী হইবে না।"

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, কাতাদাহ, শায়বান নাহবী, আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ আল ফায্যারী, আব্দুর রহমান ইব্ন সালেহ, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন

যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু আমার প্রতি নাযিল করিয়াছেন ঃ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا (নিশ্চয় আমি তোমাকে সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠাইয়াছি), তাই আমি মু'মিনকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদানকারী এবং কাফিরকে দোযখের বিরুদ্ধে সতর্ককারী।'

অধিকাংশ কারী আলোচ্য আয়াতের وَلَاتُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ এই অংশের অন্তর্গত لاتسئل শব্দটি ت বর্ণটিকে পেশ দিয়া পড়িয়াছেন। এমতাবস্থায় বাক্যটি সংবাদসূচক বাক্য (جملہ خبریہ) হইবে। হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) لاتسئل -এর স্থলে ماتسئل পড়িতেন। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) উহার স্থলে لن تسئل পড়িতেন। ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত কিরাআতসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত আয়াতের তাৎপর্য হইতেছে-'হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি তোমার প্রতি কুফর করিবে, তাহার কুফরের জন্যে আমার নিকট তোমার জওয়াবদিহী করিতে হইবে না।' অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ "তোমার কাজ শুধু তাবলীগ করা আর আমার কাজ হিসাব গ্রহণ।"

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ - لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ "তুমি উপদেশ প্রদান করিতে থাক। তুমি উপদেশদাতা বৈ কিছু নহ। তুমি তাহাদের দারোগা নহ।"

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ - فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ -

"তাহারা যাহা বলে, তৎসম্বন্ধে আমি অধিকতর অবগত রহিয়াছি। আর তুমি তো তাহাদের উপর শক্তি প্রয়োগকারী নহ। যাহারা আমার শাস্তিকে ভয় করে, তুমি তাহাদিগকে উপদেশ দিতে থাক।"

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা)-এর দায়িত্ব শুধু তাবলীগ। লোকদিগকে অন্যায় হইতে বিরত রাখিবার জন্যে তাহাদের প্রতি শক্তি প্রয়োগ তাঁহার কাজ নহে।

একদল কারী لاتسئل শব্দের অন্তর্গত ت বর্ণটিকে فتح (যবর) দিয়া পড়িয়াছেন। এমতাবস্থায় বাক্যটি নিষেধ-সূচক বাক্য হইবে। উহার অর্থ হইবে, 'তুমি দোযখবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না।'

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব করযী হইতে ধারাবাহিকভাবে মূসা ইব্ন উবায়দাহ ছাওরী ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) বলিলেন-'আহা! আমার মাতা-পিতা কোন্ অবস্থায় আছেন-তাহা যদি জানিতে পারিতাম! আহা! আমার মাতা-পিতা কোন্ অবস্থায় আছেন-তাহা যদি জানিতে পারিতাম! আহা! আমার মাতা-পিতা কোন্ অবস্থায় আছেন-তাহা যদি জানিতে পারিতাম!' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতাংশ নাযিল করিলেন ঃ

وَلَاتُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ "আর তুমি দোযখবাসীদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না।"

অতঃপর নবী করীম (সা) জীবনে আর কোন দিন স্বীয় মাতা-পিতার কথা উল্লেখ করেন নাই।

ইমাম ইব্‌ন জারীরও উপরোক্ত রিওয়ায়েত মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব হইতে ধারাবাহিকভাবে মূসা ইব্‌ন উবায়দাহ, ওয়াকী' ও আবূ কুরায়বের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী উহা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব-এই দুই রাবী হইতে বর্ণিত রিওয়ায়েত হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীস শাস্ত্রবিদগণ উক্ত রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'বের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। তাহারা তৎকর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েতের বিশুদ্ধতার বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

কুরতুবী বলেন-'শেষোক্ত কিরআত অনুসারে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে-'তুমি দোযখবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না। কারণ, তাহারা যে অবস্থায় আছে, তাহা তোমার ধারণার বাহিরে।' ইমাম কুরতুবী আরও বলেন-'আমি আত্‌তাযকিরাহ (التذكرة) নামক পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর জন্যে তাঁহার মাতা-পিতাকে জীবিত করিয়াছিলেন এবং তাহারা জীবিত হইবার পর ঈমান আনিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকে আমি নিম্নোক্ত হাদীসেরও উত্তর প্রদান করিয়াছি ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'নিশ্চয় আমার পিতা ও তোমার পিতা দোযখে আছেন।'

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি-নবী করীম (সা)-এর মাতা-পিতার জীবিত হওয়া সম্পর্কিত হাদীসটি না সিহাহ সিত্তার (বিখ্যাত ছয়টি হাদীস গ্রন্থ) অন্তর্ভুক্ত কোন গ্রন্থে উল্লেখিত আছে, আর না অন্য কোন হাদীস গ্রন্থে। উহার সনদ দুর্বল। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

দাউদ ইব্‌ন আবূ আসিম হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন জুরায়জ, হাজ্জাজ, হুসায়ন, কাসিম ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা নবী করীম (সা) বলিলেন-'আমার মাতা-পিতা কোথায় আছেন?' ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

إِنَّا أَرْسَلْنَٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَلَاتُسْئَلُ عَنْ أَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ

ইতিপূর্বে উল্লেখিত মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত এবং দাউদ ইব্‌ন আবূ আসিম কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েত-এই উভয় রিওয়ায়েতের সনদদ্বয়ের কোনটিতেই রাবী হিসাবে কোন সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয় নাই। উভয় রিওয়ায়েতের সনদ মুরসাল (مرسل)।[১]

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব প্রমুখ রাবী হইতে বর্ণিত যে সকল রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) তাঁহার মাতা-পিতার পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইমাম ইব্‌ন জারীর সেই সকল রিওয়ায়েত বাতিল বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-'স্বীয় মাতা-পিতার অবস্থা সম্বন্ধে নবী করীম (সা) সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। কারণ, আল্লাহ্‌র রসূল (সা) এইরূপ বিষয় সন্দিহান থাকিতে পারেন না।' ইমাম ইব্‌ন জারীর আলোচ্য আয়াতাংশের অন্তর্গত لاتسئل শব্দটির ت বর্ণটিকে পেশ হরকত দিয়া পড়াকেই শুদ্ধ বলিয়াছেন।

---

১. নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত কোন হাদীসের সনদের গোড়ায় রাবী হিসাবে কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ না থাকিলে সনদটিকে مرسل সনদ বলা হয়।

ইমাম ইব্‌ন জারীরের উপরোক্ত অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, এইরূপ হওয়া বিচিত্র নহে যে, নবী করীম (সা) এক সময়ে স্বীয় মাতা-পিতার পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন এবং সেই সময়ে তিনি তাঁহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ইস্‌তিগফারও করিয়াছিলেন। অতঃপর এক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাঁহার মাতা-পিতার দোযখী হইবার সংবাদ জানাইয়া দিয়াছিলেন। উক্ত সংবাদ জানিবার পর নবী করীম (সা) তাঁহাদের জন্যে আর ইস্‌তিগফার করেন নাই। একাধিক সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা)-এর মাতা-পিতা দোযখী হইবেন। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

আতা ইব্‌ন ইয়াসার হইতে ধারাবাহিকভাবে হিলাল ইব্‌ন আলী, ফালীহ ইব্‌ন সুলায়মান, মূসা ইব্‌ন দাঊদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"একদা আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ লাভ ঘটিলে আমি তাঁহাকে বলিলাম-'তাওরাত কিতাবে নবী করীম (সা)-এর যে পরিচয় ও গুণাবলী উল্লেখিত রহিয়াছে, তাহা আমার নিকট বর্ণনা করুন।' তিনি বলিলেন-আল্লাহ্‌র কসম! কুরআন মজীদে নবী করীম (সা)-এর যে পরিচয় ও গুণাবলী উল্লেখিত রহিয়াছে, তাওরাত কিতাবেও তাঁহার সেই পরিচয় ও গুণাবলী উল্লেখিত রহিয়াছে। উক্ত পরিচয় ও গুণাবলী এই ঃ -হে নবী! নিশ্চয় আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী ও নিরক্ষরদের রক্ষণাবেক্ষণকারী পাঠাইয়াছি। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমাকে المتوكل। (আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছি। সেই নবী কখনও কর্কশভাষী বা উগ্র-স্বভাবের হইবে না। সে বাজারে চিৎকার করিয়া কথা বলিবে না। সে তাহার প্রতি দুর্ব্যবহারের উত্তর দুর্ব্যবহার দ্বারা দিবে না; বরং সে ক্ষমা ও মার্জনা করিয়া দিবে। আল্লাহ্ তাঁহার দ্বারা জাতিকে সত্য পথে না আনিয়া তাঁহাকে মৃত্যু দিবেন না। আল্লাহ্ তাঁহার দ্বারা জাতিকে সত্য পথে আনিবার পর জাতির লোকদের আদর্শ হইবে 'আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই।' তাঁহার দ্বারা আল্লাহ্ অন্ধ চক্ষুকে জ্যোতির্ময়, বধির কর্ণকে শ্রুতিশীল এবং বদ্ধ হৃদয়কে উন্মুক্তদ্বার করিয়া দিবেন।'

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম বুখারী ভিন্ন সিহাহ সিত্তার অন্য কোন সংকলক বর্ণনা করেন নাই। ইমাম বুখারী উহা স্বীয় 'সহীহ' সংকলনের 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়ে উপরোক্ত রাবী ফালীহ ইব্‌ন সুলায়মান হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং 'ফালীহ ইব্‌ন সুলায়মান হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান' এই ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী হিলাল ইব্‌ন আলী হইতে আব্দুল আযীয ইব্‌ন আবূ সালিমাহও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, 'উক্ত হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, হিলাল এবং সাঈদও বর্ণনা করিয়াছেন।' ইমাম বুখারী আবার উহা তাফসীর অধ্যায়ে 'হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমার ইব্‌ন আস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, হিলাল, আব্দুল আযীয ইব্‌ন আবূ সালিমাহ ও আব্দুল্লাহর সনদে প্রায় অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন।' উপরোক্ত রাবী আব্দুল্লাহ্ হইতেছেন-আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাহ। ইমাম বুখারী 'আদব' অধ্যায়ে তাহার পরিচয় উপরোক্তরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইব্‌ন মাসউদ দামেশকী বলিয়াছেন, 'উক্ত আব্দুল্লাহ্ হইতেছে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যর।'

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন ইয়াসার, হিলাল ইব্‌ন আলী, ফালীহ ইব্‌ন সুলায়মান, মুআফী ইব্‌ন সুলায়মান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন বাররা, আহমদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আইউব ও হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়্যা

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহার সহিত এই অতিরিক্ত কথাটিও বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আতা বলেন-অতঃপর কা'ব আহ্বারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নিকটও অনুরূপ প্রশ্ন করিলাম। তিনিও অনুরূপ কথা বর্ণনা করিলেন।

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব

(١٢٠) وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

(١٢١) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

১২০. আর ইয়াহূদী ও নাসারারা কখনই তোমার উপরে সন্তুষ্ট হইবে না যতক্ষণ না তুমি তাহাদের মিল্লাতের অনুসারী হইবে। বল, "নিশ্চয় আল্লাহ্র পথ প্রদর্শনই একমাত্র পথপ্রদর্শন। আর যদি তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরেও তাহাদের অভিলাষ অনুসরণ কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্য আল্লাহ্র তরফের কোন বন্ধু ও মদদগার পাইবে না।"

১২১. "যাহাদিগকে আল-কিতাব প্রদান করা হইয়াছে তাহাদের যাহারা যথাযথভাবে উহা তিলাওয়াত করে, তাহারাই উহার উপর ঈমান আনে। আর যে ব্যক্তি উহা অবিশ্বাস করে, অনন্তর তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"

তাফসীর ঃ ইমাম ইব্ন জারীর বলেন- وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! ইয়াহূদী ও নাসারা জাতিদ্বয় কোনদিন তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না। অতএব তাহারা কিসে সন্তুষ্ট হয়, তুমি তাহা সন্ধান করিতে যাইও না। বরং আল্লাহ্ তোমার প্রতি যে সত্যকে নাযিল করিয়াছেন, সেই সত্যের প্রতি তাহাদিগকে আহ্বান জানাইতে থাকিয়া আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করিতে সচেষ্ট থাক।"

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি বল-আল্লাহ্ আমাকে যে হিদায়েত ও সত্য দিয়া পাঠাইয়াছেন, সেই হিদায়েত ও সত্যই সরল, সঠিক, পূর্ণ ও সার্বজনীন দীন ও হিদায়েত।

কাতাদাহ বলেন-'قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى' আয়াতাংশটি নবী করীম (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণের প্রতি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত একটি যুক্তি যাহার সাহায্যে তাঁহারা কাফিরদের বিরুদ্ধে বিতর্কে লিপ্ত হইতেন। কাতাদাহ আরও বলেন-'আমার নিকট ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী

করীম (সা) বলিতেন–যতদিন আল্লাহ্র গুরুত্বপূর্ণ কাজটি (কিয়ামত) না ঘটে, ততদিন ধরিয়া আমার উম্মতের মধ্য হইতে একটি দল সত্যের পথে লড়িয়া যাইবে। তাহারা উক্ত লড়াইয়ে বিজয়ী হইতে থাকিবে। তাহাদের শত্রুগণ তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–উক্ত হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلاَنَصِيْرٍ -

উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের অনুসরণের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করিয়া তাঁহার মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে বলিতেছেন-'তোমাদের নিকট কুরআন সুন্নাহরূপ জ্ঞানের আলো আসিবার পর তোমরা যদি ইয়াহুদী ও নাসারা জাতির অন্যায় অভিলাষ অনুসরণ কর, তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দিবেন এবং উহা হইতে কেহ তোমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না।' আল্লাহ্ আমাদের সকলকে উক্ত গোমরাহী হইতে রক্ষা করুন।

আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত ملتهم শব্দদ্বয় দ্বারা একদল ফকীহ্ প্রমাণ করেন যে, সকল প্রকারের কুফর এক মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা বলেন–আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারা এই দুই জাতির পৃথক দুইটি ধর্মকে বুঝাইবার জন্যে ملة (একটি ধর্ম) শব্দটিকে ব্যবহার করিয়াছেন। উহা একবচন শব্দ বিধায় প্রমাণিত হয়, কুফর যত প্রকারই হউক না কেন, উহারা মূলত একই মিল্লাতের বিভিন্ন শাখা মাত্র। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ "তোমাদের দীন তোমাদের জন্যে আর আমার দীন আমার জন্যে।"

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের বিভিন্ন দীনের প্রতি একবচন শব্দ دين (একটি দীন) প্রয়োগ করিয়াছেন। উহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, সকল প্রকারের কুফর মূলত একটি মাত্র ধর্ম বা দীন।

উপরোল্লেখিত মূলনীতির ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম শাফেঈ (র) এবং এক রিওয়ায়েত অনুসারে ইমাম আহমদ (র) বলেন–মুসলিম ও অমুসলিম ইহাদের একে অপরের উত্তরাধিকারী না হইলেও এক ধর্মের কাফির অন্য ধর্মের কাফিরের উত্তরাধিকারী হইবে। ইমাম মালিক এবং এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহমদ বলেন–'এক ধর্মের কাফির অন্য ধর্মের কাফিরের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না।' তাঁহারা বলেন, হাদীসে এইরূপ নির্দেশই রহিয়াছে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ - الخ 'এই আয়াতে ইয়াহুদী ও নাসারাদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।' আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীর উহাকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কাতাদাহ হইতে সাঈদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'উক্ত আয়াতে নবী করীম (সা)-এর সাহাবীদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।'

হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা, হযরত উসামা ইব্ন যায়দ, ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়ামান, ইবরাহীম ইব্ন মূসা, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইমরান ইস্পাহানী, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ অর্থাৎ যখন তাহারা জান্নাত সম্পর্কিত কোন আয়াত তিলাওয়াত করে, তখন আল্লাহ্র কাছে উহার জন্যে প্রার্থনা জানায়। আর যখন তাহারা দোযখ সম্পর্কিত আয়াত তিলাওয়াত করে, তখন আল্লাহ্র কাছে উহা হইতে আশ্রয় কামনা করে।' হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে আবুল আলীয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার জান রহিয়াছে সেই সত্তার কসম করিয়া বলিতেছি–আল্লাহ্র কালামকে যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করিবার তাৎপর্য হইতেছে উহাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানা ও তদনুযায়ী আমল করা। উহা যেইরূপে নাযিল হইয়াছে, সেইরূপে তিলাওয়াত করা, উহার শব্দসমূহ ও বাক্যাবলীকে স্থানচ্যুত ও পরিবর্তিত না করা এবং কোন অংশের অর্থ ও মর্মকে বিকৃত না করা।'

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাকও উপরোক্তরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে মানসূর ইব্ন মু'তামারও অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মালিক ও সুদ্দী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ্র কিতাবকে 'যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করিবার তাৎপর্য হইতেছে উহাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মনে করিয়া তদনুযায়ী আমল করা আর উহার কোন অংশকে স্থানচ্যুত বা পরিবর্তিত না করা।' ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন–'হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতেও অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে।' হাসান বসরী আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ 'আল্লাহ্র কিতাবকে যথোচিতভাবে তিলাওয়াত কবিবার তাৎপর্য হইতেছে উহার নিশ্চিতার্থক আয়াতসমূহের (المحكمات) উপর আমল করা এবং অনিশ্চিতার্থক আয়াতসমূহের (المتشابهات) প্রতি ঈমান রাখা আর উহার যে অংশের অর্থ ও তাৎপর্য বোধগম্য হয় না, তাহা বুঝিবার জন্যে সে বিষয়ে বিজ্ঞ আলেমের কাছে যাওয়া।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, দাঊদ ইব্নে আবূ হিন্দ, ইব্ন আবূ যায়দা, ইবরাহীম ইব্ন মূসা, আবূ যুরআ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্র কালামকে যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করিবার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, উহা যথোচিতভাবে মানিয়া চলা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আরও বলেন– وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا এই আয়াতের অন্তর্গত تلا ক্রিয়াটি যেইরূপে অনুসরণ করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত يَتْلُوْنَ ক্রিয়াটিও সেইরূপে 'অনুসরণ করা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইকরামা, আতা, মুজাহিদ, আবূ রযীন এবং ইবরাহীম নাখঈ হইতেও অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুররা, যুবায়দ ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ্র কালামকে যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করিবার তাৎপর্য হইতেছে উহাকে যথোচিতভাবে অনুসরণ করা।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ 'হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে', মালিক ও নসর ইব্ন ঈসা বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ অর্থাৎ 'তাহারা উহাকে যথোচিতভাবে মানিয়া চলে।' অতঃপর ইমাম কুরতুবী বলেন–'প্রসিদ্ধ রাবী ও সমালোচক খতীবের বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত রিওয়ায়েতের সনদে একাধিক অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রহিয়াছে। তবে উহার বক্তব্যের বিষয় সহীহ ও সঠিক।' হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন–'যে ব্যক্তি কুরআন মজীদকে মানিয়া চলে, সে উহাকে সঙ্গে লইয়া জান্নাতের উদ্যানসমূহে প্রবেশ করিবে।'

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'আল্লাহ্র কালামকে যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করিবার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, রহমতের আয়াত তিলাওয়াত করিবার কালে আল্লাহ্র নিকট রহমতের জন্যে দোয়া করা এবং আযাবের আয়াত তিলাওয়াত করিবার কালে আযাব হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নবী করীম (সা) কুরআন মজীদকে এইরূপেই তিলাওয়াত করিতেন। তিনি রহমতের আয়াত তিলাওয়াত করিবার কালে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রহমতের জন্যে দোয়া করিতেন এবং আযাবের আয়াত তিলাওয়াত করিবার কালে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আযাব হইতে আশ্রয় চাহিতেন।

أُولَئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ (তাহারা উহার প্রতি ঈমান রাখে) আয়াতের প্রথমাংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'যাহারা কিতাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা কিতাবকে যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করিয়া থাকে।' উপরোক্ত অংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্বন্ধে সংবাদ দিতেছেন যে, 'তাহারা তোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপরও ঈমান আনে।' আলোচ্য আয়াতের উভয় অংশের তাৎপর্য এই যে, যাহারা পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহকে যথোচিতভাবে কায়েম করে, তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপরও ঈমান রাখে।

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ -

"আর তাহারা যদি তাওরাত, ইঞ্জীল এবং তাহাদের প্রতি তাহাদের পরওয়ারদিগারের তরফ হইতে অন্য যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে উহা কায়েম করিত, তবে তাহারা নিশ্চয় তাহাদের উপর ও নীচ উভয় দিক হইতে বিপুল আহার্য লাভ করিত।

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْئٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ -

"হে আহলে কিতাব! তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাওরাত, ইঞ্জীল এবং তোমাদের প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের উপর অন্য যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা না যথোচিতভাবে কায়েম করিবে, ততক্ষণ তোমাদের কোন ভিত্তি নাই।" অর্থাৎ তাহাতে মুহাম্মদ (সা)-এর যে পরিচয় ও গুণাবলী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহাকে অনুসরণ ও সাহায্য করিবার যে নির্দেশ প্রদত্ত রহিয়াছে

তাহা সত্য বলিয়া মনে প্রাণে গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমাদের মুক্তি নাই। তোমাদের এই কার্যই তোমাদিগকে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ সত্যকে গ্রহণ করিবার দিকে লইয়া যাইবে এবং উহার ফলে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল ও কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে।

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الاُمِّيَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالاِنْجِيْلِ -

"তাহারা সেইসব লোক যাহারা উম্মী নবী ও রাসূলকে অনুসরণ করে–যে রাসূলের পরিচয় তাহারা নিজেদের নিকট (রক্ষিত) তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিখিত পাইতেছে।"

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لاَتُؤْمِنُوْا - اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلاً -

"তুমি বল–তোমরা ঈমান আন অথবা না আন; উহার (কুরআন মজীদের) পূর্বে যাহাদিগকে প্রজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে, তাহাদের সম্মুখে যখন উহা (কুরআন মজীদ) তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাহারা বিনীতভাবে চিবুক মাটিতে রাখিয়া সিজদা করে আর বলে–আমাদের পরওয়ারদিগার অতি মহান! আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় পূর্ণ হইয়াছে।"

اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلاً অর্থাৎ আমাদের পরওয়ারদিগার মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের বিষয়ে আমাদিগকে যে ওয়াদা দিয়াছিলেন নিশ্চয় উহা পূর্ণ হইয়াছে।

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ - وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا - اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ - اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ - وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

"আমরা উহার (কুরআন মজীদের) পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব প্রদান করিয়াছি, তাহারা উহার প্রতি ঈমান আনে। আর যখন উহা তাহাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাহারা বলে–'আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিলাম। নিশ্চয় উহা আমাদের পরওয়ারদিগারের তরফ হইতে আগত সত্য। আমরা উহার আগমনের পূর্বেই আত্মসমর্পণকারী ছিলাম।' তাহাদিগকে তাহাদের সবরের কারণে দুইবার পুরস্কার প্রদান করা হইবে। আর তাহারা অশিষ্টতাকে শিষ্টতা দ্বারা প্রতিরোধ করে এবং তাহাদিগকে আমি যে রিযিক প্রদান করিয়াছি, উহা হইতে তাহারা দান করে।"

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَقُلْ لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ وَالاُمِّيِّيْنَ ءَاَسْلَمْتُمْ - فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ - وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ -

"আর আহলে কিতাব এবং উম্মীদিগকে তুমি বল–'তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ?' যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তো তাহারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হইল। আর যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করা হইতে ফিরিয়া থাকে, তবে তোমার উপর শুধু আমার কথা পৌঁছাইবার দায়িত্ব রহিয়াছে। অনন্তর আল্লাহ্ বান্দাদিগকে দেখিতেছেন।"

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ অর্থাৎ আর যাহারা উহার প্রতি কুফর করে, তাহারা মহা-ক্ষতিগ্রস্ত।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ "আর বিভিন্নদলের যাহারা উহার প্রতি কুফর করিবে, আগুন তাহাদের প্রতিশ্রুত শাস্তি।"

এইরূপ সহীহ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'যেই সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, সেই সত্তার কসম করিয়া বলিতেছি–ইয়াহূদীই হউক আর নাসারাই হউক এই উম্মতের (সমগ্র মানব জাতির) কাহারও কানে আমার আগমনের সংবাদ পৌঁছিবার পর যদি সে আমার প্রতি ঈমান না আনে, তবে তাহাদের দোযখে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।'

বনী ইসরাঈলের প্রতি সতর্কবাণী

(١٢٢) يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

(١٢٣) وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

১২২. হে বনী ইসরাঈলবৃন্দ! আমি যেই সব নি'আমাত তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছি তাহা স্মরণ কর। আর নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সমগ্র সৃষ্টির উপর মর্যাদা দান করিয়াছিলাম।

১২৩. তোমরা সেই দিনটিকে ভয় কর যেইদিন কেহ কাহারও কোন উপকারে আসিবে না ও কাহারও নিকট হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না। আর কাহারও সুপারিশ কাজে আসিবে না এবং তাহারা কোনই সাহায্য পাইবে না।

তাফসীর ঃ এই সূরার প্রথমদিকে এই আয়াতদ্বয়ের অনুরূপ দুইটি আয়াত উল্লেখিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের বক্তব্যের গুরুত্বকে প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এই স্থলে উহা পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন। আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে তাহাদের প্রতি প্রদত্ত তাঁহার নি'আমাতসমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে এবং তাঁহার রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিতে বলিতেছেন। ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা

তাহাদিগকে যে কিতাব প্রদান করিয়াছেন, উহাতেই আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচয় ও গুণাবলী এবং তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সহ তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবার নির্দেশ উল্লেখিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন-তাহারা যেন সত্য গোপন না করিয়া উহা গ্রহণ করে। আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা) তাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ না করিয়া বরং আরব গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং আরব গোত্র শেষ নবীর দানে ধন্য হইল, এই অজুহাতে যেন তাহারা তাঁহার প্রতি হিংসা না করে।' কারণ, তাঁহার প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র অনুগ্রহ থাকিবে। পক্ষান্তরে, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিবার শাস্তি অতিশয় ভয়াবহ। কোনরূপ হিংসা বা যে কোন কারণে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিলে তাহারা কিয়ামতের দিনে মহা শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। কোন সাহায্যকারী বা সুপারিশকারী সেদিন তাহাদিগকে দোযখের ভয়াবহ শাস্তি হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। অতএব, তাহারা যেন সত্যকে গ্রহণ করিয়া আযাব হইতে বাঁচিয়া থাকিতে সচেষ্ট হয়।

ইবরাহীম (আ)-এর মর্যাদা

(١٢٤) وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرٰهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ ○

১২৪. আর যখন ইবরাহীমকে তাহার প্রভু কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করিলেন, সে তাহা পূর্ণ করিল। নিশ্চয় আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করিব। সে বলিল-এবং আমার সন্তানগণকেও। তিনি বলিলেন, 'আমার এই প্রতিশ্রুতির আওতায় জালিমগণ আসিবে না।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিক ও ইয়াহুদী-নাসারাসহ সমগ্র মানব জাতিকে উপদেশ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মহান মর্যাদা ও উহার কারণ বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে একাধিক কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়া উহাতে তাঁহাকে কৃতকার্য পাইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে ঈমান ও আমলে মানব জাতির ইমাম ও নেতার মহাসম্মানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজের বংশধরদের জন্যেও উক্ত ইমামত ও নেতৃত্বের মহাসম্মানের জন্যে প্রার্থনা জানাইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে উহার প্রতিশ্রুতি দিয়া ইহাও জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশধরদের মধ্যে কাফির এবং জালিম লোকের আবির্ভাবও ঘটিবে। তাহারা আল্লাহ্র উক্ত প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্র হইবে না। অতএব তাহারা লোকদের জন্যে অনুসরণীয়ও নহে। লোকে যেন তাহাদিগকে অনুসরণ না করে। ইহাই আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ অর্থাৎ-'হে মুহাম্মদ! তুমি মুশরিক ও ইয়াহুদী-নাসারা জাতিসমূহের নিকট ইবরাহীমের কাহিনী বিবৃত কর। আল্লাহ্ ইবরাহীমকে কতগুলি কঠিন আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইবরাহীম উহার সবগুলিতেই কৃতকার্য হইয়াছিল।' মুশরিক, ইয়াহুদী ও নাসারাগণ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর

অনুসারী হইবার দাবী করিলেও তাহারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অনুসারী নহে; বরং নবী করীম (সা) এবং তাঁহার সাহাবীগণই হইতেছেন তাঁহার প্রকৃত অনুসারী। মুশরিক, ইয়াহুদী, নাসারা জাতিসমূহের জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনীর মধ্যে উপদেশ রহিয়াছে।

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى "আর সেই ইবরাহীম যে তাহার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করিয়াছিল।"

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ شَاكِرًا لِاَنْعُمِهٖ اِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ وَاٰتَيْنَاهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ ـ ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ـ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

"নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল আল্লাহ্র প্রতি অনুগত সত্যানুরাগী ব্যক্তি। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে ছিল তাঁহার (আল্লাহ্র) নিআমাতসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি তাহাকে বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং সরল পথ দেখাইয়াছিলেন। আর আমি তাহাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করিয়াছি এবং আখিরাতে সে নিশ্চয় নেককারদের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। অনন্তর আমি তোমার নিকট এই প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিয়াছি যে, তুমি ইবরাহীমের পথ অনুসরণ করো। সে ছিল অনুগত সত্যানুরাগী এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

قُلْ اِنَّنِىْ هَدَانِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ـ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

"তুমি বলো– নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ দেখাইয়াছেন। উক্ত পথই হইতেছে সঠিক পথ। উহা ইবরাহীমের পথ। ইবরাহীম ছিল অনুগত সত্যানুরাগী। আর সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَانَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ـ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"ইবরাহীম না ছিল ইয়াহুদী আর না ছিল নাসারা; কিন্তু সে ছিল সত্যানুরাগী ও মুসলিম। আর সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নিশ্চয় ইবরাহীমের নিকটতম ব্যক্তিগণ হইতেছে তাহারা যাহারা তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে আর এই নবী এবং যাহারা (তাঁহার প্রতি) ঈমান আনিয়াছে, তাহারা। আর আল্লাহ্ মু'মিনদের বন্ধু।"

শব্দার্থ ঃ كلمة শব্দের অর্থ হইতেছে–বিধান। এইস্থলে উহার তাৎপর্য হইতেছে আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্র বিধান দুই প্রকারে বিভক্ত। كلمة শব্দটি উভয় প্রকারের বিধানের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের বিধান প্রাকৃতিক বিধান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ "আর সে (মরিয়াম) স্বীয় প্রতিপালকের বিধানসমূহ এবং কিতাবসমূহকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।"

এইস্থলে كلمة শব্দের তাৎপর্য হইতেছে প্রাকৃতিক বিধানাবলী।

দ্বিতীয় প্রকারের বিধান শারীআতের মাধ্যমে প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً "আর তোমার প্রতিপালকের বিধান সত্যতা ও ন্যায্যতা উভয় দিক দিয়া পরিপূর্ণ হইয়াছে।"

এইস্থলে كلمة শব্দটির তাৎপর্য হইতেছে শারীআতের মাধ্যমে প্রদত্ত বিধান।

শারীআতের মাধ্যমে প্রদত্ত বিধান আবার দুই ভাগে বিভক্ত ঃ সত্য সংবাদ ও ন্যায্য আদেশ বা নিষেধ। وَاِذِ ابْتَلَى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ الخ এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা যে বিধানাবলী উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ছিল শেষোক্ত শ্রেণীর বিধানাবলী অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধ।

قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا অর্থাৎ আল্লাহ্ বলিলেন–আমার সকল আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে তোমার পালন করিবার পুরস্কারস্বরূপ আমি তোমাকে দীনী ইমাম বা ধর্মীয় নেতা বানাইব। তুমি মানুষকে আমার দীনের প্রতি আহ্বান জানাইবে এবং মানুষ তোমাকে অনুসরণ করিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা কি কি আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে পরীক্ষা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে এই বিষয়ে বিভিন্নরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদাহ, মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জ সম্পর্কিত নির্দেশাবলীর (المناسك) মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তামীমী ও আবূ ইসহাক সাবীঈ উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, ইব্নে তাউস, মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে মস্তকের সহিত সংশ্লিষ্ট পাঁচটি এবং দেহের অবশিষ্টাংশের সহিত সংশ্লিষ্ট পাঁচটি মোট দশটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত বিধানের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মস্তকের সহিত সংশ্লিষ্ট নির্দেশগুলি হইতেছে ঃ 'গোঁফ খাটো রাখা, কুলি করা, নাকে পানি দিয়া নাক সাফ করা, মিসওয়াক করা ও মাথার চুলে সিঁথি কাটা। দেহের অবশিষ্টাংশের সহিত সংশ্লিষ্ট নির্দেশগুলি হইতেছে ঃ হাত-পায়ের আঙ্গুলের নখ কাটা, গুপ্ত স্থানের লোম মুণ্ডানো, খতনা করা, বগলের লোম তুলিয়া ফেলা এবং মল-মূত্র ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা পরিষ্কার করা।'

ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন–'সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব, মুজাহিদ, শা'বী, ইবরাহীম নাখঈ, আবূ সালেহ এবং আবূ জাল্‌দ হইতেও উপরোক্ত রূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।'

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি–'হযরত আয়েশা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে যে রিওয়ায়েতটি বর্ণিত রহিয়াছে, উহাও প্রায় অনুরূপ। উক্ত রিওয়ায়েতটি এই ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– দশটি কার্য মানুষের الفطرة। বা সহজাত প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। যথা গোঁফ খাটো রাখা, দাড়ি লম্বা রাখা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দিয়া নাক সাফ করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের গিরাগুলি ধৌত করা, বগলের লোম তুলিয়া ফেলা; গুপ্তস্থানের লোম মুণ্ডন করা, মলমূত্র ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা পরিষ্কার হওয়া (انتقاص الماء) দশম কার্যটি কি তাহা হযরত আয়েশা (রা) ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন–'সম্ভবত উহা হইতেছে কুলি করা।'

ওয়াকী' বলেন ঃ انتقاص الماء। অর্থাৎ মল-মূত্র ত্যাগ করিবার পর উহা নির্গমন স্থান পানি দ্বারা পরিষ্কার করা।'

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ (সুরুচিপূর্ণ প্রবৃত্তি) الفطرة। হইতেছে পাঁচটি ঃ খতনা করা, গুপ্তস্থানের লোম চাঁছিয়া ফেলা, গোঁফ খাটো করা; নখ কাটা এবং বগলের লোম তুলিয়া ফেলা।'

হানাশ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ সুনআনী হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন হুরায়রা, ইব্‌ন লাহীআ, ইব্‌নে ওয়াহাব, ইউনুস ইব্‌নে আব্দুল আ'লা ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَاِذِ ابْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিতেন–আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দশটি আদেশের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্য হইতে ছয়টি মানব-দেহের সহিত সম্পর্কিত এবং চারটি হজ্জের সহিত সম্পর্কিত। মানব-দেহের সহিত সম্পর্কিত ছয়টি আদেশ হইতেছে এই ঃ গুপ্ত স্থানের লোম চাঁছিয়া ফেলা ও বগলের লোম তুলিয়া ফেলা, খতনা করা;[১] রাবী ইব্‌ন হুরায়রা বলেন–'উক্ত তিনটি মিলিয়া দুইটি হইয়াছে।' আর নখ কাটা; গোঁফ খাটো করা; মিসওয়াক করা এবং জুমআর দিনে গোসল করা। হজ্জের সহিত সম্পর্কিত চারটি আদেশ হইতেছে এই ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করা, সাফা ও মারওয়াহ পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানো, কংকর নিক্ষেপ করা এবং তাওয়াফে ইফাযা করা।

দাউদ ইব্‌নে আবূ হিন্দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইকরামা বলেন, একদা হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলিলেন–'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যে সকল আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সকল আদেশ-নিষেধের পরীক্ষায় একমাত্র তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন। উক্ত পরীক্ষায় তিনি ভিন্ন অন্য কেহ সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারে নাই।' তাই হযরত ইবরাহীম (আ) সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِذِ ابْتَلَى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ আমি (ইকরামা) প্রশ্ন করিলাম–'যে সকল আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পরীক্ষা করিয়াছিলেন,

---

১. الدر المنثور গ্রন্থে এইস্থলে 'অথবা খতনা করা'–এইরূপ কথা উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত বর্ণনা অনুসারে প্রথম প্রকারের ছয়টি আদেশই রিওয়ায়েতে উল্লেখিত পাওয়া যায়। ইব্‌ন আবূ হাতিমের আলোচ্য রিওয়ায়েতে উল্লেখিত প্রথম প্রকারের আদেশসমূহের সংখ্যা ছয়টির অধিক দেখা যায়।

সেইগুলো কি কি? তিনি বলিলেন-ইসলাম ত্রিশটি অঙ্গ অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ লইয়া গঠিত। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ইসলামের সেই ত্রিশটি আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। উক্ত ত্রিশটি আদেশ-নিষেধের মধ্য হইতে দশটি আদেশ-নিষেধ সূরা বারাআতের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

উক্ত ত্রিশটি আদেশ-নিষেধের মধ্য হইতে দশটি আদেশ-নিষেধ সূরা মু'মিনূনের প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াতে (অর্থাৎ নয়টি আয়াতে) এবং সূরা মা'আরিজের কয়েকটি আয়াতে যথা-

اِلاَّ الْمُصَلِّيْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ دَائِمُوْنَ - الى قوله تعالى - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ -

উক্ত ত্রিশটি আদেশ-নিষেধের মধ্য হইতে দশটি আদেশ-নিষেধ সূরা আহযাবের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ - الى اخر الاية অতঃপর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন-'হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার সকল আদেশ-নিষেধই পালন করিয়াছিলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার জন্যে দোযখ হইতে মুক্তি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।'

হাকাম, ইমাম আবূ জা'ফর ইব্নে জারীর এবং ইমাম আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হাতিম উক্ত রিওয়ায়েত উপরোক্ত রাবী দাউদ ইব্ন আবী হিন্দ হইতে পূর্বোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ যে সকল বিষয় الكلمات -এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং যে সকল বিষয় তিনি পরিপূর্ণরূপে পালন করিয়াছিলেন, সেইগুলি হইতেছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে নির্দেশ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্বীয় জাতিকে পরিত্যাগ করা; বাদশাহ নমরূদের নিকট তাঁহার ইসলামের তাবলীগ করা এবং সাহসিকতার সহিত তাঁহার যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করা; আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে বরণ করিয়া লওয়া; আল্লাহ্র তরফ হইতে নির্দেশ আসিবার পর তাঁহার সন্তোষ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে হিজরত করা; আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে জান-মাল দিয়া অতিথি সেবা করা; এবং আল্লাহ্র নির্দেশে স্বীয় পুত্রকে যবেহ করা।

হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কার্যসমূহ সম্পন্ন করার পর আল্লাহ্ তা'আলা পরীক্ষা করিবার জন্যে তাঁহাকে মনোনীত করিয়া এই আদেশ করিলেন- اسلم (আমার নিকট আত্মসমর্পণ করো)। তিনি মানুষের পক্ষ হইতে

আগত বিরোধিতা ও নিপীড়ন নির্যাতনের মুখে বলিলেন- اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ (আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।')

হাসান বসরী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ রজা, ইসমাঈল ইব্‌ন আলীয়া, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও ইমাম ইব্‌নে আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهِمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নক্ষত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্যে তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে চন্দ্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্যে তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে সূর্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্যে তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে হিজরতের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্যে তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে খতনার মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্যে তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার পুত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্যে তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।'

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ, ইয়াযীদ ইব্‌ন যরীঈ, বিশর ইব্‌ন মু'আয ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হাসান বসরী বলিতেন-আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যে বিষয়ের মাধ্যমেই পরীক্ষা করিয়াছেন, তিনি উহাতেই কৃতকার্য হইয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে নক্ষত্র, চন্দ্র এবং সূর্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি উহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতিপালক প্রভু চিরঞ্জীব ও অনন্ত। যে সত্তা আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি মিথ্যা মা'বূদ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সেই সত্তার দিকে মুখ করিয়াছেন। আর তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে হিজরতের আদেশের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে স্বীয় জন্মভূমি ও স্বীয় জাতিকে ত্যাগ করিয়া সিরিয়ায় চলিয়া যান। তাঁহার হিজরতের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে আগুনের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি উহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাঁহার পুত্রকে যবেহ করিতে আদেশ করিবার মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি উহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে খত্‌নার নির্দেশ দিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি উহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী হইতে ধারাবাহিকভাবে জনৈক রাবী (নাম উহ্য রহিয়াছে), মুআম্মার ও আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হাসান বসরী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁহার পুত্রের যবেহ, আগুন, নক্ষত্র, চন্দ্র এবং সূর্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হিলাল, সালেম ইব্‌ন তায়বাকু ইব্‌ন বিশার ও ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং প্রতিটি পরীক্ষায় তাঁহাকে ধৈর্যশীল ও সত্যের প্রতি অবিচল পাইয়াছিলেন।'

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যে সকল বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা

করিয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে একটি নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا (তিনি বলেন–নিশ্চয় আমি তোমাকে মানুষের জন্যে ইমাম বানাইব।)

উহাদের মধ্য হইতে আরেকটি নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ "আর সেই সময়টি স্মরণ-যোগ্য, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ (গাঁথিয়া) উচ্চ করিতেছিল।"

উহাদের মধ্য হইতে কয়েকটি হইতেছে ঃ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি প্রদত্ত হজ্জ সম্পর্কিত আদেশ; হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে নির্ধারিত স্থান; বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার অধিবাসীদিগকে আল্লাহ্ তা'আলার রিযিক দান এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর দীনসহ প্রেরণ করা। এই বিষয়গুলো কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত রহিয়াছে।'

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ নাজীহ, উরায়কা, শাবাবাহ, হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাবাহ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলিলেন 'আমি তোমাকে একটি বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করিব। উহা কি হইবে বলো? হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–তুমি কি আমাকে লোকদের ইমাম বানাইবে? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–হ্যাঁ। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–আমার বংশধরদের মধ্য হইতেও? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–তবে জালিমগণ (অর্থাৎ কাফিরগণ) আমার প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্র নহে। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–তুমি কি কা'বা ঘরকে লোকদের জন্যে পুণ্যস্থান বানাইবে? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন- হ্যাঁ। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–আর উহাকে শান্তি নিকেতন বানাইবে? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–হ্যাঁ। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–আর আমাদের দুইজনকে (অর্থাৎ–পিতা-পুত্রকে) তোমার প্রতি অনুগত বানাইবে এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হইতে তোমার প্রতি অনুগত একদল লোক সৃষ্টি করিবে? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–হ্যাঁ। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–মক্কার অধিবাসীদিগের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনিবে তাহাদিগকে ফলসমূহ হইতে রিযিক দিবে? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–'হ্যাঁ।' রাবী ইব্নে আবূ নাজীহ বলেন–'উক্ত রিওয়ায়েত আমি ইকরামার নিকট হইতে শুনিয়া উহা মুজাহিদের নিকট উপস্থাপন করিলে তিনি উহার বিরুদ্ধে কিছু বলিলেন না।' ইমাম ইব্ন জারীর উহা 'মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ' এই উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং একাধিক অধস্তন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্নে আবূ নাজীহ ও সুফিয়ান ছাওরী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন–'আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল বিষয়ের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পরীক্ষা করিয়াছেন, উহার বর্ণনা আয়াতের নিম্নোক্ত অংশ এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে রহিয়াছে ঃ

قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ـ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ـ قَالَ لَايَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ

রবী' ইব্ন আনাস হইতে আবূ জা'ফর রাযী বর্ণনা করিয়াছেন– আল্লাহ্ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যে সকল বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে উহার বর্ণনা রহিয়াছে ঃ

إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا "নিশ্চয় আমি তোমাকে লোকদের জন্য ইমাম বানাইব।"

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا "আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন কা'বা ঘরকে লোকদের জন্য মিলনভূমি ও শান্তি-নিকেতন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলাম।"

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى "আর তোমার ইবরাহীমের অবস্থান স্থল-এর যে কোন অংশকে নামাযের স্থান বানাও।"

وَعَهِدْنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ـ

"আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিলাম—তোমরা উভয়ে আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের জন্যে, ই'তিকাফকারীদের জন্যে, রুকূকারীদের জন্যে এবং সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখো।"

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمعِيْلُ "আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ উঁচু করিতেছিল।"

সুদ্দী বলেন—আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যে সকল বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে উহাদের বর্ণনা রহিয়াছে ঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ـ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ ـ

"হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদের দোআ কবূল কর; নিশ্চয় তুমি শ্রবণশীল, প্রজ্ঞাবান। হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আর আমাদের দুইজনকে তোমার প্রতি অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশধরদের মধ্যে তোমার প্রতি অনুগত একদল লোক সৃষ্টি করিও। হে আমাদের পরওয়ারদিগার! অনন্তর তুমি তাহাদের জন্য তাহাদের মধ্য হইতে একজন রাসূল পাঠাইও।"

ইমাম কুরতুবী বলেন—'ইমাম মালিকের মুআত্তা এবং অন্যান্য গ্রন্থে ইয়াহিয়া ইব্‌নে সাঈদ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, সাঈদ ইব্‌নে মুসাইয়্যেব বলেন—সর্বপ্রথম খতনা করেন হযরত ইবরাহীম (আ)। তিনিই সর্বপ্রথম অতিথি সেবা করেন, তিনিই সর্বপ্রথম নখ কাটেন, তিনিই সর্বপ্রথম গোঁফ খাটো করেন, এবং তিনিই সর্বপ্রথম বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হন। তিনি (স্বীয় মস্তকে) বার্ধক্যের চিহ্ন দেখিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরয করিলেন—হে প্রভু! ইহা কি? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন-ইহা সম্মানের প্রতীক। তিনি আরয করিলেন—হে প্রভু! আমাকে আরও সম্মান দান কর।

ইবরাহীম হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র সা'দ ও ইব্‌ন আবূ শায়বা বর্ণনা করিয়াছেন—সর্বপ্রথম মিম্বরের দাঁড়াইয়া খুৎবা প্রদান করেন হযরত ইবরাহীম (আ)। জনৈক ব্যক্তি (নাম উহ্য রহিয়াছে) বলেন—'সর্বপ্রথম প্রতিনিধি প্রেরণ করেন হযরত ইবরাহীম (আ)।

তিনিই সর্বপ্রথম তলোয়ার দ্বারা আঘাত করেন (অর্থাৎ জিহাদ করেন)। তিনিই সর্বপ্রথম মিসওয়াক ব্যবহার করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মল-মূত্র ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম পায়জামা পরিধান করেন।'

হযরত মুআয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–আমি মিম্বর ব্যবহার করিলে কি অন্যায়? আমার পিতা ইবরাহীমও ইতিপূর্বে ইহা করিয়াছেন। আর আমি লাঠি ব্যবহার করিলে কি ক্ষতি? আমার পিতা ইবরাহীমও ইতিপূর্বে লাঠি ব্যবহার করিয়াছেন।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–উপরোক্ত হাদীস সহীহ্ বলিয়া প্রমাণিত নহে। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম কুরতুবী উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহের বর্ণনা শেষ করিবার পর উহাতে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে শরীআতে কি কি বিধান রহিয়াছে এবং শরীআতে উহাদের স্থান কোথায় তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর বলেন–'আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যার সবগুলি অথবা উহাদের যে কোনো একটি সহীহ ও সঠিক হইতে পারে। সহীহ হাদীস অথবা সর্বসম্মত অভিমত (اجماع)-এর সাহায্য ব্যতীত উহাদের কোন একটি ব্যাখ্যাকে নির্দিষ্ট করিয়া সহীহ্ ও সঠিক বলা যায় না। বস্তুত, উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহের কোনটিই এক বা একাধিক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নহে। উল্লেখযোগ্য যে, মাত্র একজন রাবী অথবা একাধিক স্বল্প সংখ্যক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস (خبر واحد)-এর উপর আমল করা ওয়াজিব নহে। পক্ষান্তরে বিপুল সংখ্যক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করা ওয়াজিব।'

ইমাম ইব্নে জারীর অতঃপর বলেন–'অবশ্য নবী করীম (সা) হইতে এইরূপ দুইটি রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে যাহা সহীহ হইলে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে বিবেচিত হইতে পারিত। রিওয়ায়েত দুইটির একটি হইতেছে এই ঃ

হযরত সাহল ইব্ন মুআয ইব্ন আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকসূত্রে যাবান ইব্ন ফায়েদ, রাশিদ ইব্ন সা'দ ও আবূ কুরায়ব আমার (ইমাম ইব্ন জারীর) নিকট বর্ণনা করিয়াছেন–নবী করীম (সা) বলিতেন–আমি কি তোমাদিগকে বলিব, কেন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে স্বীয় خليل (ঘনিষ্ট বন্ধু) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন? কোন্ ইবরাহীম? যিনি সকল বাঞ্ছিত কঠিন কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আল্লাহ্ তা'আলার স্বীয় 'খলীল' নামে অভিহিত করিবার কারণ এই যে, প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তিনি বলিতেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُسْبِحُوْنَ - وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ -

"তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা কর। আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইয়া থাকে। আর তোমার রাত্রিতে এবং দ্বিপ্রহরে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা কর।"

আরেকটি রিওয়ায়েত হইতেছে এই ঃ হযরত আবূ উমামা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম, জা'ফর ইব্ন জুবায়র, ইসমাঈল, আতিয়্যা, হাসান ও আবূ কুরায়েবের সূত্রে আমার (ইব্ন জারীরের) নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা নবী করীম (সা) সাহাবীগণকে বলিলেন- وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِى وَفَّى এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) সম্বন্ধে বলিয়াছেন-'ইবরাহীম পূর্ণ করিয়াছিল।' তোমরা কি বলিতে পার ইবরাহীম (আ) কি পূর্ণ করিয়াছিলেন? সাহাবীগণ বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। নবী করীম (সা) বলিলেন-তিনি প্রতিদিন দিনের বেলায় চারি রাকাত নামায আদায় করিতেন। উহাই তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন।'

উক্ত রিওয়ায়েতটি আদমও স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উপরোক্ত রাবী জা'ফর ইব্ন জুবায়র হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং জা'ফর ইব্ন জুবায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ, ইউনুস ইব্ন মুহাম্মদ এবং আব্দ ইব্ন হামিদের সূত্রে ধারাবাহিকভাবে অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম ইব্ন জারীর উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েতদ্বয় উল্লেখ করিবার পর উহাকে দুর্বল রিওয়ায়েত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-'উক্ত রিওয়ায়েতদ্বয়ের দুর্বলতাকে উল্লেখ না করিয়া উহাকে শুধু বর্ণনা করা জায়েয নহে। উহা কয়েক দিক দিয়া দুর্বল। উহার সনদদ্বয়ের প্রতিটি সনদেই একাধিক দুর্বল রাবী রহিয়াছে। উক্ত রিওয়ায়েতদ্বয়ের বক্তব্য বিষয়সমূহও এইরূপ যদ্দ্বরা প্রমাণিত হয় যে, উহা দুর্বল রিওয়ায়েত। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।'

অতঃপর ইমাম ইব্নে জারীর বলেন ঃ 'যদি কেহ বলে যে, মুজাহিদ, আবূ সালেহ ও রবী' ইব্ন আনাস আলোচ্য আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, উহা অন্যান্য তাফসীরকার কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর সহীহ, তবে তাহার কথা উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যে সকল বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় এবং উহাদের অনুরূপ আয়াতসমূহে সেই সকল বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যেমন ঃ

اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا "আমি নিশ্চয় তোমাকে মানুষের জন্যে ইমাম বানাইব।" কিংবা,

وَعَهِدْنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ -

"আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের প্রতি নির্দেশ দিয়াছিলাম, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের জন্যে, ই'তেকাফকারীদের জন্যে, রুকূ'কারীদের জন্যে এবং সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখিও।"

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ইমাম ইব্ন জারীরের উপরোক্ত দুইটি অভিমতের মধ্য হইতে প্রথম অভিমতটিই অধিকতর শক্তিশালী। এতদ্সম্পর্কিত তাঁহার প্রথম অভিমতটি এই যে, 'আলোচ্য আয়াতের উপরোল্লেখিত বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যার সব কয়টিই অথবা উহাদের যে কোন একটি সহীহ ও সঠিক হইতে পারে। তবে নির্দিষ্ট

কোন ব্যাখ্যাকে সহীহ ও সঠিক বলিয়া অভিহিত করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই।' এতদ্সম্পর্কিত তাঁহার দ্বিতীয় অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়াতের মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরকারগণ কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যাই অধিকতর সহীহ ও সঠিক।' বস্তুত, আলোচ্য আয়াতের গ্রন্থি-অবস্থিতি (سِيَاق وسبق) দ্বারা বুঝা যায়, মুজাহিদ প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা ভিন্ন উহার অন্যরূপ সহীহ ও সঠিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَيَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে লোকদের জন্যে ইমাম বানাইবার পর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন জানাইলেন, তাঁহার পর তিনি যেন তাঁহার বংশধরদের মধ্যে হইতেও ইমাম নিযুক্ত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্ত আবেদন মঞ্জুর করিলেন। তবে তাঁহাকে ইহাও জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার বংশধরদের মধ্যে জালিম অর্থাৎ কাফির লোকও জন্মগ্রহণ করিবে। তাহারা তাঁহার উক্ত প্রতিশ্রুতির আওতায় পড়িবে না এবং তাহাদিগকে তিনি ইমামতের সম্মান দান করিবেন না। অতএব তাহারা লোকদের জন্যে অনুসরণযোগ্য হইবে না।' হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপরোক্ত দোয়া যে আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করিয়াছিলেন, 'সূরা 'আনকাবূত'-এর নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ (আর আমি তাহার (ইবরাহীমের) বংশধরদের মধ্যে নবূওত ও কিতাবকে ন্যস্ত করিয়াছি।)

উল্লেখ্য যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পর আল্লাহ্ তা'আলা যত নবী প্রেরণ করিয়াছেন এবং যত কিতাব নাযিল করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই এবং উহাদের সবগুলিকেই তাঁহার বংশধরদের মধ্যে ন্যস্ত করিয়াছেন।

মুজাহিদ হইতে খাসীফ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ قَالَ لاَيَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِيْنَ অর্থাৎ তোমার বংশে জালিমগণও পয়দা হইবে এবং আমি তাহাদিগকে ইমামতের সম্মানে ভূষিত করিব না। ইব্ন আবূ নাজীহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলিয়াছেন—ঐ আয়াত অর্থাৎ আমি কোন জালিমকে লোকদের জন্যে ইমাম বানাইব না।' মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মানসূর এবং সুফিয়ানও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মানসূর, শারীক, মালেক ইব্ন ইসমাঈল, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন ঃ ' ঐ আয়াত অর্থাৎ বংশধরদের মধ্য হইতে যাহারা নেককার ও যোগ্য হইবে, আমি তাহাদিগকে লোকদের জন্যে ইমাম বানাইব। কিন্তু যাহারা জালিম হইবে তাহাদের নিকট আমার এই প্রতিশ্রুতি পৌঁছিবে না।' মুজাহিদ বলেন—এইস্থলে কোন নির্দিষ্ট নিআমতের প্রতিশ্রুতি উল্লেখিত হয় নাই। উহা যে কোনরূপ নিআমতেরই প্রতিশ্রুতি হইতে পারে।'

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ 'ঐ আয়াত অর্থাৎ কোন মুশরিক ব্যক্তি ইমাম হইতে পারিবে না।' ইব্ন জুরায়জ বলেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আতা বলিয়াছেন—হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন জানাইলেন—'পরওয়াদেগার! আমার বংশধরদের মধ্য হইতেও কিছু লোককে ইমাম বানাইও।' আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার কোন জালিম বংশধরকে ইমাম বানাইবেন না।' আতা বলেন— 'عهد অর্থাৎ বিষয়।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, সিমাক ইব্ন হারব, ইসমাঈল ফরিয়াবী, আমর ইব্ন ছাওর কায়সারী ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলিলেন–নিশ্চয় আমি তোমাকে লোকদের জন্যে ইমাম বানাইব। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন জানাইলেন–'আমার বংশধরদের মধ্য হইতে কিছু লোককেও ইমাম বানাইও।' আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার আবেদনকে নামঞ্জুর করিয়া বলিলেন–'আমার প্রতিশ্রুতি জালিমগণ পর্যন্ত পৌঁছিবে না।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এই সংবাদ দিলেন যে, তাঁহার বংশধরদের মধ্যে জালিম লোকও জন্মিবে। তাহারা আল্লাহ্র খলীলের বংশধর হইলেও যেহেতু তাহারা জালিম, তাই তাহারা ইমামত বা অনুরূপ কোন নি'আমাত লাভ করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে তাঁহার বংশে নেককার যোগ্য লোকও জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহাদের বিষয়ে তাঁহার দোয়া কবূল হইল। আল্লাহ্ তাহাদিগকে মানব জাতির ইমাম বানাইবেন।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন–لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ 'জালিমদের বিষয়ে আমার পক্ষ হইতে তোমার প্রতি এইরূপ কোন নির্দেশ নাই যাহা তোমাকে পালন করিতে হইবে।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, মুসলিম আল আ'ওয়ার, ইসরাঈল, আব্দুর রহমান ইব্ন আব্দুল্লাহ, ইসহাক ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ জালিমদের জন্যে কোন প্রতিশ্রুতি নাই। আর যদি তুমি তাহাদিগকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকো, তবে উহা ভঙ্গ করো।' মুজাহিদ, আতা এবং মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত রহিয়াছে।

আন্‌তারা হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র হারূন ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আন্‌তারা বলেন ঃ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ জালিমের বিষয়ে আমার কোন প্রতিশ্রুতি নাই। কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদাহ বলেন–لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ জালিমের জন্যে আখিরাতের নিআমতের বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি নাই। জালিম আখিরাতে আল্লাহ্র কোন নি'আমাত পাইবে না। তবে দুনিয়াতে সেও আল্লাহ্র নি'আমাত ভোগ করিতে পারিবে। এই কারণেই দুনিয়াতে সে নিরাপদ থাকে, আহার পায় এবং জীবিত থাকে।' ইবরাহীম নাখঈ, আতা, হাসান এবং ইকরামাও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

রবী' ইব্ন আনাস বলেন– لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ জালিমদের জন্যে আল্লাহ্র দীন সম্পর্কিত কোন প্রতিশ্রুতি নাই। তাহারা আল্লাহ্র দীন লাভ করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰى اِسْحٰقَ ـ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ

'আর আমি তাহার (ইবরাহীমের) প্রতি এবং ইসহাকের প্রতি বরকত নাযিল করিয়াছি। তাহাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে নেককার এবং প্রকাশ্য আত্মপীড়ক উভয় শ্রেণীর লোকই রহিয়াছে।'

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সকল বংশধরই হক ও সত্যের অনুসারী নহে। আবুল আলীয়া, আতা এবং মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

যিহাক হইতে জুওয়াইবির বর্ণনা করিয়াছেন যে, لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ আমার কোন শত্রু আমার ইবাদত করিবে না এবং আমার স্নেহভাজন প্রিয় বান্দাই আমার ইবাদত করিবে।

হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আব্দুর রহমান্ সালমী, সাঈদ ইব্‌ন উবায়দাহ, আ'মাশ, ওয়াকী', আহমদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ দামেগানী, আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হামেদ ও হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ

لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ একমাত্র সৎকার্য বা সৎ আদেশকে অনুসরণ করিতে হইবে। অসৎ কার্য বা অসৎ আদেশকে অনুসরণ করা যাইবে না।

সুদ্দী বলেন– لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ জালিমগণের নিকট নবূওত সম্পর্কীয় আমার কোন প্রতিশ্রুতি পৌঁছিবে না, তাহারা নবী হইতে পারিবে না।

ইমাম ইব্‌ন জারীর এবং ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম পূর্বসূরী তাফসীকারগণ কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য আয়াতাংশের যে সকল ব্যাখ্যা তাঁহাদের গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, উপরে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা একদিকে প্রত্যক্ষভাবে বলিতেছেন যে, জালিমদের নিকট ইমামত সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পৌঁছিবে না এবং তাহারা ইমামতের ন্যায় মহা নি'আমাত লাভ করিতে পারিবে না। অন্যদিকে তিনি পরোক্ষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে জানাইয়া দিতেছেন যে, তাঁহার বংশধরদের মধ্যে জালিম লোকও জন্ম নিবে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরকারগণও অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন খুআয়য মিনদাদ মালেকী বলেন–জালিম ব্যক্তি খলীফা, শাসনকর্তা, মুফতী, সাক্ষী এবং রাবী–ইহাদের কোনটিই হইবার যোগ্য নহে।

বায়তুল্লাহ্ শরীফের মর্যাদা

(١٢٥) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ط وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى ط

১২৫. আর যখন আমি কা'বা ঘরকে মানুষের জন্য পুণ্যতীর্থ ও নিরাপদাগার বানাইয়াছি; অনন্তর মাকামে ইবরাহীমকে তোমরা সালাতের স্থান বানাও।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِمَ مُصَلًّى

অর্থাৎ লোকেরা এখানে বারবার আসা-যাওয়া করিবে। তাহারা একবার এখানে আসিবে এবং এখান হইতে ফিরিয়া যাইবে। অতঃপর আবার তাহারা এখানে আসিবে।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ 'লোকজন এখানে সমবেত হইবে।' উপরোক্ত রিওয়ায়েত দুইটি ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, মুসলিম, ইসরাঈল, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন রজা, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ লোকেরা এখানে সমবেত হইবে। অতঃপর তাহারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন–আবুল আলীয়া, এক রিওয়ায়েত অনুসারে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আতা, মুজাহিদ, হাসান, আতিয়্যা, রবী' ইব্ন আনাস এবং যিহাক হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

উবাদাহ ইব্ন আবূ লুবাবা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আমর (আওযায়ী), ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম, আব্দুল করীম ইব্ন আবূ উমায়র ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় উবাদা ইব্ন আবূ লুবাবা বলেন ঃ কেহ এখানে একবার আসিয়া মনে করিবে না যে, তাহার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং এখানে আবার আসিবার প্রয়োজন নাই। বরং লোকেরা এখানে বারবার আসিবে এবং বারবার উপকৃত হইবে।

ইব্ন যায়দ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন যায়দ বলেন ঃ 'পৃথিবীর সকল অঞ্চল হইতে লোকেরা এখানে সমবেত হইবে।'

ইমাম কুরতুবী জনৈক কবির দুইটি চরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহাতে কা'বা শরীফের مَثَابَةً لِّلنَّاس (লোকদের জন্য মিলন-স্থান) হইবার তাৎপর্যটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। কবি বলেন ঃ

جعل البيت مثابا لهم

ليس منه الدهر يقضون الوطر

"আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা ঘরকে লোকদের জন্য মিলন-ভূমি বানাইয়াছেন। তাহারা যুগ যুগ ধরিয়া উহার নিকট আসিবার পরও উহার প্রয়োজন ফুরাইয়া যাইবে না।"

ইকরামা, কাতাদাহ, আতা খোরাসানী এবং এক রিওয়ায়েত অনুসারে সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ مَثَابَةً لِّلنَّاس অর্থাৎ লোকদের সমবেত ও একত্রিত হইবার স্থান।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وامنا অর্থাৎ 'লোকদের জন্য শান্তি নিকেতন।' আবুল আলীয়া হইতে

ধারাবাহিকভাবে রবী' ইব্ন আনাস ও আবূ জাফর রাযী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল আলীয়া বলেন ঃ وامنا অর্থাৎ শত্রু হইতে নিরাপত্তা লাভ করিবার স্থান। এই স্থানে কোনরূপ অস্ত্র আনয়ন করা নিষিদ্ধ।' আবুল আলীয়া আরও বলেন-'জাহেলী যুগে দূর-দুরান্ত হইতে লোকেরা কা'বা ঘরের দিকে ছুটিয়া আসিত। এখানে তাহারা নিরাপদ থাকিত। এমনকি কেহ কাহাকে গালিও দিত না।' মুজাহিদ, আতা, সুদ্দী, কাতাদাহ এবং রবী' ইব্ন আনাস হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তাহারা বলেন- وامنا অর্থাৎ যে ব্যক্তি কা'বা ঘরে প্রবেশ করে, সে নিরাপত্তা লাভ করে।'

উপরে আলোচ্য আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের তাৎপর্য এই যে, উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা শরীফের প্রাকৃতিক ও শরীআত কর্তৃক প্রদত্ত সম্মান এবং মর্যাদার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। কা'বা শরীফের সহিত মানুষের আত্মার নিবিড় সংযোগ রহিয়াছে। লোকেরা যুগ যুগ ধরিয়া দূর-দূরান্ত হইতে প্রতি বৎসর এখানে আসিয়া একত্রিত হইতেছে এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাইতেছে। কা'বা শরীফের নিকট লোকদের এই প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় নাই-যাইবার নহে। উহার নিকট তাহাদের প্রয়োজন চিরকাল থাকিবে। কা'বা শরীফের এইরূপ সম্মান ও ফযীলত কেন? উহা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার ফল। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কা'বা শরীফকে এইরূপ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিবার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সেই দোয়া কবূল করিয়াছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন পেশ করিয়াছিলেন ঃ

فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ وَاَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ -

(হে আমাদের পরওয়ারদিগার!) অনন্তর, তুমি কিছুসংখ্যক লোকের অন্তরকে তাহাদের (মক্কাবাসীদের) দিকে লইয়া আসো। আর তুমি তাহাদিগকে ফলসমূহ হইতে রিযিক দান কর। আশা করা যায়, তাহারা শোকর আদায় করিবে।

হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরও আবেদন জানাইয়াছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (প্রভু হে! আর তুমি আমার দোআ কবূল কর।)

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া কবূল করিয়াছিলেন। তাই যুগ-যুগ ধরিয়া মানুষ দূর-দূরান্ত হইতে কা'বার নিকট আসিতেছে এবং আসিতে থাকিবে। কা'বা শরীফের আরেকটি সম্মান ও ফযীলত এই যে, উহা মানুষকে নিরাপত্তা দান করে। উহাতে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে, ইতিপূর্বে যে অপরাধই করিয়া থাকুক না কেন, সে নিরাপদ থাকে।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন-'জাহেলী যুগেও কেহ কা'বা ঘর বা উহার পার্শ্বে স্বীয় পিতা বা ভ্রাতার হত্যাকারীকে দেখিতে পাইয়াও তাহাকে কিছু বলিত না।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ অর্থাৎ আল্লাহ্ সম্মানিত ঘর কা'বাকে লোকদের জন্যে নিরাপদ স্থান বানাইয়াছেন। যাহারা উহাতে অবস্থান করে, আল্লাহ্ উহার সম্মানের কারণে তাহাদিগকে বিপদমুক্ত রাখেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন-মানুষ যদি এই ঘরে আসিয়া হজ্জ না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা যমীনের জন্যে

আসমানের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিতেন। (অর্থাৎ যমীনের বাসিন্দাদের প্রতি রহমতের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিতেন।)

কা'বা ঘর উপরোক্ত সম্মান ও ফযীলতের অধিকারী হইয়াছে শুধু উহার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্মান ও মর্যাদার কারণে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَاَّ تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا (আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন আমি ইবরাহীমকে এই নির্দেশ দিয়াছিলাম যে, তুমি কোন কিছুকে আমার সহিত শরীক ঠাওরাইও না, কা'বা ঘরের অঞ্চলকে তাহার বসবাসের স্থান বানাইয়াছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ - فِيْهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرَاهِيْمَ - وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا -

(মানুষের ইবাদতের জন্যে সর্বপ্রথম নির্মিত ঘর হইতেছে মক্কায় অবস্থিত ঘর। উহা বরকতময় ও সমগ্র জগদ্বাসীর জন্যে পথ নির্দেশক। উহাতে অনেক স্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। মাকামে ইবরাহীম এইরূপ একটি নিদর্শন। যে ব্যক্তি উহাতে (উক্ত ঘরে) প্রবেশ করিবে, সে নিরাপত্তা লাভ করিবে।)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা 'মাকামে ইবরাহীম' এ নামায আদায় করিবার জন্যে মু'মিনদিগকে নির্দেশ দিতেছেন। বলিতেছেন ঃ

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا - وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى

(আর তোমরা মাকামে ইব্রাহীমের যে কোন অংশকে নামায আদায় করিবার স্থান বানাইও।)

মাকামে ইবরাহীম (مقام ابراهيم) কোন্ স্থান? এই বিষয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দ, আবূ খল্ফ (আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ঈসা), আমর ইব্ন শাব্বা নুমায়রী ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'মাকামে ইবরাহীম হইতেছে সমগ্র হারাম শরীফ এলাকা।' মুজাহিদ এবং আতা হইতেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জুরায়জ হইতে ধারাবাহিকভাবে হাজ্জাজ, হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাবাহ্ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা আমি আতার নিকট وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى এই আয়াতাংশে উল্লেখিত 'মাকামে ইবরাহীম' কোন্ স্থান তাহা জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন—আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى এই আয়াতাংশে উল্লেখিত মাকামে ইবরাহীম হইতেছে মসজিদের (অর্থাৎ মাসজিদুল হারামের) অন্তর্গত এই মাকামে ইবরাহীম। তবে অন্যত্র উল্লেখিত 'মাকামে ইবরাহীম সম্বন্ধে অনেকে মনে করেন যে, উহা হইতেছে হজ্জের সমুদয় কার্য। রাবী ইব্ন জুরায়জ বলেন—অতঃপর আতা আমার নিকট হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কথার এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিলেন ঃ 'হজ্জের কার্যসমূহ (মাকামে ইবরাহীম) হইতেছে এই ঃ আরাফাতের

ময়দানে অবস্থান করা, আরাফাতের ময়দানে দুই রাকাআত নামায আদায় করা, কা'বা ঘর তওয়াফ করা, মিনায় কুরবানী করা, কংকর নিক্ষেপ করা এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানো।' আমি (ইব্ন জুরায়জ) তাহার (আতার) নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম-হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) নিজেই কি উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন? তিনি বলিলেন-'না' তিনি নিজেই উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন নাই; তবে তিনি বলিয়াছেন مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ اَلْحَجُّ كُلُّهُ (হজ্জের সকল কার্যই হইতেছে মাকামে ইবরাহীম)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-উহা কি আপনি স্বয়ং তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন-হ্যাঁ; আমি উহা স্বয়ং তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছি।'

সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন মুসলিম ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ (কা'বা ঘরের পার্শ্বে সংরক্ষিত) কালো পাথরটিই হইতেছে মাকামে ইবরাহীম। আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে রহমত বানাইয়াছেন। হযরত ইসমাঈল (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হাতে পাথর উঠাইয়া দিতেন আর হযরত ইবরাহীম (আ) উহার (কালো পাথরটির) উপর দাঁড়াইয়া কা'বা ঘরের দেওয়ালে গাঁথিতেন। সাঈদ ইব্ন জুবায়র আরও বলেন-কেহ কেহ বলেন, উক্ত পাথরের উপর বসিয়া হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় মস্তক ধৌত করিতেন। কিন্তু, উক্ত ধারণা সঠিক নহে। তিনি উহার উপর বসিয়া স্বীয় মস্তক ধৌত করিলে নিশ্চয় উহার বিভিন্ন দিকে তাঁহার পায়ের দাগ পড়িত।

সুদ্দী বলেন ঃ কালো পাথরটিই হইতেছে মাকামে ইবরাহীম। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর স্ত্রী হযরত ইবরাহীম (আ)-কে উহার উপর বসাইয়া তাঁহার মাথা ধোয়াইয়া দিতেন। ইমাম কুরতুবী সুদ্দীর উপরোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া উহাকে দুর্বল উক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি সুদ্দীর অভিমত ভিন্ন অন্য অভিমতকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে হাসান বসরী, কাতাদাহ এবং রবী' ইব্ন আনাস হইতে সুদ্দীর অভিমতের অনুরূপ অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ, তৎপুত্র জা'ফর, ইব্ন জুরায়জ, আবদুল ওয়াহাব ইব্ন আতা, হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাবাহ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) নবী করীম (সা)-এর হজ্জের বর্ণনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন-নবী করীম (সা)-এর কা'বা ঘর তাওয়াফ করিবার কালে হযরত উমর (রা) তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, ইহাই কি আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মাকাম? নবী করীম (সা) বলিলেন-হ্যাঁ; ইহাই আমাদের পিতার মাকাম। হযরত উমর (রা) বলিলেন-আমরা কি উহাকে নামাযের স্থান বানাইব না? ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى -

হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মায়সারাহ, আবূ ইসহাক, যাকারিয়া, আবূ উসামাহ ও উসমান ইব্ন আবূ শাবাহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে বলিলাম-হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহাই কি আমাদের প্রভুর খলীলের

মাকাম? তিনি বলিলেন–হ্যাঁ। হযরত উমর (রা) বলিলেন–আমরা কি উহাকে নামাযের স্থান বানাইব না? ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى

হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্‌ন মায়মূন, আবূ ইসহাক, যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যায়দাহ, মাসরূক ইব্‌ন মারযাবান, গায়লান ইব্‌ন আবদুস সামাদ, দালাজ ইব্‌ন আহমদ ও ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমর ইব্‌ন মায়মুন বলেন ঃ হযরত উমর (রা) মাকামে ইব্রাহীমের নিকট দিয়া যাইবার কালে নবী করীম (সা)-কে বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি আমাদের প্রভুর খলীলের 'মাকাম'-এ থামিব না? নবী করীম (সা) বলিলেন–হ্যাঁ। হযরত উমর (রা) বলিলেন–আমরা কি উহাকে নামাযের স্থান বানাইব না? তাঁহার উক্ত প্রশ্নের অল্পক্ষণ পরই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى

হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ, তৎপুত্র জা'ফর, মালিক ইব্‌ন আনাস, ওয়ালীদ, হিশাম ইব্‌ন খালিদ, জুনায়দ, আলী ইব্‌ন হুসায়ন, আলী ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ক্বাযবীনী ও ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সা) যখন 'মাকামে ইবরাহীম'-এর নিকট থামিলেন, তখন হযরত উমর (রা) তাঁহাকে বলিলেন–হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহা কি সেই মাকামে ইবরাহীম যাহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন ঃ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى

নবী করীম (সা) বলিলেন–হ্যাঁ। উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী ওয়ালীদ বলেন, 'আমি আমার উস্তাদ মালিককে জিজ্ঞাসা করিলাম–উক্ত রিওয়ায়েতে দেখা যাইতেছে যে, মাকামে ইবরাহীম সম্বন্ধে নবী করীম (সা)-এর নিকট হযরত উমর (রা)-এর উপরোক্ত প্রশ্ন করিবার পূর্বেই وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى এই আয়াতাংশ নাযিল হইয়াছিল। আপনার শায়খ কি উহা ঐরূপেই আপনার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন? আমার উস্তাদ বলিলেন–হ্যাঁ। তিনি উহাকে ঐরূপেই আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েত সুস্পষ্টত হযরত উমর (রা)-এর প্রশ্নের পূর্বে আলোচ্য আয়াতাংশের নাযিল হইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহা মাত্র একটি মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম নাসাঈও উহা উপরোক্ত রাবী ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী তাফসীর অধ্যায়ে وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى সম্পর্কিত পর্বে। বলেন ঃ مثابة অর্থাৎ–'যে স্থানে লোকে বারংবার আগমন করে।' হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), হামীদ, ইয়াহিয়া ও মুসাদ্দাদের সূত্রে আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমি আমার প্রভুর তিনটি বিধান নাযিল হইবার পূর্বেই উহার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছি। অথবা বলা যায়, তিনটি বিষয়ে আমার অভিমত প্রকাশ করিবার পর আমার প্রভু উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আমার অভিমতের অনুরূপ বিধান নাযিল করিয়াছেন। প্রথম বিষয় ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে

আরয করিলাম–'হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আপনি 'মাকামে ইবরাহীম'-এর যে কোন অংশকে নামাযের স্থান বানাইতেন, তবে ভাল হইত।' ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন : وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى

দ্বিতীয় বিষয় : একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলাম–'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার গৃহে ভাল ও মন্দ উভয় শ্রেণীর লোকই আগমন করিয়া থাকে। যদি আপনি উম্মাহাতুল মুমিনীনকে পর্দা করিবার নির্দেশ দিতেন, তবে ভাল হইত।' ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করিলেন। তৃতীয় বিষয় : একদা আমি জানিতে পারিলাম যে, নবী করীম (সা) তাঁহার জনৈকা সহধর্মিণীকে তিরস্কার করিয়াছেন। ইহাতে আমি নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণীদের নিকট গিয়া বলিলাম–'হয় আপনারা নবী করীম (সা)-কে অসন্তুষ্ট করিবার মত কার্য হইতে বিরত থাকিবেন, না হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলের জন্যে আপনাদের পরিবর্তে আপনাদের অপেক্ষা অধিকতর উত্তম সহধর্মিণীর ব্যবস্থা করিবেন।' ইহাতে নবী করীম (সা)-এর জনৈকা সহধর্মিণী আমাকে বলিলেন–'হে উমর! নবী করীম (সা) নিজে কি স্বীয় সহধর্মিণীদিগকে উপদেশ দিতে পারেন না যে, তুমি আসিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতেছ?' এই ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَّاَبْكَارًا ـ

তিনি (আল্লাহর রাসূল) তোমাদিগকে তালাক দিলে তাহার পরওয়ারদেগার তোমাদের পরিবর্তে তাঁহাকে তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর উত্তম পত্নী দিবেন- যে সকল পত্নী হইবে অনুগতা, মু'মিনা, বিনয়ের সহিত নামায আদায়কারিণী, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, সিয়াম পালনকারিণী, বিধবা ও কুমারী।)

ইমাম বুখারী আবার উপরোক্ত রিওয়ায়েত হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আনাস (রা), হামীদ, ইয়াহিয়া ইব্ন আইউব ও ইব্ন আবূ মরিয়ামের সনদেও বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত সনদের সর্বশেষ রাবী ইব্ন আবূ মরিয়াম (সাঈদ ইব্ন হাকাম) ইমাম বুখারীর উস্তাদ হইলেও এবং উক্ত রিওয়ায়েত তিনি সরাসরি তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া বর্ণনা করিলেও সনদ বর্ণনায় তিনি 'ইব্ন আবূ মরিয়াম আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।' এইরূপ উপরোক্ত সনদ অবিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ইমাম বুখারী উহার বর্ণনার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন সনদের বর্ণনার বেলায় প্রযোজ্য পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। উহার কারণ এই যে, আলোচ্য সনদের অন্যতম রাবী ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ আইউব গাফেকীর মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রহিয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইমাম আহমদ তাঁহার (ইয়াহিয়ার) সম্বন্ধে বলিয়াছেন–তাহার স্মৃতি-শক্তি দুর্বল ছিল। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। ইমাম বুখারীর উপরোক্ত উস্তাদ ইব্ন আবূ মরিয়াম সম্বন্ধে এইস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইমাম বুখারী ভিন্ন 'সিহ্হা সিত্তার' অন্য কোন সংকলক তাহার নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে হাদীস বর্ণনা করেন নাই। তবে সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলক পরোক্ষভাবে (অপরের মাধ্যমে) তাঁহার নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আনাস (রা), হামীদ, হাশীম ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমি তিনটি বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিবার পর আমার প্রতিপালক উক্ত তিনটি বিষয়ে আমার অভিমতের অনুরূপ বিধান নাযিল করিয়াছেন। প্রথম বিষয় ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-কে বলিলাম–'হে আল্লাহ্‌র রসূল! যদি আপনি 'মাকামে ইবরাহীম'-এর যে কোন অংশকে নামাযের স্থান বানাইতেন, তবে ভালো হইত।' ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى

দ্বিতীয় বিষয় ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলাম–হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যদি স্বীয় সহধর্মিণীদিগকে পর্দা করিতে আদেশ দিতেন, তবে ভাল হইত। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করিলেন। তৃতীয় বিষয় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই নামক মুনাফিক সর্দারের মৃত্যুর পর নবী করীম (সা) তাহার নামাযে জানাযা আদায় করিবার জন্যে উপস্থিত হইলে আমি আরয করিলাম–হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এই মুনাফিক কাফিরের জন্যে নামাযে জানাযা আদায় করিবেন? নবী করীম (সা) বলিলেন–'হে খাত্তাব-পুত্র! আমাকে বাধা দিও না।' ইহার পর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَاتَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ (তাহাদের (মুনাফিকদের) মধ্য হইতে কেহ মরিলে তুমি কখনও তাহার জন্যে দোয়া করিও না এবং তাহার কবরের পার্শ্বেও দাঁড়াইও না (অর্থাৎ তাহার কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার জন্যে দোয়া করিও না)।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদও সহীহ। এইস্থলে কেহ বলিতে পারে, উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েতসমূহ পরস্পর বিরোধী। কারণ, উক্ত রিওয়ায়েতসমূহের একটিতে যে তিনটি বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যটিতে তাহা ভিন্ন অন্য তিনটি বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় উক্ত রিওয়ায়েতসমূহের সবগুলি সহীহ হইতে পারে না। বরং উহাদের এক প্রকারের রিওয়ায়েত সহীহ হইলে অন্য সকল প্রকারের রিওয়ায়েত গায়ের সহীহ বা অশুদ্ধ হইবে। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, উক্ত রিওয়ায়েতসমূহের মধ্য হইতে কোন্ প্রকারের রিওয়ায়েত সহীহ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহের সবগুলি রিওয়ায়েতই সহীহ। উক্ত রিওয়ায়েতসমূহে উল্লেখিত সবগুলি বিষয়েই আল্লাহ্ তা'আলা বিধান নাযিল করিবার পূর্বেই হযরত উমর (রা) উহার অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত সকল বক্তব্যের বিশুদ্ধতা সুপ্রমাণিত বিধায় সংখ্যার বিরোধ পরিত্যাজ্য। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞানের অধিকারী।[১]

হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ, তৎপুত্র জা'ফর ও ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) কাঁধ দোলাইয়া দৌড়াইয়া তিনবার এবং হাঁটিয়া চারিবার কা'বা ঘর তাওয়াফ করিলেন। তাওয়াফ শেষ করিয়া তিনি মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দাঁড়াইয়া দুই রাকআত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى

হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ, তৎপুত্র জা'ফর, হাতিম ইব্ন ইসমাঈল, ইউসুফ ইব্ন সালমান ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা)

১. বর্ণনাকারী যেহেতু বিভিন্ন এবং ঘটনাকালও ভিন্ন ভিন্ন তাই সংখ্যার বিভিন্নতা স্বাভাবিক। সকল ঘটনা মিলাইয়া বিষয়ের ভিত্তিতে মোট সংখ্যা নির্ণীত হইবে।

রুকনকে (কা'বা ঘরের ডান পার্শ্বের কোনা) স্পর্শ করিয়া কাঁধ দোলাইয়া দৌড়াইয়া তিনবার এবং হাঁটিয়া চারিবার কা'বা শরীফ তাওয়াফ করিলেন। অতঃপর তিনি মাকামে ইব্রাহীমের নিকট গিয়া এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى

তারপর মাকামে ইবরাহীমকে নিজের ও কা'বা শরীফের মাঝখানে রাখিয়া দুই রাকআত নামায আদায় করিলেন। উক্ত হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ মাত্র। পূর্ণ হাদীসটি ইমাম মুসলিম উপরোক্ত রাবী হাতিম ইব্‌ন ইসমাঈল হইতে উক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্‌ন দীনার প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) কা'বা শরীফ সাতবার তাওয়াফ করিয়া মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দুই রাকআত নামায আদায় করিয়াছিলেন।

উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক ব্যবহৃত পাথরটিই হইতেছে মাকামে ইবরাহীম। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কা'বা ঘরের দেওয়াল গাঁথিবার সময়ে উহা উচ্চ হইয়া গেলে হযরত ইসমাঈল (আ) উক্ত পাথরটি তাঁহার নিকট আনিয়া দিয়াছিলেন। তিনি উহার উপর দাঁড়াইয়া দেওয়াল গাঁথিতেন। একদিকের দেওয়াল গাঁথা শেষ হইবার পর তাহারা উহাকে পার্শ্ববর্তী দেওয়ালের জন্য স্থানান্তরিত করিতেন। এইরূপে হযরত ইবরাহীম (আ) উক্ত পাথরখানার উপর দাঁড়াইয়া কা'বা ঘরের সকল দেওয়াল গাঁথিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মিত হইবার ঘটনায় শীঘ্রই বিবৃত হইবে। বিস্তারিত ঘটনাটি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বুখারী শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে।

উপরোল্লেখিত পাথরখানার উপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পায়ের দাগ স্পষ্টরূপে দেখা যাইত। ইহা জাহেলী যুগের আরবদের নিকট একটি সুবিদিত বিষয় ছিল। আবূ তালিব তাহার বিখ্যাত লাম অন্ত কবিতায় বলেন ঃ

ومـوطـئـى ابـراهـيـم فـى الـصـخـر رطـبـة
عـلى قـدمـيـه حـافـيـا غـيـر نـاعـل

'আর এই প্রস্তর খণ্ডে ইবরাহীমের নগ্ন পদদ্বয়ের চিহ্ন স্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।'

প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণও উক্ত পাথরের হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পদচিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন শিহাব, ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ ও আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াহাব বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আমি স্বচক্ষে পাথরখানার উপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দুই পায়ের আঙ্গুলগুলি সহ পায়ের পাতার চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে মানুষের হাতের ঘষায় ঘষায় চিহ্নগুলি উঠিয়া গিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ, ইয়াযীদ ইব্‌ন যারীঈ, বিশর ইব্‌ন মুআয ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মাকামে ইবরাহীমের নিকট নামায আদায় করিতে আদেশ করিয়াছেন, উহাতে হাত বুলাইতে বলেন নাই। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ যেরূপে মনগড়া

বিধান বানাইয়া লইয়াছিল, এই উম্মত সেইরূপে মনগড়া বিধান বানাইয়া লইয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শী আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, মাকামে ইব্রাহীমের উপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পায়ের গোড়ালি ও আঙ্গুলের ছাপ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু, এই উম্মতের লোকেরা উহাতে হাত বুলাইয়া আসিতেছে। তাহারা উহাতে এত বেশী হাত বুলাইয়াছে যে, তাহাদের হাত বুলাইবার কারণে উক্ত ছাপ উহা হইতে মুছিয়া গিয়াছে।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি ঃ পূর্বকালে 'মাকামে ইবরাহীম' কা'বা শরীফের দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন ছিল। তখন উহা যে স্থানে ছিল, সে স্থানটি কা'বা শরীফের দরজার দিকে উহার ডানে হিজর নামক স্থানের নিকট অবস্থিত। উহা একটি স্বতন্ত্র স্থান। স্থানটি এখনও লোকদের নিকট নির্দিষ্ট ও পরিচিত। হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা ঘরের নির্মাণকার্য সম্পন্ন করিবার পর উহা কা'বা শরীফের দেওয়ালের কাছে উক্ত স্থানে রাখিয়া দিয়াছিলেন; অথবা দেয়ালে গাঁথিতে গাঁথিতে উক্ত স্থানে তাঁহার পৌছিবার পর কা'বা শরীফের নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং উহা সেখানেই রহিয়া গিয়াছিল। উক্ত স্থান পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পৌছিবার পর যেহেতু কা'বা শরীফের নির্মাণকার্য শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাই তাওয়াফ শেষ করিবার পর উক্ত স্থানে নামায আদায় করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করিয়াছেন। আল্লাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত উমর (রা) স্বীয় খিলাফতের যুগে হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক ব্যবহৃত উপরোক্ত পাথরখানাকে স্থানান্তরিত করেন। হযরত উমর (রা) ছিলেন সত্য পথপ্রাপ্ত খলীফাগণের অন্যতম। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'আমার ইন্তিকালের পর তোমরা দুই ব্যক্তিকে অনুসরণ করিও। তাহারা হইতেছে—আবূ বকর ও উমর।' হযরত উমর (রা)-এর অভিমতের অনুকূলে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত পাথরের কাছে নামায আদায় করিতে মু'মিনদিগকে আদেশ দিয়াছেন। উপরোল্লেখিত কারণেই দেখা যায়, সাহাবীগণ তাঁহার উপরোক্ত কার্যে বাধা দেন নাই।

আতা প্রমুখ ব্যক্তিগণ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন জুরায়জ ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন—'উহাকে অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম কর্তৃক ব্যবহৃত পাথরখানাকে সর্বপ্রথম স্থানান্তরিত করেন হযরত উমর (রা)। মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে হামীদ আ'রাজ, মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক আরও বর্ণনা করিয়াছেন—'হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক ব্যবহৃত পাথরখানা বর্তমান স্থানে আনয়ন করেন হযরত উমর (রা)।'

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, দুরাওয়ার্দী, আবূ ছাবিত, আবূ ইসমাঈল, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল সালমী, কাযী আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন কামিল, আবূ হুসাইন ইব্‌ন ফযল আল কাত্তান ও হাফিজ আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসাইন বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন—নবী করীম (সা)-এর যুগে এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর যুগে 'মাকামে ইবরাহীম' ঘরের সহিত সংলগ্ন ছিল। অতঃপর হযরত উমর (রা) স্বীয় খিলাফতের আমলে উহা স্থানান্তরিত করেন।' উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহের সনদ সহীহ।

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবূ উমর আদানী, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা)-এর যুগে মাকামে

ইবরাহীম বায়তুল্লাহ শরীফের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। হযরত উমর (রা) স্বীয় খিলাফতের আমল وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণী সত্ত্বেও উহা স্থানান্তরিত করেন। একদা পানির স্রোত উহাকে স্থানচ্যুত করিয়া দিলে হযরত উমর (রা) আবার সেইখানেই (যে স্থানে তিনি উহাকে রাখিয়াছিলেন) পুনঃস্থাপিত করেন। সুফিয়ান ইব্‌ন আলীয়া বলেন-হযরত উমর (রা) কর্তৃক স্থানান্তরিত হইবার পূর্বে মাকামে ইবরাহীম কি কা'বা ঘরের সহিত সংলগ্ন ছিল অথবা উহা হইতে পৃথক ছিল কিংবা পৃথক থাকিলে উভয়ের মধ্যকার দূরত্ব কতটুকু ছিল তাহা আমার জানা নাই।'

এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত রিওয়ায়েতের মূল রাবী সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না তাঁহার সমসাময়িক মক্কাবাসীদের ইমাম ছিলেন। সাহাবী ও তাবেঈগণের উপরোক্ত উক্তিসমূহ মাকামে ইবরাহীম সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহের বক্তব্যকে সমর্থন করিতেছে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাজির, শরীক, আদম (ইব্‌ন আবী আয়াস), মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহাব ইব্‌ন আবূ তামাম ইব্‌ন উমর (আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাকীম) ও হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলেন-'হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আমরা 'মাকামে ইবরাহীম'-এর পিছনে নামায আদায় করিতাম, তবে ভালো হইত।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى

মুজাহিদ বলেন-'মাকামে ইবরাহীম' তখন কা'বা ঘরের সহিত সংলগ্ন ছিল। নবী করীম (সা) উহা এখনকার স্থানে আনয়ন করিলেন। মুজাহিদ আরও বলেন-কখনও কখনও এইরূপ ঘটিত যে, হযরত উমর (রা) কোন বিষয়ে একটি অভিমত প্রকাশ করিতেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার অভিমতের অনুরূপ বিধানসহ আয়াত নাযিল করিতেন।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ বিচ্ছিন্ন। কারণ, হযরত উমর (রা)-এর সহিত মুজাহিদের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে নাই। এমতাবস্থায় মুজাহিদ উক্ত রিওয়ায়েত সরাসরি হযরত উমর (রা)-এর নিকট শুনেন নাই; বরং তিনি উহা অন্য কোন রাবীর নিকট শুনিয়াছেন। অথচ সনদে তিনি তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত রিওয়ায়েতটি ইতিপূর্বে উল্লেখিত মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে হামীদ আ'রাজ, মুআম্মার ও আবদুর রায্যাক কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতের বিরোধী। ইতিপূর্বে উল্লেখিত মুজাহিদ হইতে বর্ণিত রিওয়ায়েতে বিবৃত হইয়াছে যে, 'মাকামে ইবরাহীমকে বর্তমান স্থানে সর্বপ্রথম আনিয়াছিলেন হযরত উমর (রা)।' ইমাম আব্দুর রায্যাক কর্তৃক বর্ণিত উক্ত রিওয়ায়েতে ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়্যা কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত অপেক্ষা অধিকতর সহীহ। এতদ্ব্যতীত উহা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারাও সমর্থিত হয়। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

মক্কা শরীফের মর্যাদা

(١٢٥) وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ○

(١٢٦) وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ○

(١٢٧) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ○

(١٢٨) رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ○

১২৫. আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিলাম, 'আমার ঘর ই'তেকাফ, তাওয়াফ ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পাক পবিত্র করিয়া রাখ।

১২৬. আর যখন ইবরাহীম বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! ইহাকে নিরাপত্তাদায়ক শহর বানাও এবং যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী উহার সেই সব বাসিন্দাকে ফল ফসলের রিযিক দান কর।' তিনি বলিলেন, 'আর যে ব্যক্তি কুফরী করিবে তাহাকেও স্বল্পকালীন (জীবনের) সুবিধা দান করিয়া অবশেষে তাহাকে দোযখের আযাবে নিক্ষেপ করিব। আর উহা বড়ই খারাপ ঠিকানা।'

১২৭. এবং (স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত দাঁড় করাইল, তখন দোয়া করিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ইহা কবূল কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

১২৮. 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে তোমার ফরমাঁবরদার বানাও ও আমাদের সন্তান-সন্ততিকেও তোমার ফরমাঁবরদার বানাইও। আর আমাদিগকে হজ্জের রীতি-নীতি শিখাও ও আমাদিগকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি অশেষ তওবা কবূলকারী, অসীম মেহেরবান।'

তাফসীর ঃ হাসান বসরী বলেন ঃ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা ঘরকে অপবিত্র বস্তু ও আবর্জনা হইতে পবিত্র রাখিবার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-কে আদেশ দিয়াছিলেন।

ইব্‌ন জুরায়জ বলেন ঃ 'একদা আমি আতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَٰهِمَ وَإِسْمَٰعِيلَ এই আয়াতাংশের অন্তর্গত عهدنا ক্রিয়াটির অর্থ কি হইবে? তিনি বলিলেন-উহার অর্থ হইতেছে আমি আদেশ দিয়াছিলাম।

আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম বলেন ঃ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَٰهِمَ وَإِسْمَٰعِيلَ অর্থাৎ অতঃপর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়াছিলাম। এই স্থলে عهدنا ক্রিয়ার সহিত إلى অব্যয়টির ব্যবহৃত হওয়া এই কারণে শুদ্ধ হইয়াছে যে, عهدنا ক্রিয়াটির মধ্যে ওহী পাঠানোর অর্থও নিহিত রহিয়াছে। এমতাবস্থায় আয়াতাংশটির তাৎপর্য হইতেছে এই-'আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের প্রতি ওহী পাঠাইয়া তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিলাম।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ অর্থাৎ তোমরা আমার ঘরকে মূর্তি হইতে পবিত্র রাখিও।

মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন ঃ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ অর্থাৎ তোমরা আমার ঘরকে মূর্তি, পাপের কথা, মিথ্যা এবং পাপকার্য হইতে পবিত্র রাখিও।

ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন-উবায়দ ইব্‌ন উমায়র, আবুল আলীয়া, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুজাহিদ, আতা এবং কাতাদাহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ অর্থাৎ তোমরা আমার ঘরকে لا اله الا الله (আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই) এই কলেমা দ্বারা শিরক হইতে পবিত্র রাখিও।

للطائفين অর্থাৎ কা'বা ঘরের তাওয়াফকারীদের জন্যে। তাওয়াফের শরীআতী তাৎপর্য সুবিদিত। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন ঃ للطائفين অর্থাৎ যাহারা মক্কা ভিন্ন অন্য এলাকা হইতে আসিয়া কা'বা ঘরকে তাওয়াফ করিবে, তাহাদের জন্যে এবং العاكفين। অর্থাৎ মক্কার অধিবাসীদের জন্যে।

অনুরূপভাবে কাতাদাহ এবং রবী' ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ العاكفين। অর্থাৎ মক্কার অধিবাসীগণ।

আতা-হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল মালিক ইব্‌ন আবূ সুলায়মান ও ইয়াহিয়া কাত্তান বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আতা বলিলেন-العاكفين। অর্থাৎ যাহারা অন্য এলাকা হইতে আসিয়া এখানে বসবাস করে তাহারা। রাবী আব্দুল মালিক বলিলেন-আমরা তো কা'বার প্রতিবেশী। তদুত্তরে আতা বলেন-তোমরাই হইতেছ العاكفين।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, আবূ বকর হুযালী ও ওয়াকী' বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন কা'বা ঘরে বসিয়া থাকে ও সেখানে অবস্থান নিয়া ইবাদত করে, তখন তাহাকে العاكف। বলা যায়।

ছাবিত হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা, মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমায়রকে বলিলাম-'আমি আমীরকে বলিয়া লোকদিগকে মসজিদুল হারামের মধ্যে নিদ্রা যাওয়া হইতে বিরত রাখিব। কারণ, সেখানে তাহারা নিদ্রারত অবস্থায় স্বপ্নদোষ বা বায়ু

ত্যাগের কারণে উহা অপবিত্র হয়।' ইহাতে আব্দুল্লাহ্ বলিলেন–আপনি এইরূপ করিবেন না। কারণ, একদা ইহাদের সম্বন্ধে হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন–ইহারা হইতেছে العاكفون। (ই'তেকাফকারী)। উক্ত রিওয়ায়েত আবদ ইব্‌ন হামীদও উপরোক্ত রাবী হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা হইতে উক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা হইতে সুলাইমান ইব্‌ন হারবের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ রিওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইব্‌ন উমর (রা) অবিবাহিত অবস্থায় মসজিদে নববীতে নিদ্রা যাইতেন।

وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ অর্থাৎ নামায আদায়কারীদের জন্যে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, আবূ বকর হাযলী ও ওয়াকী' বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ অর্থাৎ নামায আদায়কারীগণ। আতা এবং কাতাদাহও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর এখানে فى يومه اربع فى النهار বক্তব্য সম্বলিত হাদীসদ্বয়কে দুর্বল সূত্রের বলিয়াছেন।[১]

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ

وَعَهِدْنَا اِلَى اِبْرٰهِمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য এই ঃ 'অনন্তর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করিলাম–তোমরা তাওয়াফকারীদের জন্যে আমার ঘরকে পবিত্র করো।' আল্লাহ্র ঘরকে পবিত্র করিবার তাৎপর্য হইতেছে উহাকে, মূর্তি, মূর্তিপূজা এবং শিরক হইতে পবিত্র করা। অতঃপর ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন–এইস্থলে কেহ প্রশ্ন করিতে পারে, তবে কি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কা'বা ঘর নির্মাণ করিবাব পূর্বে তথায় অপবিত্র কিছু বিদ্যমান ছিল? উক্ত প্রশ্নের দুইটি উত্তর হইতে পারে। প্রথম উত্তর এই যে, হযরত নূহ (আ)-এর যামানায় কা'বা ঘর মূর্তিপূজা হইত। আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত মূর্তি ও মূর্তিপূজা হইতে উহাকে পবিত্র করিবার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-কে আদেশ দিয়াছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আ)-কে লোকদের জন্যে ইমাম বানাইয়াছিলেন, তাই তাঁহার ইন্তিকালের পর পরবর্তীকালের লোকেরা তাঁহার অনুসরণে উহাকে মূর্তি, মূর্তিপূজা ও শিরক হইতে পবিত্র করিবে।'

আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ আলোচ্য আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ইমাম ইব্‌ন জারীর কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়।

আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ বলেন ঃ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ অর্থাৎ মুশরিকগণ আমার ঘরে যে সকল মূর্তি রাখিয়া উহাদিগকে পূজা করে, সেই সকল মূর্তি ও শিরক হইতে তোমরা উহাকে পবিত্র করো।'

---

১. মূল পুস্তকে এইস্থলে লিখিত রহিয়াছে ঃ فى يومه اربع فى النهار অবশ্য ইমাম ইব্‌ন জারীর উপরোক্ত হাদীসদ্বয়কে দুর্বল প্রমাণ করিয়াছেন। উহাদের প্রতিটি সনদেই একাধিক দুর্বল রাবী রহিয়াছে। উক্ত রাবীদ্বয়ের রিওয়ায়েত শুদ্ধ নহে। মূল পুস্তকের টীকায় উপরোক্ত কথাগুলির প্রথমাংশকে অর্থহীন এবং দ্বিতীয়াংশকে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। উহাতে আরও বলা হইয়াছে–আল-আযহারের কুতুবখানায় রক্ষিত তাফসীরে ইব্‌ন কাছীরের সংস্করণে উক্ত কথাগুলি লিখিত নাই।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-উপরোক্ত ব্যাখ্যায় এই কথা দাবী করা হইয়াছে যে, 'হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আগমনের পূর্বে কা'বা শরীফে মূর্তিপূজা ও শিরক চলিত'। উক্ত দাবীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে উহার সমর্থনে নবী করীম (সা) হইতে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত থাকা প্রয়োজন।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন-উপরোক্ত প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র তাঁহারই ইবাদতের উদ্দেশ্যে কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-কে আদেশ দিয়াছিলেন। ইহার ফলে কা'বা ঘরের নির্মাণের নিয়্যত ও উদ্দেশ্য শিরক মুক্ত তথা পবিত্র হইবে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ - وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ -

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয় ও সন্তুষ্টির উপর উহার (মসজিদের) ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, সে কি উত্তম, না যে ব্যক্তি বিধ্বস্তমুখ শূন্যগর্ভ উপকূলের প্রান্তে উহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে এবং অতঃপর উহা সহ দোযখের আগুনের মধ্যে পতিত হইয়াছে, সে উত্তম? আর আল্লাহ্ জালিম জাতিকে হিদায়েত করেন না।"

সুদ্দী আলোচ্য আয়াতাংশের যে তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ইমাম ইব্ন জারীর কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়। সুদ্দী বলেন ঃ

اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ অর্থাৎ 'তোমরা তাওয়াককারীদের জন্যে আমার ঘরকে নির্মিত কর।'

ইমাম ইব্ন জারীর কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় উত্তর অনুসারে আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হইতেছে এই ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-কে আদেশ দিলেন, তাহারা যেন একমাত্র আল্লাহ্র নামে এবং একমাত্র তাঁহার সন্তোষের উদ্দেশ্যে তাঁহার ঘরটি নির্মাণ করেন এবং মানুষ উহাতে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করিবে, তাওয়াফ করিবে, ই'তেকাফ করিবে এবং নামায আদায় করিবে। এই প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ -

"আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন আমি ইবরাহীমকে এই নির্দেশ দিয়া তাহার জন্যে কা'বা ঘরের এলাকাকে আবাসস্থলরূপে নির্ধারিত করিয়াছিলাম যে, তুমি আমার সহিত কোন কিছুকে শরীক ঠাওরাইও না আর আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের জন্যে, ইবাদতে দণ্ডায়মান লোকদের জন্যে এবং রুকূ ও সিজদাকারীগণের জন্যে পবিত্র রাখিও।"

কা'বা ঘর তাওয়াফ করা এবং উহার কাছে নামায আদায় করা, এই উভয় ইবাদতের কোন্টি অধিকতর সওয়াবের কাজ তদ্বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

ইমাম মালিক বলেন-'বহিরাগত ব্যক্তিদের জন্যে উহাকে তাওয়াফ করা অধিকতর সওয়াবের কাজ। অন্য ইমামগণ বলেন-'স্থানীয় এবং বহিরাগত উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্যেই

উহার কাছে নামায আদায় করা অধিকতর সওয়াবের কাজ।' উক্ত অভিমতদ্বয়ের প্রত্যেকটির দলীল ও যুক্তি ফিকাহর কিতাবসমূহে উল্লেখিত রহিয়াছে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের দাবীকে মিথ্যা এবং তাহাদের কার্যকে জঘন্য পাপ বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। লোকে কা'বা ঘরে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করিবে–এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দিয়া উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, মুশরিকগণ উহার মধ্যে নানারূপ দেব-দেবীর মূর্তি রাখিয়া উহাদের পূজা করিত। অধিকন্তু, তাহারা তাওহীদ-পন্থী মু'মিনদিগকে উহাতে ইবাদত করিতে বাধা দিত। এইরূপে তাহারা কা'বা ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যাহত করিয়া দিয়াছিল। তাহাদের দাবী ছিল, ইবরাহীম মুশরিক ও পৌত্তলিক ছিলেন। তাহাদের এই দাবী ছিল মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন তাওহীদপন্থী মহাসাধক। পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ্র দীন কায়েম করিবার জন্যে তিনি স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মানুষ কা'বা ঘরে একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র ইবাদত করিবে, এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁহার পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে দিয়া উহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার জন্যে তাঁহাদিগকে আদেশ দিবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে এইরূপ আদেশও দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন উহা তাওহীদপন্থী ইবাদতকারীদের জন্যে পবিত্র রাখে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা ঘর নির্মাণের উপরোক্ত ইতিহাস ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া মুশরিকদের দাবীকে মিথ্যা এবং তাহাদের কার্যকে জঘন্য পাপ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, তাওয়াফ করা, ই'তেকাফ করা এবং নামায আদায় করা–কা'বা ঘরের সহিত এই তিন প্রকারের ইবাদত সম্পর্কিত। এই সূরার নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যাহত করিবার শাস্তি বর্ণনা করার সঙ্গে উহা নির্মাণের অন্যতম উদ্দেশ্য ই'তেকাফকে উল্লেখ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে, মুশরিকগণই কা'বা ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যাহত করিয়াছিল। সূরা হজ্জে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ـ وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

"যাহারা কুফ্র করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্র পথ ও সেই মসজিদুল হারাম হইতে দূরে রাখিতেছে, যে মসজিদুল হারামকে আমি অবস্থানকারী ও বহিরাগত উভয়ের সমভাবে ইবাদতের জন্যে নির্মাণ করিয়াছি। আর যদি কেহ উহাতে কুফ্র ও জুলুম করিতে চাহে, তবে আমি তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব।"

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু কা'বা ঘরের সহিত সম্পর্কিত তিন প্রকারের ইবাদতের মধ্য হইতে ই'তেকাফকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাই পরবর্তী আয়াতে তিনি উক্ত তিন প্রকারের ইবাদতের মধ্য হইতে তাওয়াফ ও নামাযকে উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لاَّ تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ـ

"আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন আমি ইবরাহীমের জন্যে কা'বা ঘরের অঞ্চলকে আবাসস্থল রূপে নির্ধারিত করিয়াছিলাম। তাহাকে আদেশ দিয়াছিলাম, আমার সহিত কোন কিছুকে শরীক ঠাওরাইও না আর আমার ঘর তাওয়াফকারীদের জন্যে, দণ্ডায়মান অবস্থায় ইবাদতকারীদের জন্যে এবং রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখিও।"

আলোচ্য আয়াতে তিনি নামাযে প্রধান তিনটি অঙ্গের মধ্য হইতে মাত্র রুকূ' ও সিজদাকে উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে (আলোচ্য আয়াতে) তিনি কিয়ামকে উল্লেখ করেন নাই। এইস্থলে কিয়ামকে উল্লেখ না করিবার কারণ এই যে, সূরা সিজদাতে তাহা উল্লেখিত হওয়ায় উহার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। অধিকন্তু, কিয়াম ব্যতীত যে রুকূ' সিজদা হইতে পারে না, তাহা কাহারও অবিদিত নহে।

তাই মূলত আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা ঘরের সহিত সম্পর্কিত তিন প্রকারের ইবাদত–তাওয়াফ, ই'তেকাফ এবং নামায–সবগুলিই উল্লেখ করিয়াছেন।

যে সকল ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান কা'বা ঘরে হজ্জ ও উমরাহ্ পালন করে না, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কার্যকে নিন্দা করিয়াছেন। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান জাতিদ্বয় স্বীকার করিয়া থাকে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) একজন উচ্চ মর্যাদাশীল নবী ছিলেন। আর তাহারা ভালভাবেই জানে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বারা কা'বা ঘর নির্মাণ করাইয়াছিলেন যে, পৃথিবীর সকল লোক একমাত্র আল্লাহ্র সন্তোষের উদ্দেশ্যে উহা তাওয়াফ করিবে, উহাতে ই'তেকাফ করিবে এবং নামায আদায় করিবে। অথচ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ কা'বা ঘরে হজ্জ ও উমরাহ পালন তথা উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা ঘরের নির্মাণের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করিয়া ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান জাতিদ্বয়ের কার্যকে নিন্দা করিয়াছেন। এইরূপে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিক, ইয়াহুদী ও নাসারা সকলের কার্যকে নিন্দা করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা (আ) সহ একাধিক নবী কা'বা ঘরে আসিয়া হজ্জ সম্পাদন করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হইতেছে–'আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের নিকট ওহী পাঠাইয়া তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিলাম, তোমরা একমাত্র তাওহীদপন্থী মু'মিনদের ইবাদতগাহ হিসাবে আমার ঘরটি নির্মাণ কর। তোমরা উহা তওয়াফকারীদের জন্যে, ইতেকাফকারীদের জন্যে এবং রুকূ' ও সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখিও। আমার ঘর তোমরা শিরক ও অপবিত্রতা হইতে মুক্ত রাখিও।

আলোচ্য আয়াত, নিম্নোক্ত আয়াত এবং একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদকে ময়লা ও আবর্জনা ইত্যাদি হইতে পবিত্র রাখা জরুরী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ـ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ

যেই সকল ঘরকে সম্মান দিতে এবং যেইগুলির মধ্যে তাঁহার নাম যিকির করিতে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন, সেইগুলির মধ্যে তাহারাই সকাল সন্ধ্যায় তাঁহার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া থাকে।

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ انما بنيت المساجد لما بنيت له। মসজিদসমূহ সেই উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হইয়া থাকে; যে উদ্দেশ্যে উহা নির্মাণ করা হইয়াছিল।' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মহান ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদসমূহ নির্মিত হইয়া থাকে।

মসজিদ, উহার ফযীলত এবং এতদসংশ্লিষ্ট কর্তব্য সম্বন্ধে আমি (ইব্ন কাছীর) স্বতন্ত্র একখানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিত।

কা'বা ঘর নির্মাণের ইতিহাস

সর্বপ্রথম কা'বা শরীফ নির্মাণ সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। কথিত আছে, পৃথিবীতে হযরত আদম (আ)-এর আগমনের পূর্বে ফেরেশতাগণ কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন। আবূ জা'ফর বাকের মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম কুরতুবীও হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য উক্ত রিওয়ায়েতটি অন্য কোন হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। ইহাও কথিত হইয়াছে যে, 'হযরত আদম (আ) সর্বপ্রথম কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন।' আতা, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব প্রমুখ ব্যক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত আদম (আ) পাঁচটি পর্বত হইতে পাথর আনিয়া কা'বা নির্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত পাঁচটি পর্বত হইতেছে-হেরা, সিনাই, যায়তা (زيتا), লেবানন এবং জূদী। অবশ্য উক্ত রিওয়ায়েতও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নহে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), কা'ব আহবার, কাতাদাহ এবং ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ সর্বপ্রথম কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন হযরত শীছ (আ)।'

উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহ সম্ভবত ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে। উল্লেখ্য, যতক্ষণ না কোন বিষয় সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়, ততক্ষণ এইরূপ রিওয়ায়েতকে সত্য বা মিথ্যা কোনটিই বলা যায় না। অবশ্য এইরূপ রিওয়ায়েতের সমর্থনে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে উহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।

আল্লাহ্ তা'আলার কালাম ঃ

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ـ

অর্থাৎ সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন ইবরাহীম বলিয়াছিল, 'প্রভু হে! তুমি ইহাকে নিরাপদ জনপদ বানাইও আর উহার অধিবাসীদিগের মধ্য হইতে যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনিবে, তাহাদিগকে ফলসমূহ হইতে রিযিক দিও।'

এই প্রসঙ্গে হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুবায়র, সুফিয়ান, আব্দুর রহমান ইব্ন মাহদী ইব্ন বিশার ও ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র ঘর (কা'বা)-কে সম্মানিত ও নিরাপদ ঘোষণা করিয়াছিলেন আর আমি মদীনা শহর অর্থাৎ উহার প্রস্তরময় দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে সম্মানিত ঘোষণা করিতেছি। উহাতে শিকার করা এবং উহার কাঁটা-বৃক্ষ কাটা যাইবে না।'

উক্ত হাদীস ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত রাবী মুহাম্মদ ইব্ন বিশার হইতে উপরোক্ত অভিন্ন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিমও উহা উপরোক্ত রাবী সুফিয়ান ছাওরী হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং সুফিয়ান ছাওরী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আহমাদ যুবায়রী, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা এবং আমর ইব্ন নাকেদের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে', আশআছ, আব্দুর রহীম রাযী, আবূ কুরায়ব ও ইমাম ইব্ন জারীর এবং উক্ত আশআছ হইতে ইব্ন ইদরীস, আবূ কুরায়ব, আবূ সায়েব ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'হযরত ইবরাহীম (আ) হইতেছেন আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার খলীল (ঘনিষ্ট বন্ধু)। আর আমি হইলাম আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। হযরত ইবরাহীম (আ) সম্মানিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন মক্কা নগরীকে আর আমি সম্মানিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছি মদীনা শহরকে। উহার প্রস্তরময় দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানের কাঁটা-গাছ কাটা যাইবে না, উহার অভ্যন্তরে প্রাণী শিকার করা যাইবে না এবং যুদ্ধের উদ্দেশ্যে উহার মধ্যে অস্ত্র বহন করা যাইবে না। এমনকি উটের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে উহার কোন গাছপালা কাটা যাইবে না।'

উক্ত হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে উপরোক্ত সনদে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত কোন হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত নাই। তবে উক্ত হাদীসের মূল বক্তব্য-বিষয় হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে উপরোক্ত মাধ্যম ভিন্ন অন্য মাধ্যমে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন-লোকেরা গাছের প্রথম ফলটি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে লইয়া আসিত। নবী করীম (সা) উহা হাতে লইয়া বলিতেন-'হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের ফলের মধ্যে বরকত দাও, তুমি আমাদের শহরে বরকত নাযিল কর, তুমি আমাদের সা' (الصاع) (চারি সের মাপার পাত্র)-এর মধ্যে বরকত দাও এবং তুমি আমাদের মুদ্দ (المد) (পঞ্চাশ তোলা মাপার পাত্র)-এর মধ্যে বরকত দাও। হে আল্লাহ্! হযরত ইবরাহীম (আ) হইতেছেন তোমার বান্দা, তোমার খলীল ও তোমার নবী; আর আমিও তোমার বান্দা ও তোমার নবী। হযরত ইবরাহীম (আ) তোমার নিকট দোয়া করিয়াছিলেন মক্কা নগরীর জন্যে; আর আমি তোমার নিকট দোয়া করিতেছি মদীনার জন্যে। হযরত ইবরাহীম (আ) তোমার নিকট মক্কার জন্যে যতটুকু নি'আমতের দোয়া করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট মদীনার জন্যে ততটুকু নি'আমতের এবং তৎসহ উহার সমান নি'আমাতের (মক্কা শরীফের দ্বিগুণ নি'আমতের) দোয়া করিতেছি।' হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর নবী করীম (সা) কনিষ্ঠতম কিশোরকে ডাকিয়া তাহাকে (অন্য এক রিওয়ায়েত অনুসারে তাঁহার নিকট উপস্থিত শিশু-কিশোরদের কনিষ্ঠতম কিশোরকে) উহা প্রদান করিতেন। অন্য এক রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে-নবী করীম (সা) উহা হাতে লইয়া বলিতেন ঃ 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের শহরে, আমাদের ফলসমূহে, আমাদের 'মুদ্দ'-এ এবং আমাদের সা'-এ বরকতের পর বরকত নাযিল কর।'

হযরত রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমার ইব্ন উসমান, আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাদ, বিকর ইব্ন মুযার, কুরায়ব ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-হযরত ইবরাহীম (আ) সম্মানিত ঘোষণা

করিয়াছিলেন মক্কা নগরীকে আর আমি সম্মানিত ঘোষণা করিতেছি মদীনার প্রস্তরময় দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে (সমগ্র মদীনা শহরকে)।'

উক্ত রিওয়ায়েত 'সিহাহ সিত্তা'র সংকলকগণের মধ্য হইতে শুধু ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহা উপরোক্ত রাবী কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ 'একদা নবী করীম (সা) আবূ তালহাকে বলিলেন–আমার খেদমতের জন্যে তোমাদের একটি কিশোরকে জোগাড় করিয়া আনো। তাই আবূ তালহা আমাকে সঙ্গে লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হন। অতঃপর নবী করীম (সা) কোথাও যাত্রাবিরতি করিলে আমি তাঁহার খেদমত করিতাম।' এইস্থলে হযরত আনাস (রা) নবী করীম (সা)-এর একটি সফরের বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি তাঁহার বর্ণনার একাংশে বলেন–অতঃপর নবী করীম (সা) সম্মুখে চলিলেন। এক সময় পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি বলিলেন–'এই পাহাড় আমাদিগকে ভালবাসে এবং উহাকে আমরা ভালবাসি।' অতঃপর মদীনার সমীপবর্তী হইয়া তিনি বলিলেন–'হে আল্লাহ্! হযরত ইবরাহীম (আ) যে সম্মানে মক্কা নগরীকে সম্মানিত করিয়াছিলেন, আমি মদীনার দুই প্রান্তের দুই পর্বতের মধ্যে অবস্থিত স্থানকে (মদীনা শহরকে) সেই সম্মানে সম্মানিত করিতেছি। হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদের জন্যে (মদীনাবাসীর জন্যে) তাহাদের 'মুদ্দ' ও 'সা'-এর মধ্যে বরকত দান কর।'

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের অন্য এক রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিলেন–'হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদের জন্যে তাহাদের পরিমাপের পাত্রসমূহে বরকত দাও, তুমি তাহাদের জন্যে তাহাদের সা' এর মধ্যে বরকত দাও এবং তুমি তাহাদের জন্যে তাহাদের 'মুদ্দ'-এর মধ্যে বরকত দাও।

হযরত আনাস (রা) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে আরও বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'হে আল্লাহ্! তুমি মক্কা নগরীতে যে বরকত নাযিল করিয়াছ, মদীনা শহরে উহার দ্বিগুণ বরকত নাযিল কর।'

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসিম (রা) হইতে বুখারী শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–হযরত ইবরাহীম (আ) যেভাবে মক্কা নগরীকে সম্মানিত ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং উহার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন, আমিও তেমনি মদীনাকে সম্মানিত ঘোষণা করিয়াছি এবং উহার অধিবাসীদের কল্যাণ ও উহার পরিমাপ পাত্র সা' ও মুদ্দের বরকতের জন্য দোয়া করিয়াছি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসিম (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'হযরত ইবরাহীম (আ) যেইরূপে সম্মানিত ঘোষণা করিয়াছিলেন মক্কা নগরীকে এবং তিনি দোয়া করিয়াছিলেন উহার (মক্কার) অধিবাসীদের জন্যে; আমিও সেইরূপ সম্মানিত ঘোষণা করিয়াছি মদীনা শহরকে আর আমি দোয়া করিয়াছি মদীনা শহরের জন্যে–'উহার সা'-এর বিষয়ে এবং উহার 'মুদ্দ'-এর বিষয়ে। হযরত ইবরাহীম (আ) মক্কার অধিবাসীদের জন্য যতটুকু (বরকতের) দোয়া করিয়াছিলেন, উহার দ্বিগুণ (বরকতের) দোয়া আমি মদীনার জন্য করিয়াছি।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'হে আল্লাহ্! হযরত ইবরাহীম (আ) সম্মানিত ঘোষণা করিয়াছেন মক্কা নগরীকে; আর আমি সম্মানিত ঘোষণা করিয়াছি মদীনাকে-উহার দুই রণক্ষেত্রের মধ্যবর্তী স্থানকে। উহার মধ্যে রক্তপাত ঘটানো যাইবে না, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে উহার মধ্যে অস্ত্র বহন করা যাইবে না এবং পশুকে খাওয়াইবার উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে উহাতে অবস্থিত কোন গাছের পাতা ছিন্ন করা যাইবে না। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জন্যে আমাদের শহরে বরকত নাযিল কর। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জন্যে আমাদের সা'-এর মধ্যে বরকত নাযিল কর। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জন্যে আমাদের 'মুদ্দ'-এর মধ্যে বরকত নাযিল কর। হে আল্লাহ্! তুমি একটি বরকতের পর দুইটি বরকত নাযিল কর।'...(অসমাপ্ত)

বিপুলসংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা) মদীনা শরীফকে 'হারম' الحرم। (বিশেষ বিধি বিধানের মাধ্যমে সম্মানিত) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যে সকল হাদীসে মদীনা শরীফের হারম হইবার বর্ণনার সহিত হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক মক্কা শরীফের হারম ঘোষিত হইবার বর্ণনা রহিয়াছে, এইস্থলে আমরা শুধু সেই সকল হাদীসই উল্লেখ করিয়াছি। কারণ, আলোচ্য আয়াতের সহিত শুধু উপরোক্তরূপ হাদীসেরই সম্বন্ধ রহিয়াছে।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা একদল আহলে-ইলম প্রমাণ করেন যে, মক্কা শরীফ 'হারম' ঘোষিত হইয়াছে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যামানায় তাঁহারই মুখে। কেহ কেহ বলেন-'উহা 'হারম' হইয়াছে পৃথিবী যখন সৃষ্টি হইয়াছে, সেই হইতে।' উক্ত অভিমতই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও শক্তিশালী। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

কতগুলি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিবার কালেই মক্কা নগরীকে হারম করিয়া রাখিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সা) বলিলেন-আল্লাহ্ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইদিনই এই শহরকে (মক্কা নগীরকে) الحرم। (পবিত্র ও সম্মানিত) করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব, উহা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত 'হুরমত' (সম্মান ও পবিত্রতা)-এর কারণে কিয়ামত পর্যন্ত 'হারম' থাকিবে। উহাতে যুদ্ধ করা আমার পূর্বে কাহারও জন্যে হালাল করা হয় নাই। আর আমার জন্যেও মাত্র সামান্য সময় উহাতে যুদ্ধ করা হালাল করা হইয়াছিল। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত হুরমাতের কারণে কিয়ামত পর্যন্ত উহা হারাম থাকিবে। উহাতে অবস্থিত কাঁটা-গাছ কাটা যাইবে না; উহাতে অবস্থিত শিকার তাড়ানো যাইবে না; উহাতে পতিত হারানো বস্তু উহার মালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে উহার প্রাপ্তির সংবাদ প্রচার করিতে পারিবে বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য কেহ উহা উঠাইতে পারিবে না। আর উহাতে অবস্থিত তৃণ কেহ কাটিতে পারিবে না।' অতঃপর হযরত আব্বাস (রা) বলিলেন-'হে আল্লাহ্র রাসূল! ইযখির (সুগন্ধ তৃণ বিশেষ) ছাড়া? কেননা উহা লোকদের শিল্পকর্মে এবং গৃহ নির্মাণ-কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।' নবী করীম (সা) বলিলেন- ইযখির তৃণ ছাড়া।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিবার পর ইমাম বুখারী বলিয়াছেন-'হযরত সফিয়াহ বিনতে শায়বা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ইব্‌ন মুসলিম ও ইব্বান ইব্‌ন সালেহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত সফিয়াহ্ বিনতে শায়বাহ (রা)

বলেন—'আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি। অতঃপর হযরত সফিয়াহ্ বিনতে শায়বাহ্ (রা) উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী উহা ঐরূপে বিচ্ছিন্ন সনদে (سند معلق) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ ইব্ন মাজাহ্ উক্ত হাদীসকেই অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি নিম্নোক্তরূপে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত সফিয়াহ বিনতে শায়বাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ইব্ন মুসলিম ইব্ন ইয়ানাক, ইব্বান ইব্ন সালেহ, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, ইউনুস ইব্ন বুকায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত সফিয়াহ্ বিনতে শায়বাহ (রা) বলেন—আমি নবী করীম (সা)-কে মক্কা বিজয়ের দিন খুতবা দিবার সময় বলিতে শুনিয়াছি—'হে লোক সকল! আল্লাহ্ যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই দিনই তিনি মক্কা নগরীকে الحرام (পবিত্র ও সম্মানিত) করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব, উহা কিয়ামত পর্যন্ত 'হারম' থাকিবে। উহার গাছপালা কাটা যাইবে না; উহার শিকার তাড়ানো যাইবে না এবং উহাতে পড়িয়া থাকা হারানো জিনিস উঠানো যাইবে না; তবে যে ব্যক্তি উহার মালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে উহা পাইবার সংবাদ প্রচার করিবে, সে উহা উঠাইতে পারিবে।' নবী করীম (সা)-এর এই ঘোষণা প্রদানের পর হযরত আব্বাস (রা) বলিলেন—ইযখির তৃণ ব্যতীত? কারণ, উহা ঘর-বাড়ী নির্মাণে এবং কবরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।' ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন—ইযখির তৃণ ব্যতীত।

হযরত আবূ শুরায়হ আদাবী (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেন—আমর ইব্ন সাঈদ যখন যুদ্ধের জন্যে মক্কা নগরীতে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিতে যাইতেছিল, তখন আমি তাহাকে বলিলাম—হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন। আমি নবী করীম (সা)-এর একটি বাণী শুনাই। মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে উহা নিঃসৃত হইয়াছিল, আমার নিজ কর্ণদ্বয় তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে উহা শ্রবণ করিয়াছিল, আমার অন্তর উহাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল এবং আমার নিজ চক্ষুদ্বয় উহা তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে নিঃসৃত হইবার দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলাম। তাহা এই ঃ "নবী করীম (সা) প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর বলিলেন—'মক্কা নগরীকে কোন মানুষ 'হারম' বলিয়া ঘোষণা করে নাই; বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই উহাকে 'হারম' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, তাহার জন্যে উহার মধ্যে রক্তপাত ঘটানো নিষিদ্ধ। যদি কোন ব্যক্তি উহাতে আল্লাহ্র রাসূলের যুদ্ধ করিবার ঘটনা দ্বারা যুদ্ধ করাকে হালাল বলিয়া প্রমাণিত করিতে চাহে, তবে তোমরা তাহাকে বলিও, আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে উহাতে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়াছেন; কিন্তু তোমাদিগকে উহাতে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেন নাই।' আর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে উহাতে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তাহাও মাত্র সামান্য সময়ের জন্যে। উহার হুরমাত গতকাল যেরূপ ছিল, আজ পুনরায় সেইরূপেই ফিরিয়া আসিয়াছে। উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট ইহা পৌঁছাইয়া দেয়।" হযরত আবূ শুরায়হ্ (রা) উক্ত ঘটনাকে তাঁহার শিষ্যদের নিকট বর্ণনা করিবার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি আমর ইব্ন সাঈদ-এর নিকট উক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর সে আপনাকে কি উত্তর দিয়াছিল? তিনি বলিলেন ঃ আমর ইব্ন সাঈদ বলিল, 'হে আবূ শুরায়হ! এ সম্বন্ধে তোমার অপেক্ষা আমি অধিকতর জ্ঞান রাখি। হারম শরীফ অপরাধী ব্যক্তি, খুনী, পলাতক

আসামী এবং দুষ্কৃতিকারী ইহাদের কাহাকেও আশ্রয় দেয় না।' উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরে দুই শ্রেণীর হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে। এক শ্রেণীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মক্কা নগরী হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগে তাঁহার মুখেই 'হারম' বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। আরেক শ্রেণীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিবার কালে আল্লাহ্ তা'আলাই মক্কা নগরীকে 'হারম' করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, উপরোক্ত দুইরূপ বর্ণনার মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ বা পরস্পর বিরোধিতা নাই। বস্তুত, মক্কা নগরীকে হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার যুগে হারম করেন নাই; বরং আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিবার কালে আল্লাহ্ তা'আলাই মক্কা নগরীকে 'হারম' করিয়া রাখিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার যুগে আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত বিধান জগদ্বাসীকে জানাইয়া দিয়াছিলেন মাত্র।

এইস্থলে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির পূর্বেই হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খাতামুন নাবিয়্যীন হিসাবে নির্দিষ্ট ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশে একজন নবী পাঠাইবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ الخ - 'প্রভু হে! আর তুমি তাহাদের জন্যে তাহাদের মধ্য হইতে এইরূপ একজন নবী পাঠাইও...।'

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্ত দোয়া কবুল করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশে যে নবীকে পাঠাইবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যে নবীকে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশে পাঠাইবার বিষয়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া কবুল করিয়াছিলেন, তিনি আর কেহ নহেন; তিনি হইতেছেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)। হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্র নিকট তিনি খাতামুন্নাবিয়্যীন হিসাবে নির্ধারিত। আল্লাহ্ তা'আলা জানিতেন–ইবরাহীম স্বীয় পুত্র ইসমাঈলের বংশে একজন নবী পাঠাইবার জন্যে তাঁহার নিকট দোয়া করিবে এবং তিনি উহা কবূল করিবেন। তদনুসারে তিনি হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির পূর্বেই হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে নবী হিসাবে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির পূর্বেই নবী করীম (সা)-এর নবী হিসাবে নির্ধারিত থাকা এবং তাহাকে পাঠাইবার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া করা ও উহা কবূল হওয়া, এই সবের মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ বা পরস্পর বিরোধিতা নাই। অনুরূপভাবে বলা যায়, আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টির সময়েই আল্লাহ্র নিকট মক্কা নগরীর 'হারম' হিসাবে নির্ধারিত থাকা এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগে তাঁহার মুখে উহার 'হারম' হইবার বিষয় ঘোষিত হওয়া–এই দুইয়ের মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ বা পরস্পর বিরোধিতা নাই।

উপরে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত হইয়াছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশে যে নবী পাঠাইবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিয়াছিলেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) ছিলেন সেই নবী। এ সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ একদা সাহাবীগণ আরয করিল–'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার আবির্ভাব সম্পর্কিত ঘটনা আমাদিগকে জ্ঞাত করুন। নবী করীম (সা) বলিলেন–'আমি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার ফল ও হযরত

ঈসা (আ)-এর সুসংবাদের পরিণতি। আমার মা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন।, তাঁহার মধ্য হইতে একটি জ্যোতি বাহির হইয়া শাম দেশের (সিরিয়া) প্রাসাদসমূহ আলোকিত করিয়া ফেলিল।' উক্ত হাদীস এই অংশটিরই আলোচিত হইবে।

এইস্থলে একটি বিষয় অনালোচিত থাকিয়া যাইতেছে। উহা হইতেছে এই ঃ মক্কা নগরী এবং মদীনা শহর– এই পবিত্র ও বিশেষ সম্মানে সম্মানিত স্থান দুইটির কোন্‌টি অধিকতর ফযীলতের অধিকারী? অধিকাংশ ফকীহ বলেন, মক্কা নগরী অধিকতর ফযীলতের অধিকারী। ইমাম মালিক ও তাঁহার অনুসারীগণ বলেন, মদীনা শহর অধিকতর ফযীলতের অধিকারী। আল্লাহ্ চাহেন তো ভবিষ্যতে উভয় পক্ষের যুক্তির উল্লেখসহ এতদসম্বন্ধে আলোচনা করিব। আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা রাখি।

পবিত্র মক্কা সম্বন্ধে হযরত ইবরাহীম (আ) বলিয়াছিলেন ঃ

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا অর্থাৎ 'প্রভু হে! তুমি ইহাকে একটি নিরাপদ ও ভীতিমুক্ত শহর বানাইও।' ফলত মক্কা নগরীকে আল্লাহ্ তা'আলা শরীআতের বিধান এবং প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা এই উভয় দিক দিয়া নিরাপদ ও ভীতিমুক্ত শহর বানাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا 'আর কেহ উহাতে প্রবেশ করিলে সে নিরাপদ হইয়া যায়।' তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ 'তাহারা কি দেখে না যে, আমি তাহাদের জন্যে একটি সম্মানিত নিরাপদ স্থান বানাইয়াছি আর তাহাদের চতুষ্পার্শ্ব হইতে লোকদের উপর হামলা করা হইয়া থাকে।'

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় ব্যতীত একাধিক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা নগরীর নিরাপদ ও সম্মানিত হইবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে উল্লেখিত একাধিক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'মক্কা ভূমিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম।' হযরত জাবির (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, মক্কা ভূমিতে অস্ত্র বহন করা কোন ব্যক্তির জন্যেই হালাল নহে।'

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যে দোয়ার বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, উহা তিনি কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার কালে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন। এই সময়ে কা'বা ঘরের অঞ্চলটি জনপদে পরিণত হয় নাই। এই কারণেই আলোচ্য আয়াতে দেখা যাইতেছে–হযরত ইবরাহীম (আ) তখন উক্ত অঞ্চলটি সম্বন্ধে 'জনপদটিকে' শব্দ প্রয়োগ না করিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলেন 'ইহাকে' শব্দ। তিনি বলিয়াছিলেন–

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا 'প্রভু হে! তুমি 'ইহাকে' একটি নিরাপদ জনপদে পরিণত কর।'

পক্ষান্তরে, সূরা ইবরাহীমের নিম্নোক্ত আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যে দোয়ার বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, উহা তিনি কা'বা ঘর নির্মাণের কার্য সম্পন্ন করিবার বেশ কয়েক বৎসর পর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কা'বা ঘরের চতুষ্পার্শ্বে

একটি জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই কারণেই 'সূরা ইবরাহীম' এর অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট আয়াতে দেখা যায়–হযরত ইবরাহীম (আ) তখন উক্ত অঞ্চলটি সম্বন্ধে 'জনপদ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সূরা ইবরাহীমের সংশ্লিষ্ট আয়াতটি হইতেছে এই ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا 'আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য যখন ইবরাহীম বলিয়াছিল, 'প্রভু হে! তুমি এই জনপদটিকে নিরাপদ বানাও।'

উল্লেখ্য যে, হযরত ইবরাহীম (আ) দ্বিতীয়বার দোয়া করিয়াছিলেন নিশ্চিতরূপে হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মের পর। কারণ, দ্বিতীয়বারের দোয়ার পর তিনি বলিয়াছিলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ - اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্যে যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করিয়াছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু অবশ্যই দোয়া শ্রবণ করিয়া থাকেন।'

এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে, হযরত ইসহাক (আ) হযরত ইসমাঈল (আ) অপেক্ষা তের বৎসরের কনিষ্ঠ। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ - وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

আলোচ্য এই আয়াত দুইরূপে পঠিত হইয়াছে। অধিকাংশ কারী ও ব্যাখ্যাকার বলেন–উক্ত আয়াতাংশের অন্তর্গত قال ক্রিয়াটির কর্তা হইতেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা। তদনুসারে তাহারা امتع। ক্রিয়াটির প্রথম বর্ণ ا-কে এবং শেষ বর্ণ ع -কে ضمة (পেশ) হরকত দিয়া পড়েন। এইরূপে তাহারা উহার অন্তর্গত اضطر। ক্রিয়াটির প্রথম বর্ণ ا-কে فتحة (যবর) এবং শেষ বর্ণ ر -কে ضمة (পেশ) দিয়া পড়েন।

পক্ষান্তরে কোন কোন কারী ও তাফসীরকার বলিয়াছেন–আলোচ্য আয়াতাংশের অন্তর্গত قال ক্রিয়াটির কর্তা হইতেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)। তদনুসারে তাহারা امتع। ক্রিয়াটির প্রথম বর্ণ ا -কে যবর এবং শেষ বর্ণ ع -কে জযম দিয়া পড়িয়াছেন। এইরূপে তাহারা اضطر। ক্রিয়াটির প্রথম বর্ণ ا -কে كسرة (যের) দিয়া পড়িয়াছেন।

প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা ও কিরাআত অনুসারে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার উত্তরে বলিলেন–আমি তোমার দোয়া কবূল করিলাম। উহাকে আমি নিরাপদ ও ভীতিমুক্ত জনপদে পরিণত করিব এবং তোমার দোয়া অনুসারে উহার অধিবাসী মু'মিনদিগকে ফলসমূহ হইতে রিযিক দিব। অধিকন্তু উহার অধিবাসীদের মধ্য হইতে যাহারা কুফরী করিবে, আমি তাহাদিগকেও মু'মিনদের ন্যায় রিযিক দিব। তবে আমাদের (কাফিরদের) বেলায় আমার রিযিকের সময়ের পরিধি হইবে সীমাবদ্ধ। তাহারা আমার রিযিক ও নি'আমাত শুধু তাহাদের ইহ জীবনেই ভোগ করিতে পারিবে। পরীক্ষার জন্য তাহাদিগকে উক্ত নি'আমাত ভোগ করিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বিধায় আমি তাহাদিগকে উহা ভোগ করিতে দিব। অতঃপর আমি তাহাদিগকে তাহাদের কুফরীর কারণে দোযখে নিক্ষেপ করিব। আর দোযখ বড়ই নিকৃষ্ট আশ্রয়।'

পক্ষান্তরে, শেষোক্ত ব্যাখ্যা ও কিরাআত অনুসারে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে ঃ 'হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ্! আর যাহারা

কুফরী করিবে, তুমি তাহাদিগকে অল্প কিছুদিন (অর্থাৎ তাহাদের পার্থিব জীবনে) নি'আমাত ভোগ করিতে সুযোগ দিও; অতঃপর তাহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করিও। আর দোযখ বড়ই নিকৃষ্ট নিবাস।' উল্লেখ্য যে, শেষোক্ত কিরাআত বিখ্যাত সাতটি কিরাআতের কোন কিরাআতের অন্তর্ভুক্ত নহে। তাহা ছাড়া শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি আয়াতের গ্রন্থি অবস্থিতির সহিত সামঞ্জস্যশীল নহে। উহা সঠিক ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; বরং প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য।

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী' ও আবূ জা'ফর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيْلاً ثُمَّ اضْطَرُّهُ اِلَى عَذَابِ النَّارِ الخ –এই অংশটি হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিবেদিত একটি দোয়া। উহাতে হযরত ইবরাহীম (আ) বলিতেছেন–'হে আল্লাহ্! আর যে ব্যক্তি কুফরী করিবে, তুমি তাহাকে অল্প কিছুদিন নি'আমাত ভোগ করিতে দিও। অতঃপর, তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিও। আর, উহা বড়ই নিকৃষ্ট স্থান!'

হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আলীয়া, রবী' ইব্‌ন আনাস ও ইমাম আবূ জা'ফর রাযী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন–

وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيْلاً ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلَى عَذَابِ النَّارِ ـ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ

এই আয়াতাংশটি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক হযরত ইবরাহীম (আ)-কে প্রদত্ত উত্তর।'

মুজাহিদ এবং ইকরামাও উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই শুদ্ধ ও সঠিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে লায়ছ ইব্‌ন আবূ সলীম ও আবূ জা'ফর বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুজাহিদ বলেন– وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيْلاً ثُمَّ اضْطَرُّهُ اِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ। অর্থাৎ–আর যে ব্যক্তি কুফ্‌রী করিবে, আমি তাহাকেও সামান্য রিযিক দান করিব। অতঃপর তাহাকে আগুনের শাস্তির দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইব। আর উহা বড়ই জঘন্য গন্তব্যস্থান!

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন–হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার বংশধরদের মধ্য হইতে কিছুসংখ্যক লোককে ইমাম বানাইবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যে দোয়া করিয়াছিলেন, উহার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন–'তাঁহার বংশে কাফিরও জন্মলাভ করিবে এবং তিনি কাফিরকে লোকদের ইমাম বানাইবেন না। তাঁহার বংশে কাফিরও জন্মলাভ করিবে ইহা জানিতে পারিয়া হযরত ইবরাহীম (আ) মর্মাহত হইলেন এবং আল্লাহ্‌র মহব্বতে আবিষ্ট হইয়া স্বীয় বংশধরদের মধ্য হইতে কাফিরদিগকে বাদ দিয়া শুধু মু'মিনদের জন্যে দোয়া করিলেন। তিনি কা'বা ঘরের অঞ্চলের ভবিষ্যৎ অধিবাসী মু'মিনদিগকে রিযিক দান করিবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিলেন। তাঁহার দোয়ার উপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জানাইলেন–আমি মু'মিনকে রিযিক দান করিব এবং তৎসহ কাফিরকেও রিযিক দান করিব। তবে কাফিরকে রিযিক দান করিব সামান্য কিছুদিন। তাহাকে শুধু তাহার পার্থিব জীবনে রিযিক দান করিব। অতঃপর তাহাকে দোযখের আযাবের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইব। আর উহা বড়ই জঘন্য গন্তব্যস্থান!

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আম্মার, যাহাবী, হামীদ খাররাত ও হাতিম ইব্ন ইসমাঈল বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন–হযরত ইবরাহীম (আ) কাফিরদিগকে বাদ দিয়া শুধু মু'মিনদের জন্য দোয়া করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন–'(প্রভু হে!) আর, তুমি উহার অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনিবে তাহাদিগকে ফলসমূহ হইতে রিযিক দান করিও।' তাঁহার দোয়ার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–'আমি যেইরূপ মু'মিনদিগকে রিযিক দান করিব, সেইরূপে কাফিরদিগকেও রিযিক দান করিব। আমি কি কাহাকেও সৃষ্টি করিয়া তাহাকে রিযিক হইতে বঞ্চিত করিব? না, তাহা করিব না, করিতে পারি না। বরং আমি কাফিরদিগকেও রিযিক দান করিব। তবে, তাহাদিগকে রিযিক দান করিব অল্প কিছুদিনের জন্যে (শুধু পার্থিব জীবনে)। অতঃপর তাহাদিগকে দোযখের আযাবের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইব। আর উহা বড়ই জঘন্য গন্তব্য স্থান। অতঃপর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন ঃ

كُلاًّ نُمِدُّ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ - وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا 'আমি তোমার প্রভুর দান হইতে এই দলকে এবং ওই দলকে উভয় দলকে সাহায্য করিয়া থাকি। আর, তোমার প্রভুর দান (দল বিশেষের জন্যে) সংরক্ষিত নহে।"

উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ এবং ইকরামা হইতেও উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لاَيُفْلِحُوْنَ - مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ -

'যাহারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তাহারা কোনক্রমে সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারিবে না। তাহাদের জন্যে দুনিয়াতে কিছু ভোগের উপকরণ রহিয়াছে। তারপর তাহাদিগকে আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। অতঃপর আমি তাহাদিগকে তাহাদের কুফরীর কারণে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব।'

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَمَنْ كَفَرَ فَلاَ يَحْزُنْكَ كُفْرُهُمْ - إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا - إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ - نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيْظٍ -

"যাহারা কুফরী করিয়াছে, তাহাদের কুফরী যেন তোমাকে চিন্তান্বিত না করে। তাহাদিগকে আমার নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবে। তৎপর আমি তাহাদিগকে তাহাদের কার্যসমূহ সম্বন্ধে অবগত করাইব। নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরের বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছেন। আমি তাহাদিগকে সামান্য কয়েক দিন ভোগের উপকরণ প্রদান করিব। অতঃপর তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির দিকে ঠেলিয়া দিব।"

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَلَوْ لاَ أَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ - وَلِبُيُوْتِهِمْ أَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُوْنَ - وَزُخْرُفًا - وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ -

"আর যদি সকল লোক একই দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশংকা না থাকত তবে আমি যাহারা 'রহমান'-এর প্রতি কুফরী করে, তাহাদের জন্যে তাহাদের গৃহসমূহের নিশ্চয় রৌপ্য দ্বারা ছাদ প্রস্তুত করিয়া দিতাম আর তাহাদের উপরে উঠার সোপানসমূহও। আর তাহাদের গৃহসমূহের দ্বার এবং পালঙ্কও (তদ্রূপ করিতাম) যাহার উপর তাহারা হেলান দিয়া বসিত। আর স্বর্ণও (দিতাম)। আর এই সবই নিশ্চয় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ; আর আখিরাত (উহার নি'আমাতসমূহ) তো তোমার প্রভুর নিকট মুত্তাকীদের জন্যেই সংরক্ষিত রহিয়াছে।"

ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ 'কাফিরদিগকে আমরা পার্থিব জীবনে কুফরী করিবার সুযোগ দিয়া আখিরাতে তাহাদিগকে শক্ত হাতে ধরিব এবং দোযখের ভীষণ শাস্তির দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইব।'

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا - وَاِلَىَّ الْمَصِيْرُ "আর কত জনপদের জালিম হওয়া অবস্থায় আমি উহাদিগকে অবকাশ দিয়াছি। অতঃপর আমি উহাদিগকে শক্ত হাতে ধরিয়াছি। আর আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।"

বুখারী শরীফে ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'কষ্টদায়ক কথা শুনিয়া আল্লাহ্ যতটুকু ধৈর্যধারণ করেন, ততটুকু ধৈর্যধারণ অন্য কেহই করে না। লোকে তাঁহার জন্যে সন্তান ঠাওরায়; তথাপি তিনি সকলকে রিযিক দেন।' সহীহ হাদীসে আরও বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'আল্লাহ্ তা'আলা জালিমকে সুযোগ ও অবকাশ দিয়া থাকেন। অতঃপর যখন তাহাকে ধরেন, তখন তাহাকে আর ছাড়েন না।' অতঃপর নবী করীম (সা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ - اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ -

"জনপদসমূহের জালিম থাকা অবস্থায় তোমার প্রভু যখন উহাদিগকে ধরেন, তখন তাঁহার ধরা এইরূপ (শক্ত) হইয়া থাকে। নিশ্চয় তাঁহার ধরা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক।"

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا - اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ - وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا - وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

শব্দার্থ ঃ القواعد শব্দটি قاعدة শব্দের বহুবচন। القاعدة অর্থ ভিত্তি বা স্তম্ভ।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার কালে তাঁহার নিকট যে হৃদয় উৎসারিত দোয়া নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন–হে মুহাম্মদ! তুমি মানব জাতির নিকট ইবরাহীম ও ইসমাঈলের কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার ইতিহাস বর্ণনা কর। তাহারা কা'বা ঘরের ভিত্তি গাঁথিয়া উঁচু করিবার কালে বলিতেছিল, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের নিকট হইতে আমাদের এই ইবাদতটুকু কবূল কর। নিশ্চয় তুমি সকল কথা শ্রবণ করিয়া থাক এবং সকল বিষয়ে অবগত রহিয়াছ।' তাহারা আরও বলিতেছিল, 'হে আমাদের প্রভু! আর তুমি আমাদের দুইজনকে তোমার প্রতি অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশে তোমার প্রতি অনুগত একদল লোক সৃষ্টি করিও। আর তুমি আমাদিগকে আমাদের ইবাদতসমূহ শিক্ষা দাও এবং আমাদের তওবা কবূল কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবূলকারী এবং দয়াময়।'

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতের অন্তর্গত–

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ এই দোয়াটি হযরত ইসমাঈল (আ) ও হযরত ইবরাহীম (আ) উভয়ই আল্লাহ্র নিকট পেশ করিয়াছিলেন। অধিকাংশ তাফসীরকার উপরোক্ত ব্যাখ্যাই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে কোন কোন তাফসীরকার বলিয়াছেন–'হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা ঘরের ভিত্তি নির্মাণ করিতেছিলেন এবং হযরত ইসমাঈল (আ) আল্লাহ্র নিকট এই দোয়া করিতেছিলেন।' উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে; বরং প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই শুদ্ধ ও সঠিক। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই যে শুদ্ধ ও সঠিক তাহা দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত দোয়া দ্বারাই প্রমাণিত হয়। শীঘ্রই এতদসম্বন্ধীয় বিবরণ আসিতেছে।

হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) এবং হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ইমাম কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা আলোচ্য আয়াত এইরূপ তিলাওয়াত করিতেন ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ـ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ـ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-এর দোয়ার মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। উহাদের একটি এই যে, তাঁহারা আল্লাহ্র ঘর নির্মাণ করিবার কালে তাঁহাদের উক্ত ইবাদত কবূল করিবার জন্যে আল্লাহ্র নিকট কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করিতেছিলেন। ইহা অতি উচ্চস্তরের চিন্তাধারা এবং হৃদয়-বৃত্তি। আল্লাহ্র অতি মর্যাদাবান বান্দাগণ ইবাদত করিবার কালে এইরূপ দোয়াই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মনে যেরূপ তাঁহাদের ইবাদত কবূল হইবার আশা বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ উহা কবূল না হইবার আশংকাও বিদ্যমান থাকে। তাই তাঁহারা যে কোন ধরনের ইবাদত করিবার কালে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিয়া থাকেন যেন তিনি উহা তাঁহাদের নিকট হইতে কবূল করেন।

ওয়াহিব ইব্ন বিরদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন খুনায়স্ মক্কী প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা ওয়াহিব ইব্ন বিরদ আলোচ্য আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করিয়া ক্রন্দনের সহিত বলিতে লাগিলেন–হে আর-রহমানের

খলীল! তুমি আর-রহমানের ঘরের ভিত্তি নির্মাণ কর আর তোমার মনে এই ভয় থাকে যে, আল্লাহ্ উহা কবূল নাও করিতে পারেন। (অর্থাৎ তোমার মন আল্লাহ্র ভয়ে কতই না ভীত!)

নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের অন্তরের উপরোক্ত মহা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ অর্থাৎ 'আর যাহাদের অন্তর সাদকা ইত্যাদি দান করিবার কালে এই ভয়ে ভীত থাকে যে, আল্লাহ্ উহাকে কবূল নাও করিতে পারেন।' নবী করীম (সা) হইতে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সহীহ হাদীসে উক্ত আয়াতাংশের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ চাহেন তো যথাস্থানে উহা বর্ণিত হইবে।

এইস্থলে ইমাম বুখারী একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে উহা বর্ণনা করিতেছি। এতদসহ এই সম্পর্কে আরও কতগুলি রিওয়ায়েত বর্ণিত হইতেছে। যেমন ঃ

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আইউব সাখতিয়ানী এবং কাছীর ইব্ন কাছীর ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আবূ ওয়াদাআ (উভয়ের রিওয়ায়েতের মধ্যে কিছু পার্থক্য রহিয়াছে) মুআম্মার, আব্দুর রায্যাক, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন–'দীর্ঘ ভ্রমণকারিণী প্রথম মহিলা হইতেছেন হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাতা হযরত হাজেরা (রা)। তিনি হযরত সারাহ (রা) হইতে অনেক দূরে চলিয়া যাইবার জন্যে বদ্ধপরিকর হইলেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহাকে এবং তাঁহার দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র ইসমাঈলকে সঙ্গে লইয়া মক্কার দিকে রওয়ানা হইলেন। সেই সময়ে মক্কা ছিল একটি জনমানব শূন্য পানিবিহীন স্থান। তখন যমযম কূপের স্থানটি ছিল কা'বা ঘরের স্থান অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ। দীর্ঘ সফরের পর হযরত ইবরাহীম (আ) মক্কায় পৌঁছিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় স্ত্রী হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাঈলকে একটি চত্বরের পার্শ্বে যমযম কূপের স্থানের ঠিক উপরে রাখিয়া গৃহের দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি তাহাদের বাঁচিবার জন্যে তাহাদের নিকট রাখিয়া গেলেন শুধু এক থলি শুকনা খেজুর এবং এক মশক পানি। ইসমাঈলের মাতা তাহাকে অনুসরণ করিতে করিতে বলিলেন–হে ইবরাহীম! এই জনমানবহীন খাদ্য-পানীয় শূন্যস্থানে আমাদিগকে একাকী ফেলিয়া আপনি কোথায় যাইতেছেন? ইসমাঈলের মাতা একাধিকবার তাঁহাকে উহা বলা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার প্রতি ফিরিয়া তাকাইলেন না। অতঃপর ইসমাঈলের মাতা বলিলেন–আল্লাহ্ তা'আলাই কি আপনাকে ইহা করিতে আদেশ করিয়াছেন? ইহাতে তিনি বলিলেন–'হ্যাঁ! আল্লাহ্ তা'আলাই আমাকে ইহা করিতে আদেশ করিয়াছেন।'. ইসমাঈলের মাতা বলিলেন–'তবে তিনি আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবেন না।' এই বলিয়া ইসমাঈলের মাতা পূর্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) পথ চলিতে লাগিলেন। তিনি এক গিরিবর্তে পৌঁছিয়া স্ত্রী ও পুত্রের দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া যাইবার পর কা'বা ঘরের স্থানের দিকে মুখ করিয়া হাত উঠাইয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এই দোয়া করিলেন ঃ

رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ -

"হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার বংশধরদের একটি অংশকে তোমার পবিত্র ঘরের নিকট শস্যবিহীন একটি উপত্যকায় এই উদ্দেশ্য বসবাস করাইয়াছি যে, তাহারা সালাত কায়েম করিবে। অতএব, তুমি কতগুলি মানুষের অন্তরকে তাহাদের দিকে আকৃষ্ট করিয়া লইয়া আসিও আর তাহাদিগকে ফলসমূহ হইতে রিযিক দান করিও। আশা করা যায়, তাহারা শোকরগুযারী করিবে।"

অতঃপর তিনি গৃহের দিকে রওয়ানা হইলেন। এদিকে ইসমাঈলের মাতা ইসমাঈলকে স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন এবং নিজে মশকের পানি পান করিয়া ও থলির খেজুর খাইয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এক সময়ে মশকের পানি ফুরাইয়া গেল। পুত্র ইসমাঈল ও তিনি তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িলেন। পানির পিপাসায় শিশুপুত্র ছট্‌ফট্ করিবার দৃশ্য সহিতে না পারিয়া তিনি পানির তালাশে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কাছেই অবস্থিত ছিল সাফা পাহাড়। কোথাও কোন মানুষকে দেখিতে পাইলে তাহার নিকট পানির সন্ধান পাইবেন এই আশায় তিনি উহাতে চড়িয়া উপত্যকার চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কোন মানুষকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি পাহাড় হইতে উপত্যকায় নামিয়া স্বীয় কামীছের কিনারা উপরে তুলিয়া বিপদগ্রস্ত মানুষের ন্যায় দৌড়াইতে লাগিলেন। এইরূপ দৌড়াইতে দৌড়াইতে তিনি মারওয়া পাহাড়ের নিকট পৌঁছিলেন। অতঃপর উহাতে চড়িয়া কোন মানুষকে দেখা যায় কিনা তাহা জানিবার জন্যে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। কিন্তু, কোথাও কোন মানুষকে দেখিতে পাইলেন না। এইরূপ সাতবার পাহাড়ে উঠানামা ও উপত্যকায় দৌড়াদৌড়ি করিলেন।' হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'নবী করীম (সা) বলিলেন–এই কারণেই লোকে (হজ্জের সময়ে) সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ (السعى) (দৌড়ান) করিয়া থাকে।

শেষবার মারওয়া পাহাড়ে উঠিয়া তিনি একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। আওয়াজ শুনিয়া নিজেই নিজেকে বলিলেন–'থামো।' অতঃপর মনোযোগ সহকারে কান লাগাইয়া সেই একই আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। এইবার আওয়াজ শুনিয়া বলিলেন, 'ওহে! কাহার আওয়াজ শুনিতেছি? তোমার নিকট যদি পানি থাকে...।' হঠাৎ তিনি দেখিলেন যমযম কূপের স্থানের কাছে এক ফেরেশতা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ফেরেশতা পায়ের গোড়ালি দ্বারা অথবা ডানা দ্বারা (এইস্থলে রাবী গোড়ালি ও ডানা এই দুইটি শব্দের কোনটি শুনিয়াছেন, তাহা তাহার মনে নাই।) মাটি খুঁড়িলেন। ফলে উক্ত স্থান হইতে ঝরনা উৎসারিত হইল। ইসমাঈলের মাতা হাত দিয়া ঠেকাইবার কাজ করিয়া (অর্থাৎ চারিপাশে মাটি দ্বারা বাঁধ দিয়া) পানিকে গড়াইয়া যাইতে বাধা দিতে লাগিলেন এবং অঞ্জলি ভরিয়া পানি উঠাইয়া মশক পূর্ণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পানি উঠাইবার পর সঙ্গে সঙ্গে উক্ত স্থান পুনরায় পানিতে ভরিয়া যাইতে লাগিল।' হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিলেন–'আল্লাহ্ তা'আলা ইসমাঈলের মাতাকে রহম করুন! যদি তিনি যমযমকে উহার নিজ গতিতে চলিতে দিতেন অথবা (বর্ণনাকারীর দ্বিধা) যদি তিনি অঞ্জলি ভরিয়া পানি না উঠাইতেন, তবে যমযম কূপ নিশ্চয় চতুর্দিকে প্রবহমান একটি ফোয়ারা হইত।' হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'অতঃপর ইসমাঈলের মাতা নিজে পানি পান করিলেন এবং শিশুকে স্তন্য পান করাইলেন। তারপর ফেরেশতা তাঁহাকে বলিলেন–'তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবার আশংকা করিও না। এখানে আল্লাহ্‌র একখানা ঘর রহিয়াছে। শিশুটি এবং তাহার পিতা উহাকে (ঘরটিকে) নির্মাণ করিবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা উহার অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করিবেন না।'

বায়তুল্লাহ্ তখন ছিল টিলার ন্যায় উচ্চ একটি স্থান। বৃষ্টির পানির ঢল উহার ডান বাম দিয়া প্রবাহিত হইত। কিন্তু, উহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে পারিত না। যাহা হউক, মাতা ও শিশুপুত্রের দিন এইভাবে চলিতে লাগিল। একদা জুরহুম (جرهم) গোত্রের একটি কাফেলা কোদা (كداء) নামক এলাকার রাস্তা দিয়া যাইবার কালে মক্কার নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিল। তাহারা একটি পাখীকে আকাশে চক্রপথে উড়িয়া বেড়াইতে দেখিয়া বলাবলি করিল, এই পাখীটি নিশ্চয় পানির উপর (ঘুরিয়া ঘুরিয়া) আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে। আমরা এই পথ দিয়া বহুবার যাতায়াত করিয়াছি; কিন্তু এখানে তো পানি দেখি নাই।' অতঃপর তাহারা প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্যে তদন্তকারী লোক পাঠাইল। তদন্তকারী লোক আসিয়া পানি দেখিতে পাইয়া কাফেলাকে উহার সংবাদ জানাইল। তাহারা আসিয়া ইসমাঈলের মাতাকে বলিল-আমাদিগকে এই স্থানে বসবাস করিতে অনুমতি দিবেন কি? তিনি বলিলেন-'হ্যাঁ। অনুমতি দিতেছি। তবে, এই পানিতে আপনাদের কোন হক (দাবী) থাকিতে পারিবে না।' তাহারা বলিল-'হ্যাঁ। আমরা উহা মানিয়া লইলাম।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, 'ইসমাঈলের মাতা চাহিয়াছিলেন, এইস্থানে আরও মানুষের বসতি কায়েম হউক যাহাতে নির্জনতার কষ্ট দূর হইয়া যায়। এখানে কাফেলার বসতি স্থাপনের কারণে উহার নির্জনতা দূর হইল।'

যাহা হউক, তাহারা সেখানে অবতরণ করিয়া পরিবারের লোকদিগকেও সেখানে আনয়ন করিল। এইরূপে জুরহুম গোত্রের কয়েকটি পরিবার সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিল। এদিকে ইসমাঈল সন্তান-বৎসল মাতার স্নেহে দিন দিন বড় হইতে লাগিলেন এবং প্রতিবেশী জুরহুম গোত্রীয় লোকদের নিকট আরবী ভাষা শিখিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বভাব চরিত্র ও চালচলন সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিল। তাহারা সকলে তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিল। সকলের স্নেহ ও ভালবাসার মধ্য দিয়া শিশু ইসমাঈল কিশোর ইসমাঈলে এবং কিশোর ইসমাঈল যুবক ইসমাঈলে পরিণত হইল। এই সময়ে তাহারা তাহাদের একটি কন্যাকে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সহিত বিবাহ দিল। কালের গতিতে এক সময় হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাতা ইন্তিকাল করিলেন। একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় পরিজনকে দেখিতে আসিয়া হযরত ইসমাঈল (আ)-কে বাড়িতে পাইলেন না। পুত্রবধুর নিকট তিনি তাঁহার সংবাদ জানিতে চাহিলে সে বলিল, তিনি রিযিকের সন্ধানের বাহিরে গিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাহাদের দিন কিভাবে চলিতেছে তাহা তাহার নিকট জানিতে চাহিলে সে বলিল-'আমরা বড় কষ্ট ও অভাব অনটনের মধ্যে আছি।' হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন-'তোমার স্বামী বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে তাহাকে আমার পক্ষ হইতে সালাম জানাইবে এবং তাহাকে নিজের ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলাইয়া ফেলিতে বলিবে।' এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। হযরত ইসমাঈল (আ) বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার বাড়ীতে কোন লোকের আগমন অনুভব করিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন-আমাদের বাড়ীতে কি কোন লোকের আগমন ঘটিয়াছিল? তাঁহার স্ত্রী বলিল-'হ্যাঁ, এই এই চেহারা চরিত্রের জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি এখানে আসিয়াছিল। সে আমার নিকট আপনার সংবাদ জানিতে চাহিয়াছিল। আমি তাহাকে আপনার বাহিরে যাইবার সংবাদ জানাইয়াছি। লোকটি আমাদের দিন কিরূপে কাটিতেছে তাহাও জানিতে চাহিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিয়াছি যে, আমরা বড় কষ্ট ও অভাবের মধ্য দিয়া দিনাতিপাত করিতেছি। হযরত ইসমাঈল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন-তিনি কি তোমাকে

কোন আদেশ দিয়া গিয়াছেন? তাঁহার স্ত্রী বলিল—হ্যাঁ! লোকটি আমাকে এই আদেশ দিয়া গিয়াছে যে, আমি যেন তাহার পক্ষ হইতে আপনাকে সালাম জানাই এবং আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলাইয়া ফেলিতে বলি। হযরত ইসমাঈল (আ) বলিলেন—'তিনি হইতেছেন আমার পিতা। তিনি তোমাকে তালাক দিবার জন্যে আমাকে আদেশ দিয়া গিয়াছেন। তুমি স্বীয় পরিজনের নিকট চলিয়া যাও।'

এইরূপে হযরত ইসমাঈল (আ) স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়া জুরহুম গোত্রের অপর একটি কন্যাকে বিবাহ করিলেন। কিছুদিন পর হযরত ইবরাহীম (আ) পুনরায় মক্কায় হযরত ইসমাঈল (আ)-কে দেখিতে আসিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে পাইলেন না। তিনি পুত্রবধুর নিকট তাঁহার সংবাদ জানিতে চাহিলে পুত্রবধু বলিলেন—'তিনি রিযিকের তালাশে বাহিরে গিয়াছেন।' হযরত ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন— তোমাদের দিন কিভাবে কাটিতেছে? পুত্রবধু বলিলেন—'আমরা সুখে আছি। অতঃপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করিলেন।' হযরত ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কি খাদ্য খাও? পুত্রবধু বলিলেন—'আমরা গোশত খাই।' হযরত ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কি পানীয় পান কর? পুত্রবধু বলিলেন—আমরা পানি পান করি। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন—'হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদের জন্যে তাহাদের গোশত ও পানিতে বরকত নাযিল কর।' নবী করীম (সা) বলেন—সেই যুগে তাহারা খাদ্য হিসাবে শস্যদানা পাইতেন না। যদি তাহাদের নিকট শস্যদানা থাকিত, তবে হযরত ইবরাহীম (আ) উহাতে বরকত নাযিল করিবার জন্যেও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিতেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন-ঃ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার ফল এই হইয়াছে যে, মক্কা ভিন্ন অন্যত্র কোন লোক শুধু গোশত ও পানি খাইয়া বাঁচিতে না পারিলেও মক্কার লোকে শুধু উক্ত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যাহা হউক হযরত ইবরাহীম (আ) পুত্রবধুকে বলিলেন—'তোমার স্বামী বাড়িতে ফিরিয়া আসিলে আমার পক্ষ হইতে তাহাকে সালাম জানাইবে এবং তাহাকে তাহার ঘরের দরজার চৌকাঠ অপরিবর্তিত রাখিতে বলিবে।' হযরত ইসমাঈল (আ) বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন লোক কি আমাদের বাড়িতে আসিয়াছিল? তাহারা স্ত্রী বলিলেন—'হ্যাঁ! জনৈক সুগঠন বৃদ্ধ ব্যক্তি আমাদের বাড়িতে আসিয়াছিলেন।' তাঁহার স্ত্রী এইরূপ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আরও প্রশংসামূলক পরিচয় বর্ণনা করিলেন। অতঃপর বলিলেন—'বৃদ্ধ লোকটি আমার নিকট আপনার সংবাদ এবং আমাদের সাংসারিক অবস্থা জানিতে চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি আমরা সুখে আছি।' হযরত ইসমাঈল (আ) বলিলেন—তিনি কি তোমাকে কোন আদেশ দিয়া গিয়াছেন? তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—'হাঁ! তিনি আমাকে তাঁহার পক্ষ হইতে আপনাকে সালাম জানাইতে বলিয়াছেন এবং আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ অপরিবর্তিত রাখিতে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।' হযরত ইসমাঈল (আ) বলিলেন—'তিনি হইতেছেন আমার পিতা। যে চৌকাঠটিকে তিনি অপরিবর্তিত রাখিতে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, তুমিই হইতেছ সেই চৌকাঠ। তিনি স্ত্রী হিসাবে তোমাকে অপরিবর্তিত রাখিবার জন্যে আমাকে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।'

কিছুদিন পর হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-কে দেখিবার জন্যে পুনরায় মক্কার আগমন করিলেন। এই সময়ে হযরত ইসমাঈল (আ) যমযম কূপের কাছে একটি টিলার নীচে বসিয়া তীরের শলাকা প্রস্তুত করিতেছিলেন। পিতাকে দেখিবা মাত্র তিনি তাঁহার নিকট দৌড়াইয়া গেলেন। পিতা-পুত্রে কোলাকুলি হইবার পর হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত

ইসমাঈল (আ)-কে বলিলেন–'হে ইসমাঈল! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে একটি কাজ করিতে আদেশ দিয়াছেন।' হযরত ইসমাঈল (আ) বলিলেন–'আপনার প্রভু আপনাকে যাহা করিতে আদেশ দিয়াছেন, তাহা পালন করুন।' হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–তুমি উহাতে আমাকে সাহায্য করিবে তো? হযরত ইসমাঈল (আ) বলিলেন–'আমি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করিব। হযরত ইবরাহীম (আ) একটি উঁচুস্থানের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন–'আল্লাহ্ তা'আলা এইস্থানে একটি ঘর নির্মাণ করিবার জন্যে আমাকে আদেশ দিয়াছেন। অতঃপর পিতাপুত্র মিলিয়া কা'বা ঘরের ভিত গাঁথিয়া উঁচু করিতে লাগিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-পাথর আনিয়া দিতে লাগিলেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ) ইমারত গাঁথিতে লাগিলেন। এক সময়ে কা'বার নির্মীয়মান দেওয়াল উঁচু হইয়া গেলে হযরত ইসমাঈল (আ) এই পাথরখানা আনিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পায়ের কাছে রাখিয়া দিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) উহার উপর দাঁড়াইয়া দেওয়াল গাঁথিতে লাগিলেন। কা'বা ঘর নির্মাণ করিতে করিতে পিতা-পুত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিতেছিলেন–'হে আমাদের প্রভু! আমাদের নিকট হইতে ইহা কবূল কর। নিশ্চয় তুমি সকল কথা শুনিয়া থাকো এবং সকল বিষয়ে অবগত রহিয়াছ।' তাঁহারা কা'বা ঘর নির্মাণ করিতেন এবং উহার চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উপরোক্ত দোয়া পেশ করিতেন।'

উক্ত রিওয়ায়েত উপরোক্ত রাবী আব্দুর রায্যাক হইতে উপরোক্ত সনদে আব্দ ইব্ন হামীদও বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার, ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম উহা উপরোক্ত রাবী আব্দুর রায্যাক হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আব্দুর রায্যাক হইতে আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন হাম্মাদ তাবরানীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি ইমাম ইব্ন জারীর উহা উপরোক্ত রাবী আব্দুর রায্যাক হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আব্দুর রায্যাক হইতে আহমদ ইব্ন ছাবিত রাযীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশের সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। কাছীর ইব্ন কাছীর হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল মালিক ইব্ন জুরায়জ, মুসলিম ইব্ন খালিদ যাঞ্জী, আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আযরাকী, বিশর ইব্ন মূসা, ইসমাঈল ইব্ন আলী ইব্ন ইসমাঈল ও ইমাম আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাছীর ইব্ন কাছীর বলেন ঃ একদা রাত্রিতে আমি, উসমান ইব্ন আবূ সুলায়মান ও আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ হুসাইন সহ একদল লোক সাঈদ ইব্ন জুবায়রের সঙ্গে মসজিদে ছিলাম। সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলিলেন–'আমি তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইবার পূর্বেই তোমরা প্রশ্ন করিয়া আমার নিকট হইতে জ্ঞানের বিষয় জানিয়া লও।' ইহাতে লোকেরা মাকামে ইবরাহীম সম্বন্ধে তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিল। তিনি তাহাদের নিকট হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে শ্রুত উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিলেন। (এইস্থলে ইমাম আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েতটি বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, কাছীর ইব্ন কাছীর, ইবরাহীম, ইব্ন নাফে', আবূ আমের আব্দুল মালিক ইব্ন আমর, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁহার অপর স্ত্রীর মধ্যে যা ঘটিয়াছিল, তাহা ঘটিবার পর তিনি ইসমাঈল ও তাঁহার মাতাকে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। তাহাদের সঙ্গে ছিল পানি ভর্তি একটি ছোট

পুরাতন মশক। পথে ইসমাঈলের মাতা মশক হইতে পানি পান করিতেন। উহার ফলে তাঁহার দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র ইসমাঈল পান করিবার জন্যে অধিক পরিমাণে দুধ পাইত। এইরূপে দীর্ঘ ভ্রমণের পর তাঁহারা মক্কায় পৌঁছিলেন। মক্কায় হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহাদিগকে একটি টিলার নীচে রাখিয়া গৃহের দিকে রওয়ানা হইলেন। ইসমাঈলের মাতা তাহাদিগকে এই অবস্থায় ফেলিয়া যাইবার কারণে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিছনে চলিলেন। কোদা (كداء) নামক স্থানে পৌঁছিবার পর তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পিছন হইতে ডাকিয়া বলিলেন—আপনি আমাদিগকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইতেছেন? হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন—'তোমাদিগকে আল্লাহ্র নিকট রাখিয়া যাইতেছি।' ইসমাঈলের মাতা বলিলেন—'আমি আল্লাহ্র আশ্রয়কে সন্তুষ্টি সহকারে গ্রহণ করিলাম।' এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

এইস্থানে থাকিয়া তিনি নিজে মশক হইতে পানি পান করিতে লাগিলেন এবং উহার ফলে শিশুপুত্র ইসমাঈল পান করিবার জন্যে অধিক পরিমাণে দুধ পাইতে লাগিল। এক সময়ে মশকের পানি ফুরাইয়া গেল। ইসমাঈলের মাতা ভাবিলেন— কোথাও কোন লোক দেখা যায় কিনা তজ্জন্য চেষ্টা করিয়া দেখি। তিনি সাফা পাহাড়ে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর নীচে নামিয়া তিনি দৌড়াইয়া মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছিলেন। এইরূপে সাতবার পাহাড়ে উঠা-নামা ও উপত্যকায় দৌড়াদৌড়ি করিলেন। কিন্তু কোথাও কোন লোক দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর ভাবিলেন—'কলিজার টুকরা শিশুটির অবস্থা একবার দেখিয়া আসি।' গিয়া দেখিলেন বাচ্চাটি মুমূর্ষ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। পুনরায় সাফা পাহাড়ে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কোন লোক দেখিতে পাইলেন না। এইরূপে পূর্বের ন্যায় সাতবার পাহাড়ে উঠা-নামা ও উপত্যকায় দৌড়াদৌড়ি করিলেন। কিন্তু, কোথাও কোন লোক দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর ভাবিলেন—'কলিজার টুকরা শিশুটিকে একবার দেখিয়া আসি।' এমন সময়ে একটি আওয়ায শুনিতে পাইলেন। আওয়াজ শুনিয়া বলিলেন—ওহে! কাহার আওয়ায শুনিতে পাইতেছি? তোমার নিকট পানি থাকিলে উহা দ্বারা আমাকে সাহায্য কর।' চাহিয়া দেখেন—তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) পায়ের পোড়ালি দ্বারা 'এইরূপ' করিলেন। এই বলিয়া রাবী শিষ্যকে বুঝাইবার জন্য নিজের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করিলেন। ইহাতে উক্ত স্থান হইতে পানি উৎসারিত হইয়া চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইসমাঈলের মাতা এই ঘটনা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি স্থানটিকে খুঁড়িতে লাগিলেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন—'ইসমাঈলের মাতা উক্ত স্থানটিকে উহার নিজ অবস্থায় থাকিতে দিলে নিশ্চয় উহার পানি উপচাইয়া চারিদিকে প্রবাহিত হইত।' যাহা হউক, ইসমাঈলের মাতা উক্ত পানি পান করিতে লাগিলেন এবং উহার ফলে তাঁহার দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র পান করিবার জন্য অধিক পরিমাণে দুধ পাইতে লাগিল।

একদা জুরহুম গোত্রের কতগুলি লোক মক্কার উপত্যকার নিম্নাংশ দিয়া পথ অতিক্রম করিবার কালে একটি পাখী দেখিতে পাইল। এই স্থানে পাখী দেখিতে পাওয়া ছিল তাহাদের নিকট অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তাহারা বলাবলি করিল—'নিশ্চয় এখানে কোথাও পানি রহিয়াছে।' অতঃপর তাহারা সন্ধান লইবার জন্য লোক পাঠাইল। সে আসিয়া পানি দেখিতে পাইয়া সঙ্গীদিগকে উহার সংবাদ জানাইল। তাহারা ইসমাঈলের মাতার নিকট আসিয়া বলিল—হে

ইসমাঈলের মাতা! আপনি কি আমাদিগকে এইস্থানে পানির নিকট আপনার সহিত বসবাস করিবার জন্য অনুমতি দিবেন? অতঃপর ইসমাঈল (মাতৃস্নেহে ও প্রতিবেশীদের আদরে) লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে শিশু ইসমাঈল কিশোর ইসমাঈলে এবং কিশোর ইসমাঈল যুবক ইসমাঈলে পরিণত হইলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর তিনি জুরহুম গোত্রীয় জনৈকা নারীকে বিবাহ করিলেন।

একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) সিদ্ধান্ত করিলেন, তিনি স্বীয় পরিজনকে দেখিতে আসিবেন। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে জানাইয়া মক্কায় আগমন করিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বাসস্থানে পৌঁছিয়া তিনি সালাম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–ইসমাঈল কোথায়? পুত্রবধূ বলিল–'তিনি শিকারে গিয়াছেন।' হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–'ইসমাঈল গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহাকে তাহার ঘরের দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করিয়া ফেলিতে বলিও।' হযরত ইসমাঈল (আ) গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার পর স্ত্রীর মুখে পিতার আদেশের কথা শুনিয়া বলিলেন–'তুমিই আমার ঘরের দরজার সেই চৌকাঠ। তুমি স্বীয় পরিজনের নিকট চলিয়া যাও।' পুনরায় একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) সিদ্ধান্ত করিলেন, তিনি ইসমাঈলকে দেখিতে আসিবেন। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে জানাইয়া মক্কায় আগমন করিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বাসস্থানে পৌঁছিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–ইসমাঈল কোথায়? পুত্রবধূ বলিলেন–'তিনি শিকারে গিয়াছেন। মেহেরবানী করিয়া অপেক্ষা করুন এবং খানাপিনা গ্রহণ করুন।' হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–তোমরা কি খাদ্য খাইয়া থাক এবং কি পানীয় পান করিয়া থাক? পুত্রবধূ বলিলেন–'আমরা গোশ্ত খাই এবং পানি পান করি।' হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–'হে আল্লাহ্! 'তুমি তাহাদের জন্যে তাহাদের খাদ্য ও পানীয়তে বরকত নাযিল কর।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন–'ইহা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার ফলে অবতীর্ণ বরকত।'

যাহা হউক, পুনরায় একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) সিদ্ধান্ত করিলেন, তিনি ইসমাঈলকে দেখিতে আসিবেন। স্বীয় স্ত্রীকে জানাইয়া তিনি মক্কায় আগমন করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি যমযম কূপের পশ্চাতে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সাক্ষাৎ পাইলেন। হযরত ইসমাঈল (আ) তখন একটি তীর সোজা করিতেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহাকে বলিলেন–হে ইসমাঈল! তোমার প্রভু আমাকে তাঁহার ইবাদতের জন্যে একটি ঘর নির্মাণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। হযরত ইসমাঈল (আ) বলিলেন–'পিতঃ! স্বীয় প্রভুর আদেশ পালন করুন।' হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–'আমার প্রভু আমার মাধ্যমে তোমাকে আমার কার্যে সাহায্য করিতে আদেশ করিয়াছেন।' হযরত ইসমাঈল (আ) বলিলেন–'আল্লাহ্ যেহেতু আদেশ দিয়াছেন, অতএব আমি আপনার কার্যে আপনাকে সাহায্য করিব।' রাবী বলেন–'অথবা হযরত ইসমাঈল (আ) অনুরূপ অন্য কিছু বলিলেন।' অতঃপর পিতা-পুত্র আল্লাহ্র ঘর নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ) পাথর আনিয়া দিতেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ) গাঁথুনি গাঁথিতেন। নির্মাণ কালে তাঁহারা বলিতেন–'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের নিকট হইতে আমাদের এই ইবাদতটুকু কবূল কর। নিশ্চয় তুমি সকল কথা শুনিয়া থাক এবং সকল বিষয়ে অবগত রহিয়াছ।' কা'বা ঘরের দেওয়াল গাঁথা হইতে হইতে উহা উঁচু হইয়া গেলে এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পক্ষে পাথর উঠাইয়া দেওয়াল গাঁথা কষ্টকর হইলে তিনি মাকামে ইবরাহীমে অবস্থিত পাথরখানার উপর দাঁড়াইলেন। এই অবস্থায় হযরত ইসমাঈল (আ) তাঁহার

হাতে পাথর তুলিয়া দিতেন এবং তিনি দেওয়াল গাঁথিতেন। দেওয়াল গাঁথিবার কাজ চলিবার কালে পিতা-পুত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিতেন ঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের নিকট হইতে আমাদের এই ইবাদতটুকু কবূল করো। নিশ্চয় তুমি সকল কথা শুনিয়া থাক এবং সকল বিষয়ে অবগত রহিয়াছ।'

ইমাম বুখারী উপরোক্ত রিওয়ায়েত উপরোক্ত দুই মাধ্যমে 'নবীগণ' অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েত হাফিজ আবূ আব্দুল্লাহ্ স্বীয় 'মুসতাদরাক' সংকলনে অন্যতম রাবী ইবরাহীম ইব্ন নাফে' হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ইবরাহীম ইব্ন নাফে' হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আলী উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মজীদ হানাফী মুহাম্মদ ইব্ন সিনান আল কাযযায ও আবুল আব্বাস আসিমের অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—'উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে টিকে, কিন্তু তাঁহারা উহা বর্ণনা করেন নাই।'

হাকিমের উপরোক্ত মন্তব্য বিস্ময়কর বটে। কারণ, ইমাম বুখারী উহা উপরোক্ত রাবী ইবরাহীম ইব্ন নাফে'র মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েতের সনদে উহা স্পষ্ট। উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েত কিছুটা সংক্ষেপ। কারণ, উহাতে যবেহের কথা উল্লেখিত হয় নাই। সহীহ রিওয়ায়েতে ইহাও বর্ণিত রহিয়াছে যে, 'হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পরিবর্তে যে দুম্বাটি যবেহ করিয়াছিলেন, উহার শিং দুইটি কা'বা ঘরে লটকানো ছিল।' আবার ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, 'হযরত ইবরাহীম (আ) বোরাকে চড়িয়া বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে মক্কায় দ্রুতগতিতে আসা যাওয়া করিতেন।' আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

এইস্থলে আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য। উহা এই যে, উপরে বর্ণিত রিওয়ায়েতটির কোন কোন অংশ স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে বর্ণিত। এইরূপ স্থানসমূহে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন' এই কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত আলী (রা) হইতেও উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহার কোন কোন অংশ উপরোক্ত রিওয়ায়েতে বর্ণিত বিষয়ের বিরোধী। নিম্নে হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়েতটি উল্লেখিত হইতেছে।

হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছা ইব্ন মাযহাব, আবূ ইসহাক, সুফিয়ান, মুআম্মার, মুহাম্মদ ইব্ন বিশার এবং মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আলী (রা) বলেন—আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কা'বা ঘর নির্মাণ করিতে আদেশ দিলে তিনি হযরত হাজেরা (রা) এবং ইসমাঈলকে লইয়া মক্কায় আগমন করিলেন। এখানে আসিয়া দেখিলেন, কা'বা ঘরের স্থানের সোজা উপরের আকাশে মেঘের ন্যায় একটি জিনিস রহিয়াছে। উহার মধ্যে মানুষের মাথার ন্যায় একটি বস্তু রহিয়াছে। বস্তুটি তাঁহাকে বলিল—হে ইবরাহীম! আমার ছায়ার সমান অথবা বলিল, আমার সমান স্থান জুড়িয়া একটি ঘর বানাও। দেখিও ঘরটির স্থান যেন উহা অপেক্ষা বড় বা ছোট না হয়। আদেশ মতে হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র ঘর নির্মাণ করিয়া ইসমাঈল ও হযরত হাজেরা (রা)-কে মক্কায় রাখিয়া বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলেন। হযরত হাজেরা (রা) বলিলেন—হে ইবরাহীম! আমাদিগকে কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া যাইতেছ? হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন—তোমাদিগকে

আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে রাখিয়া যাইতেছি। ইহাতে হযরত হাজেরা (রা) বলিলেন-'তবে তুমি চলিয়া যাও। আল্লাহ্‌ আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন না।' এক সময়ে ইসমাঈল তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িল। হযরত হাজেরা (রা) সাফা পাহাড়ে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও কিছু (অর্থাৎ পানি বা মানুষ) দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি মারওয়া পাহাড়ে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর পুনরায় সাফা পাহাড়ে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। তিনি এইরূপে সাতবার প্রত্যেক পাহাড়ে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইলেন। অতঃপর (মনের দুঃখে) বলিলেন-'হে ইসমাঈল! আমার অসাক্ষাতে মরিয়া যা।' অতঃপর তিনি ইসমাঈলের কাছে আসিলেন। দেখিলেন, তাঁহার শিশু পুত্র তৃষ্ণায় মাটিতে পা ছুঁড়িয়া মারিতেছে। এই সময়ে হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন-তুমি কে? হযরত হাজেরা (রা) বলিলেন-এই শিশুটি ইবরাহীমের পুত্র। আমি তাহার মাতা হাজেরা। হযরত জিবরাইল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন-ইবরাহীম তোমাদিগকে কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া গিয়াছেন? হযরত হাজেরা (রা) বলিলেন-'তিনি আমাদিগকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে রাখিয়া গিয়াছেন।' হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন-'তিনি তোমাদিগকে যে সত্তার আশ্রয়ে রাখিয়া গিয়াছেন, সে সত্তা তোমাদের জন্যে যথেষ্ট।' এই বলিয়া তিনি নিজের আঙ্গুল দ্বারা এক স্থানের মাটি খুঁড়িলেন। ইহাতে উক্ত স্থান হইতে পানি উৎসারিত হইল। উহাই আজিকার যম্‌যম্‌ কূপ। হযরত হাজেরা (রা) পানি আটকাইয়া রাখিতে লাগিলেন। হযরত জিব্রাঈল (আ) বলিলেন-পানির গতি রুদ্ধ করিও না। এইস্থলে তুমি অনেক বেশী পরিমাণে পানি পাইবে।

উপরোক্ত রিওয়ায়েত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল ও তাঁহার মাতা হাজেরাকে মক্কায় রাখিয়া যাইবার পূর্বে কা'বা ঘর নির্মাণ করিয়াছেন। উভয় রিওয়ায়েতের বক্তব্যের মধ্যে এইরূপে সামঞ্জস্য বিধান করা যাইতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) দুইবার কা'বা ঘর নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রথমবার তিনি একাকী কা'বা ঘরের স্থানে শুধু মাটির সহিত মিলিত একটি ঘেরাও নির্মাণ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ) বড় হইবার পর পিতা-পুত্র উভয়ে মিলিয়া কা'বা ঘরের যে নির্মাণের কথা উল্লেখিত রহিয়াছে, উহা ছিল উহার দ্বিতীয়বারের নির্মাণ।

খালিদ ইব্‌ন আরআরা হইতে ধারাবাহিকভাবে সিমাক, আবুল আহওয়াস, হিন্দ ইব্‌ন সারী ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, খালিদ ইব্‌ন আরআরা বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-কে বলিল-আপনি আমার নিকট কা'বা ঘর নির্মাণের ইতিহাস বর্ণনা করুন। উহা কি পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম ঘর? হযরত আলী (রা) বলিলেন-না; তবে উহা পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম বরকতময় ঘর। উহাতে মাকামে ইবরাহীম রহিয়াছে। উহাতে কেহ প্রবেশ করিলে নিরাপদ হইয়া যায়। উহার নির্মাণ ইতিহাস এই ঃ একদা আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে আদেশ দিলেন-তুমি আমার জন্য পৃথিবীতে একখানা ঘর বানাও। হযরত ইবরাহীম (আ) ইহাতে চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 'সাকীনাহ (সান্ত্বনা)' পাঠাইলেন। উহা ছিল দ্রুতগামী বায়ু। উহার ছিল দুইটি মস্তক। উহাদের একটি অপরটিকে অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল। এইরূপে বায়ুটি মক্কায় পৌঁছিল। অতঃপর উহা কা'বা ঘরের স্থানের উপর ঢালের ন্যায় কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিতে লাগিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা পূর্বেই হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, সাকীনাহ্‌

যে স্থানে গিয়া থামিবে, তুমি সেই স্থানে আমার ঘর নির্মাণ করিবে। হযরত ইবরাহীম (আ) উক্ত স্থানে আল্লাহ্র ঘর নির্মাণ করিতে লাগিলেন। নির্মাণ কার্যের এক পর্যায়ে হযরত ইসমাঈল (আ) পাথর আনিতে রওয়ানা হইলে হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহাকে নির্দিষ্ট ধরনের একখানা পাথর আনিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি উহা লইয়া আসিয়া দেখিলেন-হযরত ইবরাহীম (আ) হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর)-কে উহার স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-পিতঃ! আপনাকে এই পাথরখানা কে আনিয়া দিল? হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন-'যিনি তোমার নির্মাণ করিবার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকেন না, তিনিই আমাকে ইহা আনিয়া দিয়াছেন। হযরত জিবরাঈল (আ) আসমান হইতে উহা আমাকে আনিয়া দিয়াছেন।' অতঃপর পিতা-পুত্র আল্লাহ্র ঘরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করিলেন।

কা'ব আহবার হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব, বিশ্র ইব্ন আসিম, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল মাকারী ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'কা'ব আহ্বার বলেন-'কা'বা ঘর যে স্থানে অবস্থিত, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করিবার চল্লিশ বৎসর পূর্বে সেই স্থানে পানির উপর ফেনা মিশ্রিত আবর্জনা ছিল। উক্ত স্থান হইতেই পৃথিবীকে চতুর্দিকে বিস্তৃত করা হইয়াছে। সাঈদ (ইব্ন মুসাইয়্যেব) আরও বলেন-একদা হযরত আলী (রা) আমার নিকট বর্ণনা করিলেন ঃ (কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার আদেশ পাইয়া) হযরত ইবরাহীম (আ) আরমেনিয়া হইতে মক্কার দিকে আগমন করিলেন। তখন তাহার সঙ্গে ছিল 'সাকীনাহ' (সান্ত্বনা)। উহা তাঁহাকে মাকড়সার ঘর নির্মাণ করিবার পদ্ধতিতে ঘর নির্মাণ করা শিক্ষা দিতেছিল। উহা মক্কায় আসিয়া নিজের মধ্য হইতে এইরূপ কতগুলি পাথর বাহির করিল যাহার একটিকে উঠাইতেই চল্লিশজন লোক লাগিত।

অতঃপর সাঈদ (ইব্ন মুসাইয়্যেব) বলেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে বলিলাম-হে আবূ মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তা'আলা যে বলিতেছেন ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ (আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ গাঁথিয়া উঁচু করিতেছিল।) অর্থাৎ উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার কার্যে ব্যবহৃত পাথরসমূহ হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-ও তুলিতে পারিতেন। হযরত আলী (রা) বলেন-উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত ঘটনা পরে ঘটিয়াছিল।

সুদ্দী বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-কে আদেশ দিলেন, 'তোমরা তাওয়াফকারীদের জন্যে, ই'তেকাফকারীদের জন্যে এবং রুকূ'কারী ও সিজদাকারীদের জন্যে 'আমার ঘরটি' নির্মাণ কর। আদেশ পাইয়া হযরত ইবরাহীম (আ) মক্কায় আগমন করিলেন। পিতা-পুত্র কোদাল ধরিলেন; কিন্তু, তাঁহারা আল্লাহ্র ঘর কোথায় অবস্থিত তাহা জানিতেন না। এই সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা দ্রুতগামী একটি বাতাস পাঠাইলেন। উহার দুইটি ডানা এবং সাপের মাথার ন্যায় একটি মাথা ছিল। উহা কা'বা ঘরের প্রথম বুনিয়াদের উপর হইতে মাটি সরাইয়া দিয়া উহাকে দৃশ্যমান করিয়া দিল। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) কোদাল দ্বারা খুঁড়িয়া উক্ত স্থান পরিষ্কার করত পুনরায় উহা নির্মাণ করিলেন। নিম্নোক্ত আয়াতাংশদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপরোক্ত কার্যকেই বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ـ

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَاِذْ بَوَّانَا لِاِبْرٰهِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ (আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন আমি কা'বা ঘরের অঞ্চলকে ইবরাহীমের জন্যে আবাস-স্থল বানাইয়াছিলাম।)

কা'বা ঘরের ভিত্তি নির্মাণ করিতে করিতে তাঁহারা 'রুকন' (কা'বা ঘরের অংশবিশেষ) পর্যন্ত পৌঁছিলে হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-কে বলিলেন–বৎস! একখানা সুন্দর পাথর আনো, উহা এই স্থানে বসাইব। হযরত ইসমাঈল (আ) বলিলেন–'আব্বা! আমি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।'

হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–'তৎসত্ত্বেও যাও।' হযরত ইসমাঈল (আ) পাথরের সন্ধানে গেলেন। এদিকে হযরত জিব্রাঈল (আ) হিন্দুস্তান হইতে 'হাজরে আস্ওয়াদ' খানা (কালো পাথর) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট লইয়া আসিলেন। উক্ত পাথরখানা ইয়াকূত জাতীয় একখানা পাথর। হযরত আদম (আ) উহা বেহেশত হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। প্রথমে উহা ছিগামা'র (الثغامة। এক প্রকারের সাদা ফুল) ন্যায় সাদা ছিল। মানুষের পাপের কারণে উহা ক্রমশ কালো হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, হযরত ইসমাঈল (আ) একখানা পাথর লইয়া আসিলেন। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পার্শ্বে উক্ত কালো পাথরখানা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–আব্বা! আপনার নিকট এই পাথরখানা কে আনিয়াছে? হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–'উহাকে তোমার অপেক্ষা অধিকতর কর্মতৎপর এক ব্যক্তি আনিয়াছে।' যাহা হউক, আল্লাহ্ তা'আলা যে বাক্যগুলি দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার কালে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) উহাদের সাহায্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিতেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিতেছিলেন ঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ـ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

উপরোক্ত রিওয়ায়েত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘর নির্মাণ করিবার পূর্বেই উহার ভিত্তিসমূহ নির্মিত হইয়াছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) উক্ত ভিত্তি পুনঃনির্মিত করিতে গিয়া উহার উপর দেয়াল নির্মাণ করিয়াছিলেন। একদল ইতিহাসকার উপরোক্তরূপ বর্ণনাকেই সঠিক মনে করেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আইউব, মুআম্মার ও ইমাম আবদুর রায্‌যাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন–হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বেই কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ নির্মিত হইয়াছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) উহা পুনঃনির্মিত করিয়াছিলেন মাত্র। উক্ত আয়াতাংশে তাঁহার পুনঃনির্মাণ করিবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

আতা ইব্ন আবূ রুবাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আতার আত্মীয়-সাউওয়ার, হিশাম ইব্ন হাস্সান ও ইমাম আবদুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, আতা ইব্ন আবূ রুবাহ্ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে যখন বেহেশত হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া দেন, তখন তাঁহার পা দুইখানা ছিল পৃথিবীর বুকে এবং মাথাটি ছিল আকাশে। এই অবস্থায় তিনি আকাশের অধিবাসীদের কথাবার্তা এবং দোয়াসমূহ শুনিতেন। তিনি তাহাদের সহিত মেলামেশা করিয়া শান্তি লাভ করিতেন। ইহাতে ফেরেশেতাগণ আশংকিত হইয়া দোয়া ও নামাযে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হযরত আদম (আ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীতে নামাইয়া দিলেন। ফেরেশতাদের সংশ্রব হইতে বঞ্চিত হইয়া হযরত আদম (আ) একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতার কারণে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগিতে লাগিলেন। তিনি দোয়ায় ও নামাযে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজের যন্ত্রণার কথা জানাইলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে মক্কায় আগমন করিতে আদেশ করিলেন। তিনি মক্কার পথে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে তিনি যে যে স্থানে পা রাখিলেন, সেই সেই স্থানে বাসোপযোগী হইয়া গেল এবং তাঁহার দুই পা ফেলিবার স্থানের মধ্যবর্তী স্থান মরুভূমি হইয়া গেল। এইরূপে তিনি মক্কায় পৌঁছিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিকট বেহেশত হইতে একখানা ইয়াকূত পাথর অবতীর্ণ করেন। উহা বর্তমান কা'বা ঘরের স্থানে স্থাপিত ছিল। তিনি উহা তাওয়াফ করিতেন। হযরত নূহ (আ)-এর যুগের মহাপ্লাবনে পাথরখানা উক্ত স্থান হইতে অপসারিত হয়। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) উক্ত পাথরটির স্থানে কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। নিম্নোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মিত হইবার সেই ঘটনারই বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَاِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ـ

আতা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ ও ইমাম আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আদম (আ) আল্লাহ্ তা'আলাকে বলিলেন—'আমি ফেরেশতাদের আওয়াজ শুনিতে পাই না।' আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন—'তুমি তোমার গুনাহের কারণে তাহাদের আওয়াজ শুনিতে পাও না। তুমি পৃথিবীতে নামিয়া গিয়া সেখানে আমার ইবাদতের জন্যে একখানা ঘর বানাও এবং ফেরেশতাদিগকে যেরূপে আকাশে অবস্থিত আমার ঘরকে তাওয়াফ করিতে দেখিয়াছ, সেইরূপে উহাকে তাওয়াফ কর।' কথিত আছে, হযরত আদম (আ) কা'বা ঘরকে পাঁচটি পাহাড়ের পাথর দ্বারা নির্মাণ করিয়াছিলেন—হেরা পাহাড়, যায়তা পাহাড়, সিনাই পাহাড় এবং জুদী পাহাড়।[১] তবে উহার ভিত্তি হেরা পাহাড়ের পাথর দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। কা'বা ঘর হযরত আদম (আ) কর্তৃক নির্মিত হইবার পর হযরত ইবরাহীম (আ) উহাকে পুনরায় নির্মাণ করিয়াছিলেন।

উক্ত রিওয়ায়েতটি সহীহ সনদে আতা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহার কোন কোন অংশ অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও ইমাম আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর যুগে কা'বা ঘর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে বেহেশত হইতে হিন্দুস্তানে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পা দুইটি পৃথিবীর বুকে এবং মাথাটি আসমানে ছিল। এই অবস্থায় ফেরেশতাগণ

১. রিওয়ায়েতে পাহাড়ের সংখ্যা পাঁচটি বলিয়া উল্লেখিত হইলেও চারটি পাহাড়ের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। তবে ইতিপূর্বে বর্ণিত এ রিওয়ায়েতে পাঁচটি পাহাড়ের নাম রহিয়াছে।

তাঁহাকে ভয় করিত। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দেহের দৈর্ঘ কমাইয়া উহা ষাট হাত করিয়া দিলেন। উহার ফলে হযরত আদম (আ) ফেরেশতাদের আওয়াজ ও তাসবীহ্ শ্রবণ করা হইতে বঞ্চিত হইয়া গেলেন। তাই তিনি চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এই অস্বস্তি দূর করিবার জন্যে দোয়া করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বলিলেন-হে আদম! আমি তোমার জন্যে পৃথিবীতে একটি ঘর নাযিল করিয়াছি। যেরূপে আমার আরশের চতুষ্পার্শ্বে তাওয়াফ করা হয়, সেইরূপে তুমি উক্ত ঘর তাওয়াফ করিবে এবং যেরূপে আমার আরশের নিকট নামায আদায় করা হয়, সেইরূপে তুমি উক্ত ঘরের নিকট নামায আদায় করিবে। আদেশ পাইয়া হযরত আদম (আ) কা'বা ঘরের দিকে রওয়ানা হইলেন। পথ অতিক্রম করিবার কালে তিনি দীর্ঘ ব্যবধানে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুইটি পদক্ষেপে মধ্যবর্তী স্থানসমূহ মরুভূমি হইয়া গেল। পরবর্তীকালে উক্ত স্থানসমূহ মরুভূমিই রহিয়া গেল। যাহা হউক, হযরত আদম (আ) কা'বা ঘরে পৌঁছিয়া উহা তাওয়াফ করিলেন। অন্য নবীগণও উহা তাওয়াফ করিয়াছেন।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, হাফ্‌স ইব্‌ন হামীদ, ইয়াকূব, উম্মী ইব্‌ন হামীদ ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'পৃথিবী সৃষ্টির দুই হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা পানির চারিটি স্তম্ভের উপর কা'বা ঘরকে নির্মিত করিয়াছিলেন। এইরূপে কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা এক সময়ে উহার নিম্নে পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়া দেন।'

মুজাহিদ প্রমুখ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নাজীহ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা ঘরের অঞ্চলকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে আবাস ভূমি হিসাবে নির্ধারিত করিবার পর হযরত ইবরাহীম (আ) সিরিয়া হইতে স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র ইসমাঈলকে সঙ্গে লইয়া বুরাকের পিঠে চড়িয়া হযরত জিবরাঈল (আ)-এর পথ নির্দেশনায় মক্কার পথে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে কোন জনপদ দেখিলেই তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিতেন-হে জিবরাঈল! আমাকে কি আল্লাহ্ তা'আলা এইস্থানে আসিতে আদেশ করিয়াছেন? হযরত জিবরাঈল (আ) বলিতেন-'আরও পথ যাইতে হইবে।' মক্কায় পৌঁছিবার পর তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন-আল্লাহ্ তা'আলা কি এইস্থানে ইহাদিগকে রাখিয়া যাইবার জন্যে আমাকে আদেশ করিয়াছেন? হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন-হ্যাঁ। এইস্থানেই রাখিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। সে সময়ে মক্কা ছিল বাবুল ইত্যাদি কাঁটা গাছে পরিপূর্ণ জঙ্গলময় একটি স্থান। দূরে আমালীক (عماليق) নামক একটি সম্প্রদায় বাস করিত। কা'বা ঘরের স্থানটি ছিল একটি লাল টিলা। হযরত ইবরাহীম (আ) ইসমাঈলসহ হাজেরা (রা)-কে হাজরে আসওয়াদ-এর স্থানে রাখিয়া তাহাকে উক্ত স্থানে একখানা ঝুপড়ি বানাইয়া লইতে বলিলেন। এই সময়ে তিনি আল্লাহ্‌র নিকট এই দোয়া করিলেন ঃ

رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ - رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ - وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ -

'হে আমাদের প্রভু! আমি আমার বংশধরদের একটি অংশকে তোমার ঘরের নিকট শস্যহীন একটি উপত্যকায় বাস করিবার জন্যে এই উদ্দেশ্যে বসাইয়াছি যে, লোকে নামায আদায় করিবে। অতএব তুমি কিছু সংখ্যক লোকের অন্তরকে তাহাদের দিকে আকৃষ্ট করিয়া আন আর তাহাদিগকে ফলসমূহ হইতে রিযিক দান কর। আশা করা যায়, তাহারা শোকর গুযারী করিবে।'

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে হামীদ, হিশাম ইব্ন হাস্সান ও ইমাম আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন বস্তু সৃষ্টি করিবার দুই হাজার বৎসর পূর্বে কা'বা ঘরের স্থানটি সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার ভিত্তিসমূহ পৃথিবীর সপ্তম স্তরে প্রোথিত রহিয়াছে।

তেমনি মুজাহিদ হইতে লায়ছ ইব্ন আবূ সালীম বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুজাহিদ বলেন ঃ কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ পৃথিবীর সপ্তম স্তর পর্যন্ত প্রোথিত রহিয়াছে।

উলিয়া ইব্ন আহমার হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল মুমিন ইব্ন খালিদ, আব্দুল ওহাব ইব্ন মুআবিয়া, আমর ইব্ন রাফে', ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা যুল-কারনাইন বাদশাহ মক্কায় আসিয়া হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-কে পাঁচটি পাহাড় হইতে পাথর আনিয়া কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ নির্মাণ করিতে দেখিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কাহার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া আমার রাজ্যে ঘর নির্মাণ করিতেছ? হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন—আমরা এই ঘর নির্মাণ করিবার জন্যে আল্লাহ্র তরফ হইতে আদিষ্ট দুই বান্দা। যুল-কারনাইন বলিলেন—নিজেদের দাবীর পক্ষে প্রমাণ উপস্থিত কর। ইহাতে পাঁচটি দুম্বার জবান খুলিয়া গেল। উহার বলিল—'আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, ইবরাহীম ও ইসমাঈল এই ঘর নির্মাণ করিবার জন্যে আল্লাহ্র তরফ হইতে আদেশপ্রাপ্ত দুই বান্দা। যুল-কারনাইন বলিলেন—'আমি এই প্রমাণে সন্তুষ্ট হইলাম।' এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আযরাকী স্বীয় 'মক্কার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'যুল-কারনাইন বাদশাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত কা'বা ঘর তাওয়াফ করিয়াছিলেন।' উক্ত রিওয়ায়েতদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যুল-কারনাইন বাদশাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ـ

القواعد শব্দটি القا عدة শব্দের বহুবচন। القاعدة অর্থ বুনিয়াদ, ভিত্তি المرأة القاعدة অর্থাৎ যে নারীর স্বামী হারাইয়া গিয়াছে, বৃদ্ধা নারী। উক্ত অর্থেও القاعدة শব্দের বহুবচন القواعد।

অতঃপর ইমাম বুখারী বলেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিক সূত্রে আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা), সালিম ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন শিহাব, মালিক ও ইসমাঈলের মাধ্যমে আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন—তুমি কি জান না, তোমার কওম কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিবার কালে হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক স্থাপিত ভিত্তিসমূহ দ্বারা নির্ধারিত স্থানের কিয়দংশ উহার বাহিরে রাখিয়াছে? আমি আরয করিলাম—হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি উহা হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক স্থাপিত ভিত্তিসমূহের উপর

পুনর্নির্মিত করিবেন না? নবী করীম (সা) বলিলেন–তোমার কওম মাত্র অল্প দিন পূর্বে কুফর ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের ইসলাম গ্রহণের বয়স স্বল্প না হইয়া দীর্ঘ হইলে আমি তাহাই করিতাম। রাবী সালিম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) উক্ত হাদীসটি শুনিয়া বলিলেন–সম্ভবত এই কারণেই দেখা গিয়াছে যে, নবী করীম (সা) কা'বা ঘর তাওয়াফ করিবার কালে হাজরে আসওয়াদের নিকটে অবস্থিত খুঁটি দুইটি স্পর্শ করেন নাই। অর্থাৎ নবী করীম (সা) উক্ত খুঁটি দুইটি হইতে দূরে মূল কা'বা ঘরের সীমানার বাহিরে থাকিয়া তাওয়াফ করিয়াছেন।

উপরোক্ত হাদীস ইমাম বুখারী আবার 'হজ্জ অধ্যায়ে' উক্ত রাবী মালিক হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং মালিক হইতে কা'নাবীর ভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। পুনরায় তিনি উহা 'নবীগণ অধ্যায়ে' উপরোক্ত রাবী মালিক হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং মালিক হইতে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফের ভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত রাবী মালিক হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং মালিক হইতে ইব্‌ন ওহাব প্রমুখের ভিন্নরূপ অধস্তন সনাদংশেও বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম নাসাঈ উহা উপরোক্ত রাবী মালিক হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং মালিক হইতে আব্দুর রহমান ইব্‌ন কাসিম প্রমুখের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

'হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)[১], হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) ও রাফে' প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন–তোমার কওম যদি সদ্য কুফরত্যাগী না হইত, তবে আমি নিশ্চয় কা'বা ঘরের ধন সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে দান করিয়া দিতাম; উহার দরজা নীচু করিয়া চত্বর সংলগ্ন করিয়া দিতাম এবং হাতিমকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিতাম।'

আসওয়াদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা ইব্‌ন জুবায়র আমাকে বলিলেন, হযরত আয়েশা (রা) তোমার নিকট অনেক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি কা'বা ঘর সম্বন্ধে কি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন? আমি বলিলাম–তিনি কা'বা ঘর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন–একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন–'হে আয়েশা! তোমার কওম (অর্থাৎ কুরায়শ) যদি সদ্য কুফরত্যাগী না হইত, তবে আমি নিশ্চয় কা'বা ঘরকে ভাঙ্গিয়া উহাতে দুইটি দরজা নির্মাণ করিতাম। একটি দরজা দিয়া লোকে উহাতে প্রবেশ করিত এবং আরেকটি দরজা দিয়া তাহারা উহা হইতে বাহির হইত।' পরবর্তীকালে ইব্‌ন জুবায়র কা'বা ঘরকে উপরোক্তরূপে নির্মাণও করিয়াছিলেন।

---

১. প্রকৃতপক্ষে 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর নহে; বরং আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর হইতেছেন রিওয়ায়েতটির রাবী। ইমাম মুসলিম কর্তৃক অন্যত্র বর্ণিত রিওয়ায়েতে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরই উল্লেখিত হইয়াছে। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর তাঁহার পিতার খিলাফতের আমলেই ইন্তিকাল করেন।

উপরোক্ত রিওয়ায়েত শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই। ইমাম বুখারী উহা 'ইলম অধ্যায়ে' বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্ন উরওয়া, আবূ মুআবিয়া, ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়াহিয়া ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন-তোমার কওম সদ্য কুফরত্যাগী না হইলে আমি নিশ্চয় কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া উহা হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক স্থাপিত ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করিতাম। কারণ, কুরায়শ গোত্র উহা পুনঃনির্মিত করিবার কালে উহার মূল ভিত্তির আওতার অন্তর্ভুক্ত স্থানের কিয়দংশ উহার বাহিরে রহিয়াছে। আর আমি উহাতে একটি পশ্চাদ-দ্বার নির্মাণ করিতাম।

উপরোক্ত রিওয়ায়েত ইমাম মুসলিম আবার হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্ন উরওয়া, ইব্ন নুমায়র, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা এবং আবূ কুরায়বের সনদেও বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েত শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী উহা বর্ণনা করেন নাই।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্লাহ ইব্ন জুবায়র, সাঈদ ইব্ন মায়না, সালীম ইব্ন হাইয়ান, মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন-হে আয়েশা! তোমার কওম যদি সদ্য শিরক ত্যাগী না হইত, তবে আমি নিশ্চয় কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া উহা চত্বরের সহিত সমতল করিয়া পুনঃনির্মাণ করিতাম, উহার পূর্বে দিকে একটি দরজা এবং পশ্চিম দিকে একটি দরজা নির্মাণ করিতাম এবং ছয় হাত পরিমিত 'হাতীম' উহার অন্তর্ভুক্ত করিতাম। কারণ, কুরায়শ উহা পুনঃর্নিমিত করিবার কালে উহার মূল ভিত্তির আওতার অন্তর্ভুক্ত স্থানের কিয়দংশ উহার বাহিরে রাখিয়াছে।

উক্ত রিওয়ায়েতটিও শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী উহা বর্ণনা করেন নাই।

কুরায়েশ কর্তৃক কা'বা ঘরের পুনর্নির্মিত হওয়ার ঘটনা

হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মিত হইবার হাজার-হাজার বৎসর পর নবী করীম (সা)-এর নবূওত লাভ করিবার পাঁচ বৎসর পূর্বে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিয়াছিল। উক্ত পুনঃনির্মাণ কার্যে নবী করীম (সা)-ও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বৎসর। তিনি লোকদের সহিত কাঁধে করিয়া পাথর বহিয়া আনিতেন। তাঁহার উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র তরফ হইতে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হইতে থাকুক।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার স্বীয় 'সীরাত' পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বৎসর, তখন কুরায়শ গোত্রের লোকেরা কা'বা ঘরকে পুনর্নির্মিত করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হইল। তখন কা'বা ঘরে ছাদ ছিল না। উহা তখন মাত্র প্রস্তর নির্মিত ভিত্তি ও দেওয়ালের সমষ্টি ছিল। কুরায়শগণ চাহিয়াছিল, তাহারা উহা ভাঙ্গিয়া ছাদ বিশিষ্ট করিয়া উহা পুনঃনির্মিত করিবে। কিন্তু তাহারা উহা ভাঙ্গিতে ভয় পাইত। ইতিমধ্যে একটি

ঘটনা ঘটিয়া গিয়া কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বাড়াইয়া দিয়াছিল। কা'বা ঘরের ধনরাজি উহার মধ্যে অবস্থিত একটি কূপে রক্ষিত থাকিত। একদা উহা চুরি হইয়া গেল। অবশ্য دويبك (দুবায়েক) নামক একটি লোকের নিকট উহা প্রাপ্ত হওয়ায় উহা উদ্ধার করাও হইল। দুবায়েক ছিল খুযাআহ (خزاعة) গোত্রের বনী মালীহ ইব্ন আমর নামক একটি শাখার লোকদের গোলাম। কুরায়শরা বিচারের মাধ্যমে তাহার হাত কাটিয়াছিল। কথিত আছে, কা'বা ঘরের ধনরাজির প্রকৃত চোর দুবায়েক ছিল না; বরং প্রকৃত চোরেরা তাহার নিকট উহা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। যাহা হউক, উক্ত চুরির ঘটনা কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বাড়াইয়া দিল। ইতিমধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল। তাহা এই ঃ

কা'বা ঘরের মধ্যে অবস্থিত কূপে একটি ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ বাস করিত। লোকেরা সাপটির জন্যে প্রতিদিন কূপের মধ্যে খাদ্য নিক্ষেপ করিত। উহা প্রতিদিন কা'বার দেওয়ালের উপর আসিত। একদিন একটি বড় পাখী আসিয়া সাপটিকে কা'বার দেওয়াল হইতে ধরিয়া লইয়া গেল। এই ঘটনা কা'বা ঘর ভাঙ্গিবার বিষয়ে কুরায়শের মনে দুই দিক দিয়া সাহস আনিয়া দিল। সাপটি ছিল স্বভাবতই ভয়ঙ্কর ও ভীতিকর। কেহ উহার নিকটে গেলে উহা ফনা তুলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইত। সাপটিকে পাখীতে ধরিয়া লইয়া যাইবার পর উহার আক্রমণের ভয় দূর হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত কুরায়শগণ সাপটির অপসারণকে তাহাদের কার্যের প্রতি আল্লাহ্র সন্তোষ ও অনুমোদনের লক্ষণ মনে করিল। তাহারা মনে করিল, কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ সম্পর্কিত তাহাদের পরিকল্পনার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি রহিয়াছে। এই কারণেই তিনি সাপটিকে দূর করিয়া দিয়া তাহাদের কার্যকে সহজ করিয়া দিয়াছেন।

ইতিমধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। উহা কুরায়শের জন্যে তাহাদের পরিকল্পনার বাস্তবায়নকে আরও সহজ করিয়া দিল। একদা জনৈক রোমক বণিকের একখানা সামুদ্রিক নৌকার ভগ্নাবশেষ জেদ্দায় আসিয়া ঠেকিল। উহার মজবুত তক্তাগুলি কা'বা ঘরের ছাদ নির্মাণের জন্যে বিশেষ উপযোগী ছিল। মক্কায় তখন জনৈক অভিজ্ঞ কিবতী সুতার বাস করিত। তাহার গৃহ নির্মাণ বিদ্যা কুরায়শের পরিকল্পনার বাস্তবায়নের পক্ষে অনুকূল ও সহায়ক ছিল।

উপরোক্ত আনুকূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে কুরায়শের লোকগণ কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিবার কার্যে হাত দিল। সর্বপ্রথম ইব্ন ওহাব[১] ইব্ন আমর ইব্ন আয়েয ইব্ন আবদ ইব্ন ইমরান ইব্ন মাখযুম নামক জনৈক ব্যক্তি কা'বা ঘরের একখানা পাথর স্থানচ্যুত করিয়া হাতে উঠাইল। সঙ্গে সঙ্গে উহা তাহার হাত হইতে পূর্বস্থানে পড়িয়া গেল। ইহাতে তিনি বলিলেন–হে কুরায়শগণ! তোমাদের কেহ যেন এই ঘর নির্মাণ করিবার কার্যে ব্যভিচারলব্ধ অর্থ, সুদলব্ধ অর্থ ও অত্যাচারলব্ধ অর্থ দান না করে। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ একদল ইতিহাসকার বলেন–ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন মাখযুম উপরোক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, কুরায়শরা পূর্বেই কা'বা ঘর ভাঙ্গিবার কার্যকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া কুরায়শের একেকটি শাখা বা একাধিক শাখার উপর একেকটি অংশ ভাঙ্গিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিল। কা'বা ঘরের দরজা ভাঙ্গিবার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল বনু আব্দে মানাফ এবং যুহরা উপগোত্রের উপর। রুকনে আসওয়াদ (হাজরে আসওয়াদ) এবং রুকনে ইয়ামানীর

১. কোন কোন সংস্করণে এই স্থানে ইব্ন ওহাব এর পরিবর্তে 'আবূ ওহাব' লিখিত রহিয়াছে। উহার টীকায় লিখিত রহিয়াছে–'ইনি নবী করীম (সা)-এর পিতা আব্দুল্লাহর মাতুল ছিলেন। ইনি একজন শরীফ ও সৎ-স্বভাব বিশিষ্ট লোক ছিলেন।'

মধ্যবর্তী স্থান ভাঙ্গিবার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল বনু মাখযুমসহ কয়েকটি উপগোত্রের উপর। কা'বার পশ্চাতের অংশ ভাঙ্গিবার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল বনূ জুমহ এবং বনূ সাহমের উপর। 'হাতীম' ভাঙ্গিবার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল বনু আবদি দার ইব্ন কুসাই, বনু আসাদ ইব্ন আব্দুল উয্যা ইব্ন কুসাই এবং বানূ আদী ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআর উপর। প্রথম ভঙ্গকারী ইব্ন ওহাব-এর হাত হইতে পাথর ফসকাইয়া পড়িবার কারণে লোকদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহারা ভাঙ্গিবার কার্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস পাইল না। এই সময়ে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা বলিল-'আমি উহা সর্বাগ্রে ভাঙ্গিতেছি।' এই বলিয়া সে কোদাল হাতে লইয়া কা'বা ঘরে উঠিয়া বলিতে লাগিল-'হে আল্লাহ্! আমাদিগকে ভীত করিও না। হে আল্লাহ্! কা'বা ঘরের মঙ্গল ছাড়া আমাদের মনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।' অতঃপর সে কা'বা ঘরের রুকনদ্বয়ের দিকের দেওয়ালের একাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। অতঃপর লোকেরা বলিল, আগামী দিন পর্যন্ত ভাঙ্গিবার কার্য স্থগিত থাকুক। রাত্রিতে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার উপর কোন বিপদ আপতিত হইলে আমরা আর কা'বা ঘর ভাঙ্গিব না, যেটুকু ভাঙ্গা হইয়াছে, উহা মেরামত করিয়া কা'বা ঘরকে উহার পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিব। পক্ষান্তরে ইব্ন মুগীরার উপর কোন বিপদ না আসিলে বুঝিব, আল্লাহ আমাদের কার্যে সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। অতঃপর পরিকল্পনা মুতাবিক কা'বা ঘরকে ভাঙ্গিবার এবং পুনঃনির্মাণ করিবার কাজ পুনরায় আরম্ভ করিব।'

পরের দিন দেখা গেল, ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা নিরাপদ রহিয়াছে। ইহাতে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরাসহ সকলে কা'বা ঘর ভাঙ্গিবার কার্যে লাগিয়া গেল। ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক নির্মিত মূলভিত্তি পর্যন্ত পৌছিল। উহার পাথরগুলি ছিল সবুজ রঙের। উহারা দন্তমালার ন্যায় একটির সহিত আরেকটি সুসংবদ্ধভাবে সুবিন্যস্ত ছিল। ইব্ন ইসহাক বলেন-যাহারা আমার নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের একজন আমার নিকট ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'কুরায়শের একটি লোক উক্ত মূলভিত্তি ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্যে উহার দুইখানা পাথরের মধ্যে শক্ত একটি দন্ত প্রবেশ করাইয়া নাড়া দিল। ইহাতে একখানা পাথর নড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মক্কা নগরী প্রকম্পিত হইল। ইহাতে কুরায়শগণ উক্ত মূলভিত্তি ভাঙ্গিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিল।'

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ 'অতঃপর প্রত্যেক শাখা-গোত্র পৃথক পৃথকভাবে পাথর সংগ্রহ করিয়া স্ব-স্ব দায়িত্বের অংশ নির্মাণ করিতে লাগিল। তাহাদের নির্মাণ কার্য হাজরে আসওয়াদের স্থানে পৌছিবার পর উহা যথাস্থানে স্থাপন করা লইয়া তাহাদের মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। প্রত্যেক শাখা-গোত্রই দাবী করিল, তাহারাই হাজরে আসওয়াদকে উহার স্থানে লইয়া যাইবে। তাহাদের দ্বন্দ্ব ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া অবশেষে যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করিবার আয়োজন করিল। বনূ আবদিদ্দার এবং বনূ আদী ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআ রক্তভর্তি একটি পাত্রের মধ্যে হাত রাখিয়া শপথ করিল-'তাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে শেষ হইয়া না যাওয়া পর্যন্ত অন্য কোন গোত্র-শাখাকে উক্ত পাথর উঠাইতে দিবে না।' এইরূপ থমথমে অবস্থায় চার পাঁচ দিন অতিবাহিত হইল। অতঃপর বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা মসজিদে হারমে মিলিত হইল।'

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ জনৈক রাবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই সময়ে আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরা ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন মাখযুম একটি প্রস্তাব দিল। সে ছিল কুরায়শ গোত্রের জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি। সে বলিল-হে কুরায়শের লোকগণ! তোমরা একটি লোককে সালিস মানো।

কাহাকে সালিস মানিবে? যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এখানে উপস্থিত হইবে, সেই হইবে তোমাদের সালিস। সে ব্যক্তি যে রায় দিবে, সকলে তাহাই মানিবে।' সকলে তাহার এই প্রস্তাবকে মানিয়া লইল। তাহারা প্রথম আগন্তুকের আগমনের জন্যে অপেক্ষা করিতে থাকিল। তাহারা দেখিল, সেখানে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি আসিতেছে, সে হইতেছে তাহাদের প্রিয় 'আল আমীন'— মুহাম্মদ। উল্লেখ্য যে, নবূওত প্রাপ্তির পূর্বে নবী করীম (সা) স্বীয় বিশ্বস্ততার কারণে মক্কাবাসীর নিকট হইতে 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রিয় 'আল-আমীন'কে দেখিয়া তাহারা বলিতে লাগিল-'এই তো আল-আমীন; আমরা মানিয়া লইলাম; এই তো মুহাম্মদ।' 'আল-আমীন' তাহাদের নিকট পৌঁছিলে তাহারা তাঁহাকে ঘটনা খুলিয়া জানাইল। তিনি বলিলেন ঃ 'আমাকে একখানা কাপড় আনিয়া দাও।' তাহারা তাঁহাকে একখানা কাপড় আনিয়া দিলে তিনি উহা বিছাইয়া নিজ হাতে পাথরখানা উহার উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন-প্রত্যেক শাখা-গোত্রের লোকে কাপড়খানার কিনারা ধরিয়া পাথরখানা বসাইবার স্থানে লইয়া যাও।' তাহারা তাহাই করিল। তিনি নিজ হাতে পাথরখানা কাপড়ের উপর হইতে উঠাইয়া লইয়া উহা যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। এইরূপে তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় কুরায়শ গোত্রের এক ভয়াবহ বিরোধ মিটিয়া গেল। অতঃপর কুরায়শগণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে স্বীয় পরিকল্পনা মুতাবিক কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ কার্যের অবশিষ্টাংশ সম্পন্ন করিল। কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইবার পর জুবায়র ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব কা'বা ঘরের কূপে বসবাসকারী পূর্বোল্লেখিত ভয়ংকর সাপটির অবস্থা বর্ণনা করিয়া নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করিল ঃ

عجبت لما تصوبت العقاب

الى الثعبان وهى لها اضطراب

وقد كانت يكون لها كشيش

واحيانا يكون لها وثاب

اذا قمنا الى التأسيس شدت

تهيبنا البناء وقد تهاب

فلما ان خشينا الرجز جائت

عقاب تتلئب لها انصباب

فضمتها اليها ثم خلت

لنا البنيان ليس له حجاب

فقمنا حاشدين الى بناء

لنا منه القوعد والتراب

غـداة نـرفـع الـتـاسـيـس مـنـه
ولـيـس عـلـى مـسـاويـنـا ثـيـاب
اغـزبـه الـمـلـيـك بـنـى لـؤى
فـلـيـس لاصـلـه مـنـهـم ذهـاب
وقـد حـشـدت هـنـاك بـنـو عـدى
ومـرة قـد تـقـدمـهـا كـلاب
فـبـوأنـا الـمـلـيـك بـذاك عـزا
وعـنـد الله يـلـتـمـس الـثـواب

'সাপটির উপর যখন 'উকাব' পাখী (বাজ পাখী হইতে অধিকতর শক্তিশালী এক প্রকারের শিকারী পাখী) নামিয়া আসিল, তখন আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলাম। সাপটির স্বভাব ছিল অতিশয় উগ্র। অনেক সময়েই উহার ফোঁস ফোঁসানি শোনা যাইত। আবার অনেক সময়ে উহা মানুষকে তাড়াইত। আমরা কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিতে গেলেই উহা আমাদিগকে আক্রমণ করিত। উহা আমাদিহকে ভয় দেখাইয়া কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিতে বাধা দিত। বস্তুত উহা ভীতিকর প্রাণীই ছিল। আমরা ভয় করিতাম, পুনঃনির্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে ও কা'বা ঘর ভাঙ্গিতে গেলে আমাদের পাপ হইবে। এই অবস্থায় একদিন অকস্মাৎ একটি 'উকাব' পাখী আসিয়া সরল গতিতে উহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। অতঃপর উহা সুদৃঢ় নখরে ধরিয়া লইয়া উধাও হইল। আমাদের জন্যে কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিবার কার্যকে নিবিঘ্ন করিয়া দিল। অতঃপর আমাদের সম্মুখে আর কোন বিঘ্ন রহিল না। আমরা অতি সকালে দ্রুত আমাদের একটি ঘরের দিকে চলিয়া গেলাম। উহাতে ছিল মাত্র ভিত্তি ও মাটি। আমরা উহাকে যখন পুনঃনির্মাণ করিতেছিলাম, তখন আমাদের দেহের ঊর্ধ্বাংশে বস্ত্র ছিল না। সৃষ্টির অধিপতি আল্লাহ 'বনু-লুআ'কে উহার দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। তাহারা উহার নির্মাণ কার্যে কোনরূপ অলসতা দেখায় নাই। 'বনু আদী'ও সেখানে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া নির্মাণ কার্যে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। আর একবার 'কিলাব' শাখাগোত্রও উহার নির্মাণ কার্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এইরূপে বিশ্বের অধিপতি আল্লাহ উহার মাধ্যমে আমাদিগকে সম্মানিত করিলেন। আর আল্লাহর নিকট আমরা নিবেদন করিতেছি- তিনি যেন আমাদিগকে সওয়াব দান করেন।'

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ 'নবী করীম (সা)-এর যুগে কা'বা ঘরের দৈর্ঘ্য আঠার হাত ছিল। প্রথমদিকে কা'বা ঘর 'কিবতী' (এক শ্রেণীর কাতান) বস্ত্রে আবৃত করা হইত। পরবর্তীকালে উহা 'বুরূদ' (পাড় বিশিষ্ট চাদর) দ্বারা আবৃত করা হইত। উহা রেশম বস্ত্রে সর্বপ্রথম আবৃত করেন হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-কুরায়শ গোত্র যেরূপে কা'বা ঘর নির্মাণ করিয়াছিল, উহা পবিত্র মক্কার সুশাসক হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর শাসনকালের প্রথম দিক পর্যন্ত সেইরূপেই অটুট ছিল। ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়ার রাজত্বকালের শেষ দিকে এবং পবিত্র মক্কার সুশাসক হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়া তাঁহাকে তথায়

অবরুদ্ধ করিবার কালে উক্ত বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্রের আক্রমণে কা'বা ঘরে আগুন লাগিয়া যায় এবং উহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহা ছিল হিজরী ষাট সনের পরের ঘটনা। উক্ত ঘটনার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) কা'বা ঘরকে ভূমির সমতল করিয়া ভাঙ্গিয়া উহা হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক স্থাপিত ভিত্তির উপর পুনঃনির্মিত করেন। তিনি 'হাতিম'কে পূর্ণভাবে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ভূমির সহিত সংলগ্ন করিয়া মোট দুইটি দরজা নির্মাণ করেন। উক্ত পুনঃনির্মাণ কার্য সম্পাদন করিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) নবী করীম (সা)-এর এতদ্‌সম্পর্কিত ইচ্ছাটি পূরণ করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি তাঁহার খালা হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট হইতে নবী করীম (সা)-এর উক্ত ইচ্ছার কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত কা'বা ঘরের উপরোক্ত আকার ও গঠন অটুট ছিল। তাঁহার শাহাদাতের পর উহা পুনরায় ভাঙ্গিয়া নির্মাণ করা হয়। হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ তাঁহাকে শহীদ করিয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের নির্দেশে কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া উহা পূর্বের আকার ও গঠনে পুনঃনির্মাণ করেন।

আতা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ সুলায়মান, ইব্ন আবূ যায়দা, হিনদ ইব্ন সিররী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আতা বলেন-ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়ার রাজত্বকালে তাহার সেনাবাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্রে কা'বা ঘরে আগুন লাগিয়া যাইবার কারণে উহা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) উহা তদবস্থায় রাখিয়া দিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল হজ্জের সময়ে লোকেরা কা'বা ঘর যিয়ারত ও তাওয়াফ করিতে আসিয়া ইয়াযীদ বাহিনীর অত্যাচারের আলামত ও নিদর্শন দেখিয়া ইয়াযীদের প্রতি রুষ্ট হইবে ও তাহার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইবে। হজ্জের সময়ে লোকেরা পবিত্র মক্কায় একত্রিত হইলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন-হে লোক সকল! তোমরা আমাকে কা'বা ঘরের বিষয়ে পরামর্শ দাও। উহা ভাঙ্গিয়া পুনঃনির্মাণ করিব অথবা শুধু উহার ক্ষতিগ্রস্ত অংশকে মেরামত করিব? হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন-'আমার অভিমত এই যে, নবী করীম (সা)-এর নবূওত লাভ করিবার সময়ে এবং লোকদের ইসলাম গ্রহণ করিবার সময়ে আল্লাহর ঘর যে অবস্থায় ছিল, আপনি শুধু উহার ক্ষতিগ্রস্ত অংশটুকু মেরামত করিয়া উহা সেই অবস্থায় রাখিয়া দিবেন।' হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র বলিলেন-'তোমাদের কাহারও বাসভবন (আংশিকভাবে) পুড়িয়া গেলে তো সে উহা সম্পূর্ণরূপে নতুন করিয়া পুনর্নির্মাণ করা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থায়ই সন্তুষ্ট থাকিতে না। এমতাবস্থায় আল্লাহর ঘরের বিষয়ে কোন্ ব্যবস্থা গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে মানাইতে পারে? এই বিষয়ে আমি তিন দিন ধরিয়া আমার প্রভুর নিকট ইসতেখারা (কোন বিষয়ে আল্লাহর নিকট পথ নির্দেশনা চাহিয়া বিশেষ আমল করা) করিব। অতঃপর এই বিষয়ে করণীয় স্থির করিব।' তিন দিন অতিবাহিত হইবার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) সিদ্ধান্ত করিলেন- তিনি কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া উহা পুনর্নির্মিত করিবেন। কিন্তু কা'বা ঘর ভাঙ্গিতে গেলে তাহার উপর আসমান হইতে বিপদ নাযিল হইতে পারে, এই আশংকায় কেহ উহা ভাঙ্গিবার জন্যে অগ্রসর হইতে সাহস পাইল না। এক সময়ে একটি লোক সাহস সঞ্চয় করিয়া উহার উপরে উঠিল এবং উপর হইতে একখানা পাথর খুলিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। লোকে দেখিল, তাহার উপর কোন বিপদ নাযিল হয় নাই। ইহাতে এক এক করিয়া সকলে উহাকে ভাঙ্গিবার কার্যে লাগিয়া গেল। এইরূপে উহাকে ভাঙ্গিয়া ভূমির সমতল করা হইল। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) উহার ভিত্তির উপর কতগুলি খুঁটি গাড়িয়া রাখিলেন। এই সময়ে

তিনি লোকদিগকে একটি হাদীস শুনাইলেন। তিনি বলিলেন-আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

'একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন-'জনগণ যদি সদ্য কুফরত্যাগী না হইত এবং আমার নিকট যদি প্রয়োজনীয় অর্থ থাকিত, তবে আমি নিশ্চয় 'হিজর (হাতিম)' এর পাঁচ হাত পরিমিত স্থান কা'বা ঘরের অন্তর্ভুক্ত করিতাম এবং উহাতে প্রবেশ করিবার একটি দরজা ও বাহির হইবার একটি দরজা, মোট দুইটি দরজা লাগাইতাম।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বলিলেন-'আমার নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ রহিয়াছে এবং জনগণের বিভ্রান্ত হইবার আশংকাও দূরীভূত হইয়াছে। এমতাবস্থায় নবী করীম (সা)-এর ইচ্ছা পূরণ করায় কোন বাধা দেখিতেছি না।' তিনি 'হিজর' এর পাঁচ হাত পরিমিত স্থানকে কা'বা ঘরের সীমানার অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহাতে ভিত্তি স্থাপন করিলেন। ইতিপূর্বে কা'বা ঘরের দৈর্ঘ্য ছিল আঠার হাত। 'হিজর' ইহার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উহার প্রস্থ পাঁচ হাত বৃদ্ধি পাওয়ার পর লোকদের নিকট উহা দৈর্ঘ্যে খাটো বিবেচিত হইল। ইহাতে তিনি উহার দৈর্ঘ্য পাঁচ হাত বাড়াইয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত উহাতে প্রবেশ করিবার জন্যে একটি দরজা এবং বাহির হইবার জন্যে একটি দরজা, মোট দুইটি দরজা নির্মাণ করিলেন। এইরূপে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর শাসনকালে তাঁহার উদ্যোগে নবী করীম (সা)-এর ইচ্ছা অনুসারে হাতিম এর সম্পূর্ণ অংশ কা'বার অন্তর্ভুক্ত হইল এবং উহাতে দুইটি দরজা নির্মিত হইল।

কা'বা ঘর পুনর্নির্মিত হইবার পর উহা উক্ত অবস্থায় বেশীদিন থাকিতে পারিল না। হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-কে শহীদ করিয়া খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানকে লিখিয়া জানাইল ঃ 'আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র মক্কার নেককার ও ন্যায়বাদী মহলের সম্মতি লইয়া কা'বা ঘর নতুন আকার ও গঠনে নির্মিত করিয়াছেন। এই অবস্থায় কা'বা ঘরের বিষয়ে কি অবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আপনার নির্দেশ জানিতে চাই।' খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান তাহাকে আদেশ দিলেন ঃ আমরা কোন বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র এর অনুসারী নহি। সে কা'বা ঘরের দৈর্ঘ্যের দিকে যে স্থানকে সংযোজিত করিয়াছে, উহা অপরিবর্তিত রাখো। কিন্তু, সে উহার প্রস্থের দিকে 'হিজর' (হাতিম)-এর যে অংশকে সংযোজিত করিয়াছে, উহা কা'বা ঘর হইতে পৃথক করিয়া ফেল আর ইব্ন যুবায়র কর্তৃক স্থাপিত নূতন দরজাটি বন্ধ করিয়া দাও।' খলীফার আদেশ পাইয়া হাজ্জাজ কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া তাঁহার আদেশ অনুসারে উহা পুনঃনির্মাণ করিলের।

উপরোল্লিখিত রিওয়ায়েতে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর যে বাণীটি বর্ণিত হইয়াছে, ইমাম নাসাঈ উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ ব্যতিরেকে শুধু উহা উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) কা'বা ঘরকে যে আকার ও আকৃতিতে পুনঃনির্মাণ করিয়াছিলেন, উহাই ছিল নবী করীম (সা)-এর আকাঙ্ক্ষিত আকার ও গঠন। নবী করীম (সা) উক্ত আকার ও গঠনেই কা'বা ঘর পুনঃনির্মিত করিবার জন্যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তবে তিনি এই আশংকায় স্বীয় আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করেন নাই যে, জনগণ অল্প দিন পূর্বে কুফর ত্যাগ করত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা কা'বা ঘর ভাঙ্গিতে এবং উহার আকৃতি ও গঠন পরিবর্তন করিতে দেখিলে বিভ্রান্ত হইতে পারে। আর নবী করীম (সা)-এর উক্ত আকাঙ্ক্ষার বিষয় প্রথম দিকে খলীফা অব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের কথা জানা ছিল না। তাই তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র কর্তৃক পুনর্নির্মিত কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া উহা পূর্বের

আকার ও গঠনে পুনর্নির্মিত করিবার জন্যে হাজ্জাজকে আদেশ দিয়াছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি উক্ত হাদীস জানিতে পারিয়া নিজের কার্যে অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন-'আহা! ইব্ন যুবায়র কা'বা ঘরকে যে আকার ও গঠনে পুনর্নির্মিত করিয়াছিল, যদি আমি উহাকে সেই আকারে ও গঠনে রাখিয়া দিতাম, তবে কত ভাল হইত। এই স্থলে ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতটি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে উহা বর্ণিত হইতেছে ঃ

আব্দুল্লাহ ইব্ন উবায়দ ইব্ন উমায়র এবং ওয়ালীদ এবং ইব্ন আতা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ, মুহাম্মদ ইব্ন বকর, মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা হারিস ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবী রবীআহ প্রতিনিধি হইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের খিলাফতের যুগে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। খলীফা তাঁহাকে বলিলেন-'আমার ধারণা, আবূ হাবীব যে হাদীস (যাহাতে কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণ করিবার জন্যে নবী করীম (সা)-এর ইচ্ছা ব্যক্ত হইয়াছে) শুনিয়াছে বলিয়া দাবি করিয়াছিল, উহা মিথ্যা দাবি ছিল।' ইহাতে হারিস ইব্ন উবায়দুল্লাহ বলিলেন-না; তাঁহার দাবি মিথ্যা ছিল না। আমিও হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট উক্ত হাদীস শুনিয়াছি।' খলীফা বলিলেন-আপনি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট কি শুনিয়াছেন ? হারিস ইব্ন উবায়দুল্লাহ বলিলেন-হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেন ঃ

একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন-'তোমার কওম কা'বা ঘরকে উহার মূল আকার ও আয়তনে পুনর্নির্মাণ না করিয়া উহার একাংশ বাহিরে রাখিয়া পুনর্নির্মাণ করিয়াছেন। তাহারা যদি সদ্য শিরকত্যাগী না হইত, তবে আমি উহার পরিত্যক্ত অংশ উহার সহিত সংযোজিত করিয়া উহা পুনর্নির্মিত করিতাম। তোমার কওম যদি পূর্বের আকার ও আয়তনে উহা পুনর্নির্মিত করিতে চাহে, তবে তাহাদিগকে কতটুকু স্থান উহার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, আস, তাহা আমি তোমাকে দেখাইয়া দেই। এই বলিয়া নবী করীম (সা) আমাকে প্রায় সাত হাত পরিমিত জায়গা দেখাইলেন।' হাদীসের উক্ত অংশটুকু রাবী আব্দুল্লাহ ইব্ন উবায়দ ইব্ন উমায়র কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী ওয়ালীদ ইব্ন আতা নিম্নোক্ত অতিরিক্ত অংশটি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হারিছ আরও বলিলেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেন-নবী করীম (সা) বলিলেন, তাহা ছাড়া আমি উহার পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ভূমি সংলগ্ন করিয়া দুইটি দরজা স্থাপন করিতাম। আর তুমি কি জান, তোমার কওম কেন কা'বা ঘরের দরজাকে ভূমি হইতে উচ্চে স্থাপন করিয়াছিল? আমি বলিলাম-হে আল্লাহর রাসূল। আমি উহা জানি না। নবী করীম (সা) বলিলেন, তাঁহারা গর্ব, অহংকার ও বৈষম্যমূলক মনোবৃত্তির কারণে এইরূপ করিয়াছিল। তাহারা যাহাকে উহাতে প্রবেশ করিতে দিতে চাহিত, সে ছাড়া অন্য কেহ যেন উহাতে প্রবেশ করিতে না পরে সেই উদ্দেশ্যে তাহারা উহার দরজা ভূমি হইতে উচ্চে স্থাপন করিয়াছিল। এই কারণেই দেখা যাইত, কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করিতে চাহিলে তাহাকে উপরে আরোহণ করিতে দিত। অতঃপর সে ব্যক্তি দরজার কাছে চলিয়া গেলে তাহারা তাহাকে ধাক্কা মারিয়া নীচে ফেলিয়া দিত।'

যাহা হউক, হারিস ইব্ন উবায়দুল্লাহর বর্ণনা শুনিয়া খলীফা বলিলেন, আপনি নিজ কানেই কি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট হইতে উক্ত হাদীস শুনিয়াছেন ঃ হারিস বলিলেন-হ্যাঁ, আমি নিজ কানে উহা তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছি। ইহা শুনিয়া খলীফা চিন্তামগ্ন হইয়া

হাতের লাঠি দ্বারা কিছুক্ষণ মাটি খুঁড়িলেন। অতঃপর বলিলেন–'আহা! ইব্নে যুবায়র যাহা করিয়াছে, যদি আমি উহা অক্ষুণ্ন রাখিতাম, তবে কতই না ভালো হইত!'

ইমাম মুসলিম আবার উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি উপরোক্ত রাবী ইব্ন জুরায়জ হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুর রায্যাক ও আবদ ইব্ন হামীদের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে এবং উক্ত রাবী ইব্ন জুরায়জ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আসিম ও মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন জিবিল্লার ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ কুয্আ হইতে ধারাবাহিকভাবে হাতিম ইব্ন আবূ সগীরা, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন বিকর সাহমী; মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ কুয্আ বলেন ঃ একদা খলীফা আব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ান কা'বা ঘর তাওয়াফ করিবার কালে বলেন–আল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের উপর লা'নত বর্ষণ করুন। কারণ, সে উম্মুল মুমিনীন (হযরত আয়েশা রা)-এর নামে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। সে বলিয়াছে–আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন–একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিয়াছিলেন–'হে আয়েশা! তোমার কওম যদি সদ্য কুফরত্যাগী না হইত, তবে আমি নিশ্চয় কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া হাতিমকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিতাম। কারণ, উহা কা'বা ঘরের অংশ ছিল। তোমার কওম কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিবার কালে উহা কা'বা ঘরের বাহিরে রাখিয়াছে।' ইহা শুনিয়া হারিস ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ রবীআহ বলেন–'হে আমীরুল মু'মিনীন ইব্ন যুবায়র সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিবেন না। কারণ, আমি নিজ কানে হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট হইতে উক্ত হাদীসটি শুনিয়াছি।' ইহাতে খলীফা বলিলেন–আমি কা'বা ঘর ভাঙ্গিবার আদেশ দিবার পূর্বে উহা জানিতে পারিলে কা'বা ঘরকে ইব্ন যুবায়র যেরূপে পুনর্নির্মাণ করিয়াছিল সেইরূপেই উহা রাখিয়া দিতাম।'

উপরোল্লিখিত হাদীসটি নবী করীম (সা) হইতে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক প্রায় নিশ্চিতরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। নবী করীম (সা) হইতে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক উহার বর্ণিত হইবার বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, উহা হযরত আয়েশা (রা) হইতে একাধিক সহীহ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। উহা হযরত আয়েশা (রা) হইতে আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ, হারিস ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রবীআহ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা), আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর এবং উরওয়া ইব্ন যুবায়র বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) যাহা করিয়াছিলেন, তাহা অভ্রান্ত ছিল। তাঁহার নির্মাণকে অক্ষুণ্ন রাখা খলীফা মারওয়ানের জন্যে সমীচীন ছিল।

এইস্থলে প্রশ্ন দেখা দেয়, অতঃপর কা'বা ঘর নবী করীম (সা) কর্তৃক আকাঙ্ক্ষিত আকার ও আয়তনে পুনঃনির্মাণ করিবার প্রয়োজনীয়তা অক্ষুণ্ন রহিয়াছে কিনা? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, কা'বা ঘরের উপর একাধিক ভাঙ্গা-গড়া চলিবার কারণে কোন কোন ফকীহ উহাকে বর্তমান অবস্থায়ই রাখিয়া দিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কথিত আছে, একদা খলীফা হারূন অর-রশীদ অথবা তাঁহার পিতার মাহদী ইমাম মালিকের নিকট এই বিষয়ে পরামর্শ চাহিলে ইমাম মালিক বলেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্র ঘরকে রাজা-বাদশাহগণের খেলনা বানাইবেন না। উহা যে চাহিবে, সেই ভাঙ্গিবে, এইরূপ অবস্থা চলিবার পক্ষে সম্মতি

দেওয়া যায় না।' ইমাম মালিকের কথায় খলীফা হারূন অর-রশীদ অথবা তাঁহার পিতা মাহদী স্বীয় পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিলেন। কাযী আয়ায এবং ইমাম নববী উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। কা'বা ঘর শেষ যামানা পর্যন্ত শত্রুর আক্রমণ হইতে মুক্ত ও সংরক্ষিত থাকিবে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'শেষ যামানায় কা'বা ঘর আল্লাহ্‌র শত্রু কর্তৃক বিধ্বস্ত হইবে। উহাকে বিধ্বস্ত করিবে জনৈক হাবশী। তাহার পায়ের নিম্নার্ধ হইবে খর্বাকৃতির।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'জনৈক হাবশী কা'বা ঘর বিধ্বস্ত করিবে। তাহার পায়ের নিম্নাংশ হইবে খর্বাকৃতির।' হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বুখারী শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'আমি যেন তাহাকে চোখের সামনে দেখিতেছি। সে হইবে কৃষ্ণাঙ্গ। তাহার পা দুইটি হইবে বাঁকা। উহার দরুন সে হাঁটিবার কালে পায়ের পাতার সম্মুখের অংশ ভিতরে দিকে এবং গোড়ালি বাহিরের দিকে ফেলিবে। আমি যেন তাহাকে (কা'বা ঘরের) পাথরগুলি এক একখানা করিয়া তুলিতে দেখিতেছি।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, ইব্‌ন আবূ নাজীহ, ইব্‌ন ইসহাক, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালিমা, আহমদ ইব্‌ন আব্দুল মালিক হাররানী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-জনৈক হাবশী কা'বা ঘর বিধ্বস্ত করিবে। তাহার পায়ের নিম্নার্ধ হইবে খর্বাকৃতি।' সে কা'বা ঘরের অলঙ্কার (অর্থাৎ উহার সম্পদ) ছিনাইয়া লইবে এবং উহার গিলাফ খুলিয়া ফেলিবে। আমি যেন চোখের সামনে তাহাকে দেখিতেছি, দেখিতেছি তাহার মাথার সম্মুখভাগে চুল নাই ও তাহার হাত পা বাঁকা। ইহাও দেখিতেছি যে, সে কোদাল ও বেলচা দিয়া কা'বা ঘরের পাথরগুলিকে এক এক করিয়া খুলিয়া ফেলিতেছে।'.

কা'বা ঘর বিধ্বস্ত হইবার ঘটনা সম্ভবত ইয়াজুজ-মাজূজের প্রাদুর্ভাবের পর ঘটিবে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বুখারী শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- ইয়াজুজ-মাজূজ-এর প্রাদুর্ভাবের পরও লোকেরা কা'বা ঘরে আসিয়া হজ্জ ও উমরাহ্ পালন করিবে।'

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا
وَتُبْ عَلَيْنَا ـ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

আলোচ্য উক্ত আয়াত সম্পর্কে ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ অর্থাৎ- 'আমাদের দুইজনকে তোমার আদেশের প্রতি অনুগত এবং তোমার ইবাদতে বিনয়ী বানাও যেন আমরা ইবাদত ও আনুগত্যে কাহাকেও তোমার শরীক না ঠাওরাই।' আব্দুল করীম হইতে ধারাবাহিকভাবে মা'কাল ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ, রজা ইব্‌ন হাব্বান আল হুসায়নী আল করশী, ইসমাঈল, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

অর্থাৎ তুমি আমাদের দুইজনকে একমাত্র তোমার ইবাদতে নিষ্ঠাবান বানাও, আর আমাদের বংশধরদের মধ্য হইতে একদল লোককে শুধুমাত্র তোমার ইবাদতে আন্তরিক বানাইও।'

সালাম ইব্‌ন আবূ মু'তী হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন আমের, মিকদাম, আলী ইব্‌ন হুসায়ন ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সালাম ইব্‌ন আবূ মু'তী বলেন–'হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) পূর্ব হইতেই আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুগত ছিলেন। উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত তাঁহাদের দোয়ার অর্থ হইতেছে–'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে তোমার আনুগত্যে দৃঢ় ও অবিচল রাখিও।'

ইকরামা বলেন–'হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিলেন ঃ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ এবং আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–আমি কবূল করিলাম, তাঁহারা দোয়া করিলেন– وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ এবং আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–আমি কবূল করিলাম।

সুদ্দী বলেন– وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ আয়াতাংশে উল্লেখিত দোয়া তাঁহারা করিয়াছিলেন শুধু হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরগণ অর্থাৎ আরব দেশের অধিবাসীগণের জন্যে।

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ 'উক্ত আয়াতাংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের (অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের জন্যে দোয়া করিয়াছিলেন।' হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে বনী ইসরাঈল এবং বনী ইসমাঈল এই উভয় শ্রেণীর লোকেই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। অতএব ইহাই সঠিক যে, তাহারা দোয়া করিয়াছিলেন বনী ইসমাঈল এবং বনী ইসরাঈল এই উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্যে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسَى أُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ 'আর মূসার কওমে এইরূপ একদল লোক ছিল যাহারা লোকদিগকে সত্য পথ দেখাইত এবং নিজেরা সত্য পথে চলিত।'

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি–ইমাম ইব্‌ন জারীর এবং সুদ্দীর ব্যাখ্যা পরস্পর বিরোধী নহে। কারণ, 'হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) মিলিতভাবে বনী ইসমাঈলের জন্যে দোয়া করিয়াছিলেন'–এ কথার তাৎপর্য এই নহে যে, তাঁহারা অন্যদের জন্যে দোয়া করেন নাই। অবশ্য আলোচ্য আয়াতাংশের বক্তব্য ও ইঙ্গিত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) বনী ইসমাঈলের জন্যেই দোয়া করিয়াছিলেন। পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ তাহারা আরও বলিল–'হে আমাদের প্রভু। আর তুমি তাহাদের মধ্য হইতে এইরূপ একজন রাসূল পাঠাইও যিনি তাহাদিগকে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইবেন, তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিখাইবেন আর তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন। নিশ্চয় তুমি মহা পরাক্রমশালী এবং মহা প্রজ্ঞাবান।' বলা অনাবশ্যক যে, উক্ত রাসূল হইতেছেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)। শেষোক্ত দোয়া দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) ইতিপূর্বে বনী

ইসমাঈলের জন্যেই দোয়া করিয়াছিলেন। এইস্থলে শেষোক্ত দোয়া প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের উক্ত দোয়াটি কবূল করিয়াছিলেন। আর কবূল করিয়াছিলেন বলিয়াই তো বনী ইসমাঈলের মধ্যে নবী করীম (সা)-কে পাঠাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الاُمِّيّينَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ 'তিনি সেই সত্তা যিনি নিরক্ষর লোকদের নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন।' এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নবী করীম (সা) শুধু মক্কার নিরক্ষর লোকদের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি পৃথিবীর অন্য সকল লোকের নিকটও প্রেরিত হইয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا 'তুমি বল, হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের নিকট প্রেরিত আল্লাহ্র রাসূল।'

এতদ্ব্যতীত একাধিক নিশ্চিত প্রমাণ রহিয়াছে যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা) পৃথিবীর সকল লোকের নিকট প্রেরিত রাসূল।

স্বীয় সন্তান-সন্ততি এবং বংশধরদের জন্যে কল্যাণ কামনা করা এবং তাহাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করা প্রত্যেক মুত্তাকী মু'মিনের জন্যে কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকী মু'মিনের প্রশংসা বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ

আর যাহারা বলে—'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে চোখ জুড়ানো স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর আর আমাদিগকে মুত্তাকীগণের ইমাম বানাও।'

বস্তুত, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতকে ভালবাসিলে সে স্বভাবতই কামনা করিবে যে, তাহার আত্মীয়-পরিজন এবং সন্তান-সন্ততিও আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতকে ভালবাসুক। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার অতি প্রিয় মুত্তাকী মু'মিন ছিলেন, তাই তাঁহারা স্বভাবতই তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি এবং বংশধরদের জন্যে উপরোক্ত দোয়া করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলিলেন ঃ

اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا (আমি নিশ্চয় তোমাকে মানবদের জন্যে ইমাম বানাইব) তখন তিনি স্বভাবতই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এই প্রার্থনামূলক প্রশ্ন নিবেদন করিলেন ঃ

وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ (আর আমার বংশধরদের মধ্যে হইতেও) অন্যত্র অনুরূপভাবে হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিয়াছিলেন ঃ

وَاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ 'আর আমাকে এবং আমার পুত্রগণকে মূর্তিপূজা হইতে পবিত্র রাখিও।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, মানুষ মরিয়া গেলে তিনটি সূত্র ছাড়া সকল সূত্রে তাহার নেক আমল বন্ধ হইয়া যায়। উক্ত সূত্র তিনটি হইতেছে এই ঃ 'সাদকায়ে জারিয়া–যে সাদকার ফল চলিতে থাকে; এইরূপ ইলম যদ্দারা মানুষ উপকৃত হইতে থাকে এবং এইরূপ নেক সন্তান যে মাতা-পিতার জন্যে দোয়া করে।' উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নেককার সন্তান দুনিয়াতে রাখিয়া যাওয়া খোদ মাতা-পিতার পরকালীন জীবনের জন্যেও উপকারী এবং লাভজনক। এইরূপে আলোচ্য আয়াতাংশসহ উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহ এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সন্তান-সন্ততির নেককার হইবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করা এবং তজ্জন্য চেষ্টা করা একদিকে সন্তান-সন্ততির জন্যে উপকারী এবং লাভজনক, অন্যদিকে উহা স্বয়ং পিতার জন্যেও উপকারী এবং লাভজনক।

আতা হইতে ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا অর্থাৎ আর তুমি আমাদিগকে আমাদের হজ্জের কার্যাবলী শিক্ষা দাও। মুজাহিদ বলেন– وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا অর্থাৎ আর তুমি আমাদিগকে আমাদের কুরবানীর স্থানসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞাত কর। আতা এবং কাতাদাহ হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে খাসীফ, ইতাব ইব্ন বাশীর ও সাঈদ ইব্ন মানসূর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিলেন ঃ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا (আর তুমি আমাদিগকে আমাদের জন্য করণীয় হজ্জের কার্যাবলী শিখাও।)

ইহাতে হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহার নিকট আগমন করত তাঁহাকে কা'বা ঘরের স্থানে আনয়ন করিয়া বলিলেন–'এখানে আল্লাহ্‌র ঘরের ভিত্তিসমূহ গাঁথিয়া উচ্চ করুন।' তিনি তাহাই করিলেন। কা'বা ঘরের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইবার পর হযরত জিবরাঈল (আ) হাত ধরিয়া তাঁহাকে সাফা পাহাড়ে লইয়া গিয়া বলিলেন–ইহা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত হজ্জের একটি স্থান। অতঃপর তাঁহাকে মারওয়া পাহাড়ে লইয়া গিয়া বলিলেন–ইহা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত হজ্জের একটি স্থান। অতঃপর তাঁহাকে মিনায় লইয়া গেলেন। সেখানে 'জামারায়ে আকাবা'য় পৌঁছিয়া তাঁহারা বৃক্ষের নিকট ইবলীসকে দণ্ডায়মান দেখিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলিলেন–'আপনি তাকবীর বলিয়া উহার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করুন।' তিনি তাহাই করিলেন। ইহাতে ইবলীস সেই স্থান হইতে হটিয়া গিয়া 'জামারায়ে উসতা'য় দাঁড়াইয়া রহিল। তাঁহারা তাহার কাছ দিয়া যাইবার কালে হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলিলেন–'তাকবীর বলিয়া উহার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করুন।' তিনি তাহাই করিলেন। ইহাতে খবীছ ইবলীস ভাগিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা ছিল, সে হজ্জের কার্যাবলীর মধ্যে নিজস্ব কোন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিবে। কিন্তু, তাহা পারিল না। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) হাত ধরিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-কে 'আল-মাশআরুল হারাম'-এ লইয়া গিয়া বলিলেন–'এই হইতেছে আল-মাশআরুল হারাম।' অতঃপর তিনি হাত ধরিয়া তাঁহাকে আরাফাতে লইয়া গিয়া বলিলেন–আমি আপনাকে যে সকল স্থান দেখাইলাম, সেইগুলিকে আপনি চিনিয়া রাখিয়াছেন তো? তিনি তিনবার উহা বলিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) উত্তর দিলেন–'হ্যাঁ; আমি চিনিয়া রাখিয়াছি।' আবূ মাজলায এবং কাতাদাহ হইতেও অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ তুফায়েল, আবূ আসিম গানাবী, হাম্মাদ ইব্ন সালমা ও ইমাম আবূ দাঊদ তায়ালেসী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন–হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জের স্থানসমূহ দেখাইবার কালে শয়তান 'সাঈ'র স্থানে (সাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে মিনায় লইয়া আসিয়া বলিলেন–এই হইতেছে আল-মানাখ (লোকদের অবস্থান-স্থান)। সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ) জামারাতুল আকাবায় পৌঁছিলে শয়তান পুনরায় তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি উহার প্রতি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিলেন। উহাতে সে দূর হইয়া গেল। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে জামরাতুল উসতায় লইয়া আসিলেন। এখানেও শয়তান তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি উহার প্রতি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে সে দূর হইয়া গেল। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে জামরাতুল কুছওয়ায় লইয়া আসিলেন। এখানেও শয়তান তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি উহার প্রতি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে সে দূর হইয়া গেল। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে মুযদালিফায় লইয়া আসিয়া বলিলেন–এই হইতেছে 'আল-মাশআর।' অতঃপর তিনি তাহাকে আরাফাতে লইয়া আসিয়া বলিলেন–এই হইতেছে 'আরাফাত'। অতঃপর বলিলেন– আপনি চিনিয়াছেন তো?'

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ

(١٢٩) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۟

১২৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের (বংশধরদের) নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে রাসূল পাঠাইও। সে তাহাদের নিকট তোমার আয়াত পাঠ করিবে ও তাহাদিগকে আল-কিতাব এবং হিকমাত শিক্ষা দিবে আর তাহাদিগকে পবিত্র করিবে। নিশ্চয় তুমি মহা প্রতাপান্বিত ও শ্রেষ্ঠতম কুশলী।

তাফসীর ঃ কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার কালে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) মক্কার অধিবাসী তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যে দোয়া পেশ করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়াতে উহার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার কালে আরও দোয়া করিলেন–'হে আমাদের প্রভু! আর তুমি আমাদের বংশধরদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এইরূপ একজন রাসূল পাঠাইও যিনি তাহাদিগকে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইবেন, তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমাত শিখাইবেন আর তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন; নিশ্চয় তুমি অশেষ ক্ষমতাশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।'

উপরোক্ত দোয়ায় হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) যে 'রাসূল'কে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানব জাতির হিদায়তের জন্য বনী ইসমাঈলের মধ্য হইতে প্রেরিত রাসূল হিসাবে পূর্বেই নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-এর উপরোক্ত দোয়া আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক পূর্বেই নির্ধারিত ফয়সালার সহিত সামঞ্জস্যশীল ছিল।

হযরত ইরবায ইব্ন সারিয়া (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল আ'লা ইব্ন হিলাল সালমী, সাঈদ ইব্ন সুআয়দ কালবী, মুআবিয়া ইব্ন সালেহ, আব্দুর রহমান ইব্ন মাহদী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির পূর্বেই আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খাতামুন্নাবিয়্যীন হিসাবে নির্ধারিত ছিলাম। আমার আত্মপ্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের বিবরণ হইতেছে এই ঃ আমার জন্যে আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করিয়াছিলেন। হযরত ঈসা (আ) আমার আগমন সম্বন্ধে সুসংবাদ দিয়াছেন। অবশেষে আমার মাতা আমার সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখার তাহা দেখিয়াছেন। নবীদের মাতাগণ এইরূপ স্বপ্নই দেখিয়া থাকেন।

উপরোক্ত রিওয়ায়েত ইব্ন ওহাব, লায়ছ এবং তাঁহার চুক্তিবদ্ধ গোলাম আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালেহও উপরোক্ত রাবী মুআবিয়া ইব্ন সালেহ হইতে উক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ বকর ইব্ন আবূ মরিয়ামও উহা উপরোক্ত রাবী সাঈদ ইব্ন সুআয়দ হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ উমামা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে লুকমান ইব্ন আমের, ফারাজ, আবূ নযর ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম –হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার আত্মপ্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের বিবরণ কি? নবী করীম (সা) বলিলেন–আমার আত্মপ্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের বিবরণ হইতেছে, আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) আমার জন্যে দোয়া করিয়াছিলেন, হযরত ঈসা (আ) আমার আগমন সম্বন্ধে সুসংবাদ দিয়াছিলেন এবং আমার মাতা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার মধ্য হইতে একটি জ্যোতি বাহির হইয়া শাম দেশের (সিরিয়ার) প্রাসাদসমূহ আলোকিত করিয়াছে।'

উপরোক্ত রিওয়ায়েত দুইটিতে নবী করীম (সা)-এর আত্মপ্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের বর্ণনায় উল্লেখিত হইয়াছে ঃ دعوة ابى ابراهيم

উহার তাৎপর্য এই যে, 'হযরত ইবরাহীম (আ) লোকদের নিকট সর্বপ্রথম নবী করীম (সা)-এর প্রশংসামূলক বর্ণনা প্রদান করিয়াছিলেন।' উহাতে আরও উল্লেখিত হইয়াছে ঃ

بشرى عيسى بى উহার তাৎপর্য এই যে, 'বনী ইসরাঈল জাতির সর্বশেষ নবী হযরত ঈসা (আ) নবী করীম (সা)-এর আগমন সম্বন্ধে লোকদিগকে সুসংবাদ শুনাইয়াছিলেন।' একদা হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের নিকট বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইয়া বলিলেন ঃ

إِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ -

(নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত রাসূল; আমার সম্মুখে যে তাওরাত কিতাব রহিয়াছে, উহা আমি সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছি আর এইরূপ এক রাসূল সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদান করিতেছি যিনি আমার পর আগমন করিবেন। তাঁহার নাম হইবে আহমদ।)

উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলেন–'আমার মাতা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার মধ্য হইতে একটি জ্যোতি বাহির হইয়া শাম দেশের প্রাসাদসমূহ আলোকিত করিয়া ফেলিল।'

কথিত আছে–নবী করীম (সা)-এর মাতা বিবি আমেনা তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিবার পর উক্ত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। উক্ত স্বপ্ন দেখিয়া তিনি নিজ লোকজনকে উহা জানাইয়াছিলেন। এইরূপে উহা লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল।' বস্তুত, নবী করীম (সা)-এর মাতাকে উক্ত স্বপ্ন দেখাইয়া আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে চিনিতে পারা এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনা লোকদের জন্যে আসান করিয়া দিয়াছিলেন। এইস্থলে প্রশ্ন দেখা দেয়, 'নবী করীম (সা) পৃথিবীর সকল স্থানের অন্ধকারকে দূরীভূত করিয়া উহা আলোকিত করিয়া দিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় স্বপ্নে আলোকিত স্থান হিসাবে শুধু শামদেশ প্রদর্শিত হইবার তাৎপর্য কি?' এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, উহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, 'মুহাম্মদ (সা)-এর দীন ও নবূওত শামদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে।'

বস্তুত, আখেরী যামানায় শামদেশে হইবে ইসলাম এবং মুসলমানদের আশ্রয়স্থল আর উহারই অন্তর্গত দামেশ্ক নগরের মসজিদের পূর্ব দিকে অবস্থিত শুভ্র মিনারায় হযরত ঈসা (আ) অবতীর্ণ হইবেন এবং ইসলামকে দুনিয়াতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'আমার উম্মতের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত এইরূপ একদল লোক থাকিবে যাহারা সত্যকে সাহায্য করিবে। মানুষের বিদ্রূপ ও বিরোধিতা তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।' বুখারী শরীফের রিওয়ায়েতে উহার পর এই অতিরিক্ত কথাটি উল্লেখিত রহিয়াছে ঃ 'আর তাহারা থাকিবে শামদেশে।'

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী' ইব্ন আনাস ও আবূ জা'ফর রাযী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবুল আলীয়া বলেন–'আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-এর দোয়ায় যে রাসূলের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, তিনি হইতেছেন নবী করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্ত দোয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন-তোমার দোয়া কবূল করিলাম। সেই রাসূল আখেরী যামানায় আবির্ভূত হইবেন।' কাতাদাহ এবং সুদ্দীও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (আর যিনি তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবেন) আয়াতাংশ প্রসঙ্গে হাসান (বসরী) কাতাদাহ, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, আবূ মালিক প্রমুখ তাফসীরকার বলেন ঃ الكتاب। অর্থাৎ কুরআন মজীদ এবং الحكمة। অর্থাৎ সুন্নাহ।' কোন কোন তাফসীরকার বলেন الحكمة। অর্থাৎ দীনী ইলম।' প্রকৃতপক্ষে الحكمة। শব্দের উপরোক্ত তাৎপর্যদ্বয় পরস্পর বিরোধী নহে।

وَيُزَكِّيهِمْ (আর যিনি তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন) আয়াতাংশ প্রসঙ্গে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন– ويزكيهم অর্থাৎ আর যিনি তাহাদিগকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অনুগত বানাইবেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন– وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ অর্থাৎ আর যিনি তাহাদিগকে ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিবেন। ইহাতে তাহারা ভাল কাজ এবং ন্যায় কাজ করিবে আর মন্দ কাজ ও অন্যায় কাজ হইতে দূরে থাকিবে। পরন্তু যিনি তাহাদিগকে আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ করিবার কার্যাবলী এবং তাঁহার অসন্তোষে পতিত হইবার কার্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিবেন। ইহাতে তাহারা তাঁহার সন্তোষ লাভ করিবার কার্যাবলী করিতে এবং তাঁহার অসন্তোষে পতিত হইবার কার্যাবলী হইতে বিরত থাকিতে পারিবে।'

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ নিশ্চয় তুমি মহা ক্ষমতাবান; তুমি যাহা ইচ্ছা কর তাহাই করিতে পারো; তোমাকে কেহ কোন কাজ হইতে বিরত রাখিতে পারে না। আর তুমি মহা প্রজ্ঞাবান; তোমার কথা ও কাজ হিকমতপূর্ণ: তাই তুমি প্রতিটি বস্তুকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া থাক।

ইবরাহীম (আ)-এর মর্যাদা

(١٣٠) وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

(١٣١) اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(١٣٢) وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○ؕ

১৩০. আর যে ব্যক্তি ইবরাহীমের মিল্লাত হইতে মুখ ফিরায় (তাহা) মূর্খতাবশত বৈ নহে। এবং অবশ্যই আমি তাহাকে দুনিয়ার বুকে মনোনীত করিয়াছি আর আখিরাতে সে নিশ্চয় নেককারগণের অন্তর্গত।

১৩১. যখন তাহার প্রভু তাহাকে বলিলেন, 'অনুগত হও'; সে বলিল, 'আমি নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের অনুগত হইলাম।'

১৩২. আর উহার জন্য ইবরাহীম তাহার পুত্রকে ওসিয়ত করিলেন এবং ইয়াকূবও– 'হে আমার পুত্র! নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য 'দীন' মনোনীত করিয়াছেন। তাই তোমরা মুসলিম না হইয়া মৃত্যুবরণ করিও না।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতত্রয়ে কাফিরদের শিরকের বিরুদ্ধে ইবরাহীম (আ)-এর তাওহীদ প্রচারকে প্রশংসা করা হইয়াছে। হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন মহান সত্যসাধক। জ্ঞান লাভ করিবার পর অল্প বয়সেই তিনি শিরকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। যে সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা ছিল পৌত্তলিক সমাজ। তাঁহার ঘোষণায় তাঁহার পিতাসহ সমগ্র সমাজই তাঁহার শত্রু হইয়া গিয়াছিল। এইজন্যে তাহাদের পক্ষ হইতে তাঁহার উপর নামিয়া আসিয়াছিল কঠোর নির্যাতন ও নিপীড়ন। তাওহীদের সুতীব্র ভালবাসায় তিনি সবই সহিয়া গিয়াছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসার বর্ণনা প্রদান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

قَالَ يَاقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ـ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

"হে আমার জাতি! তোমরা যাহাদিগকে শরীক বানাও, উহাদিগকে শরীক বানানো হইতে আমি নিশ্চয় মুক্ত রহিলাম। আমি নিশ্চয় সেই সত্তার দিকে মুখ ফিরাইলাম, যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি একমাত্র সেই সত্তার প্রতি অনুগত হইলাম এবং আমি কোনক্রমে শির্ক করিব না।"

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ اِنَّنِىْ بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ـ اِلاَّ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ـ

"আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা ও জাতিকে বলিয়াছিল—তোমরা যাহাদিগকে ইবাদত করিয়া থাক, আমি নিশ্চয় তাহাদিগকে ইবাদত করা হইতে বিরত রহিলাম। কিন্তু, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, (তাঁহার দিকে আমি মুখ ফিরাইলাম।) নিশ্চয় তিনি অচিরেই আমাকে পথ দেখাইবেন।"

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلاَّ عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ ـ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ـ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ـ

"আর স্বীয় পিতার জন্যে ইবরাহীমের ইস্তিগফার করা ছিল শুধু একটি প্রতিশ্রুতির কারণে, যে প্রতিশ্রুতি সে ইতিপূর্বে তাহাকে প্রদান করিয়াছিল। অতঃপর যখন তাহার নিকট ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, তাহার পিতা আল্লাহ্র একজন শত্রু, তখন ইবরাহীম উক্ত বিষয়ে নিবৃত্ত হইয়া গেল। নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল অতিশয় অনুগত ও ধৈর্যশীল।"

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ـ اِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ وَاٰتَيْنَاهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ـ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

"নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল বাতিলের প্রতি ঘৃণাপরায়ণ ও আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত এক ব্যক্তি। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে ছিল আল্লাহ্‌র নিআমতসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে সত্য পথ দেখাইয়াছিলেন। আর আমি তাহাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করিয়াছিলাম এবং আখিরাতে সে নিশ্চয় নেককারদের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।"

উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহ এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন বাতিলের প্রতি ঘৃণাপরায়ণ এবং ন্যায়ের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী। তিনি আল্লাহ্ ভিন্ন সকল মনগড়া মা'বূদের ইবাদতকে ঘৃণা করিতেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ অর্থাৎ ইবরাহীমের দীন হইতে যাহারা দূরে থাকে, তাহারা স্বীয় মূর্খতার দরুন নিজেদের উপরই অত্যাচার করিয়া থাকে। বস্তুত, নিজেদের উপর তাহাদের উক্ত অত্যাচার হইতেছে জঘন্যতম অত্যাচার। কারণ, অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা (হযরত লুকমানের উপদেশ উল্লেখ প্রসঙ্গে) বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ 'নিশ্চয় শিরক অতি বড় অত্যাচার।'

আবুল আলীয়া এবং কাতাদাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ এই আয়াত ইয়াহুদী জাতি সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দীন ত্যাগ করত মনগড়া দীন অনুসরণ করিতেছে। আবুল আলীয়া এবং কাতাদাহ্‌র উক্ত অভিমতের পক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখিত হইয়া থাকে ঃ

وَمَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلاَ نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا - وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ -

"ইবরাহীম না ইয়াহুদী ছিল আর না নাসারা; বরং সে ছিল বাতিলের প্রতি ঘৃণাপরায়ণ এবং আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত; আর সে মুশরিকও ছিল না। নিশ্চয় ইবরাহীমের অধিকতর নিকটবর্তী হইতেছে তাহার যথার্থ অনুসরণকারীরা। বিশেষত এই নবী এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা। আর আল্লাহ্ মু'মিনদের বন্ধু।"

وَاِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ 'তাহার প্রভু যখন তাহাকে বলিল, 'আমার প্রতি অনুগত হও।' সে বলিল, 'জগতসমূহের মহা প্রতিপালকের প্রতি অনুগত হইলাম।' এইরূপে হযরত ইবরাহীম (আ) প্রাকৃতিক বিধান এবং শরীআতী বিধান উভয় বিধানে আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত হইলেন।

وَوَصّٰى بِهَا اِبْرٰهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ অর্থাৎ –'ইবরাহীম এবং ইয়াকূব নিজ নিজ পুত্রদিগকে ইবরাহীমের 'দীন' আঁকড়াইয়া থাকিতে উপদেশ দিয়াছিল।'

এইস্থলে بها শব্দদ্বয়ের অন্তর্গত ها (المرجع) اَلْعَالَمِيْنَ সর্বনামটির উদ্দিষ্ট বস্তু الكلمة। (বাণীটি)ও হইতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতাংশটির অর্থ হইবে ঃ 'আর ইবরাহীম ও ইয়াকূব স্ব-স্ব পুত্রদিগকে اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ বাণীটি আঁকড়াইয়া থাকিতে উপদেশ দিল।'

বস্তুত, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্ত ওসিয়াত বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল। এ সম্বন্ধে অনত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِه "আর আল্লাহ্ উহাকে (তাওহীদের কলেমাকে) তাহার (ইবরাহীমের) পরেও বিদ্যমান থাকার কলেমায় পরিণত করিলেন।"

একদল বিশেষজ্ঞ আলোচ্য আয়াতাংশের অন্তর্গত يعقوب শব্দটিকে যবর দিয়া পড়িয়াছেন। এমতাবস্থায় অর্থগত দিক দিয়া উহা ابراهيم শব্দের সহিত নহে, বরং بنيه শব্দের সহিত 'মা'তূফ' (সংযোজক অব্যয়) পদ হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতাংশটির অর্থ হইতেছে এই ঃ 'আর ইবরাহীম স্বীয় পুত্রদিগকে এবং (স্বীয় পৌত্র) ইয়াকূবকে উক্ত দীন আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়াছিল।' উক্ত কিরাআত ও অর্থ অনুসারে আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অবশ্য কুশায়রী বলেন–'হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ইন্তিকালের পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইমাম কুরতুবী তাঁহার উক্ত অভিমতটি উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ অভিমতের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ না থাকিলে উহাকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বস্তুত, উক্ত অভিমতের পক্ষে স্পষ্ট কোন প্রমাণ নাই। নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা বাহ্যত মনে হয়, হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত সারা (রা)-এর জীবদ্দশায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَبَشَّرْنَاهَا بِاسْحٰقَ - وَمِنْ وَّرَاءِ اسْحٰقَ يَعْقُوْبَ "এমতাবস্থায় আমি তাহাকে (সারা (রা)-কে) ইসহাক এর জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদান করিলাম এবং ইসহাকের পর তাহাদের পৌত্র ইয়াকূব জন্ম লাভ করিবে বলিয়াও তাহাকে সু-সংবাদ প্রদান করিলাম।"

উল্লেখযোগ্য যে, এখানে يعقوب শব্দটি যবর দিয়া গঠিত হইয়াছে। اسحاق শব্দের পূর্বে যেরূপে ب অব্যয় রহিয়াছে, উহার পূর্বেও সেইরূপে ب অব্যয় ছিল। উক্ত অব্যয়কে উহ্য করিয়া اسحاق শব্দটিকে 'নসব' সহকারে পাঠ করা হইয়া থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উপরোদ্ধৃত আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁহার স্ত্রী হযরত সারা (রা)-কে তাঁহাদের জীবদ্দশায়ই তাঁহাদের পৌত্র হযরত ইয়াকূব (আ) জন্মলাভ করিবে বলিয়া সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।' এইরূপ না হইলে হযরত ইসহাক (আ)-এর বংশধর নবীগণের মধ্য হইতে শুধু হযরত ইয়াকূব (আ)-এর জন্মলাভ সম্পর্কিত সুসংবাদ প্রদত্ত হইবার পশ্চাতে বিশেষ কোন তাৎপর্য থাকে না। আল্লাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

এইরূপে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইয়াকূব (আ) স্বীয় পিতামহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায়ই জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ - وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ "আর আমি তাহাকে (ইবরাহীমকে) ইসহাক এবং ইয়াকূবকে দান করিয়াছিলাম। অতঃপর আমি তাহার বংশে নবূওত ও কিতাব প্রদান করিয়াছিলাম।"

এখানেও আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে প্রদত্ত নিআমাত হিসাবে হযরত ইসহাক (আ)-এর সহিত হযরত ইয়াকূব (আ)-কে উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইরূপে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً "আর আমি তাহার জন্য ইসহাককে এবং অতিরিক্ত নি'আমাত হিসাবে ইয়াকূবকে দান করিয়াছিলাম।"

এতদ্ব্যতীত পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইয়াকূব (আ) হইতেছেন বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রথম নির্মাতা। হযরত আবূ যর গিফারী (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেন-একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলাম-হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন্ মাসজিদ সর্বপ্রথম নির্মিত হইয়াছে? নবী করীম (সা) বলিলেন-মসজিদুল হারাম সর্বপ্রথম নির্মিত হইয়াছে। আমি আরয করিলাম-অতঃপর সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মিত হইয়াছে? নবী করীম (সা) বলিলেন-অতঃপর সর্বপ্রথম বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মিত হইয়াছে। আমি আরয করিলাম-উভয়ের নির্মাণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত? নবী করীম (সা) বলিলেন-উভয়ের নির্মাণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান চল্লিশ বৎসর।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপরোক্ত তথ্য এবং উপরোল্লেখিত হাদীসের বক্তব্য একত্র করিলে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মিত হইবার চল্লিশ বৎসর পর হযরত ইয়াকূব (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইমাম ইব্ন হাব্বান উপরোল্লেখিত হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা করিয়াছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগ এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগের মধ্যে মাত্র চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল। ইমাম ইব্ন হাব্বানের উপরোক্ত ধারণা অন্য একটি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি মনে করিয়াছেন-হযরত সুলায়মান (আ)-ই বায়তুল মুকাদ্দাস সর্বপ্রথম নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্ত ধারণা ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগ শেষ হইবার কয়েক হাজার বৎসর পর হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। হযরত সুলায়মান (আ) বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রথম নির্মাতা নহেন; বরং তিনি উহার পুনঃনির্মাতা ও সংস্কারক মাত্র। ইমাম ইব্ন হাব্বান তাঁহাকে উহার প্রথম নির্মাতা মনে করিয়াই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগ এবং তাঁহার যুগের মধ্যে মাত্র চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার এই মত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। মূলত তাঁহাদের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান সহস্রাধিক বৎসর। আল্লাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

আলোচ্য আয়াতাংশের শেষোক্ত কিরাআতের শেষোক্ত অর্থই যে সঠিক, উহার পক্ষে আরেকটি প্রমাণ রহিয়াছে। উহা এই যে, হযরত ইয়াকূব (আ) স্বীয় পুত্রদিগকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, উহা আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন। স্বভাবতই বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতাংশে হযরত ইয়াকূব (আ) উপদেষ্টারূপে উল্লেখিত হন নাই; বরং তিনি এখানে উপদিষ্টরূপে উল্লেখিত হইয়াছেন।

يَابَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা এই দীনকে সারা জীবন ধরিয়া আঁকড়াইয়া থাক। এইরূপ করিলে আশা করা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে উক্ত দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় মৃত্যু দিবেন। কারণ, মানুষ সারা জীবন যে দীনকে আঁকড়াইয়া থাকে, প্রায়শ দেখা যায়, সেই দীনে থাকা অবস্থায়ই সে মরে। আর ইহা নিশ্চিত যে, সে যে দীনে থাকা অবস্থায় মরে, সেই দীনের অনুসারী হিসাবেই সে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হইবে। আর আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ম এই যে, যে ব্যক্তি নেক ও ন্যায় কাজ করিতে চাহে, তিনি তাহার জন্যে উহা আসান করিয়া দেন। আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত নিয়ম নিম্নোক্ত হাদীসের বিরোধী নহে ঃ

"নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'এইরূপ ঘটিয়া থাকে যে, মানুষ নেক আমল করিতে করিতে এত উন্নতি করে যে, তাহার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাত বা উহা অপেক্ষা কিছু অধিকতর পরিমিত স্থান ব্যবধান থাকে। এই সময়ে তাহার তাকদীর তাহার উপর জয়ী হয়। ফলে সে বদ আমলে লিপ্ত হয় এবং দোযখে প্রবেশ করে। আবার এইরূপও ঘটিয়া থাকে যে, মানুষ বদ আমল করিতে করিতে এত নীচে নামিয়া যায় যে, তাহার ও দোযখের মধ্যে মাত্র এক হাত বা উহা অপেক্ষা কিছু অধিকতর পরিমিত স্থান ব্যবধান থাকে। এই সময়ে তাহার তাকদীর তাহার উপর জয়ী হয়। ফলে সে নেক আমলে লিপ্ত হয় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।'

উক্ত হাদীসের বক্তব্য আল্লাহ্ তা'আলার উপরোল্লেখিত নিয়মের বিরোধী নহে— এই কারণে যে, উক্ত হাদীস কোন কোন সনদে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'মানুষ দৃশ্যত নেক আমল করিতে থাকে।... ... এবং মানুষ দৃশ্যত বদ আমল করিতে থাকে ... ...।' এতদ্বারা প্রমাণিত হয়, মানুষ নেক আমল বা বদ আমল যাহাই করিয়া থাকে, তাহার তাকদীর উহার বিরোধী হয় না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى - وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى -

"যে ব্যক্তি দান করে আর তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে এবং সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, আমি তাহার জন্যে নেক কাজকে নিশ্চয় আসান করিয়া দেই। আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করে, সত্য বিমুখ হয় এবং সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখান করে, আমি তাহার জন্যে বদ কাজকে নিশ্চয় আসান করিয়া দেই।"

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপর তাহার নেক আমল বা বদ আমলের বিরোধী কোন তাকদীর চাপাইয়া দেন না; বরং তিনি প্রত্যেককে তাহার নেক আমল বা বদ আমলের উপকরণ যোগাইয়া তাহাকে নিজ ইচ্ছা অনুসারে জান্নাত বা জাহান্নামের পথে চলিতে দেন।

Contents

প্রত্যেকের কর্মফল তাহারই জন্য

(١٣٣) اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

(١٣٤) تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৩৩. 'তোমরা কি ইয়াকূবের মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলে? যখন সে তাহার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার পর তোমরা কাহার ইবাদত করিবে?' তাহারা জবাব দিল, 'আমরা তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের একমাত্র প্রভুর ইবাদত করিব। আমরা তাঁহারই অনুগত।'

১৩৪. এই এক গোষ্ঠী অতিক্রান্ত হইয়াছে। তাহাদের উপার্জন তাহাদের জন্য আর তোমাদের উপার্জন তোমাদের জন্য। তাহারা কি কাজ করিত, তজ্জন্য তোমরা জবাবদিহী হইবে না।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মুশরিক বংশধর আরবগণ এবং হযরত ইয়াকূব (আ)-এর কাফির বংশধর বনী ইসরাঈলগণের দাবীর প্রতিবাদে বলিতেছেন যে, 'ইয়াকূবের মৃত্যুর সময়ে সে স্বীয় পুত্রদিগকে কি ওসিয়াত করিয়া গিয়াছিল, তাহা কি তোমরা তাহার মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত থাকিয়া শুনিয়াছিলে? নিশ্চয় তোমরা তাহার মৃত্যুর সময়ে তাহার নিকট উপস্থিত ছিলে না। অতএব, তোমরা কিভাবে নিশ্চিতরূপে দাবী করিয়া থাক যে, ইয়াকূব মুশরিক, ইয়াহুদী বা নাসারা ছিল? বস্তুত, মৃত্যুকালে ইয়াকূব স্বীয় পুত্রদিগকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করিতে ওসিয়াত করিয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় আয়াতে তিনি বলিতেছেন—কোন ব্যক্তিই অপরের ভাল কাজে পুরস্কৃত বা মন্দ কাজে শাস্তি প্রাপ্ত হইবে না। অতএব, প্রত্যেককেই নিজের নাজাতের জন্যে ঈমান আনিয়া নেক আমল করিতে হইবে। যে সকল পূর্ব পুরুষকে তোমরা মুশরিক, ইয়াহুদী বা নাসারা বলিয়া দাবী করিতেছ, তাহাদের ঈমান ও আমলে তোমাদের কোন উপকার বা অপকার হইবে না। নিজেদের নাজাতের জন্যে তোমাদিগকেই ঈমান আনিয়া নেক আমল করিতে হইবে। অতএব, আখিরাতে নাজাত পাইতে চাহিলে ঈমান আনিয়া নেক আমল করিতে প্রবৃত্ত হও।

হযরত ইসমাঈল (আ) ছিলেন হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পিতৃব্য। এখানে দেখা যাইতেছে, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পুত্রগণ হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসহাক

(আ)-এর সহিত হযরত ইসমাঈল (আ)-কেও হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পিতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তাহাদের এইরূপ অভিহিত করা تغليب -এর নিয়ম অনুসারে ঘটিয়াছে। অর্থাৎ দুর্বল দিককে সবল দিকের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন–এখানে পিতৃব্যকে 'পিতা' নামে অভিহিত করিবার কারণ 'তাগলীব'-এর নিয়ম প্রয়োগ নহে; বরং আরবগণ পিতৃব্যকে পিতা নামেও অভিহিত করিয়া থাকে। সেই কারণে এখানে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পিতৃব্য হযরত ইসমাঈল (আ) তাঁহার পিতা নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইমাম কুরতুবী উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'নাহ্হাস বলেন যে, আরবগণ পিতৃব্যকে পিতা নামেও অভিহিত করিয়া থাকে।'

মৃত ব্যক্তি মৃত্যুকালে পিতামহকে রাখিয়া গেলে উক্ত পিতামহ মৃত ব্যক্তির ভাইদিগকে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিবার পথে মৃত ব্যক্তির পিতার ন্যায় অন্তরায় হইবে কিনা এই বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত আয়েশা (রা), হাসান বসরী, তাঊস, আতা, ইমাম আবূ হানীফা প্রমুখ বিপুলসংখ্যক ফকীহ বলেন–মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকিতে যেরূপ তাহার ভাইগণ তাহার উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, তাহার পিতামহ জীবিত থাকিতে সেইরূপে তাহার ভাইগণ তাহার উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। তাঁহারা তাঁহাদের অভিমতের পক্ষে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতটি উল্লেখ করেন। উক্ত আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পিতামহ হওয়া সত্ত্বেও হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পিতা নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালিক এবং বিখ্যাত রিওয়ায়েত অনুসারে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল বলেন-মৃত ব্যক্তির পিতামহ জীবিত থাকিলে তাহার ভাইগণ তাহার পিতামহের সহিত তাহার উত্তরাধিকারী হইবে। হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে মাসঊদ (রা), হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) প্রমুখ বিপুল সংখ্যক ফকীহ উক্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ উক্ত অভিমতকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ইমাম বুখারী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং হযরত ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর মাধ্যমে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে উপরোক্ত অভিমত বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন–'এই বিষয়ে কেহ অন্য কোনরূপ মত প্রকাশ করেন নাই।' যাহা হউক এই বিষয়ে অন্যত্র বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিব ইনশাআল্লাহ্।

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ অর্থাৎ অনন্তর আমরা তাঁহার প্রতি অনুগত। বস্তুত, সকল সৃষ্টিই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অনুগত। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ "আর আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যত কিছু রহিয়াছে, উহাদের সকলেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁহার প্রতি অনুগত; আর তাহারা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইবে।"

সকল নবীর শরীআত এক না হইলেও তাহাদের সকলের দীন 'এক'। আর সেই একটি মাত্র দীন হইতেছে ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ ও তাঁহার প্রতি আনুগত্য।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ـ

"আর আমি তোমার পূর্বে যত রাসূলই পাঠাইয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি এই ওহী পাঠাইয়াছি যে, আমি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর।"

কুরআন মজীদের বিপুল সংখ্যক আয়াতে উপরোক্ত বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এইরূপে বিপুল সংখ্যক হাদীসেও উহা বর্ণিত রহিয়াছে। উহাদের একটি হাদীস হইতেছে এই ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'আমরা নবীগণ সকলে (দীনের দিক দিয়া) পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। আমাদের সকলের দীন এক।'

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ـ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ـ وَلاَتُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, উহারা হইতেছেন বিগত লোক সকল। তোমরা নিজেরা নেককার না হইলে এই সকল নেককার বান্দাগণের সহিত বংশগত দিক দিয়া তোমাদের সম্পর্কিত হওয়া তোমাদের কোন উপকার আসিবে না। কারণ, তাহাদের আমল তাহাদের উপকারে আসিবে আর তোমাদের আমল তোমাদের উপকারে আসিবে। অনুরূপভাবে তাহাদের কার্য সম্বন্ধেও তোমাদিগকে আল্লাহ্র নিকট জওয়াবদিহী করিতে হইবে না। অতএব নাজাত পাইতে চাহিলে নিজেরা ঈমান আনিয়া নেক আমল করিতে প্রবৃত্ত হও। ইহাই নাজাতের সঠিক পথ।'

হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'আমল যাহাকে পিছনে টানিবে, তাহার বংশ গৌরব তাহাকে আগাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না।'

আবুল আলীয়া বলেন- تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ অর্থাৎ ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব এবং তাঁহাদের উত্তরসূরিগণ।'

ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের বিভ্রান্তি

(١٣٥) وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْنَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ۖ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১৩৫. আর তাহারা বলিল, 'তোমরা ইয়াহুদী, অথবা নাসারা হইয়া যাও, তাহা হইলে পথপ্রাপ্ত হইবে।' তুমি বল, 'বরং ইবরাহীমের মিল্লাতই সুস্পষ্ট সত্য। তিনি মুশরিক দলভুক্ত ছিলেন না।'

তাফসীর ঃ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সওরিয়া নবী করীম (সা)-কে

বলিল–'আমরা যে ধর্ম লইয়া আছি, উহা ছাড়া অন্য কিছুই হিদায়েত নহে। হে মুহাম্মদ! তাই তুমি আমাদিগকে অনুসরণ কর। আমাদিগকে অনুসরণ করিলে তুমি হিদায়েত লাভ করিবে।' তেমনি খ্রিস্টানগণও নবী করীম (সা)-কে তদ্রূপ কথা বলিল। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ـ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهِمَ حَنِيْفًا الى اخر الاية

অর্থাৎ তোমরা যে ইয়াহুদী ধর্ম ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান জানাইতেছ, আমরা উহা অনুসরণ করিব না; বরং আমরা সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড ইবরাহীমের দীনকে অনুসরণ করিব।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব করযী এবং ঈসা ইব্‌ন জারিয়াহ বলেন– الحنيف। শব্দের অর্থ المستقيم। (দৃঢ় সরল; অবিচল)। মুজাহিদ হইতে খাসীফ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ الحنيف। অর্থ المخلص। (একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত)। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবী তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ الحنيف। অর্থ হজ্জ পালনকারী। হাসান, যিহাক, আতিয়্যা এবং সুদ্দী হইতেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। আবুল আলীয়া বলেন–যে ব্যক্তি স্বীয় নামাযে কা'বামুখী থাকে এবং এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, সামর্থ্য থাকিলে হজ্জ করা তাহার উপর ফরয, সে ব্যক্তিই হানীফ।'

মুজাহিদ এবং রবী' ইব্‌ন আনাস বলেন– الحنيف। অর্থ সত্যানুসারী।

আবূ কুলাবাহ বলেন–'যে ব্যক্তি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, সেই ব্যক্তি حنيف।'

কাতাদাহ বলেন–'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই, সে ব্যক্তিই হানীফ। মাতা, কন্যা, খালা ও ফুফুকে বিবাহ করা হারাম বলিয়া জানাসহ আল্লাহ্ কর্তৃক হারাম বলিয়া ঘোষিত সকল বিষয়কে হারাম বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়া, খতনা করা ইত্যাদি সবই উক্ত সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।"

মুসলমানদের বিশ্বাসের স্বরূপ

(١٣٦) قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

১৩৬. তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও আমাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপর আর যাহা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাহাদের উত্তরসূরীদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপর ঈমান আনিয়াছি। আর যাহা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে দেওয়া হইয়াছে তাহার উপরও। আমরা তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও পৃথক করি না আর আমরা তাঁহার অনুগত্যে আত্মসমর্পণকারী।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়সমূহ সবিস্তারে জানিয়া উহার প্রতি বিস্তারিতভাবে ঈমান আনিতে এবং পূর্ববর্তী সকল নবীর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়সমূহ মোটামুটিভাবে জানিয়া মোটামুটিভাবে উহার প্রতি ঈমান আনিতে মু'মিনদিগকে আদেশ দিতেছেন। তিনি তাহাদিগকে আদেশ দিতেছেন—'যাহারা আল্লাহ্র কতিপয় নবীর প্রতি ঈমান আনে এবং কতিপয়ের প্রতি কুফরী করে, তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না; বরং তাঁহার সকল নবীর প্রতিই তোমরা ঈমান আন।' এখানে আল্লাহ্ তা'আলা কয়েকজন নবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া অন্য সকল নবীকে 'নবীগণ' শব্দের মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার কতেক নবীর প্রতি ঈমান আনে এবং কতেকের প্রতি কুফরী করে, তাহাদের ঈমান ঈমান নহে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উহার কোনই মূল্য নাই। এ সম্বন্ধে তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً ـ اُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا ـ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ـ

"যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণের প্রতি কুফরী করে আর আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করিতে চাহে এবং বলে আমরা একাংশের প্রতি ঈমান রাখি ও একাংশের প্রতি কুফরী করি আর উহার মধ্যে থাকিয়া একটি পথ বানাইয়া লইতে চাহে, তাহারা নিশ্চয় কাফির; আর আমি কাফিরদের জন্যে লাঞ্ছনাকর শাস্তি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিমা ইব্ন আব্দুর রহমান, ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর, আলী ইব্ন মুবারক, উসমান ইব্ন আমারাহ, মুহাম্মদ ইব্ন বিশার ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন—আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও নাসারা) সম্প্রদায়ের লোকেরা ইব্রানী ভাষায় তাওরাত কিতাব পাঠ করিয়া মুসলমানদিগকে উহার আরবী অনুবাদ শুনাইত। একদা নবী করীম (সা) সাহাবাদিগকে বলিলেন—আহলে কিতাব সম্প্রদায় কর্তৃক বর্ণিত বিষয়সমূহকে তোমরা বিশ্বাসও করিও না আর অবিশ্বাসও করিও না। তোমরা বলিও—আমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং তিনি যাহা নাযিল করিয়াছেন, তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন ইয়াসার ও উসমান ইব্ন হাকাম প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন—নবী করীম (সা) অধিকাংশ সময়ে ফজরের ফরয নামাযের পূর্বের দুই রাকআত নামাযের প্রথম রাকআতে— قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ ـ الخ এই আয়াত এবং দ্বিতীয় রাকআতে اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেন।'

শব্দার্থ ঃ আবুল আলীয়া, রবী' ইব্ন আনাস ও কাতাদাহ বলেন– الاسباط অর্থাৎ হযরত ইয়াকূব (আ)-এর দ্বাদশ পুত্র এবং তাহাদের বংশধরগণ।'

খলীল ইব্ন আহমদ প্রমুখ ব্যাখ্যাকার বলেন–ইসমাঈল বংশের বনী ইসমাঈলগণ যেভাবে গোত্রকে قبيلة বলে, ইয়াকূব বংশের বনী ইসরাঈলগণ তেমনি গোত্রকে سبط বলে। উহারই বহুবচন হইতেছে اسباط ।

আল্লামা যামাখশারী স্বীয় আল-কাশ্শাফ (الكشاف) গ্রন্থে বলেন ঃ اسباط হইতেছে– 'হযরত ইয়াকূব (আ) এর পৌত্র-প্রপৌত্রগণ। অর্থাৎ তাঁহার বার পুত্রের বংশধরগণ।' ইমাম রাযী আল্লামা যামাখশারীর উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে বিনা মন্তব্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি উহাকে ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত কিছুই বলেন নাই। ইমাম বুখারী বলেন ঃ الاسباط অর্থাৎ বনী ইসরাঈল জাতির গোত্রসমূহ।'

الاسباط শব্দের উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য দাঁড়ায় ঃ 'তোমরা বল–আমরা আল্লাহ্র প্রতি, আমাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের উপর আর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূব–এর উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং ইয়াকূবের বংশধরদের উপর তাহাদের নবীগণের মাধ্যমে অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্য সকল নবীর নিকট আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রেরিত গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনিয়াছি। বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে যে আল্লাহ্ তা'আলা বহুসংখ্যক নবী পাঠাইয়াছেন, এ সম্বন্ধে হযরত মূসা (আ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا

"তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অতীতে প্রদত্ত নি'আমাত স্মরণ কর; যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক নবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বাদশাহ বানাইয়াছেন।"

নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির বারটি গোত্রকে الاسباط নামে অভিহিত করিয়াছেন ঃ

وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَىْ عَشَرَةَ اَسْبَاطًا "আর আমি তাহাদিগকে বারটি গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি।"

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ السبط (আস্‌সিবতু) দল, গোত্র। উহার বহুবচন হইতেছে الاسباط। বনী ইসরাঈল জাতি যেহেতু বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত, তাই তাহারা الاسباط নামে অভিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ঃ الاسباط শব্দটি السبط (আস্ সাবাতু) শব্দ হইতে গঠিত হইয়াছে। السبط হইল একই মূল হইতে উৎপন্ন একাধিক বৃক্ষের সমষ্টি (যেমন, বাঁশ ঝাড়)। উহার একবচন হইতেছে سبطة বনী ইসরাঈল জাতির প্রতিটি গোত্র যেহেতু একেকটি سبط এর ন্যায়, তাই তাহার সমষ্টি الاسباط নামে অভিহিত হইয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, সিমাক, ইসরাঈল, আসওয়াদ ইব্ন আমের, আবূ নাজীদ দাক্কাক, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর আমবারী ও যাজ্জাজ বর্ণনা

করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন–নিম্নোক্ত দশজন নবী ছাড়া সকল নবীই বনী ইসরাঈল জাতি হইতে প্রেরিত হইয়াছেন ঃ হযরত নূহ (আ), হযরত হূদ (আ), হযরত সালেহ (আ), হযরত শুআয়ব (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত ইয়াকূব (আ), হযরত ইসমাঈল (আ) এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)।[১]

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ السبط। একই ব্যক্তি হইতে উদ্ভূত জনগোষ্ঠী, গোত্র। উহার বহুবচন হইতেছে الاسباط।

কাতাদাহ বলেন–'আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি, তাঁহার সকল কিতাবের প্রতি এবং তাঁহার সকল নবীর প্রতি ঈমান আনিতে মুমিনদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন।'

সুলায়মান ইব্‌ন হাবীব বলেন–'আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবদ্বয়ের প্রতি শুধু ঈমান আনিতে আদেশ দিয়াছেন; কিন্তু, উহা আমল করিতে আদেশ দেন নাই। হযরত মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মালীহ, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ হামীদ, মুআম্মাল, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসআব সওরী ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–তোমরা তাওরাত, যবূর এবং ইঞ্জীলের প্রতি ঈমান রাখিও; কিন্তু তোমাদের আমলের জন্যে কুরআন মজীদই যথেষ্ট।'

(১৩৭) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

(১৩৮) صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ۝

১৩৭. যদি তাহারা তোমাদের মত উহাতে ঈমান আনে, তাহা হইলে তাহারা পথপ্রাপ্ত হইল। আর যদি তাহারা ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা পাপাচারে লিপ্ত হইল। অনন্তর শীঘ্রই আল্লাহ্ তাহাদের জন্যে যথেষ্ট হইবেন। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

১৩৮. আল্লাহ্‌র রঙ, আর আল্লাহ্‌র রঙের চাইতে উত্তম রঙ কি হইতে পারে? আর আমরা তাঁহারই ইবাদতগার।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন–'হে মুমিনগণ! আহলে কিতাব ও অন্যান্য কাফির সম্প্রদায় যদি তোমাদের ন্যায় আল্লাহ্‌র কিতাব ও সকল নবীর প্রতি ঈমান আনে এবং কোন নবীর প্রতি কুফরী না করে, তবে তাহারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হইবে। আর যদি তাহারা সত্যকে গ্রহণ না করিয়া মিথ্যাকেই আঁকড়াইয়া থাকে, তবে তাহারা হিদায়েত হইতে দূরেই থাকিয়া যাইবে। হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তাহাদের বিরুদ্ধে

---

১. প্রথম নবী হযরত আদম (আ) সহ দশজন হয়। রাবী সম্ভবত ভুলে উহা উল্লেখ করেন নাই। তাহা ছাড়া রাবী হয়ত খ্যাতনামা দশজনের কথা বলিয়াছেন। অখ্যাতদের সংখ্যা আরও বেশী।

তোমাকে সাহায্য করিবেন এবং তাহাদের উপর তোমাকে জয়ী করিবেন; আর তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।'

নাফে' ইব্‌ন আবূ নাঈম হইতে ধারাবাহিকভাবে যিয়াদ ইব্‌ন ইউনুস, ইব্‌ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, নাফে' ইব্‌ন আবূ নাঈম বলেন ঃ একদা হযরত উসমান (রা)-এর কুরআন মজীদখানা জনৈক খলীফার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল যাহাতে তিনি উহার ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনঃপ্রস্তুত করাইয়া উহা সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে পরবর্তী রাবী যিয়াদ ইব্‌ন ইউনুস প্রশ্ন করিলেন−লোকে বলে, হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের সময়ে উক্ত কুরআন মজীদখানা তাঁহার কোলে ছিল এবং

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

এই আয়াতাংশের উপর রক্ত পড়িয়াছিল। ইহা কি সত্য? নাফে' ইব্‌ন আবূ নাঈম জবাব দিলেন ঃ 'আমি স্বচক্ষে সেই কুরআন মজীদখানার এই আয়াতাংশের উপর রক্তের দাগ দেখিয়াছি। উক্ত কুরআন মজীদ পুরাতন হইয়া গিয়াছিল।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ صبغة الله অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দীন। মুজাহিদ, আবুল আলীয়া, ইকরামা, ইবরাহীম (নাখঈ) হাসান (বসরী), কাতাদাহ্, যিহাক, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন কাছীর, আতিয়্যা আওফী, রবী' ইব্‌ন আনাস এবং সুদ্দী হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

এখানে صبغة শব্দটির উপর 'নসব' হইবার কারণ এই যে, উহার পূর্বে الزموا। তোমরা আঁকড়াইয়া ধর অথবা عليكم তোমাদের জন্য অপরিহার্য অথবা অনুরূপ অর্থের কোন ক্রিয়া উহ্য রহিয়াছে। উক্ত ক্রিয়ার مفعول به (কর্মকারক) হিসাবে উহাতে نصب হইয়াছে। অনুরূপ কারণে 'নসব' হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে− فطرة الله অর্থাৎ 'তোমরা আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট স্বভাব ধর্মকে (ইসলামকে) আঁকড়াইয়া ধর।'

কেহ কেহ বলেন ঃ صبغة الله শব্দটি قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا আয়াতাংশের অন্তর্গত ملة শব্দের بدل হইবার কারণে উহার উপর 'নসব' হইয়াছে। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের অর্থ হইতেছে ঃ 'তুমি বল, বরং আমরা সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড একত্ববাদী ইবরাহীমের দীন তথা আল্লাহ্‌র দীনকে অনুসরণ করিব।'

সীবওয়াই বলেন ঃ صبغة শব্দটির পূর্বে صبغ ক্রিয়া উহ্য থাকিয়া উহাকে 'নসব' দিয়াছে। এমতাবস্থায় উহা مفعول مطلق (সমধাতুজ কর্মকারক) হিসাবে منصوب (কর্মকারকের বিভক্তি যুক্ত) হইয়াছে। পূর্ণ বাক্যটি হইতেছে এইরূপ ঃ صبغنا الله صبغة অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের অন্তরকে তাঁহার আনুগত্যের রঙে রঞ্জিত করিয়াছেন। বস্তুত উহা اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا - الخ বাক্যের তাকীদ বা দৃঢ়করণের জন্যে উক্ত হইয়াছে। অনুরূপ প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে এই ঃ وَعَدَ اللّٰهُ অর্থাৎ وَعْدًا وَعَدَ اللّٰهُ (আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আশআছ ইব্ন ইসহাক প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, বনী ইসরাঈল জাতির লোকেরা হযরত মূসা (আ)-কে প্রশ্ন করিয়াছিল–হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রভু কি রং লাগাইয়া থাকেন? হযরত মূসা (আ) বলিয়াছেন–'তোমরা আল্লাকে ভয় কর।' এই ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন–হে মূসা! উহারা তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, আপনার প্রভু কি রং লাগাইয়া থাকেন? তুমি (উহাদিগকে) বলো–'হ্যাঁ, আমার প্রভু তাঁহার রংসমূহের মধ্য হইতে লাল, সাদা, কালো এবং অন্য সকল রং লাগাইয়া থাকেন।' অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিয়াছেন ঃ

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً

উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম মারদুবিয়্যা উপরোক্তরূপে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী (حديث مرفوع) হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু, ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম উহাকে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উহার সনদ সহীহ হইলে উহা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হওয়াই অধিকতর স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

প্রত্যেকের কর্মফল তাহার নিজের জন্য

(١٣٩) قُلْ اَتُحَاجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ۙ

(١٤٠) اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

(١٤١) تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৩৯. তুমি বল, 'তোমরা কি আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্র ব্যাপারে ঝগড়া করিতেছ? তিনি আমাদের ও তোমাদের সকলের প্রভু। আমাদের কাজের দায়িত্ব আমাদের আর তোমাদের কাজের দায়িত্ব তোমাদের। আমরা তাঁহার জন্য নিবেদিত প্রাণ।'

১৪০. 'তোমরা কি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ইয়াকূব ও তাহাদের উত্তরসূরিগণকে ইয়াহুদী অথবা নাসারা বলিয়া দাবী করিতেছ?' তুমি বল– 'তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ্ বেশী জানেন? তাহার চাইতে জালিম কে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র তরফ হইতে আসা সাক্ষ্য তাহার সামনেই গোপন করে? আর আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন নহেন।'

১৪১. 'এই উম্মত অতীত হইয়াছে। তাহাদের জন্য তাহাদের উপার্জন আর তোমাদের জন্য তোমাদের উপার্জন। তাহারা কি করিতেছিল তাহার জন্য তোমরা জবাবদিহী হইবে না।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের বিতর্কের উত্তরে নবী করীম (সা)-কে শিখাইয়া দিতেছেন যে, তুমি তাহাদিগকে বল– 'তোমরা কি আল্লাহ্র একত্ব, তাঁহার প্রতি আনুগত্য এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলিবার বিষয় লইয়া আমাদের সহিত তর্ক করিতেছ? অথচ তিনি আমাদের এবং তোমাদের সকলেরই প্রতিপালক প্রভু। আমাদের এবং তোমাদের সকলেরই কর্তব্য একমাত্র তাঁহার প্রতি অনুগত হওয়া এবং একমাত্র তাঁহারই ইবাদত করা। আর আমরা ভোগ করিব আমাদের কর্মফল এবং তোমরা ভোগ করিবে তোমাদের কর্মফল। তোমাদের আমল আমাদিগকে বা আমাদের আমল তোমাদিগকে কোন উপকার বা অপকার করিতে পারিবে না। অতএব আমাদের ও তোমাদের সকলেরই কর্তব্য স্বীয় বিবেক প্রয়োগ করিয়া উহার নির্দেশ অনুসারে চলা। আমরা তদনুসারে একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছি।'

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَإِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ـ أَنْتُمْ بَرِيْـئُوْنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ـ

"তথাপি যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে (তাহাদিগকে) বল-আমার আমল আমার জন্যে এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে; আমার আমলের দায়িত্ব হইতে তোমরা মুক্ত এবং তোমাদের আমলের দায়িত্ব হইতে আমি মুক্ত।'

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

فَإِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ "এতদ্সত্ত্বেও যদি তাহারা তোমার সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তবে তুমি বলিও–আমি এবং আমার অনুসারীগণ আমরা সকলে আল্লাহ্র নিকট নিজদিগকে সঁপিয়া দিয়াছি।"

অনুরূপভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّوْنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانِ 'আর তাঁহার কওমের লোকেরা তাঁহার সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইল। তিনি বলিলেন–তোমরা আল্লাহ্র বিষয়ে আমার সহিত তর্ক করিতেছ? অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখাইয়াছেন।'

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖ اَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ "তুমি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছ যাহাকে আল্লাহ্ রাজ্যাধিকারী বানাইবার কারণে উহার গর্বে সে স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর বিষয়ে ইবরাহীমের সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল?"

আয়াতত্রয়ের দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের মিথ্যা দাবীর প্রতিবাদ করিতেছেন। ইয়াহুদী জাতি ও নাসারা জাতি প্রত্যেকেই দাবী করিত যে, হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসমাঈল (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত ইয়াকূব (আ) এবং বনী ইসরাঈল জাতির অন্যান্য নবীগণ তাহাদের ন্যায় ইয়াহুদী বা নাসারা ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কেহই ইয়াহুদী ও নাসারাগণের ন্যায় সত্যদ্বেষী ছিলেন না। ইয়াহুদী ও নাসারা সম্প্রদায় এসম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান রাখে, আল্লাহ্ তদপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান রাখেন। আল্লাহ্ নিশ্চিতরূপে জানেন, তাহাদের কেহই ইয়াহুদী বা নাসারা ছিলেন না। ইয়াহুদী ও নাসারাগণ যে উহা জানে না, তাহাও নহে; বরং তাহারাও জানে যে, ইবরাহীম প্রমুখ নবীগণ সকলেই সত্যপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাহারা ইয়াহুদী ও নাসারাগণের ন্যায় আল্লাহ্র প্রতি অবাধ্য ছিলেন না; বরং তাহারা ছিলেন আল্লাহ্র প্রতি অনুগত। কিন্তু, ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিদ্বয় উক্ত সত্য গোপন করিয়া তাঁহাদের নামে মিথ্যা প্রচার করিয়া থাকে। বস্তুত, উক্ত কার্যের দ্বারা তাহারা নিজেদের উপর অতি অবিচার করিয়াছে। তাহাদের কার্য সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবগত নহেন। তিনি তাহাদের কার্য সম্বন্ধে বেশ ভালরূপে অবগত রহিয়াছেন। একদিন তাহাদিগকে নিজেদের কার্যের জন্যে আল্লাহ্র নিকট জওয়াবদিহী করিতে হইবে।

এইরূপে হযরত ইবরাহীম (আ) সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَانَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ـ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

"ইবরাহীম ইয়াহুদী ছিল না এবং নাসারাও ছিল না; বরং সে ছিল সত্যপরায়ণ মুসলিম; আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"

তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ অর্থাৎ "আর যে ব্যক্তি নিজের নিকট রক্ষিত সাক্ষ্যকে আল্লাহ্র নিকট হইতে গোপন রাখিতে চেষ্টা করে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর জালিম কে হইতে পারে?"

হাসান বসরী বলেন–ইয়াহুদী ও নাসারাগণ তাহাদের কিতাবে পড়িত যে, দীন হইতেছে একমাত্র ইসলাম; মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও অন্যান্য নবী ইয়াহুদিয়াত ও নাসরানিয়াত হইতে পবিত্র ছিলেন। তাহাদের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে যাহারা প্রকৃত মু'মিন ছিল, তাহারা উহার পক্ষে আল্লাহ্র নিকট সঠিক সাক্ষ্য দিত। কিন্তু, নবী করীম (সা)-এর আগমনের পর ইয়াহুদী ও নাসারাগণ উক্ত তথ্য গোপন করিত।'

وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তোমাদের সকল কার্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে তোমাদের কার্যের যথাযথ প্রতিদান প্রদান করিবেন। অতএব, এখনও সত্য-বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া ঈমান ও আনুগত্যের পথ গ্রহণ কর।'

আয়াতত্রয়ের তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—'পূর্ব পুরুষগণের নেক আমল তোমাদের কোন উপকার করিবে না; বরং তোমাদের উপকার করিবে তোমাদের নিজস্ব নেক আমল।' অতএব, আখিরাতে দোযখ হইতে বাঁচিতে চাহিলে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ নি'আমাতপূর্ণ জান্নাত লাভ করিতে চাহিলে সত্য-বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি, তাঁহার সকল কিতাবের প্রতি এবং তাঁহার সকল রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধ পালন করিয়া চল।'

বস্তুত, শুধুমাত্র কোন নবীর সহিত সম্পর্কের মৌখিক দাবী করিয়া কেহ পার পাইবে না—তাহা ছাড়া আল্লাহ্র যে কোন নবীকে অস্বীকার করা সকল নবীকে অস্বীকার করার শামিল। বিশেষত সমগ্র মানব ও জ্বিন জাতির জন্য নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের প্রেরিত নবীকুল শিরোমণি সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে মানিয়া চলা সকলের জন্য সমান অপরিহার্য। আল্লাহ্ পাক তাঁহার ও আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর শান্তি ও রহমত নাযিল করুন।

আলিফ লাম পারা সমাপ্ত

ইফা-২০১৩-২০১৪-প্র/২৫৫(উ)-৩২৫০